Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Documentation of Bengali documents in collaboration with Rabindra Bharati University and the Ford Foundation: microfilmed and digitised in December 2006

Record No: 2006/ 168	Language of work: Bengali
Author (s) / Editor (s): SUDHINDRANĀTH DUTTA (1931 - 1943) SUDHINDRANĀTH DUTTA & HIRANKUMAR SĀNYĀL (JULY 1940 - JUNE 1943)	
Title: পরিচয় PARICAYA	
Volume(s): VOL. 1 no 1 (SRABAN 1338 [JULY 1931] - VOL 12 [ASHADHA 1350 [JUNE 1943]	
Place (s) of Publication: CALCUTTA	Publisher: JAGATBANDHU DUTTA 485 DALAHAUSI SQUARE. SRI KUNDABHUSAN BHADURI 11 COLLEGE SQUARE ET AL
Year / edition:	
Size: 23·2	Condition of the original: BRITTLE
Remarks: TITLE PAGE MISSING - VOL 4, VOL. 9 PART II VOL 10 PART II TORN VOLUME - VOL. 5 (LITTLE TORN) VOL 7 PART I	
Holding institute: Rabindra Bharati University, Calcutta	Microfilmed and digitised by: Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta, 2006 - 2007.

Microfilm Roll No:	From gate:	To gate:

পরিচয়

অষ্টম বর্ষ—প্রথম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩৪৫ হইতে পৌষ, ১৩৪৫

11500

সম্পাদক—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

RABINDRA BHARATI UNIVERSITY
CENTRAL LIBRARY
ACC. NO. ম1৪৫
DATE 21-5-2001

পরিচয়

সূচিপত্র

৮ম বর্ষ—১ম খণ্ড; শ্রাবণ, ১৩৪৫—পৌষ, ১৩৪৫

লেখকগণের বর্ণানুক্রমিক সূচী

শ্রীঅমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়—
পুস্তক-পরিচয় ৯৮, ১৯৯, ৩৮৮, ৪৮৩

শ্রীঅমূল্য চট্টোপাধ্যায়—
সেতুবন্ধ (গল্প) ১০৯

শ্রীঅরুণকুমার মিত্র—
আমরা চেয়েছি শান্তি (কবিতা) ১০৩

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—
দিন চ'লে যায় (কবিতা) ৫৬০
নবজন্ম (কবিতা) ২৬৯

শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত—
পুস্তক-পরিচয় ৯৯
যাত্রাশেষ (কবিতা) ৫৫৮

শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—
মানুষের মন, মগজ ও আত্মা ৩২৬

শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য—
পুস্তক-পরিচয় ১৮৯

শ্রীগৌরগোপাল মুখোপাধ্যায়—
রজনীগন্ধা (কবিতা) ৩৬৯

শ্রীচঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়—
পুস্তক-পরিচয় ৫৯০

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত—
পুস্তক-পরিচয় ৭৬

শ্রীজীবনময় রায়—
মন্থর (কবিতা) ৪৬৩
বিদায়ের গান (কবিতা) ১৭০

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নন্দী—
নদী ও নারী (গল্প) ৩৩৬

শ্রীদর্শন শর্ম্মা—
পুস্তক-পরিচয় ৭৯, ২৮৭, ৩৮০, ৪৭৮

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—
জাপানী কবিতা ১১৯

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
নতুন ও পুরাতন ৪৯৫
পুস্তক-পরিচয় ৩৭৩

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত—
পুস্তক-পরিচয় ৩৯৫

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত—
কবি ও যোগী ৪৫৫

শ্রীনীরদকুমার ভট্টাচার্য্য—
দেশ-বিদেশ ৪০[illegible]
পুস্তক-পরিচয় ১৯১

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়—
দাবী (উপন্যাস) ১৩১, ২১৮, ৩১১, ৪১২

শ্রীপরিমল গোস্বামী—
শব্দ-সঙ্ঘাত (গল্প) ৫৩২

শ্রীপূর্ণেন্দু গুহ—
ঘূর্ণি হাওয়া (কবিতা) ১৭০
পুস্তক-পরিচয় ২৯২, ৪৮৫

শ্রীপ্রবীরচন্দ্র বসু মল্লিক—
পুস্তক-পরিচয় ২৮১, ৩৮৩
ফ্যাসিজম্ ও সমর ১৪৪

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী—
পুস্তক-পরিচয় ৮২, ১৭৮, ৪৯২

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন—
পুস্তক-পরিচয় ৫৮৭

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র—
থার্মোফ্লাস্ক ও চীনের যুদ্ধ (গল্প) ২৭২

শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ—
বসুবন্ধুর বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি ২০১
বিজ্ঞানবাদের ক্রমবিকাশ ৪
বৌদ্ধদর্শনে ঈশ্বরজিজ্ঞাসা ৩৯৭
স্থিরমতির ত্রিংশিকাভাষ্য ৫৬২

শ্রীবিজন রায়—
দেশ-বিদেশ ২৬০, ৩৫১

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়—
প্রত্যয় (কবিতা) ৫৫৭

শ্রীবিষ্ণু দে—
পুস্তক-পরিচয় ৮৬
সর জি, পি-র গান (কবিতা) ২৬৮

শ্রীভোলানাথ ঘোষ—
বাংলা বানানের নিয়ম ১৭৫

শ্রীমণীন্দ্র রায়—
আগন্তুক (গল্প) ৫০১
"স্বর্গ হইতে বিদায়" (কবিতা) ৩৭২

শ্রীমণীশ ঘটক—
বঙ্কিমচন্দ্র (কবিতা) ২৭০

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়—
প্যাঁক (গল্প) ৪৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—
মংপু পাহাড়ে (কবিতা) ১

শ্রীলীলাময় রায়—
দম্পতী (নাটিকা) ২৫২

শ্রীশোভা মহলানবীশ—
বিচ্ছেদ (কবিতা) ৩৬৯

শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ—
পুস্তক-পরিচয় ৪৮৭

শ্রীসমর সেন—
পুস্তক-পরিচয় ২৯০

শ্রীসমীর রায়—
মাদনুনা (গল্প) ৪৩০

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী—
সোমলতা (উপন্যাস) ২৫

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়—
আত্মনির্ব্বাসিত (কবিতা) ২৭১

শ্রীসুকুমার দে সরকার—
আসার আগে (কবিতা) ৩৭০

শ্রীসুকৃৎকুমার মৈত্র—
বন্ধ্যা-জমি (কবিতা) ৫৫৯

শ্রীসুধাময় ভট্টাচার্য—
পুস্তক-পরিচয় ৫৭৯
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত—
উজ্জীবন (কবিতা) ৪৬৪
শ্রীসুনীলরঞ্জন ঘোষ—
ছবি (কবিতা) ৫৫৮
শ্রীসুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—
দিগ্‌গজের সাহিত্য-চর্চা ৪৩৫, ৫৩৯
শ্রীসুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—
এখানে (কবিতা) ৪৬১
শ্রীসুমন্ত্র মহলানবীশ—
পুস্তক-পরিচয় ৩৭৭
শ্রীসুশোভন সরকার—
পুস্তক-পরিচয় ৪৭২, ৫৮৪
শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ বসু—
পুস্তক-পরিচয় ১৮৫, ২৯৬
শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র—
পাষাণ-কন্যা (কবিতা) ৪৬২
পুস্তক-পরিচয় ৫৯২
শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব—
পুস্তক-পরিচয় ৩৯০, ৪৮১
শ্রীহিরণকুমার সান্যাল—
পুস্তক-পরিচয় ৮৫
ভারতপথে (উপন্যাস) ৬৭, ১৫৩, ২৭৩, ৩৫৯, ৪৪৭, ৫৪৯
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত—
দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র ৪১, ১০১, ২০৩, ৩০১, ৪২৩, ৫২১
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—
দেশ-বিদেশ ১৬২
ভারতীয় জাতীয়তার জন্ম ৫৮
শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়—
পুস্তক-পরিচয় ১৯৫, ৫৮৩

RABINDRA BHARATI UNIVERSITY
CENTRAL LIBRARY
J ।৪৬

৮ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা
শ্রাবণ, ১৩৪৫

পরিচয়

মংপু পাহাড়ে

কুজ্‌ঝটি জাল যেই সরে গেল মংপুর
নীল শৈলের গায়ে দেখা দিল রঙ পুর।
বহুকেলে জাদুকর, খেলা বহুদিন তার,
আর কোনো দায় নেই, লেশ নেই চিন্তার।
দূর বৎসর পানে ধ্যানে চাই যদ্দূর
দেখি লুকোচুরি খেলে মেঘ আর রোদ্দুর।
কত রাজা এলো গেলো, মোলো এরি মধ্যে,
লড়েছিল বীর, কবি লিখেছিল পদ্যে।
কত মাথা কাটাকাটি সভ্যে-অসভ্যে,
কত মাথা-ফাটাফাটি সনাতনে নব্যে।
ঐ গাছ চিরদিন যেন শিশু মস্ত,
সূর্য্য উদয় দেখে, দেখে তার অস্ত।
ঐ ঢালু গিরিমালা, রুক্ষ ও বন্ধ্যা,
দিন গেলে ওরি পরে জপ করে সন্ধ্যা।
নিচে রেখা দেখা যায় ঐ নদী তিস্তার,
কঠোরের স্বপ্নে ও মধুরের বিস্তার।

হেনকালে একদিন বৈশাখী গ্রীষ্মে,
টানা-পাখা-চলা সেই সেকালের বিশ্বে
রবিঠাকুরের দেখা সেইদিন মাত্তর,
আজ তো বয়স তার কেবল আঠাত্তর,
সাতের পিঠের কাছে এক ফোঁটা শূন্য ;
শত শত বরষের ওদের তারুণ্য।
ছোট আয়ু মানুষের, তবু একী কাণ্ড,
এটুকু সীমায় গড়া মনোব্রহ্মাণ্ড ;
কত সুখে দুখে গাঁথা, ইষ্টে অনিষ্টে,
সুন্দরে কুৎসিতে, তিক্তে ও মিষ্টে,
কত গৃহ-উৎসবে, কত সভা-সজ্জায়,
কত রসে মজ্জিত অস্থি ও মজ্জায়,
ভাষার নাগাল-ছাড়া কত উপলব্ধি
ধেয়ানের মন্দিরে আছে তার স্তব্ধি'।
অবশেষে একদিন বন্ধন খণ্ডি'
অজানা অদৃষ্টের অদৃশ্য গণ্ডি
অন্তিম নিমেষেই হবে উত্তীর্ণ।
তখনি অকস্মাৎ হবে কি বিদীর্ণ
এত রেখা এত রঙে গড়া এই সৃষ্টি,
এত মধু অঞ্জনে রঞ্জিত দৃষ্টি।

বিধাতা আপন ক্ষতি করে যদি ধার্য,
নিজেরই ত'বিল-ভাঙা হয় তার কার্য,
নিমেষেই নিঃশেষ করি ভরা পাত্র
বেদনা না যদি তার লাগে কিছু মাত্র,
আমারি কী লোকসান যদি হই শূন্য,
শেষ ক্ষয় হলে কারে কে করিবে ক্ষুণ্ণ ?

এ জীবনে পাওয়াটারই সীমাহীন মূল্য,
মরণে হারানোটা তো নহে তার তুল্য।
রবিঠাকুরের পালা শেষ হবে সদ্য,
তখনো তো হেথা এক অখণ্ড অদ্য
জাগ্রত রবে চিরদিবসের জন্যে
এই গিরিতটে এই নীলিম অরণ্যে।
তখনো চলিবে খেলা নাই যার যুক্তি,
বারবার ঢাকা দেওয়া, বারবার মুক্তি।
তখনো এ বিধাতার সুন্দর ভ্রান্তি
উদাসীন এ আকাশে এ মোহন কান্তি॥

মংপু
১০।৬।৩৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিজ্ঞানবাদের ক্রমবিকাশ।*

বৌদ্ধযুগের শেষ ভাগে, শান্তরক্ষিত ও কমলশীলের জীবিত কালে (৮০০ খৃঃ) ভারতীয় দর্শন কি কি বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল তাহাই আমার বক্তৃতা-শ্রেণীর আলোচ্য বিষয়। অদ্যকার এই প্রথম বক্তৃতায় সংক্ষেপে দেখাইবার চেষ্টা করিব বৌদ্ধ ধর্ম্মের উদ্ভব কিরূপে হইয়াছিল, এবং আদি বুদ্ধবচন কিরূপে ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া পরিশেষে শান্তরক্ষিতের বিজ্ঞানবাদে পরিণত হইয়াছিল। দর্শনের ক্ষেত্রে ইহাকেই বৌদ্ধ ধর্ম্মের চরম পরিণতি বলা যাইতে পারে। সাংখ্য, বেদান্ত, ন্যায় প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হিন্দু দার্শনিকদের বিরুদ্ধ সমালোচনায় জর্জ্জরিত হইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও দর্শনের মূল শিথিল ও ভিত্তি সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছিল। বুদ্ধদেব হইতে শান্তরক্ষিত পর্য্যন্ত এই চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও দর্শন যে এত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহার একটি প্রধান কারণ হিন্দু জৈনাদি অপরাপর দার্শনিক মতবাদের সহিত সঙ্ঘর্ষ। সুতরাং বৌদ্ধ দর্শনের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও পরিণতি সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, যে যে দার্শনিক মতবাদের বিরুদ্ধে বৌদ্ধদিগকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল সেগুলিরও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা প্রয়োজন। এবং এই আলোচনার ফলে যে কেবল বৌদ্ধ দর্শনেরই ক্রমবিকাশ সুপরিস্ফুট হইবে তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু জৈনাদি বিরুদ্ধপক্ষীয় দার্শনিকদের মতবাদও কিরূপে বৌদ্ধসঙ্ঘর্ষে ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহাও আমরা বুঝিতে পারিব। শান্তরক্ষিতের "তত্ত্বসংগ্রহ" (কমলশীলের "পঞ্জিকা" সহ) এই দিক হইতে একটি অমূল্য গ্রন্থ; কারণ ভারতের বিস্তীর্ণ দার্শনিক সাহিত্যের মধ্যে এমন আর একখানিও গ্রন্থ নাই যাহাতে একটি বিশেষ দার্শনিক মতবাদের পক্ষ হইতে সেই যুগের অপর সমস্ত মতের বিচার ও সমালোচনা করা হইয়াছে। ভারতীয় সাহিত্যে ইহাই একমাত্র গ্রন্থ যন্মধ্যে আমরা সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাই—কুমারিলের অব্যবহিত পরে এবং শঙ্করাচার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বে বৌদ্ধ

* Prabodh Basu Mullick Fellowship lecture, No. 1,

দর্শন কিরূপে অপরাপর সম্প্রদায়ের দার্শনিকদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল এবং কিরূপেই বা বৌদ্ধগণ আপনাদিগকে সেই আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ বলিতে এখানে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ বুঝিতে হইবে, কারণ শান্তরক্ষিত ও কমলশীল ছিলেন বিজ্ঞানবাদী, এবং তাঁহারা ভিন্ন সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ মতবাদ এবং সাংখ্য জৈনাদি অবৌদ্ধ মতবাদের সমভাবে বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন।*

বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও দর্শন লইয়া বহু আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত নিঃসন্দিগ্ধ রূপে নির্ণীত হয় নাই, গৌতম বুদ্ধ নামে কোন ব্যক্তি বাস্তবিক কখনও জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কি না। গৌতম বুদ্ধের (?) অস্থি আবিষ্কৃত হওয়াতেও এবিষয়ে ঐতিহাসিকগণের সন্দেহ নিরস্ত হয় নাই। তবে সান্ত্বনার বিষয় এইটুকু যে ধর্ম্ম প্রচারকদিগের মধ্যে একমাত্র বুদ্ধদেবের ঐতিহাসিকতাই যে অমীমাংসিত রহিয়া গিয়াছে তাহা নহে; বৈদিক যুগের অব্যবহিত পরবর্ত্তী কালে যে ভক্তিমূলক হিন্দু ধর্ম্ম ভারতে প্রচারিত হইয়া আজিও জগৎসমক্ষে ভারতীয় সভ্যতার প্রধান অঙ্গরূপ পরিচিত, সেই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক কৃষ্ণবাসুদেবের ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধেও পণ্ডিতগণ সমভাবে সন্দিহান, কারণ তাঁহাদের মতে কৃষ্ণবাসুদেবই যে ছান্দোগ্যোপনিষদের কৃষ্ণ দেবকীপুত্র তাহার যথেষ্ট প্রমাণ নাই। যিশু খৃষ্ট সম্বন্ধেও ঐ এক কথা। খৃষ্ট ধর্ম্ম আজ বিশ্বজয়ী, তথাপি খৃষ্টমতাবলম্বী পণ্ডিতগণও নির্ভয় বলিয়া থাকেন, যিশু খৃষ্ট ভক্তগণের আবিষ্কার মাত্র।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে ধর্ম্ম আছে অথচ তাহার প্রবর্ত্তক নাই, ইহা অসম্ভব, কারণ মূলহীন বৃক্ষ কি কখনও কল্পনা করা যাইতে পারে? কিন্তু একটি বিশেষ ধর্ম্মমত ও একটি বিশেষ বৃক্ষের জন্ম, বৃদ্ধি ও পরিণতি একই পন্থায় ঘটে না। বৃক্ষ বীজেরই পরিবর্ত্তিত রূপ, কিন্তু ধর্ম্ম যে ধর্ম্মেতর কোন বস্তুর পরিবর্ত্তিত রূপ—তাহা হইতে বলা যাইতে পারে না। যদি কোন ধর্ম্ম সম্বন্ধে একথা বলা সম্ভব হয় তবে বুঝিতে হইবে যে তাহা সংজ্ঞানুযায়ী ধর্ম্ম নহে, রাজনীতি বা সমাজনীতি মাত্র। এক কথায় বলিব transcendental sociologyর নাম ধর্ম্ম। মানুষের চিন্তাশক্তি ও কল্পনা

* ইহা হইতে বুঝা যায় যে শান্তরক্ষিতের যুগেও বৌদ্ধগণ হিন্দু সমাজেরই একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়রূপে পরিগণিত হইতেন।

প্রচেষ্টার মধ্যেই যাহা স্বতঃসিদ্ধরূপে ধরিয়া লইতে হয়, এবং তজ্জন্য সত্য-নিরূপণের সকল প্রকার মানসিক প্রচেষ্টার যাহা ভিত্তিস্বরূপ,—তাহাকেই transcendental বলা হয়। Kant তাঁহার Aesthetic-এ কাল ও দিক্‌কে (time and space) এই অর্থেই transcendental বলিয়াছেন এবং বৈশেষিক দর্শনেও কাল ও দিক্‌কে অপ্রত্যক্ষ ও পঞ্চভূতের অতিরিক্ত বলার অর্থও সম্ভবতঃ ইহাই। সুতরাং বলা যাইতে পারে না যে মানুষ সভ্যতার একটি নির্দ্দিষ্ট স্তরে পৌছাইয়া তবে বাহ্যপ্রণোদিত হইয়া তাহার ধর্ম্ম আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। মানুষ পরিপূর্ণরূপে sapiens হইয়া উঠিবার পূর্ব্বেই যে ধর্ম্মচিন্তা আরম্ভ করিয়াছিল Neanderthal মনুষ্যের পরলোক-বিশ্বাসই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আদিম মানবের ধর্ম্মবিশ্বাসের মধ্যেই মানুষের দার্শনিক চিন্তার অরুণোদয়। কারণ মানব সমাজ কোন দিনই ধর্ম্ম হইতে দর্শনকে এবং দর্শন হইতে ধর্ম্মকে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। ধর্ম্ম ও দর্শন একই মানবমনপ্রসূত, সুতরাং তাহাদের পার্থক্য সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভবও নয়, বিশেষ যখন সেই মানবমনই উভয়েরই বিচারক। ভক্তি ও যুক্তি,—দুইই মানব মনে সমভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত; ভক্তি হইতে জন্মে প্রপত্তি (self-surrender) এবং তাহাই সকল প্রকার ধর্ম্মবিশ্বাসের মূল ভিত্তি; যুক্তি দর্শনের জন্মদাত্রী। কিন্তু কোন ধর্ম্মমতই সম্পূর্ণরূপে যুক্তিহীন নহে, এবং চার্ব্বাকদর্শন ভিন্ন অপর কোন দর্শনকেই সম্পূর্ণরূপে ভক্তিহীনও বলা যায় না। এই দুইটি শক্তির চিরন্তন দ্বন্দ্বই সভ্যতাবিকাশের মূল মন্ত্র। সমস্ত সভ্য জাতি ইতিহাসেই দেখা যায় যে যুক্তিনিষ্ঠ যুগের পরেই ভক্তির যুগ আসিয়াছে —Platoর পর Plotinus, শঙ্করের পর রামানুজ, Kant-এর পর Bergson।

ধর্ম্ম ও দর্শন যদি পরস্পরের সহিত এইরূপ অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হয় তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে ধর্ম্মও যত প্রাচীন, দর্শনও তত প্রাচীন, এবং Neanderthal মনুষ্যও ছিল এক হিসাবে দার্শনিক। কতকগুলি বিষয়ে সভ্য ও আদিম মানবের বিশ্বাসাদি সমভাবে ধর্ম্ম নামে পরিগণিত হইয়া থাকে; কিন্তু সভ্য মানুষের চিন্তাপ্রণালীর সহিত আদিম মানবের সত্যানুসন্ধিৎসার যে কোন সাদৃশ্য বা ঐকজাত্য আছে, তাহা সভ্য মানুষ সহজে স্বীকার করিতে চাহে না। কিন্তু ইহা নিতান্তই অযৌক্তিক। Levy-Bruhl প্রমুখ

আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ এই জন্য মানব সমাজের একটি প্রাগ্‌-যৌক্তিক (Pre-logical) অবস্থা কল্পনা করিয়া লন। কিন্তু এক্ষেত্রে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই "প্রাগ্‌--যৌক্তিক" অবস্থা হইতেই যদি বিবর্ত্তনক্রমে মানুষের যুক্তিশীলতা উদ্ভূত হইয়া থাকে তবে কিরূপে তাহাকে প্রাগ্‌-যৌক্তিক বলা যাইতে পারে? সুতরাং আপত্তির আশঙ্কা না করিয়া বলা যাইতে পারে যে আদিম মানবের মনেও দার্শনিক চিন্তার বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, এবং তাহাই ভিন্ন দেশে, ভিন্ন যুগে, নানা আকারে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। এবং দর্শনপ্রবণতা যদি পূর্ব্বোক্ত পন্থায় transcendental sociologyর অঙ্গস্বরূপ হয় তবে প্রত্যেক দেশের ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভেই তদ্দেশীয় দর্শনের ক্রমবিকাশের আদি স্তরের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে। এখন দেখা যাউক, ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের মধ্যে বৌদ্ধ দর্শনের কোন চিহ্ন আবিষ্কার করা যায় কি না। এ বিষয়ের বিস্তীর্ণ আলোচনা সাংখ্য বেদান্তাদি বিভিন্ন মতবাদের সহিত বৌদ্ধ দর্শনের তুলনা সম্পর্কে পরে করা হইবে। এস্থলে এইটুকু বলাই বোধহয় যথেষ্ট যে সাংখ্য, যোগ ও বেদান্তদর্শনের মধ্যেই বৌদ্ধ দর্শনের সমস্ত মূলতত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। বেদান্তের ব্রহ্মবাদ, সাংখ্যের প্রকৃতি, এবং যোগ-দর্শনের প্রায় সমস্ত মূলতত্ত্বগুলিকেই ভিত্তি করিয়া বৌদ্ধ দর্শন গড়িয়া উঠিয়াছে। বেদান্তের ব্রহ্মেরই বৌদ্ধ নাম বিজ্ঞান (বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য, I. H. Q., 1934, pp. 1-11); সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষের শাসন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বৌদ্ধ দর্শনে প্রতীত্যসমুৎপাদরূপে বিকাশ লাভ করিয়াছে। ইহাই সংক্ষেপে বৌদ্ধ-দর্শনের উৎপত্তির ইতিহাস। কিন্তু উৎপত্তির প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে শাখাভেদের সূচনা হইল, কারণ কোন জীবন্ত ধর্ম্মমতই দীর্ঘকাল অপরিবর্ত্তিত থাকিতে পারে না। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নানা প্রাচীন শাখার নাম ও মতবাদের কথা বৌদ্ধশাস্ত্র হইতে জানা যায়, কিন্তু তাহাদের ঐতিহাসিক পরম্পরা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধরূপে কিছু বলিবার উপায় নাই। তবে হিট্‌লার ও মুসোলিনির দ্বারা অলঙ্কৃত এই আধুনিক যুগ ভিন্ন ইতিহাসের সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে মানবীয় চিন্তাধারা সহজ অবস্থায় স্থূল হইতে সূক্ষ্মের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। এই দিক হইতে বিচার করিলে পুদ্গলবাদকেই আদি বৌদ্ধমত বলিয়া মনে করা স্বাভাবিক।

পুদ্গলবাদিগণ Personalist। যে সকল বুদ্ধবচনের মধ্যে পুদ্গল সম্বন্ধে আলোচনা আছে সেইগুলিই এই মতবাদের ভিত্তিস্বরূপ। এই সকল বচনের মধ্যে পুদ্গল কথাটির অর্থ সুস্পষ্ট। যথা "তং পুগ্গলং এব পস্সথ" (ঐ ব্যক্তিটি কে দেখ), "সঙ্ঘে বা পুগ্গলে বা" (সঙ্ঘের মধ্যে অথবা ব্যক্তির মধ্যে), ইত্যাদি। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে বুদ্ধদেব এই পুদ্গল সম্পর্কেই আবার আত্মার কথা বলিয়াছেন :—"পুদ্গল চারি প্রকার ; যে পুদ্গল অপরের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করে, কিন্তু "আত্মার" কল্যাণের জন্য চেষ্টা করে না ; যে পুদ্গল "আত্মার" কল্যাণের জন্য চেষ্টা করে কিন্তু অপরের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করে না" ইত্যাদি (অঙ্গুত্তর, II, p. 95 ; পুগ্গলপঞ্ঞত্তি, পৃ ৫৪)। এই সকল বচনের মধ্যে "আত্মা" কথাটির অর্থ self না soul না চিত্তমাত্র তাহা লইয়া অনন্ত তর্ক বিতর্ক চলিতেছে, কিন্তু কোন কালে যে এ সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছান যাইবে তাহা মনে হয় না। জন্মান্তরবাদ ও কর্ম্মবাদে পুদ্গলবাদিগণের পরিপূর্ণ আস্থা। ব্যক্তিত্বে যাঁহারা বিশ্বাস করেন তাঁহাদের পক্ষে জন্মান্তরবাদী ও কর্ম্মবাদী হওয়া স্বাভাবিকও বটে। কারণ একের কর্ম্মের ফল অপরে ভোগ করিবে এরূপ কথা কিরূপে তাঁহারা স্বীকার করিতে পারেন ?

এখন প্রশ্ন পুদ্গল ও আত্মা এতদ্বয়ের এক বা উভয়ের যদি প্রকৃত অস্তিত্ব থাকে, নির্ব্বাণ তবে কি ? এরূপ অবস্থায় নির্ব্বাণের অর্থ যে পূর্ণবিলোপ হইতে পারে না তাহা সুস্পষ্ট। সুতরাং নির্ব্বাণও যে এক প্রকারের অস্তিত্ব তাহা স্বীকার করিতে হইবে। নির্ব্বাণের অনুপম আনন্দের কথাও বৌদ্ধগণ সর্ব্বত্র স্বীকার করিয়া গিয়াছেন,—বেদান্তের সহিত বৌদ্ধ দর্শনের এই বিষয়ে কোন পার্থক্য নাই। চারিটি অব্যাকৃতবস্তুর মধ্যে নির্ব্বাণান্তর তথাগতের অস্তিত্বানস্তিত্ব বিষয়ক প্রশ্নাবলী একটি* (Thomas, p. 124), কিন্তু বুদ্ধাবতার নাগার্জ্জুন এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ রাখিয়া যান নাই। তাঁহার মতে পুদ্গলবাদিগণের বিশ্বাস, বুদ্ধদেব যে নির্ব্বাণের পর আত্মার অনস্তিত্ব বিষয়ে প্রশ্নোত্থাপন করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন তাহার অর্থই এই যে নির্ব্বাণই অস্তিত্ব† (Poussin, p. 162)।

* অপর তিনটি (১) জগৎ শাশ্বত না নশ্বর ; (২) জগৎ সান্ত না অনন্ত ; (৩) দেহই জীব কিনা। Majjh. N. I, 157 ff.

† অকুতোভয়া (মধ্যমকভাষ্য), ২২।১৩।

পুদ্গলবাদিগণের পরেই স্কন্ধবাদিগণের অভ্যুদয়, উভয় সম্প্রদায়ই হীনযানের অন্তর্গত। বলা যাইতে পারে যে এই স্কন্ধবাদেই হীনযানী বৌদ্ধ দর্শনের চরম পরিণতি। পুদ্গলবাদিগণের মতে দেহাত্মা যেন অখণ্ড ও অবিভাজ্য, কিন্তু স্কন্ধবাদিদের মতে দৈহিক ও আত্মিক নানা বস্তুর সমবায়ের ফলেই দেহাত্মার উৎপত্তি। Vallée-Poussin এই জন্য স্কন্ধবাদিদের নাম দিয়াছেন Phenomenalists। এই সম্প্রদায়ের মতে পঞ্চভূত ও মানসিক বৃত্তি সকল পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া নাম ও রূপের সৃষ্টি করিয়া থাকে, যাহার মধ্যে মন্দধীগণই কেবল একটি শাশ্বত সত্তার অস্তিত্ব অনুমান করিয়া থাকে। বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে স্কন্ধবাদিগণ "বিজ্ঞান"কেও স্কন্ধ রূপে স্বীকার করিয়াছেন। ইহা স্বীকার করিবার কারণ খুব সম্ভব এই যে তদ্ব্যতীত স্কন্ধবাদের সহিত সকল সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ মতবাদের ভিত্তিস্বরূপ সেই জন্মান্তরবাদের সামঞ্জস্য রক্ষা করা সম্ভব হয় না। ইহাই বৌদ্ধ দার্শনিকদের অমর কীর্ত্তি বিজ্ঞানবাদের সূচনা। বৌদ্ধ দর্শনের প্রথমাবস্থায় কিন্তু বিজ্ঞানও যে রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার প্রমুখ অপর স্কন্ধগুলির ন্যায় সত্ত্বের উৎপাদক একটি সমবায়ী কারণ রূপেই পরিগণিত হইত তৎসম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। সংযুক্তনিকায়ান্তর্গত বজিরার উপাখ্যান (১। ১৩৫) হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। মার আসিয়া বজিরাকে জিজ্ঞাসা করিল, কি হইতে জীবের উৎপত্তি, কিসেই বা জীব লয়প্রাপ্ত হয়, ইত্যাদি। বজিরা ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া উত্তর দিলেন যে জীব বলিয়া বস্তুতঃ কিছুই নাই ; যাহা আছে তাহা নানা স্কন্ধাবলির সংহতি মাত্র। উৎপত্তি হয় কেবল দুঃখের, এবং নিবৃত্তিও হয় সেই দুঃখেরই, কিন্তু সে দুঃখের পশ্চাতে বাস্তব কোন সত্তার অস্তিত্ব নাই। মিলিন্দ-পঞ্ঞহে এই স্কন্ধবাদ বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। রাজা মিলিন্দ রথে নাগসেনের নিকট উপস্থিত হইলে নাগসেন তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন যে রথ বলিয়া বাস্তবিক কোন বস্তু নাই, যাহাকে রথ বলা হয় তাহা বস্তুতঃ যুগচক্রাদি বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র বস্তুর সংহতি মাত্র। হীনযানী সাহিত্যে স্কন্ধবাদ বুঝাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ এই রথের উপমা দেওয়া হইয়াছে।

স্কন্ধবাদের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বৌদ্ধ দর্শনের অপর একটি মূলমন্ত্র ;—প্রতীত্যসমুৎপাদবাদ। স্কন্ধবাদীর নিকট সত্তা জ্যামিতির বিন্দুর মত, যাহার

অবস্থান আছে কিন্তু আয়তন নাই। এখন এই সত্তারূপ বিন্দুর অবস্থানই এই প্রতীত্যসমুৎপাদ দ্বারা সূক্ষ্মতররূপে ব্যাকৃত হইয়াছে, অর্থাৎ এতদ্দ্বারা বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে স্কন্ধাবলি কিরূপে পরস্পরের সহিত সংহিত হইয়া সত্ত্বের মোহ সৃষ্টি করিয়া থাকে। প্রতীত্যসমুৎপাদবাদ প্রথমে বৌদ্ধ দর্শনের একটি theory মাত্র ছিল, কিন্তু অতি প্রাচীন কালেই ইহা বৌদ্ধ ধর্ম্মেরও অঙ্গস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছিল। সেই জন্য দেখা যায় যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতীত্যসমুৎপাদবাদের পরিবর্ত্তন হইয়া চলিয়াছে। 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' কথাটির আক্ষরিক অর্থ হইল 'কারণাবলীর সহযোগে উৎপত্তি,' ইংরাজিতে ইহা সাধারণতঃ 'dependent origination' বলিয়া অনুবাদ করা হইয়া থাকে। হীনযানের মধ্যে দার্শনিক চিন্তা মনোবিশ্লেষ করিয়াই প্রায় ক্ষান্ত হইয়াছিল, সুতরাং পালিপিটকের "পটিচ্চসমুপ্পাদ" বাস্তবিকই একটি "chain of causation" ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভারতীয় দর্শনে দুঃখবাদ সুপরিচিত। বেদান্তাদি দর্শনে অজ্ঞানই দুঃখের কারণরূপে কথিত হওয়ায় এই দুঃখবাদের সহিত সহজেই পরাবিদ্যার যোগ সাধিত হইয়াছে। পালিপিটকের বুদ্ধ কিন্তু অন্য পন্থায় দুঃখ বিচার করিতে গিয়া ঐ শাস্ত্রে উচ্চাঙ্গের দার্শনিক চিন্তার পথ চিরদিনের জন্য রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, যদিও তৎসত্ত্বেও পালিপিটকেই ক্রমশঃ পটিচ্চসমুপ্পাদের কারণপরম্পরার মধ্যে অজ্ঞানকেও অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছিল। পরাবিদ্যা পালিপিটকের বুদ্ধের নিকট অব্যাকৃত বস্তু, জিজ্ঞাসার বিষয়ই নহে,—দুঃখ হইতে মুক্তির পথ নির্দ্দেশ করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু জীবের দুঃখ মোচন করিতে হইলে সেই দুঃখের কারণ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া প্রয়োজন, এবং সেই কারণ দূরীভূত করিতে হইলে সেই কারণেরই বা কারণ কি, তাহাও জানিতে হইবে। পালিপিটকে দুঃখোৎপত্তির কারণপরম্পরারই নাম পটিচ্চসমুপ্পাদ। বুদ্ধাবিষ্কৃত যে চারিটি আর্য্যসত্যের উপর সমস্ত বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও দর্শন প্রতিষ্ঠিত তাহা এই :—দুঃখ আছে, দুঃখের কারণও আছে, দুঃখ নিবৃত্তিও সম্ভব, এবং সেই দুঃখ নিবৃত্তির উপায়ও আছে।

এই দুঃখের কারণ তৃষ্ণা; এই তৃষ্ণা দূর করিতে পারিলে দুঃখ আপনা হইতেই দূরীভূত হইবে। বোধি লাভের পর বুদ্ধদেব ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তনসূত্র দ্বারাই তাঁহার

তপোলব্ধ নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন; তন্মধ্যে দুঃখোদ্ভবের কারণপরম্পরা ঐ "তৃষ্ণা"র অধিক আর অগ্রসর হয় নাই। ইহাই হইল 'পটিচ্চ-সমুপ্পাদে'র প্রথমাবস্থা। পালিপিটকের মধ্যেই পল্লবিত হইয়া ইহা পরে যে রূপ ধারণ করিয়াছিল তাহা কিন্তু এই :—অবিদ্যা হইতে জন্মে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ, নামরূপ হইতে ষড়ায়তন (six organs of sense), ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ (contact), স্পর্শ হইতে বেদনা (sensation), বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান (attachment), উপাদান হইতে ভব (continued existence), ভব হইতে জন্ম, এবং জন্ম হইতে জরা-মৃত্যু-দুঃখ-শোকাদি।

পালিপিটকান্তর্গত পটিচ্চসমুপ্পাদের ইহাই পরিণত রূপ, এবং মহাযান সাহিত্যেও ইহা গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাও প্রকৃতপক্ষে মনস্তত্ত্ববিষয়ক কতকগুলি পরস্পরসংশ্লিষ্ট বচনের সমষ্টি মাত্র—metaphysics হইতে ইহা এখনও বহুদূরে। একই theoryর সাহায্যে যেখানে বিশ্ব ও আত্মা উভয়েরই পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা সম্ভব কেবল তাহাই প্রকৃতপক্ষে metaphysics বা পরাবিদ্যা নামের অধিকারী, অপর যাহা কিছু তাহার সমস্তই psychology বা অপর কোন-logyর বিষয়ীভূত। কিন্তু পালিপিটকের পটিচ্চসমুপ্পাদের মধ্যে সে চেষ্টা বিন্দুমাত্রও নাই, আছে কেবল সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষ। মানুষের দার্শনিক জিজ্ঞাসা কিন্তু ইহাতেই পরিতৃপ্ত থাকিতে পারে না। মনোবিশ্লেষ যতই সূক্ষ্ম হউক না কেন, তাহা যুক্তিসহ হওয়া চাই, এবং যুক্তির সহিত যদি দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় তবে মনোবিশ্লেষই পরাস্ত হইবে। কারণ যুক্তির বিচারক্ষেত্র দীর্ঘতর। যুক্তি (logic) সমস্ত মানব মনের সাধারণ ধর্ম্ম, কিন্তু psychology বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মানসিক বিশ্লেষণ মাত্র। psychology যে সার্ব্বজনীন হইতে পারে না তাহা অবশ্যই ঠিক নহে, এবং logicও ব্যক্তিনিষ্ঠ হইতে পারে না এ কথাও সমভাবে মিথ্যা। কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে psychologyর উদ্দেশ্য সাধারণের মধ্যে ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা করা, এবং logicএর উদ্দেশ্য ব্যক্তির মধ্যেও সাধারণত্বের নিদর্শন স্থাপন; এতদ্দ্বয়ের সংঘর্ষস্থলে যে logicই জয়যুক্ত হইবে তাহা স্বতঃসিদ্ধ। এখন প্রতীত্যসমুৎপাদবাদকে psychologyর গণ্ডী হইতে মুক্ত করিয়া তাহা logicএর পথে পরিচালিত করাই হইল মহাযানী

বৌদ্ধ দার্শনিকদের সুমহান্ কীর্ত্তি। যে প্রতীত্যসমুৎপাদ সম্বন্ধে কমলশীল বলিয়াছেন যে ইহা ভগবান্ বুদ্ধের প্রবচনরত্ন, তাহা যে পালিপিটকের—"পটিচ্চ-সমুপ্পাদ" নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। মধ্যমকবাদ, শূন্যবাদ, বিজ্ঞানবাদ—সমস্তরই মূলে প্রতীত্যসমুৎপাদের এক অভিনব ব্যাখ্যা। Vallée-Poussin অনুমান করেন যে সৌত্রান্তিকগণই এই নূতন পথের প্রবর্ত্তক। সৌত্রান্তিকগণ হীনযানী হইলেও তাঁহাদের শাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় রচিত, সুতরাং ভাষার দিক হইতেও তাঁহারা হীনযানের সহিত মহাযানের সংযোগের সেতু-স্বরূপ।

বৌদ্ধ ধর্ম্মকে যদি হিন্দুধর্ম্ম হইতে পৃথক একটি ধর্ম্ম মনে করা সম্ভব হয় তবে মহাযানকেও হীনযান হইতে স্বতন্ত্র একটি ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক নাগার্জ্জুন বুদ্ধদেবেরই অবতাররূপে পরিচিত। নাগার্জ্জুন যে বুদ্ধবচন নূতন ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে; যে সকল ভাব ও চিন্তা নাগার্জ্জুনের নামের সহিত বিজড়িত সেগুলি এতই স্বতন্ত্র যে তাহাদের কোন মতেই আদি বুদ্ধবচন হইতে প্রতিপন্ন করা যায় না। নাগার্জ্জুনকে সেই জন্য বলিতে হইয়াছিল যে তাঁহার প্রচারিত মতই প্রকৃত বুদ্ধমত হইলেও বুদ্ধদেব স্বয়ং তাহা প্রচার করিয়া যান নাই, কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন যে ঐ প্রকৃত বুদ্ধমতের গূঢ় তত্ত্ব জনসাধারণ বুঝিতে পারিবে না, এবং সেই জন্যই তিনি দুর্ব্বোধ্য মহাযান ধর্ম্ম সরল হীনযানে পরিবর্ত্তিত করিয়া তাহাই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এ কথার প্রকৃত অর্থ যে কি তাহা সহজেই অনুমেয়। নাগার্জ্জুনের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের বৌদ্ধমত সর্ব্বাস্তিবাদ নামে পরিচিত, কারণ তাহার মধ্যে সাধারণ ভাবে বস্তুর পৃথক্ সত্তা স্বীকার করা হইয়াছে। নাগার্জ্জুন কিন্তু তাহাই অস্বীকার করিয়া অতি সূক্ষ্ম শূন্যবাদ প্রচার করিয়া বৌদ্ধ দর্শনের দ্বিতীয় যুগের পত্তন করিলেন। আরও কয়েক শতাব্দী পরে অসঙ্গ ও বসুবন্ধু নাগার্জ্জুনেরই চিন্তাধারা যতদূর সম্ভব প্রসারিত করিয়া যোগাচার বা বিজ্ঞান-বাদের প্রতিষ্ঠা করেন। বৌদ্ধ দর্শনের এই তিন যুগ হিন্দু দার্শনিকগণও সর্ব্বত্র স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা এতত্ত্রয়ের কোন একটি বিশেষ মতকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বা অর্ব্বাচীন বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের মতে এই তিন সম্প্রদায়েরই বৌদ্ধ দর্শন যেন চিরকালই প্রচলিত ছিল,—ইহা যে সত্য নয় তাহাই বা কে বলিবে। সম্প্রদায়ভেদের মূল কারণ শিষ্যবর্গের

ধী-শক্তির তারতম্য। ভামতীকার বাচস্পতি মিশ্র এ কথা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন ঃ—হীনমধ্যোৎকৃষ্টধিয়ো হি শিষ্যা ভবন্তি। তত্র যে হীন-মতয়স্তে সর্বাস্তিবাদেন তদাশয়ানুরোধাৎ শূন্যতায়াম্ অবতর্য্যন্তে। যে তু মধ্যমাস্তে জ্ঞানমাত্রাস্তিত্বেন শূন্যতায়াম্ অবতর্য্যন্তে। যে তু প্রকৃষ্টমতয়স্তেভ্যঃ সাক্ষাদেব শূন্যতাতত্ত্বম্ প্রতিপাদ্যতে (Bibl. Ind. ed., Benares 1880, p. 413)। এখানে অবশ্য শূন্যবাদকেই বৌদ্ধদিগের চরম লক্ষ্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।

এইবার আলোচনা করা যাউক, মহাযানী বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব এই শূন্যবাদ কি, এবং পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের বৌদ্ধ মতবাদের সহিতই বা ইহার কি সম্বন্ধ।

মহাযানী দর্শনের শূন্য কথাটি সাধারণতঃ void বলিয়া অনুবাদ করা হইয়া থাকে, কিন্তু আমার মনে হয় ইহা ঠিক নহে। বৌদ্ধ শাস্ত্রে শূন্যবাদ সম্বন্ধে যে অনন্ত আলোচনা আছে তাহা হইতে কিছুতেই মনে হয় না যে সর্ব্বসত্ত্বের অভাবের নামই শূন্য। শূন্য কথাটির প্রকৃত অর্থ গুণশূন্য। বেদান্তে যাহাকে নির্গুণ বলা হইয়াছে মহাযানী দর্শনে তাহারই নাম শূন্য, ব্রহ্ম ও শূন্য একই বস্তু,—উভয়েরই অর্থ Ding an sich বা স্বলক্ষণ বস্তু। কোন বস্তুরই স্বরূপ উপলব্ধি করা যে মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে একথা Hume-এর অন্ততঃ দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় দার্শনিকগণ সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া-ছিলেন। মানুষ যাহা অনুভব করিতে পারে, জানিতে পারে এবং বুঝিতে পারে বলিয়া মনেও করিতে পারে তাহা সর্ব্বত্রই সেই অনুভূয়মান বস্তুটির এক বা একাধিক গুণ মাত্র, আসল বস্তুটির নিকটে পৌঁছাইবার সাধ্যই মানুষের নাই। এমন কি আমি যে টেবিলের উপর কাগজ রাখিয়া এখন এই প্রবন্ধ লিখিতেছি, সেই টেবিলটিও যে আসলে কি তাহা বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। কারণ এই টেবিলটি একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে একটি বিশেষ স্থানে আমার নিকট কিরূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল সেইটুকু কেবল আমার জানা আছে, কিন্তু তাহা হইতে কোন ক্রমেই বলিবার উপায় নাই আসলে টেবিলটি কিরূপ! আর স্থান ও কালের কথা ছাড়িয়া দিলেও যে টেবিলটির স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব হইবে তাহাও নহে, কারণ সেই

টেবিল পূর্ব্বালোচিত মিলিন্দরাজের রথেরই সহিত সমপর্য্যায়ভুক্ত; ঋষি নাগসেন অনায়াসেই তাহার অসত্ব প্রমাণ করিয়া দিবেন। Protagoras প্রমুখ গ্রীক্ দার্শনিকগণও যে অনুরূপ যুক্তি দর্শাইয়া অতি প্রাচীন কালেই বস্তুর সত্ত্বোপলব্ধি সম্বন্ধে অনুরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিলেন তাহা সুবিদিত। কিন্তু Protagoras ছিলেন Sophist, অর্থাৎ জ্ঞানের সেবক হইয়াও সত্যে আস্থাহীন; সুতরাং এ সম্বন্ধে তাঁহার যে যুক্তি ও তর্ক তাহা ছল বা quibble ভিন্ন আর কিছুই নহে; তিনি তাঁহার জ্ঞানলব্ধ সত্যের সাহায্যে সেইজন্য কোন দর্শনশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টাও করিয়া যান নাই। Protagoras হইতে ভারতীয় দার্শনিকগণের পার্থক্য ছিল এই যে ইঁহারা তাঁহাদের আবিষ্কারকে বাস্তবিকই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, এবং এই জন্যই এই মূলতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া তাঁহারা সেই প্রাচীনযুগেই, যে সমস্ত আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন তাহা বিংশ শতাব্দীর দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণেরও বিস্ময়োৎপাদন করিয়া থাকে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে নাগার্জ্জুন মহাযান প্রবর্ত্তন করিয়া এক নূতন ধর্ম্মেরই পত্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু জগতে কোন বস্তুকেই প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ নূতন বলা যায় না, এবং শূন্যবাদমূলক মহাযান সম্বন্ধেও সেই কথা প্রযুজ্য। প্রকৃত প্রস্তাবে, যে চিন্তাপ্রণালী অবলম্বন করিয়া বৌদ্ধগণ স্কন্ধবাদে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন, দৃঢ়চিত্তে সেই পথে আরও অগ্রসর হইলে আপনা হইতেই শূন্যবাদে আসিয়া পড়িতে হইবে। স্কন্ধবাদীগণ যাহা costituent মাত্র মনে করিতেন তাহাকেই যদি attribute বলিয়া মনে করা যায় তাহা হইলেই স্কন্ধবাদ শূন্যবাদে পরিণত হয়। আমার বিশ্বাস এইরূপেই স্কন্ধবাদ হইতে শূন্যবাদ উদ্ভূত হইয়াছিল। একথা স্বীকার করিলে আর বলিতে হয় না যে বৌদ্ধ দর্শন হীনযান হইতে মণ্ডুকপ্লুতি দ্বারা মহাযানে উপনীত হইয়াছিল। যতদূর দেখিতেছি, আধুনিক লেখকগণের সকলেই কিন্তু এই প্রকার এক মণ্ডুকপ্লুতি যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন, এবং সেই জন্যই তাঁহাদিগকে আরও স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে যে মহাযান বাস্তবিকই একটি অভিনব দর্শনশাস্ত্র। মহাযান যে বাস্তবিকই একটি অভিনব চিন্তাধারাপ্রসূত তাহা অবশ্যই অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

কিন্তু তথাপি স্মরণ রাখিতে হইবে যে মানুষের ইতিহাসে বিপ্লব সর্ব্বত্রই প্রগতিরই একটি বিশিষ্ট রূপ; প্রগতিপথে যে কার্য্য সম্পন্ন হইতে দীর্ঘকাল লাগিয়া যায় বিপ্লবে তাহাই স্বল্পকাল মধ্যে সাধিত হয়। প্রগতিমূলক বিপ্লবকে সেইজন্য সর্ব্বত্র পুরাতনের সহিত যোগ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়, নতুবা প্রগতির নামে যাহা সাধিত হয় তাহা কেবল বৈরিতা ও অনাচার। এখন জড়বাদমূলক হীনযানের পর চৈতন্যমূলক মহাযানের অভ্যুদয় বাস্তবিকই চিন্তাজগতের এক বিরাট বিপ্লব, এবং সেই বিপ্লব যে বাস্তবিকই প্রগতিমূলক তাহা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। সুতরাং পূর্ব্ব যুগের চিন্তাধারার সহিত মহাযানী দর্শনের কোন প্রত্যক্ষ সংযোগ না থাকা বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার হইত। সুতরাং পূর্ব্বোক্তপন্থায় স্কন্ধবাদের সহিত শূন্যবাদের ঐতিহাসিক সম্বন্ধ স্বীকার করা সর্ব্বতোভাবে সমীচীন। ইহার মধ্যে কষ্ট-কল্পনাও কিছুই নাই; কেবল মাত্র ধরিয়া লইতে হইবে যে পূর্ব্বে যাহাকে constituent মনে করা হইত, পরে তাহাই attribute রূপে পরিগণিত হইল। এই সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তনের ফলেই যে ভারতীয় চিন্তাজগতে এই বিরাট বিপ্লব সাধিত হইয়াছিল তাহাতে বিন্দুমাত্রও বিস্মিত হইবার প্রয়োজন নাই। Leibniz, Kant ও Hegel-এর দর্শনেরও তুলনামূলক বিশ্লেষণ করিলে মৌলিক পার্থক্য যেটুকু পাওয়া যাইবে তাহা ইহা অপেক্ষা অধিক তো নহেই, বরং অনেক কম।

এই সম্পর্কে আর একটি বিষয় চিন্তনীয়। "গুণ" কথাটি সাধারণতঃ attribute অর্থে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা কি ঠিক্? সাংখ্যের ত্রৈগুণ্যের তাহা হইলে কি অর্থ হইবে? সাংখ্যমতে প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিনটি 'গুণ'। এখানে 'গুণ' কথাটির অর্থ attribute হইতেই পারে না, কারণ সাংখ্য দর্শনে substance ও attribute-এর মধ্যে কোন পার্থক্যই স্বীকার করা হয় না। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ যে প্রকৃতির constituents, attributes নহে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না, অথচ সর্ব্বত্রই প্রায় সাংখ্যের ত্রৈগুণ্য attributes বলিয়া পরিচিত। ভাষা ভাবকে ভ্রান্তিপথেও যে কতদূর প্রভাবান্বিত করিতে পারে ইহা তাহার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যাহাই হউক, ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে ভারতীয় দর্শনের

পরিভাষায় "গুণ" কথাটির অর্থ কেবল যে attribute তাহা নহে, অনেক স্থলে constituentও বটে। এখন একই শব্দের সাহায্যে যদি দুইটি পৃথক ভাব সংজ্ঞিত হয়, তবে কি একথা কল্পনা করা অন্যায় হইবে যে তন্মধ্যে একটি ভাব সহজেই অপরটিতে পরিবর্ত্তিত হইতে পারিয়াছিল? স্কন্ধবাদী ও শূন্যবাদী বৌদ্ধাচার্য্যের যে মতবৈরুদ্ধ্য তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে 'গুণ' কথাটির এই দুই বিভিন্ন ব্যাখ্যানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এক কথায় বলা যাইতে পারে যে স্কন্ধবাদীর নিকট যাহা ছিল constituent, শূন্যবাদীর নিকট তাহাই হইয়া পড়িল attribute।

শূন্যবাদী বৌদ্ধ ও ব্রহ্মবাদী বৈদান্তিকের দৃষ্টিভঙ্গীতে কোনই পার্থক্য নাই। একথা শান্তিদেবের বোধিচর্য্যাবতার হইতে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলেই বুঝা যাইবে। অহং কি তাহাই বুঝাইবার জন্য শান্তিদেব বলিতেছেন :—

দন্তকেশনখা নাহং নাস্থি নাপ্যস্মি শোণিতম্।
ন শিংঘানং ন চ শ্লেষ্মা ন পূয়ং লসিকাপি বা॥
নাহং বসা ন চ স্বেদো ন মেদোঽস্মাণি নাপ্যহং।
ন চাহমন্ত্রনির্গুণ্ডী গূথমূত্রমহং ন চ॥
নাহং মাংসং ন চ স্নায়ু নোষ্মা বায়ুরহং চ ন।
ন চ ছিদ্রাণ্যহং নাপি ষড়্‌বিজ্ঞানানি সর্বথা॥ (বোধিচর্য্যাবতার ৯।৫৮-৬০)।

অহং তবে কি? তদুত্তরেও শান্তিদেবের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট :—

যদ্দুঃখজননং বস্তু ত্রাসস্তস্মাৎ প্রজায়তাং।
শূন্যতা দুঃখশমনী ততঃ কিং জায়তে ভয়ং॥
যতস্ততো বাস্তু ভয়ং যদ্যহং নাম কিঞ্চন।
অহমেব ন কিঞ্চিচ্চেত্তভয়ং কস্য ভবিষ্যতি॥ (ঐ, ৯।৫৬-৫৭)।

অর্থাৎ "বস্তু দুঃখের কারণ বলিয়াই ত্রাসের বিষয়; কিন্তু শূন্যতা দুঃখ প্রশমন করিয়া থাকে, তাহাতে কোন ভয় নাই। অহং বলিয়া বাস্তবিক যদি কিছু থাকে তবেই ভয়। এখন অহং বলিয়া কিছু যদি নাইই থাকে তবে আর ভয়ের কারণ কি?" নির্ব্বাণও এই শূন্যোপলব্ধির উপর নির্ভর করিতেছে, কারণ, "বিনা শূন্যতয়া চিত্তং বদ্ধমুৎপদ্যতে পুনঃ।" (ঐ, ৯।৪৯)। অর্থাৎ "শূন্যতা ব্যতিরেকে চিত্ত বদ্ধ থাকিবে এবং তজ্জন্য পুনর্জ্জন্মও ঘটিবে"। এই

সমস্ত কি সম্পূর্ণই ব্রহ্মবাদী বৈদান্তিকের কথা নহে? এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে শূন্যবাদ যদি ব্রহ্মবাদই হয় তবে বৌদ্ধগণ সোজাসুজি ব্রহ্মন্ বা তদনুরূপ কোন শব্দ ব্যবহার না করিয়া সকল অনর্থের মূল এই 'শূন্য' শব্দ ব্যবহার করিলেন কেন? ইহারও উত্তর আছে। যাহা ব্রহ্মের ন্যায় বিভুত্বশালী ও সর্ব্বব্যাপী তাহা ব্রহ্মেরই মধ্যে সর্ব্বতোভাবে সীমাবদ্ধ জীবের নিকট এই হিসাবে অলীক যে তাহার বিশেষ সত্তা অনুভব বা কল্পনা করাও জীবের পক্ষে সম্ভব নহে। বৈশিষ্ট্যই হইল বস্তুর লক্ষণ। Mill বলিয়াছেন, a thing is known to be what it is only by contrast with what it is not। অর্থাৎ গরু বলিয়া যে এক প্রকার বিশেষ প্রাণীর অস্তিত্ব আমরা স্বীকার করিয়া থাকি তাহার কারণ এই যে অশ্ব, গর্দ্দভ প্রভৃতি অপরাপর প্রাণী হইতে গরুর পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, কোন বস্তু অনুভব বা অনুমান করা মানুষের পক্ষে তখনই সম্ভব যখন তদতিরিক্ত বহু বা অন্ততঃ একটি বিষয়ও মানুষের অনুভূতিগোচর হয়। কিন্তু ব্রহ্মের অতিরিক্ত তো আর জগতে কিছু নাই। সুতরাং গবাশ্বাদি যেরূপে মানুষের প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে সেইরূপে ব্রহ্মোপলব্ধি সম্ভব নহে। মৎস্য চিরজীবন জলের মধ্যে অবস্থান করিয়াও জল কাহাকে বলে তাহা চিনিতে পারে না, কিন্তু দৈবাৎ যদি সে কোন দিন ধীবরের জালে পড়িয়া জলের বাহিরে আকৃষ্ট হয় তবেই তাহা জলের অভাবের সঙ্গে সঙ্গে জলের অস্তিত্বও এক মুহূর্ত্তে উপলব্ধি করে। কোন ধীবরই কিন্তু কোন জীবকে কোন দিন ব্রহ্মবারিধি হইতে টানিয়া বাহির করিতে পারে নাই, সুতরাং জীবের নিকট ব্রহ্ম যে অসৎ রূপে প্রতীয়মান হইবে ইহাতে বিস্ময়কর কিছু নাই। জীবের পক্ষে তাই ব্রহ্মের শূন্যাভিধান সার্থক। শুধু যে সার্থক তাহাই নহে, বরং সার্থকতর; কারণ বৈদান্তিকগণকে কল্পনাচাতুর্য্যের সাহায্যে মায়াবাদ প্রভৃতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। মায়াবাদ স্বীকার করার অর্থ হেতুশাস্ত্রের গণ্ডী অতিক্রম করা, এবং তাহার অর্থ দর্শন শাস্ত্রের ধর্ম্মে (religion) পর্য্যবসন। দর্শনের দিক হইতেও যে অ-যৌক্তিক মায়াবাদ প্রভৃতির কোন সার্থকতা নাই তাহা নহে, কারণ সত্যোপলব্ধি যে জাগ্রত ও যৌক্তিক চিন্তার দ্বারাই সাধিত হইতে পারে, অন্য কোন উপায়ে নহে,—একথা মনে করাও একটি কুসংস্কার ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু বিপদ এই যে যুক্তির গণ্ডী

অতিক্রম করিলেই দেখা যায় যে মানুষ পথ চলার নিয়ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সেই জন্যই যুক্তিসহ জাগ্রতচিত্তবৃত্তির অতিরিক্ত আর সমস্তই সাধারণতঃ অগ্রাহ্য করা হইয়া থাকে, যদিও একথাও ঠিক যে তদ্দারা পূর্ণভাবে সত্যদর্শন কখনই সম্ভব নহে। কারণ জাগ্রতচিত্তবৃত্তি ব্যক্তিত্বের গণ্ডীতেই আবদ্ধ, এবং সত্য শাশ্বত ও অনন্ত;—এস্থলে জাগ্রতচিত্তবৃত্তি দ্বারা যে পূর্ণভাবে সত্যোপলব্ধি অসম্ভব তাহা সহজেই অনুমেয়, বিশেষ যদি Bergson-র সেই কথাটি স্মরণ রাখা যায় যে উপলব্ধির অর্থ comprehension নহে, coincidence। তবে ইহার উত্তরেও যুক্তিবাদী দার্শনিক বলিতে পারেন যে দার্শনিকের উদ্দেশ্য সত্যোপলব্ধি নহে, সত্যানুসন্ধান।

এই আলোচনা কথঞ্চিৎ অবান্তর হইয়া পড়িল। কিন্তু এতদ্দারা যদি বাস্তবিক প্রমাণিত হইয়া থাকে যে বৌদ্ধাচার্য্যগণের নিকট শূন্য-শব্দ কেবল সর্ব্বসত্ত্বের অভাবদ্যোতক ছিল না, তাহা হইলে এই অবান্তর আলোচনাও সার্থক জ্ঞান করিব। দেখিতেছি যে অধ্যাপক Stcherbatsky-ও শূন্য-শব্দটিকে ধর্ম্মশূন্যতা, স্বভাবশূন্যতা এইরূপ অর্থেই গ্রহণ করিয়াছেন (Buddhist Logic, Vol. I, p. 8, f.-n. 15)। স্কন্ধবাদিগণ বিশ্বাস করিতেন যে বিভিন্ন বাস্তব "স্কন্ধের" সঙ্গমের ফলেই নূতন সত্ত্বের উদ্ভব হয়; সুতরাং তাঁহাদের মতবাদকে pluralism বলা যাইতে পারে। কিন্তু মহাযানে এই "স্কন্ধ" constituent হইতে attributeএ পরিণত হওয়ার পূর্ব্বের pluralism পূর্ণ monismএ পরিণত হইল। এই দিক দিয়াই অদ্বৈতবেদান্তের সহিত বৌদ্ধ দর্শনের সংযোগ,—শঙ্করাচার্য্য যে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়া তিরস্কৃত হইয়াছিলেন, বাস্তবিকই তাহার কারণ আছে। অদ্বৈতবাদ যে কোন প্রকারেরই হউক না কেন, তাহার কেন্দ্রস্থল যদি শূন্য নামে অভিহিত হয়, তবে সেই শূন্য যে সর্ব্বসত্ত্বের অভাবব্যঞ্জক হইতে পারে না তাহা সুস্পষ্ট। প্রকৃতপক্ষে এই শূন্য যে বেদান্তের ব্রহ্মণের সহিত সমার্থক তাহা উপরে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু একটি বিষয়ে যে পার্থক্যও আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বেদান্তের ব্রহ্মন্ সর্ব্বভূতে আত্মরূপে প্রকাশিত, কিন্তু বৌদ্ধের শূন্যের প্রকাশরূপ কি? ইহার কোন সদুত্তর নাই। যদি কোন উত্তর দেওয়া যায় তবে তাহা এই যে শূন্যই শূন্যের প্রকাশরূপ। ফল দাঁড়াইল এই যে বেদান্তে যদি বা

বস্তুর ব্যাবহারিক সত্তা স্বীকার করা হয়, শূন্যবাদে তাহাও চলিবে না। সুতরাং শূন্যবাদীগণের মতে ব্যাবহারিক জগতেও সমস্তই সত্ত্বশূন্য ও ধর্ম্মশূন্য।

এখন সর্ব্বসত্ত্বের এই ধর্ম্মশূন্যতার প্রমাণ কি? তাহার প্রথম প্রমাণ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে যে, যে কোন বস্তুর পৃথক সত্তা যদি তদিতর অপর সমস্ত বস্তু হইতে সেই বস্তুটির পার্থক্যের উপরেই নির্ভর করে তাহা হইলেই স্বীকার করা হইল যে সেই বস্তুটির আপন সত্তা সম্বন্ধে বাস্তবিক কিছু বলিবার নাই। এই অর্থে শূন্যবাদ Relativity বা আপেক্ষিকবাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। অপর দিক হইতে স্কন্ধবাদেরও সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণ করিলে এই শূন্যবাদেই আসিয়া পৌঁছিতে হইবে। স্কন্ধবাদী বস্তুকে স্কন্ধে বিভক্ত করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, কিন্তু স্কন্ধেরও যে পুনরায় স্কন্ধবিভাগ করা যায় না তাহার প্রমাণ কি? কিন্তু স্কন্ধের স্কন্ধবিভাগ, পুনরায় সেই বিভাগেরও স্কন্ধবিভাগ,—এইরূপে অগ্রসর হইলে শেষ পরিণতি কোথায়? আধুনিক যুগে পদার্থবিদ্যায় (Physics) এই অনবস্থ স্কন্ধবিভাগ করিতে করিতে বৈজ্ঞানিকগণ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা এই যে matter বলিয়া কিছু নাই। বৌদ্ধাচার্য্যগণ শূন্যবাদ-দ্বারা ঠিক এই কথাটিই বলিতে চাহিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শূন্যবাদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের চিন্তাজগতে এক বিরাট বিপ্লব সাধিত হইলেও পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের স্কন্ধবাদের সহিত গূঢ় সংযোগ কোন ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হয় নাই। অপর দিকে আবার এই শূন্যতাই বিভুত্বার্থে গৃহীত হইয়া বেদান্তের ব্রহ্মবাদের সহিত যোগ স্থাপন করিয়াছিল।

এইবার দেখা যাউক স্কন্ধবাদীর প্রতীত্যসমুৎপাদ শূন্যবাদে আসিয়া কি আকার ধারণ করিল। কার্য্য ও কারণের মধ্যে সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করাই প্রতীত্যসমুৎপাদের উদ্দেশ্য; কিন্তু শূন্যবাদের নিকট কার্য্য ও কারণ দুইই অসত্ত্বরূপে পরিগণিত হওয়ায় তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধও হইয়া পড়িল অসৎ। শান্তিদেব এই কথাটি অতি সহজভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন :—

পিতা চেন্ন বিনা পুত্রাৎ কুতঃ পুত্রস্য সম্ভবঃ।
পুত্রাভাবে পিতা নাস্তি তথাসত্ত্বং তয়োর্দ্বয়োঃ॥*

* বোধিচর্য্যাবতার, ৯।১১৪।

অর্থাৎ, “পুত্র ব্যতিরেকে যদি পিতৃত্ব সিদ্ধ না হয় তবে পুত্রের উৎপত্তি কিরূপে সম্ভব ? (অথচ স্বীকার করিতে হইবে যে) পুত্র না থাকিলে পিতাও নাই। সুতরাং পিতা ও পুত্র দুয়েরই অসত্ত্ব (স্বীকার করিতে হইবে)।” পিতাপুত্রের দৃষ্টান্তের সাহায্যে শান্তিদেব যাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা এই যে কারণাবলী একটি বিশেষ অবস্থায় সংহত না হইলে যদি কার্য্যের উৎপত্তি না হয় তবে কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে সেগুলি কখনই কারণরূপে বিবেচিত হইতে পারে না। সৎ বা অসৎ কোন বস্তুরই কারণের উপর নির্ভর করার প্রয়োজন নাই। যদি সৎ, তবে তাহার তো আর কারণের প্রয়োজনই নাই ; আর কারণ যখন কার্য্যাপেক্ষী তখন অসতের যে কারণ থাকিতে পারে না তাহাও সুস্পষ্ট। কার্য্যকারণ সম্বন্ধ তাহা হইলে কোন দিক দিয়াই সমর্থন করা যায় না। কার্য্যকারণ সম্বন্ধের স্থলে আপেক্ষিক সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠাই শূন্যবাদের পরিণাম। সর্ব্বাস্তিবাদী সর্ব্ববিষয়েই বলিতে পারেন “তস্মাদেতদ্ভবতি,—ঐ কারণের জন্য এই কার্য্য ঘটিল।” কিন্তু আপেক্ষিকবাদী বৌদ্ধ দার্শনিককে বলিতে হইবে “তস্মিন্ সতি ইদং স্যাৎ”, অর্থাৎ “ঐটি ঘটিলে এইটি ঘটে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নাই।” ইহাই হইল প্রতীত্যসমুৎপাদের মহাযানী রূপ। পালিপিটকের পটিচ্চসমুপ্পাদের সহিত ইহার আর কোনই সাদৃশ্য নাই। পুদ্গলবাদ হইতে যে পদ্ধতিতে শূন্যবাদের উদ্ভব তাহারই সহিত সমান্তরাল পথ অবলম্বন করিয়া পালিপিটকের পটিচ্চসমুপ্পাদ এই পরিপূর্ণ আপেক্ষিকবাদে পরিণত হইয়াছে। ইহাই গেল বৌদ্ধ দর্শনের দ্বিতীয় যুগ।

ইহার পর আরম্ভ হইল অসঙ্গ ও বসুবন্ধুর প্রচারিত বিজ্ঞানবাদ। ইহার অপর নাম যোগাচার। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী ইহাদের জীবিত কাল। পঞ্চম শতাব্দী হইতে শান্তরক্ষিতের জীবিত কাল অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতের বৌদ্ধ জগতে বিজ্ঞানবাদের যুগ চলিয়াছে। ইহার পরেই বৌদ্ধ দর্শন নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। কারণ কোন ধর্ম্ম বা দর্শনই মুখ্যতঃ নেতিপন্থী হইয়া পড়িলে আর দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না। একটি গরু দেখিয়া যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে সেটি কি জীব তবে তাহাকে কিছুতেই এই উত্তর দিয়া সন্তুষ্ট করা যাইবে না যে তাহা ঘোড়া, গর্দ্দভ প্রভৃতি গবেতর কোন জন্তু নহে। গরু কি নহে তাহা জানিয়া কেহই সন্তুষ্ট হইবে না ; সকলেই জানিতে চাহিবে গরুটি

RABINDRA BHARATI UNIVERSITY
CENTRAL LIBRARY
J1845
RABINDRA BHARATI UNIVERSITY
L 41990

আসলে কি, যদিও সে প্রশ্নের সর্ব্বসম্মত একটি উত্তর দেওয়া দার্শনিকের পক্ষে অসম্ভব। ইহার কারণ এই যে মানুষ সর্ব্বক্ষণই তাহার শাণিত যুক্তি উদ্যত করিয়া বসিয়া নাই। যুক্তি প্রয়োগেও ক্লান্তি আসে, তখন মানুষ আর যুক্তির কথা না ভাবিয়া প্রাণ খুলিয়া বিশ্বাস করিতে চায়। এই জন্যই ঐ যুগে কুমারিলের প্রচারিত মীমাংসা দর্শন এত প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

শূন্যবাদ হইতে বিজ্ঞানবাদের অভ্যুদয় অতি স্বাভাবিক। শূন্যবাদী বাহ্য জগতের বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে তাহার মধ্যে বাস্তব সত্তা কিছু নাই। এ সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত না হইতে পারে, কিন্তু ইহার মূলে যে স্বতঃসিদ্ধ-রূপে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে বাহ্য প্রকাশরূপই বস্তুর প্রকৃত রূপ, তাহা নিশ্চয়ই ভ্রান্ত। একথা শূন্যবাদী স্পষ্ট করিয়া হয়তো বলেন নাই, কিন্তু প্রধানতঃ বাহ্যরূপের বিশ্লেষণদ্বারাই যিনি বস্তুর অসত্ত্ব অনুমান করার পক্ষপাতী তিনি যে বাহ্যরূপ (appearance) এবং প্রকৃত সত্তার (reality) মধ্যে বাস্তবিক কোন পার্থক্য স্বীকার করেন না তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। এইটি ছিল শূন্যবাদের দুর্ব্বলতা, এবং এই বিষয়েই বিজ্ঞানবাদীগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। রূপ (appearance) ও সত্তার (reality) পরস্পর সম্বন্ধ সকল দেশের সকল দার্শনিকেরই একটি প্রধান আলোচ্য বিষয় এবং এই বিষয়ে তত্ত্বানুসন্ধানই যে দর্শন শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য একথা বলাও অত্যুক্তি হইবে না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বহু দার্শনিক এ সম্বন্ধে বহু মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু বিজ্ঞানবাদের সহিত সেই সমস্ত মতের তুলনামূলক আলোচনা কেবল লোভনীয় নয়, প্রয়োজনীয় হইলেও, আমাদের এ ক্ষেত্রে তাহার অবকাশ নাই, যদিও পরে প্রসঙ্গক্রমে এইরূপ আলোচনাও করা হইবে।

গ্রাহ্য (object) ও গ্রাহকের (subject) সংঘর্ষের ফলেই বস্তু সম্বন্ধে অনুভূতি জন্মে। গ্রাহক ব্যতিরেকে গ্রাহ্য বস্তুর যে অস্তিত্ব নাই তাহা শূন্যবাদীই প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। এখন প্রশ্ন গ্রাহ্য বস্তুর অভাবে গ্রাহকের অস্তিত্ব সম্ভব কি না। বিজ্ঞানবাদী প্রকারান্তরে ইহারই উত্তরে বলিয়াছেন যে তাহা সম্ভব। ইহাই হইল বিজ্ঞানবাদের মূল কথা।

বিজ্ঞানবাদী বলেন যে বস্তু সম্বন্ধে অনুভূতি কেবল সেই অনুভূয়মান

বস্তুটির উপর নির্ভর করে না, অনুভাবকের উপরেও সমপরিমাণে নির্ভর করে। এখন, বস্তুর সত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা প্রযুজ্য, বস্তুর অসত্ত্ব সম্বন্ধেও তাহাই প্রয়োগ করিতে হইবে,—যে অসত্ত্ব শূন্যবাদীগণ প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু শূন্যতাই যদি হয় গ্রাহ্য (object) তবে তাহার গ্রাহক (subject) কে? এই শূন্যতার গ্রাহক হইল বিজ্ঞান (consciousness only)। এই বিজ্ঞান যে সর্ব্বসত্ত্বনিরপেক্ষ তাহা সুস্পষ্ট, কারণ ইহার গ্রাহ্য বিষয় শূন্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। এবং সর্ব্বসত্ত্বনিরপেক্ষ হওয়ায় এই বিজ্ঞানের বিশেষ কোন রূপও নাই, এমন কি গ্রাহ্যগ্রাহক ভেদও নাই। একথা কমলশীল স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন: যেষাং তু বিজ্ঞানবাদিনাং মতং সর্ব্বমেব জ্ঞানং গ্রাহ্যগ্রাহকবৈধুর্য্যাৎ স্বয়মেব প্রকাশতে, ন তু জ্ঞানান্তরেণ বেদ্যত ইতি (p. 83)। এই বিজ্ঞানের উপরেই মায়াময় বিশ্বপ্রপঞ্চ অধ্যস্ত হইয়া থাকে। এই বিজ্ঞানবাদ যে বেদান্তের ব্রহ্মবাদেরই নামান্তর সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। বেদান্তমতেও ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞেয়স্বরূপ নহে। পার্থক্য কেবল এই যে বৌদ্ধগণ কোন দিনই প্রত্যক্ষভাবে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। বৌদ্ধ দর্শন চিরদিন অনাত্মবাদ নামেই বিখ্যাত। বিজ্ঞানবাদের মধ্যে কিন্তু আত্মার অস্তিত্বও পরোক্ষভাবে স্বীকার করা হইয়াছিল। কারণ বিজ্ঞানবাদের প্রথম যুগেই (লঙ্কাবতার সূত্রে) আলয়বিজ্ঞানের উল্লেখ পাওয়া যায়: জন্মজন্মান্তর হইতে বিভিন্ন বিজ্ঞানস্রোত প্রবাহিত হইয়া এই আলয়বিজ্ঞানে সম্মিলিত হইতেছে, এবং তথা হইতে পুনরায় বিচ্ছুরিত হইয়া জীবের ক্রিয়া, বুদ্ধি প্রভৃতি প্রণোদিত করিতেছে। এই আলয়বিজ্ঞান (অর্থাৎ, বিজ্ঞানালয়) হইতে চৈতন্যস্বরূপ আত্মার পার্থক্য মারাত্মক নহে।

আলয়বিজ্ঞানে যে সমস্ত বিজ্ঞানস্রোত আসিয়া সম্মিলিত হইতেছে তাহারা কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন গতিতে প্রবাহিত হইতেছে না। বিজ্ঞানস্রোত না বলিয়া আসলে বলা উচিত বিজ্ঞানক্ষণপরম্পরা। কারণ প্রত্যেক বিজ্ঞানস্রোত একটি পরিকল্পিত বিষয় হইতে প্রবাহিত, এবং সেই পরিকল্পিত বিষয়ও আবার কতকগুলি পরম্পরাগত বিজ্ঞানক্ষণের কল্পনা। পরিকল্পিত বস্তু ও তাহার বিজ্ঞান,—দুইই ক্ষণিক। বস্তু যে সর্ব্বত্রই পরিকল্পিত তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কিন্তু তাহারই বা অভিব্যক্তি হয় কিরূপে? পরিকল্পিত

বস্তুরও স্বভাব চলত্ব বা নিয়তপরিবর্ত্তনশীলতা। কোন বস্তুই অবিচলিত থাকিতে পারে না, অথচ পরিবর্ত্তন স্বীকার করিলে পূর্ব্ব মুহূর্ত্তের বস্তুকে আর পর মুহূর্ত্তে সেই বস্তু বলা চলিবে না। "The understanding of change involves the attribution of contradictory predicates to the same subject" (Paton, Kant's Metaphysic of Experience, vol. 1, p. 127) এই উভয় সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য বৌদ্ধ দার্শনিকগণ ক্ষণিকবাদের আশ্রয় লইয়াছেন। তাঁহারা বলেন না যে একই অবিচলিত বস্তুর নিরবচ্ছিন্ন বিজ্ঞানস্রোত আলয়বিজ্ঞানে পুঞ্জীভূত হইতেছে। তাঁহাদের মতে প্রত্যেক পরিকল্পিত বস্তু প্রতি মুহূর্ত্তে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া পর মুহূর্ত্তে পুনরায় উদ্ভূত হইতেছে। দীপশ্রেণীর এক একটি পর পর প্রজ্জ্বলিত ও তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাপিত হইলে যেমন মনে হইতে পারে যে একই দীপশিখা এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিতেছে, প্রতি বস্তুর জীবনেও নিরন্তর তাহাই ঘটিতেছে। এইরূপ কষ্টকল্পনা অসার্থক নহে, কারণ এতদ্দ্বারা বস্তুর চলত্ব ও আপাতদৃষ্টিতে অনন্যত্ব এই দুই বিরুদ্ধ প্রশ্নই প্রশান্ত হইল। অপর দিক হইতে বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে, সেই সুপ্রাচীন প্রতীত্যসমুৎপাদবাদ বিজ্ঞানবাদিদের হস্তে এই অতি জটিলাকার ধারণ করিয়াছিল। অতি স্থূল পুদ্গলবাদ হইতে ক্রমে ক্রমে এই অতি সূক্ষ্ম ক্ষণিকবাদের উদ্ভব বাস্তবিকই বিস্ময়ের বিষয়।

ইহাই হইল সংক্ষেপে বিজ্ঞানবাদের উদ্ভবের ইতিহাস। বেদান্ত যদি মায়াবাদ হয় তবে বলিতে হইবে যে বিজ্ঞানবাদ ত্রিবর্গ মায়াবাদ। কারণ ইহাতে গ্রাহ্যও কল্পনা, গ্রাহকও কল্পনা, এবং গ্রাহ্যগ্রাহক সম্বন্ধও কল্পনা। তবে বিজ্ঞানবাদের গৌরবের বিষয় এই যে ইহাতে যুক্তি পরাস্ত হইয়া কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করে নাই, আপন পথে অসঙ্কোচে অগ্রসর হইতে হইতেই মায়াবাদে আসিয়া পড়িয়াছিল। বিজ্ঞানবাদের বিরুদ্ধে কিন্তু এখনও একটি কথা বলা যাইতে পারে:—সবই যদি বিজ্ঞানময় তবে আর মায়ার অবকাশ কোথায়? ইহার উত্তর এই:—

উক্তং চ লোকনাথেন চিত্তং চিত্তং ন পশ্যতি।
ন ছিনত্তি যথাত্মানমসিধারা তথা মনঃ॥ (বোধিচ ৯।১৭-১৮)

অর্থাৎ বুদ্ধদেব বলিয়াছেন যে চিত্ত (=বিজ্ঞান) সমস্তই সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারে,—কেবল আপনাকে ছাড়া, খড়্গাধারা যেমন অপর সকল বস্তুই ছেদন করিতে পারে, কিন্তু আপনাকে পারে না। প্রজ্ঞাকরমতি "পঞ্জিকায়" এই সম্পর্কে আরও বলিয়াছেন যে "অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া সমস্তই স্পর্শ করা যায় কিন্তু আপনাকে স্পর্শ করা তাহার সাধ্যাতীত।" সুতরাং সর্ব্বচৈতন্যময় হওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞানে মায়ার অবকাশ রহিয়াছে। চৈতন্য দ্বারা বিশ্বজগৎ উদ্ভাসিত, কিন্তু তথাপি চৈতন্য আপনার স্বরূপ প্রকাশ করে না, দীপ যেমন অন্ধকারাবৃত স্থানে চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়া দিয়াও নিজে অজ্ঞেয়ই থাকিয়া যায়। নিজেকে প্রকাশ করার কোন প্রয়োজন দীপের নাই, কারণ দীপ তো আর তমসাবৃত নহে।—

আত্মভাবং যথা দীপঃ সংপ্রকাশয়তীতি চেৎ।
নৈব প্রকাশ্যতে দীপো যস্মান্ন তমসাবৃতঃ॥ (বোধিচ, ৯।১৮-১৯)

শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ

সোমলতা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(১৫)

রসময় আর তারাপদ যখন গিয়ে পৌঁছুল তখন বেলা তিনটে বেজে গেছে। তারাপদ অবশ্য বিনোদিনীদের বাড়ী থেকে খেয়ে বেরিয়েছিল। কিন্তু রসময়ের বলতে গেলে কিছুই জোটেনি।

ওর শুকনো মুখের দিকে চেয়ে তারাপদ বললে, এর চেয়ে খেয়ে দেয়ে হাঁটা পথে এলেই হ'ত।

ক্লান্তভাবে রসময় বললে, আমি একলা হ'লে আসতাম বাবু মশায়। আপনার জন্যে ট্রেনে আসা।

তারাপদ অস্বীকার করতে পারলে না। ষ্টেশন থেকে তাদের গ্রামও অনেকটা হাঁটতে হয়। ট্রেনে এলে কেবল মধ্যের ক্রোশ পাঁচেক পথ হাঁটা বাঁচে।

হেসে বললে, যা বলেছেন! রেলে পায়ের কাজ একেবারেই সেরে দিয়েছে। হাঁটবার নাম শুনলেই পায়ে যেন বাতে ধরে।

গ্রামের সীমানায় এসেই তারাপদ কিন্তু অন্য পথ ধরলে। বললে, দু'জনে এক সঙ্গে যাওয়া হবে না। ভাববে যেন ষড়যন্ত্র ক'রে এসেছি। চেনেন তো হারাণদা'র বাড়ী ?

—বিলক্ষণ।

—সোজা চ'লে গেলেই খেয়া ঘাট পাবেন। ময়ূরাক্ষীতে জল নেই। হেঁটেই পার হ'তে পারবেন।

রসময় বললে, তারপরে সোজা গিয়েই তো সেই তেঁতুলতলা।

—হ্যাঁ। আমি এই বাঁয়ের রাস্তাটা ধ'রে কোমর পাড়া দিয়ে যাব। সন্ধ্যের সময় থাকবেন, আমি হারাণদার ওখানে যাব।

—তাই হবে।

রসময় একলা হাঁটতে লাগল।

ময়ুরাক্ষীতে জল নেই। এদিকে বিস্তীর্ণ শুষ্ক বালুচর ধূ ধূ করছে। ওদিকে হাত তিনেক পরিমিত স্থানে শীর্ণ জলরেখা মন্থর গতিতে বইছে। মাত্র একটি জায়গায় কোমর পর্য্যন্ত ডোবে। বাকি কোথাও তাও ডোবে না। এদিক দিয়ে রসময় কোনো দিন আসেনি। অপরিচিত স্থানে চারিদিকে চাইতে চাইতে সে আসছিল।

ঘাট এক রকম জনশূন্য বললেই হয়। কেবল কয়েকটি দুরন্ত বালক পিতামাতার সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে এই অগভীর জলে ঝাঁপাঝাঁপি ক'রে সাঁতার শিখছিল। রসময়ের আবক্ষ পরিমিত ধূলায় ধূসর দাড়ি এবং মাথার চূড়া দেখে তারা ভয় পেয়ে জল ছেড়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করলে। আরও অনেক জায়গায় ছেলেরা এমনি ক'রে তাকে দেখে ভয় পেয়েছে। রসময় বুঝলে। বুঝে আপন মনেই হাসলে।

বালুর উপর সে ঝুলি রাখলে। মাথায়-বাঁধা গামছাটা খুলে ফেললে। জলে নেমে মুখ-হাত-পা বেশ ক'রে ধুয়ে ফেললে। ঠাণ্ডা জলের স্পর্শে শরীরটা ঠাণ্ডা হ'ল। একটু বিশ্রাম করারও ইচ্ছা ছিল। কিন্তু হারাণের বাড়ীর এত কাছে এসে এখানে বিশ্রাম নিষ্প্রয়োজন। রসময় সোজা চলতে লাগল।

তেঁতুলতলার কাছে এসে তখন তার সমস্ত চেনা বোধ হ'তে লাগল। এই তেঁতুলগাছটিকে তার কেমন আশ্চর্য্য বোধ হয়, ভারি ভালো লাগে। এত বড় ঝোপওয়ালা তেঁতুলগাছ ইতিপূর্ব্বে তার চোখে কখনও পড়েনি। এর সঙ্গে কেমন একটা রহস্য জড়িয়ে আছে।

পশ্চিম দিগন্তে পাৎলা একখণ্ড মেঘ সূর্য্যকে আচ্ছন্ন ক'রেছে। তারই পটভূমিকায় এই গাছটি যেন তার কচি পাতার পেখম তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আপন মনে রসময় বললে, বাঃ!

চারিদিকে যতদূর দৃষ্টি চলে শূন্য মাঠ ঝাঁ ঝাঁ করছে। রাখাল বালকেরা গরুগুলিকে ফিরিয়ে আনছে। তাদের শিশুকণ্ঠের গানের টুকরো অংশ হাওয়ায় অলসভাবে ভাসতে ভাসতে আসছে। মেঘ কেটে গিয়ে আবার রোদ উঠল। রসময় চারিদিকে চেয়ে দেখলে, এত বড় মাঠে ছায়া বলতে এতটুকু স্থান

নেই। যা আছে দূরে ওই আমবাগানে আর এই তেঁতুলতলায়। এই ছায়ার নীচে দাঁড়াতে তার চোখ জুড়িয়ে গেল।

একটুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে রসময় আবার হাঁটতে আরম্ভ করলে হারাণের বাড়ীর দিকে। বিনোদিনীর সম্বন্ধে কি যে করা যায় তার কিছুই স্থির করতে পারেনি। এখন একবার ভাবতে চেষ্টা করলে। কিন্তু কিছুই ভাবতে পারলে না।

বাইরে থেকেই রসময় শুনলে হারাণের বাড়ীতে যেন একটা সোর-গোল চলছে। একটু দ্বিধা ক'রে সে আস্তে আস্তে ভিতরে গেল।

সোর-গোলই বটে। আট-দশ জন লোক হারাণের বড় ঘরের দাওয়ায় কেউ দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে, কেউ খুঁটিতে ঠেস দিয়ে, কেউ বা ভব্যযুক্ত বাবু হয়ে ব'সে আছে। এদের কয়েকজনের মুখ রসময়ের পরিচিত। তারা এই গ্রামেরই মাতব্বর ব্যক্তি। বাকি কয়জন অপরিচিত, অন্ততঃ পরিচিত ব'লে মনে হ'ল না।

হারাণ নিরীহ বালকের মতো এক কোণে সসম্ভ্রমে ব'সে ছিল। রসময়কে দেখেই লাফিয়ে উঠল। একেবারে ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বললে, আরে বাবাজি যে! এস, এস।

ভারি মোটা গলায় অভ্যাগতদের একজন জিজ্ঞাসা করলে, বাবাজির আখড়া কোথায়?

—আজ্ঞে সাতগাঁ-কাঞ্চনপুর।

—সে তো অনেক দূর।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, একটু দূর আছে।

—বেশ, বেশ। গান-টান জান? একটা বেশ ভালো দেখে গান শুনিয়ে দাও দেখি।

হারাণ ওকে টানতে টানতে উপরে নিয়ে এল। বললে, গান জানে? বিলক্ষণ! এ অঞ্চলে ওর মতো গাইয়ে আর নেই।

ওর ঝোলা ঝুলি ঘরের মধ্যে রেখে দিয়ে এসে বললে, গানের ভাবনা কি! সারারাত যত পারেন গান শুনবেন। ওর তো ওই কাজ। না কি বল?

হারাণ হো হো ক'রে হেসে উঠল।

বললে, এই পাখাটা নাও। একটু বিশ্রাম ক'রে চান সেরে এস। ঘরে সরু ধানের চিড়ে আছে, ক্ষীরও আছে। আমাদের হাতের রান্না তো চলবে না, নইলে দিব্যি মাছের টক দিয়ে······

রসময় হেসে বললে, তার জন্যে ভাবনা কি? সন্ধ্যেবেলায় আবার মাছ ধরাও। রাত্রে সেবা করা যাবে। কিন্তু চান তোমরা কোথায় কর? নদীতে তো জল নেই।

—নদী পর্য্যন্ত গিয়ে কাজ কি? ওই তেঁতুলতলার কাছেই তোফা ন'পুকুর। চল তোমাকে দেখিয়ে দিয়ে আসি।

রসময়ও তাই চায়। এত লোক দেখে ও ভড়কে গেছে। এরা যে এখন যাবে তাও মনে হ'ল না। বরং রাত্রে গান শোনবারই আভাস দিলে। একটু নিরিবিলি হারাণকে না পেলে সুবিধা হবে না।

বললে, তাই চল, ঘাটটা দেখিয়ে দিয়ে আসবে।

—তাহ'লে চট ক'রে তোমার চিড়েটা ভিজতে দিই দাঁড়াও। অনেক দিন পরে দেখা হে! তোমাকে পেয়ে কি আনন্দ যে হচ্ছে!

হারাণ চিড়া ভিজতে দিতে গেল। রসময় তেল মাখতে বসল। একটু পরেই হারাণ এসে বললে, চল।

বাইরে বেরিয়ে এসেই রসময়ের ঘাড়ে একটা প্রচণ্ড চাপড় মেরে হারাণ উল্লসিত হয়ে বললে, সব তো ঠিক হয়ে গেল।

—কি ঠিক হয়ে গেল?

হো হো ক'রে হেসে হারাণ বললে, তুমি বাবাজি তো বাবাজিই। বুঝতে পারলে না, কি ঠিক হ'ল?

তার বলিষ্ঠ হাতের প্রচণ্ড আঘাতে রসময়ের ঘাড় টনটন করছিল। চোখে অন্ধকার দেখছিল। কিন্তু রসিকতার উপর বলবার তো কিছু নেই। রসময়ের তখন কাঁদবার মতো অবস্থা।

কোনোক্রমে বললে, বিয়ের?

—হ্যাঁ হে!

হারাণ সমস্ত পথ অনর্গল ব'কে যেতে লাগল:

মেয়ে সে নিজের চোখে দেখে এসেছে। দিব্যি মেয়ে, খাসা মেয়ে। এদিকেও বেশ ডাগর-ডোগর। তা বয়স এগারো-বারোর কম তো নয়ই। আর বেশ চালাক-চতুরই মনে হ'ল। তাকে দেখেই এমন একটা ছুট দিলে!

হারাণ মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে হাসতে লাগল। সে হাসি আর থামে না।

বললে, শ্বশুরমশায়ের মামলাবাজ ব'লে বদনাম আছে। তা মামলাবাজ কি লোকে সাধ ক'রে হয় ভাই, ক্রমাগত খোঁচা দিলে যার বুদ্ধি আছে সেই মামলা করে। তোমার-আমার মতো লোকই চুপ ক'রে সয়ে যায়। কি বল? এখন এমন হয়েছে যে, গাঁয়ের লোক ওঁকে দেখলে বাঘের মতো ডরায়। হুঁ হুঁ বাবা! তোর পায়ে পড়ি না, তোর কাজের পায়ে পড়ি!

রসময় অন্যমনস্ক ভাবে নিঃশব্দে পথ হাঁটছিল।

তাকে একটা কনুয়ের ঠেলা দিয়ে হারাণ বললে, আমাকে তো ব'লেই দিয়েছেন, বিয়েটা একবার হয়ে যাক, তারপর আল নিয়ে গেলবার যে ঝগড়া হয়েছিল, তার বিহিত কি ক'রে করতে হয় তা তিনি দেখিয়ে দেবেন। এইবার কি হয়!

হারাণ অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে আকাশে মুষ্টি উত্তোলন করলে।

বললে, আশ্চর্য্য মানুষ ভাই! ওইটুকু তো মানুষ, আর ওইটুকু তো মাথা। বয়েসে আমাদের চেয়ে দু'এক বছরের ছোট হবেন তো বড় হবেন না। তারই মধ্যে যেন ভেল্‌কি খেলছে। তুমি কি বল?

বয়ঃকনিষ্ঠ ভাবী শ্বশুরের প্রতি এতখানি শ্রদ্ধা উদগত হতে দেখে রসময়ের হাসি আসছিল। বহু কষ্টে হাস্য দমন করে বললে, ও সব লগ্ন হে, লগ্ন।

রসময় তখন জলে নেমে স্নান করছে। উৎসাহের আধিক্যে হারাণ যতদূর সম্ভব কাপড় তুলে যাওয়া যায়, হুড়-মুড় ক'রে জলেই নেমে পড়ল।

বললে, যা বলেছ! লগ্নই বটে হে। ও সব চন্দ্র লগ্নে জন্ম। কই তোমার-আমার মাথা অমন খেলে না কেন? আমাদেরও তো বয়েস যা হোক কিছু হয়েছে, মানে নিতান্ত ছেলেমানুষ তো আর নই। কি বল?

সভয়ে ওর দিকে চেয়ে রসময় বললে, তা তো বটেই।

দুই হাতে তালি বাজিয়ে হারাণ বললে, তবেই বোঝ। আসল কথা বুদ্ধি থাকা চাই। মাথা তো নয় যেন তলোয়ার খেলছে। বলিহারি মাথা!

ব'লে সেই তলোয়ারের মতো মাথার উদ্দেশে সসম্ভ্রমে নমস্কার জানালে।

রসময়ের স্নান হয়ে গিয়েছিল। বললে, চল।

—হ্যাঁ, চল।

ব'লেই হঠাৎ ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে হারাণ বললে, একবার ভালোয়-ভালোয় বিয়েটা হ'তে দাও না, তারপর সব বেটাকে একধার করব। যাদের জন্যে বড়বৌ আত্মহত্যে ক'রেছে, তাদের চাল কেটে গাঁ থেকে তাড়াব তবে আমার নাম হারাণ মণ্ডল।

রসময় সভয়ে চেয়ে দেখলে, হারাণের রক্তবর্ণ চোখে ভাঁটার মতো তারা দুটো ঘুরছে।

বিবাহের কথাবার্ত্তা পাকাপাকি হয়ে গেছে। কাল সকালে আশীর্ব্বাদ এবং দিনস্থির হবে। ভাবী বধূর নামে হারাণ যে কয় বিঘা জমি দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছে, তারও দলিল কালকেই লেখাপড়া হবে। বিবাহের পরে একদিন রেজেষ্ট্রী করিয়ে আনলেই চলবে।

রসময় অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত অভ্যাগতদের গান শোনালে। তারা গান শুনে যে খুব প্রীত হ'ল সে কথা বলাই বাহুল্য। হাসি-তামাসা, গল্প-গুজব অনেক হ'ল। তারাপদ সন্ধ্যার পর এল। কিন্তু তার মনটা কেমন যেন ভার-ভার। যে কথা নিতান্ত না কইলে নয়, তা ছাড়া বিশেষ কথা সে কইলে না। কিন্তু সে জন্যে বিশেষ কিছু গেল-এল না। এই প্রবীণের মজলিসে তার কথা শোনবার জন্যে কেউ ব্যস্তও ছিল না।

অনেক রাত্রে তারা শুতে গেল। গ্রামের মাতব্বররাও নিজের নিজের বাড়ী চ'লে গেল। হারাণের দু'খানি মাত্র ঘর। এক ঘরে অভ্যাগতদের জন্যে জায়গা হয়েছিল।

রসময় শুল, পথশ্রমে দেহ তার ক্লান্ত, তবু ঘুম আসে না। বিনোদিনীর করুণ ম্লান মুখ কেবলই মনে পড়ে। হারাণ যেভাবে বিয়ের জন্যে নেচেছে তাতে বিনোদিনীর সম্বন্ধে কিছু বলা ঠিক হবে কি না তাও সে ভেবে উঠতে পারেনি।

কিন্তু আর উপায় কি? ভালো হোক, আর মন্দই হোক, এই শেষ সুযোগ। যে মন্দ হতে চলেছে, বিনোদিনীর তার চেয়ে বেশী মন্দ আর কি হ'তে পারে?

অবশেষে মরিয়া হয়ে ডাকলে, হারাণ, জেগে আছ নাকি?

ঘুম হারাণেরও আসছিল না। আসন্ন বিবাহ সম্বন্ধে সম্ভব অসম্ভব বহুতর কল্পনায় তার চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত। নিঃশব্দে পড়ে পড়ে সে আকাশ-কুসুম রচনা করছিল।

বললে, আছি।

রসময় চুপ ক'রে রইল।

হারাণ পাশ ফিরে বললে, আমি ভেবেছিলাম, তুমি ঘুমিয়ে গেছ। রাস্তা হেঁটে এসেছ।

—তা হেঁটেছি বই কি।

হারাণ বললে, তুমি হাঁটতে পার খুব। আমাকে তুমি সারা দিন জমি চাষ করিয়ে নাও, তা পারি। কিন্তু রাস্তা হাঁটতে হলেই জিভ বেরিয়ে যাবে।

হারাণ হাসলে।

বললে, তবু কতদূর হেঁটেছ আজকে? কোত্থেকে আসছ তাও জিগ্যেস করিনি। করব কখন বল? যা ঝামেলা!

হারাণ খুব মাতব্বরী ঢঙে কথাটা বললে।

একটু দ্বিধা ক'রে রসময় বললে, আসছি ভালো জায়গা থেকেই। তোমার শ্বশুরবাড়ী থেকে।

হারাণ যেন থমকে গেল।

রসময় বলতে লাগল: গৌরহরি তাদের সেই পুরোণো ভিটের উপরে নতুন আখড়া তৈরী করলে কি না। তাই একটা মচ্ছব দিলে। সেখান থেকে একটু আমার এই দিকে আসার দরকার ছিল। তাই ভাবলাম,

হারাণ অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে, ওদের সঙ্গে দেখা হ'ল,—হাবল-মেনীর সঙ্গে?

—হ'ল বই কি! ভালোই আছে।

হারাণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

একটু থেমে রসময় বললে, শরীরটা বিনোদিদিরই খারাপ দেখলাম। একেবারে……

অকস্মাৎ ফোড়ায় হাত পড়লে মানুষ যেমন আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার ক'রে ওঠে, আচম্বিতে বিনোদিনীর নাম শুনে হারাণ তেমনি চীৎকার ক'রে উঠল: বিনোদিনীর?

—হ্যাঁ। মধ্যে যে কঠিন অসুখ হয়েছিল, বাঁচবার তো আশাই ছিল না। রাধারাণীর দয়ায়……

হারাণ এবার পাগলের মতো অট্টহাস্য ক'রে উঠল:

—তুমি কি ঘুমের ঘোরে কথা বলছ নাকি? আমি ভেবেছিলাম জেগেই আছ বুঝি।

রসময় এবার উঠে বসল। চাঁদের আলোর একটি ফালি দরজার চৌকাঠ পর্য্যন্ত এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। তার স্বল্প আলোয় ওকে ঠিক দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল।

রসময় বললে, ঠিকই বলছি। বিনোদিদির কঠিন অসুখ ক'রেছিল। বিনোদিদি মরেনি। কিন্তু তোমার ভাবগতিক দেখে এখন মনে হচ্ছে মরাই ভালো ছিল।

হারাণ অভিভূতের মতো ফ্যাল ফ্যাল ক'রে ওর দিকে চেয়ে রইল। ব্যাপারটা যেন কিছুতে তার বোধগম্য হচ্ছিল না।

রসময় বললে, তোমার এখান থেকে পালিয়ে সে আমার আখড়ায় উঠেছিল। মাস কয়েক সেইখানেই ছিল। পুজোর ক'দিন আগে তার মা আর দাদা খবর পেয়ে তাকে বাড়ী নিয়ে যায়। তারপর থেকে সেইখানেই আছে।

হারাণ ভাবলেশহীন শূন্য দৃষ্টিতে পাথরের মূর্ত্তির মতো নিস্পন্দভাবে ওর দিকে চেয়ে রইল।

রসময় অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আত্মগতভাবে বলতে লাগল:

—আছে মানে এখনও বেঁচে আছে। কিন্তু বাঁচবে না বেশী দিন। জ্বর তো আছেই, তার ওপর বুকের দোষও হয়েছে। একটু কিছু হ'লেই ফিট হয়। দেহ যেন শুকিয়ে পোড়াকাঠের মতো হয়েছে। থাকবার মধ্যে রয়েছে শুধু চোখ দুটো,—শুকনো মুখের মধ্যে ড্যাব ড্যাব করছে। চাইলে মনে হয়, তার থেকে এখুনি বুঝি আগুন বেরুবে।

রসময় বলতে লাগল:

—মা জানকীর কথা শুনেছি। এবারে চোখে দেখে এলাম। অমন যে মেঘের মতো চুল, তেলের অভাবে তাতে জট পড়েছে। ছেলেমেয়ে দুটো মাঝে মাঝে কাছে এসে দাঁড়ায়। কি যে ভাবে কে জানে। আবার মুখ শুকিয়ে ফিরে যায়। কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই আমাকে বললে, এস। আমার মনে হ'ল, কথাটা যেন বিনোদিদি বললে না, ওপাড়া থেকে কে বললে।

হারাণ এইবার হাউ হাউ ক'রে স্ত্রীলোকের মতো ডুকরে কেঁদে উঠল। বললে, আমি যাব। আমাকে নিয়ে চল।

—যাবে? বেশ, কালই চল।

হারাণ লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। বললে, কাল নয় এখনি। তোমার ঝুলি-ঝম্পা নাও।

রসময় বললে, এই রাত্রে?

—রাত আবার কি? চাঁদের ফুট ফুটে আলো আছে। দিব্যি ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় যাব। ওঠ।

রসময়কে উঠতে হ'ল। তারাপদকে একটা খবর দেওয়ারও সময় রইল না। পনেরো মিনিটের মধ্যে দু'জনে বেরিয়ে পড়ল। যাবার সময় ওঘরের দিকে চেয়ে রসময় বললে, কিন্তু ওঁরা?

হারাণ কথাটা গ্রাহ্যই করলে না। বললে, সকাল বেলা আমাদের না দেখে ওরা আপনিই পালাবে। তুমিও যেমন!

•

হারাণের কথাই সত্য হ'ল। সকালে উঠে কন্যার পিতা এবং তার সঙ্গীরা হারাণকে দেখতে পেলে না, সেই সঙ্গে বাবাজিকেও না। কিন্তু তার জন্যে চিন্তার কোনো কারণ ছিল না। হয়তো ওদের ঘুম ভাঙতে দেরী দেখে বাইরে কোথাও গেছে। হয়তো মাঠেই গেছে। সে এমন একটা দুশ্চিন্তার কথা নয়। কিন্তু বেলা যত বাড়তে লাগল, দুশ্চিন্তাও তত বাড়তে লাগল।

অবশেষে কন্যার পিতা অগ্ন্যুদ্গার ক'রে উঠল:

—এ নিশ্চয় সেই বেটা বাবাজির কাণ্ড!

তাদের চীৎকার শুনে পাড়ার পাঁচজন লোক জড় হ'ল। পালজি

চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে রইল। কেউ কেউ তাদের শান্ত করবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু অসম্ভব।

কন্যার পিতা বেঁটে খাটো মানুষটি, কিন্তু আপাদ মস্তক তেজে ভরা। লোকটা উঠানে কিছুক্ষণ দাপাদাপি ক'রে অবশেষে সমবেত দর্শকমণ্ডলীর দিকে তর্জ্জনী তুলে বললে, আমি ডাকসাইটে নিত্যহরি রায়, আমার সঙ্গে চালাকি! মামলা ক'রে ছ'বেটাকে যদি না ঝোলাতে পারি তো আমার তল-হাতে রোঁয়া।

এই ব'লে ডাকসাইটে নিত্যহরি রায় ভর্ত্তি দুপুর বেলায় অস্নাত এবং অভুক্ত অবস্থায় সদলবলে বেরিয়ে গেল। স্নানাহার করার জন্য পালজির সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে কানই দিলে না।

(১৬)

হারাণ এবং রসময় যখন এসে পৌঁছুল তখন ঠিক জলখাবারের বেলা। রাখালেরা গরু নিয়ে মাঠে চ'লেছে। মেয়েরা কেউ স্নান করতে ঘাটে যাচ্ছে, কেউ স্নান করে ফিরছে। পথের ধুলায় ভিজা পায়ের দাগ যেন আলপনা কেটেছে।

নিতাইপদ সকালেই বেরিয়েছিল পাড়ার একটা কঠিন মামলার পরামর্শ দিতে। এই মাত্র সে ফিরল। অকস্মাৎ হারাণকে দেখে সে উল্লসিত হয়ে তাকে সম্বর্দ্ধনা জানিয়ে বসতে জায়গা দিলে। তার পরেই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে নিঃশব্দে এককোণে ব'সে রইল।

কথাটা বাড়ীর ভিতরে এবং দেখতে দেখতে গোটা গ্রামে রাষ্ট্র হয়ে পড়ল। ছেলে-বুড়ো যে যেখানে ছিল চারিদিকে ভিড় ক'রে দাঁড়াল। তারই মধ্যে রয়েছে হাবল আর মেনীও। দু'জনেই সন্দিগ্ধ চিত্তে দূর থেকে বাপের দিকে চেয়ে কি যে দেখতে লাগল তা বোধ হয় তারা নিজেরাও জানে না।

হারাণ অপরাধীর মতো মুখ নীচু ক'রে ব'সে।

ওদিকে দেওয়ালের অন্তরাল থেকে মেয়েরা উঁকি দিচ্ছে। তাদের চাপা কণ্ঠের অম্ল-মধুর-কটু-তিক্ত মন্তব্য তার কানে ভেসে আসছে।

হাবলের কাপড় গোয়াল-ছাঁদে বাঁধা। বগলে পাঁচন-বাড়ি। হাত দুটি সামনের দিকে সম্বদ্ধ।

কে একজন তাকে ঠেলে দিয়ে বললে, যা, বাপের কাছে গিয়ে ব'স গে। এখানে দাঁড়িয়ে কেন?

হারাণ তাকে কনুয়ের একটা ঝাপটা দিলে।

হারাণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওর দিকে চাইলে। কি জানি কেন হাবলের চোখে জল আসছিল। লজ্জা ঢাকবার জন্যে তাড়াতাড়ি আড়ালে স'রে গেল।

হারাণের মনে হাবলের সম্বন্ধে যে স্মৃতি ছিল, তার সঙ্গে এখনকার হাবলের অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। এরই মধ্যে সে মাথায় অনেক বড় হয়েছে। দেহ আরও সুগঠিত। লম্বায় চওড়ায় ওর গড়ন অনেকটা তারই মতো হবে।

অন্তরালবর্ত্তিনীদের কাছ থেকে মন্তব্য এল:

—ওমা, ছেলে যে বাপকে দেখে পালাল!

—পালাবে না? যেমন বাপের ছেদ্দা, তেমনি তো ছেলেরও ছেদ্দা হবে?

—ওই ঝাড়েরই তো বাঁশ!

—বাপকে চিনতেই পারেনি হয় তো!

—তাই পারে? কত দিন দেখেনি!

লজ্জায়, দুঃখে এবং অনুশোচনায় হারাণের মাথা মাটির উপর ঝুলে পড়ল। চোখ ছল ছল ক'রে উঠল। একটা কথাও সে কইতে পারলে না।

রসময় ছুটে গিয়ে মেনীকে ধ'রে নিয়ে এসে হারাণের কোলে বসিয়ে দিলে। হারাণ ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলে। মেনী আড়ষ্টভাবে বসে রইল বটে, কিন্তু মনে হ'ল সে খুসীই হয়েছে! তার শিশুমনের মধ্যে এই কোলটুকুর লোভ বুঝি অনেক দিন থেকেই ঘুমিয়ে ছিল।

অন্তরালবর্ত্তিনীরা আনন্দে অশ্রুমার্জ্জনা করলে।

—আহা! তা আর হবে না? বলে বাপের কোল!

—ভারি চাপা মেয়ে যে। বাপের জন্যে মন-কেমন করত, তা মুখ ফুটে একদিন বলত না।

—আমি দেখেছি যে। কেউ বাপের কোলে চড়লে ও কেমন একরকম ক'রে চেয়ে চেয়ে দেখত।

—আহা।

মোট কথা মেনীর সঙ্গে এরই মধ্যে হারাণের ভাব হয়ে গেল। কিন্তু হাবল সেই যে স'রে পড়ল, তার আর সন্ধান মিলল না। বোধ হয় গরু নিয়ে মাঠে গেছে। ছেলেটা মনের দিক দিয়ে একেবারে মায়ের মতো হয়েছে,—অমনি জেদী, অমনি অভিমানী এবং অমনি কঠোর।

এর মধ্যে বিনোদিনীর আঁচলটুকুরও সাক্ষাৎ হারাণ পায়নি। দুপুরবেলায় সে যখন খেয়ে-দেয়ে ঘরের মধ্যে শুয়েছে তখন ললিতা এল। পিছনে নয়নতারা।

শ্বশুর বাড়ীতে নয়নতারাই হারাণের সব চেয়ে বড় আশ্রয়। নিতাইপদ কাজের লোক। বেশীর ভাগ সময় বাইরে-বাইরেই ঘোরে। তার সঙ্গে বড় একটা দেখাও হয় না, কথাও হয় না। কিন্তু নয়নতারা যে যত্নটা করে তার তুলনা নেই।

ললিতা হাসতে হাসতে এসে জিজ্ঞাসা করলে, কি গো মণ্ডল মশাই, খবর কি?

হারাণ জবাব দেবার আগেই নয়নতারা বললে, মণ্ডল মশায়ের এতদিনে ঘুম ভাঙল। এইবার ছেলে-মেয়েকে দেখতে এসেছে।

ললিতা জিজ্ঞাসা করলে, বিয়ের নিমন্ত্রণ করতে না কি?

হারাণের মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠল।

নয়নতারারও। বললে, সে আবার কি?

ললিতা তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বললে, ওর সম্পর্কে ভাই হয়, তারই বিয়ে কি না, তাই।

হারাণের বিয়ের খবরটা এখানকার আর কেউ জানে না, ওরা ক'জন ছাড়া। হারাণ সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে ললিতার দিকে চাইলে।

কথা ঘোরাবার জন্যে বললে, ললিতাদি, তোমার খবর কি?

ললিতা একটা ভারি রকম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, আমাদের আর কি খবর থাকবে বল? তোমরা যেমন রেখেছ তেমনি আছি।

হারাণ খোঁচাটা বুঝলে, কিন্তু চেপে গেল।

ললিতা একটা কটাক্ষ হেনে জিজ্ঞাসা করলে, সবার সঙ্গে দেখা শোনা হ'ল?

হারাণ বেচারা এসে পর্য্যন্ত ব্যাপার দেখে জমে গিয়েছিল। যেন হাঁফিয়ে উঠেছিল। এতক্ষণ পরে একটা রসিকতা করার সুযোগ পেয়ে উল্লসিত হ'ল।

বললে, সবাইকেই দেখলাম, কিন্তু কাউকে যেন দেখতে পেলাম না।

ললিতা এবং নয়নতারা দু'জনেই এই উত্তরে হেসে উঠল।

নয়নতারা ললিতাকে একটা ঠেলা দিয়ে বললে, ঠাকুর-জামাই দেখতে গোঁয়ার-গোবিন্দ হ'লে হবে কি, ভেতরে রস আছে।

—হ্যাঁ, রস কত? সে ছুঁড়ী কোথায় গেল?

নয়নতারা ইঙ্গিতে ওঘর দেখিয়ে স'রে পড়ল।

ললিতা ওঘর থেকে টানতে টানতে তাকে নিয়ে এল। বললে, কাউকে দেখনি ব'লে দুঃখ করছিলে? এইবার দেখ প্রাণভরে।

আশ্চর্য্য। বিনোদিনী কিছুতে এ ঘরে আসতে চাইছিল না। ললিতা তাকে এক রকম জোর ক'রে টেনে এনেছে। কিন্তু যেই সে ঘরের মধ্যে এল, একেবারে সহজ মানুষ। অত্যন্ত সহজ ভাবে হারাণের পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম ক'রে বিনোদিনী অনতিদূরে ললিতার গা ঘেঁষে বসল।

জিজ্ঞাসা করলে, ভালো ছিলে?

আবেগে হারাণের গলার স্বর বন্ধ হয়ে আসছিল। মাথা নেড়ে জানালে ভালোই ছিল।

বিনোদিনী ম্লানভাবে হেসে বললে, ছাই ভালো ছিলে। পাঁজরার হাড় তো গোণা যাচ্ছে।

হারাণ হাসলে, যেমন ক'রে বৃষ্টি-ধোয়া গাছের পাতা অপরাহ্নের হঠাৎ-আলোয় হেসে ওঠে।

বললে, আর তুমি?

এবারে আর বিনোদিনী ওর মুখের দিকে চাইতে পারলে না। নত মুখে বললে, ভালোই আছি।

—ফিটের অসুখটা আর হয় না?

—মাঝে মাঝে হয়।

—চোখেও তো রক্তের চিহ্নমাত্র নেই।

বিনোদিনী জবাব দিলে না।

হারাণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, হ্যাঁ, খুব ভালোই ছিলে।

ললিতার চোখেও জল আসছিল। চোখ মুছে বললে, একটা খবরও তো নাওনি।

—কোথায় খবর নোব? খবর দিয়েছিলে একটা? তোমরা সবাই আমাকে জব্দ করতে চেয়েছিলে কি না।

—আমরা না হয় দিই নি। তুমিও তো নিতে পারতে?

—কি ক'রে নোব? আমি তো জানি সব শেষ হয়ে গেছে।

বিনোদিনী মুখ টিপে হাসছিল। বললে, তাহ'লেই ভালো হ'ত।

হারাণ রাগ ক'রে বললে, হুঁ।

—হুঁ না তো কি। জিগ্যেস কর তো ললিতা বিয়ে কবে?

—শীগগিরই।

—দিন ঠিক হয়নি?

—হয়েছে।

বিনোদিনী ওর রাগ দেখে মুখ টিপে টিপে হাসছিল। জিজ্ঞাসা করলে, মেয়ে দেখতে কেমন?

—ভালোই। তোমার মতন।

—তবে আর দেরী করা কেন? শুভ কাজ সেরে ফেলাই তো ভালো।

এবার হারাণও হেসে ফেললে। বললে, আর দেরী করব না তো। ললিতাদি, ছ'গাছা মালা ঠিক ক'রে রেখ তো। আজ রাত্রেই বিয়ে।

বিনোদিনী মুখে আঁচল দিয়ে হাসতে হাসতে পালাল। একটু পরেই তামাক সেজে নিয়ে এসে হুঁকোটা হারাণের হাতে দিলে।

বললে, রাত্রে বিয়ে। জাগরণ আছে। দিনের বেলা ঘুমিয়ে নাও প্রাণভরে। আয় ললিতা। না তুইও এখানে শুবি?

—মরণ আর কি?

ললিতা ছুটে বেরিয়ে এল।

বিনোদিনী দরজা বন্ধ ক'রে ললিতাকে নিয়ে আতাতলার ছায়ায় গিয়ে বসল।

ললিতা ওকে জড়িয়ে ধ'রে জিজ্ঞাসা করলে, কি লো, বড় যে হাসি দেখি। কেমন লাগছে?

ওর গাল টিপে দিয়ে বিনোদিনী বললে, খুব ভালো।

—কবে যাচ্ছিস?

—যেদিন নিয়ে যাবে।

ওর হাসিভরা মুখখানি দেখে ললিতার মন খুশীতে ভ'রে উঠল। মনে মনে রাধারাণীকে প্রণাম ক'রে বললে, ওদের সুখে রেখ। আর যেন কখনও দুঃখ পেতে না হয়।

হারাণ কিন্তু আর একটা দিনও থাকতে রাজি হ'ল না। নয়নতারাকে বললে, এবার এই একটা দিনই বেশ থাকা হ'ল বৌ, এর পরের বার এসে যতদিন বলবে থেকে যাব।

বিয়ের পরে এত বেশী দিন বিনোদিনী কখনও বাপের বাড়ীতে থাকেনি। মা কাঁদতে লাগল, নয়নতারা কাঁদতে লাগল, সে নিজেও অনেকদিনের পরে প্রাণভরে কাঁদলে। সব চেয়ে আশ্চর্য্য ওদের যাওয়া দেখতে দেখতে নিতাইপদও অলক্ষিতে একবার চোখ মুছলে। কাঁদলে না কেবল হাবল আর মেনী। তারা থেকে থেকে একবার হারাণকে একবার বিনোদিনীকে তাড়া দেয়, বাবা চল, মা চল।

ঘরে ফেরবার আগ্রহে তাদের আর দেরী সইছিল না।

গৌরহরির সঙ্গে ইতিমধ্যে বিনোদিনীর একবার দেখা হয়েছিল।

গৌরহরি জিজ্ঞাসা করেছিল, তোমরা কি আজই যাচ্ছ বিনোদিনী?

—হ্যাঁ।

—আর দু'একদিন থাকলে ভালো হ'ত না?

—তা আর হ'ল কই? আমার তো ইচ্ছে ছিল। ভেবেছিলাম তোমার বিয়েটা দেখে যাব।

এ কথায় দু'জনেই হেসেছিল।

বিনোদিনী বলেছিল, মাঝে মাঝে আমার ওখানে যেও গৌরহরিদা?

—যাব। কিন্তু ভয় পাবে না তো?

বিনোদিনী হেসে ব'লেছিল, না ভয় পাব না। যেও।

এই পর্য্যন্ত কথা হয়েছিল।

গাড়ী বারোটায়। কিন্তু উদ্যোগ আয়োজন করতে করতে দেখতে দেখতে বেলা হয়ে গেল। গত রাত্রে সাঁজো দিয়ে মা দই পেতে রেখেছিল। ছেলেগুলোর আর ওদের দুজনের কপালে দই-এর ফোঁটা দিয়ে দিলে। তুলসীতলায় আছে মঙ্গল ঘট পাতা, আর সিন্দুর মাখানো একটি পুঁটি মাছ। ঠাকুর বাড়ীর নির্ম্মাল্য আনা ছিল, বিনোদিনীর আঁচলে বেঁধে দেওয়া হ'ল। জলভরা কলসী নিয়ে নয়নতারা রইল বাইরে দাঁড়িয়ে। আর কত মেয়ে যে ওদের বিদায় দিতে এসেছিল তার সীমা নেই।

গুরুজনকে প্রণাম ক'রে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের স্নেহচুম্বন ক'রে বহু লোকের চোখের জলের মধ্যে দিয়ে ওরা অবশেষে যাত্রা করলে।

আজকে রোদের যেন একটু তেজ আছে। ক'দিন আগে এক পসলা বৃষ্টি হওয়ায় মাঠে লাঙ্গল দেওয়ার কাজ আরম্ভ হয়েছে। রিক্তা বসুন্ধরার বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে আবার নতুন বীজ বপন করা হবে হবে। ধু ধু করা শূন্য মাঠ আবার উঠবে ধনে-ধান্যে ভ'রে। তারই আয়োজন চ'লেছে মাঠে মাঠে।

বাঁধাঘাটের উঁচু পাড়ের উপর দাঁড়িয়ে ললিতা আর নয়নতারা দেখলে, সেই মাঠের পথ ভেঙে ওরা চলেছে ষ্টেশনের দিকে। আগে হারাণ। তার মাথায় বিনোদিনীর পেটারী, কোলে মেনী। কালো কষ্টি পাথরে খোদাই করা মূর্ত্তির মতো বলিষ্ঠ, সুদীর্ঘ সুঠাম দেহ। মাথায় মধ্যাহ্ন সূর্য্যের পরিপূর্ণ আলোর রাজছত্র। যেন সে এই বসুন্ধরার দিগ্বিজয়ী রাজা। পাশে তারই লাঠিটি কাঁধে ক'রে দৃপ্ত ভঙ্গিতে চলেছে হাবল। পিছনে বিনোদিনী। মাঠের প্রবল হাওয়ায় তার পিঠের কাপড় নৌকার পালের মতো ফুলে ফুলে উঠছে। বাঁধাঘাটের উঁচু পাড় থেকে সবাইকে চেনা যাচ্ছে, কেবল ওকে নয়। ও যেন সম্পূর্ণ অপরিচিত। ও যেন এই বসুন্ধরা স্বয়ং,—আলোয়, ছায়ায়, অন্ধকারে ক্ষণে ক্ষণে নব নব রূপে দেয় দেখা। কলঙ্কে এবং মহিমায় সে রূপের আর শেষ নেই।

সমাপ্ত

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র

[২ক]

মূল কথা

বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স যখন ২০ বৎসর, তখন (১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে) তিনি নবপ্রতিষ্ঠিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এ, পাশ করিলেন। অমনি প্রায় সঙ্গেসঙ্গে বাংলার ছোট লাট হ্যালিডে সাহেব আগষ্ট মাসে তাঁহাকে ডেপুটিগিরিতে ভর্তি করিয়া লইলেন। তখনকার রাজপুরুষেরা শিক্ষিত বাঙ্গালীকে এইরূপ সুনজরে দেখিতেন—এই ৮০ বৎসরে কি সাংঘাতিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে! দেড় বৎসর যশোহরে শিক্ষানবিশির পর বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৬০, জ্যানুয়ারিতে মেদিনীপুর জেলার নেগুঁয়া মহকুমার ভার প্রাপ্ত হইলেন। তখনও ঐ মহকুমার কেন্দ্র কাঁথিতে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই—তবে ইহা নিঃসংশয় যে, মহকুমা পরিদর্শন উপলক্ষে শুধু কাঁথি নয়, চাঁদপুর, দরিয়াপুর প্রভৃতি গ্রামেও বঙ্কিমচন্দ্রকে অবস্থান করিতে হইত। ঐ দরিয়াপুরের অবিদূরে রসুলপুর নদী সাগর-সঙ্গমে প্রবেশ করিয়াছে। নিকটে বহুযোজনব্যাপী বালিয়াড়ি। ঐ দরিয়াপুরই বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা'র পরিকল্পনা-ক্ষেত্র।

নেগুঁয়াতে দশ মাস রাজকার্য করার পর নভেম্বর মাসে বঙ্কিমচন্দ্র খুলনায় বদলী হন। জানুয়ারীতে যখন তিনি নেগুঁয়ায় আসেন তখন তিনি বিপত্নীক। নেগুঁয়ায় অবস্থানকালে জুন মাসে বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নীর নাম রাজলক্ষ্মী দেবী। এ বিবাহ তাঁহার পক্ষে প্রকৃতই 'শুভ' বিবাহ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সম্বন্ধে নিজে লিখিয়াছেন—

'একজনের প্রভাব আমার জীবনে বড় বেশী রকমের—আমার পরিবারের। তিনি না থাকিলে আমি কি হইতাম বলিতে পারি না।'

কবিবর নবীনচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রকে বেশ ঘনিষ্ট ভাবে জানিতেন। তিনি রাজলক্ষ্মী দেবী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—'বঙ্কিমচন্দ্রের স্ত্রীর চরিত্র তাঁহাকে novelist করিয়াছে। তিনিই—সূর্য্যমুখী।'

ইহার পর সার্ভিসের ধারানুযায়ী নানা ঘাটের জল খাইয়া (যথা,—খুলনা, বারাসত, হুগলী, মেদিনীপুর প্রভৃতি) বঙ্কিমচন্দ্র শেষ জীবনে আলিপুরে পোষ্টেড্ হন এবং ১৮৯১, সেপ্টেম্বর মাসে রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইহার পর তিনি আড়াই বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। তাঁহার আয়ুঃসূর্য অস্ত যাইবার দিন—অর্থাৎ তাঁহার বিজয় বাসর ৮ই এপ্রিল, ১৮৯৪—২৬শে চৈত্র, বঙ্গাব্দ ১৩০০। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ৫৬ বৎসর। তখনও শক্তি অক্ষুণ্ণ, চিত্তধারা অফুরন্ত। বাংলা সাহিত্যের শোচনীয় দুর্ভাগ্য বটে!

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে (১২৭০ সাল) বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয়। যতদূর জানা যায় ইহাই তাঁহার প্রথম বাংলা গদ্য রচনা। বঙ্কিমচন্দ্রের স্নেহাস্পদ বন্ধু রমেশচন্দ্র দত্ত এই 'দুর্গেশনন্দিনী' সম্বন্ধে ১৩০১ সনের 'সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা'য় এইরূপ লিখিয়াছিলেন—"যখন 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হইল, তখন যেন বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে সহসা একটি নূতন আলোকের বিকাশ হইল। দেশের লোক সে আলোকচ্ছটায় চমকিত হইল, সে বালার্ককিরণে প্রফুল্ল হইল, সে দীপ্তিতে স্নাত হইয়া স্তুতি গান করিল। কলিকাতা ও ঢাকা, এবং পশ্চিম ও পূর্ব্বদেশ হইতে আনন্দরব উত্থিত হইল, বঙ্গবাসিগণ বুঝিল সাহিত্যে একটি নূতন যুগের আরম্ভ হইয়াছে, একটি নূতন ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে,—নূতন চিন্তা ও নূতন কল্পনা বঙ্কিমচন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া আবির্ভূত হইয়াছে।"

ইহার পর ১৮৬৬ সালে 'কপালকুণ্ডলা' এবং ১৮৬৯ সালে 'মৃণালিনী' প্রকাশিত হইলে, বাঙ্গালী পাঠকের চমক স্থায়ী বিস্ময়ের আকার ধারণ করিল। তখন ১২৭৯ বঙ্গাব্দে (ইং ১৮৭২ সনে) বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' লইয়া মাসিক-সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। 'বঙ্গদর্শনে'র কথা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি—এখানে পুনরুক্তি করিব না। তবে আমাদের অনুসন্ধান করিতে হইবে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের কালে বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যের কিরূপ অবস্থা ছিল।

দামুণ্যার দরিদ্র কবি মুকুন্দরাম ও নবদ্বীপের রাজকবি ভারতচন্দ্রের সহিত নবাবি আমল চিরতরে অন্তর্হিত হইয়াছে। পলাশি যুদ্ধের পর প্রায় এক শতাব্দী অতীত হইতে চলিয়াছে। পাঁচালি ও কবিওয়ালার গানের খরস্রোতে ভাঁটা পড়িয়া আসিতেছে। উপচীয়মান বিলাতী বন্যার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া নবযুগের কবিগুরু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'মাতৃসমা মাতৃ-ভাষা'র স্তুতিগান গাহিয়া নীরব হইয়াছেন। দীনবন্ধু

নীলকর-প্রপীড়িত বাংলার মর্মব্যথামুখরিত 'নীলদর্পণ' রচনা করিয়াছেন এবং পাদ্রি লংসাহেব তাহার অনুবাদ প্রকাশ করিয়া কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন।

নীলবানরে সোনার বাংলা করলে এবার ছারেখার
অসময়ে হরিশ মলো লংয়ের হল কারাগার!

মাইকেল মধুসূদন—যিনি কবি-প্রতিভার প্রথমোচ্ছ্বাস 'Captive Lady' প্রভৃতি ইংরেজী কাব্যরচনায় প্রকাশ করিয়াছিলেন—এখন (১৮৬০ খৃষ্টাব্দে) অনুতপ্ত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ 'কম্বুনাদে অম্বুনাদে' 'মেঘনাদ বধ' গান করিয়া মধুচক্র রচনা করিয়াছেন।

—গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

মধুসূদন এখন মর্মে মর্মে বুঝিয়াছেন :—

হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন
তা সবে (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পরধনলোভে-মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি!

* * *

স্বপ্নে তবে কুললক্ষ্মী ক'য়ে দিলা পরে,
'ওরে বাছা, গৃহে তব রতনের রাজি,
এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি অজ্ঞান তুই যারে ফিরি ঘরে।'
পালিলাম আজ্ঞা সুখে, পাইলাম কালে
মাতৃভাষা-রূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে।

গুণগ্রাহী কালীপ্রসন্ন সিংহ—যাঁহার Motto ছিল—

নানান দেশে নানান ভাষা
বিনা স্বদেশী ভাষা না পূরে আশা

—তিনি প্রকাশ্য সভায় মধুসূদনকে অভিনন্দিত করিয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—

আপনা কর্ত্তৃক যেন ভাবী বঙ্গসন্তানগণ নিজ দুঃখিনী জননীর অবিরল-বিগলিত অশ্রুজল

মার্জনে সক্ষম হন। তাঁহাদিগের দ্বারা যেন বঙ্গভাষাকে আর ইংরেজি ভাষা-সপত্নীর পদাবনত হইয়া চির সন্তাপে কালাতিপাত করিতে না হয়।

কিন্তু এ সকল অরণ্যে রোদন দেশের বধির কর্ণে প্রবেশ লাভ করে নাই। তাই দেখি বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে'র অনুষ্ঠান পত্রে আক্ষেপ করিতেছেন ঃ—

"লেখাপড়ার কথা দূরে থাক, এখন নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কাজই বাঙ্গালায় হয় না। বিদ্যালোচনা ইংরাজিতে। সাধারণের কার্য, মিটিং, লেক্‌চার, এড্রেস, প্রোসিডিংস্‌, সমুদয় ইংরাজিতে। যদি উভয় পক্ষ ইংরাজি জানেন, তবে কথোপকথনও ইংরাজিতেই হয়, কখন যোল আনা, কখন বার আনা ইংরাজি। কথোপকথন যাহাই হউক্‌, পত্রলেখা কখনই বাঙ্গালায় হয় না। * * আমরা যত ইংরাজি পড়ি, যত ইংরাজি কহি বা যত ইংরাজি লিখি না কেন, ইংরাজি কেবল আমাদিগের মৃতসিংহের চর্মস্বরূপ হইবে মাত্র। ডাক ডাকিবার সময়ে ধরা পড়িব। পাঁচ সাত হাজার নকল ইংরাজ ভিন্ন তিন কোটি সাহেব কখনই হইয়া উঠিবে না।"

(প্রথম বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু নিজেই এই অপরাধে অপরাধী হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'Rajmohan's wife' ইংরাজিতে লিখিত হইয়া 'Indian Field'-নামক সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে তিনি উহার কিয়দংশের বাংলা করিয়াছিলেন।) সে যাহা হ'ক, পরেও দেখি বঙ্কিমচন্দ্র শিক্ষিত বাঙ্গালীকে বঙ্গভাষার প্রতি অবজ্ঞা জন্য কঠোর তিরস্কার করিতেছেন।

'বাঙ্গালা বুঝিতে পারি'—এ কথা স্বীকার করিতে অনেকের লজ্জা হইত। আজিও না-কি কলিকাতায় এমন অনেক কৃতবিদ্য নরাধম আছে, যাহারা মাতৃভাষাকে ঘৃণা করে,—যে তাহার অনুশীলন করে, তাহাকেও ঘৃণা করে এবং আপনাকে মাতৃভাষা-অনুশীলনে পরাঙ্মুখ ইংরেজি-নবিশ বলিয়া পরিচয় দিয়া আপনার গৌরব বৃদ্ধির চেষ্টা পায়।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের সহিত যদি বঙ্কিম-যুগের আরম্ভ ধরা যায়, তবে ১৮৯৪-এ তাঁহার তিরোধানের সহিত ঐ যুগের শেষ। এই ৩০ বৎসরের মধ্যে শেষ দশ বৎসর বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ ভাবে ধর্মালোচনায় মনোযোগী হইয়াছিলেন। প্রথম বয়সে তিনি স্বভাবতঃ নবীনতার অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু পরিণত বয়সে তাঁহার প্রাচীনতার প্রতি পক্ষপাত হয়। তিনি 'ধর্মতত্ত্বে'র একস্থলে লিখিয়াছেন—

আমার সব কথাই পুরাতন। নূতনে আমার নিজের বড় অবিশ্বাস। * * আমি সেই আর্য ঋষিদিগের পদারবিন্দ ধ্যান পূর্ব্বক, তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথেই যাইতেছি।

সেই জন্য দেখি প্রাচীন প্রথা 'কথকতা'র প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ এবং ইহাকেই তিনি লোকশিক্ষার মুখ্য উপায় মনে করিতেন। তাঁহার নিজের কথা এই ঃ—

গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে বেদী-পিঁড়ির উপর বসিয়া ছেঁড়া তুলট না দেখিবার মানসে সম্মুখে পাতিয়া, সুগন্ধি মল্লিকামালা শিরোপরে বেষ্টিত করিয়া, নাদুস্‌-নুদুস্‌ কালো কথক সীতার সতীত্ব, অর্জুনের বীরধর্ম, লক্ষণের সত্যব্রত, ভীষ্মের ইন্দ্রিয়জয়, রাক্ষসীর প্রেমপ্রবাহ, দধীচির আত্মসমর্পণ-বিষয়ক সুসংস্কৃতের সদ্ব্যাখ্যা সুকণ্ঠে সদলংকার সংযুক্ত করিয়া আপামর সাধারণ সমক্ষে বিবৃত করিতেন। যে লাঙ্গল চষে, যে তুলা পিঁজে, যে কাটনা কাটে, যে ভাত পায় না পায়, সেও শিখিত—শিখিত যে, ধর্ম নিত্য, ধর্ম দৈব, যে, আত্মান্বেষণ অশ্রদ্ধেয়, যে, পরের জন্য জীবন, যে, ঈশ্বর আছেন, বিশ্বসৃজন করিতেছেন, বিশ্বপালন করিতেছেন, বিশ্বধ্বংস করিতেছেন, যে, পাপপুণ্য আছে, যে, পাপের দণ্ড পুণ্যের পুরস্কার আছে, যে, জন্ম আপনার জন্য নহে পরের জন্য, যে, অহিংসা পরম ধর্ম, যে, লোকহিত পরম কার্য—সে শিক্ষা কোথায়? সে কথক কোথায়? কেন গেল? বঙ্গীয় নব্যযুবকের কুরুচির দোষে।

এমন কি, আধুনিকদিগের দৃষ্টিতে যে ব্রাহ্মণসম্প্রদায় চালকলার যম হইয়া ভারতবর্ষকে অধঃপাতে দিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদিগেরও স্তুতিবাদ করিয়াছেন।

হিন্দুধর্মে ব্রাহ্মণগণ সকলের পূজ্য। তাঁহারা যে বর্ণশ্রেষ্ঠ এবং আপামর সাধারণের বিশেষ ভক্তির পাত্র, তাহার কারণ এই যে, ব্রাহ্মণেরাই ভারতবর্ষে সামাজিক শিক্ষক ছিলেন। তাঁহারাই ধর্মবেত্তা, তাঁহারাই নীতিবেত্তা, তাঁহারাই বিজ্ঞানবেত্তা, তাঁহারাই পুরাণবেত্তা, তাঁহারাই দার্শনিক, তাঁহারাই সাহিত্যপ্রণেতা, তাঁহারাই কবি।

সমাজ ব্রাহ্মণকে এত ভক্তি করিত বলিয়াই, ভারতবর্ষ অল্পকালে এত উন্নত হইয়াছিল।

* * দেখ, বিধি, বিধান, ব্যবস্থা সকলই ব্রাহ্মণের হাতেই ছিল। নিজ হস্তে সে শক্তি থাকিতেও তাঁহারা আপনাদের উপজীবিকা-সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিয়াছেন? তাঁহারা রাজ্যের অধিকারী হইবেন না, বাণিজ্যের অধিকারী হইবেন না, কৃষিকার্যের পর্যন্ত অধিকারী নহেন। এক ভিন্ন কোন প্রকার উপজীবিকার অধিকারী নহেন। যে একটি উপজীবিকা ব্রাহ্মণেরা বাছিয়া বাছিয়া আপনাদিগের জন্য রাখিলেন, সেটি কি?

যাহার পর দুঃখের উপজীবিকা আর নাই, যাহার পর দারিদ্র্য আর কিছুতেই নাই—ভিক্ষা। এমন নিঃস্বার্থ উন্নতচিত্ত মনুষ্যশ্রেণী ভূমণ্ডলে আর কোথাও জন্মগ্রহণ করেন নাই।

* * যথার্থ নিষ্কামধর্ম যাঁহাদের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে, তাঁহারাই পরহিতব্রত সঙ্কল্প করিয়া এরূপ সর্ব্বত্যাগী হইতে পারেন।

* * পৃথিবীতে যত জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণদিগের মত প্রতিভাশালী, ক্ষমতাশালী, জ্ঞানী ও ধার্মিক কোন জাতিই নহে। প্রাচীন এথেন্স বা রোম, মধ্যকালের ইতালি, আধুনিক জর্মণি বা ইংলণ্ডবাসী কেহই তেমন প্রতিভাশালী বা ক্ষমতাশালী ছিলেন না; রোমক ধর্মযাজক, বৌদ্ধ ভিক্ষু বা অপর কোন সম্প্রদায়ের লোক তেমন জ্ঞানী বা ধার্মিক ছিলেন না।

আরও লক্ষ্য করা যায়—প্রবীন বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্মের বিশেষ পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। তাঁহার 'ধর্মতত্ত্বে' এই পক্ষপাতের ভূয়ঃ ভূয়ঃ পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করি।

"অন্য ধর্ম অসম্পূর্ণ—হিন্দুধর্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সম্পূর্ণ * * হিন্দুধর্মের মত সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন ধর্ম আর দেখা যায় না * * ইউরোপের ধর্ম, বিশেষতঃ পূর্ব্বতন ইউরোপের ধর্ম, হিন্দুধর্মের মত উন্নত ধর্ম নহে। * * মনুষ্যে প্রীতি হিন্দুশাস্ত্রের মতে ঈশ্বরে ভক্তির অন্তর্গত—এই এক কথাতেই সকল ধর্মের উপর হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইল * * হিন্দুধর্ম যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম, ইহা তদ্বিষয়ে অন্যতর প্রমাণ।"

বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুশাস্ত্রকে সমুদ্রের সহিত তুলনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

'যেমন সমুদ্রনিহিত রত্নের যথার্থ স্বরূপ ডুব দিয়া না দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় না, তেমনি অগাধ সমুদ্র হিন্দু-শাস্ত্রের ভিতরে ডুব না দিলে তদন্তর্নিহিত রত্ন সকল চিনিতে পারা যায় না।'

বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত হিন্দুধর্ম কি? সে ধর্ম বৈদিক ধর্ম নয়—উপনিষদের ধর্ম নয়—বুদ্ধের জ্ঞানময় ও ধ্যানময় ধর্ম নয়—তাহা পৌরাণিক হিন্দুধর্ম। এ সম্পর্কে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন :—

আমাদের সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হিন্দুধর্মের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবে যে, ইহার যত পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা কেবল ইহাকে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন করিবার চেষ্টার ফল।

ইহার প্রথমাবস্থা ঋগ্বেদসংহিতার ধর্ম আলোচনায় জানা যায়, যাহা শক্তিমান্ বা উপকারী বা সুন্দর তাহারই উপাসনা এই আদিম বৈদিক ধর্ম। তাহাতে আনন্দভাব যথেষ্ট ছিল, কিন্তু সত্তের ও চিত্তের উপাসনার অর্থাৎ জ্ঞান ও ধ্যানের অভাব ছিল। এইজন্য কালে তাহা উপনিষৎ সকলের দ্বারা সংশোধিত হইল। উপনিষদের ধর্ম—চিন্ময় পরব্রহ্মের উপাসনা। তাহাতে জ্ঞানের ও ধ্যানের অভাব নাই কিন্তু আনন্দাংশের অভাব আছে। ব্রহ্মানন্দ-প্রাপ্তিই উপনিষদ্ সকলের উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি সকলের অনুশীলন ও স্ফূর্ত্তির পক্ষে সেই জ্ঞান ও ধ্যান-ময় ধর্মে কোন ব্যবস্থা নাই। বৌদ্ধধর্মে উপাসনা নাই। বৌদ্ধেরা সৎ মানিতেন না, এবং তাঁহাদের ধর্মে আনন্দ ছিল না। এই তিন ধর্মের একটিও সচ্চিদানন্দপ্রয়াসী হিন্দুজাতির মধ্যে অধিকদিন স্থায়ী হইল না। এই তিন ধর্মের সারভাগ গ্রহণ করিয়া পৌরাণিক হিন্দুধর্ম সংগঠিত হইল। তাহাতে সত্তের উপাসনা, চিত্তের উপাসনা এবং আনন্দের উপাসনা প্রচুর পরিমাণে আছে। বিশেষ আনন্দভাগ বিশেষরূপে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাই জাতীয় ধর্ম হইবার উপযুক্ত এবং এই কারণেই সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন হিন্দুধর্ম অন্য কোন অসম্পূর্ণ বিজাতীয় ধর্মকর্ত্তৃক স্থানচ্যুত বা বিজিত হইতে পারে নাই।

কিন্তু ধর্ম সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র গতানুগতিক ছিলেন না। তিনি স্বীকার করিতেন—

"হিন্দুধর্মে অনেক জঞ্জাল জমিয়াছে—ঝাঁটাইয়া পরিষ্কার করিতে হইবে। হিন্দুধর্মের মর্ম যে বুঝিতে পারিবে, সে অনায়াসেই আবশ্যক ও অনাবশ্যক অংশ বুঝিতে পারিবে ও পরিত্যাগ করিবে। তাহা না করিলে হিন্দুজাতির উন্নতি নাই।"

প্রকৃত হিন্দু কে? ইহার উত্তরে তিনি বলিয়াছেন—

"সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা-স্বরূপ জ্ঞান ও আনন্দ-ময় চৈতন্যকে যে জানিয়াছে, সর্ব্বভূতে যাহার আত্মজ্ঞান আছে, যে অভেদী, অথবা সেইরূপ জ্ঞান ও চিত্তের অবস্থা প্রাপ্তিতে যাহার যত্ন আছে, সেই বৈষ্ণব ও সেই হিন্দু। তদ্ভিন্ন যে কেবল লোকের দ্বেষ করে, লোকের কেবল জাতি মারিতেই ব্যস্ত—তাহার গলায় গোচ্ছা করা পৈতা, কপালে কপাল-জোড়া ফোঁটা, মাথায় টিকি এবং গায়ে নামাবলি ও মুখে হরিনাম থাকিলেও তাহাকে হিন্দু বলিব না। সে ম্লেচ্ছের অধম ম্লেচ্ছ, তাহার সংস্পর্শে থাকিলেও হিন্দুর হিন্দুয়ানি যায়।"

বঙ্কিমচন্দ্রের অনুমোদিত হিন্দুধর্মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা আমাদের প্রণিধান-যোগ্য—

'তিনি হিন্দুধর্মের যেরূপ আলোচনা করিয়াছেন আমার মতে তাহা আধুনিক সময়ের একটি

লক্ষণ—একটি চিহ্ন স্বরূপ। অনৈক্যস্থলে ঐক্য-সংঘটন, অনুদার মত ও আচারের স্থলে উদার মত ও আচার-সংস্থাপন, নির্জীব অনুষ্ঠানের স্থলে প্রাচীন ধর্মের সঞ্জীবনী শক্তি-প্রচার-করণ, অজ্ঞানতার ও মূর্খতার স্থলে হিন্দুধর্মের জ্ঞান-বিতরণ, অবনতির স্থলে উন্নতির পথ-প্রদর্শন,—এইরূপ ইচ্ছা, এইরূপ ভাব, এইরূপ আশা আজ বঙ্গসমাজে কিছু কিছু অনুভূত হইতেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থগুলি এই ইচ্ছা, এই ভাব ও এই আশার বিকাশমাত্র।"

এ প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের দার্শনিক মতের মূলকথা গুলি বলিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। প্রবন্ধ দীর্ঘ হইল অথচ সকল মূলকথা বলা হইল না। আগামী বারে বলিবার চেষ্টা করিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

প্যাঁক

মোটর বললে, প্যাঁক।

হাঁসও বললে, প্যাঁক।

মোটর থামিয়ে মাংস খেলাম। কেবল রান্না-করা হাঁসের শক্ত মাংস নয়, শকুন্তলার কাঁচা নরম নিটোল—

মোটরেরই ছুটি হর্ণ যেন। কিন্তু বোবা। বিধাতা কি হর্ণ বাজান নিঃশব্দে?

গাছতলায় কাঁটা-ঝোপের আড়ালে ঝরাপাতা আর মরাফুলের শয্যা—

আর লেখা গেল না। সুশান্তের নাকে গন্ধ লাগিয়াছে চিংড়ী মাছ ভাজার, মনে ধাক্কা লাগিয়াছে আকস্মিক ক্ষোভের। মোটর কোথায়? শকুন্তলা? কোথায় হাঁস? রান্না করা হাঁসের শক্ত মাংস? গাছতলা, কাঁটা-ঝোপ, ঝরাপাতা, মরাফুল? মুখে একটা বিড়ি গোঁজা, হাতে একটা সস্তা কলম, তক্তপোষে একটা ময়লা চাদর, শীতের গোড়ায় ঘর জুড়িয়া একটা বর্ষাকালের ভাপসা গুমোট।

শূন্য ঘর, সেইজন্যই যেন আসলে যত ছোট তার চেয়েও ছোট মনে হয়।

তবু সব সহ্য হয় সুশান্তের, চোখের উপর যে পর্দ্দা পড়িয়াছে তাতে সব আড়াল হইয়া থাকে, কিন্তু এই কলম-ধরা শীর্ণ হাতের মুঠায় হর্ণ কই?

একতলার ভাড়াটে শিবচরণের মোটা শক্ত হাতের মুঠা হর্ণ বাজাইয়া বাজাইয়া ক্লান্ত। বেচারী ট্যাক্সি চালায়, অনেকদিনের পুরাণো একটা ট্যাক্সি। গাড়ীটা তার বৌ-এর চেয়েও পুরাণো, বৌ তো সবে তার তৃতীয় সন্তানটির মুখে স্তন দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

চিংড়ী মাছ বোধ হয় রাঁধিতেছে শিবচরণের বোন মালতী। সেই দুবেলা রান্না করে, কারণ শিবচরণের অন্ন তার দুবেলাই খাইতে হয়, এখনও স্বামী জোটে নাই। মালতীর জন্য সুশান্তর মনে একটু মমতা আছে, সে দুবেলা রান্না করে বলিয়া অথবা দুবেলা দাদার অন্ন ধ্বংস করে বলিয়া অথবা এখনও স্বামী জোটে নাই বলিয়া, সুশান্ত ঠিক জানে না। তবে মালতী কাঠির মত

সরু বলিয়া যে নয় তাতে সন্দেহ নাই। কাঠির মত রোগা হোক, রোগে মেয়েটা ভোগে না। একতলাটা শিবচরণ ভাড়া নিয়াছে বছর দুই, এই দু'বছরের মধ্যে মেয়েটা না পড়িয়াছে একদিনের জন্য জ্বরে, না ধরিয়াছে একদিনের জন্য তার মাথা, পুরাণো মোটর হুডে আড়াল করা পিছল কলতলায় একদিনের জন্য আছাড় পর্য্যন্ত সে খায় নাই। মনস্তত্বের খান কয়েক বই পড়িয়া মনের ভাব বিশ্লেষণ করিবার স্বাভাবিক অন্ধ ক্ষমতাটা বজ্রাহত চারার মত মরিয়া গিয়াছে, নিজের মনে যে ভাব জাগে নিজেই তার একটা কারণ নিঃসন্দেহে আবিষ্কার করিতে সে আর পারে না, তাই শুধু অনুমান করে যে হয়ত মালতীর মুখের চিরস্থায়ী অতি মৃদু পুলকের ছাপটা তার মমতার কারণ। কিছু নাই মালতীর, তবু যেন কোন একটা কারণে সে কিছু চায় না, আলস্যের মত অতি জলো একটা আনন্দ দিবারাত্রি বিনামূল্যে উপভোগ করে। কি ভাবে এক চামচ চিনি সংগ্রহ করিয়াছে বেচারী, তাই দিয়া তৈরী করিয়াছে এক পুকুর সরবৎ, ক্রমাগত পান করিয়া যায় তবু ফুরায় না।

দামী প্যাডের উপর সস্তা কলমটা রাখিয়া সুশান্ত ঘরের সম্মুখে রোয়াকে আসিয়া দাঁড়ায়। দেড় হাত চওড়া ত্রিকোণ রোয়াক, তিনদিকে চারখানা ঘর, একটিতে সুশান্তর মা দুবেলা রাঁধেন, স্বামী-পুত্রকে ভাত বাড়িয়া দেন আর দুবেলা ভাতের হাঁড়ি চাঁছিয়া মাছের কাঁটা বাছিয়া ভাল তরকারীর পাত্র পুঁছিয়া স্বামীর থালাতে জড়ো করেন, পেট নাকি তাঁর এই ভাবেই দুবেলা আকণ্ঠ ভরিয়া ফেলা সম্ভব হয়।

সুশান্তর মার এই অদ্ভুত ক্ষমতার কথা শিবচরণের বৌ জানে। তাই মাঝে মাঝে ঠিক এই সময় মালতীকে সহানুভূতি জানাইতে পাঠাইয়া দেয়। পাঠায় সে অন্য মতলবে, কিন্তু মালতীর মনে হয় কুকুর বিড়ালের মত থালা বাটি চাটিয়া পেট ভরানোর কৌশলটা শিখিতে পাঠাইয়াছে।

নিজেকে একই দুঃখে দুঃখী মনে করায় সহানুভূতিটা সে জানাইতে পারে আন্তরিক আর গভীর। দুচোখে জল পর্য্যন্ত আসিয়া পড়ে।

'ওই খেয়ে কি করে বাঁচবেন মাসীমা ?'

সুশান্তের মা বাঁ হাতে কপালে করাঘাত করেন।

'কোন সাধ কি মিটবে, কপাল যে পোড়া।'

মালতীর সহানুভূতি আরও গভীর হইয়া আসে। বুকের ভিতর তোলপাড় করে।

'কপাল না পোড়া হলে ছেলে আমার বিগড়ে যায়, তোর মত লক্ষ্মী মেয়েকে বৌ করতে পারি না। দেবে এবার তোর দাদা তোকে কার হাতে বিলিয়ে, আমার শেষে জুটবে একটা অলক্ষ্মী পেত্নী। আমার অদেষ্টে সুখ নেই মালতী।'

দুবেলা পেট ভরিয়া ভাত জোটার চেয়ে দরদী ছেলের বৌ থাকাটা বেশী সুখের কিনা মালতী জানে না। তার বিগড়ানো ছেলের হাতেই বোনকে দিবার জন্য শিবচরণ যে ওৎ পাতিয়া আছে, সুশান্তের মাকে কোন কৌশলে এ সংবাদটা দিতে না পারিয়া মনটা খুঁত খুঁত করে মালতীর। একটু ভাবিয়া এতক্ষণের আন্তরিক দরদের সঙ্গে আরও খানিকটা কৃত্রিম দরদ জানায়, দরদ জানান ছাড়া আর কিছু তো তার করিবার উপায় নাই।

'যা রাঁধেন সব দিয়ে দেন, নিজের জন্যে কিচ্ছু রাখেন না। আমি হলে—'

'নেই বাছা নেই, অদেষ্টে আমার সুখ নেই। ছেলেটা নইলে মানুষ হয় না ? তোকে বৌ করে এনে দুটো দিন একটু সুখের মুখ দেখতে পাই না ?'

আর সকলের মত, জীবনযাত্রার মত, কথাও দুজনের এক সুরে বাঁধা। এক সময়ে কেবল একটা আপশোষ থাকে, অন্য আপশোষগুলি খাজনা দিয়া রাজার মত তাকেই করে পুষ্ট।

'চিংড়ী মাছ রাঁধছিলি তুই ?'

'হ্যাঁ, এই বড় বড় চিংড়ী মাসীমা, তেরোটাতে প্রায় দু'সের হবে। ভাজতে গিয়ে সব তেল ফুরিয়ে গেল বলে বৌ এমন বকছিল।'

'কত করে সের নিলে ?'

'কেনা নয় তো, কে যেন দাদার গাড়ীতে ফেলে গিয়েছিল। কার জিনিষ কে খায়।'

একটু লজ্জা বোধ করে মালতী, কুড়াইয়া পাওয়া চিংড়ী মাছ, তাও সংখ্যায় তেরটা, ভাগ দেওয়া উচিত ছিল বটে। কিন্তু সুশান্তর মা নিশ্চয় জানেন ভাগ দেওয়া না দেওয়ার মালিক সে নয় ? একটু আমতা আমতা করিয়া মালতী বলে, 'একটা মাছ এনে দেব মাসীমা ? দিই না, এ্যাঁ ?'

ভয়ে বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করে। যদি রাজী হইয়া যান সুশান্তর মা, যদি সস্নেহে হাসিয়া বলেন, দিবি আচ্ছা দে। তারপর বৌদি যদি সুশান্তর মাকেও একটা চিংড়ী মাছ ভাগ দিতে রাজী না হয়, তার স্বামীর কুড়াইয়া পাওয়া চিংড়ী মাছ? ভাগাভাগি বৌদি ভালবাসে না। সে মেয়েমানুষ বটে, কিন্তু এবিষয়ে স্বভাবটা দুর্য্যোধনের মত।

কারণ-না-জানা মমতাটুকুর জন্যই সুশান্তর রোয়াকে দাঁড়ান। খাওয়ার সময় সুশান্তর মাকে সহানুভূতি জানাইয়া ফিরিবার সময় রোয়াকে তাকে না দেখিলে মালতী রাগ করে, এত বেশী রাগ করে যে সেদিন রাত্রে সে আর আসে না। অনেক রাত্রে ট্যাক্সি নিয়া ফিরিয়া আসিয়া বার কয়েক হর্ণটা প্যাঁক প্যাঁক করিয়া শিবচরণ বাড়ীর আর পাড়ার অনেকের ঘুম ভাঙ্গায়। মালতী উঠিয়া দরজা খুলিয়া দেয়, ভাত বাড়িয়া দেয়, শিবচরণ শুইয়া পড়িলে নিজেও শোয়, হর্ণের প্যাঁক প্যাঁক শব্দে যাদের ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল তাদের মত আবার সে ঘুমাইয়া পড়ে কিনা ভগবান জানেন, কিন্তু আর উঠিয়া আসে না। দামী প্যাডে সস্তা কলমের আঁচড় কাটিয়া, মাঝে মাঝে একটা দুটা সিগারেটের মেশাল দিয়া বিড়ি টানিয়া, বার বার রোয়াকে গিয়া নীচের অন্ধকার উঠানের দিকে চাহিয়া থাকিয়া রাত্রি জাগাই সুশান্তর সার হয়। কত করিয়া মালতীকে সে বুঝায়, কত বলে যে অমন মৃদু নিঃশব্দ পদসঞ্চারে মালতী চলাফেরা করে, রোজ কি তার পক্ষে টের পাওয়া সম্ভব সে কখন উপরে আসিয়াছে, দু'একদিন সময় মত রোয়াকে গিয়া না দাঁড়াইলে তার কি রাগ করা উচিত?

মালতী বুঝিয়াও বোঝে না।

'পায়ের আওয়াজ নাই বা পেলে, আমি ওপরে আসি মাসীমা যখন খেতে বসেন তখন।'

'মা কখন খেতে বসে জানব কি করে?'

'খেয়াল রাখলেই জানা যায়। তোমাদের খাইয়ে তবে মা ফেলা ছড়া যা থাকে নিয়ে—'

আলাপ আলোচনার এদিকটা সুশান্ত এড়াইয়া যায়। গভীর ক্ষোভের সঙ্গে সঙ্গে বলে, 'তুমি কিছু বোঝ না। লিখতে বসলে আমার কি কিছু

খেয়াল থাকে, না, খেয়াল থাকলে লেখা যায়? নিজে যদি লিখতে তা হলে বুঝতে মানুষের গভীর মনের সুখদুঃখের রূপ দিতে হলে বিশ্বসংসারকে ভুলে যেতে হয়। তুমি বুঝবে না মালতী, বুঝবে না।'

অন্য সকলের মত, জীবনযাত্রার ক্ষোভও এক সুরে বাঁধা। ক্ষোভের জ্বালায় মাথার মধ্যে পর্য্যন্ত যেন ঝিম ঝিম করে, মাথা নাড়িয়া জোর দিয়া সে বলে, 'বুঝবে না, বুঝবে না, তুমি বুঝবে না মালতী।'

মালতী অবশ্য দরদের সঙ্গেই বলে, মানুষ যা বোঝে না মানুষকে তা বোঝাবার দরকার? কিন্তু মালতী তো বোঝে না এক ধরণের মানুষ আছে জগতে এক ধরণের দরদের সঙ্গে এক ধরণের রূঢ় কথা বলিলে যাদের স্নায়ুগুলি ফাঁসির আসামীর মত আড়ষ্ট হইয়া যায়—মনে হয় জীবন-কাহিনীর শেষ পরিচ্ছেদের শেষ পৃষ্ঠা আসিয়া গিয়াছে জীবনটার মাঝামাঝি।

আসলে নিন্দাপ্রশংসার কথা নয়, বোঝা না বোঝার প্রশ্ন নয়, অন্য মানুষকে খুন করিয়া ক্রমাগত ফাঁসি কাঠে আত্মহত্যা করিতে গেলে ক্ষোভ জাগিবেই। অনাবৃত বিবর্ণ কাঠের টেবিলে দামী প্যাড পাতিয়া সস্তা কলমের সাহায্যে একটা আন্তর্জাতিক মহাযুদ্ধে যত বাছা বাছা লোক মরে তার চেয়ে বেশী লোক মারিবার ফন্দি আঁটিতে থাকিলে এ বিপদটা অবশ্যম্ভাবী। মাথায় লাঠি মারিয়া এ যন্ত্রণার অবসান করিবার যদি কেউ থাকিত, ছাদটা হুড়মুড় করিয়া মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়িবার সম্ভাবনা যদি থাকিত, অন্ততঃ শকুন্তলাকে পাশে নিয়া যারা গাছতলায় ঝোপের আড়ালে ঝরা পাতা আর মরা ফুলের শয্যার উদ্দেশ্যে সত্য সত্যই উধাও হইতে জানে এবং পারে তাদের মধ্যে একজনও যদি সজোরে হর্ণ টিপিয়া বীভৎস প্যাঁক প্যাঁক শব্দে সতর্ক করিয়া দিতে দিতে মাডগার্ডের ধাক্কায় বিশ পঁচিশ হাত তফাতে গাছতলায় ঝোপের আড়ালে ঝরা পাতা আর মরা ফুলের শয্যায় ছিটকাইয়া দিত, ক্ষমতা থাকিলে গালাগালি দিবার ছলে সুশান্ত তাকে আশীর্ব্বাদ না করিয়া ছাড়িত না।

মোট কথা, মালতীর ফিরিয়া যাওয়ার সময় রোয়াকে না দাঁড়াইয়া থাকিলে মালতী আর ফিরিয়া আসে না।

সুশান্ত বাবাকে গিয়া বলে, 'মোটর-ড্রাইভিং শিখব বাবা?'

শিবনেত্র হইয়া তামাক টানাটা অনাথবন্ধুর স্বভাব। মুখের দিকে না চাহিলে বোঝা যায় না তার গাম্ভীর্য্য আসলে জড়বস্তুর প্রাণহীন আলস্যের নকলনবিশী। তবু মানুষটা তো জীবন্ত, রোজ আপিস যাতায়াত করেন। তাই ছেলের প্রস্তাবে থতমত খাইয়া রাগিয়া উঠিতে পারেন।

'যা শেখ গে মোটর-ড্রাইভিং,—দূর হয়ে যা।'

মোটর-ড্রাইভিং শিখিবে। ছোটছেলের খেলনার মোটরের মধ্যে যেটুকু বাস্তবতা আছে তার সঙ্গে পরিচয় করিতে যার দম বন্ধ হইয়া আসিবে, সে শিখিবে মোটর-ড্রাইভিং, সে করিবে মোটর হাঁকাইয়া অর্থোপার্জ্জন। তাছাড়া ভদ্রলোকের ছেলে অর্থোপার্জ্জন করিয়া মোটর হাঁকায়, মোটর হাঁকাইয়া অর্থোপার্জ্জন করে না। কষ্ট করিয়া মোটর-ড্রাইভিং শিখিবার কি দরকার, রিকসা টানুক না সুশান্ত? একই কথা, তাতেও পয়সা আসিবে। অমন পয়সা রোজগারের মুখে আগুন!

রাগে আগুন হইয়া অনাথবন্ধু স্নান করিতে গেলেন, আপিসের বেলাও তখন হয় নাই, সুশান্তর মার আপিসের রান্নাও শেষ হয় নাই। দেহে জল ঢালিলে মনের যে রাগের আগুন নিভিয়া যায়, অনাথবন্ধুর রাগটা সেই সেই সাধারণ পর্য্যায়ের। স্নান করিয়া ঠাণ্ডা হইয়া বসিয়া ছেলেকে তিনি ডাকিলেন।

'কোথায় শিখবি মোটর-ড্রাইভিং?'

'স্কুল আছে, মোটর-ড্রাইভিং-এর সঙ্গে মেক্যানিকাল ট্রেনিংও দেবে, ছমাসের কোর্স।'

অনাথবন্ধু আবার থতমত খাইয়া রাগিয়া উঠিলেন।

'মাইনে দিয়ে শিখবি? স্কুলে? তোর যত সব উদ্ভট খেয়াল।'

'তিন মাসেরও একটা কোর্স আছে বাবা, মাইনে বেশী নয়।'

'না না, ওসব মোটর-ড্রাইভিং শিখতে হবে না। একদিন আলু আনতে দিলে যে পাকা পটল কিনে আনে তার আবার মোটর ড্রাইভিং। মানুষ চাপা দিয়ে জেলে যাবি তো শেষে।'

আজ সকালেই বাজারে আলু কিনিতে গিয়া সুশান্ত পটল কিনিয়া আনিয়াছিল, পাকা শুকনো পটল। বাপের যুক্তিটা তাই অস্বীকার করা গেল না।

তবে শিবচরণের কাছে শিখিতে বাধা নাই। মোটর চালনায় তালিম দিতে শিবচরণের আগ্রহই দেখা গেল, খুঁত খুঁত করিল সে অন্যদিকে। পথের বাস্তবতার ছাপ মারা কর্কশ মুখের চামড়া খোঁচ করিয়া, কলহ কলরবে মজবুত কণ্ঠস্বরকে ভদ্র করিবার চেষ্টা করিয়া ভয়ে ভয়ে সে বার বার বলিতে লাগিল, চাকরী বাকরী না করিয়া এসব কেন?

'আমি ভাবলাম সখ করে শিখতে চান, নইলে গাড়ী চালান শিখে আপনার দরকারটা কি দাদা, এঁ্যা? একি ভদ্দরলোকের কাজ, এতে কি আর পয়সা আছে!' শিবচরণ ভীত চোখে চাহিয়া থাকে, আহা রোগা দুর্ব্বল বোনটাকে ভদ্রলোকের হাতে দিবার কল্পনা কি তার শেষ হইয়া গেল।

সুশান্ত বলে, 'চাকরীর চেয়ে তো পয়সা বেশী আছে।'

'কে বললে আছে, ওসব আজগুবি কথা মশায়, না জেনে অমন সবাই বলে। এগার বছর এ লাইনে আছি, আমি জানি না ভেতরকার খবর? উপায় থাকলে আমি তো দাদা একটা দিন গাড়ী হাঁকাতাম না। আদ্ধেক খাটুনির দাম ওঠে না, মানুষ এ লাইনে আসে।'

পরম ক্ষোভের চরম আঘাতে যে ঝোঁক চাপিয়াছে, শিবচরণের উপদেশে সেটা যাইবার নয়। কোনদিন সকালে কোনদিন বিকালে শিবচরণের সঙ্গে সুশান্ত বাহির হইয়া যায়, প্রথম মোটর গাড়ী চড়িবার আরামে গাড়ী চালানর সহজ ধরা বাঁধা কৌশলগুলিও একরকম কিছুই শেখা হয় না। শিখিবার ঝোঁকটা কিন্তু সমান থাকিয়া যায়। কয়েকদিন পরেই সখটা তার মিটিয়া যাইবে, ভদ্রত্বের স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিবার জন্য আর সে আবদার ধরিবে না, —শিবচরণের এই আশাটা যেন সফল হইবে না মনে হয়।

সুশান্ত বলে, 'এমন কি মন্দ রোজগার? বেশ তো আরামের কাজ।'

শিবচরণ বলে, 'শুনুন, একটা কথা বলি আপনাকে। এসব কাজের জন্যে একটু কাটখোট্টা শক্ত শরীর দরকার হয়, আপনার কি জানেন তেমন জোরাল শরীর তো নয়, মানে ভদ্রলোকের দেহ তো আপনার, এসব কাজ আপনার পোষাবে না।'

শিবচরণ অবশ্য দরদের সঙ্গেই কথাগুলি বলে, কিন্তু মালতীর মত সেও বোঝে না একধরণের মানুষ আছে জগতে একধরণের দরদ দিয়া একধরণের

রূঢ় কথা বলিলে যাদের স্নায়ু ফাঁসির আসামীর মত উত্তেজিত হইয়া ওঠে। আর সে উত্তেজনা কাজে না লাগায় বড় কষ্ট পায়।

এক মাস সুশান্ত ধৈর্য্য ধরিয়া খেয়াল মাফিক মোটর চালান শেখে। মন দিয়া উৎসাহের সঙ্গে শেখে, কিন্তু এক মাসে অভিজ্ঞতা জন্মে যেন মোটে এক দিনের। পথের বাস্তবতা ধুলাবালি আবর্জনার চেয়ে নোংরা, অসংখ্য মানসিক ব্যাধির বীজাণুতে বোঝাই। শিবচরণের মত অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন পাকা যোদ্ধাকে সম্মুখে রাখিয়া একরকম দর্শক হিসাবেই সুশান্ত জীবনের এই প্রকাশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে নামে, তবু এক মাসেই হৃদয় মন ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়। ব্যাপারটা সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না—একটা আদর্শ টিঁকে না, একটা থিয়োরি খাটে না, একটা সখ বা সংস্কার স্থায়ী প্রশ্রয় পায় না, এ কোন জগৎ? সেই বা এতদিন এমন কিসের আড়ালে বাস করিয়াছে যে পথে ভাড়াটে মোটরে ভাড়াটের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ানকে বাঘ ভাল্লুক দৈত্য দানবের ভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে অবিরাম ছুটিয়া পালানর মত মনে হয়। তার বাড়ীতে পথের বাস্তবতা চিরদিন ছিল, এখনও আছে, পায়ে পায়ে পথের ধূলা যেমন অন্তঃপুরে প্রবেশ করে, তেমনিভাবে পথের বাস্তবতা মনে মনে প্রতিদিন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে, পথের ধুলার মত এই বাস্তবতাকেও তাই ঝাঁটাইয়া ফেলিবার ব্যবস্থা দরকার হয়, সকাল সন্ধ্যা ঘর ঝাঁট দিলেও যেমন আনাচে কানাচে পথের ধূলা থাকিয়া যায়, শত ব্যবস্থার মধ্যেও পথের বাস্তবতাও তেমনি আনাচে কানাচে আশ্রয় খুঁজিয়া পায়। তবে চাহিয়া না দেখিলে চোখে পড়ে না। দেখিতে না জানিলে চাহিয়া দেখা যায় না। শুধু অস্বীকার করিয়া যাওয়া চলে।

এক মাসে সুশান্ত এতখানি দার্শনিক জ্ঞান সঞ্চয় করে। প্রশস্ত রাজপথে, আঁকা বাঁকা সরু গলিতে শিবচরণের মোটর চালানর নির্ভয় নিশ্চিন্ত নিপুণতা আজকাল তাকে বড় ক্ষুব্ধ করিয়া তোলে, সে বুঝিতে পারে এভাবে এজীবনে এমন নিখুঁত মোটর চালান সে আয়ত্ত করিতে পারিবে না। এমন কি শিবচরণের হাতে গাড়ীর হর্ণ যেমন বাজে, তার হাতে কোনদিন সেভাবে বাজিবে না। কতবার কতভাবে সুশান্ত হর্ণটা বাজাইয়া দেখিয়াছে, প্রত্যেকবার মনে হইয়াছে সুর কাটিয়া গেল, আওয়াজটা জমিল না।

তবে একটা যা ব্যাপার ঘটে, সুশান্ত কোনদিন কল্পনা করিতে পারে নাই।

মালতীর মৃদু, অসহায় একটানা আনন্দের মধ্যে হঠাৎ সে যেন একদিন ঢেউএর আবির্ভাব অনুভব করিতে পারে। জড় পদার্থ ছাড়া যতটুকু প্রাণের অস্তিত্ব আর কিছুর মধ্যেই বোধগম্য হইবার নয়, ততটুকু পুলকের আতিশয্যও মালতীর মধ্যে অসাধারণ। হাত ধরিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া মালতী বিস্ময়ের সঙ্গে বলে, 'এক মাস গাড়ী চালাতে না চালাতে হাতে ফোস্কা পড়ে গেল?'

সুশান্ত কৈফিয়ৎ দিবার ভঙ্গিতে বলে, 'প্রথম প্রথম—'

মালতী অধীর ব্যাকুলতার সঙ্গে বলে, 'পড়ুক, পড়ুক, ফোস্কা পড়াই ভাল—সমস্ত হাতে ফোস্কা পড়ুক।' বলিয়া ধীরে ধীরে মাথা নাড়িতে থাকে: 'বুঝবে না, বুঝবে না, তুমি বুঝবে না।'

কারণে অকারণে মোটরের হর্ণ বাজাইলেই হাতে চিরদিন ফোস্কা পড়ে না—পথিককে সতর্ক করার জন্য কে তবে হর্ণ বাজাইত, মোটরের জন্য অন্য ব্যবস্থা থাকিত। কিন্তু সুশান্ত স্পষ্ট বুঝিতে পারে, শব্দের অর্থ রূপান্তর গ্রহণ করিতেছে। কাগজে যেভাবেই হর্ণ বাজানর কথা সে লিখুক, শকুন্তলা সঙ্গে সঙ্গে আগের মত অভদ্রভাবে মনের মধ্যে বিচরণ করিতে ছুটিয়া আসে না। তাকে চেষ্টা করিয়া আনিতে হয়। আনিলেও পরাশরের সত্যবতীর মত তার জন্য কিছু কিছু কুয়াশা মনের মধ্যে সৃষ্টি করিয়া রাখিতে হয়।

এক মাস পরে তাই আবার একদিন সুশান্ত সস্তা কলমে কালি ভরে। দামী প্যাডের লেখা পাতাটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আবার লিখিতে আরম্ভ করে।

মোটর বললে, প্যাক।

হাঁসও বললে, প্যাক।

মোটর থামিয়ে মাংস খেলাম। হাঁসটার মাংস শক্ত, কিন্তু শকুন্তলা চমৎকার রান্না করে। মাংসের গন্ধে অদূরের গাঁ থেকে গোটা দুই কুকুর এসে খানিক দূরে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়তে লাগল। গাছতলায় কাঁটা ঝোপের আড়ালে ঝরাপাতা আর মরামুকুলের শয্যায় বসে তাদের নিঃশব্দে আবেদন দেখতে দেখতে মনে হল, বিধাতা তো শুধু শকুন্তলার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেই ভাষা দেননি! বোবা কিছু সৃষ্টি করা কি বিধাতার ক্ষমতার বাইরে?

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতীয় জাতীয়তার জন্ম *

রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌রা সাধারণত বলে থাকেন যে সমগোষ্ঠী ও সমস্বার্থভাব, অভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অবর্ত্তমানে জাতীয় ঐক্যবোধের উদ্ভব হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জাতীয়তার এই সব উপাদান লক্ষ্য করা যায় বটে; কিন্তু জাতীয়তার মূল কারণ হচ্ছে বহুজনের আত্মীয়ভাব ("we-feoling"), সে আত্মীয়ভাব যে উপায়েই উদ্ভূত হোক্ না কেন। ফরাসী মনস্বী রেঁণা বলেছিলেন যে জাতীয়তার সংজ্ঞা দিতে হলে জাতীয়তাবোধের কথাই বলতে হয়, মিলনগ্রন্থির যে কি উপাদান তা স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। যে কারণেই হোক্, আমাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ থাকলেই আমরা নিজেদের একজাতি বলে প্রচার করতে পারি।

কিন্তু ইতিহাসের সঙ্গে সামান্য পরিচয়েই আমরা বুঝ্‌তে পারি যে আমাদের চিন্তা, আমাদের বোধ, সমাজনিরপেক্ষ নয়। জাতীয় ঐক্যের বাস্তবক্ষেত্র প্রস্তুত হওয়ার পূর্ব্বে আমরা জাতীয় ঐক্যের কথা ভাবতে পারি না। এই কারণেই দেখা যায় যে ইতিহাসে জাতীয়তার জন্ম হয়েছে বিলম্বে। যে কোন ছাত্র বলতে পারবে যে আমরা যে অর্থে 'জাতি' কথাটি ব্যবহার করি, সে অর্থে জাতির উদ্ভব সম্প্রতি হয়েছে। লর্ড অ্যাকটন্ বলেছিলেন যে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে পোলাণ্ডকে যখন প্রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া আর রাশিয়া ভাগাভাগি করে নিয়েছিল, তখন থেকে জাতিবোধের পত্তন হয়েছে। তাঁর মত যে আমাদের মেনে নিতে হবে, এমন কোন কথা নেই; কিন্তু জাতিবোধ যে ইতিহাসে বহুপূর্ব্বে দেখা দেয় নি, তা নিঃসন্দেহ। ষোড়শ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের বিশেষ ভৌগলিক, রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির জন্য সেখানে জাতীয়ভাবের উৎপত্তি হয় বটে; কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে জাতীয়তার গুরুত্ব সম্বন্ধে সজাগ হওয়ার তেমন প্রয়োজন ছিল না। বিপ্লবের তুমুল তাণ্ডবের মধ্যে, সামন্তশাসনের ভস্মস্তূপ থেকে ফরাসী জাতীয়তার জন্ম হয়। জার্ম্মাণ জাতিবোধের প্রথম প্রকাশ হয় নেপোলিয়নের

* নিখিল বঙ্গ ছাত্রছাত্রী সাহিত্য সম্মেলনে ইতিহাস শাখার সভাপতির অভিভাষণ।

আক্রমণ, প্রাশিয়ার প্রতিরোধ চেষ্টা আর ফিখ্‌ট্যে প্রভৃতির বক্তৃতাতে। তারপর ইটালিয়ান, স্লাভ প্রভৃতিরা জাতিসত্তার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে ঊনবিংশ শতক হচ্ছে জাতীয়তার যুগ; প্রাচ্যদেশগুলিও তার ছোঁয়াচ এড়াতে পারেনি।

আমাদের দেশে জাতীয়তাবোধ কখন্ ও কি ভাবে দেখা দিয়েছে, এ প্রশ্নের আলোচনা প্রয়োজন। অবশ্য যাঁরা আমাদের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের বিরোধী বা আস্থাহীন, তাঁরা বলে থাকেন যে এদেশে জাতীয়তার উপাদানসমূহের একান্ত অভাব আছে। তাঁদের মতে ভারতবর্ষ হচ্ছে একটা ভৌগলিক আখ্যা মাত্র; সমাজে, রাষ্ট্রব্যবস্থায়, শিল্পোৎপাদন-পদ্ধতিতে বহু বৈষম্যের ফলে জাতীয় ঐক্যবোধ সম্ভব হয়নি, বৈচিত্র্য হয়েছে জাতীয়তার প্রতিবন্ধক।

এ সিদ্ধান্ত যে ভ্রান্ত, তা অন্তত ভারতের আধুনিক ইতিহাস প্রমাণ করেছে। বৈষম্যের মধ্যে সাম্য দেখতে না পাওয়া হচ্ছে অন্তর্দৃষ্টির অভাবের পরিচয়; যে শুধু গাছ দেখে, বন দেখে না, তাকে অন্ধ বলা চলে। ভারতের মূলগত ঐক্য সম্বন্ধে কয়েকজন সুপ্রতিষ্ঠ লেখক আলোচনা করেছেন। বিশেষতঃ ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তাঁর "The Fundamental Unity of India" ও "Nationalisn in Hindu Culture" পুস্তকে বহু উদাহরণ দেখিয়ে ঐ ভ্রান্ত মত খণ্ডন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে ভারতবর্ষের তীর্থ, দেবায়তন, চৈত্য, পূত নদনদী, প্রাচীন হিন্দুদের ভৌগলিক জ্ঞান, জন্মভূমিপ্রীতি—এ সবই দেশের আভ্যন্তরীণ ঐক্যের সাক্ষ্য দেয়। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের সময় থেকে মারহাট্টাদের যুগ পর্য্যন্ত ভারতের ইতিহাসে ঐক্যসূত্রের সন্ধান অনেকে পেয়েছেন। প্রমথনাথ বসু মহাশয়ের মত অনেকে আবার আরও অগ্রসর হয়ে বলেছেন যে ভারতবর্ষ রাষ্ট্রিক জাতিবোধ সম্বন্ধে ব্যস্ত হয়নি, সংস্কৃতি বিষয়ে জাতিবোধ বহুদিনই ছিল, পশ্চিমের সংস্পর্শে তা নষ্ট হয়েছে। "The Soul of India" পুস্তকে বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় প্রায় একই ধরণের কথা বলেছেন। তাঁর মতে ইয়োরোপে জাতীয়তার ভিত্তি হচ্ছে রাষ্ট্রিক স্বাতন্ত্র্য, আর এদেশে হচ্ছে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরস্পর মৈত্রী; মুসলমান শাসনে ভারতীয় ঐতিহ্য ব্যাহত হয় নি, ইংরেজ শাসনে হয়েছে। কিন্তু বাস্তবের দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের দেশের ইতিহাস পড়লে মনে হয় যে ঐরকম মত সম্পূর্ণ গ্রাহ্য করা যায় না। বিপিনবাবু প্রভৃতি

লেখকের সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলা যায় যে তাঁদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে "wish-fulfilment" ; তাঁরা মনে মনে যা চেয়েছেন, তাকে ঐতিহাসিক পোষাক পরিয়েছেন। অবশ্য একথা অস্বীকার করা চলে না যে বহুকাল ধরে সমগ্র ভারতবর্ষে সংস্কৃতি বিষয়ে ঐক্য চলে এসেছে ; দ্রাবিড়দেশেও কোন বিশেষ স্বাতন্ত্র্য দেখা যায় নি। কিন্তু একথা স্বীকার করলেও আমরা আজ ভারতীয় জাতীয়তা বলতে যা বুঝি, তার উৎপত্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করতে পারব না। হিন্দুস্থান শুধু হিন্দুর বাসভূমি নয় ; ভারতের জাতীয়তা শুধু হিন্দুর জাতীয়তা নয়। হিন্দু-ভারতে জাতিবোধের বহু উপাদান আছে বটে ; কিন্তু অধিকাংশ ভারতীয় মুসলমানের সঙ্গে হিন্দুদের রক্তের তফাৎ না থাকলেও ধর্ম্মবৈষম্য, জাতিভেদ, বিজয়গর্ব্ব আর অত্যাচারের স্মৃতি মিলে দুই সমাজের মধ্যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। ভারতীয় জাতিবোধের জন্ম কবে হল, এ প্রশ্নের উত্তর শুধু হিন্দু-ভারতের ইতিহাস দিতে পারবে না।

২

অনেকের মতে পাশ্চাত্য সংস্পর্শ হচ্ছে আমাদের জাতীয়তাবাদের মূল কারণ। ব্যাপক অর্থ ধরলে এ মতকে মানা অসঙ্গত নয়। ন্যাশনালিজ্‌মের যে কোন স্বদেশী প্রতিবাক্য নেই, তা বহুবার শোনা গেছে। মহাযুদ্ধের সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহুল প্রচারিত "ন্যাশনালিজম্‌" বক্তৃতায় বলেছিলেন যে জাতীয়তা শুধু ভারতীয় ঐতিহ্যের পরিপন্থী নয়, বিশ্বমানবের সভ্যতার পক্ষেও হানিকর। ইংরেজ শাসনের ফলেই যে ভারতে জাতীয়তা দেখা দিয়েছে, তাঁর এই কথাটিই আমাদের আলোচনায় প্রাসঙ্গিক। অনেকেরই মতে ইংরেজী শিক্ষা আমাদের জাতিবোধ জাগিয়েছে ; এখানে জাতীয়তার প্রথম যুগে ম্যাগ্‌না কার্টা, হ্যাম্প্‌ডেনের বক্তৃতা, ডেনমানের রায় ইত্যাদি থেকে উদ্ধৃতি প্রায়ই দেখা যেত। আরও বলা চলে যে ইংরেজী শিক্ষার ফলে বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষিতশ্রেণী নিজেদের বক্তব্য পরস্পরকে বোঝাতে পারত, ইংরেজী সংস্কৃতির একটা বিশিষ্ট অপভ্রংশ তারা ধার করতে পেরেছিল, আর পাশ্চাত্য ইতিহাস থেকে জাতীয়তা সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছিল। এর ফলে রাষ্ট্রে ও সমাজে সংস্কার সাধনের জন্য তারা উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়েছিল, এমন কি তারা শীঘ্রই বুঝেছিল যে

স্বায়ত্তশাসনের অভাবে সমাজের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন সংস্কারও সম্ভব হয় না। ইংরেজী শিক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা করলে আর একদিক থেকে দেখা যায় যে বিজাতীয় প্রভাব থেকে মুক্তি পাবার জন্য ব্রাহ্মসমাজ, আর্য্যসমাজ ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধর্ম্মান্দোলন আরম্ভ হয়, ধর্ম্মের আবরণ সত্ত্বেও জাতিবোধ দেশে অগ্রসর হতে থাকে।

কিন্তু সহজে জটিল প্রশ্নের উত্তর মিলবে আশা করা ভুল। ইংরেজী শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের সঙ্গে জাতীয়তায় উদ্ভব হয়েছে বলা চলে না। প্রথম যুগের ইংরেজী শিক্ষিতেরা পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে এতই দৃঢ়প্রত্যয় ছিলেন যে তাঁদের পক্ষে যথার্থ স্বাদেশিকতা ও জাতিবোধ একরকম অসম্ভব ছিল। পরবর্ত্তী যুগে শিক্ষিতেরা শাসনসংস্কারের জন্য আবেদন আরম্ভ করেন, সিভিল সার্ভিসের বড় চাকরীতে দেশের লোকের প্রবেশাধিকারের জন্য ব্যস্ততা দেখান, লাটবেলাটের কাউন্সিলে সভ্যপদের জন্য আন্দোলন করেন। কিন্তু তাঁদের জাতিবোধ তখনও অসম্পূর্ণ ; তাঁরা তখনও দেশের শাসনব্যবস্থায় কর্ত্তৃত্বের দাবী করেননি। যে-জাতীয়তা রাষ্ট্রশক্তি অধিকারের সংকল্প ও উদ্যোগ করে না, সে জাতীয়তা হচ্ছে পঙ্গু। বিদেশী প্রভুত্বকে অপসারণ করার কথা প্রচার করার সময় থেকেই জাতীয়তা পূর্ণাঙ্গরূপে দেখা দিয়েছে। শিক্ষিতেরা যখন বুঝল যে শাসনকর্ত্তৃত্ব বিদেশীর হাতে থাকায় তাদের শ্রেণীস্বার্থের হানি হচ্ছে, তখনই তারা যথার্থ জাতীয়তাবাদী হতে লাগল, তখনই রাষ্ট্রব্যাপারে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব ফলপ্রদ হল। ইংরেজী শিক্ষা ভারতে জাতীয়তাবাদের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে বটে ; কিন্তু এক বিশেষ অর্থনৈতিক আবেষ্টনের মধ্যেই সে প্রভাব সম্ভব হয়েছে।

৩

এই প্রসঙ্গে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা প্রয়োজন। সাভারকার প্রমুখ কয়েকজন তথাকথিত সিপাহী বিদ্রোহকে জাতির স্বাধীনতাসংগ্রাম বলেছেন ; কিন্তু তাঁদের মতকে অত্যুক্তি বলতে হবে। বিদ্রোহ যে ইংরেজ প্রভুত্ব দূর করার প্রথম বিরাট প্রচেষ্টা, ভারতের জাতিবোধের প্রথম প্রকাশ, তা বলা ভুল নয়। ১৮৫৭ সালের পূর্ব্বেই

বাংলা-বিহারের সাঁওতালদের মত অনেকে বিচ্ছিন্নভাবে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে লড়েছিল। তখন সমস্ত উত্তর ভারতের চাষীরা বিক্ষুব্ধ ছিল; কেবল পল্লীসমাজের স্বতন্ত্র জীবনধারা ও শাসনশৃঙ্খলায় অভ্যস্ত ছিল বলে তারা একত্র হয়ে বিদ্রোহ করার শক্তি অর্জ্জন করতে পারেনি। তাদের অভাব ছিল নেতৃত্বের। পররাজ্যগ্রাসপটু ইংরেজ সরকারের চাতুর্য্য ও শক্তি যে-সব সামন্ত-তান্ত্রিকদের অপ্রসন্ন করেছিল, তারাই অসহায় প্রজামণ্ডলীর অসন্তোষের সুযোগ নিয়ে বিদ্রোহের নেতৃত্বস্থান অধিকার করেছিল। বিদ্রোহে যে উত্তর ভারতের জনসাধারণের সহানুভূতি ও সমর্থন ছিল তা নিঃসন্দেহ।

কিন্তু জাতীয়তার প্রথম প্রকাশ হিসাবে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে দারুণ অপরিণতির লক্ষণ অনেক ছিল। অধিকাংশ নেতার উদ্দেশ্য ছিল মোগল ও মারহাট্টাদের সামন্ততন্ত্রী শাসন পুনরুদ্ধার করা; অথচ সামন্তশাসনে জাতীয়তার প্রসার অসম্ভব। সামন্ততন্ত্রীদের মধ্যে প্রধানত নিজাম ও শিখেরা ইংরেজের শক্তি দেখে কাপুরুষের মত বিদেশীর পক্ষ সমর্থন করেছিল, আর তাদের প্রতিপক্ষ দেশে পাশ্চাত্য প্রভাব ও পাশ্চাত্য ব্যবস্থার উপদ্রব দেখে ইতিহাসের চাকাকে আটকে রাখার বৃথা চেষ্টা করেছিল। ভারতীয় সমাজের আসল কাঠামো ইংরেজ রাজত্বে ভেঙে গেছ্‌ল; ভারতবর্ষ তার প্রাচীন জীবন হারিয়ে নতুন জীবনের সাক্ষাৎ তখনও পায়নি। কিন্তু নির্ম্মম পরাজয় সত্বেও বিদ্রোহীরা এক বিষয়ে বিশেষ সাফল্য লাভ করেছিল; ইংরেজ আমলে কৃষির অবনতি, লোলুপ সাম্রাজ্যগর্ব্বীদের স্বার্থরক্ষার জন্য ভারতীয় শিল্পের বিনাশ, জনসাধারণের দুর্গতি বৃদ্ধি, অনভ্যস্ত বিধিব্যবস্থার প্রবর্ত্তন প্রভৃতি নানা অসন্তোষকে তারা একত্র করেছিল। তাই আমাদের জাতীয়তার ইতিহাসে সিপাহী বিদ্রোহের গুরুত্ব খুব বেশী।

৪

কয়েকজন লেখক আমাদের জাতীয়তার উদ্ভব সম্বন্ধে অর্থনৈতিক কারণের আলোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা প্রায় সকলেই বর্ণনা করেছেন, বিশ্লেষণ করেননি, মুখ্য গৌণ বিচার করেননি, ইতিহাসের কোন ঘটনাই যে আকস্মিক নয়, সেকথা বোঝার চেষ্টা করেননি। সাধারণত বলা হয় যে একপ্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে যাতায়াত ও ভ্রমণ সুকর হওয়ায় প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতার স্থলে জাতীয় ঐক্যবোধ সম্ভব হয়েছে, সুদূর সীমান্তেও ভারতবাসী তার ভারতীয়ত্ব অনুভব করতে পেরেছে। বিরাট দেশের মধ্যে এই ঐক্যবোধ বিস্তারের ফলে আর এদেশকে একটা ভৌগলিক আখ্যামাত্র বলা চলে না। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে ঘাতপ্রতিঘাতে ভারতবর্ষে আরও মুলগত পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়েছিল। ১৮৫৩ সালে "নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউন" পত্রে কার্ল্ মার্ক্স্ ভারতে ইংরেজ শাসন সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তার অনুসরণ করে আমরা বলতে পারি যে হিন্দুস্থানের সমাজবিপ্লবে ইংরেজ শত অপরাধ সত্বেও ইতিহাসের হাতিয়ার হয়ে কাজ করেছে।

লালা লাজপত রায় তাঁর বিখ্যাত "Young India" পুস্তকে বলেছিলেন যে ভারতীয়দের সহজাত দেশপ্রেমের চেয়ে ইংরেজ শাসন ও শিক্ষাব্যবস্থা, তাদের সংবাদপত্র, আইন আদালত, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, ডাকঘর, ষ্টীমার প্রভৃতি জাতীয়তা স্ফুরণে কম সাহায্য করেনি। অর্থাৎ হয়তো অজ্ঞাতসারেই ইংরেজ জাতীয়তার বাস্তব ভিত্তি স্থাপন করেছে। একটু লক্ষ্য করলেই আমরা বুঝব যে ভারতে শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে আমাদের জাতীয়তার ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে। প্রথম যুগে ভারতীয় শিল্পকে নষ্ট করলেও ইংরেজ পরে এখানে আধুনিক কলকারখানা বসাতে বাধ্য হয়েছিল। কংগ্রেস প্রথমে নিতান্ত নরমপন্থী ছিল; কিন্তু যখন ক্রমেই বিদেশী ধনিকদের শোষণনীতি পরিস্ফুট হতে লাগল, যখন ভারতবাসী বুঝল যে দেশের শিল্পে তাদের অধিকারে বিদেশী হস্তক্ষেপ করে চলেছে, তখনই কংগ্রেসের সুর গরম হল, জাতীয় অনুভূতি প্রবলতর হল। ১৮৫৩ সালে মার্ক্স্ লিখেছিলেন: "বিলাতের কারখানার মালিকেরা সস্তায় তুলা ও অন্যান্য কাঁচা মাল যোগাড় করার উদ্দেশ্যেই ভারতবর্ষে রেলপথ বিস্তার করতে চেয়েছে। কিন্তু যে দেশে লোহা আর কয়লার খনি আছে, সে দেশের যানব্যবস্থায় একবার যন্ত্রের প্রবর্ত্তন হলে সেখানে আর যন্ত্রনির্ম্মাণকে প্রতিরোধ করা যায় না। একটা বিরাট দেশে রেলপথের শাখাপ্রশাখা বজায় রাখতে গেলে রোজকে রোজ যা দরকার তা সরবরাহের জন্য কারখানা চাই। এর ফলে যে সব শিল্পের সঙ্গে রেলপথের কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নেই, তাদের চাহিদা মেটাবার জন্য কলকব্জার প্রচলন বাড়বে। তাই

রেলপথের ব্যবস্থা সত্যই ভারতবর্ষে আধুনিক কলকারখানার অগ্রদূত হবে।" এখানে বৈজ্ঞানিক শিল্পব্যবস্থা প্রবর্ত্তনে সাম্রাজ্যতন্ত্রের বহু বাধা সত্ত্বেও, মার্ক্‌সের এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রায় সফল হয়েছে। ভারতের জাতীয়তা বাস্তবিক তখনই জন্ম নিল যখন এদেশের মধ্যবিত্তশ্রেণী বুঝেছিল যে দেশের শাসনকর্ত্তৃত্ব না থাকলে শিল্পোন্নতির ফল পরহস্তগত হতে বাধ্য।

এ কথা মনে রাখলে আমরা জাতীয়তাবাদের উপর রমেশচন্দ্র দত্ত, দাদাভাই নৌরজী, বামনদাস বসু প্রভৃতির অর্থনৈতিক প্রবন্ধাদির প্রভাবের কারণ জানতে পারব। কি ভাবে বহুদিন ধরে বিদেশীরা এদেশের অর্থ লুটে নিয়ে গেছে, তার পরিচয় পেয়ে জাতীয় আন্দোলন দ্রুত অগ্রসর হতে পেরেছে। ইংরেজ শাসনে দেশের টাকা বিদেশে ক্রমাগত চালান হয়েছে। ইংরেজদের আগে যারা ভারত জয় করেছিল, তাদের সময় অন্তত দেশের টাকা দেশেই থাকত। নানা ফন্দিতে ইংরেজ এদেশের টাকা বিলাতে পাঠিয়েছে; তারা ভারতবর্ষের উপর যে সরকারী দেনা চাপিয়েছে, তার অধিকাংশই আমাদের ঘাড়ে নেবার কোন সঙ্গত কারণ নেই। এ ছাড়া অবশ্য আছে বিদেশী ব্যবসায়ীর মোটা মুনফা; গঙ্গার দুধারের পাটকলগুলি কুলিদের দেড়শ' টাকা দিলে অন্তত বারশ' টাকা স্কটলাণ্ডে পাঠিয়ে থাকে। উনবিংশ শতকের শেষ দিকে দেশের টাকা বাইরে যাওয়া সম্বন্ধে আমরা বিশেষ সজাগ হয়ে উঠেছিলাম। তা'ছাড়া সিপাহীবিদ্রোহের পর থেকে ইংরেজ সৈনিকের সংখ্যা খুব বাড়ানোর ফলে মিলিটারী বাজেট ফেঁপে ওঠে, বিদেশীশাসন আমাদের আরও অসহ্য লাগে।

৫

বিদেশীশাসন শুধু যে আমাদের আত্মমর্য্যাদায় আঘাত দিচ্ছে, তা নয়, আমাদের স্বত্বকে পর্য্যন্ত হস্তগত করছে—এই ধারণা স্পষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় আন্দোলন এগিয়ে চলেছে। কংগ্রেস তাই আর পূর্ব্বের মত কেবল দেশের লোকের জন্য কতকগুলো চাকরী দাবী করে ক্ষান্ত হল না; কংগ্রেস চাইল অর্থনৈতিক ব্যাপারে স্বাধীনতা, দেশের আয়ব্যয়ের উপর কর্ত্তৃত্ব। স্বদেশী শিল্পের উন্নতির জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন আরম্ভ হল। অন্য দিকে

দেখা যায় যে ১৯২৪ সাল পর্য্যন্ত ইংরেজ সরকার ইংলণ্ড থেকে, বিশেষত ল্যাঙ্কাশায়ার থেকে আমদানী সম্বন্ধে বিশেষ ব্যাকুল ছিল; এমন কি আমদানীর উপর শুল্ক বসানো হলেও ল্যাঙ্কাশায়ারকে সাহায্য করার জন্য দেশী সুতা ও কাপড়ের উপর বিশেষ কর চাপিয়েছিল। আরও লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে ল্যাঙ্কাশায়ারের দরকারী তুলা সরবরাহের জন্য ইংরেজ সরকার পূর্ত্তকার্য্যের ব্যবস্থা প্রধানত পাঞ্জাবের মত যেখানে তুলা উৎপন্ন হয় এমন প্রদেশে করেছে। কিন্তু জাতীয়তার শক্তিকে বেশীদিন আটকে রাখা চলেনি; নানা উপায়ে এখানকার লৌহশিল্পকে সাহায্য আর কিছুকাল ধরে ল্যাঙ্কাশায়ারের কর্ত্তাদের অগ্রাহ্য করে দেশী কাপড়ের কলগুলিকে দেশ সাহায্য করেছে।

আমাদের জাতীয় সংগ্রামের প্রতি প্রধান আন্দোলনের সঙ্গে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যাবে। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চলেছিল, তার স্বদেশী আন্দোলন বলেই প্রসিদ্ধি বেশী। মহাযুদ্ধের সময় যে অর্থনৈতিক বিপর্য্যয় ঘটেছিল, তারই ফলে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ আন্দোলনে জনসাধারণের যোগদান সম্ভব হয়েছিল। ১৯২৯-৩০ সালে সারা পৃথিবীতে অর্থনৈতিক সঙ্কট আরম্ভ হয়; আমাদের দেশের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য অর্দ্ধেক হয়ে যায়, রূপার কদর কমার ফলে গরীব চাষীমজুরের সামান্য সঞ্চয় তুচ্ছ হয়ে পড়ে আর সরকারী মর্জ্জিতে টাকার দর বাঁধা হওয়ায় দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়। এমন অবস্থায় যে মহাত্মা গান্ধী আবার ইংরেজ সাম্রাজ্যতন্ত্রকে সন্ত্রস্ত করতে পেরেছিলেন, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।

সুতরাং বলা যেতে পারে যে ইংরেজী শিক্ষার প্রচার, ভারতীয়ে আর ইংরেজে চাকরী নিয়ে ঝগড়া, রেলে ষ্টীমারে ইংরেজের হাতে ভারতীয়ের লাঞ্ছনা, অস্ত্র আইন প্রভৃতি ব্যাপারকে অর্থনৈতিক সম্বন্ধে না ফেলতে পারলে জাতীয়তার জন্ম বিষয়ে আমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণ হবে না। প্রকৃত জাতীয়তার পক্ষে দরকার শুধু জাতীয় ঐক্যবোধ নয়, জাতির বাস্তব স্বার্থের সঙ্গে সে ঐক্যবোধের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। মাত্র ঐক্যবোধে যদি জাতীয়তা গঠন করা চলত, তা'হলে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষী যে স্বার্থনিরপেক্ষ ঐক্যবোধ প্রচার করেছেন, তা বিফল হত না। তাঁদের প্রচার ব্যর্থ হওয়ার একটা কারণ এই যে ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাঁরা

যে একটা বিশেষ আধ্যাত্মিক লক্ষ্য দেখেন, তাকে ধরাছোঁয়া যায় না; আর আধ্যাত্মিক ব্যাপারে ভারতবাসীদের যে প্রায় একচেটে অধিকার, তা বিশ্বাস করা শক্ত। তা ছাড়া হিন্দু অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে এই মার্জ্জিত ভারতপ্রীতির যে নিবিড় সম্পর্ক আছে, তার ফলে মুসলমানদের পক্ষে ঐ ধরণের জাতিবোধ অনুভব করা বিশেষ দুরূহ। একমাত্র অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর জাতীয়তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টানকে একত্র আনা যাবে। এই আন্দোলনের ফলে আমরা দেখেছি যে আমাদের জাতীয়তা এপর্য্যন্ত অর্থনীতির বাস্তব ভিত্তি বিনা সুপ্রতিষ্ঠ হ'তে পারেনি; সুতরাং আজও জাতীয়তার সঙ্গে দেশের জনগঠনের স্বার্থের কি সম্পর্ক তা পরিষ্কার না করতে পারলে আমাদের মুক্তি আন্দোলন দুর্ব্বল হয়ে পড়বে।

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই মধ্যবিত্তশ্রেণী জাতীয় আন্দোলনের পুরোধা হয়েছে। আমাদের দেশেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। বিদেশীর শোষণ-নীতি তাদের জাতিবোধকে জাগ্রত করেছে, মুক্তিসংগ্রামে প্রবুদ্ধ করেছে। কিন্তু ক্রমেই জাতীয় আন্দোলন এমন এক স্তরে উপস্থিত হচ্ছে যখন দেশের জনগণ কেবল বিদেশী নয়, স্বদেশী ধনিকদের বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে চাইবে, জাতীয় জীবন পুনর্গঠনের ভার অর্থবানদের হাতে ছাড়তে রাজী হবে না। জাতীয় আন্দোলনের প্রতি অধ্যায়েই তাই তদানীন্তন অর্থনৈতিক পরিস্থিতির স্পষ্ট প্রভাব রয়েছে। আমাদের জাতীয় আন্দোলনকে ব্যাপক ও বলীয়ান করতে হলে একথা ভুললে চলবে না। সুতরাং আজ হিন্দু-ভারতের ঐক্যবোধ সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন কম; যে দুর্জ্জেয় আধ্যাত্মিকতাকে ভারতীয় জীবনের সারবস্তু বলে প্রচার করা হয়, সে কথা না বলাই বোধ হয় শ্রেয়। ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে যে সমাজব্যবস্থায় প্রকৃতি ও আদর্শ প্রধানত অর্থনৈতিক কারণেই নির্ণীত হয়ে থাকে। মানুষ অবশ্য ইতিহাসের হাতে কলের পুতুল একেবারেই নয়: "Men make history, but not as they please"।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ভারতপথে *

(১৫)

হাতীটা হাঁটু গেড়ে বসেছিল; মেটে রঙ, সবার থেকে আলাদা, যেন আর একটা পাহাড়। ওঁরা মই বেয়ে উঠলেন আর আজিজ উঠল শিকারীদের মতন প্রথম গোড়ালির ধার তারপর গোল ক'রে মোড়া ল্যাজে ভর দিয়ে। চাকরেরা ল্যাজের এক দিক ধ'রে ছিল; মহম্মদ লতিফের উঠবার পালা যখন এল তারা দিল তা ছেড়ে, বেচারি তো পড় পড়, কোনোরকমে জানোয়ারটার পিছনে যে জাল ছিল তা আঁকড়ে সে রইল। চাকরদের অবশ্য শেখানো ছিল, একটু রঙ্গরসের জন্যে। কিন্তু যাঁদের জন্যে এরকমটা করা হোলো তাঁদেরই লাগল সব চাইতে খারাপ—অর্থাৎ ঐ মহিলা দুটির। এই জাতীয় ঠাট্টা মোটে তাঁরা পছন্দ করতেন না। তারপর হস্তীপ্রবর দুবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠলেন—এক একবারকার গা ঝাড়া যেন ছোটখাটো একটি ভূমিকম্প। মাটির তিনহাত উপরে আরোহীরা হলেন বিলম্বিত। তাঁদের ঠিক নীচে রইল গ্রামের লোক, উলঙ্গ ছেলেমেয়ের দল—হাতীর চারপাশে যে জাতীয় লোকের সমাবেশ হবেই হবে। চাকরেরা বাসনপত্র ঝুপঝাপ ক'রে টঙ্গার মধ্যে দিল ফেলে। আজিজের জন্যে যে ঘোড়া ঠিক হয়েছিল হাসান তারই উপর চ'ড়ে ব'সে মাসুদ আলির চাকরকে খুব অবজ্ঞার চোখে দেখছিল। অধ্যাপক গডবোলের রান্নার জন্যে যে বামুন ঠিক করা হয়েছিল তাকে এক বাবলা গাছের তলায় বসিয়ে রাখা হোলো ওঁদের ফেরার প্রতীক্ষায়। ট্রেনটাও মাঠের উপর দিয়ে বিছের মতন এঁকে বেঁকে উধাও হোলো আবার ফিরবে এই আশায়। মাঠের মধ্যে কূয়োর লাঠাগুলো মাটির থামের উপর কাঁক্‌ড়ার দাড়ার মতন উঠছিল আর নামছিল আর ঝিরঝির ক'রে ক্ষীণধারায়

---

* E. M. FORSTER-এর বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস A PASSAGE TO INDIA আদ্যন্ত সমান উপাদেয় হইলেও আকারে এত বড় যে সম্পূর্ণ বইখানির তর্জ্জমা ধারাবাহিক ভাবেও প্রকাশযোগ্য নহে। সেইজন্য অগত্যা আমরা আখ্যায়িকার সারটুকুই নিয়মিতরূপে মুদ্রিত করিব। কিন্তু হিরণকুমার সান্যাল মহাশয় সমগ্র গ্রন্থখানিই ভাষান্তরিত করিতেছেন এবং নির্ব্বাচিত অংশের প্রকাশ 'পরিচয়ে' সমাপ্ত হইলেই তাঁহার সম্পূর্ণ অনুবাদ পুস্তকাকারে বাহির হইবে।

তা থেকে জল গড়িয়ে গড়িয়ে চারদিকে যাচ্ছিল, ট্রেণ আর এই ছাড়া আর কোথাও গতির চিহ্নমাত্র ছিল না। সকালের স্নিগ্ধ আলোয় এই দৃশ্যটি দেখাচ্ছিল মোটের উপর বেশ প্রীতিকর, কিন্তু না ছিল এতে রঙের বৈচিত্র্য, না প্রাণের সাড়া।

ইতিমধ্যে পাহাড়গুলোর পাদমূল পর্য্যন্ত সূর্য্যের ম্লান আলো পৌঁছে তাদের খাঁজে খাঁজে কালো ছায়ার রেখা এঁকে দিয়েছিল। হাতীটা যতই পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল নতুন এক ভাবের সমুদ্ভব হোলো—এমন এক গভীর নীরবতা যার উপলব্ধি সময়কে পেরিয়ে যায়। জীবনের ধারা তেমনি ব'য়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তার কোনো পৌর্ব্বাপর্য্য ছিল না, অর্থাৎ শব্দ হচ্ছিল কিন্তু প্রতিধ্বনি ছিলনা, আর মনের চিন্তা আপনা আপনি যাচ্ছিল মিলিয়ে। যেমন ধরা যাক্, পথের পাশে কতকগুলো নীচু এবড়ো খেবড়ো ঈষৎ চুণকাম করা ঢিবি ছিল। কি ব্যাপার এগুলি? কবর না পার্ব্বতীর স্তন? গ্রামের লোকেরা দুরকমই বলত। আবার, একটা সাপ নিয়ে একটু গোলমাল হোলো যার আর মীমাংসাই হোলো না। মিস কেস্টেড এক নালার অপর পারে লম্বা কালো একটা কি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে দেখে 'সাপ!' ব'লে চেঁচিয়ে উঠলেন। গ্রামের লোকেরা সায় দিল। আজিজ বলল, "হ্যাঁ, একটা কালো গোখরো, ভীষণ বিষ, এই হাতীটা যাচ্ছে দেখে মাথা তুলে দেখছে।" কিন্তু রণির দূরবীন দিয়ে জিনিষটাকে ভালো ক'রে দেখতে মিস কেস্টেড বুঝলেন আসলে সাপ নয়, একটা তালগাছের শুকনো আর বাঁকাচোরা গুঁড়ি। কিন্তু এই কথা বলতে গ্রামের লোকেরা মানতে চাইলে না। একবার মাথায় যা ঢোকানো হ'য়েছে কিছুতেই তা ওরা ছাড়বে না। আজিজ স্বীকার করল বটে যে দূরবীণ দিয়ে দেখলে মনে হয় গাছ কিন্তু তবু সে বলল ওটা সাপ আর সেই সঙ্গে আত্মরক্ষার জন্যে জীবজন্তুদের কি রকম সব অনুকরণ করবার স্বভাবদত্ত ক্ষমতা আছে এই নিয়ে বিস্তর বাজে কথা বলল। না গেল কিছু বোঝা, না হোলো মজা। ওদিকে কাউয়া দোলের খাড়া পাহাড়গুলোর থেকে পরদার পর পরদা গরমের ঝলক এসে যেন আরো সব গোলমাল করে দিল। যখন তখন তারা আসছিল, যেখানে সেখানে, হঠাৎ মাঠের মাঝখানে খানিকটা জায়গা যেন আগুনে ভাজা হয়ে তড়াক ক'রে লাফ দিয়ে উঠছিল আবার স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছিল। কাছে যেতে এর বিরাম হলো।

হাতীটা সটান কাউয়া দোলের দিকে এগিয়ে চলেছিল, যেন মাথা ঠুকে সেখানে ঢোকার চেষ্টা করবে, তারপর হঠাৎ বেঁকে একটা পথ ধরল, পাহাড়ের গা ঘেঁষে তা গেছে। পাথরগুলো সব সোজা গিয়ে মাটিতে মিলিয়ে গেছে, সমুদ্রের ধারের খাড়া পাহাড়ের মতন। মিস কেস্টেড তো দেখে অবাক! সেই কথা সবাইকে ডেকে বলতে না বলতে সমতলভূমি গেল মিলিয়ে, যেন খোসার মতন তা খ'সে পড়ল, আর চারিদিকে রইল শুধু পাথর আর পাথর, একেবারে স্তব্ধ আর নিঃসাড়। এখানেও আকাশের আধিপত্য, কিন্তু বড্ড যেন তা কাছে, পাহাড়গুলোর চূড়োয় চূড়োয় যেন ছাদের মতন লেগে রয়েছে। কোনো কালে যেন এই দৃশ্যের পরিবর্ত্তন হয় নাই। আজিজ নিজের ঔদার্য্যে এমন অভিভূত হয়েছিল যে কিছুই তার চোখে পড়ছিল না। অতিথিরা অবশ্য অতটা অন্ধ হননি কিন্তু তাঁদের এ জায়গাটি খুব সুন্দর আর দেখবার মতন লাগল না। বরঞ্চ মনে হোলো যদি মসজিদের মতন এটা মুসলমানদের একটা কিছু হোতো তাহলে আজিজ উৎসাহ ক'রে ব্যাখ্যা করত। কিন্তু এক্ষেত্রে আজিজের অজ্ঞতা বোঝা যাচ্ছিল স্পষ্ট, আর তাই হয়েছিল মুস্কিল। খুব আমোদ করে লম্বা চওড়া কথা ও বলছিল বটে, কিন্তু ওর ধারণাতেই আসছিল না ভারতবর্ষের এই বিশেষ রূপ কি ভাবে নেওয়া দরকার; ওর অতিথিদের মতন ওরও অবস্থা অধ্যাপক গডবোলের অভাবে হয়েছিল নিতান্তই অসহায়।

পথটা সরু হ'য়ে আবার চওড়া একটা ট্রে-র মতন জায়গায় এসে শেষ হোলো। মোটামুটি এই তাদের গন্তব্যস্থান। সেখানে ছিল পুরোনো একটা পুকুর, যেটুকু তাতে জল তাতে জন্তু জানোয়ারগুলোর তৃষ্ণানিবারণ চলতে পারে; পুকুরের কাদার একটু ওপরেই অন্ধকার একটা গর্ত্ত—এই হোলো এক নম্বর গুহা। তিনপাশে তিনটি পাহাড়; তাদের দুটির থেকে আগুনের তাত হল্কা দিয়ে বেরুচ্ছে, আর একটি ছিল ছায়ায়, সেখানে তারা আস্তানা গাড়ল।

মিসেস মুর নিজের মনে মনেই বললেন, "কি বিশ্রী গরম জায়গা, সত্যি!"

ইতিমধ্যেই একটা চাদর পেতে মাঝখানে কাগজের ফুলে-ভরা একটা সাজি রাখা হয়েছিল আর মামুদ আলির খানসামা দ্বিতীয়বার ওঁদের জন্যে ডিম পোচ ও চা এনে হাজির করল। মিস কেস্টেড উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বললেন, "আপনার চাকরটা কিরকম চটপটে!"

"ভাবলাম গুহা দেখার আগে এই সব খেয়ে পরে ব্রেকফাষ্ট খাওয়া যাবে।"

"কেন, এ ব্রেকফাষ্ট নয় ?"

"বলেন কি ? আপনাদের সঙ্গে এত অদ্ভুত ব্যবহার করব ভেবেছেন ?" ও শুনেছিল ইংরাজেরা কেবলই খায় আর যতক্ষণ রীতিমত একটা ভোজের খানা তৈরী না হয়, ততক্ষণ দুঘণ্টা অন্তর ও যেন ওদের কিছু না কিছু খেতে দেয়।

"কি রকম সুন্দর সব ব্যবস্থা !"

"আগে চন্দ্রপুরে ফিরি তারপরে ও কথা বলবেন। গাফলতি আমার যাই ঘটুক, আপনারা হলেন আমার অতিথি।" খুব গম্ভীরভাবে আজিজ কথাগুলি বলল। কয়েক ঘণ্টার জন্যে ওঁরা ওর ওপর নির্ভর করবেন, এই রকম ভাবে নিজেদের ওর হাতে ছেড়ে দেওয়াতে ওর কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিলনা। এতাবৎ ত্রুটি কিছু হয় নাই। হাতীটার মুখে ছিল একটা তাজা ডাল, টঙ্গার বোমগুলো শূন্যে গিয়ে ঠেকেছিল, রান্নাঘরের ছোকরা আলু ছাড়াচ্ছিল, হাসান চ্যাঁচাচ্ছিল, আর মহম্মদ লতিফ ডাল কেটে ছড়ি বানিয়ে তা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, ঠিক যেমনটি তাকে সাঁজে। ভালো রকম ব্যবস্থা বলতে হবে, আর একেবারে ভারতীয় কেতায়। কোথাকার একজন ছোকরা, কেই বা তাকে চেনে, সে আজ পেয়েছে বিদেশী অতিথিদের আদর যত্ন করবার অধিকার, ভারতবাসী সবাই তো তাই চায় এমন কি মামুদ আলির মতন যারা বিশ্ব-নিন্দুক, তারাও—কিন্তু এ সৌভাগ্য তাদের কখনো ঘটে না। অতিথি সৎকার যথারীতিই হচ্ছে, ওঁরা হলেন ওর—একেবারে ওর নিজের অতিথি, ওঁদের সুখের ওপর ওর মানসম্ভ্রম নির্ভর করছে, কিছুমাত্র অসুবিধা ওঁদের হলে ওর বুক ফেটে যাবে।

প্রাচ্যের বেশির ভাগ লোকের মতন আজিজও অতিথিপরায়ণতাকে যা না তাই একটা জিনিষ মনে করত, যেন একেবারে অন্তরঙ্গতারই সামিল ; একথা ওর মাথায় আসত না যে অতিথি সৎকারের আনন্দে রয়েছে আমিত্বের কলুষ। শুধু যখন মিসেস মূর বা মিষ্টার ফিলডিং থাকতেন ওর কাছে, তখন ব্যাপারটিকে তলিয়ে দেখত আর বুঝত দেওয়ার থেকে নেওয়ার গৌরব বেশি। এঁদের প্রভাবে ওর মন অদ্ভুত মাধুর্য্যে ভ'রে যেত, এঁরা হলেন ওঁর বন্ধু, ওর চির আত্মীয়, আর ও নিজে চিরকালের জন্য ওঁদের আপন লোক। এমন কি হামিদুল্লার চেয়েও ও ওঁদের বেশি ভালো বাসত, কেননা ওঁদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল অনেক

প্রতিবন্ধক পেরিয়ে, আর তাতে মনের ঔদার্য্য আরো বেড়ে যায়। ওর মনের কোণে একেবারে মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত ওঁদের ছবি মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল, ওঁরা ছিলেন ওর চিরদিনের সম্পদ। ডেক্ চেয়ারে ব'সে মিসেস মূর চা খাচ্ছিলেন, দেখে আজিজের মন মুহূর্ত্তের জন্যে আনন্দে ভরে উঠল ; কিন্তু এই আনন্দের মধ্যেই ছিল দুঃখের ছায়া, কেননা, এর পরেই ওর মনে হবে, 'আর কি করতে পারি ওঁর জন্যে ?' অমনি আবার সুরু হবে সেই অতিথি সৎকারের পালা। বন্দুকের গুলির মতন কালো ওর চোখ দুটো স্নিগ্ধ জ্যোতিতে ভ'রে উঠল, মুখে জিজ্ঞাসা করল, "মিসেস মূর মনে আছে সেই মসজিদের কথা ?"

হঠাৎ যেন যৌবন ফিরে এসেছে এই রকম উৎসাহের সঙ্গে তিনি বললেন : "নিশ্চয় মনে আছে, খুব।"

"আমি কি রকম অসভ্যতা করেছিলাম, আর আপনি কি রকম ভদ্রতা করেছিলেন।" "কিন্তু দুজনেরই কি রকম ভালো লেগেছিল ?"

"বোধ হয় ও রকম ক'রে যে-বন্ধুত্বের সুরু তা-ই সব চেয়ে বেশি দিন থাকে। আচ্ছা, আপনার আর সব ছেলেমেয়েরা কোনো দিন এরকম ভাবে আমার অতিথি হবে না ?"

"আর সব ছেলেমেয়েদের খবর আপনি জানেন নাকি ? আমাকে উনি কখনো কিন্তু কিছু ও সব বলেন না।" মিস কেষ্টেডের এই কথায় ওঁদের ঘোর কাটল, অবশ্য যদিও মিস কেষ্টেড সেই উদ্দেশ্যে কথা বলেননি।

"র‍্যাল্‌ফ্ আর ষ্টেলা—হ্যাঁ ওদের সব খবরই জানি। কিন্তু তাই বলে দেখুন গুহা দেখার কথা ভুললে চলবে না। আপনাদের দুজনকে এখানে অতিথি হিসাবে পেয়ে জানেন, আমার জীবনের একটা স্বপ্ন সার্থক হোলো ? আপনাদের জন্যে আমার আজ কি রকম পদবৃদ্ধি হয়েছে তা আপনারা বুঝতেও পারছেন না, আমার আজ নিজেকে ঠিক ভারত-সম্রাটের বাবরের মতন মনে হচ্ছে।"

উঠে দাঁড়িয়ে মিস কেষ্টেড জিজ্ঞাসা করলেন, "বাবরের মতন কেন ?"

"এই জন্যে যে আমার পূর্ব্বপুরুষেরা ওঁরই সঙ্গে সব এসেছিলেন আফগানিস্থান থেকে। হিরাটে বাবরের সঙ্গে ওঁরা যোগ দেন। ওঁরও প্রায়ই একটার বেশি হাতী থাকত না, কখনো আবার তাও না। কিন্তু ওঁর অতিথি সৎকার তবু সমানই চলত। যুদ্ধ বা শিকার বা পলায়ন, সব সময়ে, ঠিক আমাদেরই

মতন, কিছু কালের জন্যে পাহাড়ে ওঁর না গেলে চলত না। অতিথি সৎকার আর আমোদ প্রমোদ উনি কখনো ত্যাগ করেননি। সামান্য একটু খাবার যদি থাকে, তাও ভালো ক'রে সাজিয়ে দেওয়া চাই, বাজনা থাকে যদি মাত্র একটি তাতেই মুগ্ধ করতে হবে অতিথিকে। আমার আদর্শ হলেন বাবর। গরীব হ'লে কি হয়, মহাশয় লোক, তাই না উনি অত বড় সম্রাট হয়েছিলেন।"

"আমি ভাবতাম আপনার আদর্শ বুঝি আর একজন সম্রাট—কি যেন তাঁর নাম? মিষ্টার ফিলডিং-এর বাড়ি তাঁর কথা বলেছিলেন, বইতে যাঁকে ঔরঙ্গজীব বলে।"

"আলমগীর? হ্যাঁ, উনি অবশ্য আরো বেশি ধার্ম্মিক ছিলেন। কিন্তু বাবর—সারা জীবনে কখনো একটি বন্ধুর সঙ্গেও তিনি শঠাচরণ করেননি, তাই আজকে সকালে শুধু ওঁর কথাই মনে হচ্ছে। কি ক'রে উনি মারা যান, জানেন তো? ছেলের জন্যে উনি প্রাণ বিসর্জন করেন। যুদ্ধে মরার চেয়ে ঢের বেশি তা কঠিন। গরমে ওঁরা আটকা পড়েছিলেন, কাবুলে যাবার কথা ছিল, কিন্তু রাজকার্য্যের জন্যে তা হ'য়ে ওঠেনি; আগ্রাতে হুমায়ুনের হোলো অসুখ। বাবর তিনবার তার শয্যা প্রদক্ষিণ ক'রে বললেন, "বাস্ আমি এই অসুখ নিয়ে নিয়েছি।" হোলোও তাই, ছেলেকে ছেড়ে জ্বর তাঁকে তেড়ে ধরল, তাতেই ওঁর শেষ হোলো। এই জন্যেই আলমগীরের থেকে বাবরকে আমি বেশি পছন্দ করি। অবশ্য তা উচিত না, কিন্তু তবু না ক'রে পারি না। যাই হোক, আপনাদের আর দেরি করিয়ে দেব না। আপনারা দেখছি যাবার জন্যে প্রস্তুত।"

মিসেস মুরের পাশে ব'সে প'ড়ে মিস কেষ্টেড বললেন, "মোটেও না, এই রকম সব কথা আমার ভারি ভালো লাগে।" কেননা, অবশেষে আজিজ ওর নিজের জানা বিষয়ে কথা বলছিল, আর একেবারে ওর নিজের মনের অনুভূতির কথা, ঠিক যেমন ফিলডিং-এর বাড়ি ও বলেছিল। এ হোলো ঠিক ওঁদের পছন্দসই দেশী গাইড।

"মোগলদের সম্বন্ধে কথা-বার্ত্তা বলতে সব সময়ে ভালো লাগে। আমার প্রধান আমোদ হোলো এই। দেখুন, ওদের প্রথম ছ'জন সম্রাট ছিলেন আশ্চর্য্য লোক, আর ওঁদের যে-কেউ একজনের নাম হলে আমার আর কিছু

মনে পড়ে না, বাকি পাঁচ জনের কথা ছাড়া। পৃথিবীর সব দেশ খুঁজলেও অমন ছ'টি রাজা বের করতে পারবেন না—অর্থাৎ একটির পর একটি, বাপের পর ছেলে।"

"আকবরের কথা কিছু বলুন না।"

"হুঁ, আকবরের নামও শুনেছেন দেখছি। তা বেশ। হামিদুল্লা—ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব—আপনাদের বলবে যে আকবরের সমান কেউ না। আমি বলি, হ্যাঁ, আকবর অদ্ভুত লোক বটে, তবে আধা হিন্দু; সত্যিকারের মুসলমান উনি ছিলেন না। হামিদুল্লা জবাব দেয়, বাবরও তো তাই, তিনি মদ খেতেন। কিন্তু বাবর সব সময়ে তার জন্যে অনুতাপ করতেন—ঐ খানেই তো তফাৎ—আর আকবর পবিত্র কোরান শরিফের বদলে যে নতুন ধর্ম্ম উদ্ভাবন করেছিলেন, তার জন্যে কখনো অনুতাপ করেননি।"

"কিন্তু আকবরের নতুন ধর্ম্ম খুব ভালো না? সারা ভারতবর্ষকে এক করা ছিল তার উদ্দেশ্য।"

"মিস কেষ্টেড, আকবরের ধর্ম্ম শুনতে বেশ, কিন্তু ওর কোনো মানে হয় না। যার যা ধর্ম্ম তাকেই তা সাজে। সারা ভারতবর্ষকে এক করতে পারে এমন কিছু হতে পারে না—একবারেই না। ঐ খানেই তো আকবর ভুল করেছিলেন।"

খুব চিন্তান্বিত ভাবে মিস কেষ্টেড জবাব দিলেন, "ডাক্তার আজিজ, আপনার তাহলে ঐ মত? আশা করি আপনি ভুল করছেন। এ দেশে সার্ব্বজনীন একটা কিছু হওয়া নেহাৎই দরকার, আমি বলছি না তা' ধর্ম্ম, কিন্তু একটা কিছু, নইলে পরে ভেদ দূর হবে কেমন ক'রে?"

মাঝে মাঝে যে বিশ্বমৈত্রীর স্বপ্ন তিনি দেখতেন, মিস কেষ্টেড বলেছিলেন তারই কথা, তাঁর উদ্দেশ্য যাই হোক, কিন্তু মুখের কথায় প্রকাশ করামাত্র যেন তা নিতান্তই মিথ্যা হয়ে যাচ্ছিল।

"এই দেখুন আমার কথা"—তিনি ব'লে চললেন। বাস্তবিক তাঁর নিজের কথা ভেবেই এই আলোচনায় তাঁর অতটা উৎসাহ হয়েছিল—"আপনি শুনেছেন কিনা জানি না, মিষ্টার হিসলপের সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক।"

"আমার কন্‌গ্র্যাচুলেশ্যন জানবেন।"

"মিসেস মুর, আমাদের এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমস্যার কথা ডাক্তার আজিজকে বলা যেতে পারে ?"

"সমস্যাটা তোমার, আমার তো নয়।"

"হ্যাঁ, তা তো বটে। ব্যাপারটা কি জানেন ?

"মিষ্টার হিসলপকে বিয়ে করলে আমি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ব'লে পরিচিত হব, এই হোলো সমস্যা।"

আজিজ প্রতিবাদস্বরূপ হাত তুলে বল্লে, "অসম্ভব। এ রকম ভীষণ কথা আপনি ফিরিয়ে নিন।"

"কিন্তু তাই হব যে, উপায় নাই। ঐ লেবেল আমার গায়ে লাগবেই, আশা করি মনটাও সেই সঙ্গে ঐ ধাঁচের হ'য়ে যাবে না। এই ওঁদের মতন মেয়েরা"—মুখের কথা শেষ না করেই মিস কেষ্টেড থামলেন, যাঁদের নাম মুখের গোড়ায় এসেছিল তাঁদের নাম আর করলেন না। দিন পনেরো আগে মিসেস টার্টন, আর মিসেস ক্যালেণ্ডারের নাম নির্ব্বিবাদে তিনি ব'লে ফেলতেন—"এই ধরুন কোনো কোনো মেয়ে ভারতবাসীদের সম্বন্ধে এমন অহঙ্কারী আর সঙ্কীর্ণমনা, তাঁদের মতন হলে আমার লজ্জার আর অবধি থাকবে না, কিন্তু—আসল সমস্যাটা হোলো এই—এমন কিছু বিশেষত্ব আমার নাই, এমন মনের জোর বা উদারতা যে চারপাশের প্রভাব আমি কাটাতে পারব, তাঁদের মত হ'য়ে উঠব না। আমার খুব গুরুতর সব দোষ আছে, তাই তো আমি আকবরের সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম বা এমন কিছু চাই যাতে আমি প্রকৃতিস্থ আর ভদ্র থাকব। বুঝতে পারছেন আমার কথা ?"

ওঁর কথায় আজিজ খুসিই হয়েছিল; কিন্তু বিয়ের কথা উঠেছিল তাই ও একেবারে চুপ হয়ে গিয়েছিল। ওসব ব্যাপারে ও জড়িয়ে পড়তে চায় না। মুখের ভদ্রতা ক'রে ও বলল, "মিসেস মুরের যে-কোনো আত্মীয়ের সঙ্গে বিয়ে হ'লে আপনি সুখী না হ'য়ে পারেন না।"

"আমার সুখী হওয়া—সে হোলো আলাদা কথা। এই এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমস্যা সম্বন্ধে আপনার মতামত জানতে চাই। কিছু পরামর্শ দিতে পারেন না ?"

"আপনি অন্য সকলের মতন একেবারেই না। এদেশী লোকের সঙ্গে অভদ্রতা করা আপনার পক্ষে অসম্ভব।"

"শুনলাম যে এক বছর যেতে না যেতে আমরা সবাই অভদ্র হয়ে উঠি।"

"তাহলে আপনি মিথ্যা কথা শুনেছেন।"

আজিজ একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছিল কেননা আসলে কথাটা সত্যি, ওর তাই আঁতে ঘা লেগেছিল, এক্ষেত্রে তা একেবারে অপমানের সামিল। সামলে নিয়ে ও হেসে উঠল, কিন্তু মিস কেষ্টেডের এই বেসামাল উক্তিতে ওদের কথাবার্তা—প্রায় ওদের জাতীয় সংস্কৃতি বলা চলে—চুরমার হয়ে ভেঙে গেল, ছেঁড়া ফুলের পাপড়ির মতন তা পড়ল এখানে ওখানে ছড়িয়ে। আজিজ দুজনের দিকে দুহাত বাড়িয়ে বলল, "এবার উঠুন।" খুব যেন বেশি উৎসাহ নাই, এই ভাবে দুজনে উঠে বেড়ানোয় মন দিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

পুস্তক-পরিচয়

Trials in Burma—by Maurice Collis, (Faber) 8/6

গ্রন্থকার ব্রহ্মদেশে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। অধুনা পেনশন-ভোগী। ইতিপূর্ব্বে দুইখানি উপন্যাস রচনা করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে প্রভূত খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

আলোচ্য পুস্তকখানি কিন্তু উপন্যাস নহে, কয়েকটি সত্যঘটনাবলীর সরস ও যথাযথ বর্ণনা। এই শ্রেণীর গ্রন্থ প্রকাশ করার কোন সার্থকতা আছে কি না, সে বিষয়ে মতভেদ থাকা সম্ভব। অত্যাচার অবিচার সকল দেশেই হয়, চিরদিন হইয়া আসিতেছে। রাষ্ট্রব্যবস্থা যত উৎকৃষ্টই হউক না কেন, ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত অনাচার থাকিবেই। গণতান্ত্রিক আমেরিকাতে নিগ্রো নিপীড়ন, সঙ্ঘবদ্ধ গুণ্ডাদলের আধিপত্য, বিরাট কলকারখানাতে শ্রমজীবী নিষ্পেষণ কিছুরই অভাব নাই। সাম্যবাদী রুষ, ফাশিষ্ট ইতালীয়, নাৎসী জার্ম্মান, ইহারা ত ব্যক্তির বা শ্রেণীর কোন অধিকার আছে বলিয়াই মানে না। একছত্রী রাষ্ট্রপতির বিজয়যাত্রার রথচক্রতলে ব্যক্তি ও শ্রেণী নিয়ত নির্ম্মমভাবে দলিত হইতেছে। লেখক ইংরেজ। ইংলণ্ডের ন্যায়নিষ্ঠা ও ইংলণ্ডের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আদর্শ তাঁহার গর্ব্বের বিষয়। তাই তিনি ব্রিটিশ-শাসিত প্রাচ্য দেশসমূহে অনাচারের অনুষ্ঠান দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছেন, এবং স্বজাতিকে সাম্রাজ্যের উচ্চতর আদর্শে অনুপ্রাণিত করিবার ইচ্ছায় এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। ইংলণ্ডের আদর্শ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য কিছু নাই, তবে জানিতে ইচ্ছা হয় যে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনীতিও কি বস্তুতঃ শ্রেণীবিশেষের স্বার্থের অনুসারী নয়। ইংলণ্ডের সাধারণ অধিবাসী মুসোলিনী কর্ত্তৃক হাবসী রাজ্য ধ্বংস, হিটলারের অষ্ট্রিয়া গ্রাস, স্পেনে ফ্রাঙ্কোর তাণ্ডবের সমর্থন করে, এ কথা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। অথচ ব্রিটিশ সরকার এই সমস্ত অনাচারের নির্লজ্জভাবে অনুমোদন করিতেছেন। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে ইংরেজের ধর্ম্মজ্ঞান ও স্বাধীনতা স্পৃহা তাহার

মনের নিভৃত কোণে লুক্কায়িত রহিয়াছে, কার্য্যতঃ তাহার বিকাশ দৃষ্টিগোচর হয় না। তবে ইংলণ্ডের যথার্থ গৌরবের বিষয় এই যে ঘোরতর জাতীয় স্বার্থপরতার মাঝেও এক একজন মহানুভব ন্যায়পরায়ণ ইংরেজ উদিত হইয়া, কাহারও মুখের দিকে না চাহিয়া, নির্ভীক হৃদয়ে মুক্ত কণ্ঠে সত্যের ঘোষণা করেন। সিবিল সার্ব্বিসের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেও এরূপ উদারচেতা ইংরেজের অভাব ঘটে নাই। হিউম, ওয়েডারবার্ণ, পেনেল-এর নাম কে না জানেন! অবশ্য বর্ত্তমান গ্রন্থকার কলিস সাহেবকে এই সব মহানুভব ইংরেজের সহিত সমান আসনে বসাইলে তাঁহাদের প্রতি অবিচার করা হইবে। তথাপি এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে এই সাহেবেরও মন ভাল, তিনি বিচারকের উচ্চ মঞ্চে বসিয়া ন্যায় বিচার করিতে যথাসাধ্য চেষ্টিত হইয়াছেন। লাট সাহেব বা মন্ত্রীবর্গের, পুলিশের বা ইংরেজ সমাজের মুখাপেক্ষী হইয়া আপন সহজ বিবেকবুদ্ধিকে ভাসাইয়া দেন নাই। অন্ততঃ আলোচ্য পুস্তকের ইহাই প্রতিপন্ন বিষয়। তবে আত্মপক্ষে এই কথা প্রতিপাদন করিতে গিয়া গ্রন্থকার একটু রসভঙ্গ করিয়াছেন। নিজের ভালাই নিজমুখে যে জানাইতে চায়, তাহাকে সাধারণ ইংরেজীতে prig বলে। তবে গ্রন্থকারের তরফে এ কথা বলা যায় যে তিনি গুণগান করিবার উদ্দেশ্যে এই পুস্তক লেখেন নাই। প্রস্তাবনাকে তিনি বলিতেছেন,

> We have not yet completely grown out of our earlier possessive and domineering view of empire. If this record can help to bring us closer to what I believe to be our right mind, it will have done all that it was written to do.

আলোচ্য পুস্তকখানির ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর। ভাষা ও লিখনভঙ্গী, খুব উচ্চদরের না হইলেও, মনোরম। প্রস্তাবনা হইতে দেখিতে গেলে বিষয়বস্তুও অকিঞ্চিৎকর নহে। তথাপি এ গ্রন্থের স্থায়ী মূল্য আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। ভারত বা বর্ম্মার মত পরশাসিত দেশে অল্প-বিস্তর অত্যাচার অনাচার অনুষ্ঠিত হইলে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে! আগেই বলিয়াছি যে ন্যায় বা সত্যের মর্য্যাদা স্বাধীন দেশেও নাই। মুখের কথায় থাকিতে পারে, কার্য্যতঃ নাই। কি উপায়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভবিষ্যতে সত্য ও

ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, সে সম্বন্ধে গ্রন্থকার কিছু পূর্ব্বনির্দ্দেশ করেন নাই। তবে ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন যে তিনি তাঁহার আদালতে যেরূপ অবিচলিত ন্যায়নিষ্ঠা সহ বিচারকার্য্য করিতেন, সকলে সেরূপ করিলে ভাবীকালে বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রজাজনের বিশ্বাস ও ভক্তির উপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। আদালতে ন্যায় বিচারের মূল্য কম নয়, আমরা স্বীকার করি। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রজা কি শুধু আদালতে ন্যায় বিচার পাইলেই সন্তুষ্ট হইবে! সাম্রাজ্যকে Commonwealth of nations-এ পরিণত করিতে হইলে আরও বহু জিনিসের প্রয়োজন। সেই অতি প্রয়োজনীয় অধিকারগুলি প্রজামণ্ডলীকে দান করিতে কলিস সাহেব কতদূর প্রস্তুত, তাহার আভাস আমরা পুস্তকে পাইলাম না।

Trials in Burmaতে মোটামুটি তিনটি মোকদ্দমার বিস্তারিত বিবরণ আছে। কলিস সাহেব যখন রেঙ্গুনে প্রধান মেজিষ্ট্রেট ছিলেন, তখন তাঁহার এজলাসে এই মোকদ্দমাগুলি চলিয়াছিল। তিন বারই মোমদ্দমার রায় লিখিয়া কলিস সাহেব রেঙ্গুনের ইংরেজ সমাজের এবং বর্ম্মা সরকারের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। আজ দীর্ঘকাল পরে সাধারণের সমক্ষে তাঁহার কৈফিয়ৎ পেশ করিয়াছেন। কৈফিয়ৎকে সন্তোষজনক বলিতে আমাদের আপত্তি নাই। তবে লেখক প্রকারান্তরে আপন সূক্ষ্মবুদ্ধির ও ন্যায়নিষ্ঠার এত তারীফ করিয়াছেন যে আমরা তাঁহার রসজ্ঞানের তারীফ করিতে পারিলাম না।

প্রথম মোকদ্দমাটিতে নেটীব-নির্য্যাতক হিউজ্ সাহেবকে হাকীম যখন ছাড়িয়া দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত স্থির করিলেন, তখন আবার সেই সূত্রে সমগ্র ইংরেজ সমাজকে পাদরীর মত দীর্ঘ নীতিকথা শুনাইতে গেলেন কেন, বোঝা কঠিন। রেঙ্গুনবাসী একজন সাহেব মেজিষ্ট্রেটের রায় পড়িয়া ঠিকই বলিয়াছেন, "হিউজ্‌কে পাঁচ টাকা জরিমানা করিলেই চুকিয়া যাইত। লম্বা বক্তৃতার কি দরকার ছিল!"

দ্বিতীয় মোকদ্দমাতে কলিকাতার মেয়র সেনগুপ্ত মহাশয় রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। মেজিষ্ট্রেট অনেক গবেষণার পর স্থির করিলেন যে মেয়র মহোদয় নাম মাত্র রাজদ্রোহের অপরাধে অপরাধী। দণ্ডবিধান করিলেন দশ দিবস কারাবাস। এই সামান্য ঘটনার এত বিস্তারিত বর্ণনা ও বিচারের কি প্রয়োজন ছিল, বোঝা কঠিন। লেখকের ভাব এই, সরকার ও কংগ্রেস উভয় পক্ষই দুই বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ প্রত্যাশা করিতেছিলেন, কেমন ফাঁকী দিলাম দুই দলকেই!

তৃতীয় মোকদ্দমার ঘটনাবলী ছিল অপেক্ষাকৃত গুরুতর। F নামক এক বৃটিশ সেনানী ঈষৎ মত্ত অবস্থায় মোটর গাড়ী হাঁকাইতে গিয়া দুইটী বর্ম্মী মহিলাকে জখম করিয়াছিলেন। কলিস সাহেব অপরাধ সাব্যস্ত ধরিয়া সেনানীর কারাদণ্ড আদেশ করিলেন। উচ্চ আদালতে আপীল হইল। জজ সাহেব কারাদণ্ডের হুকুম রদ করিয়া F-এর এক হাজার টাকা জরিমানা করিলেন। জজের হুকুম যে ন্যায়-সঙ্গত একথা হয়ত কোন নিরপেক্ষ লোকই আজ বলিবে না। কিন্তু এই ব্যাপার লইয়া এতকাল পরে দীর্ঘ উচ্ছ্বাসের কি প্রয়োজন ছিল! এই প্রকার ভাবোচ্ছ্বাসে পুস্তকখানি ভরা, তাই ন্যায়নিষ্ঠ হইলেও লেখককে বেরসিক না বলিয়া থাকা যায় না।

মোট কথা আলোচ্য পুস্তকখানি পড়িয়া আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিতে পারি নাই। প্রারম্ভে উদ্ধৃত Lionel Curtis-এর বাক্যগুলি পড়িয়া ও প্রস্তাবনাতে বড় বড় কথার অবতারণা দেখিয়া আমাদের মনে যে আশার সঞ্চার হইয়াছিল, সমগ্র পুস্তকপাঠে তাহা পূর্ণ হয় নাই!

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

Lions and Shadows—by Christopher Isherwood
(The Hogarth Press)

গ্রন্থকার ইংলণ্ডের আধুনিক কালের একজন প্রধান কবি Audenএর অন্তরঙ্গ বন্ধু, নিজেও খ্যাতনামা লেখক। স্কুলে যখন পড়েন তখন তিনি একখানি উপন্যাস লেখেন—তার নাম দেন Lions and Shadows। এই উপন্যাসখানি আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয়নি, বোধ হয় কখনও প্রকাশিত হবেও না। তার বদলে, এই নামেই তিনি আলোচ্য গ্রন্থখানি পাঠককে উপহার দিয়েছেন।

বইখানি অনেকটা আত্মজীবনী গোছের। কিন্তু গ্রন্থকার প্রথমেই পাঠকদের

সাবধান ক'রে দিয়েছেন, তাঁরা বইখানিকে যেন জীবনচরিত ব'লে গ্রহণ না করেন, কেননা তাঁর মতে জীবনচরিতে সাধারণত যে সকল উপাদান থাকে এতে তা নেই। তিনি বলেছেন—It is not, in the ordinary journalistic sense of the word, an autobiography; it contains no 'revelations'; it is never 'indiscreet'; it is not entirely 'true'। বইখানিকে উপন্যাস মনে ক'রে পড়তে তিনি পাঠকদের বলেছেন, কারণ এর মধ্যে যেসব ঘটনা বা চরিত্র আছে সেগুলি তিনি যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ বা অঙ্কিত করেন নি—সেগুলি সম্পর্কে তিনি একজন ঔপন্যাসিকের স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন। খানিকটা এই কারণে এবং কারো মনে যাতে আঘাত না লাগে তার জন্যও তিনি বইখানির মধ্যে তাঁর যে সমস্ত বন্ধুবান্ধব ও পরিচিত ব্যক্তির কথা বলেছেন, তাঁদের প্রকৃত নাম উল্লেখ না ক'রে ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন।

গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য হচ্ছে—একজন ঔপন্যাসিকের জীবনব্যাপী শিক্ষার প্রথম কয়েকটি স্তরের বিবরণ দেওয়া। যে বিবরণ তিনি দিয়েছেন, তাতে মনে হয়, খেয়ালের হাওয়ায় গা ঢেলে দেওয়া ও সমস্ত নিয়ম ও শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাই হয়ত একজন ঔপন্যাসিকের জীবনের এবং শিক্ষার প্রধান অঙ্গ। স্কুলে পড়বার সময় তিনি অনেকটা বন্ধনের মধ্যে ছিলেন, অন্ততঃ তখন তিনি সব বিষয়ে নিজের খেয়াল মত চলতে পারতেন না। এই জন্যই হয়ত তাঁর পক্ষে একটা বৃত্তি পাওয়া সম্ভব হয়েছিল। বৃত্তি নিয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। এইবার খেয়ালের রাজত্ব আরম্ভ হ'ল। স্কুলে থাকতে তিনি তাঁর উপরের শ্রেণীর একজন ছাত্র—চ্যামার্সের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন। চ্যামার্সের মধ্যে ছিল কবিত্ব—ছেলেবেলা থেকেই তিনি কবিতা লিখতেন। চ্যামার্সের প্রভাব ছিল তাঁর উপর খুব বেশী। চ্যামার্সের স্কুল ভাল লাগত না—বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও আবেষ্টনীও তাঁর কাছে ছিল বিষবৎ। কাজেই তাঁর অনুগত শিষ্য ঈশারউডও যে এসব বিষয়ে তাঁর দৃষ্টান্ত অনুকরণ করবেন এবং তাঁর ভাবে অনুপ্রাণিত হবেন, তাতে আর সন্দেহ কি? বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ ক'রে গ্রন্থকার নিজের পাঠ্যবিষয়গুলি সম্পূর্ণ অবহেলা করতে আরম্ভ করলেন। মর্টমিয়ার নামে একটি কল্পলোক খাড়া ক'রে তাতেই তিনি ও তাঁর বন্ধু চ্যামার্স বাস করতে লাগলেন। কিন্তু কল্পলোকে বাস করা এক কথা ও পরীক্ষা বৈতরণী

উত্তীর্ণ হওয়া আর এক কথা। উপাধি পরীক্ষার সময় দুজনেই প্রশ্নগুলির উদ্ভট উত্তর দিলেন। এই রকমে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে ক'রলেন তাঁদের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন। তারপর আরম্ভ হল কর্ম্মজীবন। কখনও গৃহ-শিক্ষকতা, কখনও সেক্রেটারীগিরি, কখনও বা অন্য কিছু কাজ ক'রে গ্রন্থকার সময় কাটাতে লাগলেন। নিজের জীবিকা-উপার্জনের তাগিদ যে তাঁর উপর খুব বেশী ছিল তা মনে হয় না। কেন না, তিনি সব সময়েই তাঁর বাড়ী থেকে অর্থ-সাহায্য পেতেন। বাড়ীর অবস্থা সচ্ছল থাকাতে ও এই সাহায্য পাওয়াতেই হয়ত তাঁর পক্ষে এতটা নিজের খেয়াল মত চলা সম্ভব হয়েছিল।

এই সময়, ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে প্রকাশিত হ'ল তাঁর প্রথম উপন্যাস All the Conspirators। উপন্যাসখানি প্রথমে বিশেষ আদর পায়নি। গ্রন্থকার লিখেছেন—"The book sold less than three hundred copies and was duly remaindered and forgotten—until Sir Hugh Walpole, writing in the *Sunday Times* five years later, included it in a list of six novels which he considred to have been 'unjustly neglected' since the War".

বইখানি বের হবার পর গ্রন্থকারের খেয়াল চাপল ডাক্তারী শিখবার। তিনি ডাক্তারী স্কুলে ভর্ত্তি হ'লেন, কিন্তু এ খেয়ালও বেশী দিন স্থায়ী হ'ল না। কিছুকাল পরে তিনি ডাক্তারী শিক্ষায় ইস্তফা দিয়ে, বেড়াবার জন্যে জার্মানী অভিমুখে যাত্রা করলেন। এইখানেই গ্রন্থকার তাঁর আত্মজীবনীর উপর যবনিকাপাত ক'রেছেন।

যদিও গ্রন্থকারের ইচ্ছা, লোকে তার বইখানি একখানি উপন্যাস মনে করে পড়ুক, তাহ'লেও বইখানির প্রধান আকর্ষণ উপন্যাস হিসাবে খুব বেশী বলে বোধ হয় না। উপন্যাস হিসাবে বইখানিকে খুব উচুদরের বলা যায় না। আর সব কথা ছেড়ে দিলেও, চরিত্র অঙ্কনের দিক দিয়ে বইখানিতে একরকম কিছুই নেই বললেই হয়। এমন কি চ্যামার্সের যে চিত্র আমরা দেখতে পাই, তাও অনেক বিষয়ে নিতান্ত অসম্পূর্ণ। অন্যান্য পাত্রপাত্রীদের চরিত্রও লেখক যে খুব বেশী ফুটিয়ে ওঠাতে পেরেছেন তা নয়।

কিন্তু আত্মজীবনী হিসাবে বইখানি বেশ চিত্তাকর্ষক। ঘটনার বৈচিত্র্য খুব

বেশী না থাকলেও একেবারে কম নেই। লেখকের লেখার ভঙ্গীও সুন্দর। তবে যাঁরা জীবনী থেকে নৈতিক শিক্ষা সংগ্রহ করতে চান তাঁদের এই বই যে বিশেষ ভাল লাগবে তা মনে হয় না। বইখানির গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত স্বেচ্ছাতন্ত্রেরই জয় বর্ণিত হয়েছে, সংযমের পরিচয় খুব অল্পই পাওয়া যায়। জীবনে আত্মসংযমের মূল্য এত কম বলে অনেকেই স্বীকার করতে না চাইতে পারেন।

শ্রীদর্শন শর্ম্মা

Panjabi Sufi Poets—by Lajwanti Rama Krishna, (Oxford University Press) Rs. 5/-

লেখিকা ইতিপূর্ব্বে Les Sikhs নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। সে গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য তাঁকে শিখদের আদিগ্রন্থ আলোচনা করতে হয়। এই আদিগ্রন্থে কয়েকজন সুফী মুসলমানের রচিত কবিতা আছে। তা হতেই এ গ্রন্থের সূত্রপাত।

সুফী কবি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই ছিল। কিন্তু তাদের কবিতা সংগ্রহ করা এবং ধারাবাহিকভাবে তার আলোচনা এখনো সুরু হয় নাই বললেই চলে। অথচ সে সব কবিতা অনেক প্রাদেশিক সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদান। সুফীদের ধর্ম্মমত কি পরিমাণে প্রাচীন ধর্ম্মমতকে পরিবর্ত্তিত করেছিল এবং হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করেছিল তাও এ পর্য্যন্ত অবধারিত হয় নাই। এই কারণেই লজ্জাবন্তী রামকৃষ্ণের চেষ্টা প্রশংসা না করে পারা যায় না।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতক হতে ঊনবিংশ শতক পর্য্যন্ত পাঞ্জাব প্রদেশে যে সব সুফী কবি জন্মেছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে যাঁরা পাঞ্জাবী ভাষায় নিজেদের গীত রচনা করেছিলেন সেই সব কবিদের কথাই এ গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। এই কবিদের নাম হচ্ছে—শেখ ইব্রাহিম ফরীদ শানি (১৪৫০-১৫৭৫); মাধো লাল হুসেন (১৫৩৯-১৫৯৩), সুলতান বাহু (১৬৩১-৯১), বুল্‌হে শা (১৬৮০-১৭৫৮), আলি হায়দর (১৬৯০-১৭৮৫), ফরূদ ফকির (১৭২০-৯০) হাসিম শা' (১৭৫৩-১৮২৩), করম আলি এবং ঊনবিংশ শতকের কয়েকজন সুফী কবি।

লেখিকার মতে পাঞ্জাবে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকেই সুফীমতের প্রবর্ত্তন হয়। সুতরাং সুফীদের রচনা যে পাঞ্জাবী সাহিত্যের গঠনে বিশেষভাবে সহায়তা করে তা'তে সন্দেহ নাই। প্রথম যুগে সুফীরা পারসিক ভাষায় কবিতা রচনা করতেন; এর পর তাঁরা হিন্দুস্থানী ভাষায় রচনা করলেন বটে, কিন্তু সে ভাষার পনেরো আনাই ছিল পারসিক। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগ হতে এই পারসিক প্রভাব সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করা হয় এবং সেই কারণে সুফীদের রচিত কবিতা জনসাধারণের বোধগম্য হয়। শেখ ইব্রাহিম ফরিদ তাঁর রচনায় প্রথম এই ভাষা প্রয়োগ করেন।

সুফী কবিতা সাত প্রকারের—(১) কাফী, (২) বারাঁ মা, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের 'বার মাস্যা'র অনুরূপ। বার মাসের বর্ণনার ভিতর দিয়ে ভগবানের সঙ্গে মিলনের নানা স্তর নির্দ্দেশ করা হয়। (৩) অঠ্‌বারা—সপ্তাহের সাতদিনের বর্ণনার মধ্য দিয়ে ভগবানের সঙ্গে মিলনের সাতটী স্তর নির্দ্দিষ্ট হয়। অষ্টম দিনে সম্পূর্ণ মিলন। (৪) সিহর্‌ফী—বর্ণমালার প্রত্যেক বর্ণকে অবলম্বন করে কবিতা। (৫) কিস্‌সা—বিয়োগান্ত কাব্যগীতি; (৬) বয়ঁত; (৭) দো'রা—হিন্দী দোহার অনুরূপ।

মধ্যযুগের অনেক প্রাদেশিক সাহিত্যেই এই প্রকারের কবিতা পাওয়া যায়। তার মূলে সুফীদের প্রভাব আছে কিনা তার বিশেষ আলোচনা আবশ্যক। এবং সে আলোচনা না হলে কোন প্রাদেশিক সাহিত্যেরই প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধার করা সম্ভব নয়।

রামকৃষ্ণ যে সব কবিদের রচনা আলোচনা করেছেন তাদের প্রত্যেকের বিশদ পরিচয়, তাদের রচিত গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য, এবং তাদের বিশিষ্ট ধর্ম্মমত আলোচনা করবার জন্য তাদের রচিত বিভিন্ন পদ প্রভৃতি সমস্তই তাঁর গ্রন্থে দিয়েছেন। উদ্ধৃত পদগুলির অনুবাদও তিনি দিয়েছেন। উপরন্তু তিনি ভূমিকায় সুফী মতের উৎপত্তি, ভারতীয় সুফী সম্প্রদায়, সুফী ধর্ম্মমত প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন।

সুফী মতের উৎপত্তি সম্বন্ধে লেখিকা প্রাচীন মতেরই পৃষ্ঠপোষক—"Sufism was born soon after the death of the Prophet and proceeded on orthodox line. Its adepts had ascetic tendencies, led hard

lives, practising the tenets of the Qur'an to the very letter. But this asceticism soon passed into mysticism and before the end of the second century A. H. (815 A. D.) these ascetics began to be known to the people as Sufis"। এ মতের পরিপোষক হচ্ছেন Nicholson, Massignon প্রভৃতি অনেক বড় বড় পণ্ডিত। কিন্তু মহম্মদের ধর্ম্মমত কি করে এই mysticism-এ পরিণত হতে পারে সে সম্বন্ধে সকলে নিরব। প্রথম থেকেই যে গ্রীক দর্শনের প্রভাবে এ মত পরিপুষ্টি লাভ করেছে তাও তাঁরা স্বীকার করেছেন।

সুফী মতের উৎপত্তি যে দেশেই এবং যে ভাবেই হয়ে থাকুক না কেন তার সঙ্গে যে ভারতীয় Mysticismএর সম্পূর্ণ মিল আছে এবং তার প্রচলন যে ভারতবর্ষে সব চাইতে বেশী তা স্বীকার করতেই হবে। ভারতীয় ধর্ম্মমতের সঙ্গে যেটুকু মিল রয়েছে তার মধ্যে কতটা ভারতীয় প্রভাব রয়েছে এবং কতটা মৌলিক তা সুফী ধর্ম্মমতের গভীর আলোচনা হতেই বুঝতে পারা যাবে।

সুফী ধর্ম্মমতের মধ্যে যে সব দেহতত্ত্বের কথা আছে সে সম্বন্ধে লেখিকা নিরব। সে দিকে তিনি কোন মনোযোগ দেননি বলেই অনেক পারিভাষিক শব্দের ঠিক অর্থ ধরতে পারেননি। দু' একটি উদাহরণ দিলেই এ কথা স্পষ্ট বোঝা যাবে। সুফীদের কবিতায় কার্পাস হতে তুলা বের করা (তুম্‌না), তুলা ধুনা (বেল্‌না), পেঁজা (পিঞ্জনা), সূতা কাটা, সূতা কাটার চরকা, বস্ত্র বয়ন করা প্রভৃতি অনেক কথা আছে। এ সব কথা পারিভাষিক এবং তার বিশেষ অর্থ না ধরতে পারলে সুফীদের কবিতা অবোধ্য থেকে যায়। এই কারণে রামকৃষ্ণের অনেক অনুবাদ অস্পষ্ট আছে বলে মনে হয়। তিনি ইব্রাহিম ফরিদের একটি কবিতার অনুবাদ দিয়েছেন—

In the lake (=world) there is one swan (=good soul) while there are fifty snares (=bad souls): O True one my hope is in thee.

যদিও মূল কবিতাটি তিনি উদ্ধৃত করেননি তবুও নিঃসংশয়ে বলা যায় যে তিনি কবিতাটির অর্থ সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছেন। সুফী সাহিত্যের সংগ্রহকার্য্য আরও অগ্রসর হলে এবং সুফী ধর্ম্মমতের আলোচনা আরও গভীর হলে সুফী

মনোভাব আরও স্পষ্টভাবে ধরা পড়বে। এ কার্য্যে রামকৃষ্ণ অগ্রণী হয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। তাঁর বইয়ের বহুল প্রচার হলে এদিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

Lament for Economics—by Barbara Wootton,
(Allen & Unwin.) 6/-

আলোচ্য পুস্তকখানির লেখিকা অর্থনীতি-বিষয়ক রচনার জন্য ইতিপূর্ব্বেই খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। এই পুস্তকটিতে তাঁহার খ্যাতি সমধিক বৃদ্ধি পাইবে এইরূপ আশা করা অসঙ্গত নহে। কেননা, তাঁহার লিখিবার ক্ষমতা অসাধারণ, তীব্র অথচ সুখপাঠ্য ভাষায় তাঁহার বক্তব্য তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার আক্রোশ অর্থনীতিজ্ঞ পণ্ডিতদের উপর। এই পণ্ডিতের দল নাকি কূটতর্কের সূক্ষ্মজাল বয়নে এত ব্যস্ত যে জনসাধারণের নিকট বর্ত্তমান অর্থনীতিশাস্ত্র পরস্পর-বিরোধী মতদুষ্ট, দুর্ব্বোধ্য হেঁয়ালীর মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উপরন্তু, যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ভিক্টোরীয় যুগের সহিত অবসান হওয়া উচিত ছিল বর্ত্তমান অর্থশাস্ত্রকারের দল তাহারই অন্ধ সমর্থক। ফলে আধুনিক অর্থশাস্ত্র একেবারে অনাবশ্যক পাণ্ডিত্যবিলাসে পরিণত হইয়াছে।

লেখিকার অভিযোগ অংশত সত্য, সম্পূর্ণ নহে। কেননা, অর্থনীতিশাস্ত্র বা ইকনমিকস্‌-এর মূল্য বিচার করিতে হইলে যে বাধাবিঘ্নের মধ্যে এই শাস্ত্রের চর্চ্চা করিতে হয় তাহার সম্যক উপলব্ধি করা প্রয়োজন। পদার্থবিদ্যা বা রসায়নশাস্ত্রের ন্যায় অর্থনীতির সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি নাই। বাস্তবজীবনের বিচিত্র জটিল নিত্যপরিবর্ত্তনশীল ক্ষেত্র হইতে ইকনমিষ্টগণ তাঁহাদের উপকরণ সংগ্রহ করেন। এই অবস্থায় তাঁহাদের সিদ্ধান্তগুলি যদি মাঝে মাঝে অস্পষ্ট বা পরস্পরবিরোধী হয়, তাহাতে তাঁহাদের দোষ দেওয়া চলে না। লেখিকা নিজেই একথা স্বীকার করিয়াছেন, কেননা ইকনমিকস্‌-এর নাড়ি-নক্ষত্রের কথা তিনি ভালো করিয়া জানেন, তাই ইকনমিকস্‌-এর স্বপক্ষে ও বিপক্ষে সকল যুক্তিই

তিনি সমান দক্ষতার সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রশ্ন উঠে, তাহা হইলে তাঁহার বক্তব্য কি? তাঁহার ল্যামেন্ট বা বিলাপের হেতুই বা কি?

লেখিকার মতে ইকনমিকস্ আরো ব্যাবহারিক প্রণালীতে আলোচিত হওয়া আবশ্যক এবং বিশেষভাবে ইহার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত বাস্তবজগতের নানা সমস্যার সমাধান। ইহার উত্তরে বলা চলে, যতদুর সম্ভব তাহা হইতেছে এবং একাধিক খ্যাতনামা ইকনমিষ্ট বিশেষভাবে অর্থশাস্ত্রের ব্যাবহারিক প্রয়োগে মনোনিবেশ করিয়াছেন। লেখিকা আরও বলেন অর্থশাস্ত্রের উদ্দেশ্য মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের আদর্শ ব্যক্ত করা। এই মতে সকলে সায় দিতে পারেন না। কেন না, কোনও বিশেষ আদর্শ অনুসরণ করিতে হইলে নিরপেক্ষ থাকা চলে না এবং বিজ্ঞানের প্রধান অঙ্গ নিশ্চয়ই নিরপেক্ষতা। লেখিকা নিজেই দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন বর্ত্তমান অর্থশাস্ত্রকারগণ ব্যক্তিত্ববাদের পক্ষপাতী। লেখিকার আপত্তি যদি পক্ষপাতিত্ব সম্বন্ধে হয় তাহা হইলে যে কোনো আদর্শের বিরুদ্ধেই এই আপত্তি উঠিবে। আর যদি তাঁহার আপত্তির কারণ হয় ব্যক্তিত্ববাদ তাহা হইলে তাঁহার উচিত ছিল সবলভাবে সমাজতন্ত্রবাদের সমর্থন। তিনি চাহিয়াছেন দুকূল বাঁচাইয়া চলিতে, ফলে তাঁহার রচনা পড়িয়া কোনো কূলেরই সন্ধান পাওয়া যায় না।

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

Essays in Verse—by Shahid Suhrawardy, (The University Press, Cambridge).

Prefaces—by Shahid Subrawardy, (The University Press, Calcutta).

এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ যে ভারতীয় কোনো কবিই ইংরেজি গদ্য বা পদ্যকাব্যে সুরাওআর্দির সমকক্ষ নন, তা সে শ্রীমতী নাইডু বা ইক্‌বাল, দত্তপরিবার বা চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅরবিন্দ বা কাশীপ্রসাদ যাকেই ধরুন। এক শুধু মনমোহন ঘোষই সুরাওআর্দির কৃতিত্বের সঙ্গে তুলনীয় এবং তার কারণ

ইংরেজি কাব্যের সঙ্গে তাঁর নাড়ীর যোগের বেশি ঘনিষ্ঠতা ততটা নয়, যতটা হয়তো মনমোহনের কবিত্ব বা সাত্ত্বিকতর কবিস্বভাব।

বিদেশীর কাছেও স্পষ্ট যে সুরাওআর্দি ইংরেজির মর্মে প্রবেশ করেছেন। রোমান্টিকতা বা ভাবালুতায় ইংরেজিতে বিদেশী তথা স্বদেশীর পক্ষে একটা সহজ আপাতসুবিধা আছে, যেটা রসিক কাব্যে নেই। এবং সুরাওআর্দির কীর্তিই তাঁর বিদগ্ধ লঘু নাগরিক কবিতাগুলি। সুরাওআর্দির সমাজ-ভ্রমর নাগরিকোচিত বৈদগ্ধ্য ও ইংরেজিতে তাঁর অন্তঃশীল মমতায় তাই সোনায় সোহাগা হয়েছে। বিদেশীর পক্ষে এ কৃতিত্ব বিস্ময়কর ও প্রণম্য। অবশ্য বিদেশীসুলভ কথার নেশায় এখনো তাঁর মধ্যে মধ্যে শিথিলসমাধি ঘটে, ফলে কবিতা হয়ে পড়ে গৌণ, মুখরোচক শব্দটাই হয়ে ওঠে মুখ্য। ইএটসের ভাষায়, তাঁর ফর্ম্ বা প্রজ্ঞামাত্রিক ভাবনা নেই, তাঁর প্রেরণা গন্তের আভিধানিক শব্দস্বাতন্ত্র্যে, কাব্যের অখণ্ড কেলাসিত রূপ তাঁর আয়ত্তে নয়। তাই obstreperous বা lone কথাদুটি তাঁকে পেয়ে বসে। তাঁর কথাপ্রয়োগ প্রায় হয়ে ওঠে স্থানকালপাত্র-বোধহীন, তাতে আর আকস্মিক বিস্ময়ানন্দও থাকে না। তাই চীনাসাগর থেকে তাঁর কবিতায় ritornels দেখেও বিচলিত হই না, যদিচ কথাটি গতিয়ের ভিনিসীয় কবিতায় সার্থক।

এই গদ্যস্বভাবের আরেকটি দিক দেখি তাঁর কাব্যে মহাজনের প্রতিধ্বনির বিশেষত্বে। প্রথম কবিতায়ই ব্রিজেস্-মার্গে-তাঁকে দেখি এবং যেহেতু ব্রিজেসের কাব্যে আবেগ ও শব্দস্রোতের উচ্চাবচ নেই, তাই সুরাওআর্দিও এখানে প্রায় অখণ্ডতা অর্জন করেছেন। প্রসঙ্গত, কীটস্ ও ইএটসের অনুরূপ তাঁর সমাসযোজনা যথেষ্ট রসঘন হয় নি, এমন কি বাধ্যতামূলক বলে'ই মনে হয়। যেমন মনে হয় The Asoka Tree-নামক উপাদেয় মুক্তছন্দ কবিতাতে in the days of yore। কিন্তু পরের কবিতাটি জয়সের সঙ্গে তুলনা করলে সুরাও-আর্দিকেই অভিনন্দিত করতে হবে। অথবা তার পরবর্তী কবিতাটির Beside the primrose landslides of the South অডেনের হাতে মানায় কিন্তু But abating my sense?

এখানে বলা দরকার যে সুরাওআর্দি মহাকবিদের রচনা পাঠ করেছেন বটে, যেমন প্রত্যেক ভদ্রলোকেরই করা উচিত; কিন্তু কাব্য তাঁর পেশা নয়।

তাঁর বিদগ্ধ মনে তাই অনুরণনই হয়, তাঁর রচনা অনুকরণ হয় না। এটা মনে রাখলে When You Unloose Your Hair, Foam of the Sea, I Sat, Lines for an Album, You Will Not Miss Me (মনরো না হমবর্ট্ উল্‌ফ্ ?), An Old Man's Songs—I নম্বর (সাইমন্‌স্ ?) নামে কবিতাগুলিতে আর ইএট্সের সন্ধানে ঘুরতে হয় না অথবা Moon in the Skyতে এচ্-ডি-কে বা The Cotswolds-এ ব্লণ্ট্, মেরেডিথ্ ও টেনিসন্‌কে ; My Thoughts Flock to Thee-তে মেনেল্‌কে ; In Russia-তে ভেরলেন্‌কে ; In the Earth-এ টম্পসন্ বা এ-ই-কে অন্বেষণ করতে হয় না। বরঞ্চ তারিফ্ করতে হয় তাঁর কুম্ভীরকবৃত্তির আশ্চর্য্য নৈপুণ্য এই উদ্ধৃতিতে :

Ruth singing waist-high midst my lands,
Reaping with condid hands
The lean harvest of my hazardous plight !—

যদিচ A Fragment কবিতাটি শিথিল ও কীট্সীয় উক্তির পরে O Shulamite, my Shulamite ইত্যাদিতে মন বিক্ষিপ্ত হয়।

তাঁর শাস্ত্রমানানুগ কবিতাগুলিতে আপত্তি উঠতে পারে যে, গাঢ়বদ্ধ বহিরঙ্গ রূপে পদ্যসুলভ সংহতিতে তিনি সংযমের প্রশংসনীয় চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু সেই কারণেই ফাঁকিও দিয়েছেন। কিম্বা Narcisse Mallarmeenতে তিনি মোটেই মালার্মেপন্থী নন, একথাও উঠতে পারে। অবশ্য সুরাওআর্দির প্রকৃতি ও প্রস্তুতিতে সেটা সম্ভবও নয়, Prefaces-এর শেষ প্রবন্ধে মালার্মে বা ভালেরি সম্বন্ধে সমাচারেই তা বোঝা যায়। মালার্মের নাম না করে' সাইমণ্ড্‌স্, ডগ্‌লস্ বা ওশনেসির নামই হয়তো তাঁর করা উচিত ছিল। এলিঅটের মতো তিনিও গতিয়ের ভাস্কর্য-কঠিন চতুষ্পদী ব্যবহার করেছেন এবং যেখানে এলোপাথাড়ি নানাবিধ জহরতের নাম করেছেন, সেখানে হয়তো আমাদের গতিয়েকে—বা প্রাচীন মার্ভ্‌ল-কে মনে পড়বে না, পড়বে ঐ সাইমণ্ড্‌স্‌কেই, ইএলোবুক্ ও রাইমর্স্ ক্লবের কবিকিশোরদেরই। এবং সেটা নিন্দার্হ নয়। সুরাওআর্দি মানুষ নাইন্‌টিইস্‌মেই। তাঁর অন্যান্য কবিতাতেও তা বোধগম্য। তাঁর Prefacesও এই কথার সাক্ষ্য, এমন কি তাঁর গদ্য বাক্যরচনাতেও, পেটারের ও সংবাদ-পত্রের সংমিশ্রণে।

কিন্তু To My Dog, Letter from O'ni ইত্যাদি কবিতা সকলেরই ভালো লাগবে—বিশেষ যদি ক্যাভালিঅরভঙ্গী তাঁদের ধাতে সয়। কারণ শাহেদ্ সুরাওআর্দি ইরানী-ইংরেজি শেষ ক্যাভালিঅর্। দ্বিতীয় চার্লস্ আজ মৃত, সপ্তমের নাতি অষ্টম এডোআর্ড আজ বনবাসে, যাযাবর ইরানীরা আজ অনেকেই ইউ-এস্-এস্-আরে প্রগতিশীল—তাই সুরাওয়ার্দির At Tennisএ মনে হয়—

Friend, the world smashes in my brain—
Girders and plinths, limbs and stars !
In the sudden upheaval of unbidden centuries
The lands convulse with cataclysmal speed.
Flaming widenostrilled monsters plunge
Across the convex of the skies.
I stretch torn hands to reach your piteous hands ;
I seek through tattered space your ample eyes.
But you,
Stranger to apocalyptic needs,
In the narrow orb of your accurate mind
Rotate from hour to hour :
Dinner for two ;
Tennis at four ;
Odol and powder before going out to friends ;
Cautious caresses ;
Honourable amends ;
Lips painted to the crimson of a wound
After sentimental flutters ;—
Whatever happens one should go to sleep
Carefully drawing to the shutters……
Oh ! Passion lion hearted, that ruled calamitous wilds,
Browses on well-laid lawns, a weary sheep.

শেষ দুই লাইন প্যারডি মনে হলেও, আমাদের অনুকম্পা উচ্ছল হয়ে' ওঠে কবির জন্যে এবং অপ্রত্যাশিত দাবিতে কাতর নায়িকার জন্যেও, যাঁর মধ্যে না

পাসিওনেরা বা মাদাম চাং-কাই-শেককে খোঁজাটা অবিচার অথচ অবস্থাবিশেষে হয়তো স্বাভাবিক।

সুরাওআর্দির এই কবিস্বভাবের বিদগ্ধ নাগরিক বৈশিষ্ট্য মনে রেখে তাঁর অধ্যাপকোচিত প্রথম আত্মপ্রকাশ Prefaces বা মুখবন্ধমালা পড়লে পাঠকেরই সুবিধা। কারণ যস্মিন্ দেশে যদাচার এবং সুরাওআর্দি যে সভ্যজগতে বাস করেন, সে বিদগ্ধ তত্ত্ববিশ্বে পাণ্ডিত্য কারো পেশা হতে পারে না, সেখানে শিল্পীর ফরমায়েস্ থাকলেও সেখানে কেউ শিল্পী নয় আর পুরাতত্ত্বে বা ইতিহাসে বা নৃতত্ত্বে তথা শিল্পানুরাগে আত্মহারা হওয়া সে জগতে বর্বরতারই নামান্তর। তাই প্লেটোর নাম করলেও তাঁর জপমন্ত্র সৌন্দর্য, সক্রেটিসের টোকালন নয়। প্লেটোর ভ্রান্তপাঠে তাই সুরাওআর্দির মনে হয় আর্ট ও সুন্দর সমপদবাচ্য, যেমন ব্যাবহারিকার্থ ও পুরুষার্থ নিয়ে পাত্রাধারতৈলমূলক বাক্যজাল বিস্তারের পরে তিনি প্রস্তর যুগের শিল্পীর ম্যাজিকাল বা অথর্ববৈদিক আর্ট বিষয়ে যা বলেন, তা বর্কিট বা চাইল্ড্, বল্ড্উইনব্রাউন্ বা ব্রোইল্ কারো মাথাতেই আসে নি।

এ সব অনুরূপ তথ্য তাঁর প্রথম প্রবন্ধ On the Study of Indian Arts-এই পাঠক পাবেন। বহুকাল আগে রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষের এই বিষয়ে একটি ছাত্র-বোধ্য প্রবন্ধ পড়েছিলুম, সেটি লেখার পরে ত্রিশ বছর কেটেছে, অনেক জ্ঞান বেড়েছে, তবু সুরাওআর্দি সে লেখাটি সবিনয়ে পড়লে তাঁর ভ্রান্তি-বিলাস হয়তো কমত। কিন্তু তাঁর প্রাগিতিহাসিক গবেষণা তাঁর মনোলৌল্যই, যার দুঃসাহস এবং নিশ্চিন্ততা চাইল্ড্, পীক্ বা ফ্লুরের ঈর্ষা জাগাবে। অবশ্য প্রবন্ধটিতে তিনি নিজের কীর্তিঘোষণার সঙ্গে উর্ধ্বশ্বাসে অনেকেরই নামোল্লেখ করেছেন। তবে সে নাম, শুধু নাম, বিনয়ী পাঠককে ধাঁধানো ও ভয় দেখানো মাত্র। এবং এস্কিমো ছাড়া য়ুরোপের সর্বদেশের সেইসব পণ্ডিতদের অন্তত অনেকেই, যথা সারে বা ডাল্টন্ যে সুরাওআর্দির অনুশীলন ও সিদ্ধান্তের জন্যে তাঁদের দায়ী করলে মামলা আন্‌বেন, সে কথাটা ঘুণাক্ষরে জানান্ নি। শেষে শুধু স্তম্ভিত পাঠকদের তিনি জানিয়েছেন যে, যাই হোক্ শেষ পর্যন্ত তিনি শিল্পকারু বা টেক্‌নিক্ বিচার এবং সমাজতত্ত্বের মিলিত সাহায্যে শিল্পালোচনার পক্ষে। আম্‌রাও তাই। ফলে উদ্‌গ্রীব হয়ে' দ্বিতীয় প্রবন্ধের লোকশিক্ষা ও শিল্প

বিষয়ে প্রয়োজনীয় সাধুকথার চর্বিতচর্বণ সাঙ্গ করে' পঞ্চাশপৃষ্ঠার ইন্দোপারসীক চিত্রে এসে স্বদেশে স্বভূমিতেও বেঘোরে ঘুরি।

উপভোগ্য তাঁর দায়িত্বহীনতা বটে, কিন্তু হায়, সমাজতত্ত্বের বিস্তর প্রস্তুতি, শিল্পজ্ঞানের সাধনা এবং মনোধর্ম বিচারের সতর্ক সংবেদ্যতা যেখানে নেই, সেখানে উদ্ধত অগ্রজ-দ্রোহিতায় অন্তত পাঠকের কোনো পদবৃদ্ধি হয় না। কারণ, স্বকীয়তায় তন্ময় সুরাওআর্দি ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, শিল্পশাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান সবই ভুলে' গেছেন গোপাল ভাঁড়ের সেই বিশ্বপণ্ডিত উৎকলবাসীর মতো। তাই পারস্য তাঁর কাছে একচ্ছত্র রাজবংশের একটানা ইতিহাসের পেয়ালায় ঘনীভূত। তাই তাঁর মহাব্যসন উদ্ভট ইরানতত্ত্বে বলে যে উক্ত ইরানীরা পারস্যের অনাদ্যন্ত মধ্যপদলোপী রাজা অর্থাৎ এলামীরা ছাড়াও সেলুকীয়, পার্থীয়, দামাস্কী, খলিফা, বোগদাদী খলিফা, গজনীক, সেলজুক তুর্কী, মঙ্গল, তৈমুরী ইত্যাদি বহু বিদেশী বংশ বাদ দিয়ে তাঁর পারস্যের ইতিহাস শুধু একিমেনী, সাসানী ও সফবীতেই নিবদ্ধ। কিন্তু তিনি মার্কস্‌বিরোধী হলেও ইতিহাস তাঁর মুখাপেক্ষী নয়। আর আমাদেরও হবার হেতু নেই। একাধিক চিন্তাশীল ও বিদ্যানম্র মনীষী সুরাওআর্দির চেয়ে দীর্ঘতর জীবন কাটিয়াছেন এই নানা উৎসের মধ্যে পারস্যের শিল্পেতিহাস উদ্‌ঘাটনে। তাই সর টমস্ আর্নল্ড যেখানে পদক্ষেপে দ্বিধান্বিত, সেই অজ্ঞানশান্তিতে সুরাওআর্দি ধাবমান হলেও আমরা হব না। তাই সারের সঙ্গে আমরা পারস্য শিল্পের জন্ম খুঁজব আসীরিয়ায়, গ্রোমানের সঙ্গে ঘুরব মিশরে। এবং পারস্যে সুমেরীয় প্রভাব আর গ্রীক্, রোমান্ ও পরে বাইজান্টীয় এবং আরবীদের প্রায় ক্রোক্ করবার মতো ঋণ আমরা হিসাব করতে যাব, সুরাওআর্দির রসিক সঙ্গ অগত্যা ছেড়েই। চীনের কুটুম্বসংকারও আমাদের গোচরে আসে পূর্বোক্ত পণ্ডিতগণ এবং সাকিসিঁয়া, মার্টিন বা রুশের সাহায্যে। তদুপরি সহজবোধ্য বিনয়ী বিনিঅন্ বা ব্যাজল্ গ্রে তো আছেনই।

তাই কুমারস্বামী, হ্যাভেল্, ব্রাউন প্রভৃতিকে সুরাওআর্দির ভোজপুরীতে ভূমিসাৎ দেখেও অস্থির হই না, যখন দেখি যে মুঘল ও রাজপুত চিত্র পারসীক হল এই তিন কারণেঃ প্রথমত, মুঘল, রাজপুত ও পারসীকদের ইতিহাসেতর পূর্ব-পুরুষ হল ইরানীরা; দ্বিতীয়ত, পারসীক তথা রাজপুত চিত্রের বর্ণাঢ্যতা;

তৃতীয়ত, কোনো কোনা পাহাড়ী চিত্রের পটভূমিতে স্থাপত্যনিদর্শন নাকি পারস্যসুলভ এবং হিমালয়প্রাপ্য তন্নপর্ণ গাছের আলঙ্কারিক প্রয়োগ নাকি মূর্খ উদ্ভিদ্‌তাত্ত্বিকদের মত উড়িয়েই পারসীক সাইপ্রেস্ বৃক্ষজ।

তাই আগ্নেয়গিরির এই মূষিকপ্রসবে আমাদের আর কোনো বিস্ময়ের কারণ নেই। কিন্তু ক্ষুণ্ণ হয়েছি লেখক পারসীক জাতীয় মহাকাব্য পড়েন নি দেখে, সে ত ইতিহাস নয়! পড়লে তিনি জানতেন যে তাঁর একচেটে যাযাবর ইরানীরা সেখানে ইরানী নয়, তুরানী; এবং ইরান-তুরানে যুদ্ধ চলে। অধিকন্তু মিঞ্জো প্রমুখ বিশেষজ্ঞের মারফৎ পারস্যের ভিতরে কিরকম অনিরানী মধ্যএসিআর মঙ্গল প্রভাব গিয়াছিল, তাও সহজেই জানা যায়। ষ্টাইন্, পেলিও, মুন্‌ষ্টের্‌বের্গ গ্রুন্‌বেডেলের সমর্থিত একটি তথ্যও লেখক চেপে গিয়েছেন, অজ্ঞাতসারে হয়তো, কারণ তাতে তাঁর ইরানীকীর্তনের হানি হয় না। বরঞ্চ মধ্যএসিআয় যে ভারতীয় ধর্মশিল্পের উপনিবেশ ও পরে স্বকীয় বিকাশ, যার পারমাত্রিক শাখা গেল চীনে এবং সাংসারিক প্রেরণা গেল পারস্যে,—সেই যোগসূত্র ধরে' সুরাওআর্দি ভারতীয় ও পারসীক শিল্পের আরেকটা রাখী বন্ধন করতে পারতেন। যেমন পারতেন বৈদিক পুরুষে বা ইহুদি আদিপিতা অ্যাডামের কথা তুললে।

পাঠক বল্‌তে পারেন, তাহলে রাজপুত চিত্র কি করে' ভিন্ন প্রকৃতির? যেহেতু রাজপুত চিত্র হচ্ছে মূলত ফ্রেস্কো বা টেম্পেরাচিত্র আর পারসীক চিত্র মিনিএট্যের বা আলঙ্কারিক এবং ইলস্ট্রেশন্ বা চিত্রোপাখ্যান। এ দুএর জাত আলাদা, ধর্ম আলাদা। বাঘ জোগিমারা অজন্তার ঐতিহ্যে রাজপুত চিত্র, তা সে অভিজাত বা লৌকিক, রাজস্থানী বা পাহাড়ীই হোক্, প্রাণ পেয়েছে, যার প্রমাণ বহু বিরাট চিত্রে ও চিত্রের খস্‌ড়ায় এবং তার অবশেষ এখনো জয়পুর প্রাসাদে দ্রষ্টব্য। তারপর রঙের বিশেষত্ব, রঙের প্রয়োগ, পটভূমিতে হিমালয় বা রাজপুতানার নিসর্গদৃশ্য; ভারতীয় প্রতীক ব্যবহার যথা জলের প্রতীক চক্রাবর্ত, ত্রিকোণোপস্থ হ্রদসরোবর, পদ্মাদি ফুল, বক-সারসাদি পাখি, ভারতীয় গাছগাছড়া তো আছেই। সর্বোপরি রাজপুতের এবং তদ্‌গৃহীত পরিণত মুঘল চিত্রে পারস্যাজ্ঞাত বর্তনা বা সর্ফেস্ মডেলিং বাই শেডিং এবং আকাশ বা স্পেস্ ও পরিমণ্ডল বা অ্যাট্‌মস্‌ফিঅর-এর আভাস। এই গোত্রশিল্পের ক্রমবিকাশ এখনো সাক্ষাৎ না জানা গেলেও এর ভারতীয় ধারাবাহিকতা

অনুমেয়, বিশেষ করে' সমাজচৈতন্যব্যাপী ব্যক্তিঅতিরিক্ত শিল্পধর্মের কথা মনে রাখলে। বিষ্ণুপুর বা মেদিনীপুরের পট ও পাটায় এই ঐতিহ্যেরই বঙ্গীয় বিকাশ, নেপালী চিত্রেও এর অনুরূপ সাক্ষ্য। জৈনচিত্রকে নিন্দা করে' রাজপুত-চিত্রের ঠিকুজি কষতে পারস্যে যাওয়া সুরাওআর্দির খেয়াল মাত্র—চীনে গেলেও বরং বুঝতুম, কারণ কাগজ, তুলি ও রঙের আমদানী হয়তো একদা চীন থেকেই হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি কুমারস্বামীকে সংশোধন করে বলেছেন, বাজারের কথা "তিব্বতী" থেকেই নাকি পারসীক প্রভাব স্পষ্ট। আমাদের কাছে নয়; তিব্বত পারসীক বা ইরানী নয় বলে'ই, চৈনিকাত্মীয় বলে'ই আমরা জানি। আর রাজপুতচিত্রের ষ্ট্রেন্‌গেন্ আন্টিকেন্ লিনিএনফ্যুরুং বিষয়েও তিনি অন্ধ, যদিচ এই বলিষ্ঠ প্রাক্‌সভ্যসুলভ লৌহতন্ত্রবৎ কঠিন বাহ্যলেখার তুলনা খুঁজতে যেতে হয় মিশরে, আসীরিয়ায়, মাইকেনিতে, আদিম গ্রীসে।

কিন্তু তাঁর মনই বিপরীতধর্মী, তাই তিনি মুঘলচিত্রের দেশী পরিণতিতেও শুধু পারসীক মার্গ দেখেন, শিল্পীর দৃষ্টিতে যা দেখা অসম্ভব। আর তিনি মুঘলচিত্রে শুধু পারসীক গজল, দ্বিপদী বা সোরাব-রুস্তম্ ও বহরাম্‌গোর্-আজাদাকেই দেখেন (লয়লামজ্‌নুকে দেখেন না), যদিচ সামান্যশ্রমেই তিনি জান্‌তে পারতেন যে আকবরের রাজত্বেই রামায়ণ, মহাভারত, যোগবাশিষ্ট, নলদময়ন্তী কথা, অথর্ববেদ, হরিবংশ, পঞ্চতন্ত্র ইত্যাদির অনুবাদ চল্‌তি হয়েছিল। গোআলিঅর-প্রসাদে রজম্-নামা নামক মহাভারতের আকবরী সচিত্র অনুবাদ এখনো রক্ষিত। এমন কি, বিজ্‌াদের কালে সূফীদের প্রতাপ বিষয়েও সুরাওআর্দি অচেতন। তাই তিনি পূর্বাচার্যদের ব্যঙ্গ করে' বলেছেন যে পারসীকচিত্রের নাটকীয় বা বর্ণনাত্মকগুণ তাঁদের চোখের দোষ, যদিচ তিনি কোনোমতেই চক্ষুবিশারদ নন্ বলে' তাঁর চেয়ে অর্নল্ড্ বা বিনিঅনের উপরেই আমাদের আস্থা। এবং এ প্রসঙ্গে ও অন্য প্রবন্ধেও তিনি ইস্তাহার দিয়াছেন যে ভারতীয় শিল্পই উপাখ্যানাত্মক ও নাটকীয়। কারণ ভারতীয় শিল্প ধর্মতান্ত্রিক ও শিল্প-শাস্ত্রানুগ। কিন্তু বিড়াল কখনো কখনো থলি থেকে বেরোয় এবং বিজাদ্-কে সুরাওআর্দি বলে ফেলেন প্রাচ্যের রাফাএল। তিনি যে বতিচেল্লির নাম করেন নি, সেটা তাঁকেই সাজে। সুধী পাঠককে এই তুলনায় রাফাএল বিষয়ে অদ্ভুত ভ্রান্তির বিশদ্ ব্যাখা অনাবশ্যক, শুধু রাফাএলের বহুধাপ্রতিভার এক দিক স্মর্তব্য—যে রাফাএল উপাখ্যানচিত্রের শ্রেষ্ঠ শিল্পী।

এই চিরসবুজ অবুঝ রোমান্টিক মনোবৃত্তি ও তজ্জনিত বিশ্বের শিল্পধর্মের প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানাভাবে যামিনী রায়ের উপর প্রবন্ধ বা A Nation's Art-ও তাই গোড়ায় গলদে টলমল। লোকশিল্প সম্বন্ধে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি থাকলে তিনি আর গান্ধীজিদের ধমক দিয়ে ইতিহাসবিমুখ হয়ে' লোকশিল্পের শান্তিনিকেতনী প্রাণহীন উজ্জীবন কাম্য ভাবতেন না। জাতির সমষ্টিগত চিন্তাধারা ও শিল্পৈতিহ্যের বংশপরম্পরায় যে লোকশিল্পের জীবন ও জীবিকা, এ আর্যসত্য নৃতত্ত্ব মনোবিজ্ঞান না পড়ে'ও স্থূল শুভবুদ্ধিতেই বোঝা উচিত। কিন্তু সমাজোৎসারিত এই সহজবৃত্তি ভুলে' লেখক গেয়েছেন যে, লোকশিল্প মহান, লোকোত্তর এবং সেইখানেই বিদেশী শিল্পের নিছক শিল্পগত চালের বিশেষ প্রভাব অন্বেষ্য। আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে সভ্য শিল্পী, যথা পিকাসোর কথা তিনি ভেবেছেন বা হয়তো পড়েছেন যে পল্ ক্লী কি রকম তাঁর ছবির পূর্বজ খুঁজেছেন কপ্টিক বস্ত্রে বায়জান্তীয় প্রস্তরখচিত কুট্টিমে, গথিক ভাস্কর্যে, ঈষ্টার দ্বীপের প্রতিমায়, আলাস্কাএস্কিমোর মুখোসে, অষ্ট্রেলীয় কালো মানুষের বল্কলচিত্রে, প্রাচীন কাঠখোদাই-এ, প্রাক্‌জর্মান শিল্পে, এবং এল্ গ্রেকো, সেজান, রুসো, পিকাশো, গোইআ, ব্লেক্, মাতিস্ বা বিআর্ড্‌স্‌লি-র ছবিতে।

ফলে কালিঘাটের পুতুল হয়ে' পড়েছে মিশরাগত। সুরাওআর্দি বলেন তার হেতুও স্পষ্ট: বাংলাদেশ সমুদ্রতীরে অর্থাৎ মিশর-বাংলায় পি-এণ্ড্-ও জাহাজের যাতায়াত তো খুবই বেশি। ব্রতচারী নাচে ক্ষণে ক্ষণে যে মিশরী পার্শ্বচিত্র ফোটে, সেটা তিনি কিন্তু লক্ষ্য করেন নি। উড়িষ্যার কুটীর-চিত্রণও কি মিশরী চিত্রের কথা মনে আনে না? বাংলা মেয়েলি ব্রতে যে বৈদিক সামের এবং মিশরী মন্ত্রের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়, সে বিষয়েই বা সুরাওআর্দি মৌন কেন? আর বাংলা আল্‌পনার সংকেতিতালঙ্কার প্রতীক কি জার্মানি-তে বা স্কট্‌ল্যাণ্ডে, আমেরিকায় বা চীনে, রাশ্যায়, বা পূর্বএসিআয় তিনি দেখেন নি? এদেশী মাটির পুতুলের সঙ্গে কাণ্ডিয়ায় পালাইকাস্ত্রো-প্রাপ্ত নৃত্যপ্রতিমার সঙ্গে কি মিল নেই? যামিনীবাবুর একটি ছবির মুখ ও ভারতীয় মধ্যযুগান্তিক অহল্যাবাই জাতীয় দেব-মূর্তির সঙ্গে বের্লিনস্থ কপটিক ব্রন্‌জ ধূপচির সাদৃশ্য বা গিনি প্রদেশস্থ মুখোস বা বেনিনের ব্রন্‌জ মুখের সমতুল্য ভারতীয়মূর্তি বা মুখ কি তিনি দেখেন নি? ভারতীয় শিল্পের ভঙ্গ দেখে কি তাঁর মনে হয় নি

যে ভারতীয় শিল্পশাস্ত্র বা প্রতিমাশাস্ত্র গ্রীক প্রভাবে মানুষ, কারণ এফেসাসী হর্মিস দণ্ডায়মান আমাদেরই পরিচিত ভঙ্গে? তবে তিনি বলেছেন যে,—রাজপুতনায় বাহুলেখাময় খসড়া চলিত থাকলেও, বা অজন্তায় খস্‌ড়াচিহ্ন দৃশ্য হলেও, প্রতিবিহিত প্রযোজনা পারসীক আম্‌দানি। অতঃপর তিনি বলেছেন কন্দাকৃতি পল্লব প্রায় সব দেশের লোকশিল্পে, যথা বাংলা পটে বা রাশ্যান্ লুবকে সুলভ হলেও রাজপুত চিত্রের ঐরকম গাছ না কি ইরানী। এখানে পাছে পাঠক ভাবেন যে সুরাওআর্দি নিজেকে পারসীক মনে করেন, তাই জানানো ভালো যে ডি, এচ্ লরেন্সের পত্রাবলীতে প্রকাশ, সুরাওআর্দি আরবী, সৈয়দ।

কিন্তু সত্যই তাঁর আত্মবিসম্বাদী কথার কোনো ব্যাখ্যা নেই। পারম্পর্যহীন ও একেবারে বিপরীত এলোমেলো কথায় তাঁর অসতর্ক লেখা এত কণ্টকাকীর্ণ যে তার উদাহরণে অবলীলায় পাঁচ পাতা না ভরিয়ে একবার যামিনীরায়ের উপরে প্রশংসামূলক প্রবন্ধটিই চকিতে দেখা যাক্। তার মধ্যে তিনি যে ভর্টিকাল বা ঊর্ধমুখ ও হরাইজণ্টাল বা অনুপ্রস্থ রেখা নিয়ে' বা ধর্মতান্ত্রিক ও ধ্রুপদী এবং দেশী রীতি নিয়ে' শিল্পজ্ঞম্মন্য কায়দা অকারণে দেখিয়েছেন সে বিষয়ে না হয় বোরিঙ্গার বা ব্বোল্‌ক্লিনের কথা ভেবে ধৈর্য ধারণ করা যাক্। কিন্তু যামিনী রায়কে যে তিনি নিজের রোমান্টিক কল্পনায় বাক্‌শক্তিহীন অ-বুদ্ধিবাদী বলেছেন তার মধ্যে সত্য কোথায়? যামিনীবাবুকে আমার চেনার সৌভাগ্য আছে। তিনি নিজের ও আনুষঙ্গিক শিল্প সম্বন্ধে জটিল ও গভীর আলোচনা করে' আনন্দ পান এবং আমাদের শিক্ষাদান করে' থাকেন। তিনি কোনোমতেই অন্ধ তাড়নায় তাঁর চিত্রের আনন্দচিন্ময় রেখাশুদ্ধিতে সিদ্ধিলাভ করেন নি। এবং তাঁর বাউলচিত্রের মধ্যে কোনো বিকলাঙ্গ নেশাখোরের ঘোর নেই এবং তাঁর বাউল আপন ভূতমাত্রিক রূপেই চিত্রের শিল্পগত প্রজ্ঞামাত্রায় বিরাজমান, বাউল যিনি দেখেন নি, তাঁর কাছে তা মনে না হলে'ও। তেম্‌নি অন্তঃসারহীন ও ভিত্তিহীন যামিনীবাবুর ছবিকে প্রাকৃত বা বর্ণনাত্মক বলা। আর ঐ হরতনমার্কা বক্ষ সম্বন্ধে গবেষণারই বা সার্থকতা কি।

সুরাওআর্দির পক্ষে তো এসব কথা বলা বঞ্চনামাত্র। কারণ তাঁর মনের ঝোঁকই এই দিকে! সেই জন্যেই তো তাঁর মুঘল প্রতিচিত্র এত ভালো

লাগে, তাই তাঁর পারসীক পুস্তকচিত্রে এত কাব্যি জাগে। তিনি তো আর রজর্ ফ্রাই বা বেরেন্সন্ নন, সাহিত্যবিলাসী শিল্পবিলাসী তাঁর কবিকিশোরমন তাই যাযাবর ইরানী ঘোড়সওয়ারকে যেখানে সেখানে লাফাতে দেখে আত্মহারা হয় এবং তিনি মিশরী যুগের সাসানী মুদ্রাঙ্কিত এই প্রতীকটি বাংলাপটে খুঁজে পান ইরানী প্রভাবের আরেকটি নমুনা হিসাবে। অবশ্য প্রতীকতত্ত্বে তা সমর্থন করবেনা, এলিঅট্স্মিথের বিস্তারপ্রসারে বা রুথ্‌বেনেডিক্টের কৃষ্টির ছঁকে এ প্রভাব অচল। কিন্তু যাঁর আনন্দ শুধু বাক্যে, শিশু যেমন মাকে নামের নেশায় ডাকে, তাঁর পক্ষে সবই সম্ভব। কিন্তু স্বুরাওআর্দির অজ্ঞাতসারে এই প্রতীক প্রস্তরযুগের মানব মনকেও নাড়া দিয়েছিল। আর তিনি বলেছেন মিশরীরা মগ্ন কালাতীত মুহূর্তের স্তব্ধতায়, চৈনিক ও পারসীকরা সৌখিনতায় ও কারিকুরিতে, এবং ইরানীরা বিরাট স্থাপত্যাত্মক পরিকল্পনায়! বেশি কিছু নয়, ওএলি আর চাং ঈ-র সাহায্য নিলেই তাঁর বোধগম্য হত যে, চৈনিক শিল্পে আশ্চর্য সৌখিন ও স্বকুমার নৈপুণ্য থাকলেও তাদের সাধনা ও সিদ্ধি কঠিন শক্তির সংহতিতে ও অতীন্দ্রিয় অধিদৈবত ব্যঞ্জনায়, পেশী ও অস্থি এবং উচ্ছ্বসিত প্রাণধর্মে। আর বিরাট স্থাপত্যগুণ ভারতীয় শিল্পেও প্রাপ্তব্য, মিশরে, আসীরিয়াতেও তা পাওয়া যায়।

তবে স্বুরাওআর্দির আনন্দ কল্পনাবিলাসে। নচেৎ অমরাবতীর সম্বন্ধে তিনি হঠোক্তি করবেন কেন? অথবা কুশনশিল্পে বিরাটপরিকল্পনা না পেয়ে বস্তুতান্ত্রিক তদ্‌গত কারিকুরিই বা পাবেন কি করে'? কিম্বা সেজানে-র চরিতকারদের সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে সেজানের প্রভাঁসযাত্রায় আত্মপ্রত্যয়ই বা আসে কি করে? ভারতীয় শিল্পে এবং চৈনিকশিল্পে তিনি জীবজন্তু ও মানবশরীর সম্বন্ধে অনুকম্পা না পেয়ে শুধু ইরানী শিল্পেই তা খুঁজে পান। বিলেনস্কির মারফৎ তাঁর জানা দরকার যে নিরাসক্ত শুদ্ধ শিল্পীরা ও শিল্পজ্ঞরা ঠিক উল্টা কথাই বলেন।

আর ঐ ইরানী যে কাল্পনিক, সেটা দুর্বল মুহূর্তে লেখক বলে ফেলেছেন—ইরানী হয়ে পড়েছে, তাঁরই কথায় তুর্কী, শক, চৈনিক আদির লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়। তাই কড্রিংটন বা বাখ্‌হোফেরের নির্মম মতের প্রতিধ্বনি না করেই পাঠকদের জানাই যে, স্বুরাওআর্দি অন্তত ভারতীয় প্রজ্ঞামাত্রিক শিল্প

বোঝেন নি বা দেখেন নি। শিল্পজ্ঞান ও স্বাভাবিক রুচি এবং রসবোধ তাঁর এ বইএ শেষ পর্য্যন্ত নঙর্থক।

এবং সেটা শুধু শিল্পে সীমাবদ্ধ নয়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় নির্দিষ্ট বলে' উপাদেয় ও আমাদের পক্ষে মূল্যবান প্রবন্ধ দুটিতে—On Theatrical Art ও The Modern European Stage-এও তার প্রমাণ মিলবে। যথা, ভারতবর্ষে নাকি জীবনে ট্রাজেডি নেই, কারণ এখানে মানুষ ব্যক্তিসর্বস্ব নয়, সামাজিক জীব। তাই নাকি এখানে নাট্যে ট্রাজেডি নেই, তাই নাকি শান্তিনিকেতনে ও ষ্টার থিয়েটারে মর্মান্তিক ব্যর্থতা ও মৃত্যুর সঙ্গে জোটে অপ্রাসঙ্গিক গান ও নাচ। নাটকের জন্ম এদেশে নাকি ছায়ানাট্য ও বিদূষণ থেকে, বড় জোর না হয় বৈদিক ক্রিয়াকলাপে বা রিটুআল্‌সে আর গ্রীসে নাকি ব্যক্তিসর্বস্ব ডায়োনীসীয় orgies থেকে, রিটুআলসে নয়। বলা বাহুল্য, আরিষ্টটেলী মত যাঁরা মানেন না, সেই সব গ্রীকপণ্ডিতরাও একথা ভ্রান্ত বলেন এবং orgies বা ভোগবিলাস স্বুরাওআর্দির কল্পনাকে যতই চঞ্চল করুক্, ডায়োনীসস গ্রীক দেবলোকে আসন পাবার পরে তাঁর উৎসব যখন হয়ে উঠল রিটুআলস্, তখনই তার থেকে নাটকের উৎপত্তি। আর ভারতীয় নাট্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অধ্যয়নেই জানা যায় যে জীবনমৃত্যুঘটিত ভারতীয় সাধারণ্যসূচক ঈশ্বর, জন্মান্তর, কর্ম প্রভৃতি তত্ত্বের কারণেই ভারতীয় নাটক ট্রাজিকোত্তর। এ যিনি জানেন না, তাঁর নাট্য বিষয়ে প্রবন্ধে ধৃষ্টতা না করে সংবাদপত্রদূত হওয়াই সঙ্গত।

বোধহয় সংবাদপত্রের কথাটা অন্যায়ই হল, কারণ তারও গুরু দায়িত্ব আছে, তার জন্যে কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়। বরং স্বুরাওআর্দি সাহেবকে ভদ্রলোক বলাই সঙ্গত, অতিসভ্য বিশ্বমানবিক সমাজের নাগরিক ভদ্রলোক। শুনেছি এই শ্রেণী না কি আজকাল অনেক প্রাচীন জন্তুর মতোই লুপ্তপ্রায়। এঁদের শেষদলের আন্ত্যলীলা না কি গত শতকের শেষ ভাগে, সপ্তম এডোআর্ডের যৌবনে। এই শ্রেণীর প্রতি মার্ক্সিষ্টদের মতো আমার কোনো বিরাগ নেই—যদি তাঁরা তাঁদের বৃন্দাবনেই আবদ্ধ থাকেন। এবং Prefaces-এর ভূমিকায় স্বুরাওআর্দি যে তাই থাকেন তা জানা গেল। সত্যই উপভোগ্য তাঁর ধন্যবাদ ও বন্ধুকৃত্যের এই আবহ, যেখানে সত্যের চেয়ে চক্ষুলজ্জারই খাতির বেশি। সমগ্র বইটির সার্থকতাই মনে হয় এই ভূমিকার জন্যে।

সুখের বিষয়, কবিতাতে সুরাওআর্দি লক্ষ্মণের গণ্ডীতেই আবদ্ধ। ইংরেজী কবিতার বিরাট ও গভীর ঐতিহ্যের দরুনই হোক্ বা কবিতায় অধ্যাপকোচিত পাণ্ডিত্যপ্রমাণ অনাবশ্যক বলেই হোক্, তাঁর কবিতার বইটি বিনীত ও সুখপাঠ্য। বইটির ছাপাও পাঠকের সহায় হয় যেমন এই ছাপার পার্থক্যেই কেম্ব্রিজ ও কলিকাতা বিদ্যায়তনের তুলনাও সহজ হয়ে ওঠে।

বিষ্ণু দে

অরণ্যপথ—প্রবোধকুমার সান্যাল। (মিত্র এণ্ড ঘোষ)
ককটেল্ কন্‌ফেশন্—মণি বাগচি। (ডি, এম, লাইব্রেরী)
রাজধানীতে ঝড়—আবু রুশ্‌দ্। (বুলবুল পাবলিশিং হাউস)

প্রবোধকুমার সান্যাল শিকারীর সহযাত্রী হ'য়ে অরণ্য পরিভ্রমণ ক'রে যে-অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছেন, 'অরণ্যপথ' তারই কাহিনী। লেখকের নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলি মনে রাখলে প্রচলিত শিকার কাহিনীর সঙ্গে আলোচ্য পুস্তকের পার্থক্য ধরা পড়বে। 'শিকারীর চোখ কেবলমাত্র শিকারের প্রতি, সাহিত্যিকের চোখ শিকার ছাড়া আর সব দিকে।' সেই জন্য রোমাঞ্চকর শিকার-বর্ণনার পরিবর্ত্তে প্রবোধকুমারের রচনায় ফুটে উঠেছে অরণ্যের রহস্যময় রুদ্র-মধুর রূপ। ভ্রমণ কাহিনীতে রোমান্টিক উপন্যাসের অবতারণা করা এবং শিকার কাহিনীতে কেবল মাত্র অরণ্যের রূপ বিশ্লেষণ বাঞ্ছনীয় কিনা, তা অবশ্যই বিচার্য্য। কিন্তু লিপিকুশলতার গুণে কোনো রচনা শিল্পসম্মত ব'লে গ্রাহ্য হ'লে সে-প্রশ্ন আর ওঠে না। এই দিক দিয়ে বিচার করলে লেখকের কৃতিত্ব অসামান্য। আবেগপূর্ণ স্বচ্ছ ভাষা ও কবিত্বপূর্ণ বর্ণনার ভিতর দিয়ে এক অখণ্ড পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে পেরেছেন ব'লে লেখককে ধন্যবাদ।

মণি বাগচি তাঁর 'কন্‌ফেশন্' প্রকাশ ক'রে বিশেষ সুবুদ্ধির পরিচয় দেননি। নিজের যে-রূপ তিনি ভদ্রসমাজে উদ্ঘাটিত করেছেন, সে-সম্বন্ধে তিনি নির্ব্বিকার ব'লেই আমরা তাঁকে বিকারগ্রস্ত ভেবে নির্ব্বিচারে মার্জ্জনা করতে পারি।

তাঁর হাস্যকর মনোবৃত্তি এবং দুর্বিনীত স্পর্দ্ধা এই কারণেই অবজ্ঞেয় ও উপেক্ষণীয়।

আবু রুশ্‌দ্-এর 'রাজধানীতে ঝড়' নামক গল্পের বইখানি সুখপাঠ্য। তাঁর লিখন-ভঙ্গি ও ভাষা সুন্দর। গল্পগুলি নিতান্ত মামুলি ধরণের হ'লেও আধুনিকতার উৎকট প্রয়াস তাতে নেই দেখে সুখী হয়েছি।

অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

চণ্ডালিকা
ক্ষণিকা } শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : (বিশ্বভারতী)

'চণ্ডালিকা' ছোট-ছোট তিনটি দৃশ্যে সমাপ্ত সংক্ষিপ্ত নৃত্যনাট্য। সম্ভবত নৃত্যনাট্য সেই ধরণের নাটক যেখানে নিছক কথোপকথনের চেয়ে দৃশ্যপট ও সুর-সঙ্গীতের প্রাধান্য অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী। এবং বোধ করি সে কারণে মনে রাখা দরকার যে 'এই নাটিকা দৃশ্য এবং শ্রাব্য, কিন্তু পাঠ্য নয়।' গ্রন্থের ভূমিকায় রয়েছে নেপালী বৌদ্ধসাহিত্যে শার্দ্দুলকর্ণাবদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে গল্পাংশ সংগৃহীত। গল্পের ঘটনাস্থল শ্রাবস্তী নগর। ভগবান বুদ্ধদেবের অন্যতম শিষ্য আনন্দ কোনো গৃহস্থের ঘরে নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রে ফিরবার পথে তৃষ্ণার্ত্ত হ'য়ে চণ্ডালকন্যা প্রকৃতির কাছে জল চেয়ে তৃষ্ণা দূর করেছিলেন। তাঁর রূপে মুগ্ধ হ'য়ে প্রকৃতি জননীর সাহায্য প্রার্থনা করে। জননী যাদুবিদ্যা জানতো এবং তারই জোরে আনন্দ এসে পড়লেন চণ্ডালীর ঘরে। পরে নিরুপায় হ'য়ে মহাপ্রভুকে স্মরণে আনলেন। বুদ্ধদেব ধ্যানে সব বৃত্তান্ত অবগত হ'য়ে মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা চণ্ডালীর বশীকরণ বিদ্যাকে দুর্ব্বল ক'রে শিষ্যকে উদ্ধার ক'রলেন। আবেশ-মুগ্ধ আনন্দ নিষ্কৃতি পেলেন।

এ হেন কাহিনী নাতিদীর্ঘ নাটিকার সম্পূর্ণ উপযোগী এবং মোটামুটি চমৎকার। আমাদের সময়ের অভাব, আনন্দেরও অভাব; অল্প সময়ের অভিনয়োপযোগী ক'রে, বিশেষ ক'রে নৃত্য-সঙ্গীত ও দৃশ্যসজ্জার ওপর বিশিষ্ট

নজর রেখে সমগ্র নাটিকাকে নিখুঁত ক'রে তোলবার চেষ্টা হ'য়েছে। এবং শেষ পর্য্যন্ত একথা বোধ করি বলা চলে যে অভিনয় দেখে তবেই 'চণ্ডালিকা'র যথার্থ মূল্যগুণ অধিকতর অসঙ্কোচে নির্ণয় ক'রতে পাঠক সাধারণের পক্ষে সুবিধে হবে।

দ্বিতীয় পুস্তিকা 'ক্ষণিকা'র যে যুগে (১৩০৭ সাল) সর্ব্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ এবং এই বই-এর অধিকাংশ কবিতাই কাব্যরসজ্ঞ পাঠকসম্প্রদায়ের মুখে-মুখে ফিরেছে, সে যুগ বর্ত্তমানে বিস্মৃতপ্রায়। সাধারণ জ্ঞানে প্রতীয়মায়মান হয় এর মূল কারণ নবনবোন্মেষিকা প্রতিভাপ্রসূত পরবর্ত্তী গ্রন্থরাজি। নতুনের নির্দ্দোষ আমন্ত্রণে পুরাতনকে স্মরণপথে পরিহার সাধারণের পক্ষে স্বাভাবিক। অতএব কিছুকাল ধরে' 'ক্ষণিকা'র কবিতাগুলি ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছাপূরণ মাত্র, এবং সেই হিসেবেই প্রথম পাঠার্থীর বিস্ময়ের উদ্রেক ক'রে এসেছে। কাব্যগ্রন্থটির বিষয়বস্তু অবশ্য বহু আলোচিত, সুতরাং সে-প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি বহুল পরিমাণে বাহুল্য মাত্র। ভিন্নতর দিক থেকেও নব সংস্করণ প্রকাশের উপযোগীতা উপলব্ধি করা চলে। আভ্যন্তরীণ কাব্য-বিন্যাসের কোনরূপ তারতম্য না ঘটলেও মুদ্রণপারিপাট্য, প্রচ্ছদপট প্রভৃতি অঙ্গসৌষ্ঠব সংস্কারের দিক থেকে বর্ত্তমান সংস্করণটিকে পূর্ব্ববর্ত্তীদের চেয়ে নিশ্চিত অধিকতর মূল্যবান মনে হবে। মনে হবে, কোনো নতুন বই-ই বুঝি পড়ছি।

শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

শ্রীগোবর্দ্ধন মণ্ডল কর্ত্তৃক আলেক্‌জান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত
ও শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক ১১, কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত।

৮ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা
ভাদ্র, ১৩৪৫

পরিচয়

দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র

[২খ]

মূল কথা

গতবারের 'পরিচয়ে' আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের দার্শনিক মতের মূল কথাগুলি বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। অনেক কথা বলিয়াছি কিন্তু সকল কথা বলা হয় নাই। অবশিষ্ট কথা এই প্রবন্ধে বলিব। প্রথম মত-পরিবর্ত্তনের কথা বলি।

ধারাবাহিক ভাবে বঙ্কিম-সাহিত্যের আলোচনা করিলে দেখা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র অনেক বিষয়ে মত পরিবর্তন করিয়াছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁহার নিজের স্বীকারোক্তি এই :—

আমার জীবনে আমি অনেক বিষয়ে মত পরিবর্তন করিয়াছি—কে না করে? কৃষ্ণ বিষয়েই আমার মত পরিবর্ত্তনের বিচিত্র উদাহরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বঙ্গদর্শনে যে কৃষ্ণচরিত্র লিখিয়াছিলাম, আর এখন যাহা লিখিলাম, আলোক অন্ধকারে যতদূর প্রভেদ, এতদুভয়ে ততদূর প্রভেদ। মত পরিবর্তন—বয়োবৃদ্ধি, অনুসন্ধানের বিস্তার এবং ভাবনার ফল। যাহার কখনও মত পরিবর্তন হয় না, তিনি হয় অভ্রান্ত দৈবজ্ঞান-বিশিষ্ট, নয় বুদ্ধিহীন এবং জ্ঞানহীন।

অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র অসঙ্গতি-জুজুর ভয় রাখিতেন না। মনস্বী এমার্‌সন্ বলিয়াছেন—Consistency is the hobgoblin of little minds—অর্থাৎ সঙ্গতি ক্ষুদ্রচেতাদিগের উপাস্য ব্রহ্মদৈত্য। তাহারা উহার ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিত। বঙ্কিমচন্দ্র এ শ্রেণীর ক্ষুদ্রচেতা ছিলেন না।

সত্য বটে, নবীন বয়সে মিলের প্রভাবান্বিত হইয়া তিনি 'সাম্য' গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, কিন্তু পরে বুঝিয়াছিলেন, All men are *not* born equal—অর্থাৎ সম্ভাবনায় (potentially) সকলে সমান হইলেও জীবে জীবে জন্মগত সাম্য নাই :—বৈষম্যই প্রকৃতির রীতি। তাঁহার নিজের কথা এই,—

"পাশ্চাত্য সাম্যবাদের প্রকৃত মর্ম এখন শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত সম্প্রদায় এই বিকৃত তাৎপর্য্য বুঝিয়া লইয়াছেন যে, মনুষ্যে মনুষ্যে বুঝি সর্ব্বথাই সমান।"

বঙ্কিমচন্দ্র অধিকারী-ভেদ স্বীকার করিতেন। সেই জন্য তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন—'সকলে তুল্যরূপে মোক্ষাধিকারী নহে'।

আরও দেখা যায় পাশ্চাত্যের অনুমোদিত যে স্ত্রীপুরুষের সাম্য—বঙ্কিমচন্দ্র তাহার অনুমোদন করিতেন না। বৃত্তিতে ব্যাপারে শরীরে অধিকারে—নর ও নারী সম নহে—বিষম। কে বড় কে ছোট সে প্রশ্ন উঠিতেছে না—কিন্তু উভয়ে কখনই তুল্যমূল্য নয়। অতএব উভয়ের পক্ষে তুল্যরূপ শিক্ষা, সাধন, জীবন-যাপন অবিহিত। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের কথায় বলি :—

গুরু। ধর্ম জন্য সমাজ আবশ্যক। সমাজগঠনের পক্ষে একটি প্রথম প্রয়োজন বিবাহ প্রথা। বিবাহ প্রথার স্থূলমর্ম এই যে, স্ত্রীপুরুষ এক হইয়া সাংসারিক ব্যাপার ভাগে নির্বাহ করিবে। যাহার যাহা যোগ্য, সে সেই ভাগের ভারপ্রাপ্ত। পুরুষের ভাগ পালন ও রক্ষণ।

শিষ্য। তবে পাশ্চাত্যেরা যে স্ত্রীপুরুষেরা সাম্যস্থাপন করিতে চাহেন, সেটা সামাজিক বিড়ম্বনা মাত্র?

গুরু। সাম্য কি সম্ভবে? পুরুষে কি প্রসব করিতে পারে, না শিশুকে স্তন্যপান করাইতে পারে? পক্ষান্তরে, স্ত্রীলোকের পল্টন্ লইয়া লড়াই চলে কি?

শিষ্য। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, পাশ্চাত্য স্ত্রীলোকেরা ঘোড়ায় চড়া বন্দুক ছোঁড়া প্রভৃতি পৌরুষকর্মে পটুতা লাভ করিয়া থাকে।

গুরু। অভ্যাসজনিত বিকৃতিক দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এ সকল বিচার না করিয়া উড়াইয়া দিলেই ভাল হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র গীতাভাষ্যের একস্থলে স্ব-ধর্মানুষ্ঠানতত্ত্ব বুঝাইতে বলিয়াছেন—

(পরধর্মের) তৃতীয় উদাহরণ, আমেরিকার স্ত্রীজাতির আধুনিক স্বধর্মত্যাগ ও পৌরুষকর্মে প্রবৃত্তি। ইহাতে ঘটিতেছে, স্ত্রীজাতির বৈষয়িক ভিন্নপ্রকার অবনতি, গৃহে উচ্ছৃঙ্খলতা এবং জাতীয় সুখ-হানি। যে স্ত্রীলোকে স্বগর্ভসম্ভূত শিশুকে স্তন্যদানে অসমর্থা, তাহাকে স্মরণ

করিয়া, সহমরণাভিলাষিনী হিন্দু মহিলা অবশ্যই বলিবেন,—'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।'

এই নারীপ্রগতি ও সাম্য-মোহের যুগে এ সকল কথা স্মরণ করা ভাল। আর স্মরণ করা ভাল যে, পাশ্চাত্যেও এ সম্পর্কে বেশ প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে—হিট্‌লারের কবলিত জার্মানি ও মুসোলিনির প্রভাবিত ইটালি তাহার নিদর্শন। এ নিদর্শন যে এক-রাটের খামখেয়াল-প্রসূত নয়—ইহার যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে তাহা প্রদর্শিত করিবার জন্য দুই জন অভিজ্ঞ লেখকের অভিমত উদ্ধৃত করি।

In mind, body and feeling—in character, women are by nature designed to play a different part from men. These differences shew that that part is personal and not general, domestic not public, working by direct contact not by remote suggestion, through the imagination more than through the reason, by the heart than by the head. * * that is to say, that the sphere in which the women act at their highest is the family, and the side where they are strongest is the affection.—Frederick Harrison's Realities and Ideals.

The human race is approaching the parting of the ways for its future destiny. Either, speaking generally, the old division of labour, founded in nature, must continue—that by which the majority of women not only bear but bring up the new generation within the home * * * or on the other hand, women must be brought up for relentless competition with men in all departments of production, thus necessarily losing more the power and the desire to provide the race with new human material. * * * If therefore we are to retain the old division of labour, under which the race has heitherto progressed, then women must be brought back to the home.—Ellen Kay's Love and Marriage. p. 211.

আশা করি ইহার অর্থ কেহই এরূপ বুঝিবেন না যে, নারী অবজ্ঞার পাত্র। কখনই না—

যত্র নার্য্যস্ত পূজ্যন্তে রমন্তে সর্বদেবতাঃ—মনু

বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' লিখিয়াছেন—

'রমণী ক্ষমাময়ী, দয়াময়ী, স্নেহময়ী ;—রমণী ঈশ্বরের কীর্তির চরমোৎকর্ষ, দেবতার ছায়া ; পুরুষেরা দেবতার সৃষ্টি মাত্র। স্ত্রী আলোক, পুরুষ ছায়া।'

বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্মতত্ত্বে' লিখিয়াছেন—

স্বামী সকল বিষয়েই স্ত্রীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—তিনি ভক্তির পাত্র। হিন্দুধর্মে ইহাও বলে যে, স্ত্রীও স্বামীর ভক্তির পাত্র হওয়া উচিত, কেন না হিন্দুধর্ম বলে স্ত্রীকে লক্ষ্মীরূপা মনে করিবে। কিন্তু এখানে হিন্দুধর্মের অপেক্ষা কোম্‌ৎধর্মের উক্তি কিছু স্পষ্ট এবং শ্রদ্ধার যোগ্য। যেখানে স্ত্রী স্নেহে, ধর্মে বা পবিত্রতায় শ্রেষ্ঠ, সেখানে তাঁহারও স্বামীর ভক্তির পাত্র হওয়া উচিত বটে।

কুসাহিত্যের উপর বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ রোষ-দৃষ্টি ছিল—কু-সাহিত্যিককে তিনি বেশ তীব্র কষাঘাত করিয়াছেন—

যাহারা কুবাক্য প্রণয়ন করিয়া পরের চিত্ত কলুষিত করিতে চেষ্টা করে, তাহারা তস্কর-দিগের ন্যায় মনুষ্যজাতির শত্রু, এবং তাহাদিগকে তস্করদিগের ন্যায় শারীরিক দণ্ডের দ্বারা দণ্ডিত করা বিধেয়।

'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"যাহা ইন্দ্রিয়াদি উদ্দীপনার্থ, বা গ্রন্থকারের হৃদয়স্থিত কদর্য্যভাবের অভিব্যক্তি-জন্য লিখিত হয়, তাহাই অশ্লীলতা ; তাহা অপবিত্র, সভ্য ভাষায় লিখিত হইলেও অশ্লীল। আর যাহার উদ্দেশ্য সেরূপ নহে, কেবল পাপকে তিরস্কৃত বা উপহাসিত করা যাহার উদ্দেশ্য, তাহার ভাষা রুচি এবং সভ্যতার বিরুদ্ধ হইলেও অশ্লীল নহে।"

বিলাত হইতে আমদানী 'শ্লীলতাকে' বিদ্রূপ করিয়া তিনি ঐ প্রবন্ধে এইরূপ লিখিয়াছিলেন,—

এখন আমাদের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে, আমরা দেশী জিনিষ সকলই হেয় বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছি, বিলাতি জিনিষ সবই ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। দেশী সুরুচি ছাড়িয়া আমরা বিদেশী সুরুচি গ্রহণ করিতেছি। শিক্ষিত বাঙ্গালী এমনও আছেন যে, তাঁহাদের পরস্ত্রীর মুখচুম্বনে আপত্তি নাই, কিন্তু পরস্ত্রীর অনাবৃত চরণ, আলতাপরা মলপরা পা-দর্শনে আপত্তি।

পাশ্চাত্যের অনুকরণে কয়েক বৎসর হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যে যে অশ্লীলতার স্রোতঃ খরবেগে প্রবাহিত হইতেছে—যাহার ফলে বঙ্গ সাহিত্য ও সমাজ কলঙ্কিত ও কলুষিত হইতেছে, তৎসম্পর্কে আমি চন্দননগরে অনুষ্ঠিত বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতিরূপে যথোচিত আলোচনা করিয়াছিলাম। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করিব না। তবে পাঠককে স্মরণ করাইয়া দিব যে, ঐ সম্মিলনের উদ্বোধন করিতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গভাষার অগ্রগতিতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া সাহিত্যের শুচিতা রক্ষার জন্য সাহিত্যিকগণকে সবিশেষ অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। এই পঙ্কিল উচ্ছৃঙ্খল উদগ্র অশ্লীলতার যুগে বঙ্কিমচন্দ্র জীবিত থাকিলে, বোধ হয় কশাঘাত করিয়াই নিরস্ত থাকিতেন না—বৃশ্চিক (scorpion) ও শঙ্করমাছ ব্যবহার করিতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেন—"কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি"।

'কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে—কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষসাধন—চিত্তশুদ্ধিজনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা কিন্তু নীতিব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন।

অধম অশ্লীলতাদ্বারা কখনই সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি হইতে পারে না। যিনি সুন্দর, তিনি সঙ্গে সঙ্গে সত্য ও শিব—সত্যং শিবং সুন্দরম্। সাহিত্যিকেরা একথা কদাচ যেন বিস্মৃত না হন।

এ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র 'বিবিধ প্রবন্ধে' লিখিয়াছেন—

সাহিত্যও ধর্ম ছাড়া নহে, কেননা সাহিত্য সত্যমূলক। যাহা সত্য, তাহা ধর্ম। যদি এমন কু-সাহিত্য থাকে যে, তাহা অসত্যমূলক ও অধর্মময়, তবে তাহার পাঠে দুরাত্মা বা বিকৃতরুচি পাঠক ভিন্ন কেহ সুখী হয় না।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাধারণ ধর্মমত কিরূপ ছিল? কোঁতের দৃষ্টবাদ, বেন্থামের হিতবাদ, মিলের হেতুবাদ (Rationalism) ও স্পেন্সরের অজ্ঞেয়-বাদ সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র কখন ঈশ্বর প্রত্যাখ্যান করেন নাই। এমন কি—তাঁহার নবীন বয়সেরও কোন রচনা নাস্তিক্যগন্ধি নয়। তিনি 'ধর্মতত্ত্বে' এরূপ লিখিয়াছেন,—

"যদি বল, ঈশ্বর মানি না, তোমার সঙ্গে আমার বিচার ফুরাইল। আমি পরকাল হইতে ধর্মকে বিযুক্ত করিয়া বিচার করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু ঈশ্বর হইতে ধর্মকে বিযুক্ত করিয়া বিচার করিতে প্রস্তুত নহি।"

এমনকি কৃষ্ণচরিত্রের ষষ্ঠ খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে তিনি লিখিয়াছেন—

ঈশ্বর লীলার জন্য এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। জগৎ তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে—তাঁহারই অংশ। তিনি আপনার সত্তাকে অবিদ্যায় আবৃত করাতেই উহা সুখ দুঃখ পাপ পুণ্যের আধার হইয়াছে। অতএব সুখদুঃখ পাপপুণ্য তাঁহারই মায়াজনিত। তাঁহা হইতেই সুখ দুঃখ ও পাপপুণ্য। দুঃখ যে পাই, তাঁহার মায়া; পাপ যে করি, তাঁহার মায়া। * *

"বিদ্যাবিদ্যে ভবান্ সত্যম্ অসত্যম্ ত্বং বিষামৃতে।" 'তুমি বিদ্যা, তুমিই অবিদ্যা, তুমি সত্য, তুমিই অসত্য, তুমি বিষ, তুমিই অমৃত।' তিনি ভিন্ন জগতে কিছুই নাই। ধর্ম অধর্ম, জ্ঞান অজ্ঞান, সত্য অসত্য, ন্যায় অন্যায়, বুদ্ধি দুর্বুদ্ধি সব তাঁহা হইতে।"

বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন বটে—'পরকাল হইতে ধর্মকে বিযুক্ত করিয়া বিচার করিতে প্রস্তুত আছি' এবং ১২৮৪ সালের 'বঙ্গদর্শনে' লিখিয়াছিলেন বটে—'যদি পরলোক থাকে, তবে যে ব্যবহারে পরলোকে শুভ-নিষ্পত্তির সম্ভাবনা, সেই কার্য্যেই ইহলোকেও শুভ-নিষ্পত্তির সম্ভাবনা'—কিন্তু পরিণত বয়সে রচিত 'ধর্মতত্ত্বে' তিনি গুরুর মুখ দিয়া স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—

তুমি পরকাল মান না মান আমি মানি * * ইহকালে ও পরকালে চিরস্থায়ী যে সুখ তাহাই স্থায়ী সুখ * * ইহকালকে আমি একটি পাঠশালা মনে করি। যে এখান হইতে সৎবৃত্তিগুলি মার্জিত ও অনুশীলিত করিয়া লইয়া যাইবে, তাহার সেই বৃত্তিগুলি ইহলোকের কল্পনাতীত স্ফূর্তি প্রাপ্ত হইয়া সেখানে তাহার অনন্ত সুখের কারণ হইবে।

ঐ যে পরলোকের সুখ, বঙ্কিমচন্দ্র ইহাকেই স্বর্গ এবং পরলোকের দুঃখকে নরক বলিয়াছেন।

তাঁহার নিজের কথা এই—

'কৃমিকীটসঙ্কুল অবর্ণনীয় হ্রদরূপ নরক বা অপ্সরা-কণ্ঠনিনাদ-মধুরিত, উর্বশী মেনকা রম্ভাদির নৃত্যসমাকুলিত, নন্দন-কানন-সুবাস-সমুল্লাসিত স্বর্গ মানি না। হিন্দুধর্ম মানি, হিন্দুধর্মের "বথামি"-গুলা মানি না।

অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভবতঃ ভৌম স্বর্গ-নরক মানিতেন না। তাঁহার মতে স্বর্গ-নরক স্থান নহে অবস্থান, place নহে state। আমি বলিতে চাই, স্বর্গ নরক placeও বটে stateও বটে।

বঙ্কিমচন্দ্র মানবজাতির জন্য অতি সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অঙ্কিত করিয়াছেন। তিনি গুরুর মুখে বলিয়াছেন—

যেদিন ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প, এবং ভারতবর্ষের এই নিষ্কাম ধর্ম একত্র হইবে, সেইদিন মনুষ্য দেবতা হইবে। তখন ঐ বিজ্ঞান ও শিল্পের নিষ্কাম প্রয়োগ ভিন্ন সকাম প্রয়োগ হইবে না।

শিষ্য। মানুষের অদৃষ্টে কি এমন দিন ঘটিবে?

গুরু। তোমরা ভারতবাসী, তোমরা করিলেই হইবে। দুইই তোমাদের হাতে। এখন ইচ্ছা করিলে তোমারাই পৃথিবীর কর্তা ও নেতা হইতে পার।

বিশেষতঃ হিন্দুজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন।

গুরু। কিন্তু তুমি দেখিবে, শীঘ্রই বিশুদ্ধ ভক্তির প্রচারে হিন্দু নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া ক্রমওয়েলের সমকালিক ইংরেজের মত বা মহম্মদের সমকালিক আরবের মত অতিশয় প্রতাপান্বিত হইয়া উঠিবে।

শিষ্য। কায়মনোবাক্যে জগদীশ্বরের নিকট সেই প্রার্থনা করি।

মানবের নিয়তি সম্পর্কে আমি অন্যত্র যাহা লিখিয়াছি, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করি :—

উন্নতিই বিশ্বের নিয়ম—Progress is undoubtedly the law of life। কিন্তু প্রথম প্রথম ঐ উন্নতি অতি মন্থর গতিতে অগ্রসর হয়। প্রথমতঃ Arithmetical Progression—তারপর Geometrical Progression. Later still, the meandering stream, when nearing the sun-lit sea, will turn into a mighty torrent, so that in the closing stages of humanity progress will mount up by 'Powers'। কিন্তু শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক, দ্রুতই হউক বা মন্থরই হউক, মানব একদিন না একদিন উন্নতির তুঙ্গ তোরণে আরূঢ় হইবে—and shall become that which entereth not the imagination—'Verily unto him shall I return!'

ইহাকেই এদেশে বলে ব্রহ্মসাযুজ্য—গীতা যাহাকে বলিয়াছেন—'মম সাধর্ম্যম্ আগতাঃ'। যাঁহারা 'মম সাধর্ম্যম্ আগতাঃ' অর্থাৎ যাঁহাদের ব্রহ্ম-ধর্ম সৎ, চিৎ ও আনন্দভাব সুবিকশিত, যাঁহাদের প্রতাপ প্রজ্ঞা ও প্রেম পরাকাষ্ঠপ্রাপ্ত—তাঁহারা, গীতার কথায়, সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ।

ইহাই মনুষ্যের নিয়তি। অতএব মানবের ভবিষ্যৎ খুব সমুজ্জ্বল বটে।

দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আমার মূল কথা এখানে শেষ করিলাম। অতঃপর বঙ্কিমচন্দ্রের দার্শনিক মতের সবিশেষ আলোচনা করিতে হইবে। সে আলোচনা আগামীবারে আরম্ভ করিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সেতুবন্ধ

বাতায়নবর্ত্তিনী প্রোষিত-ভর্ত্তৃকার বিষণ্ণ মৃগনয়নে মুগ্ধ হইয়া কবিতা লিখিবার বয়স পার হইয়া আসিয়াছি।

আসিয়াছি এই জনতাবহুল ঘর্ম্মাক্ত কর্ম্মমুখর বাস্তবতায়। সস্তা দার্শনিকতা নয়, নোঙ্‌রা আলাপও নয়। কারণ, দুটাতেই চাই অনন্ত অবসর ও বিপুল ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স্। যা' আমাদের নাই। জন্মের মুহূর্ত্ত হইতে প্রতি পলে মরিতেছি, বুঝিতে পারি মাত্র সেইদিন, যেদিন মা আসিয়া বলেন, দিতে পারিস্ দুটো টাকা? টাকা। পাবো কোথায়? মা আবার বলেন, রোজগার কর্। বয়স বাড়্ছে না? তাই তো। বয়স বাড়িয়াছে,—জমার অঙ্ক অর্দ্ধেক প্রায় খালি হইয়া আসিয়াছে। অতএব জ্বালাও তোমার অনুসন্ধানের দীপ-বর্ত্তিকা, সুরু হউক প্রাথমিক প্রথাগুলি। আর, সেই মুহূর্ত্তে সান্নিধ্য ঘনিষ্ট করিয়া আনে আমাদের বার্দ্ধক্য।

অর্দ্ধেক মরিয়া যাই আমরা। ক্ষয়রোগীর মতো।

ইন্সিওরেন্স্ কোম্পানীর প্রস্‌পেক্‌টাসের পাতা মুখস্থ করি। হিসাব করিতে বসি ডিভিডেণ্ড্-এর। যেমন মুলো পোদ্দার নাকের ডগায় চশমার ঠুলি দিয়া হিসাব করে। কিসের? জীবনের ঘনায়মান সন্ধ্যার দূরত্বটুকুর?—না জীবনায়নের। যে-রসটুকু পান করিয়া কুমারী অনুপমা সেনের গালের আপেল লোভনীয় হইয়াছিল। যাহার প্রত্নতাত্ত্বিক অস্তিত্বের গৌরবে কুমার ভূদেব পালচৌধুরীর কাছে উপহার আসিয়াছিল একজোড়া প্রবাল: কুমারী মঞ্জুলিকার ঠোঁট।

সাদা বাঙ্‌লায়: টাকা।

অতঃপর সেই টাকা উপার্জ্জনেই আত্মনিবেশ করিতে হয়। কষ্ট করিয়া আর খোঁজ রাখি না স্বর্ণমানের অর্থ কী, অর্থের মূল্য হ্রাসে একটা সাম্রাজ্যের কী উত্থান-পতন হয়। মনে পড়ে সেই গল্প: কার্ল্ মার্ক্‌স্-এর মাতা ভাণ্ডার বাড়ন্ত দেখিয়া একদিন নিদারুণ রুক্ষ কণ্ঠে পুত্রকে বলিয়াছিলেন, 'ক্যাপিটাল্' না লিখে কিছু ক্যাপিটাল্ জোগাড়ের চেষ্টা কর্‌লে ভালো হতো। অতএব মানুষ (?) হইয়া জন্মিয়াছি যখন, অর্থ উপায় করিতেই হইবে।

তবু কবিতা জাগে, জিজ্ঞাসা করি, কেরে নেড়ী ?

অবাক হইয়া যায় নেড়ী, বলে, কা'র কথা বল্‌ছো, দাদা ?

কারো নয়—বলিয়া আবার স্থূলো পোদ্দারের মতো জমাখরচের খাতায় ঝুঁকিয়া পড়ি।

আর নিজেরই অজ্ঞাতে নাকের শিরাতন্তগুলি উচ্চকিত করিয়া রাখি রোমান্স্‌-এর গন্ধের জন্য। রোমান্স্‌ পাই নাই। দেখা মিলিয়াছে নন্দর। জীবনের ট্র্যাজিক কাহিনীগুলি শুনাইয়া ও বোধ হয় গর্ব্বই অনুভব করে।

নন্দকে আমি পছন্দ করি না, আমার সম্বন্ধে ওরও বেশ একটু বিদ্বেষ আছে। তবু, দিনেরপর দিন একসাথে দু'জনে দিব্য কাটাইয়া দিতেছি। ইদানীং ওর সম্বন্ধে একটু কৌতূহলী হইয়া পড়িয়াছি।

ভীড়ের আর অন্ত নাই। বারটি পাশাপাশি গ্রামের মধ্যে এই একটি মাত্র আদালত। ভিড় হইবারই কথা। বিরাট প্রাঙ্গণে মাছির মতো লোক কিল্‌বিল্‌ করিতেছে। বেঁটে পট্‌লারই অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। তোলা উনানে কড়ায় তেল ফুটিতেছে, তা'তে বেগুনী ছাড়িয়া দিয়া পট্‌লা চীৎকার করে, আসেন বাবু, এক্কেকারে টাটকা। ছোপ-ধরানো দাঁতগুলি ওর স্মিতহাস্যে বিকশিত হইয়াই আছে। পরণে কালো হাফ্‌ প্যাণ্ট্‌। আর গায়ে ভি-গলা গেঞ্জী। কালো পাথরে গড়া দেহখানি। নিটোল স্বাস্থ্য। তেলের কড়ায় টস্‌ টস্‌ করিয়া ঘাম ঝরিয়া পড়ে। পট্‌লা দু'হাতে পয়সা কুড়াইয়া শেষ করিয়া উঠিতে পারে না।

আর একজন আছে। পানওয়ালী। দূর গ্রাম হইতে মামলা করিতে আসিয়া ক্ষুধার উদ্রেক হইলেই এক আনার তেলেভাজা আত্মসাৎ করিয়া মিষ্টিমুখের উদ্দেশ্যে মুখে একটা বাতাসা পোরে। এক ঘটি জল খাইয়া কাপড়ের খুঁটে মুখ মুছিতে মুছিতে আসিয়া উবু হইয়া বসে পানওয়ালীর সম্মুখে। অনাবশ্যক আত্মীয়তার সুরে বলে, পান দাও এক খিলি। ডবল্‌।

বাসনা হাসে : আধলা যে নেই। সিগ্‌রেট্‌ নিন না একটা।

দাও—বলিয়া লোকে মুখে পান পুরিয়া হাত পাতে, বলে, গুণ্ডি।

এরপর আর কিছু বলিবার নাই। আদালতও সুরু হইল বলিয়া অগত্যা তাড়াতাড়ি উঠিতে হয়।

মুস্কিল এই যে আমার দোকানে লোকে আসে না। ভদ্র বাঙালীর সন্তান দোকান খুলিয়াছি, জিনিষপত্র ভালোই। বিস্কুট্‌, কেক ইত্যাদি। কিন্তু মূর্খ লোকেরা তেলেভাজার পরিবর্ত্তে উৎকৃষ্ট খাদ্যের সদ্ব্যবহারে উদাসীনতায় অকৃপণ।

বিপুলবপু জলধর আমারই দোকানের একটি পাশে এক তক্তাপোষ পাতিয়া বসিয়াছে, মুহুরী হিসাবে বেশ দু'পয়সা আয় হয়। জিনিষ বিক্রী না হওয়ার চেয়েও আমাকে বেশী পীড়া দেয় এই মোটা জলধরের উপদেশ।

তোতলা জলধর বলে, মুড়িমুড়কি বিক্রী করো। তবু যা' হোক্‌ পেট ভরবে। খদ্দের আর তোমার, উভয়ের। বু'লে চাঁদ, তোমার ঐ চাঁদপানা চেহারা আর কবি কবি ভাব দেখে' গেঁয়ো ব্যাটারা—ইয়ে—এদিকে ভিড়তে সাহস করে না। এ ঐ ছোটলোক ব্যাটাদের কাজ, বাবা। তার চেয়ে আপিসে গিয়ে কলম পেষো গে যাদু। ও বাসনা—ইয়ে—একটা সিগ্রেট্‌ দাও তো।—আরে, নন্দবাবু যে! তারপর ?

গল্পের নায়ক আসিয়াছে।

নন্দ ভাড়াকরা সাক্ষী। এই সরকারী আদালতে এমন একটি পুরাতন প্রাণী নাই নন্দকে যে চেনে না। রুক্ষ, বিবর্ণ চেহারা। মাথার অর্দ্ধেকের বেশী চুল পাকিয়া গিয়াছে। চোখে নিষ্প্রভ জ্যোতি। গলাবন্ধ কোট, কোঁচানো থান কাপড়, রূপার ফ্রেমের চশমা আর পায়ে একজোড়া তালি লাগানো পেটেণ্ট্‌ লেদার-এর অ্যাল্‌বার্ট্‌ শু। গ্রাম্য লোকগুলির তুলনায় চেহারায় আর পরিচ্ছদে অভিজ্ঞতা আছে বলিতে হইবে। চলিবার সময় দেহের উপরার্দ্ধের প্রতি ধরিত্রীর আকর্ষণ একটু অধিক পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যহ আদালত সুরু হইবার ঘণ্টা দু'য়েক আগে নন্দ আসিয়া আমার দোকানের সামনের টিনের চেয়ারে বসিয়া থাকে। এখানে অলক্ষ্যে বলিয়া রাখা ভালো যে, নন্দর কাছ হইতে আমি ইহার জন্য মাসিক আটআনা পাই।

পরিচিত লোকেরা আসিয়া বলে, ভট্‌চায্যি মশাই, আজকে আপনাকে আমার সাক্ষী হতে হবে।

কতো দেবে ?

আজ্ঞে কতো আর—আটআনা।

যা' ভাগ্। এক টাকা। একটিও আধলা কম নয়। নন্দ বিপরীতমুখী হইয়া বসে।

শোনেন না, রাগ কর্‌ছেন কেন ভট্‌চায্যি মশাই। আচ্ছা, বারোআনা। আর জিতলে এক বোতল।

এবার ভট্‌চায্যি একটু নরম হইয়াছে: কিসের মামলা শুনি আগে?

আজ্ঞে মারপিট্‌-এর।

ঘটনাটি খুলিয়া বলো এবার।

পাঁচমিনিটে নন্দ কেস্ বুঝিয়া লইয়াছে। এ তো ভারী! কত শক্ত শক্ত কেস্ উল্টাইয়া দিল নন্দ, আর ইয়ে—। অমুক লয়ের বাই-লয়ে কী বলিতেছে হে জলধর? হ্যাঁ, ঠিক হইয়াছে। আচ্ছা যাও বাপু, তোমার আর ভয় নাই। সাবজজ্ নন্দর বন্ধু।

কোর্টে গিয়া নন্দ তোতাপাখীর মতো মুখস্ত বলিয়া যায়; ধর্ম্মাবতার! ঘটনাস্থলে আমি স্বয়ং উপস্থিত ছিলাম। আমি দেখেছি বাদী দীননাথ মণ্ডল তা'র দখলের বাগানে বেড়া দেবার সময় বিবাদী জয়হরি পেছন থেকে বাদীকে লাঠির দ্বারা আঘাত করে। অকুস্থলে আমার উপস্থিতির কথা যদি জিজ্ঞাসা করেন তো আমি বল্‌বো, আমি সেদিন গিয়েছিলাম বাদীর কাছে সামান্য হিসাব নিকাশ কর্‌তে।

বাইরে আসিয়া নন্দ হাত পাতে: টাকা দে আর বোতলের দাম।

টাকা ট্যাঁকে গুঁজিয়া নন্দ আসিয়া বসে পানওয়ালীর সামনে, অমায়িক হাসিয়া বলে, পান দাও, বাসনা।

পান দিয়া বাসনা জিজ্ঞাসা করে, আবার কা'র সব্বোনাশ কর্‌লেন বাবু?

সব্বোনাশ? সব্বোনাশ কর্‌বো কেন? যা' স্বচক্ষে দেখেছি তাই সাক্ষী দিয়েছি। সত্যি কথা বল্‌বো তা'তে আবার ভয়টা কী? আমার কাছে ও ঢাক ঢাক গুড়গুড় নেই।

ও—বলিয়া বাসনা আবার হাসে।

আদালত শেষ হইয়া গেছে। নন্দর ছুটি। এখান হইতে এতখানি পথ এই বৃদ্ধ বয়সে হাঁটিয়া বাড়ী ফিরিতে হইবে ভাবিয়া নন্দর আর গা আসে না। এক কলিকা তামাক খাইলে ভালো হয়। ফুলো পোদ্দার দিনান্তে ক্যাশ বাক্সে

চাবি দিয়া বিড়ি টানিতেছিল। নন্দকে দেখিয়া প্রণাম করিল। আসুন, বিড়ি খান।

না। শুক্‌নো খেতে ভালো লাগে না। তামাক সাজো না বাবা এক কল্‌কে।

পোদ্দার-পো এত বোকা নয়। তামাক অপেক্ষা বিড়িতে খরচ কম। বলিল, নেই বাবা ঠাকুর। থাক্‌লে ব্রাম্ভন্‌কে এক কল্‌কে দিতে আর আপত্তি? ছিঃ ছিঃ—বলিয়া জিব কাটে।

অগত্যা বিড়িই সই।

এদিকে বেঁটে পট্‌লা পয়সা গুণিয়া হৃষ্টচিত্তে ট্যাঁকে গুঁজিল। বাহিরে রাখিল একটি পয়সা। পান আর সিগারেট্‌ খাইবে। এইটুকু বয়সে ছোক্‌রা বেজায় হিসাবী। কোঠা বাড়ী বানাইবার বিশেষ দেরী নাই। দিনান্তে এই একটি পয়সা খরচেই চূড়ান্ত বিলাসিতা করিয়া নেয় ও। পান খাইয়া সিগারেট্‌ টানিতে টানিতে শুধাইল, কত রোজগার হলো আজ?

কত আর—বাসনার ঠোঁট উল্টাইয়াছে: মাত্তর পাঁচ আনা।

ও-কথা আর যেই হোক্, পট্‌লা বিশ্বাস করে না। তা' হইলে বাসনাকে আর হাতে অমন ভারী সোনার অনন্ত পরিতে হইত না। পট্‌লা বলিল, আমারো তাই। পৌনে ছ' আনা।

বাসনা হাসিল। কর্ম্মব্যস্ত আদালত শেষ হইলে তাহার জন-বিরল আঙিনায় বসিয়া এই দুইটি প্রবীণ আত্মা এমনি করিয়া দিনের পর দিন শঠতা আর মিথ্যা কথা দিয়া পরস্পরের মিতালির গ্রন্থি আরো সুদৃঢ় করিয়া নেয়। প্রবঞ্চিত হইয়া ওরা যুগান্তরের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে: নিজেকে পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিয়ো না।

বাড়ী ফিরিয়া নন্দ হাতমুখ ধুইতেছে, এমন সময় মেয়ে মাধু আসিয়া বলিল, বাবা জমিদার বাড়ী থেকে পেয়াদা এসেছিল। চিঠি আছে, এই নাও।

নন্দ প্রথমে উৎফুল্ল হইয়াছিল, ভাবিয়াছিল জমিদার গৃহে বোধ হয় কোনো জলসার অনুষ্ঠান আছে। কিন্তু তা' নয়। কি এক কারণে জমিদারবাবু ডাকিয়াছেন ওকে। যাইতেই হইবে। তবু নন্দ আলস্য বোধ করে। বিশ্বের শ্রান্তি কর্ম্মক্লান্ত, অবসাদগ্রস্ত দেহের উপর ভাঙিয়া পড়িয়াছে। পারিবে না নন্দ যাইতে। কেন, নন্দ কি কারো মাহিনা-করা গোলাম নাকি যে ডাকিলেই

যাইতে হইবে? বিশেষ কারণ! কৈ, কারণ একটু খাওয়াও দেখি। তা' খাওয়াইবে? কঞ্জুষ, শালা—

নন্দ হাঁকিল, মাধু, চা নিয়ে আয়।

চা আনিয়া মাধু বলিল, আহ্নিক কর্‌বে না? গঙ্গাজলের পাত্তর এনে দোব?

না থাক।

আর, অবশ্যকরণীয় কাজের প্রতি মানুষের চিরকাল অবহেলা থাকে বলিয়াই, সে কাজ করিতে পারে। নন্দও উঠিল। জমিদার বাড়ী কম দূর নয়।

কেস্ বুঝিয়া বাড়ী ফিরিল নন্দ অনেক রাত্রে। সব চেয়ে আনন্দের কথা, জমিদার গৃহে আসরও ছোটখাটো বসিয়াছিল একটা। অনেকদিন পরে একটু বিলাতী খাইয়া গলাটা একটু আর্দ্র করিয়া লইবার লোভ সামলাইবে নন্দকে এতখানি সাধু ভাবিয়ো না। বেশ দু'পাত্র টানিবার পর মাথাটা একটু ঝিমঝিম করিয়া উঠিল, কিন্তু সে কতটুকুই বা! একটু পরে নন্দ আবার চাঙ্গা হইয়া উঠিল। তা'রপর চলিল পাত্রের পর পাত্র। অল্প সময়ের মধ্যে কয়েক গ্লাস্ টানিয়া এক সময় উঠিল নন্দ, চলিল বাড়ীর পথে। গৃহের সমুখে পৌঁছাইয়া স্খলিত পা দুটাকে শক্ত করিয়া লইল, তারপর বিচলিত কণ্ঠ যথাসম্ভব দৃঢ় করিয়া ডাকিল, মাধু!

মাধু দরজা খুলিয়া দিল।

নন্দ জিজ্ঞাসা করিল, চুপি চুপি, তোর মা কি কর্‌ছে রে? ঘুমিয়েছে?

না। জেগেই আছে মা। বড্ডো যন্তোরনা পাচ্ছে। কিন্তু—মাধু হঠাৎ কুটিল করিয়া আনে তা'র চোখ দু'টা: আবার খেয়েছো ঐসব?

না না। ধ্যেৎ! কী আবার খাইয়াছে নন্দ, অ্যাঁ? এই একটু ইয়ে—

দূর করে' দে, দূর করে' দে। অকস্মাৎ বাড়ীর মধ্য হইতে তীব্র, তীক্ষ্ণ এক আর্ত্ত নারীকণ্ঠ জাগিয়া উঠিল, ঢুক্‌তে দিস্‌নে মাধু ও অলুক্ষুণে মিন্সেকে বাড়ীতে।

ওসব কথা নন্দর সহিয়া গেছে। ও ততক্ষণে গাড়ু লইয়া হাতমুখ ধুইয়া ফেলিল। ভিজা গামছা দিয়া গা মুছিতেছে, এমন সময় আবার আসিল মাধুরী, বলিল, একটা ডাক্তার ডাকো না বাবা।

ডাক্তার! এসব রোগে ডাক্তার কি করিবে শুনি? বিধু কোব্‌রেজ তো দিতেছে ওষুধ। দিয়াছিল মাধু শিকড়টা বাটিয়া?

দিয়াছিল। কিন্তু ওকি ওষুধ! ছাই। বেদনায় মাধুর দু'চোখ ভারী হইয়া আসে। জানে ও মা মরিবে। তবু। এম্‌নি করিয়া বিনা আড়ম্বরে, বিনা আয়োজনে? যে মৃত্যুর পূর্ব্বে নাই উদার প্রস্তুতি তার ব্যথা অন্ধকারে অনাদৃত গোপন মৃত্যুর অপেক্ষাও অনেক দুঃসহ। সমারোহ হইল না, মাধুরীর ইহাই দুঃখ।

বেশীক্ষণ দাঁড়াইলে কথা বাড়িয়া যাইবে। নন্দ বলিল, খেতে দে।

খাইতে বসিয়া নন্দ উস্‌খুস্ করিতেছে। কি যেন একটা কথা করি করি করিয়াও জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছে না ও। জিজ্ঞাসার বাসনা এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, পিতৃত্বের সব সঙ্কোচ ভুলিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল, তারক এসেছিল আজ, মাধু?

হ্যাঁ, এসেছিল। মাধু লাল হইয়া উঠিয়াছে।

ও—নন্দ খানিকটা চুপ করিয়া থাকিল, তা'রপর: কবে কোল্‌কাতায় যাচ্ছে ও?

দু'একদিনের মধ্যেই।

আর কিছু বল্‌ছিলো? নন্দ পাতে আঙুল দিয়া আঁক কাটিতেছে।

দু'ধের বাটিটা আগাইয়া দিতে দিতে মাধুরী বলিল, না—বলিয়াই উঠিয়া পলাইল নন্দর পান আনিতে।

ইহার পর আর কিছু প্রশ্ন করা যায় না। অথচ, আসল কথাটা এখনো জানিতে বাকী আছে। স্ত্রীর নিকট যাইতে নন্দ ভরসা পায় না। দাম্পত্য-জীবনের মধুরতাটুকু প্রদীপের তৈলের মতো কবে শুকাইয়া গেছে, পড়িয়া আছে মৃত-পাণ্ডুর, রোগ-বিকৃত, হলদে মুখে বিষাক্ত বীভৎসতা। রোগে ভুগিয়া জগদম্বার চোখে বিশ্ব-জগৎ রূপ লইয়াছে যেন জ্বরো-রুগীর শীর্ণ কঙ্কাল। নন্দ জগদম্বাকে এড়াইয়া চলে।

আর, কে বলিতে পারে নন্দর আভ্যন্তরিক দ্বিতীয় মানুষটি আজো অলক্ষ্যে বসিয়া অলস কল্পনার রঙীন রামধনুর স্বপ্ন দেখে কিনা। তাই হয়তো নন্দ মদ খায়। পানওয়ালী বাসনাকে পর্য্যন্ত ওর বেশ ভালো লাগে।

অথচ কথাটা না জানিলেও নয়।

তারকের মতিগতির উপর তুমি বিশ্বাস করিয়া বসিয়া থাকিতে পারো না।

চঞ্চল, যৌবনমত্ত ছেলে। দামাল ঘূর্ণীবায়ুর মতো ঘুরিয়া বেড়ায়। আর আধুনিক ছেলেরা যা' করে—বেশী করিয়া বই পড়া ও খদ্দর পরিয়া সোশ্যালিজম্ প্রচার করা। মাথার উপর আছে বিধবা মা, আর কেউ নাই। আর আছে বাপের পয়সা। যাহা রাখিয়া যাইতে পারিলে জীবনটা নির্ভাবনায় কাটিয়া যাইবে।

দুপুর আর নিশীথ রাত্রির আকাশ দেখিয়াছো? তাকাইয়া থাকিলে দেখিবে যে অন্য সময়ের অপেক্ষা গগনের বিস্তৃতি অনেক বাড়িয়া গেছে। তেমনি মানুষের জীবন। রৌদ্র-ঝলকিত তারুণ্যের লক্ষ সূর্য্যদীপ্তি দেখিলে মানুষ ভয় পায়। সীমা হারাইয়া ফেলে। তাই নন্দ তারককে বিশ্বাস করে না। নন্দ বেশ ভালো করিয়াই জানে যে মাধুকে তারকের ভালো লাগে। তবু, বিশ্বাস করিয়ো না।

আর ভয় করে মাধুরী। তারকের আদরের মতো নরম, কোমল ব্যবহার-গুলিতে ও কেমন অস্বস্তিই বোধ করে। মনে হয়, ইহার সবটুকু সত্য হইলেও, কোথায় যেন এক কণা ধূমায়মান বহ্নি রহিয়া গেছে। সামান্য একটু আভাস পাইলেই ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে তাহা আবার জাগিয়া উঠিবে। সময় সময় মনে হয়, তারককে না ভালোবাসিলেই বুঝি মঙ্গল হইত। সুদূর আকাশের মতো ও স্পর্শোত্তর, ওকে ভুলিয়া মাটির শিবকে প্রেম আর পূজা নিবেদন করা হয়ত' অনেক সহজ, অনেক নিরাপদ।

কিন্তু, কল্পনাতীতের প্রতিই মানুষের লোভ বেশী।

পরের দিন কোর্টে আসিয়া যে-কথা শুনিল তাহা বুঝিতে অনেকটা সময় লাগিয়াছিল ওর। ব্যাপারটি তবে খুলিয়া বলি।

অন্যদিনের মতোই নন্দ আমার দোকানের চেয়ারে বসিয়াছিল। তখনো পর্য্যন্ত কোনো কাজ নন্দর হাতে আসিয়া পড়ে নাই। তাহাতে ওর দুঃখ নাই। বরঞ্চ এই অলস অবসরটুকু ও উপভোগ করিতেছিল। কিন্তু এম্‌নি ভাবেই বা কতক্ষণ বসিয়া থাকা যায়? মুলো পোদ্দারের দোকানের সাম্‌নে বেশ একটি জটলা হইয়াছে। হয়ত' পুরাতন কোনো কাহিনীর রোমন্থন হইতেছে। নন্দ পায় পায় সেদিকে আগাইয়া গেল। আর গেলাম আমি।

মুলো সসম্ভ্রমে প্রণাম করিল, আগাইয়া দিল একটা বিড়ি। বসিবার জায়গা করিয়া দিয়া বলিল, ইদিকের ব্যাপার শুনেছেন?

কি?—নন্দর বিশেষ উৎসাহ নাই।

শোনেন নি? ছোঁড়াটাকে যে পুলিশে ধরেছে।

পুলিশ। ক'াকে ধরেছে?

ক'াকে আবার! তারককে।

হঠাৎ যেন বাতাসে অম্লজানের ভাগ অনেকটা কমিয়া গেছে, নন্দর নিঃশ্বাস লইতে কষ্ট হইতেছে। অনেকক্ষণ বাদে প্রকৃতিস্থ হইয়া নন্দ সমগ্র কাহিনীটি শুনিল।

কী অপরাধ, বল্‌তে পারো?

ডাকাতি, কর্ত্তা, ছিরিপ্রসাদ বলিল।

ডাকাতি? তারক ডাকাতি করিবে কেন? ওর কি টাকার অভাব আছে? বাজে কথা।

আজ্ঞে না, বিমু প্যায়দা বল্‌ছিলো স্বদিশি ডাকাতি। ভিন্-গাঁয়ে কোন্ জমিদার বাড়ী যেন রাত বিরেতে হানা দিয়েছিলো। অনেক টাকা লুটে নিয়ে আসে। পুলিশ সন্ধান পেয়ে কাল রাত্তিরে ইষ্টেশনে গিরেফ্‌তার করেছে।

ইহার পর নন্দর আর কিছু বলিবার নাই। শুধু বোবা, নিরর্থক দৃষ্টি মেলিয়া ধরিয়াছিলো আমার মুখের উপর।

তবু ও মনের মধ্যে একটি অতি গোপন, সুদূর-পরাহত আশা লালন করিতে লাগিল। হয়ত' তারক ছাড়া পাইবে। ন্যায় বিচারে হয়ত' রাজরোষ উহার উপর নাও পড়িতে পারে। দরকার হইলে নন্দ সাক্ষি দিবে। এতদিন আদালতে ঘুরিয়া আইন সম্বন্ধে নন্দ যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে, বেশ ভালো করিয়াই ও জানে যে তারকের মুক্তির কোনো আশাই নাই। কিন্তু কি জানি কেন এই পরম সত্যটিকে ও চোখের সম্মুখ হইতে ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার মধ্যে কেবলি দু'হাতে ঠেলিতে লাগিল। যেন তাতেই কত শান্তি।

শেষ পর্য্যন্ত সে আস্থাটুকু হারাইতে হইল।

পরে অনুসন্ধান করিয়া তারকের বাড়ীর বাগান খুঁড়িয়া পুলিশ আরো এমন অনেক কিছু আবিষ্কার করিল, যার উপস্থিতির ফল অতি ভয়াবহ, অতি শোচনীয়।

সেই তারক। দুপুরের আকাশের মতো যে বিস্তৃত, নিশীথ রাত্রির মতো যে রহস্যময়।

নির্ম্মূল হইয়া গেছে সব আলো। কি বিশ্বাসঘাতক ছেলেটা!

শূয়ার, বেল্লিক, নচ্ছার—

অনুপস্থিত তারককে গালি দিয়াও নন্দ স্বস্তি পাইল না। আর, সেই মুহূর্ত্তে হঠাৎ কেন জানি না তাহার সমস্ত ক্রোধ গিয়া পড়িল মাধুরীর উপর। ঐ মেয়েটাই ইহার জন্য দায়ী। নিশ্চয় ও এমন কিছু বলিয়াছে, এমন কিছু করিয়াছে যা'র জন্যে ছেলেটা এমন হইল।

বাড়ী পৌঁছাইয়া অনর্থক জোরে কড়া নাড়ে নন্দ। দরজা অবশ্য মাধুরীই খুলিয়া দেয়।

শুনেছিস্, মাধু? ছেলেটার জেল হলো। সাত বচ্ছর।

শুনেছি। আগেই জান্তুম এমন হ'বে।

জান্তিস্? কার কাছে শুন্লি?

এমন যে হ'বে এ আমি আগেই জান্তুম।—গরুর মতো অর্থহীন, ডাগর দু'চোখে কতো রহস্য।—তারকদা' আমায় সব বলেছিলো।

অ্যাঁ—কথাটার অর্থ নন্দ যেন কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারে না। নির্ব্বাক বিস্ময়ে ও মাধুরীর দিকে তাকাইয়া থাকে। বলে কি মেয়েটা! আগে হইতে জানিত, আর স্বচ্ছন্দে চাপিয়া গেল কথাটা। কেন, নন্দকে বলিলে ভালো হইত কা'র?

চক্রান্ত!

ধীরে ধীরে নন্দর মুষ্ট দৃঢ় হইতে থাকে। মারিবে। মেয়েটাকে ও এমন মার মারিবে যে—

আর মাধুরী বিক্ষুব্ধ সাগরের তীরে তেম্‌নিই দাঁড়াইয়া থাকে। সাহস যেন ওর দ্বিগুণ বাড়িয়া গেছে।

কারণ, সেতু ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল অনেক আগেই।

অমূল্য চট্টোপাধ্যায়

জাপানী কবিতা

জাপানকে আজ আমরা প্রধানতঃ জানি সাম্রাজ্যগর্ব্বী, বাণিজ্যনিপুণ, রণকুশল দেশ—পশ্চিম-পৃথিবীর প্রিয়শিষ্যরূপে। কিন্তু যাঁরা তার অন্তরলোকের সন্ধান রাখেন, তাঁরা জানেন, সে শুধু সোনার খনির সন্ধানীই নয়; 'ফুজিয়ামা'র আগুন-শিখায়, মেঘলোকের মোহন মায়ায়, চেরীফুলের প্রগল্‌ভ হাস্যোচ্ছ্বাসে তার কবি-নয়ন চির মন্ত্রমুগ্ধ। বাস্তব উন্নতির পাশাপাশি মধুর, কোমল তার স্বপ্নলীলা চলেছে। আরও, এটি লক্ষ্য কর্‌বার বিষয় বলে' মনে হয়, যে ইউরোপে যন্ত্রযুগের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য হ'য়ে প'ড়েছে তত্ত্বকণ্টকিত, সমস্যাসঙ্কুল, চিন্তাভারপীড়িত; কিন্তু জাপানের বৈজ্ঞানিক উন্নতি সত্ত্বেও সাহিত্যে তার রূঢ় স্পর্শ তেমন প্রকট হয়ে ওঠেনি।

জাপানী কাব্যলোক এক অপূর্ব্ব স্বপ্নরাজ্য। নানারঙে রঙীন্ রামধনুর দেশ। বিচিত্রবর্ণ, চঞ্চল, ফুলে ফুলে-ওড়া প্রজাপতির মত ছোট, সুন্দর কবিতাগুলি; সাগরের বিশালতা বা পর্ব্বতের তুঙ্গতা নেই এতে; শিশির-বিন্দুর মত স্নিগ্ধোজ্জ্বল, আকাশের আলো হাসে তার বুকে; তেম্‌নি শিথিল ও সংক্ষিপ্ত, যেন ছুঁলেই ঝরে' যাবে, অথচ দূর থেকে দেখ্‌লে জুড়িয়ে যাবে চোখ।

জাপানী কবিতার যে বৈশিষ্ট্য সর্ব্বপ্রথমেই চোখে পড়ে, সে হচ্ছে তার সংক্ষিপ্ত আকার। বেশী কথা বলা জাপানীরা ভালোবাসে না। তা'রা জানে, মনের কথা বাক্যের ফেনিল উচ্ছ্বাসে কোথায় হারিয়ে যায়, আভাসে ইঙ্গিতেই তার প্রকাশ হয় সুন্দর। বিখ্যাত জাপানী কবি ইয়োনে নোগুচি তাঁর "জাপানী কবিতার মর্ম্মকথা" (The Spirit of Japanese Poetry) বইয়ের প্রারম্ভে বলেছেন: "আমার বরাবরই মনে হয়, ইংরেজ কবিরা বহু পরিশ্রম অপব্যয় করে ফেলেছেন কথার পিছনে। কেবল কথা আর কথা! অনিচ্ছায় হলেও, বাক্যজালে তাঁরা যে বক্তব্য বিষয়কে অনেক সময়ে আচ্ছন্ন করে' ফেলেছেন, তাতে সন্দেহ নেই।"

জাপানী কবিতায় এই কথার অত্যাচার নেই। তাতে আছে শুধু ইঙ্গিত, মনের গভীর আলোড়ন থেকে যেমন চোখের কোণে দেখা দেয় একবিন্দু অশ্রু,

সন্ন্যাসীর অতল প্রশান্তি যেমন ফুটে ওঠে ওষ্ঠপ্রান্তের স্মিতরেখায়, জাপানী কবিতা তেম্নি অসীম মাধুরীকে লুকিয়ে রাখে সূক্ষ্ম কণিকায়; বলার বাতায়ন-পথে দেখা দেয় না-বলার বিশাল জগৎ।

আর একটি বৈশিষ্ট্য, প্রতিদিনকার জগতের ও জীবনের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সংযোগ; প্রতি মুহূর্ত্তে যে রূপ-মাধুরী ফুটে উঠছে ফুলের বনে, ঝল্‌কে উঠ্‌ছে পাখীর পাখায়, তাকেই এরা এঁকে রেখেছে রঙে আর রেখায়। দুর্ব্বোধ্য দার্শনিক রহস্য নয়, কঠিন পরমার্থ-তত্ত্ব নয়,—এ যেন পথিকের পথ চলার গান; দু'ধারের ফুল কুড়িয়ে আঁচল ভরে' নিয়ে চলেছেন কবি—মুগ্ধ, আপনাহারা।

এই স্বাভাবিকতা, এই সহজ স্বাচ্ছন্দ্য জাপানী কাব্য-লক্ষ্মীর মনোরম লাবণ্য। জাপানের পথে যে চলে, সে-ই বুঝি গান গেয়ে যায়, জীবনময় তার সৌন্দর্য্যের উপাসনা। সমগ্র জাতির এই সৌন্দর্য্যবোধ এবং জীবনে তাকে রূপ দেবার চেষ্টা মুগ্ধ করেছিল কবি রবীন্দ্রনাথকে। জাপানের কাব্যপ্রীতি সম্বন্ধে লাফ্‌কেডিয়ো হার্ন্ বলেছেন: "বাতাসের মতই কবিতা জাপানে সর্ব্বজনীন। সবাই এখানে অনুভব করে কবিত্ব, পড়ে এবং লেখে কবিতা। এবিষয়ে ধনী-দরিদ্র বা বড় ছোটর কোন পার্থক্য এ-দেশে নেই।" ঈষৎ অতিরঞ্জিত হলেও তাঁর কথা অনেকটা সত্য।

প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্য্য জাপানী কবিতার প্রধান উৎস। তার ঋতুলীলার প্রতি ইঙ্গিত, প্রতি ভঙ্গিমা এঁকে গিয়েছেন কবির পর কবি—কাব্যেতিহাসের বিভিন্ন যুগে। কিন্তু কত বিচিত্র তার সুর, কত কবির মনের তারে কত নূতন সুর বেজে উঠেছে প্রকৃতির মায়াময় স্পর্শে! অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রাচীন কবি বুসোন্ ইয়োসানোর বর্ষার গান—

"বরষা রিম্‌ঝিম্ ঝরে অঝোর!
ফুরানো বাঁশী শোনো বাজিছে জলধারায়,
প্রাচীন বয়সের শ্রবণ মোর।"

জীবন-সন্ধ্যায় সব-হারানোর, সব-ফুরানোর গান শুনেছেন কবি বর্ষার জলধারায়। যেমন উজাড় করে' দিচ্ছে আকাশ আজ নিজেকে, তেমনি আপনাকে আজ উজাড় করে' দেবার দিন যে এলো; রিম্‌ঝিম্ বর্ষারাত্রি ঘনিয়ে আসে।

আবার পুরাকালের নারীকবি কোমাচি লিখেছেন বেদনামন্থর বর্ষায়—

"ফুলেরা ঝরিল বরষায়,
প্রিয় মোর হারালো কোথায়?
আলসে চাহিয়া রহিলাম,
প্রিয় মোর গেল সে কোথায়?"

বলা যা হয়েছে, তার অনেক বেশী ঘনিয়ে আসছে মনে, দ্বার-পথে যেন দেখছি দূর দিগন্ত।

আগ্নেয়গিরি 'ফুজিয়ামা' বা 'ফুজি-সান' চির রহস্যে আচ্ছন্ন হয়ে আছে এদের চোখে। কখনও এর রূপ শান্ত-স্থির, তুষার-শুভ্র,—কখনও অগ্নিশিখায়, ধূম্রোচ্ছ্বাসে ভয়ঙ্কর। এর শান্ত-স্নিগ্ধ রূপ দেখে কবি আকাহিতো বল্‌ছেন—

"তাগো-র তীরে তীরে
করেছি বিচরণ;
ফুজি-র গিরিশিরে
তুষার আবরণ।"

আবার অজ্ঞাত কোন কবি লিখে গিয়েছেন—

"সুরুগা আর কাই জুড়ে' দাঁড়িয়ে আছে
উত্তুঙ্গ ফুজি-পর্ব্বত;
আকাশের মেঘেরা থম্‌কে থাকে দাঁড়িয়ে,
পার হ'তে সাহস করে না এর উন্নত শিখর।
পাখীরা উড়তে পারে না এর চূড়োর উপর।
তুষারের অশ্রান্ত বর্ষণ
চাইছে এর জ্বলন্ত আগুন নেবাতে,
আর, জ্বলন্ত আগুন এর বুকের
চাইছে এই পড়ন্ত তুষার গলাতে।
এ যেন কোন্ অনাম দেবতা,
চিরকালের বিস্ময় মানুষের,
রূপ যার আঁকা যাবে না কোনদিন।

সে-নো-উমি নামে বিশাল হ্রদ
লুকিয়ে আছে এই পাহাড়ের বুকে ;
ফুজি-গাওয়া নামে বিশাল নদী,
নাবিকেরা যা ভয়ে ভয়ে পার হয়,
—বেরিয়ে এসেছে তারই জল থেকে।
এ যেন সেই বিধাতৃপুরুষ,
অনন্ত কাল চেয়ে আছেন
সূর্য্যোদয়ের দেশ এই ইয়ামাতোর,
আমাদের এই জাপানের পানে।
এ পাহাড় তার পবিত্র সম্পদ,
তার চিরন্তন গৌরব।
যুগযুগান্ত ধরে'ও দেখে দেখে
ক্লান্ত হয় না চোখ,
সুরুগায় এই ফুজি পাহাড়ের চূড়া।"

বসন্ত আসে জাপানে, কুয়াশায় আবছা থাকে আকাশ, তুষার তখনও গলেনি, মাঝে মাঝে ঝরে বৃষ্টি-ধারা, চাঁদ ওঠে অস্পষ্ট আকাশে—স্বপ্নরাজ্যের ছবির মত, ভোরের বেলায় বাগানে বাগানে প্রজাপতির মেলা, বুনোহাঁসের দল উড়ে চলে যায় উত্তর মুখে, চেরীফুল আর প্লামের মুকুলে ছেয়ে যায় দিক্-দিগন্ত, উগুইস্থ পাখীর সুমিষ্ট গান সুরের মাধুরী ছড়ায় বনে বনান্তে,—আসে উৎসবের দিন।

"বসন্ত এলো,
আজ পাহাড় সবুজ,
শুধু ফুজির চূড়ায়
আজো শুভ্র তুষার।" (সম্রাট্ মেইজি ; ১৮৫২-১৯১২)

"বসন্তরাত, বৃথা এ আঁধার চারিধার।
প্লামের মুকুল দৃষ্টি-আড়াল,
গন্ধ ঢাকিবে কে তাহার ?" (মিৎসুনে ; ৯ম শতাব্দী)

চেরীফুল জাপানীদের সবচেয়ে প্রিয়, বসন্তে তাদের চেরী উৎসব। সেই চেরীফুলের বর্ণনা করেছেন কবি কোরেমিচি (১০৯৩-১১৬৫) ঃ

"পাহাড় চূড়ায় চেরীফুল ফোটে
মেঘের মত
ঝরে' যায়, যেন গিরিপদমূলে
তুষার শত।"

তেমনি প্রিয় এদের উগুইস্থ পাখীর গান ঃ

"লোকে বলে ঐ বসন্তদিন আসে,
মন নাহি মানে, উগুসুর গান
যদি না বাতাসে ভাসে।" (ঐ)

শীতের দিনে গাছে-গাছে পাতা ঝরে' যায়, তুষার-বর্ষণ চারিদিকে, তীব্র শীতল বায়ু, রিক্ত প্রান্তর, পাণ্ডুর চাঁদ, বর্ষশেষের সুর বাজে কবির কণ্ঠে ঃ

"বসন্ত কবে হেসেছিল হায়,
'নানিবা'-সায়র-তীরে
'সোৎসু'তে, সে যে স্বপন দূর-সুদূর।
উত্তর-বায়ু আজি শিহরায়
ঝরাপাতা ঘিরে' ঘিরে'
শরবনে তার বাজিছে তীব্র সুর।"
(ভিক্ষু সাইগিয়ো ; ১১১৮-১১৯০)

শরৎ সন্ধ্যায় আকাশে আঁকা ছায়াপথ, বনে বনে মেপল্ পাতার রক্তশোভা, শিশিরের মুক্তাজল আর হরিণদলের সানন্দ বিচরণ। আবার গ্রীষ্মদিনে সেখানে ভোরের অরুণ আলো, সরোবরে পদ্ম-কুমুদের শোভা, গ্রীষ্মের শেষ ভাগে সুমধুর বৃষ্টি, দিনের শেষে সান্ধ্যবায়ুর স্নিগ্ধ স্পর্শ।

এম্‌নি করে' জাপানের কাব্যলোকে চ'লেছে প্রকৃতির অফুরন্ত লীলার সুর, জলছবির মত ছোট ছোট কবিতায় ফুটে উঠছে তার অন্তহীন বর্ণ-বিলাস।

শুধু প্রকৃতিই নয়, জীবনের প্রতিদিনকার সুখদুঃখগুলিও ফুটে উঠেছে দু'একটি রেখার টানে, অপূর্ব্ব মধুর হয়ে। সন্তানহারা নারী কবি নাকাৎসুকাসা (১০ম শতাব্দী) লিখেছেন ঃ

"ফুটিবার আগে ক'রেছিনু আশা,
ফুটিলে পরাণ কাঁপি' ওঠে শঙ্কায়,

পাহাড়ের বুকে চেরীফুল ফোটে,
চেরীফুল ঝরে' যায়,
হেরিয়া পরাণ ভরে মোর বেদনায়।"

অজ্ঞাত নারীকবি তাঁর দরিদ্র স্বামীকে উদ্দেশ করে' বলছেন :

"ইশামাশিরোর পথে
সবার স্বামী যায় ঘোড়ার 'পরে টগ্‌বগিয়ে ছুটে,
আমার স্বামী যায় পায়ে হেঁটে, কত কষ্ট করে',
দেখে আমার কান্না পায়।
স্বামী আমার,
এই নাও আমার উজ্জ্বল আয়নাখানি
মায়ের দেওয়া বহুমূল্য এই স্মৃতিচিহ্ন,
আর নাও এই গলবন্ধ রুমাল,
পতঙ্গের মত মেলে' দিয়েছে এর ডানা,
এই দিয়ে তুমি কিনে' আনো একটি ঘোড়া,
আমার অনুরোধ।"

স্বামীর উত্তর :

"আমি যদি ঘোড়া কিনি,
তবু ত' তোমায় হবে হেঁটে যেতে ;
তার চেয়ে,—
যদিও কঠিন বন্ধুর এই পাহাড়ের পথ,
এসো আমরা পাশাপাশি পায়ে হেঁটেই যাই।"

সরল কবিতাগুলিতে জীবনের স্পর্শ আছে ; প্রতিদিনকার হাসি-অশ্রুতে এরা উজ্জ্বল।

জাপানী কাব্যেতিহাসে এসেছে আটটি যুগ। বিস্মৃত পুরাকাল থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত গিয়েছে 'আদিযুগ'। তারপর একে একে 'নারা-যুগ' (৭১০-৭৯৩), 'হেইয়ান্-যুগ' (৭৯৪-১১৮৫), 'কামাকুরা-যুগ' (১১৮৬-১৩৩২), মুরোমাচি-যুগ (১৩৩৬-১৫৬৫), মোনোয়ামা-যুগ (১৫৬৬-১৬০২), ইয়েদো-যুগ (১৬০৩-১৮৬৭), এবং বর্ত্তমানে চল্‌ছে তোকিও-যুগ (১৮৬৮ থেকে)। যুগগুলির নামকরণ হয়েছে বিভিন্ন যুগের রাজধানীর নাম থেকে, সেখান থেকেই ছড়িয়ে পড়েছে সাহিত্য-শিল্প-সভ্যতার ধারা—সারা দেশের দিক্‌দিগন্তে।

প্রথমযুগের কবিদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—সম্রাট্ নিন্‌তোকু। ইনি উদার-হৃদয়, মহাপ্রাণ এবং সারল্যপ্রিয়। প্রজাদের দারিদ্র্য দেখে তিন বছরের জন্য তিনি তাদের সমস্ত খাজ্‌না মকুব করে' দিয়েছিলেন, এবং এত হিসেব করে' চলেছিলেন নিজে, যে, এই তিন বছরের মধ্যে রাজবাড়ীর কোন সংস্কার করেননি,—যদিও দেয়াল ভেঙে পড়েছে, আর ছাদ গিয়েছে ফেটে। তিন বছর পরে, একদিন ছাদে উঠে দেখলেন, বাড়ী বাড়ী রান্নাঘর থেকে ধীরে ধীরে ধোঁয়া উঠছে ; আনন্দে তখনই তিনি বলে' উঠলেন :

"উচ্চ চূড়া হতে চাহিনু নীচে,
আকাশ-পানে ধূম কুণ্ডলিছে,
প্রজার ঘরে ঘরে সচ্ছলতা,
অন্ন-উৎসব বহে বারতা।"

দ্বিতীয় যুগের প্রধান কবি হিতোমারো। শিগা থেকে এযুগে রাজধানী এসেছিল 'নারা'য়। 'শিগা'র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আর অতীত রাজধানীর হারানো গৌরব কবির মনকে অভিভূত করেছিল। কবি লিখেছেন :

"ওমি-সায়রের সন্ধ্যা ঢেউয়ের পরে
উড়িয়া চলেছ মুখর পাখীর দল,
তোমাদের হেরি' অতীতের স্মৃতিমালা
ভরিয়া তুলিছে' আমার হৃদয়তল।"

অতীত দিনের রাজধানী আজ পরিত্যক্ত, নির্জ্জন

"অতীত দিনের রাজধানী হায়,
শিগার তীরে
পড়ি' আছে জনহীন,
তেমনি আজিও চেরীফুল ফোটে
দু'কূল ঘিরে'
আসে বসন্তদিন।"

মাঠের পথে কবি বেড়াতে গিয়েছেন ভোর-বেলায়।

"মাঠের প্রান্তে উষালোক জাগে
পূব্ সীমায়,
পিছনে চাহিনু, চন্দ্র তখন
অস্ত যায়।"

পাহাড়ে'-নদী দেখতে গিয়েছেন কবি বর্ষার দিনে; মোহন রুদ্র তার রূপ।

"পাহাড়ে নদীর তীব্র স্রোত
গর্জ্জি' ধায়।
যুজুকি পাহাড়ে ভীষণ ঘন
মেঘ ঘনায়।"

প্রিয়ার কথা বহুবার মনে পড়েছে কবির—প্রকৃতির পানে চেয়ে।

"গত বরষের শরতের চাঁদ
এসেছে ফিরে,
সেদিন যে মোর সাথে ছিল, আজ
সুদূর-তীরে।"

অখ্যাতনামা কত কবি রচনা করে' গিয়েছেন মনের সহজ আনন্দে; খ্যাতির জন্য নয়। তাহ'লে তাঁদের নাম হয়ত এমন গোপন থাক্‌ত না, নিছক্ আনন্দের জন্যেই লিখে গিয়েছেন তাঁরা।

"শান্ত সন্ধ্যা ছায়ে সারসের দল
আহারের তরে তীর খুঁজেছিল যারা,
জোয়ারের উচ্ছ্বাসে ভীতিবিহ্বল
প্রিয়ারে সচকি' তুলি' ডাকিছে তাহারা।"

"শরত-বরষণ গিরির বুকে
নিঠুর জলধারে ঝ'রোনা অনিবার
রাঙা এ পাতাদল শিহরে সুখে,
বৃষ্টিবায়ুঘায় লুটিবে চারিধার।"

'ৎসুরায়ুকি' তৃতীয় যুগের কবি। রাজকার্য্যে তাঁকে বিদেশে থাকতে হ'ত।

অবসর পেলে গৃহে ফিরে তিনি প্রকৃতির শোভা উপভোগ ক'রতেন। দীর্ঘকাল পরে পরিত্যক্ত কুটীরে ফিরে তিনি লিখ্‌ছেন:

"কেহ নাহি আসে কুটীরে আমার
বসন্ত তবু হাসে,
আগাছায় ভরা আমার দুয়ার-পাশে।"

এই যুগের আর-একজন কবি 'তাদামিনে' পাহাড়িয়া গ্রামের বর্ণনা করছেন:

"পাহাড়িয়া গ্রামে নিঠুর শরৎ,
হরিণেরা অসহায়
কাতর কণ্ঠে আমারে জাগায়ে যায়।"

চিত্র-নিপুণা মহিলা-কবি 'কুনাই-কায়ো' হ্রদের বুকে ঝরা চেরীফুলের সৌন্দর্য্য আঁক্‌ছেন একটি কবিতায়:

"হীরাপাহাড়ের বায়ু বহে' আসে,
সায়রের বুকে ঝরায়ে ফুল,
সেই ফুল-পথে জলরেখা আঁকি,
তরী বহে' যায় সুদূর-কূল।"

হ্রদের বুকে চাঁদের আলো; সারারাত্রি ধরে' নৌকোখানি হ্রদের জলে ব'য়ে চল্‌তে চল্‌তে এখন কোথায় অদৃশ্য হয়েছে। মহিলা কবি তান্‌গো (দ্বাদশ শতাব্দী) রাত্রির এই রহস্যময় সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ।

"সারারাত ধরি' চলিয়াছে তরী—
'কারাসাকি' হ্রদ 'পরে,
অদৃশ্য এবে! চন্দ্র এখনো
জ্বলিছে দূরান্তরে।"

'ইয়েদো' যুগে দু'টি প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছে জাপানী কাব্যসাহিত্যে: এক, পৌরাণিক সংস্কৃতি ও রচনা-রীতিকে অনুসরণ করবার চেষ্টা, আর, সহজ-সরল লৌকিক ভাষা-ভঙ্গীকে কাব্যে অবতারণা করবার চেষ্টা।

'তোকিও' অর্থাৎ বর্ত্তমান-যুগে, পাশ্চাত্য রোমান্টিক এবং প্রকৃতিপন্থী কাব্যের প্রভাবও জাপানী সাহিত্যের উপর এসে পড়েছে। কিন্তু অনুকরণের মত্ততায় জাপানী কাব্য তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্য্য হারিয়ে ফেলেনি।

জাপানী কবিতার মধ্যে সব-চেয়ে ক্ষুদ্রাকার হচ্ছে 'হক্কু।' ৫, ৭, ৫,— মোট ১৭টি সিলেবল্ তার আয়তন। তারই মধ্যে তা'র রূপের আভাস, ভাবের ব্যঞ্জনা। এত সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যেও কবিতাগুলির অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনাশক্তি, পাঠককে বিস্মিত করে। জীবনের ছোট-ছোট ছবি ও ভাব দু'একটি রেখার টানে কি সুমধুর হয়ে ফুটে উঠেছে।

"শরতের পূর্ণ চাঁদ:
পাইন্ গাছের ছায়া পড়েছে
মাদুরের উপর।" (কিকাকু)

"কি মহান্ দৃশ্য!
সবুজ, তরুণ পাতা—
ভোরের আলোয় ঝল্‌মল্!" (বাশো)

এর চেয়ে কিছু বড় ৩১ সিলেব্‌লের 'উতা' বা 'তান্‌কা'। ৫, ৭, ৫, ৭, ৭— এই হচ্ছে সিলেব্‌ল্‌গুলির বিন্যাসের রীতি। 'তান্‌কা' জাপানী সাহিত্যে অত্যন্ত প্রচলিত এবং জাপানীদের অতিশয় প্রিয়।

"বসন্ত-দিন।
দূর থেকে ভেসে আসে আলো।
তবু কেন আজ ফুলেরা
ঝরে' যায় বনপ্রান্তে—
অতৃপ্ত হৃদয়ে?" (তোমোনোরি)

কবিতার নূতন-নূতন ভঙ্গীও আজ এসে পড়েছে জাপানী সাহিত্যে। 'হক্কু' আর 'তান্‌কা'র গণ্ডীতেই কবিরা আর কাব্যলক্ষ্মীকে আবদ্ধ রাখতে চাইছেন না। উনবিংশ শতাব্দী থেকেই কবিতায় রূপ-বৈচিত্র্য আনবার প্রচেষ্টা বিশেষভাবে লক্ষিত হচ্ছে। নবীন কবিরা যে নূতন ধরণের কবিতার প্রবর্ত্তন করেছেন—তার নাম 'শিন্‌তাইশি'। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ মেইজির রাজত্বকালে

রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন-কয়েক অধ্যাপক তাঁদের নূতন কবিতা এবং পাশ্চাত্য কবিদের রচনার কিছু কিছু অনুবাদ প্রকাশ করেন। কিন্তু নব-কবিতা প্রকৃতপক্ষে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আরও বছর দশেক পরে—'তোসোন শিমাজাকি'র আবির্ভাবের পর। এঁর কবিতায় প্রাকৃতিক চিত্র মনোরম হয়ে ফুটেছে, আর তা'তে মাখানো আছে একটি কোমল বিষাদের সুর। তারপর উল্লেখযোগ্য কবি 'বান্‌সুই ৎসুচিয়ি'। হুগো, শিলার প্রভৃতি পাশ্চাত্য কবিদের প্রভাব এঁর কবিতায় লক্ষিত হয়। 'কিয়ুকিন্ সুসুকিদা'র আদর্শ ছিলেন সৌন্দর্য্য-পূজারী কীট্‌স্; তাঁরই মত ইনিও ছিলেন রূপ ও যৌবনের বন্দনা-গায়ক। 'আরিয়াকে কান্‌বারা' এবং 'হোমেই ইওআনো' আধুনিক জাপানের আর দু'জন শ্রেষ্ঠ কবি। কান্‌বারার কবিতায় কল্পনার বিস্তার এবং রোমান্টিক স্বপ্নদৃষ্টি আছে।

"একাকী দাঁড়িয়ে শুনি—
বিষাদের মৃদুগুঞ্জন;
সুদূর সমুদ্রের বুকে,
অন্তহীন নীল আকাশ
শুভ্র সূর্য্যালোকে
—নিত্য যে কথা বলে।
একক সেই বাণী,
শান্ত,—তবু সে দীপ্ত;
কি ক'রে জানব আমি, মৃদুস্বরে কি কথা বলে
সুদূর সমুদ্র, আর আলোকিত আকাশ?" (কান্‌বারা)

ইওয়ানোর রচনায় আছে বৈচিত্র্য এবং প্রাণের সহজ উচ্ছ্বাস, কিন্তু অনেকস্থলেই তাঁর প্রাণের আবেগ শিল্পসংযমকে উপেক্ষা ক'রেছে, কাজেই কবিতা শিল্প-পরিণতি লাভ করতে পারেনি।

জাপান প্রকৃতিকে ভালোবাসে; তার কবিতায় প্রধানতঃ গীত হয়েছে প্রকৃতির স্তবগান। যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ্যপরিচালনার অবকাশে সম্রাটেরাও এখানে প্রকৃতির মাধুরী উপভোগ করেছেন। সম্রাট্ মেইজি (১৮৫২-১৯১২) যুদ্ধান্তে সৈনিকদের বর্ণনা করেছেন।

যোদ্ধা যাহারা—সাগরের বুকে
হঠায়ে দিয়েছে শত্রুর রণতরী—
হয়ত এখন জলধি-বক্ষে
চন্দ্রের শোভা হেরিছে নয়ন ভরি’।”

সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যকে আঁকতে জাপানী কবি সিদ্ধহস্ত। রাত্রির বর্ষণান্তে মুগ্ধ প্রজাপতিদল ফুলের বুকে ঘুমিয়ে আছে। কবি সেই ছবি আঁকছেন :

“কোমল প্রজাপতিদল
ঘুমায়ে কুসুমের বুকে
জানে না রাত্রির জল,
মুগ্ধ স্বপনের সুখে।”

মুগ্ধ প্রজাপতির ছবি আঁকছেন,—আভাসও কি দিয়ে যা’ননি কবি মুগ্ধ প্রেমিকের? শুধু ছবি নয়, ছবির মধ্যে দিয়ে ব্যঞ্জনা, জাপানী কবিদের রচনায় সুপ্রচুর।

এই স্বপ্নমুগ্ধ কবির দেশেই নাট্যকারেরা আজ নাটকে রূপ দিচ্ছেন বাস্তব জীবনের বিভিন্ন দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষকে; আঁকছেন জাপানের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিস্থিতির সুনিপুণ চিত্র। সেখানে জাপানের সাহিত্যপ্রতিভার আর এক অভিনব প্রকাশ; জীবন-সংগ্রামের আঘাত-সংঘাত, আনন্দ-বেদনার কাহিনী। সেখানে আর শরৎ-আকাশের স্বপ্নালস মেঘ-লীলা নয়; সমুদ্র তরঙ্গের কল কল্লোল, জীবন মৃত্যুর উত্থান-পতন।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

দাবী

পূজার ছুটিতে অসিত বেড়াইতে আসিয়াছিল পুরীতে। তাহার মামা পুরীর বাসিন্দা, বেশ বর্দ্ধিষ্ণু লোক; তবুও ইহার পূর্ব্বে সে আর কখনও এখানে আসে নাই। পিতা বিনয়কৃষ্ণ ছুটির সময়েও তাহার একমাত্র পুত্রকে চোখের আড়াল করিতে চাহিতেন না। আর সপরিবারে শ্যালক-গৃহে অতিথি হওয়াও তিনি অপছন্দ করিতেন। পুরীতে আসিয়া স্বতন্ত্রবাসের ব্যবস্থা করিলে দেখিতে অশোভন হইবে, এই ভয়ে, তিনি অন্য অনেক স্থলে অসিতকে লইয়া বেড়াইতে গিয়াছেন, আসেন নাই শুধু পুরীতে। এবারে বিশেষ কাজের চাপে তাঁহাকে পূজার ঠিক পূর্ব্বেই রেঙ্গুন যাইতে হইল। তাই অসিত মায়ের অনুমতি লইয়া পুরী চলিয়া আসিয়াছে।

ছুটি ফুরাইয়া আসিয়াছে। এইবার কলিকাতায় ফিরিতে হইবে। সমুদ্রের নিকট তাহার শেষ বিদায় লইবার জন্য অসিত সন্ধ্যার সময় বেড়াইতে বাহির হইল। ইচ্ছা করিয়াই কাহাকেও সঙ্গে লইল না, লইল শুধু তাহার প্রিয় বাঁশের বাঁশীটি। ঘুরিতে ঘুরিতে রাত্রি অন্ধকার হইয়া আসিল। উপরে কৃষ্ণপক্ষের তারাভরা আকাশের উদার বিস্তার, সম্মুখে তরঙ্গায়িত সমুদ্রের ফেনায়িত লীলা। অসিত মুগ্ধ হইয়া বসিয়া পড়িয়া আনমনে পকেট হইতে বাঁশীটি বাহিরে আনিয়া বাজাইতে সুরু করিল। কত কি গান যে বাজাইয়া চলিল তাহার খেয়াল ছিল না। শেষে যখন রবীন্দ্রনাথের একটি অতি প্রচলিত গান তিনবারের বার শেষ করিতে যাইতেছে, এমন সময় তাহার চৈতন্য হইল কোথা হইতে একটা টর্চ্চের আলো যেন তাহার গায়ে আসিয়া পড়িয়াছে। সমুদ্রতট তখন একান্ত নির্জ্জন, জনবিরল পথও নিকটে নহে; অসিত বিস্মিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে নিকটে একটি যুবককে দেখিল। তাহার অভদ্রতায় বিরক্তি-বোধ প্রকাশ করার পূর্ব্বেই চাপিয়া গেল, কেননা ওই যুবকের সঙ্গে ছিল একটি তরুণী। সে শুনিতে পাইল, চেনা গলায় কে যেন বলিতেছে—Hullo, it’s you, I was just going to apologise।

অসিতের বিস্ময় বাড়িয়াই চলিল। এই ছেলেটি তাহার সহপাঠী, নাম অনিল, কিন্তু ইংরাজীতে বানান লেখে Oneal ; হ্যাটকোট ছাড়া কখনও কলেজে আসে না, বিশুদ্ধ উচ্চারণের ইংরাজীতে ছাড়া কথা কয় না, ছেলেদের সঙ্গ এড়াইয়া চলে, ও দলবিহীনতার সমস্ত অত্যাচার সদর্পে বহন করে। আজ অন্ধকারে অপ্রত্যাশিতভাবে তাহার ধুতি-পাঞ্জাবী-পরা চেহারায় অসিত প্রথমে তাহাকে চিনিতেই পারে নাই। চিনিতে যখন পারিল, তাহার মন তখন এই ধাঁধায় পড়িল, কোন ভাষায়, বাংলায় না ইংরাজীতে, কথাবার্ত্তা চালানো উচিত। পরে সাহস করিয়া ও অল্প ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া বলিল,—কে, অনিল ? তোমার বাঙালী বেশ দেখে বাংলা ভাষাই ব্যবহার করলুম। আশা করি বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না তোমার।

অনিল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, তোমার কি সত্যিই বিশ্বাস বাংলা আমি বুঝতে পারিনে? তোমরা আমায় কি ভাবো বল ত ?

—সত্যি বলবো ? ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাক। স্বীকার করছি তোমায় দাঁড়কাক বললে বর্ণান্ধতার পরিচয় দেওয়া হয়। কিন্তু ধুতি পাঞ্জাবীতে তোমায় কি কম মানিয়েছে। তবু ছাই ও ধার করা পোষাকগুলো কেন যে পরো তুমিই জানো।

—প্রথমে তোমার কম্‌প্লিমেন্টের জন্যে ধন্যবাদ, অসিত। কিন্তু এ ময়ূরপুচ্ছে তোমরাই আমাকে সাজিয়েছ।

—অবাক করলে তুমি যা হোক্‌! প্রথম যেদিন তুমি কলেজে এলে সেদিন থেকেই ত তোমার ওই রাজবেশ।

—হ্যাঁ, সেদিনটাই শেষ দিন হোত যদি তোমাদের ব্যবহার আমায় রাগিয়ে না দিত। সত্যি কথায় রাগ করবে না আশা করি।

—না, যদি সেটা সত্যি বলে বুঝি। তার আগে পর্য্যন্ত রাগ করার অধিকার আছে, এটা বোধ হয় তুমিও স্বীকার করবে।

—নিশ্চয়ই। তাহলে এসো, বসে পড়া যাক, ব্যাপারটা খুলে বলি। ছেলেবেলা থেকে বাবা পড়ালেন ইংরেজ ছেলের স্কুলে। অনেক সময় তাদের বোর্ডিং-এও থেকেছি। কাজেই তাদের ধরণধারণ আমার নিজস্ব হয়ে গিয়েছিল। তারপর পাস্‌ কোরলাম সিনিয়ার কেম্‌ব্রিজ—

—সে খবরটা আমরা জানি :

—কিন্তু জানার আগেই যেতাম চলে বিলেতে, হঠাৎ বাবার মত বদলে গেল। তিনি আরও কয়েক বছর আমায় এখানেই পড়াতে চাইলেন। তাই তোমাদের ক্লাসে ভর্ত্তি হ'তে হোল।

—ক্লাসটা কি এখনও তোমার হয়নি নাকি ?

—হোল আর কৈ ? একা একা ত ক্লাস হওয়া যায় না। কলেজের খাতায় নাম উঠেছে বটে, দলের খাতায় উঠল কৈ ?

—তার কারণ দলকে তুমি অপমান করেছ। শুনিয়া অনিলের দৃষ্টি তীব্র হইয়া উঠিল। সে উত্তেজিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—

—তুমি জান, আমার কোন্‌ অপরাধে আমায় প্রথম দিন থেকে বর্জ্জন করা হয়েছে ?

—না আমি নিজে ঠিক জানি না, কারণ সেদিন আমি কলেজে হাজির ছিলাম না। কিন্তু তার পরের দিন থেকেই দেখছি, তুমি আমাদের এড়িয়ে চল।

—হ্যাঁ চলি, কিন্তু কেন ? শুনবে আমার অপরাধ ? ক্লাসের একটি ছেলে ঘরের মধ্যেই বারবার থুতু ফেল্‌ছিল। আমি তাকে বারণ করেছিলাম। অপরাধটা কি খুবই মারাত্মক ?

—কিন্তু এই বারণের মধ্যে একটু কি আত্ম-প্রাধান্যের ভাব ছিল না, যেন তুমি অন্য সকলের চেয়ে ঢের বেশী সভ্য ?

অনিল একটু থামিয়া ভাবিয়া বলিল—হয়ত ছিল। সূক্ষ্ম বিচার করে দেখলে হয়ত তোমার কথাটাই সত্যি। কিন্তু তাতে কি প্রমাণ হয়, ওই থুতু ফেলাটা কোন অপরাধই নয় ? আর সে-অপরাধ যে দেখিয়ে দেবে শাস্তি তারই প্রাপ্য ? তাছাড়া তুমি বুঝতে পারবে না, ব্যাপারটা তখন আমার চোখে কি রকম বিশ্রী ঠেকেছিল। ইংরেজ ছেলেরা আর যাই হোক, তোমাদের চেয়ে ঢের বেশী পরিচ্ছন্ন ও ঢের বেশী ভদ্র। আর একথাও ভেব না যে তারা আমাদের একেবারেই ভালবাসতে পারে না।

—স্বীকার করছি, নোংরা অভ্যাস আমাদের ত্যাগ করা উচিত। কিন্তু ধুতি চাদর নিয়ে তাদের কাছে গেলে তোমার ইংরেজ বন্ধুরা তোমায় কতটা ভালবাসত বল ত ? তেমনি হ্যাট কোট পরে থাকলে দলে টানতে আমাদেরও বাধে।

—আমি প্রথম দিন স্যুট পরে গিয়েছিলাম, শুধু অভ্যাস বশে। গিয়েই

আমার ভুল বুঝতে পারি। বিশ্বাস করো, মনে মনে ঠিক করেছিলাম পরের দিন থেকেই ধুতি পরব। কিন্তু প্রথম দিনেই এমন কাণ্ড ঘটে গেল যে—

—আচ্ছা, তাহলে এই ছুটির পর প্রথম দিন থেকেই ধুতি পরে' যেয়ো। তখন দেখা যাবে কে তোমাকে দলে না নেয়।

—এত দিনে মিটল,—মেয়েটির এই ছোট্ট টিপ্পনীতে দুজনেই অপ্রতিভ ভাবে হাসিয়া উঠিল।

অনিল তাড়াতাড়ি বলিল—সত্যি বড় অভদ্রতা হয়ে গেছে অসিত; তোমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়নি। আমার বোন পূর্ণিমা, আর তুই ত বুঝতেই পারছিস, এ আমার ক্লাস ফ্রেণ্ড অসিত মিত্র।

দুজনে পরস্পরকে সনমস্কার অভিবাদন করিল।

—এঁকে কি বলে ডাকব দাদা? যে রকম স্বদেশী উনি মিঃ মিত্র বল্‌লে বোধহয় খুব চটে যাবেন।

—দাদার মতো আপনিও বুঝি বিলিতি স্কুলে পড়েন?

—হাঁ জুনিয়র কেম্ব্রিজ দেবে। কিন্তু ওকে 'আপনি' কেন অসিত? ও কি আবার একটা মানুষ। গত জন্মদিন থেকে ত সবে ফ্রক ছেড়ে শাড়ী ধরেছে।

—শিক্ষিতা মেয়েদের কি কখনও ছোট ভাবা যায়? তাই তুমি বলতে ভয় করে।

—আপনি আমায় নির্ভয়ে 'তুমি' বল্‌তে পারেন। দাদার শাসনের চোটে আমার নিজেকে বড় করে দেখার জো-নেই।

—অনিল, আমি কিন্তু অবাক হয়ে গেছি। চিরকাল সাহেবী স্কুলে পড়েও তোমরা কি চমৎকার বাংলা বল্‌ছ! অথচ তোমাদের মত ইংরিজি বলা আমাদের স্বপ্নেরও অগোচর।

—কিন্তু আপনি কি সুন্দর বাঁশী বাজান!

—তাই ত অসিত আসল কথাই বল্‌তে ভুলে গেছি। তোমার বাঁশী শুনেই আমরা এদিকে আসি বাজিয়েকে আবিষ্কার করতে।

—কিন্তু ঠকে গেলে। চেনা জিনিস খুঁজে পেলে আবিষ্কার হয় না।

—না জিতলাম, তোমায় বন্ধুভাবে পেয়ে। নইলে কলেজের বাকী সময়টা না চিনেই কেটে যেত।

—দাদা কলেজের কথা না হয় পরে হবে। এখন একটু বাজাতে বলো না।

—এখন কি বাজানো যায়? তা ছাড়া তুমি যে বড় অসময়ে এসেছ, পূর্ণিমা।

অনিল ঘড়ি দেখিয়া বলিল—কেন, এখনও বেশী রাত হয়নি। অসিত বলিল—আমি তা বলিনি। বলছিলাম, আজ ঘোর কৃষ্ণপক্ষ। সকলে হাসিয়া উঠিল। পূর্ণিমা বলিল—তাহলে অমন বারবার "এই অপরূপ আকুল আলোকে, দাঁড়াও হে" বাজাচ্ছিলেন কেন?

শুধু অনিল হাসিল।

অসিত একটু থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তাহলে কি ওই গানটাই আবার বাজাব? না অন্য কিছু?

পূর্ণিমা বলিল—সে আমি কি জানি, আপনার যা ভালো লাগে। অসিত বাজাইবার অনেক চেষ্টা করিল কিছুতেই পারিল না। মন যেন স্থির হয় না। শেষে হঠাৎ বলিয়া উঠিল—নাঃ, হবে না, কিছুতেই জমাতে পারছি না। আসল কথা, শ্রোতা কাছে থাকলে বাঁশী বাজানো যায় না, অন্ততঃ আমি পারি না। মন বড় চঞ্চল থাকে। বাঁশী শুনতে হলে দূরে থাকাই ভালো।

—দেখছ দাদা, উনি আমাদের বল্‌ছেন আমরা কাছে এসে ভাল করিনি।

—ও যা-ই বলুক আমার আজ লাভ হয়ে গেল। তারপর অসিতের দিকে চাহিয়া বলিল—তোমার সঙ্গে ত কোন আলো নেই দেখছি, চল পৌঁছে দিয়ে আসি। কোন্ দিকে?

অসিত আপত্তি করিতে পারিল না। বিদায়ের সময় পূর্ণিমা বলিল—কলকাতায় গিয়ে আবার দেখা হবে ত?

অসিত উত্তর দিবার পূর্ব্বেই অনিল বলিল—হবে বৈকি!

(২)

কলেজ খুলিবার পর অনিলের বেশ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ব্যবহারের পরিবর্ত্তনে ক্লাসের সঙ্গীরা চমকিত ও মুগ্ধ হইয়া গেল; আর এই ইন্দ্রজালের সমস্ত কৃতিত্ব আসিয়া জুটিল অসিতের ভাগ্যে। যত দিন সে অনিলদের বাড়ী যায় নাই, ততদিন তাহার মনেও এ অহমিকা গোপনে বাসা বাঁধিয়াছিল।

কিন্তু ভুল ভাঙিল অনিলদের বাড়ী বেড়াইতে আসিয়া। অনিল থাকে বরাহনগরে। কলেজেই দেখা হইত বলিয়া তাহার বাড়ী যাইবার কোন প্রয়োজন অসিত বোধ করে নাই। অনিল দু-এক দিন বলিয়াছে বটে, অসিত সসঙ্কোচে কাটাইয়া দিয়াছে। ওরা বড়লোক, সাহেবী ধরণে থাকে, সঙ্কোচের মূলে ছিল এই ধারণা। কিন্তু একদিন অসিতের এমন একটি বইয়ের দরকার হইল যা সে লাইব্রেরীতে খুঁজিয়া পাইল না। অনিল শুনিয়া বলিল বইটি তাহার আছে, দরকার হইলে পরের দিন আনিয়া দিতে পারে। সন্ধান পাইয়া অসিতের আর তর সহিল না। জানিতে চাহিল সেই দিনই পাওয়া সম্ভব কি না। অনিল বলিল—আমার ত গাড়ী আস্‌বে, তুমি আমার সঙ্গে গেলে বইটা দিতে পারি।

—কিন্তু গাড়ী ত তোমায় নিয়ে তোমার বোনকে আনতে যায়। আমায় নিতে গেলে তার দেরী হয়ে যাবে না ?

—কতই বা আর দেরী হবে ? ততক্ষণ বোর্ডিংএ মেয়েদের কাছে থাকতে পেলে প্রুণের ত মজাই হবে।

—পূর্ণিমার ডাক নাম কি প্রুণ ?

অনিল হাসিতে হাসিতে বলিল—হ্যাঁ, নামটার একটা মজার ইতিহাস আছে। মেমেদের বাংলা উচ্চারণ সে এক অপরূপ ব্যাপার। পূর্ণিমা বল্‌তে পারে না বলে' প্রুণিমা দিয়ে কাজ চালায়। তার উপর আবার কাঁচি চালিয়ে মেয়েরা করে নিয়েছে প্রুণ। ওটা এখন আমাদের বাড়ীতেও চলে গেছে।

গাড়ী আসিয়া পড়িল। এক সঙ্গে যাইতে যাইতে অসিত অনিলের এই অযাচিত ভদ্রতার উত্তরে কি করিতে পারে ভাবিতেছিল। হঠাৎ তাহার মাথায় একটা দুষ্ট বুদ্ধি খেলিয়া গেল। একটা বড় দোকানের সামনে গাড়ী দাঁড় করাইয়া সে এক টিন "প্রুণ" কিনিয়া আনিয়া অনিলকে দিতে দিতে বলিল—প্রথম যাচ্ছি, ছোট বোনের জন্য কিছু নেওয়া গেল। আমার বাঁশীর এতবড় ভক্ত ত আর নেই।

অসিতের মনের সঙ্কোচ অনিল ধরিয়া ফেলিয়াছিল। তাই কোন আপত্তি না জানাইয়া বলিল—তুমি ভুল বুঝেছ হে, দেখবে তোমার বাঁশীর চাইতে ও জিনিসটার কত বেশী ভক্ত সে। সেদিন মার অসুখে এক টিন আনানো হয়েছিল,

তাতে মার চেয়ে বেশী খেয়েছিল ও-ই ; অবশ্য আমিও একেবারে বাদ যাই নি। কিন্তু আজ ত তুমি এখনই ফিরবে, তার সঙ্গে দেখা হবে না ত।

—সেই ত ভাল ; অদর্শনের নিদর্শন রেখে যাব।

—তাতে লাভ হবে এই, সে আমার ওপর অত্যন্ত চটে যাবে। তোমাকে নিয়ে আসার কথা সে আমায় অনেক বার বলেছে। সে ত জানে না তুমি কি ভীষণ একগুঁয়ে লোক।

সেদিন অসিত চা খাওয়ার অনুরোধ উপেক্ষা করিল, অনিলের মায়ের সহিতও আলাপ করিল না, বইটি লইয়া তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিল।

পরের দিন পূর্ণিমার এক চিঠি আসিয়া হাজির—উপহারের জন্য ধন্যবাদ, দেখা না করার জন্য অনুযোগ, ও শীঘ্রই একদিন চা খাইতে আসার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। উত্তরে অসিত তাহার সুবিধামত একটি দিন নির্দ্দেশ করিয়া দিতে বাধ্য হইল। সেদিন অনিল তাহাকে কলেজ হইতেই লইয়া গেল।

বরাহনগরে গঙ্গার ধারে অনিলদের বাড়ী। ছোট বাড়ীটির চারি পাশে বাগান, খানিকটা ফলের ফুলের আর খানিকটা এলোমেলো করিয়া রাখা, তাহাতে হঠাৎ চোখে একটু বিস্ময়ের চমক লাগে। একটা পুকুরও আছে, তাহার ধারে ধারে নারিকেলের সারি। গেট হইতে আরম্ভ করিয়া মোটর-চলা লাল পথ বাগানের ভিতর ঘুরিয়া বাড়ীর দরজায় গিয়া লাগিয়াছে।

অসিতকে ড্রইংরুমে বসাইয়া অনিল বলিল—একটু বোসো অসিত, মাকে খবর দিই। সুনয়নী আসিবার পূর্ব্বেই পূর্ণিমা এই বলিতে বলিতে ঘরে ঢুকিল—তবু যাহোক, এতদিনে এলেন। প্রুণগুলির জন্য ধন্যবাদ, এই দেখুন এখনও একটা মুখে।

সুনয়নী প্রবেশ করিতেই অসিত উঠিয়া প্রণাম করিতে গেল। অনিল বলিল—মা, এই আমার বন্ধু অসিত ; এর কাছে আমি খুব কৃতজ্ঞ। অসিত প্রণাম সারিয়া উঠিয়া লজ্জিত হইয়া বলিল—অমন করে বোলো না অনিল, তোমার সকল তাতেই বাড়াবাড়ি।

সুনয়নী বলিলেন—প্রথম দিন তোমাদের কলেজ থেকে এসে অনিলের কি রাগ ; বলে, মা তুমি ত কেবলই বাঙালীদের ভাল বল। তোমার কথা সব মিথ্যে। আজ দেখে এলাম, বাঙালী ছেলেরা অত্যন্ত অভদ্র ও অসভ্য।

অনিল বলিল—নেহাৎ তোমার বাধ্য ছেলে, তাই পরের দিন গিয়েছিলাম।

পূর্ণিমা বলিল—কিন্তু এখন কি মনে হয়? বন্ধুদের কথা ত আর ফুরোতে চায় না। তারপর অসিতের দিকে ফিরিয়া বলিল—অবশ্য আপনার কথাই সব থেকে বেশী।

অনিল বলিল—সে শুধু তোকে খুসী করবার জন্য; তুই শুনতে চাস্ বলে।

অসিত বলিল—স্পোর্টস নিয়ে যে মেতে গেছ, আমাকে যে মনে পড়ে এই যথেষ্ট। আমি ত আর খেলোয়াড় নই। জানেন অনিলকে পেয়ে আমাদের কলেজ টীম খুব জমে উঠেছে। ও আমাদের সব চেয়ে নামজাদা প্লেয়ার। সাহেবী স্কুলে পড়ার এ একটা মস্ত গুণ।

সুনয়নী বলিলেন—আমি কিন্তু তার বিরোধী ছিলাম।

—কেন?

—দেশের ছেলে পর হয়ে যায়। কিন্তু দেশী স্কুলে ভাল বোর্ডিংয়ের বড্ড অভাব, বিশেষতঃ ছোট ছেলেদের জন্যে। আমরা তখন এক জায়গায় বেশী দিন থাকতে পেতাম না—চাকরীর জন্যে নানা দেশ ঘুরে বেড়াতে হোত। কাজেই বাধ্য হয়ে সাহেবী স্কুলের আশ্রয় নিতে হোল।

—কিন্তু ফল ত বেশ ভাল হয়েছে বলেই মনে হয়; সুশিক্ষা পেয়েছে অথচ "পর" হয়ে যায়নি।

—যেত আরো কিছু দিন বোর্ডিংএ থাকলে। স্কুলের চাইতে বোর্ডিং-ই মনের উপর বেশী ছাপ ফেলে। ওদের জন্যই ত ওঁকে একা বিদেশে রেখে আমার এই বাসা করে থাকা।

পূর্ণিমা বলিল—শুনবেন মা কি রকম স্বদেশী? আমাকে খদ্দরের ফ্রক আর টাই পরিয়ে স্কুলে পাঠিয়ে ছেড়েছে অথচ বাড়ীতে আমরা যে সব সময় খদ্দর পরি তা নয়।

অসিতের স্বদেশভক্ত চিত্ত ভাবাবেগে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। অনিল বলিল—আর বাড়ীতে সমস্ত ক্ষণ বাংলা বলতে হয়। তবে বাবা এলে মা জব্দ তখন মাকেও ইংরিজি চালাতে হয়। তিনি বাংলা বলা পছন্দ করেন না।

অসিত জিজ্ঞাসা করিল—তিনি এখন কোথায় আছেন? করিয়াই তাহার ভয় হইল অন্যায় কৌতূহল প্রকাশের অসভ্যতা হইয়া গিয়াছে কিনা। অনিল

সহজ ভাবেই উত্তর দিল—তাঁকে এখন রেঙ্গুনে থাকতে হয়; বর্ম্মা গভর্ণমেন্ট ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টের কাছ থেকে তাঁকে চেয়ে নিয়েছে। সেদিন লিখেছেন, অনেক চেষ্টা করেও কলকাতায় বদলি হতে পারছেন না; চাকরীর বাকী ক'টা বছর হয়ত ও দেশেই কাটাতে হবে।

চা পানান্তে অনিল তাহাকে পড়িবার ঘরে লইয়া গেল। পূর্ণিমাও তাহার ঘর দেখাইতে ছাড়িল না। বাড়ীতে ফিরিয়া অসিতের মনে হইল তাহার জীবনে যেন একটা যুগ-পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে। অনিলদের সংসার তাহার কাছে এক নূতন জগৎ। সে নিজে যে খুব অভাবের মধ্যে বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা নহে। কিন্তু বাঙ্গালী গৃহস্থ পরিবারে, এমন কি সম্পন্ন পরিবারেও কেমন যেন একটা শৃঙ্খলার অভাব, অগোছাল ব্যবস্থা। আসবাব পত্রের অপ্রতুল নাই, অথচ সুরুচির পরিচয় পাওয়া যাওয়া না। অনিলদের বাড়ী ঢোকা অবধি লক্ষ্য করিয়াছে যে এই সংসারের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি সজাগ দৃষ্টি ও সুস্থির বুদ্ধির দূরদর্শী নীতির বিধানে নিয়ন্ত্রিত। সে বুঝিতে পারিল রচনা-নৈপুণ্য দিয়া জীবনকে কিরূপ সুশোভন করিয়া তোলা যায়; বুঝিল সম্পদকে আরামকে সুচারুরূপে ভোগ করিতে পারাও শিল্পশাস্ত্রের মতো সাধনা করিয়া শিখিতে হয়। এ সন্ধ্যাটি তাহার জীবন-পঞ্জিকায় একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া লইল।

(৩)

কাল-মাহাত্ম্যে এই নূতন জগৎ অসিতের অত্যন্ত পরিচিত হইয়া উঠিল। প্রথম প্রথম অনিলের সহিতই যাইত। ক্রমে অবস্থা দাঁড়াইল এমনই যে অনিলের বাড়ীতে অনিলই গৌণ পদার্থ। কলেজে অসিতের সঙ্গ যথেষ্ট পরিমাণে পাইত বলিয়া অনিলের দিক হইতে আপত্তির কোন কারণ ছিল না। অনিল বাড়ীতে না থাকিলেও অসিত অসঙ্কোচে যাতায়াত করিত। সুনয়নী ও পূর্ণিমার সাহচর্য্যে তাহার মনের দুইটি দিক পরম তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিত। দেশ বিদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার ইতিহাস সুনয়নী সাগ্রহে পর্য্যালোচনা করিতেন। অনিলের কিন্তু ও সব বিষয়ে কোন আগ্রহ ছিল না। সে ভাল ছেলের মত নিজের লেখাপড়া নিয়মিতভাবে করিত; আর বাকী সময় ইংরেজ

ছাত্রদের মত খেলা ও খেলার আলোচনায় মাতিয়া থাকিত। টেষ্টম্যাচের জন্ম হইতে সমস্ত "স্কোর" তাহার ওষ্ঠাগ্রে। আর তাহার প্রধান সখ উড়োজাহাজ চালানো। দমদম-এর এরো ক্লাবের সভ্য, পাইলটের লাইসেন্সের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। তাহার বিশ্বাস ছিল, শিক্ষানবিশী শেষ হইলেই নৃপেশনাথ তাহাকে একখানা "পুস্‌মথ" বা 'জিপ্সীমথ' কিনিয়া দিবেন। ইতিহাসের আলোচনা উঠিলে সে বলিত অন্য লোকে কি করে গেছে তা মনে গেঁথে রাখায় কি লাভ? আমার চেষ্টা যাতে আমার নামই ইতিহাসে ওঠে ও লোকে পড়ে। যেদিন লিণ্ডবার্গের রেকর্ডটা চুরমার করে দেব—

পূর্ণিমা দাদার এই কাল্পনিক বীরত্বে মুগ্ধ হয়। তবুও বলে—ততদিনে অন্য ঢের রেকর্ড তৈরী হয়ে যাবে।

সুনয়নীর আর এক ঝোঁক, বাংলা সাহিত্যের চর্চ্চা। অনিল পূর্ণিমা বাংলায় কথা কহিতে পারে বটে, সাহিত্যের অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না। কাজেই তাহাদের সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার তৃপ্তি হয় না। তাই অসিতকে পাইয়া তিনি যেন বাঁচিয়া গেলেন। অসিতও মুগ্ধ হইয়া গেল তাঁহার সহজ রসবোধ ও পরিণত বিচার-বুদ্ধিতে। যেদিন আলোচনার উত্তেজনায় অসিত নিজেকে ধর্ম্মমতে ও সমাজমতে সর্ব্ববিধ প্রচলিত পন্থার বিরোধী চরম নাস্তিক বলিয়া ঘোষণা করিয়া বসিল, সেদিনও যখন সুনয়নী চমকিত তাচ্ছিল্যভরে তাহাকে উপেক্ষা না করিয়া গভীর সহানুভূতির সহিত শুনিয়া গেলেন, তখন অসিতের উচ্ছ্বসিত চিত্ত ভক্তিনম্র হইয়া সেই মহীয়সী মহিলার পদপ্রান্তে অদৃশ্য প্রণামে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। ব্যক্তিগত ঈশ্বরে অবিশ্বাস, জন্মগত জাতিভেদে অবিশ্বাস, পারিবারিক সংস্থিতিতে অবিশ্বাস, রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্রে অবিশ্বাস, সামাজিক অর্থবৈষম্যে অবিশ্বাস—তাহার এই সব নিভৃত হৃদয়-লালিত দুর্দ্ধর্ষ বিদ্রোহী মত-গুলিকে কোন মাতৃস্থানীয়া নারী যে আন্তরিক সহৃদয়তা দিয়া বুঝিতে পারেন, অসিত ইহা কোনদিন কল্পনাও করে নাই। সুনয়নীর চিত্তের এই প্রশস্ত উদারতা, সহমর্ম্মিতার এই স্নেহ-গভীর স্পর্শ অসিতকে অভিভূত করিয়া ফেলিল।

পূর্ণিমার কাজ ছিল তাহাদের এই গুরু-গম্ভীর আলোচনায় গোল বাধাইয়া দেওয়া। কিছুই বুঝিতে পারে না বলিয়া কিছুই তাহার ভাল লাগে না, তাই তর্ক দীর্ঘায়িত হইলেই সে বলিয়া উঠিত—মা তোমাদের এ সব কচ্‌কচির কি

আজ শেষ হবে না? উঠে আসুন না অসিত-দা চলুন আমার ঘরে, বলিয়া জোর করিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া যায়। জানেন আজ ক্লাসে কি হয়েছিল? এই বলিয়া তাহার স্কুলের গল্প সুরু করিয়া দেয়। তাহার স্কুলের কাহিনীর তুচ্ছতম খুঁটিনাটির এমন উৎসুক শ্রোতা সে আগে কখনও পায় নাই। ওই ধরণের স্কুলে পড়ে নাই বলিয়া অসিতেরও জানিবার আগ্রহ কম ছিল না। গল্প শুনিয়া ও ছবি দেখিয়া এখন পূর্ণিমার সঙ্গিনী ও শিক্ষয়িত্রীগুলির নাম, ডাকনাম (প্রায় প্রত্যেকেরই) ও চেহারা তাহার মুখস্থ হইয়া গিয়াছে—এমন কি কাহার নাকে আঁচিল আছে সেটা পর্য্যন্ত। কাজেই এখন আর অপরিচয়ের বাধা লাগে না। বরং তাহাদিগকে লইয়া অসিতই এখন পূর্ণিমাকে ক্ষেপায়। একদিন স্কুল হইতে ফিরিয়া একটা খামের চিঠি পাইয়া পূর্ণিমা সাগ্রহে খুলিয়া দেখে, ভিতরে আর কিছুই নাই, শুধু তাহারই এক বন্ধুর নামে রঙ্গ করিয়া একটি 'লিমেরিক'। স্বাক্ষরহীন হস্তাক্ষরে বুঝিল ইহা অসিতেরই কীর্ত্তি। পরের দিন পূর্ণিমা সেটি ক্লাসে প্রচার করিতেই অসিত হঠাৎ তাহাদের মধ্যে বিখ্যাত হইয়া উঠিল। অসিত বলিল—বাইরণের মতো। ফলে অনেকের নামে অনেক ছড়া লিখিয়া দিতে হইল। কিন্তু অসিত প্রমাদ গণিল যেদিন হুকুম আসিল সনেট লিখিয়া দিবার। ইংরাজি সনেট যে কি কঠিন ব্যাপার তাহা সে ভাল করিয়াই জানিত; জানিত এই জন্য যে তাহার মতে বাংলা ভাষায় প্রকৃত সনেট নাই বলিলেই হয়। সাহিত্যিক আত্মসম্মানে ঘা লাগিলেও এই রূঢ় সত্যকে সে অস্বীকার করিতে পারে নাই। বাংলায় সনেট বলিয়া যাহা চলে তাহা প্রকৃত সনেটের ব্যর্থরূপ। যেন ঠোঙাভরা মিঠে বুলির লজেনজুস; যেগুলির রূপ আছে, সেগুলির রস নাই আর যেগুলির রস আছে, সেগুলির রূপ নাই। রূপে রসে সমৃদ্ধ, ডাঁসা পেয়ারার মত আঁটসাঁট একটিও সনেট আছে কিনা অসিত এইরূপ সন্দেহ করিত। তাই সেদিন অসিত বলিতে বাধ্য হইল—সনেট লেখা, সে আমি পারবো না, তোমার 'টোম্যাটোর (জুলিয়ার ডাকনাম) খাতিরেও নয়। তাকে বলে দিও, যারা লিমেরিক লেখে, সনেট লেখা তাদের কর্ম্ম নয়। ব্যাডমিণ্টন খেলতে জানলেই টেনিস খেলা যায় না।

পূর্ণিমা হাসিয়া বলিল,—আপনি ত টেনিসও খেলেন। তারপর কথা পাল্টাইবার জন্য বলিল, চলুন না একসেট খেলা যাক্।

—সেদিন হারিয়ে দিয়ে বুঝি লোভ বেড়ে গেছে? দাদার কাছে ত পাত্তা পাও না।

পূর্ণিমা একটু লজ্জিত হইল কিন্তু হটিল না। বাস্তবিক অসিত ভাল খেলিতে পারে না। আর অনিলের মত পাকা খেলোয়াড়ের সহিত খেলিয়া খেলিয়া পূর্ণিমা সাধারণ মেয়েদের তুলনায় খুবই ভাল খেলে। তাই সে তৎক্ষণাৎ নিজেকে সংযত করিয়া বলিল—দাদা ত আপনার মত কবি নয় যে 'গ্যালান্ট্রি' করে হেরে যাবে।

—গ্যালান্ট্রি! আমার হারার মধ্যে একটুও গ্যালান্ট্রি নেই। খেলে হেরে গেছি, এর মধ্যে লজ্জা কিসের—অর্থাৎ আমি বলছি পুরুষ হয়ে কোন মেয়ের কাছে হেরেছি বলে। তারপর একটু হাসিয়া বলিল, মেয়েরা কি এতই তুচ্ছ যে আমাদের খেলাতেও হারাতে পারবে না?

মেয়েরা যে তুচ্ছ নয়, অসিতের এই স্বীকারোক্তিতে পূর্ণিমা খুসী হইয়া উঠিল। সে ত নিজের মনে জানে অসিতের সাহচর্য্যে তাহার কত লাভ হইয়াছে। দাদার উপযুক্ত বোন, সেও মনোযোগী, স্কলারশিপ পাওয়া ভালো ছাত্রী। কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত লেখাপড়ার মধ্যে সাফল্য ও আনুষঙ্গিক যশ ভিন্ন অন্য কিছুই তাহার লক্ষ্যের মধ্যে ছিল না। তাহাতে ছিল কিছু পরিমাণ অহঙ্কারের উন্মাদনা, কিছু তাহার উচ্চাশার পরিতৃপ্তি এবং অনেকটাই ছিল গতানুগতিকের অনুসরণ। কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে লোকোত্তর আনন্দের আস্বাদ এমন করিয়া সে পাইতে শিখে নাই। অসিতের সংস্পর্শে আসিয়া দেখিল, সে পড়ে পড়িয়াই তৃপ্তি পায় বলিয়া; বিদ্যার্চ্চনাকে অন্য কোন সাংসারিক উদ্দেশ্য সাধনের উপায় স্বরূপ ব্যবহার করার কল্পনাও তাহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না। লেখাপড়া সম্বন্ধে পূর্ণিমার দৃষ্টিভঙ্গী বদলাইয়া গেল ও তাহার জীবনে প্রথম স্বপ্নসৃষ্টি আরম্ভ হইল।

হঠাৎ একদিন অসিত খবর পাইল যে নৃপেশনাথ কিছুদিনের ছুটিতে কলিকাতায় আসিতেছেন। তাঁহার সাহেবীপনার গল্প শুনিয়া অবধি অসিত তাঁহাকে মনে মনে ভয় করিয়া চলিত। নৃপেশনাথকে দেখিয়া নিজের কাছে স্বীকার করিতে বাধ্য হইল হাঁ সাহেবীপনা ইহাকে মানায় বটে। দীর্ঘ সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহ, সুগৌর বর্ণ, সাবলীল স্বচ্ছন্দ অঙ্গভঙ্গী, সুনিয়ন্ত্রিত পদক্ষেপ, সংযত ও মার্জ্জিত শিষ্টাচার—সর্ব্বশুদ্ধ একটি মনীষা-মণ্ডিত মনের গৌরবময় প্রকাশ।

শুনিয়াছিল ছেলেমেয়ের ইংরিজি উচ্চারণের ও স্বরসঙ্গতির দিকে ইহার খরদৃষ্টি। এখন নিজের কানে শুনিয়া বুঝিল, এ বিষয়ে অহঙ্কার করিবার মতো মূলধন ইহার আছে। কয়েকদিন দেখাশোনা আলাপ-পরিচয়ের পর তিনি চলিয়া গেলেন, অসিতের মর্ম্মপটে একটি গভীর অঙ্কপাত করিয়া। একদিকে যেমন তাঁহার পারিবারিক স্নেহ-প্রবণতা; তাঁহার উপস্থিতিতে সাংসারটি হইয়া উঠিল যেন একটি কিউব-এর মতো—প্রত্যেকেই অন্যের অধিকারের সীমারেখাকে সম্মান করিয়া স্বকীয় সম্পূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত। অন্যদিকে তাঁহার কঠিন সমালোচকের দৃষ্টি—যে কোন মতবাদের, যে কোন আদর্শবাদের অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতা তাঁহার নিকট ছাপার বইদের মতই সুস্পষ্ট। সরকারী চাকরী করিয়াও সরকারের কার্য্যাবলীর বিচারে তাঁহার উক্তি যেরূপ নির্ভীক, জাতীয় আন্দোলনে আত্মপ্রবঞ্চনার বিরুদ্ধেও তাঁহার মন্তব্য তেমনি নির্দ্দয়। তাঁহার সমালোচনার তীব্রতায় অসিত মাঝে মাঝে উত্তেজিত হইয়া উঠিত। ভাব-রসহীন নিরপেক্ষ যুক্তির বায়ুমণ্ডল-বিরহিত রাজ্যে তাহার নিঃশ্বাস-রোধ হইয়া আসিত। তাঁহার ব্যতিক্রম-হীন সংশয়বাদের আক্রমণে তাহার যৌবনসুলভ ভাব-প্রচুর বিদ্রোহবাদকে রঙীন ফানুসের মত অন্তঃসারশূন্য বোধ হইত। সমস্ত কিছুকে এত তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিতে সে চাহে না, একটা বড় কিছুকে বিশ্বাস করিতে, অবলম্বন করিতে পারিলে যেন সে বাঁচে, এইরূপ মনে হইত। শেষে একদিন আত্ম-সংবরণ করিতে না পারিয়া ঈষৎ ক্রোধমিশ্রিত দীপ্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, তবে কি মানুষের কাজ কেবলই সন্দেহ করা, শুধুই ছিদ্রান্বেষণ? গড়ে তোলবার কোন আদর্শ, কোন সাধনা কি নেই?

নৃপেশনাথ প্রশান্ত দৃষ্টিতে তাহার চোখের দিকে কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া রহিলেন। পরে অল্প স্মিতমুখে ধীর কণ্ঠে উত্তর করিলেন—আদর্শ? হয়ত আছে। কিন্তু আমি পাইনি। আর যে আদর্শ জীবনে ফলিয়ে তোলা যায়না, তার দাম কতটুকু? কথা কয়টির মধ্যে নূতন কিছুই ছিল না। তবুও এমন কিছু ছিল যাহাতে অসিতের বোধ হইল কিসে তাহার মনকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়

ফ্যাশিজম্ ও সমর*

বিগত মহাযুদ্ধের সময় মিত্রপক্ষীয় ইয়োরোপ প্রচার করেছিল যে সেই সমর ঘটেছিল পৃথিবীতে যুদ্ধ-বিগ্রহের চিরসমাপ্তি হবে বলে এবং সামরিকতন্ত্র ও স্বৈরীতন্ত্রের বিচ্ছেদ করে গণতন্ত্রবাদকে জগতে নিষ্কণ্টক এবং নিরাপদ করবার জন্য। এমনি একটি আদর্শবাদের নৈতিক সমর্থনের বিশেষ প্রয়োজন ঘটেছিল। নৈতিক অস্বাচ্ছন্দ্যের মত আর কিছুতে এমন মেকি দেবতার সৃষ্টি করতে পারে না। এবং মেকি দেবতার পূজার ছলেই পৃথিবীর সব চেয়ে বড় অন্যায় এবং অবিচারগুলি সম্পাদিত হয়। অবশ্য আসল দেবতার মেকি পূজার ছলেও জগতে কম অন্যায় সাধিত হয় না। মহাসমরের পর ধর্ম্মাশ্রয়ী বিজয়ী শক্তিগুলি তাঁদের বিজয় সম্পন্ন করলেন একটি রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু অন্যায় এবং ভ্রান্ত নীতির বালুকার উপর যার ভিত্তি তার অস্তিত্বের মেয়াদ খুব দীর্ঘ হতে পারে না। ভের্সাই (Versailles) ব্যবস্থা সন্দেহ এবং ঘৃণা-উৎকট বিদ্বেষপূর্ণ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হল এবং তার কোন সমাধানই টেঁকসই হল না। এই ব্যবস্থা নাকচ করা বিজিতদের পক্ষে কেবল সময় এবং সুযোগসাপেক্ষ হয়ে রইল। ভের্সাই ব্যবস্থার বিরাট ব্যর্থতা সম্বন্ধে আজ আর কোন সন্দেহ নেই। যুদ্ধ বন্ধ হওয়া ত দূরের কথা, আজ বিংশ শতাব্দীতে ইয়োরোপ বর্ব্বর প্রাক্তন যুগের জবরদস্তিকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। গণতন্ত্রবাদ আজ টলমল করছে এবং অধিকাংশ ইয়োরোপ আজ ডিক্টেটার-শাসিত। ক্ষুন্নিবৃত্ত ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স যুদ্ধে তাদের স্বার্থ বিনাশের সম্ভাবনা দেখে শান্তি কামনা করে, কিন্তু হিটলার বর্ত্তমান ব্যবস্থার উচ্ছেদ তাঁর বিধাতা-নির্দ্দিষ্ট ব্রত বলে মনে করেন। বঞ্চিত অসন্তোষের আক্রোশ নিয়ে সাম্রাজ্যাভিলাষী বেনিতো মুসোলিনিও হিটলারের দলে।

ইয়োরোপের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে এই আত্মনিযুক্ত যুগাবতার যুগলের

* Mussolini's Roman Empire—by G. T. Garratt (Penguin).
Blackmail or War—Genevieve Tabouis (Penguin).

বাহ্বাস্ফোটনের এবং তাল ঠোকার পিছনে কতখানি সংসাধন-ক্ষমতা আছে সেইটাই কেবল রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে গণ্য। ইতালির আভ্যন্তরিক অর্থনৈতিক অবস্থার যে মুসোলিনি-কৃত কোন উন্নতি সাধন হয়নি তার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। সরকারী পরিচালনার মাহাত্ম্যে ইতালির আপাতদৃষ্ট পরিতৃপ্তির ভাব অনেকের কাছেই ইতালির সমৃদ্ধির অভ্রান্ত এবং নিশ্চিত নিদর্শন। কিন্তু বাস্তবিক পরীক্ষায় এই প্রতীয়মান ঋদ্ধির শূন্যগর্ভতা সহজেই ধরা পড়ে। বাইরের ঠাট বজায় রাখার জন্য ফ্যাশিজম্ ও নাৎসিজম্ অভূতপূর্ব্ব পরিমাণে শক্তি এবং মেহনৎ নিযুক্ত রাখে। গণতন্ত্রী দেশগুলির একটি প্রধান গলদ তাদের বেকার শ্রমিকদের সংখ্যা। হিটলার এবং মুসোলিনি বেকারদের যেনতেন প্রকারের কাজ দিয়ে সকলের চমক লাগিয়ে দিয়েছে অথচ তার দ্বারা দেশের শিল্পোৎপাদন বা খাদ্যোৎপাদন বেড়েছে কিনা সেই একমাত্র ধর্ত্তব্য মানদণ্ডের কথাই অনেকে ভুলে যান। সামরিক শিল্পের প্রসার স্বভাবতই অনেক লোককে কাজে বহাল রেখেছে। কিন্তু দেশের উন্নতি কতটুকু হয়েছে? উপরন্তু সমর-সজ্জার ফর্দ্দ নিঃশেষ হয়ে গেলেই অধিকাংশ শ্রমিকরা বেকার শ্রেণীতে পুনরাবর্ত্তন করবে। যে অর্থ এবং অর্থনৈতিক সামর্থ দেশের সমৃদ্ধি আনতে পারে সে সমস্তই যুদ্ধায়োজনে অপব্যয়িত হচ্ছে। ইতালির বাজেটের ঘাটতি হাবসী যুদ্ধের পর অনেক বেড়ে গেছে। মুসোলিনির অভ্যুদয়ের পর থেকে ইতালির রাষ্ট্রিক দেনা ক্রমাগত বেড়ে গিয়ে এখন প্রাক-ফ্যাশিষ্ট যুগের দেনার দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাক-মুসোলিনি যুগে ইতালির যে ক্রেডিট ছিল তা আজ সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়েছে। যে-ধনিক সম্প্রদায় কম্যুনিজমের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য মুসোলিনিকে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন তাঁরা আজ মুসোলিনি প্রবর্ত্তিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চাপে বোধহয় কম্যুনিজম্‌কেও কাম্য মনে করেছেন। এরকম অবস্থায় মুসোলিনির দ্বিগ্বিজয়ী আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির জন্য এবং অত্যধিক ব্যয়সাপেক্ষ ফ্যাশিষ্টতন্ত্র পালনের জন্য দেশবাসীর যে ব্যবস্থানুযায়ী শোষণ চলেছে তা সহজেই অনুমেয়। অতএব ফ্যাসিজমের ভিত্তি তেমন সুদৃঢ় নয়। ফ্যাশিজমের ততদিনই আয়ু যতদিন বাহ্যিক আড়ম্বরের ঠাট বজায় থাকে এবং যতদিন মুসোলিনি ধাপ্পাবাজির খেলায় বাজিমাৎ না হন।

চিরকাল এ অবস্থায় নেপোলিয়ান প্রমুখ নেতারা দিগ্বিজয়ের শরণ নিয়েই

জীবনের মেয়াদ আরও কিছুদিন বাড়িয়েছেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের ঘোর প্যাঁচে যুদ্ধে জয়লাভ করেও নিষ্কৃতি পাওয়ার সম্ভাবনা সর্ব্বদা নিশ্চিত নয়। তাই মুসোলিনি উভয় সঙ্কটে পড়েছেন। কম্যুনিষ্টদের মতে ফ্যাশিজ্‌ম্ হল পরস্পর বিরুদ্ধতার একটা জটিল ভোজবাজী। এটা হয়ত তারই একটা উপসর্গ। যুদ্ধের গোলমালে সব ব্যাপারটি একটু চাপা না পড়লে অর্থনৈতিক দুর্দ্দশার নিরন্তর আঘাতে মুসোলিনির, তথা ফ্যাশিজমের, অনতিসুদৃঢ় ভিত্তি ক্ষয় পেতে সুরু করবে। অথচ বিপ্লব ঘটবার জন্য যে আলোড়ন একান্তই অপরিহার্য্য আর একটি যুদ্ধ খুব সম্ভব ইতালিতে সেই আলোড়ন এনে দেবে। দীর্ঘকালব্যাপী কোন বড়দরের যুদ্ধে বিজড়িত থাকতে ইতালি অপারগ কারণ তার স্থিতি-ক্ষমতা নেই। তাই মুসোলিনি বৈদ্যুতিক দিগ্বিজয়ের উপর বাজি ধরলেন। কিন্তু আবিসিনিয়া ও স্পেন তাঁকে এই পন্থারও বিঘ্নকুটিলতা সম্বন্ধে কতকটা শিক্ষা দিয়েছে এবং এখনও দিচ্ছে। মুসোলিনি নিজের দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে যে অচেতন তা মোটেই মনে হয় না, কিন্তু তিনি ইয়োরোপের মনস্তত্ত্ব এবং দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে অত্যন্ত সজীব সে বিষয় সন্দেহ নেই। তাঁর কার্য্যোদ্ধার করার শ্রেষ্ঠ উপায় যে ধাপ্পাবাজি তা তিনি খুব গভীর ভাবেই উপলব্ধি করেছেন। তাঁর একার ভয় দেখানোতেই যখন ইয়োরোপ কাবু তখন ইয়োরোপের "strong man"-দ্বয়ের সংযোগে ইয়োরোপ হয়ত ভীতিবৈকল্যে পঙ্গু হয়ে থাকবে। অথবা মুসোলিনি হয়ত ভেবেছিলেন যে যদি কেউ ধাপ্পাবাজিতে না প্রতারিত হয় তাহলে হিটলারের সাহায্যটা হাতে রাখা অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় হবে। কিন্তু ইতালির মত জার্ম্মানিরও কোন বড় যুদ্ধে স্থিতির সম্ভাবনা অতীব সঙ্কীর্ণ।

জার্ম্মানির আভ্যন্তরিক অবস্থা ইতালির মতই পদ্মপত্রে টলটল করছে। কেবল শিক্ষিত ও পারদর্শী সৈন্যবাহিনীর এবং অস্ত্র-সম্ভারের দ্বারা আধুনিক যুদ্ধ যোঝা যায় না। ১৯১৮ সালে জার্ম্মানির যুদ্ধ-পারদর্শিতার এবং নৈপুণ্যের অভাব ছিল না। যার অভাব ছিল—সে হল খাদ্য। জার্ম্মান Four Year Plan-এ synthetic খাদ্যোৎপাদনের যে চেষ্টা চলছে তার সফলতা এ সমস্যা সমাধান করতে পারবে না, কারণ উৎপাদিত খাদ্যের পরিমাণ প্রয়োজনানুযায়ী অতি অল্প হবে। Winston Churchill-এর হিসাবে হিটলারী আমলে প্রায় ৯০ কোটি পাউণ্ড সমরসজ্জায় ব্যয়িত হয়েছে।

এই সংখ্যাটি সকলে না মানলেও এ-কথা সকলেরই স্বীকার্য্য যে সমরায়োজনে জার্ম্মানি অত্যধিক, এমন কি সাধ্যাতিরিক্ত, পরিমাণে খরচ করেছে। ফলে দেশে আজ খাদ্যাভাব ঘটেছে। নাৎসি কর্ত্তৃপক্ষরা তাই "guns rather than butter" এই অতি সুবিধাবাদী উচ্চ আদর্শের দ্বারা জার্ম্মান জাতিকে অনুপ্রাণিত করতে বাধ্য হচ্ছেন। অজস্র আইন কানুন এবং বিধি-ব্যবস্থা সত্ত্বেও জার্ম্মানিতে চাষের জমি বর্দ্ধিত হওয়া ত দূরের কথা, ১৯১৪ সালে যা ছিল তার থেকেও কমে গেছে, এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণ ভাবে খাদ্যাভাব না ঘটে থাকতে পারে কিন্তু মাঝে মাঝে এবং জায়গা বিশেষে খাদ্যাভাব ঘটেছে। বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে যে এমনি একটি দমক এসেছে তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এই অবস্থায় জেনেরাল ফ্রাঙ্কোকে যুদ্ধের মালমশলা এবং সৈন্য সরবরাহ করায় দুর্দ্দশা আরও বেড়ে গেছে। যদিও ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের দৃঢ়তার অভাবে জার্ম্মানি স্পেনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে কিছু কিছু কাঁচা মালের ব্যবস্থা করে নিয়েছে তথাপি অর্থনৈতিক সামর্থ্য একান্তই সীমাবদ্ধ হওয়ার দরুণ তার উপর নির্ভর করে জার্ম্মানি কোন বড় যুদ্ধে বিজড়িত হতে পারবে না।

দেশে আবার অসন্তুষ্টি বেড়ে গেছে কারণ জার্ম্মানদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে Reich-এর "will to power" গণতন্ত্রী দেশগুলির তরফ থেকে অথবা যে কোন দিক থেকে সমস্ত প্রতিরোধকে বিধ্বস্ত করবে। অতএব স্পেনের মত দ্বিতীয় শ্রেণীর শক্তি যখন সমষ্টিকৃত ফ্যাশিষ্ট শক্তিকে বাধা প্রদানে সমর্থ হয়েছে তখন যদি জার্ম্মান জাতির হিটলারী রাষ্ট্রের বিধাতা-নির্দ্দিষ্ট ব্রত সম্বন্ধে মনে সন্দেহ জেগে থাকে তাতে আর বিচিত্র কি? নাৎসি রাষ্ট্রের এই কথঞ্চিত মলিনতাকে দূর করার জন্য তার ঐশ্বরিকত্বের আর একটা রশ্মি বিকীর্ণ করার সময় নিঃসন্দেহে হয়েছিল। অষ্ট্রীয়া অধিকারে সেই রশ্মির আলোতে জার্ম্মানি নিজের আত্মগত শক্তিকে দেখতে পেলে এবং ভগবত-প্রেরিত নেতার সম্বন্ধে সমস্ত দ্বিধা সন্দেহ ঘুচে গেল। Fuehrer হ'লেন জার্ম্মান রাষ্ট্রের মূর্ত্তিমন্ত আত্মা। জার্ম্মান রাষ্ট্রের বা সরকারী কার্য্যনীতির বিরুদ্ধাচরণ সম্বন্ধে বহির্জগতকে যতটা সম্ভব অজ্ঞ রাখা যায় তা করা হয়। রাজনৈতিক ব্যাপার ছাড়া অন্য ব্যাপারেও কোন রকম বিরুদ্ধাচরণ বরদাস্ত করা হয় না। নাৎসি রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌমিক দাবী organised ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ বাধিয়েছে। এই সঙ্ঘর্ষের

রাষ্ট্রনৈতিক গুরুত্ব কোন মতেই অকিঞ্চিতকর নয়। এবং নাৎসি সর্ব্বগ্রাসিত্বের বিরুদ্ধে এই প্রতিরোধ শক্তি সঞ্চয় করে যাচ্ছে। যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলির উত্তর সামরিক দুর্দ্দশা নাৎসি আন্দোলনের শক্তির প্রধান উৎস ছিল সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলি আজ করভারে এবং "স্বেচ্ছাকৃত চাঁদার" অত্যাচারে উৎপীড়িত হয়ে অঙ্গীকারসর্ব্বস্ব নেতাদের কাছে প্রতিজ্ঞাপূরণের দাবী করছে। পরাজয়ের লাঞ্ছনা এবং আত্মগ্লানি থেকে জার্ম্মান জাতির সম্মান ও সম্ভ্রমকে পুনর্মুক্ত করার এবং জার্ম্মান প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করার চিত্তাকর্ষী মন্ত্রের মোহ দেশের মন হরণ করে নিয়েছিল। হিটলার তাঁর অঙ্গীকারের মধ্যে কেবল মাত্র একটিকেই পূরণ করেছেন। তিনি ভের্সাই সন্ধিপত্রটিকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেছেন। একরাষ্ট্রীয়তাবোধ তবং বর্ণাভিমানের খোরাক জোগান দিয়ে হিটলার এযাবৎকাল দেশের সমর্থন পেয়ে আসছেন। কিন্তু তাঁর স্থূলতর অঙ্গীকারগুলি আজ পর্য্যন্ত বাস্তবে পরিণত না হওয়ার দরুণ হিটলার রাজত্বের ভিত্তি দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে কারণ গৌরব এবং সম্ভ্রমের সূক্ষ্মতায় বেশি দিন পেট ভরে না। হিটলারী প্লেবিসিটের অসার ও ব্যঙ্গময় ভড়ং নাৎসিতন্ত্রের দৃঢ়মূলতার প্রমাণ নয়। মুসোলিনির মত হিটলারও যুদ্ধে সর্ব্বস্ব পণ করেছেন। যুদ্ধ ফ্যাশিজমের অনিবার্য্য পরিণাম। মুসোলিনি ভূমিষ্ট সন্তান থেকে সামরিক শিক্ষা সুরু করেন। হিটলার এ বিষয়ে সাহায্য পেয়েছেন জার্ম্মান সামরিকতন্ত্রবাদের ঐতিহাসিক এবং ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য থেকে। Prussianism-এর প্রভাব হেগেলের মত দার্শনিক থেকে সুরু করে নিম্নতর সৈনিক পর্য্যন্ত সকলকেই অভিভূত করে রেখেছিল। মহাসমর সামরিকতন্ত্রের বিনাশ করে গেল, কিন্তু আবার তার অভ্যুদয় হয়েছে।

খঞ্জ অর্থনৈতিক অবস্থার পুঁজি নিয়ে ইতালি ও জার্ম্মানির যুদ্ধ করবার মত ক্ষমতা নেই বলেই তারা ধাপ্পাবাজির সাহায্যে এবং ভয় দেখিয়ে যুদ্ধ করার মত ক্ষমতা সংগ্রহ করছে। তাদের এই কাজে কোন রকম বাধা দিতে ইউরোপ পারেনি। উল্টে তাদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য আজ অন্যান্য দেশগুলিও সমরসজ্জা করছে। ফ্যাশিজমের লুণ্ঠন এবং অত্যাচারের হাত থেকে নিরীহ এবং দুর্ব্বল দেশগুলিকে রক্ষা করবারও কেউ আজ ইউরোপে নেই।

গ্যারেট প্রধানতঃ ইংলণ্ডকে দায়ী করেছেন এই অবস্থা ঘটার জন্য।

সত্যই আমাদের বিস্ময় লাগে যে কোথায় গেল সেই ইংলণ্ড যে সগর্ব্বে দাবী করত যে সে দুর্ব্বলের রক্ষক এবং অসহায়ের আশ্রয়। আবিসিনিয়া এবং স্পেন সম্পর্কে ইংলণ্ডের কার্য্যকলাপ দেখে একথা অস্বীকারই করা চলে না যে এই দু'টি দুর্ব্বল দেশকে সাহায্য করা ত দূরের কথা বরং তাদের আত্মসংরক্ষণের সমস্ত প্রচেষ্টা এবং ব্যবস্থাকে ইংলণ্ডই ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্যাহত করেছিল এবং করছে। ইতালির সঙ্গে ফ্রান্সের মৈত্রী যাতে নষ্ট না হয়ে যায় তার জন্য মসিয় লাভাল প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। নিজেদের নির্ব্বিঘ্নতা যাতে না নষ্ট হয় সেইটাই ছিল প্রধান লক্ষ্য। এরকম মনস্তাত্বিক আবেষ্টনীর মধ্যে যে আন্তররাষ্ট্রীয় শাসনবিধি নিষ্ফল এবং পঙ্গু হবে তা লেশ মাত্রও বিচিত্র নয়। ইতালি কেবল আবিসিনিয়া গ্রাস করেই ক্ষান্ত হয়নি ইয়োরোপকে তার স্বত্বাধিকার স্বীকার করিয়েছে। ধাপ্পাবাজির এবং জবরদস্তির এই স্পর্দ্ধিত অবমাননা হজম করে আজ স্পেন সম্বন্ধেও গণতন্ত্রী শক্তিগুলি ক্লীবত্বের পরিচয় দিচ্ছে। স্পেন জয়ের সঙ্কল্প ডিক্টেটারদ্বয় বহুকাল পূর্ব্বেই করে রেখেছিলেন এবং স্পেনের ভবিষ্যৎ বিদ্রোহীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন অনেকদিন থেকেই। বিদ্রোহ সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বহু সৈন্য, অর্থ ও যুদ্ধোপচার ইটালি এবং জার্ম্মানি ফ্রাঙ্কোকে সরবরাহ করেছে। মুখ রক্ষার জন্য ইংলণ্ডের নেতৃত্বে স্পেনে মধ্যস্থতা না করার "polite comedy"র অভিনয় সুরু হল।

শেষ অবধি এই উপহাস্য নিরপেক্ষ নীতি একটি পূর্ণাঙ্গ প্রহসনে পরিণত হয়েছে। ইংলণ্ডের জনমত যে অধিকাংশই গণতন্ত্রী স্পেনের তরফে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অতএব মুসোলিনির অনুকূল নীতি অবলম্বন করার অর্থ এক এই হতে পারে যে কোন মুষ্টিমেয় অথচ প্রবল এবং প্রভাবসম্পন্ন দলের প্ররোচনায় এই ব্যাপার ঘটছে। এ সম্বন্ধে গ্যারেট ভ্যাটিকান এবং রোমান ক্যাথলিকদের অনেকটা দায়ী করেছেন। ফ্যাশিজ্‌মকে আশীর্ব্বাদ করে পোপ গণতন্ত্রী দেশগুলির রোমান ক্যাথলিক সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের দ্বারা মুসোলিনির কার্য্যকলাপ সমর্থনের এবং তাতে সাহায্য দানের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। গ্যারেটের এই সুদৃঢ় মতের বাস্তবতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া শক্ত। এমন ধর্ম্মপ্রাণতার জন্য এখনও যে ক'জন লোক ঐহিক

জীবনের ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে ন্যায় অন্যায় সম্বন্ধে অন্ধ থাকতে পারে তাদের সংখ্যা এবং প্রভাব উপেক্ষণীয় বলেই মনে হয়। যাই হোক, গ্যারেট এ দলের থেকেও ultra-conservatives অথবা neo-fascistsদের অধিক অপরাধী করেছেন। এদের পৃষ্টপোষক হ'ল ভ্যাটিকান, বহু ধনিকতন্ত্রী এবং ইয়োরোপের পুরাতন ভূম্যধিকারী সম্ভ্রান্ত-সম্প্রদায়। এই দলকে অবলম্বন করে একটা নূতন আন্তররাষ্ট্রীয়তাবোধের অভ্যুদয় হয়েছে। তার ভিত্তি হল বিদ্বেষ। লীগ, সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক, সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতা, স্বাবলম্বী শিক্ষা এই সকলের উপর তাদের বিদ্বেষ। এরা বিশেষ করে ইংলণ্ডের বৈশিষ্ট্য। তাই গ্যারেট তাঁর বইখানি ইংরেজের জন্যেই লিখেছেন এবং ইংলণ্ডের উপর পৃথিবীর ভবিষ্যতের সমস্ত দায়িত্ব চাপিয়েছেন। এই নয়া ফ্যাশিষ্টদের শক্তি এবং সামর্থের উৎস খুব গভীর। এদের নেতৃবৃন্দ ধনী এবং ক্ষমতাসম্পন্ন। এদের মনে সাম্রাজ্য সংরক্ষণের থেকে লীগ সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা এবং সম্পত্তি সম্বন্ধে অসনাতনী মত-বিলাসী দেশের সংস্রবের ভয় অনেক বেশি। এদের ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান এবং অন্তররাষ্ট্রীয় ন্যায়পরতা নিতান্তই একদেশদর্শী। ধনিকতন্ত্রী দেশগুলিতে এরা রাষ্ট্রশক্তি গ্রাস করতে সুরু করেছে। জগতের উন্নতি এবং প্রগতির পথে এরা প্রচণ্ড অন্তরায়।

কিন্তু গ্যারেট যদি ভেবে থাকেন যে এরা একটি বিচ্ছিন্ন এবং স্বতন্ত্র দল তিনি ভুল করেছেন। কারণ সম্পত্তিবিশিষ্ট শ্রেণীগুলি একথা উপলব্ধি না করেই পারে না যে কম্যুনিজ্‌ম্‌কে রাশিয়ার চৌহদ্দিতে আবদ্ধ রাখার একমাত্র উপায় হ'ল ইয়োরোপে ফ্যাশিজ্‌ম্‌কে বজায় রাখা। যাই হোক, প্রাথমিক দায়িত্ব এই সঙ্কীর্ণ এবং ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের উপরই পড়ে। এদের কার্য্যকর প্রতিপত্তি ভিন্ন ইংলণ্ডের বর্ত্তমান পররাষ্ট্রনীতির অন্য কোন গ্রাহ্য ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। মুসোলিনির দশ হস্ত বিস্তারণে ইংলণ্ডেরই সমূহ বিপদ। অথচ তা সত্ত্বেও ইংলণ্ড মুসোলিনির সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কাজ এগিয়ে দিচ্ছে। ভূমধ্যসাগর "mare nostrum"এ পরিণত করা অনেকটা এখনও নির্ভর করছে স্পেনের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের উপর। কিন্তু ইংলণ্ড এখনও নিরপেক্ষতার অর্থহীন নীতি আঁকড়িয়ে রয়েছে। হিটলার এবং মুসোলিনির সঙ্গে ইংলণ্ডের মৈত্রীর যোগসূত্র এতই সূক্ষ্ম যে জনসাধারণের চোখে তা ধরা পড়ে না; কিন্তু স্পেনের গবর্মেণ্টের

দিকে সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও ব্রিটিশ জনসাধারণের ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের দেবতা-দের উপর এবং পররাষ্ট্র বিভাগের বিশেষজ্ঞদের উপর এমনই অবিচল বিশ্বাস যে সরকারী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আসে কেবল ক্ষীণ কণ্ঠে কম্যুনিষ্ট দল থেকে এবং বলতে-হয়-তাই-বলা গোছের নিষ্ফল এবং ভুয়ো প্রতিবাদ লেবার পার্টির তরফ থেকে। সরকারী-বিরুদ্ধ পক্ষ এই ভাবে তার constitution-নির্দ্দিষ্ট সরকারী কর্ত্তব্য বজায় রেখে চলে।

ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের যুদ্ধ না করতে চাওয়া স্বাভাবিক এবং সহজবোধ্য। কিন্তু সূচ্যগ্র ভূমি না ছেড়ে দিয়ে, নিজেদের স্বার্থে একটু আঁচড় পর্য্যন্ত না লাগতে দিয়ে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতি অনুরাগ জানান অসাধু কপটতা ভিন্ন কিছু নয়। বাঙ্ময়তা বজ্রগর্ভী হ'লেও তার জোরে প্রভুত্ব জারি করা যায় না। কিন্তু মুসোলিনির নৃশংসতার বিরুদ্ধে কোনরূপ সরকারী চোখ-রাঙানি বা বাক্যবাণের প্রয়োগও দেখা যায়নি। বাস্তবিক বিগত মহাযুদ্ধ ইয়োরোপকে আশানুরূপ শিক্ষা দিতে পারেনি। তাই যে একরাষ্ট্রীয়তাবোধের জন্য চার বৎসর বীভৎস ধ্বংসের তাণ্ডব চলেছিল তার পরেও আজ সেই একরাষ্ট্রীয়তাবোধ ইয়োরোপের অধিকাংশ দেশে চরম উন্নতি লাভ করেছে। ভের্সাই ব্যবস্থার এই বিকাশই অবশ্যম্ভাবী ছিল। তথাকথিত শান্তি রক্ষার জন্য ইয়োরোপে আজ সমরসজ্জার হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে এই সমরসজ্জা যে শান্তি রক্ষার জন্য নয়, আসন্ন যুদ্ধের আয়োজন সে বিষয় কারুই কোন সন্দেহ নেই। সব দেশগুলি সশস্ত্র হয়ে বৈঠক করে যে একটা বোঝাপড়া করবে তার কোন সম্ভাবনাই নেই। অদূর অতীতের অনেক কিছুই তার সাক্ষ্য দেয়। ইয়োরোপের একটি অদ্ভুত romanticism আছে। ইয়োরোপ বাস্তবকে সর্ব্বদা এড়িয়ে চলতে চায়, ঘটনার সম্মুখীন হতে চায় না। এইজন্য যুদ্ধ বন্ধ রাখার জন্য যা কিছু করা উচিত ছিল তার কোনটাই সোজাসুজি করার চেষ্টা হয়নি। প্রকৃত ব্যাপার তফাতে রেখে খুঁটিনাটি বিষয়ের মধ্যে দিয়ে বাস্তবের সঙ্গে আপোষের চেষ্টা এখনও চলছে। ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে এই আপোষের চেষ্টা এখন আসলে হচ্ছে একতরফা, কারণ হিটলার ও মুসোলিনি মিটমাটের ভান দেখিয়ে সময় নিচ্ছেন। আজীবন যুদ্ধের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করে' এবং সারা দেশটাকে সামরিক ব্যবস্থানুযায়ী রূপান্তরিত করে—যুদ্ধে সর্ব্বস্ব পণ করে—আজ

আড়ম্বরহীন শান্তির আদর্শ এই ডিক্টেটারদ্বয় বরণ করে নেবেন সেটা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন।

যুদ্ধ নিবারণের তাহলে কি উপায় নেই? এই সভয় প্রশ্নের উত্তরে গ্যারেট বলেছেন যে পশ্চিম ইয়োরোপ এবং আমেরিকার ধীসম্পন্ন ব্যক্তিরা যদি তাদের শাসকদের আয়ত্তে রাখতে পারেন এবং জগতে নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকতে পারেন তাহলেই যুদ্ধ বন্ধ হবার উপায় আছে। ইংলণ্ডেরই প্রধান দায়িত্ব। ইংলণ্ডকে ইংরাজসুলভ "decent sanity"তে ফিরে যেতে হবে। মাদাম তাবুই-ও বলেছেন যে যুদ্ধ বন্ধের উপায় হল ফ্যাশিষ্ট ডিক্টেটারদের ধাপ্পাবাজির সম্মুখীন হয়ে তার অসারতা প্রকাশ করে দেওয়া। এঁদের নির্দ্দিষ্ট পন্থায় চলাই পর্য্যাপ্ত কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। সমস্যাটি আরও গূঢ়। এঁদের সমাধান আংশিক। Aldous Huxley তাঁর Ends and Means-এ বলেছেন যে সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় পশুবলের দ্বারা কোন সমাধান সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত প্রয়াস এবং কয়েকটি ব্যক্তির সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াসের দ্বারা তাঁর মতে যুদ্ধ থামিয়ে রাখা যায়। এদের কাজ হল বিশ্বতত্ত্বঘটিত একটা বিপ্লব আনা। Aldous Huxley-র পরামর্শগুলি কিঞ্চিৎ স্বপ্নাশ্রয়ী। বর্ত্তমান অবস্থায় পশুবলকে একেবারে ছেঁটে ফেলে কিছুই করা সম্ভব হবে না। অন্য দিকে আবার কেবল বলপ্রয়োগের সাহায্যেও সমাধান হবে না। ডিক্টেটারশাসিত দেশগুলির আমূল আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তন না হলে এবং গণতন্ত্রী দেশগুলিতে প্রগতি-পরিপন্থী শক্তিগুলির উৎপাটন না হলে শান্তি রক্ষা সম্ভব হবে না। এক কথায় বলতে গেলে যে-পরিবেষ্টনী এবং আবহাওয়ায় বর্ত্তমান জটিলতার সমাধান হবে ইয়োরোপে আজ তার অভাব। যুদ্ধ বাধবার পূর্ব্বেই ঘটনা বিপর্য্যয়ে শান্তি-অনুকূল অবস্থান্তর হবে কি না সেই অতি আনুমানিক সম্ভাব্য নিয়ে বিচার করা অর্থহীন। তবে পূর্ব্বোক্ত লেখকদের পরামর্শানুযায়ী পন্থা অবলম্বনে ক্ষতির সম্ভাবনা ত নেই-ই, হয়ত তাতে অবস্থার উন্নতি হবে।

শ্রীপ্রবীরচন্দ্র বসু মল্লিক

ভারতপথে*

(১৬)

প্রথম গুহাটা ছিল, বেশ সুবিধামত জায়গাতেই। ডোবার ধার ঘেঁষে গিয়ে রোদের দিকে পিঠ ক'রে ওঁরা কতকগুলো বাজে-দেখতে পাথর বেয়ে ওপরে উঠলেন, তারপর মাথা নীচু ক'রে একে একে পাহাড়ের অন্তস্তলে হলেন অদৃশ্য। ক্ষণেকের জন্যে গুহার মুখে রূপের রঙের ঢেউ খেলে গেল, তারপর আবার সেই হাঁ-করা কালো গর্ত্ত। গুহাটি যেন ওঁদের শুষে নিল যেমন জলকে শুষে নেয় মাটির তলার ড্রেন। চার পাশ ঘিরে বেয়াড়া রকমের খাড়া খাড়া সব পাহাড়, তাদের মাঝে মাঝে মাথার উপর বেয়াড়া রকমের আঁঠালো আকাশ; নিরেট শাদা একটা চিল পাথরগুলোর মধ্যে বেঢপ ভঙ্গীতে পাখা ঝটপট করছিল, দেখলে মনে হয় যেন একেবারে ইচ্ছাকৃত ওর ভঙ্গী। মানুষ চায় সৌষ্ঠব, মানুষের জন্মের আগে নিশ্চয় পৃথিবী ছিল এই রকম বেঢপ।...হয়তো পাখীদের জন্মের আগে...গুহাটি করল উদ্গীরণ, মানুষের দল আবার ফিরে এল।

মারাবার গুহা অত্যন্ত ভয়াবহ ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল মিসেস্ মূরের পক্ষে, কেননা প্রায় তিনি মূর্চ্ছা গিয়েছিলেন, আর খোলা হাওয়ায় ফিরে এসে এই কথা চেপে রাখা তাঁর পক্ষে কষ্টকর হয়েছিল। ওরকম হবারই কথা। ওঁর একে তো এমনিই মাথা ঘুরত, তারপর গুহাটার মধ্যে ওঁদের লোকলস্কর সবাই ঢুকে হাওয়া চলাচল বন্ধ ক'রে দিয়েছিল। গ্রামের লোক আর চাকরবাকরের ভিড়ে গোল ঘরটি দুর্গন্ধ হ'য়ে উঠেছিল। অন্ধকারে আজিজ আর এডেলাকে উনি ফেললেন হারিয়ে, কে যেন পায়ে হাত দিল, তা বুঝতে পারলেন না, ওঁর দম বন্ধ হ'য়ে এল, তার উপর কি একটা বিশ্রী জিনিষ চটাং করে ওঁর মুখে এসে নরম

* E. M. FORSTER-এর বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস A PASSAGE TO INDIA আদ্যন্ত সমান উপাদেয় হইলেও আকারে এত বড় যে সম্পূর্ণ বইখানির তর্জ্জমা ধারাবাহিক ভাবেও প্রকাশযোগ্য নহে। সেইজন্য অগত্যা আমরা আখ্যায়িকার সারটুকুই নিয়মিতরূপে মুদ্রিত করিব। কিন্তু হিরণকুমার সান্যাল মহাশয় সমগ্র গ্রন্থখানিই ভাষান্তরিত করিতেছেন এবং নির্ব্বাচিত অংশের প্রকাশ 'পরিচয়ে' সমাপ্ত হইলেই তাঁহার সম্পূর্ণ অনুবাদ পুস্তকাকারে বাহির হইবে।—প: স:

তুলোর মত লেগে থাকল। বেরোবার চেষ্টা করলেন কিন্তু একদল গ্রামের লোক ঢুকে ওঁকে দিল আরো ভিতরে ঠেলে। তারপর ওঁর মাথায় লাগাল চোট। মুহূর্ত্তের জন্যে উনি দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে পাগলের মতন হাত পা ছুঁড়তে আর হাঁফাতে লাগলেন। শুধু লোকের চাপ আর দুর্গন্ধ ওঁর আতঙ্কের কারণ হয়নি, এর ওপর ছিল বিজাতীয় এক প্রতিধ্বনির শব্দ।

প্রতিধ্বনির কথা অধ্যাপক গডবোলে একবারও বলেন নি, বোধ হয় তাঁর কখনো মনেই হয় নাই এ আবার একটা বলবার মতন ব্যাপার। ভারতবর্ষে অদ্ভুত প্রতিধ্বনি শোনা যায় একাধিক জায়গায়; যেমন বিজাপুরের গম্বুজের চারপাশের ফিস্‌ফিস্ শব্দ; মাণ্ডুতে আবার লম্বা গোটা কথা যে জায়গায় বলা হয় বাতাসে ঘুরে আবার সেইখানে এসে হাজির হয়। এদের সঙ্গে মারাবার গুহার প্রতিধ্বনির তুলনা চলে না, কেননা একেবারে তা বৈশিষ্ট্যবর্জ্জিত। যাই বলা যাক, শোনা যাবে একঘেয়ে এক আওয়াজ, দেওয়াল জুড়ে কেঁপে কেঁপে ক্রমে ছাদে তা মিলিয়ে যাবে। 'বুম', 'বু-উম', কিম্বা 'উ-বুম'—মানুষের হরফে বলতে গেলে এই ট্যাপ্‌টেপে ধরণের একটা শব্দ। আশ্বাস, ভদ্রতা, নাকঝাড়া, জুতোর মচমচ—যা কিছু আওয়াজ, প্রতিধ্বনি হবে ঐ এক রকম—'বুম'। এমন কি দেশলাই জ্বললেও ছোট্ট একটা পোকা পাক খেতে সুরু করবে, এত তা ছোট যে পুরো পাক একটা হবে না, কিন্তু তবু তা চিরজাগ্রত। আর যদি একসঙ্গে জনকয়েক লোক কথাবার্ত্তা বলে, অমনি সুরু হবে এলোমেলো এক চীৎকারের শব্দ, প্রতিধ্বনির প্রতিধ্বনি, গুহাটা ভ'রে যাবে একটা সাপে, তার মধ্যে আবার ছোট ছোট সাপ, আলাদা আলাদা সেগুলি পাক খেতে থাকবে।

মিসেস্ মূরের পিছন পিছন সবাই গুহা থেকে বেরিয়ে পড়লেন, যেন তিনি দিয়েছিলেন ফেরার সিগন্যাল। আজিজ আর এডেলা দুজনেরই হাসি মুখ, মিসেস্ মূরও চেষ্টা করে হাসিমুখ করলেন, পাছে আজিজ ভাবে তার এই আয়োজন ব্যর্থ হয়েছে। একটির পর একটি লোক বেরোচ্ছিল আর তিনি দেখছিলেন তাদের মধ্যে বদমাইস কেউ থাকতে পারে কিনা। কিন্তু সে রকম কাউকেই মনে হোলো না, তিনি বুঝলেন যে লোকগুলি নিতান্তই নিরীহ ভালোমানুষ, ওঁকে মান্য করা এদের একমাত্র উদ্দেশ্য, আর সেই তুলোর মতন জিনিষটা উলঙ্গ একটি শিশু—অসহায়ভাবে মায়ের কাঁকে ব'সে রয়েছে। এমন

কিছু এই গুহার মধ্যে ছিল না যা অনিষ্টকর বা ভয়ঙ্কর। কিন্তু মোদ্দা কথা তাঁর ভালো লাগেনি, একেবারেই না, তাই আর কোনো গুহায় ঢুকবেন না এই তিনি ঠিক করেছিলেন।

এডেলা জিজ্ঞাসা করল, "ইনি দেশলাই জ্বাললে কি রকম সব ছায়া পড়েছিল দেখেছিলেন? বেশ সুন্দর না?"

"ঠিক মনে পড়ছে না..."

"কিন্তু ইনি বলছেন এই গুহাটা নাকি ভালো না, ভালোগুলি সব নাকি কাউয়া দোলে।"

"আমি আর অত দূর যাব না ভাবছি। পাহাড়ে চড়তে আমার মোটে ভালো লাগে না।"

"তা বেশ; চলুন, যতক্ষণ ব্রেকফাষ্ট তৈরি না হয়, একটু ছায়ায় গিয়ে বসা যাক্।"

"কিন্তু ভদ্রলোক কষ্ট ক'রে এত আয়োজন করেছেন, উনি তাহ'লে খুব ক্ষুণ্ণ হবেন। এডেলা, তুমি যাওনা, তোমার তো কোনো আপত্তি নাই।"

এডেলা জবাব দিল, "হ্যাঁ, যাওয়াই বোধ হয় উচিত।" উৎসাহ তার কিছুতেই বিশেষ ছিল না, কিন্তু তার ইচ্ছা আজিজকে খুসি করা।

চাকরবাকরেরা সব হুড়মুড় ক'রে আস্তানায় ফিরে আসছিল, পিছন পিছন তাদের বকতে বকতে আসছিল মহম্মদ লতিফ। আজিজ ওর অতিথিদের পাথরগুলো পেরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে এল। ওর দেহমনের শক্তি একেবারে চরমে ঠেকেছিল, একদিকে যেমন প্রবল ওর উদ্যম তেমনি আবার ওর নম্রতা, নিজের উপর আস্থা এত গভীর যে বিরুদ্ধ কথায় কিছুমাত্র ওর রাগ হচ্ছিল না, আর যখন শুনল যে ওঁরা ওর ব্যবস্থার একটু নড়চড় করেছেন, তখন সত্যি মনে প্রাণে ও খুসি হোলো।

"নিশ্চয়। মিস কেষ্টেড, তাহলে আমি আর আপনি দুজনে যাব, আর মিসেস্ মূর থাকবেন এখানে। আর, বেশি দেরি আমরা করব না, কিন্তু তাই ব'লে খুব তাড়াতাড়িও করব না। কেননা উনি তো তাই চান, কেমন?"

"হ্যাঁ, তাই। আমি আসতে পারলে বেশ হোতো, কিন্তু হাঁটতে যে পারি না।"

"মিসেস্ মূর, যতক্ষণ আপনি আমার অতিথি ততক্ষণ যা ইচ্ছে হোক কুছ পরোয়া নেই। আপনি আসছেন না আমি তাতে খুব খুসি হয়েছি। কথাটা খুব অদ্ভুত শোনাচ্ছে জানি কিন্তু ভারি ভালো লাগছে যে আপনি আমার সঙ্গে সত্যি বন্ধুর মতন খোলাখুলি ব্যবহার করছেন।"

আজিজের জামার হাতায় হাত রেখে মিসেস্ মূর বল্লেন, "হ্যাঁ, আমি সত্যি আপনার বন্ধু।" ক্লান্তি সত্ত্বেও একথা ওঁর মনে হচ্ছিল কি রকম ও লোক, কি রকম খাসা ওর ধরণধারণ, আর উনি কি রকম চান যে ও সুখী হোক্। "তাহলে, আর একটা কথা বলি? এবার আর ভিড় বাড়াবেন না, দেখবেন তাহলে আরো সুবিধা হবে।"

"ঠিক বলেছেন"—ব'লেই উৎসাহের আতিশয্যে ও মাত্র একজন গাইড ছাড়া মিস্ কেষ্টেড আর ওর সঙ্গে কাউয়া দোল যেতে সবাইকে মানা ক'রে দিল। "কেমন, এই তো ঠিক হোলো?"

"একেবারে ঠিক। তাহলে এখন আপনারা মজা করুন গে, ফিরে এসে আমাকে সব বলবেন"—ব'লে মিসেস্ মূর ডেক চেয়ারে এলিয়ে পড়্লেন।

গুহাগুলোর আসল জায়গাটিতে গেলে ফিরতে ওদের অন্তত একটি ঘণ্টা হবে। চিঠির কাগজ বের ক'রে মিসেস্ মূর লিখতে সুরু করলেন—"স্নেহের ষ্টেলা আর র‍্যাল্‌ফ্।" এইটুকু লিখে ঐ অদ্ভুত উপত্যকার দিকে উনি তাকিয়ে দেখলেন ওরই মাঝে মানুষের অভিমান কি রকম সামান্য মনে হচ্ছে। এমন কি হাতীটাও যেন একটা নগণ্য জিনিষ। ওঁর চোখ পড়ল গুহার সুড়ঙ্গের মুখে—না, দ্বিতীয়বার ঐ রকম অভিজ্ঞতার স্পৃহা ওঁর আর নাই। যতই ও কথা ভাবেন ততই যেন তা অপ্রীতিকর আর ভয়াবহ মনে হয়। তখনকার থেকে এখন যেন আরো বেশি তা খারাপ লাগছিল। লোকের চাপ আর দুর্গন্ধ তবু সহ্য করা যায়, কিন্তু ঐ বিকট প্রতিধ্বনি—যেন অদ্ভুত তার শক্তি, জীবনের বাঁধন যেন জোর ক'রে তা আলগা ক'রে দেয়। ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন এমন সময়ে যেন তা এই কথা কানে কানে বলল, "করুণা, দয়া দাক্ষিণ্য, সৎসাহস—সবই আছে। কিন্তু সবই এক, আর ময়লা আবর্জ্জনা, তাও ঐ একরকমই। আছে সবই কিন্তু কিছুরই কোনো মূল্য নাই।" ঐ জায়গায় কেউ যদি অশ্লীল কথা বলত বা উঁচুদরের কবিতা আওড়াত উত্তরে শোনা

যেত ঐ এক "উ-বুম" ধ্বনি। যদি কারো মুখে আসত একেবারে স্বর্গের দেবতাদের ভাষা আর পৃথিবীর অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ যা কিছু দুঃখ কষ্ট—শত চেষ্টা সত্ত্বেও পদমর্য্যাদা বা মতামত নির্ব্বিশেষে যে দুঃখভোগ মানুষের ভাগ্যে অনিবার্য্য যদি কেউ বলত তার কথা—ফল হোতো ঐ এক—সেই সাপটি আসত পাকে পাকে নেমে আবার পাকে পাকে তা উঠত গিয়ে গুহার ছাদে। সয়তান আর তার অনুচরদের বাস উত্তরে, তাদের সম্বন্ধে কবিতায় উচ্ছ্বাস করা চলে, কিন্তু মারাবারকে নিয়ে কেউ কবিত্ব করতে পারে না কেননা মারাবারে অসীমের আর অনন্তের ব্যাপ্তি পায় লোপ—একমাত্র যে-ব্যাপ্তির জন্যে মানুষ অসীম আর অনন্তকে সহ্য করে।

উনি চেষ্টা করলেন চিঠি শেষ করতে। মনকে বোঝালেন যে এই বয়সে এত সকালে উঠে এতদূর আসাটা একটু বাড়াবাড়ি হয়েছে, যে-নৈরাশ্য তাঁকে অভিভূত করছে তা ওঁর সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত নৈরাশ্য, ওঁর নিজের মনের দুর্ব্বলতা ছাড়া আর কিছু না—যদি হঠাৎ সর্দ্দিগর্মি হ'য়ে উনি পাগল হ'য়েও যান, তবু পৃথিবী যেমন চলছিল তেমনি চলবে। কিন্তু হঠাৎ মনের কোণে দেখা দিল ধর্ম্ম, ক্ষুদ্র নগণ্য ক্রিশ্চ্যান ধর্ম্ম, বাক্যবহুল ক্রিশ্চ্যান ধর্ম্ম, অমনি ওঁর মনে হোলো যা কিছু এই ধর্ম্মের বাণী সবের অর্থ শুধু ঐ 'বুম্' ধ্বনি। তখন ওঁর হোলো আতঙ্ক, সচরাচর যা হোতো তার চাইতে অনেকখানি ব্যাপকতর তার পরিধি। বুদ্ধির অগোচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কথা ভেবে তাঁর অশান্ত আত্মা কিছুমাত্র শান্ত হোলো না, গত দুইমাস ধরে যা অস্পষ্ট মনে হোতো তা স্পষ্ট আকার নিল—উনি বুঝতে পারলেন যে ছেলেমেয়ের কাছে চিঠি লিখতে উনি সত্যি চান না, কারও সঙ্গে আদান প্রদান উনি চান না, এমন কি ভগবানের সঙ্গেও না। ভয়ে কাঠ হয়ে উনি ব'সে রইলেন, আর মহম্মদ লতিফ আসতে ভাবলেন যে সে বুঝি ওঁর অবস্থা ধ'রে ফেলবে। "আমার নিশ্চয় কিছু অসুখ হবে" এই ভেবে উনি একটু সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু শেষকালে দিলেন একেবারে হাল ছেড়ে। কিছুতে আর ওঁর মন ছিল না, আজিজ সম্বন্ধেও না। এই একটু আগে অকপট স্নেহভরে যা ওকে বলেছিলেন মনে হোলো তা যেন ওঁর মুখের কথাই নয়, যেন তা বাতাসে ভেসে এসেছে।

(১৭)

মিস কেষ্টেড ও আজিজ একজন গাইডকে নিয়ে গেলেন গুহায় গুহায় ঘুরতে। ব্যাপারটি একটু ক্লান্তিকর হ'য়ে পড়েছিল। কারও মুখে বেশি কথা ছিল না, কেননা সূর্য্য ক্রমেই মাথার ওপর উঠছিল। বালতির মধ্যে ক্রমাগত গরম জল ঢাললে যে-রকম হয়, বাতাসের অবস্থা হয়েছিল সেই রকম। তাপ বেড়েই চলেছে, বড় বড় পাথরের চাংড়াগুলো যেন বলছিল, 'আমাদের প্রাণ আছে', ছোট ছোট পাথরগুলো বলছিল, 'আমাদের প্রাণ প্রায় আছে বললেই হয়'। ফাটলগুলোর মাঝে মাঝে ছিল রোদে-পোড়া ছোটো ছোটো লতাগুল্ম।

সবার ওপরে যে-দোদুল্যমান পাথর, ওদের ইচ্ছা ছিল সে পর্য্যন্ত যাওয়া। কিন্তু অতটা দূর যাওয়া আর হ'য়ে উঠল না, তাই একসঙ্গে অনেকগুলো গুহা যেখানে আছে এবারকার মতন তাই হোলো তাদের গন্তব্য স্থান। মাঝপথে পড়ল এখানে ওখানে কতকগুলো গুহা, দেখবার মতন মোটেই না, তবু গাইডের কথায় তারা ঢুকে ঢুকে একবার করে দেশলাই জ্বেলে দেওয়ালের পালিশে আলোর প্রতিবিম্বের তারিফ করল, তারপর প্রতিধ্বনি কি রকম হয় দেখে আবার বেরিয়ে এল। আজিজ বলল খুব পুরানো কাজ শিগ্‌গিরই কোনো না কোনো গুহায় তারা নিশ্চয় দেখতে পাবে—অর্থাৎ তার ইচ্ছাটা ছিল তাই। কিন্তু ওর মনের তলায় তলায় ছিল ব্রেকফাষ্টের চিন্তা। ক্যাম্প থেকে রওনা হবার সময় একটু যেন গণ্ডগোলের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। মনে মনে ও 'মেনু'টা একবার আওড়ে নিল: পুরো ইংরেজি খানা, 'পরিজ্', 'মাটন চপ্', কিন্তু কথাবার্ত্তা বলা চাই তো, তাই কিঞ্চিদধিক দেশী খাদ্যেরও ব্যবস্থা ছিল—সবশেষে আবার পান। মিসেস্ মূরের মতন অতটা ভালো মিস কেষ্টেডকে আজিজের কখনো লাগেনি, তাই বিশেষ কিছু কথা ওকে বলার ছিল না, তার ওপর আবার ব্রিটিশ রাজপুরুষের সঙ্গে ওর বিয়ে ঠিক হয়েছে শোনার পর।

এডেলারও সেই দশা। আজিজ ভাবছিল ব্রেকফাষ্টের কথা, আর এডেলা ভাবছিল প্রধানত বিয়ের কথা। আগামী হপ্তায় সিমলা, এ্যাণ্টনিকে বিদায়, তিব্বত দর্শন, তারপর বিয়ের ধূমধাম—ভাবতেও ক্লান্তি হয়, অক্টোবরে আগ্রা, বম্বে হ'তে মিসেস্ মূরকে ধীরে সুস্থে জাহাজে তুলে দেওয়া—একটির পর একটি ঘটনা, গরমের ঝাঁঝে একটু যেন অস্পষ্ট হ'য়ে, ওর চোখের সামনে ভেসে যাচ্ছিল।

তারপরে ওর মনে পড়ল চন্দ্রপুরের জীবনের গুরুতর সব ব্যাপার। সত্যিকারের ভাববার মতন সমস্যা ছিল বটে একাধিক—রনির আর ওর নিজের সব ত্রুটি—কিন্তু কোনো সমস্যা উপস্থিত হলে ওর ভালোই লাগত। এডেলা ভেবে ঠিক করল যে ওর রুক্ষ মেজাজ—ওর সব চাইতে বড় ত্রুটি—যদি সামলে চলতে পারে, অর্থাৎ ইঙ্গ-ভারতীয় জীবনের ধারায় একেবারে গা ঢেলে না দেয়, কিম্বা এই জীবন সম্বন্ধে যা'তা' কথা না বলে, তা'হ'লে ওদের বিবাহিত জীবন দুজনের পক্ষেই সুখময় ও কল্যাণকর না হবার কোনো হেতু নাই। বাঁধা মতামত অনুযায়ী চললে চলবে না, সমস্যা যখন যা উপস্থিত হবে তখন তখন তার সমাধান করতে হবে, আর নিজের আর রনির সুবুদ্ধির উপর রাখতে হবে আস্থা। সৌভাগ্যের কথা এই যে ওদের দুজনেরই প্রীতি ও সুবুদ্ধির অভাব ছিল না।

উলটো করা চায়ের পিরিচের মতন একটা পাথরের উপর দিয়ে চলতে চলতে তার মনে হোলো—"আর ভালোবাসা, তার কি হবে?" পাথরটির গায়ে ছিল দুসারি খাঁজ—পা দেবার জন্যে। ওর মনে এই প্রশ্নের উদয় হোলো ঐ খাঁজ্‌গুলি দেখে। এরকম যেন আর কোথায় ও দেখেছে? হ্যাঁ, নবাব বাহাদুরের গাড়ির চাকা রাস্তার ধুলোয় এরকম নক্‌সা কেটেছিল বটে। রনি আর ও—না, পরস্পরকে ওরা ভালোবাসে না।

আজিজ জিজ্ঞাসা করল, "আমি কি বড্ড তাড়াতাড়ি চলছি?" কেননা, এডেলা হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছিল, মুখে ছিল সংশয়ের ভাব। পাহাড়ে ওঠার সময় একমাত্র অবলম্বন যে দড়ি তা ছিঁড়লে যা মনে হয়, এডেলার মনে হচ্ছিল সেই রকম। যার সঙ্গে বিয়ে তাকে ও ভালোবাসে না! আর এই মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সে কথা ওর কখনো মনে হয়নি। আশ্চর্য্য, এর আগে কখনো তা ভেবেও দেখেনি! আবার একটি ভাববার মতন জিনিষ বটে। পাথরটার ওপর রোদ ঠিক্‌রে পড়ছিল, তারই ওপর চোখ রেখে ও ছিল ঠায় দাঁড়িয়ে—ততটা হতভম্ব নয় যতটা বিরক্ত। সন্ধ্যার অন্ধকারে ওরা পেয়েছিল পরস্পরের শ্রদ্ধা আর দেহের স্পর্শ—কিন্তু যে মনের আবেগে দেহের মিলন সার্থক হয় তা ছিল না। তাহলে কি ওর উচিত বিয়ে বন্ধ করা? বোধহয় না, তাতে অনেককে বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হবে, আর বিবাহের সার্থকতার জন্যে

ভালোবাসা যে অত্যাবশ্যক একথা যখন জোর করে সে বলতে পারে না—। যদি ভালোবাসাই হয় সব, তাহলে বাসরঘরেই বেশির ভাগ বিয়ের অবসান হোতো। "না, ওসব কিছু না"—ব'লে মনের জোর ক'রে সে আবার পাহাড়ে উঠতে সুরু করল, যদিও বেশ একটা ধাক্কা তার লেগেছিল। আজিজ ওর হাত ধরেছিল আর গাইডটি পাহাড়ের গায়ে গায়ে গিরগিটির মতন তিড়িক তিড়িক ক'রে চলছিল, যেন তার মাধ্যাকর্ষণের কেন্দ্র সে স্বয়ং।

আবার থেমে ভুরু কুঁচকে এডেলা জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা, ডাক্তার আজিজ, আপনার বিয়ে হয়েছে ?"

"হ্যাঁ, হয়েছে বৈ কি। একদিন এসে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করবেন না ?"—ওর মনে হোলো এক্ষেত্রে অন্তত একটি মুহূর্ত্তের জন্যে ওর স্ত্রী বেঁচে থাকাই বেশি শোভন।

অন্যমনা হয়ে এডেলা জবাব দিল—"ধন্যবাদ।"

"এখন উনি অবশ্য চন্দ্রপুরে নাই।"

"আপনার ছেলেপিলে নাই।"

আর একটু দৃঢ়স্বরে ও জবাব দিল, "হ্যাঁ, তিনটি।"

"ওদের আপনার খুব ভালো লাগে না ?"

আজিজ হেসে উঠল, "নিশ্চয়—আমি তো ওদের জন্য একেবারে পাগল।"

"তাই মনে হয়।"

কি রকম সুন্দর এই ভারতবর্ষীয় লোকটি। ওর স্ত্রী ও ছেলেপিলেরা নিশ্চয়ই খুব সুন্দর, কেননা, মানুষের যা আছে, আরো তাই জোটে। এই ভালো লাগা এডেলার পক্ষে সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক, কেননা উচ্ছৃঙ্খলতার রেশমাত্র ওর রক্তে ছিল না, কিন্তু তবু ওর মনে হোলো ওর স্বজাতীয় ও সমপর্য্যায়ের মেয়েদের বোধহয় আজিজকে ভালোই লাগে, আর ও নিজে বা রণি কেউ সুন্দর নয় ভেবে একটু ওর আক্ষেপও হোলো। ভালো চেহারা, ঘন চুল, মসৃণ ত্বক—এই সবের ফলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের একটু তফাৎ হয় বই কি। হয়তো এই লোকটির একাধিক স্ত্রী আছে—মিসেস্ টার্টনের মতে নাকি মুসলমান মাত্রেই তাদের শাস্ত্রমাফিক চারজনের কমে কখনো খুসি হয় না। সেই চিরন্তন পাথরটির উপর দাঁড়িয়ে কথা বলার লোক আর কেউ ছিল না।

তাই বিয়ের কথা পেড়ে একেবারে সম্পূর্ণ সরল ভাবে ছেলেমানুষের মতন প্রশ্ন ক'রে বসল, "আপনার স্ত্রী কি মাত্র একটি না বেশি ?"

আজিজ তো শুনে হতভম্ব। ওদের সমাজের এক নূতন আদর্শ সম্বন্ধে যেন সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে—পুরোনো আদর্শ অপেক্ষা নতুন আদর্শের অভিমান আরো বেশি। যদি এডেলা জিজ্ঞাসা করত, "আপনার মতে ভগবান এক না বহু ?" ওর কোনো আপত্তি হোতো না। কিন্তু ভারতবর্ষের শিক্ষিত এক মুসলমানকে প্রশ্ন করা তাঁর স্ত্রী ক'টি—কি ভয়ঙ্কর! কি জঘন্য! বেচারি মুস্কিলে পড়ল, কি ক'রে ওর মনের ক্ষোভ গোপন করে। "একটি—অর্থাৎ, এই আমার বেলায় মাত্র একটি"—এই ব'লে ও এডেলার হাত ছেড়ে দিল। রাস্তার মাথার উপর অনেকগুলি গুহা ছিল। "চুলোয় থাক ইংরেজেরা—সব চাইতে যখন ভালো তখনও"—এই ভেবে প্রকৃতিস্থ হবার উদ্দেশ্যে আজিজ ঐগুলোর মধ্যে একটি গুহায় উধাও হোলো। এডেলা ধীরে সুস্থে পিছন পিছন যাচ্ছিল। বেসামাল কিছু বলেছে এ কথা তার মাথায় আদবেই ঢোকেনি। আজিজকে দেখতে না পেয়ে সেও একটা গুহার ভিতর ঢুকে পড়ল। মনের একটা ভাগ ওর ভাবছিল—"এই সব দেখে বেড়ানোতে আমার বিরক্তি ধরে।" আর একটি ভাগ আচ্ছন্ন ছিল বিয়ের রহস্যে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

দেশ-বিদেশ

চব্বিশ বছর আগে ইয়োরোপে যে মহাযুদ্ধ বেধে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে গেছ্‌ল, তার জের এখনও মেটেনি বটে, কিন্তু আবার যুদ্ধ কবে লাগবে সে সম্বন্ধে জল্পনাকল্পনা বেশ চলেছে। আজ দু'বছর ধরে ফ্র্যাঙ্কোর ফ্যাশিষ্ট দল গণতন্ত্রকে পিষে মারার যথাসম্ভব চেষ্টা করছে। হিটলার আর মুসোলিনির হুকুমই যে ফ্র্যাঙ্কো তামিল করছে, এ কথা যিনি এখনও বিশ্বাস করেন না, তাঁকে অবশ্য কিছু বলার নেই। চীনে জাপান যে নৃশংস অত্যাচার এক বছর ধরে চালাচ্ছে, সে অত্যাচারকে রোম আর বার্লিন এখন খোলাখুলি সাহায্য করছে, চীনের সমরবিভাগ থেকে জার্ম্মান পরামর্শদাতাদের হিটলার সরিয়ে নিয়েছে। এর ফলে সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে কয়েকজন চীনের সমরবিভাগে যোগ দিয়েছে। আর ইংরেজ সরকার সন্ত্রস্ত হয়ে জানিয়েছে যে তারা চীনকে টাকা ধার দেবার ব্যবস্থা করতে রাজী নয়। জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের দেমাক্‌কে সোভিয়েট সহ্য করার পাত্র নয় বলে মাঞ্চুকুয়োর সীমান্তে সোভিয়েট আর জাপানী সৈন্যের ছোটখাট সংঘর্ষ মাঝে মাঝে বাধছে। চেকোশ্লোভাকিয়াতে হিটলারের অনুচরদল কবে যে বিষম সঙ্কট উপস্থিত করবে বলা শক্ত। যুদ্ধকে কতদিন আটকে রাখা যাবে, এই এখন সমস্যা।

অনেকে আজকাল বলছেন যে আমরা চোখের সামনে ইংরেজ সাম্রাজ্যের পতন দেখতে পাচ্ছি। শুধু ইংরেজ প্রজা বলে এক অজ্ঞাতকুলশীল পর্ত্তুগীজ ইহুদীর গ্রীসে গ্রেপ্তার নিয়ে পামারষ্টোন এককালে সমস্ত ইয়োরোপ তোলপাড় করেছিলেন। আর আজ ইংরেজ জাহাজের উপর ফ্র্যাঙ্কোর বোমা পড়ছে, ইংরেজ নাবিকের প্রাণ যাচ্ছে, জাপানীদের হাতে ইংরেজ অম্লান বদনে অপমান হজম করছে। দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ইংরেজের এই অবস্থা দেখে আমাদের স্ফূর্ত্তি হওয়া স্বাভাবিক; আর যাঁরা চন্দ্র সূর্য্য তারার মত ইংরেজ সাম্রাজ্যকে অজর অমর মনে করেন, তাঁরাও হয়তো বিচলিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনকে বোঝার দিকে একটু এগিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু যদি আমরা ভাবি যে এখন ইংরেজ সাম্রাজ্যতন্ত্র দুর্ব্বল, নিস্তেজ হয়ে পড়ছে, যদি মনে করি যে এ অবস্থায়

এক রকম বিনা সংগ্রামেই আমরা স্বাধীন হতে পারব, তা হলে সেটা বিষম ভুল হবে। ধার্ম্মিক-চূড়ামণি হ্যালিফ্যাক্স্‌কে সামনে রেখে চেম্বারলেন যে দারুণ ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে, ইংরেজ যে কোন উপায়ে যুদ্ধ এড়িয়ে যাবার জন্য ব্যস্ত এই বলে শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের চোখে ধুলো দিচ্ছে, সে সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ সতর্ক হওয়া দরকার। সমস্ত পৃথিবীতে গণতন্ত্র আর প্রগতিকে রোধ করার যে চক্রান্ত চলেছে, সে চক্রান্তে ইংরেজ সরকার হচ্ছে অগ্রণী। ইংরেজ সাম্রাজ্যের মৃত্যু সন্নিকট ভেবে নিজেদের আশ্বস্ত করার বদলে আমাদের জানা উচিত যে তার আয়ুর্ব্বৃদ্ধির জন্যই বিশেষ উদ্যোগ চলেছে।

প্রায় তিনমাস আগে চেম্বারলেনের প্রতিনিধি রোমে মুসোলিনির সঙ্গে চুক্তি সই করে এসেছে। জার্ম্মান সরকারকে এ খবর তখনই দেওয়া হয়েছিল, তিন শক্তির মধ্যে মতের কোন গরমিল ছিল না। ঐ সময়েই ফ্র্যাঙ্কোর দল সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত এগিয়ে বার্সিলোনা থেকে ভ্যালেন্সিয়ায় যাবার পথ বন্ধ করে দেয়। শুধু জাহাজে ও এরোপ্লেনে গণতান্ত্রিক স্পেনের দুই প্রধান বন্দরের মধ্যে যাতায়াত চলে। তারপর ইংরেজের উদ্যোগে স্পেন থেকে বিদেশী যোদ্ধা সরিয়ে নেওয়া সম্বন্ধে একটা খসড়া খাড়া করা হয়। খসড়াতে অনেক কিছু মারাত্মক ব্যবস্থা থাকলেও স্পেনের গণতন্ত্র সেটাকে কিছু বদলে সাময়িকভাবে গ্রহণ করতে রাজী হয়, ফ্র্যাঙ্কো এখনও কোন উত্তর দেয় নি। চেম্বারলেন কিন্তু অটল হয়ে রয়েছেন, পার্লামেণ্টে বলেছেন যে স্পেন সম্বন্ধে প্রকারান্তরে ফ্যাশিষ্টদের সাহায্য করার যে ব্যবস্থা ইংরেজ সরকার চালিয়েছে, তাই চলবে। অর্থাৎ স্পেন-ফ্রান্সের সীমান্ত বন্ধ করে গণতন্ত্রকে বিব্রত করা হবে। বিদেশ থেকে কোন সরবরাহ তারা পাবে না, অথচ পর্ত্তুগাল দিয়ে আর নানা বন্দর দিয়ে ফ্র্যাঙ্কোর পক্ষে যোদ্ধা ও যুদ্ধোপকরণ সহজেই সরবরাহ হতে থাকবে। ফ্র্যাঙ্কো গণতান্ত্রিক স্পেনকে সমুদ্র থেকে একরকম অবরোধ করেছে, শুধু সম্প্রতি দয়াপরবশ হয়ে বার্সিলোনায় একটা প্রস্তাব পাঠান হোয়েছে যে সরকার পক্ষের বন্দরগুলোর মধ্যে একমাত্র আলমিরাতে বিদেশী জাহাজকে ঢুকতে দেওয়া যেতে পারে। আলমিরা থেকে গণতান্ত্রিক স্পেনে যাবার রাস্তা এখন নেই, সুতরাং এ প্রস্তাবকে সরকার অগ্রাহ্য করেছে। একথা শুনে চেম্বারলেন সাহেব বলেছেন যে বার্সিলোনার এরকম "একগুয়েঁমি" অত্যন্ত অন্যায়, আর তাই তিনি যে সব

জাহাজ স্পেনে ব্যবসা করতে যাবে তাদের রক্ষা করবার ভার নেবেন না। এর ফলে কয়েকটা ইংরেজ জাহাজে ফ্র্যাঙ্কোর বোমা পড়েছে, কয়েকজন ইংরেজ নাবিকের প্রাণ গেছে, কিন্তু পার্লামেণ্টে চেম্বারলেন বলেছেন ইংরেজ জাহাজের মালিকেরা তাঁর কাছে কোন অভিযোগ করেনি, আর তাই ইংরেজ নাবিকের মৃত্যু আর ইংরেজ সম্পত্তির হানি দুঃখের বিষয় হলেও তিনি এ বিষয়ে ফ্র্যাঙ্কোর কাছে মৌখিক প্রতিবাদ ছাড়া আর কিছু করতে রাজী নন। এ অবস্থায় আমরা যদি ভাবি যে ইংরেজ জাহাজের বিপদ হচ্ছে ইংরেজ সাম্রাজ্যতন্ত্রেরই বিপদ তা হলে ব্যাপারটা ভুল বোঝা হবে। অধিকাংশ ইংরেজ মালিক চান যে স্পেনে গণতন্ত্র নষ্ট হয়, মালিকদের প্রভুত্ব কায়েম হয়। ফ্র্যাঙ্কোর রাস্তায় বিঘ্ন ঘটাতে তারা চায় না বলেই ইংরেজ সরকার বেমালুম অপমান হজম করে চলেছে।

স্পেনের গণতন্ত্রকে দমন করতে পারলে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী, জার্ম্মানীর মধ্যে চুক্তি অতি সহজ হয়ে পড়বে। সম্প্রতি রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জের প্যারিস ভ্রমণের পেছুনেও এই উদ্দেশ্য ছিল। গত কয়েক বছর ধরে বৈদেশিক ব্যাপারে ফ্রান্স শুধু ইংলণ্ডকে অনুসরণ করে এসেছে; স্পেনে ফ্যাশিজ্‌ম কায়েম হলে ফ্রান্স আত্মরক্ষার উদ্দেশেই ইংরেজের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে। সঙ্গে সঙ্গে চেকোশ্লোভাকিয়া ব্যাপারে হিটলারকে সন্তুষ্ট করা চলবে; সেই ব্যবস্থা করার জন্যই ইংরেজ সরকারের পক্ষ থেকে লর্ড রান্সিমানকে প্রাগে পাঠানো হয়েছে। অবশ্য বলা হয়েছে যে চেকোশ্লোভাকিয়ার নিমন্ত্রণেই রান্সিমান গেছেন, কিন্তু এ সব বিষয়ে সরকারী ইস্তাহার বিশ্বাস করা ভুল। সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ফ্রান্সের সাহায্য আশা করে, আর নিজেদের অস্ত্রবলের উপর নির্ভর করেই চেকোশ্লোভাকিয়া হিটলারী দম্ভের উত্তর দিতে পেরেছে; অষ্ট্রিয়ার মত বিনাযুদ্ধে হিটলারের কবলিত হয়নি। কিন্তু ফ্রান্সকে সরিয়ে, সোভিয়েট ইউনিয়নকে বিপন্ন করে, মধ্য ইউরোপে হিটলারী প্রাধান্য স্থাপিত করে, হিটলারকে তুষ্ট রাখার মতলব ইংরেজ করেছে।

চেকোশ্লোভাকিয়াকে কোণঠেসা করে ইতালী জর্ম্মানী হাঙ্গেরী আর রুমেনিয়া একত্র হবার জন্য রোমে সম্প্রতি আলোচনা হয়ে গেছে। এখনও ইংরেজ-ইতালীর চুক্তি একেবারে বাহাল হয়নি বলে ইংরেজকে তারা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে না।

সাম্রাজ্যতন্ত্রের পরস্পর বিশ্বাস বলে কোন বস্তুই নেই। এইজন্য সম্প্রতি ইংরেজ সরকার ঠিক করেছে যে যুদ্ধের এরোপ্লেন ইত্যাদি বাবদে বরাদ্দ খরচের উপর প্রায় আড়াই কোটি পাউণ্ড খরচ করতে হবে। আকস্মিক কোন বিপদ যাতে দেশকে অভিভূত না করতে পারে সেজন্য খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহের বিশেষ ব্যবস্থা তারা করেছে। সাম্রাজ্যতন্ত্রমাত্রই পরস্পরকে সন্দেহ করে থাকে। কিন্তু তাদের পরস্পর বিরোধ সত্ত্বেও তারা আজ একরকম একযোগেই কাজ করছে; গণতন্ত্রের প্রগতিকে তারা ভয় করে, গণশক্তি তাদের শত্রু, সোভিয়েট ইউনিয়নকে নির্ব্বান্ধব করে বিধ্বস্ত করাই এখন তাদের উদ্দেশ্য।

সুদূর প্রাচ্যে একাধিক সাম্রাজ্যতন্ত্রের স্বার্থ আজ বিপন্ন হয়ে পড়েছে। সুতরাং তাদের পক্ষে চীনকে সাহায্য করা স্বাভাবিক মনে করা অন্যায় হবে না। জাপানের অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ শ্রীমতী ফ্রীডা আট্‌লে একাধিক পুস্তকে ও বহু প্রবন্ধে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে ইংরেজ সরকারের পক্ষে স্বার্থরক্ষার জন্যই জাপানকে প্রতিরোধ করা প্রয়োজন। কিন্তু ইংরেজ সরকার জানে, ও বিশেষ করে বল্‌ডুইন-চেম্বারলেনের দল স্পষ্টই জানে, যে একথা ভুল না হলেও চীনকে সাহায্য করা তাদের পক্ষে দূরদর্শিতার একান্ত অভাবেরই প্রমাণ হবে। চীনে আজ গণশক্তি জাগ্রত হয়ে উঠেছে, চীনা লাল ফৌজ জেহল্‌, মাঞ্চুকুয়োতে পর্য্যন্ত জাপানকে বিব্রত করে তুলছে, জাপান বুঝছে যে চীনকে সহজে কাবু করবার ক্ষমতা তার নেই। এমন অবস্থায় জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের প্রতি দারুণ বিদ্বেষ সত্ত্বেও কোন সাম্রাজ্যতন্ত্রই চীনের সাফল্য চাইতে পারে না। চীনের সংগ্রাম তাই দুনিয়ার সকল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীর সংগ্রাম। আমরাও একথা বুঝছি, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত "চীন দিবসের" সাফল্য তার প্রমাণ।

ইংরেজ সরকার পশ্চিম ইয়োরোপের চার প্রধান শক্তি ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, ইতালী—নিয়ে একটা চুক্তি স্থাপনের জন্য চেষ্টা করছে। এর ফলে দক্ষিণ ও মধ্য ইয়োরোপ থেকে নাৎসি জার্ম্মানীর লোলুপ দৃষ্টি পূর্ব্বে, সোভিয়েট য়ুক্রেনের দিকে যাবে। জাপান ও জার্ম্মানীর যুগপৎ আক্রমণে সোভিয়েটের অবস্থা সঙ্গীন হবে। মস্কোর বিচারে সোভিয়েট শাসনকে পঙ্গু করার এই অপচেষ্টার বহু প্রমাণ পাওয়া গেছে। সোভিয়েটকে একেবারে নিষ্পিষ্ট করাই হচ্ছে Four Power Pact-এর মতলব।

চেম্বারলেন প্রায়ই বলে থাকেন যে শান্তির জন্য হিটলার-মুসোলিনির সঙ্গে সখ্যস্থাপন প্রয়োজন; ক্যান্টন বা ম্যাড্রিডের কথা তাঁর মনে অবশ্য স্থান পায় না। বহু শান্তিকামী মনে করে যে হিটলারকে কয়েকটা উপনিবেশ ফেরৎ দিলে যুদ্ধকে রোধ করা যাবে; কিন্তু তাঁদের জানা উচিত যে, যে সব উপনিবেশ সাম্রাজ্যতন্ত্রের পক্ষে সত্যই মূল্যবান, সেগুলো কেউই জার্ম্মানীকে বিনাযুদ্ধে দেবে না; তাছাড়া তাঁরা স্বচ্ছন্দে ভুলে যান, যে উপনিবেশের যারা অধিবাসী তারা স্বাধীনতা চায়, এক মালিকের খোঁয়াড় থেকে আর এক মালিকের খোঁয়াড়ে যাওয়া সম্বন্ধে তাদের কোনই উৎসাহ নেই, তাদের প্রতি গরু ভেড়ার মত ব্যবহার তারা বরদাস্ত করবে না। কেউ কেউ বলেন যে ভ্যান্ জীলাণ্ড্ যে রিপোর্ট তৈরী করেছেন, সে অনুসারে কাজ হলে যুদ্ধ আট্কানো যাবে; কিন্তু সে রিপোর্ট কাজে লাগালে, যারা হুমকি দিয়ে পৃথিবীর শান্তি ভঙ্গ করছে তাদেরই সাহায্য করা হবে, শান্তির পথ পরিষ্কার হবে না।

* * *

আমাদের দেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যতন্ত্র ফেডারেশন চাপাবার যে মতলব করেছে, তার সঙ্গে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির স্পষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। ইংরেজ সরকার চায় পশ্চিম ইয়োরোপে শান্তি, আর চায় নিজের সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখা। যুদ্ধোদ্যোগের জন্য তারা যে বিরাট ব্যয় করেছে, তার একটা কারণ এই যে প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্য-তন্ত্রের মধ্যে মৌখিক মৈত্রী হলেও আন্তরিক আনুকূল্য অসম্ভব, হঠাৎ লড়াই বাধলে স্বার্থরক্ষার জন্য তৈরী থাকা দরকার। তা ছাড়া ১৯১৯-২২ সালে যেমন পৃথিবীর প্রায় সকল ধনিক দেশের সৈন্য গিয়ে সোভিয়েট শাসনকে ভূমিসাৎ করার চেষ্টায় লেগেছিল, তেমনি আবার সোভিয়েট ইউনিয়নকে একত্র হয়ে আক্রমণ করার প্রয়োজন হতে পারে। এ অবস্থায় ভারতবর্ষকে শান্ত ও তুষ্ট রাখা ইংরেজ সাম্রাজ্যতন্ত্রের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। এদেশ থেকে যাতে আগামী যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষে সিপাহী সরবরাহে কোন গোলযোগ না হয়, সেজন্য এখনই পাঞ্জাবে সার সিকন্দর হায়াৎ খাঁ প্রমুখ অনেকে উঠে পড়ে লেগেছেন। এমন কি বড় লোকদের সাহায্য হারাবার আশঙ্কা সত্ত্বেও পঞ্জাব আইনসভায় ঋণ সম্বন্ধে একটা বিল এনেছেন, আর প্রস্তাবিত আইনের অর্থ বোঝাবার

অজুহাতে সাধারণের কাছে লড়াইয়ের কথা বলছেন। অন্য দিকে স্যামুয়েল, লোথিয়ান, প্রভৃতি কোনক্রমে কংগ্রেসকে বুঝিয়ে ফেডারেশন গ্রহণ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আমাদের নেতারাও অনেকে যেন তাদের টোপ গেলার উপক্রম করছেন।

মাদ্রাজের সত্যমূর্ত্তি মহাশয় তো খোলাখুলি বলেছেন যে ফেডারেশন ব্যবস্থার কয়েকটা অদলবদল হলেই আমাদের সেটা সানন্দে স্বীকার করে নেওয়া উচিত। কংগ্রেস সভাপতির ফেডারেশন বিরোধী মনোভাবের পরিচয় আমরা তাঁর স্পষ্ট দৃপ্ত বিবৃতিতে পেয়েছি বটে; কিন্তু তাঁর প্রধান সহকর্ম্মীদের ভাবগতিক দেখে হাওয়া কোন্ দিকে বইছে, বেশ বোঝা যায়। ভুলাভাই দেশাই লণ্ডনে কি বলে এসেছেন জানা শক্ত, কিন্তু তিনি কংগ্রেস সভাপতিকে জানিয়েছেন যে ১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইনে ফেডারেশনের যে ব্যবস্থা আছে তার বিরোধিতা তিনি লণ্ডনে করেছেন। অর্থাৎ ব্যবস্থার ভুলচুকগুলো সরালে পুনর্ব্বিবেচনা চলবে। ওয়ার্কিং কমিটির আর একজন সভ্য শঙ্কর রাও দেও সগর্ব্বে বলেছেন যে শীঘ্রই কংগ্রেস দিল্লীতে গদিয়ান হয়ে বসবে, অর্থাৎ ফেডারেশনে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করবে। গান্ধীজী সম্প্রতি লিখেছেন যে বিনা যুদ্ধেই আমরা সাম্রাজ্যবাদকে পরাজিত করতে পারব, অর্থাৎ সাম্রাজ্য-বাদীদের সঙ্গে একটা রফা হওয়া একেবারেই অসম্ভব নয়। এই রফার খোঁজেই এখন সাম্রাজ্যবাদ ব্যস্ত, আমাদের জাতীয় আন্দোলনের বিষদাঁত ভাঙাই তার উদ্দেশ্য। এ অবস্থায় কূট সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে বোকা বনে যাওয়ায় বিপদ থেকে আমরা সাবধান হওয়ার তেমন চেষ্টা করছি মনে হয় না।

সম্প্রতি ওয়ার্কিং কমিটির যে সভা হয়ে গেল, তাতে ফেডারেশন সম্বন্ধে কংগ্রেসের মনোভাব আবার জোর করে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হল না। বলা হল যে এমন কোন নতুন ব্যাপার ঘটেনি যার দরুণ সে ঘোষণা প্রয়োজন! সুভাষচন্দ্র ফেডারেশন সম্বন্ধে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, তাকে সমর্থন করা কমিটি দরকার মনে করেন নি। মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রীদের মধ্যে অতি অশোভন বিবাদ নিয়েই কমিটি মাথা ঘামালেন, ঘামানোর ফল যে শুভ হয়েছে তাও মনে হচ্ছে না।

ফেডারেশনকে গ্রহণযোগ্য করে নেবার জন্য কংগ্রেস সামন্ত নৃপতিদের সঙ্গে

বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য ব্যস্ত হয়েছে। হরিপুরা কংগ্রেসে এ বিষয়ে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। মহীশূরে যখন একটা ছোটখাট জালিয়ানওয়ালাবাগ ঘট্‌ল, তখন সেখানকার ক্ষুব্ধ গণশক্তির আন্দোলনকে কংগ্রেস ধামাচাপা দিয়ে দিল, এখন আবার কংগ্রেসের তরফ থেকে হুকুম হয়েছে যে জনসভামাত্রেই কংগ্রেস পতাকা তুলতে হলে আগে মহীশূর পতাকা তোলা চাই। ত্রিবাঙ্কুরে শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে জনসাধারণের অসন্তোষকে কংগ্রেস সাহায্য করতে রাজী হয় নি। কাশ্মীর, হায়দরাবাদ, বরোদা, ঢোলপুর ও অন্যান্য বহু দেশীয় রাজ্য থেকে নানা অভিযোগের খবর আসছে ; কিন্তু তাদের সম্বন্ধে কংগ্রেস উদাসীন। মনসা রাজ্যে যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন হয়েছিল, তাকে বল্লভভাই পাটেল একরকম বাধ্য হয়েই সমর্থন করেছিলেন ; সেখানকার অশিক্ষিত কিষাণ স্ত্রী পুরুষ যে শক্তির পরিচয় দিয়েছে, তার তুলনা কমই মেলে। কিন্তু গান্ধীজী থেকে শঙ্কর রাও দেও পর্য্যন্ত সবাই বলেছেন যে সামন্ত নৃপতিদের সঙ্গে বিরোধ না বাধিয়ে তাদের সমর্থন পাবার চেষ্টা করা উচিত। মুসলিম লীগের সঙ্গে কথাবার্ত্তার মত এও হচ্ছে ফেডারেশনে কংগ্রেসীদলের সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধির একটা প্রধান উপায়।

সামাজ্যতন্ত্রের সঙ্গে সংঘর্ষের বদলে একটা মিটমাট স্থাপনের দিকে যে ঝোঁক আজকাল দেখা যাচ্ছে, তার বিরোধিতা বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কিন্তু এ বিরোধিতায় জনসাধারণের শক্তিবৃদ্ধিই হবে প্রধান অস্ত্র। কাণপুরে যে বিরাট ধর্ম্মঘট হয়ে গেল, তাতে কংগ্রেসের পক্ষে উদাসীন থাকা সম্ভব ছিল না। কিন্তু কেবল কংগ্রেস নেতাদের মর্জির দিকে চেয়ে থাকলে গণশক্তিকে সঙ্ঘবদ্ধ করা যাবে না। আর শুধু রাজনৈতিক দাবীর উপর জোর দিলে জনসাধারণের কাছ থেকে তেমন সাড়া মিলবে না। গত বৎসর যখন রাজবন্দী সমস্যা নিয়ে বাংলায় কিছুকাল আন্দোলন চলেছিল, তখন হক্‌ মন্ত্রিসভাকে টলানো যায় নি। কিন্তু সম্প্রতি চাষীদের অভিযোগ নিয়ে দেশ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে, ২৯শে জুলাই তারিখে নিখিল বঙ্গ চাষী দিবস উপলক্ষে কলকাতায় বিরাট শোভাযাত্রা ও সভা হয়ে গেছে, চাষীমজুরের মৈত্রী ঘোষণা হয়েছে, হক্‌ মন্ত্রিসভা টলমল হয়েছে। জনসাধারণের অর্থনৈতিক দাবী সম্বন্ধে কংগ্রেস কোনমতেই নিরাসক্ত থাকতে পারে না ; কর্ণাটক নেতা গঙ্গাধর রাও দেশপাণ্ডের মত যাঁরা চাষীদের জন্য

আইন প্রণয়নের প্রয়োজন দেখেন না, তাঁরা কংগ্রেসকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করছেন। শুধু সুখের বিষয় এই যে একবার গণ আন্দোলন আরম্ভ হলে কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতাদের অন্তত নেতৃত্ব বজায় রাখার জন্য আন্দোলন সমর্থন করতে হয়। কিন্তু গণ আন্দোলন যদি শিথিল হয়ে আসে তো তারা ভোল বদলাতে দেরী করবে না। এ বিষয়ে সকল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধীর অবহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

গণতন্ত্র ও শান্তির বিরুদ্ধে পৃথিবীব্যাপী যে অভিযান চলেছে, আমাদের উপর ফেডারেশন চাপানোর চেষ্টা সেই অভিযানেরই একটা প্রধান অঙ্গ। একথা আমরা যেন কিছুতেই না ভুলি, স্যাম্রাজ্যতন্ত্রের ফাঁদে যেন পা না ফেলে বসি।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কবিতাগুচ্ছ

বিদায়ের গান

স্মরণ-ঊষর পার হ'য়ে আজ চলেছি ভাসিয়া মরণ-সিন্ধু পানে,
প্রিয় যাহা ছিল এসেছি ফেলিয়া, চলেছি উদাসী অজানার সন্ধানে।
আমার অশ্রুজলের মিনতি হৃদয়ে কাহারো করুণার আবেদন
যদি সঁপে থাকে, তাহারই স্মরণে দিয়ে গেনু মোর প্রাণের আকিঞ্চন।
সজল সাঁঝের আকুতি আজিকে ছাইছে চিত্ত তারই বেদনার গানে।
হে প্রিয়,
        তোমার বিরহ আমারে ঘেরিয়া ঘেরিয়া জড়ায় মায়ার ডোর;
চোখের আলোক কুয়াসায় ছায়, ক্ষণে ক্ষণে ঝরে অবোধ আঁখির লোর।
তবু যেতে হবে ব্যর্থ জীবনে ঝরানো পাতার অবমান বহি শিরে,
বিস্মৃতি যেথা ঘুচায় লজ্জা পেতে রেখে দেয় মরণের কোলটিরে;
সে মহামৃত্যুপাথারের ডাকে উদাসী পরাণ আজি আঁধারের টানে।

শ্রীজীবনময় রায়

ঘূর্ণি হাওয়া

কাদামাখা মোষের মত
        আকাশের রং
হাওয়ায় গৃহহারার হাহাকার।
        ঘূর্ণি হাওয়া
          ক্রূর মত।
        টেনে তুলছে—
        খড় কুটো
        ছেঁড়া কাগজের টুকরো
        খাবারের ঠোঙা
        আরো কত আবর্জ্জনা।

সামনে, দূর আকাশের গায়
        ঘুড়ি,—
ও যেন কিসের ইঙ্গিত।
আজকের ঐ মলিন আকাশ,
        মাতাল বাতাস,
বিপর্য্যস্ত পৃথিবীর বিহ্বল রূপ,
মনের বিষাদের মত
মেঘের ছায়া-মলিন মাঠের জল,
ঘুড়ির দোলন,
কী যেন বলে!

ভুলে-যাওয়া কবেকার কোন্ গন্ধ
স্মৃতির দিগন্তে এসে ফিরে যায়।
নীল সমুদ্রের বুকে দোলে
মেঘবন্দী সূর্য্য-রশ্মির
ক্ষণিক আভা।
পরক্ষণেই নামে বিস্মৃতির পাণ্ডুরতা।
স্মৃতির আকাশ কাঁপে আর কাঁপে,
তাতে জন্মপূর্ব্বের নিঃশ্বাস পড়ে।
গর্ভলীন শিশুকে ঘিরে।
প্রেতাত্মালোক পরিক্রম করে।

ভাঁটার টানে জোয়ারের জল
        নদীর বুকে নামে।
অব-চেতন অন্তলোকে
নিখিল-ব্যাপ্ত মনের নিঃশব্দ যাত্রা।

দেখা দিলো
অচঞ্চল সাগরের
ধ্যানলীন মহামৌনতা।
গর্ভে তার
নৈঃশব্দ্যের মৌচাক ?
তাতে সহস্র ভ্রমরের গুঞ্জন ?
না—একি শঙ্খের শূন্য কোটরের
যুগ যুগান্ত ব্যাপী
অতৃপ্ত কামনার
অস্ফুট ক্রন্দন ?

আবার দেখি
মেঘ-লগ্ন ঘুড়ির নৃত্য।
কোথায় চিড় ধ'রল,
স্মৃতি-লোকে
আলোর এক ঝলক।
শঙ্খমুখে ফুৎকার,
অস্ফুট ক্রন্দন হ'লো
সুতীব্র কামনার ডাকে উন্মুখর।—

আলোড়িত রক্ত-স্রোত
সরীসৃপের পিচ্ছল গতিতে
শিরা উপশিরায় ঘূর্ণি খেয়ে
আছড়ে পড়লো
হৃৎপিণ্ডে।—

তোমার টানে
আবার আমার সত্তা জাগুক।
ঊর্দ্ধে আমায় উধাও কর,
মহাশূন্য মন্থন করি।
পৃথিবী হোক স্বপ্নবৎ
রুদ্ধপ্রায় শ্বাস
ঝাপসা দৃষ্টি,
এলোমেলো চেতনা ;
তাতে জাগুক
দূরে বহুদূরে
ঊর্দ্ধে তুলে-ধরা
তোমার দুটি নিষ্পলক আঁখি।

পূর্ণেন্দু গুহ

আমরা চেয়েছি শান্তি

আমরা চেয়েছি শান্তি, আজ তার অবসাদে ভারি,
মুমূর্ষু রোদের মত ঝিমানো জীবন ;
আমরা পুষেছি আশা—বিহঙ্গ সে দূর নভোচারী,
মাটিতে ঝরেছে তার পালক চিকণ।

চোখের পাতায় ছিল কৃপাকার আধ-আধ ঘুম,
স্তিমিত শয়ন-দীপে স্বপন-রচনা ;
আমরা দূরের থেকে দেখিয়াছি আকাশকুসুম—
কোথায় সে ফুল আর কোথা বা কামনা !

কখন্ লেগেছে মত্ত ঘূর্ণিস্রোত ঘুমন্ত বেলায়,
কখন্ কেঁপেছে রাত নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে—
দূরের নির্বিঘ্ন কোণে তার সাড়া সুখের মেলায়
হারায়ে গিয়েছে শুধু মিথ্যা অবিশ্বাসে।

যেখানে উঠিল ঝড়, উথলিল ফেনিল প্লাবন,
যেখানে ভাঙিল ঘর আবর্তের মুখে,
সেখানে অজস্র শক্তি, মৃত্যু—সে তো জীবনের পণ,
সেখানে গতির বেগ স্পন্দিত সমুখে।

যাহারা চেয়েছে শান্তি তাহাদের অবসাদে ভারি,
সোনার শিকলে সুর ক্লান্ত বিলাপের,
আকাশকুসুম যারা দেখেছিল তাদের সবারি
অলক্ষ্যে ঝরেছে দল বিবর্ণ ফুলের।

শ্রীঅরুণকুমার মিত্র

বাংলা বানানের নিয়ম

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের যে নূতন নিয়ম সংকলিত করিয়াছেন, আমি সে নিয়মের একটি অংশের সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিচার প্রার্থনা করিয়া দুই-একটি কথার উত্থাপন করিতে চাই। আশা করি 'পরিচয়' তাহা করিতে দিয়া লেখককে অনুগৃহীত করিবেন।

বিশ্ববিদ্যালয় ৯ নিয়মের এক স্থানে বলিয়াছেন, "'কোন, এখন, কখন, তখন' প্রভৃতি শব্দের বিভিন্ন প্রয়োগে এইরূপ বানান বিধেয়—'কোন্ লোক? কোন কোন লোক বর্ণান্ধ। কোনও লোক আসে নাই। কখন্ হইবে জানি না। কখন মেঘ কখন রৌদ্র। এমন কখনও হয় না।'"

প্রথমে বলিতে চাই—'প্রভৃতি' শব্দটির ব্যবহার করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কিছু সংশয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। উক্ত উদাহরণে বিশ্ববিদ্যালয় 'এমন' শব্দটির যে ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় শব্দটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতে 'কোন, এখন, কখন, তখন' প্রভৃতি শব্দের পর্য্যায়ে পড়ে না। নতুবা তাঁহারা 'এমন' না লিখিয়া 'এমন্' লিখিতেন। অথচ 'এখন, তখন'এর মত 'এমন' শব্দটিরও ব্যবহারভেদ আছে। কাজেই, বিশ্ববিদ্যালয়ের মতে কোন্ কোন্ শব্দ 'কোন, কখন' প্রভৃতি শব্দের পর্য্যায়ে পড়ে, উক্ত নিয়মাবলীতে তাহা জানিবার উপায় নাই। 'আর, কাহার' শব্দ দুইটিরও উক্তরূপ ব্যবহারভেদ আছে। যথা, 'আর্ দিও না। আর দাও। কাহার্ বই? কাহারও কথা শুনিও না। কাহার কাহার মতে'। এই দুইটি শব্দকে এবং ইহাদের সাদৃশ্যে 'আমার, তোমার, তাহার' প্রভৃতি শব্দ-গুলিকেও কি বিশ্ববিদ্যালয়দত্ত নিয়মে 'কোন, কখন' প্রভৃতি শব্দের পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া মানিতে হইবে?

দ্বিতীয়ে বলিতে চাই—'এমন' শব্দটি যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মে "কোন, কখন' প্রভৃতির পর্য্যায়ে না পড়ে তবে 'এখন, তখন'ই বা কেন পড়িবে? 'এমন, এখন, যখন, তখন' প্রভৃতি শব্দগুলির উচ্চারণ বাংলা উচ্চারণের স্বাভাবিক নিয়মেই হসন্ত। 'কোন' ও 'কখন' এই শব্দ দুইটিরও উচ্চারণ বাংলা উচ্চারণের

ওই নিয়মেই 'কোন্' ও 'কথন্'। পুঁথিপত্রের যুগে সংস্কৃত পণ্ডিতদের কবলে পড়িয়াই সংস্কৃত উচ্চারণের নিয়মে শব্দ দুইটির অজন্ত উচ্চারণ বাংলা ভাষায় স্বীকৃত হইয়া গিয়াছে এবং বহু ব্যবহারে বেশ প্রতিষ্ঠাও লাভ করিয়াছে (পক্ষান্তরে 'এখন, তখন' প্রভৃতি শব্দগুলির অজন্ত উচ্চারণ বাংলা লেখাপড়ায় আদৌ প্রচলন লাভ করে নাই)। আসলে অজন্ত 'কোন' এবং ও-যুক্ত হসন্ত 'কোন (=কোনও—অর্থাৎ কোনো)' অভিন্ন শব্দ। যাহাই হউক, উক্ত প্রতিষ্ঠার অধিকারকে স্বীকার করিয়া সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হিসাবে 'কোন, কথন' শব্দ দুইটির বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাবিত বানানই রাখা বাঞ্ছনীয় (আমি নিজে কিন্তু 'কোন, কথন' লিখিয়া 'কোন্, কথন্' এবং 'কোনও, কথনও' লিখিয়া 'কোনো, কখনো' পড়িতে পাইলেই সুখী হই)। বরং 'এখন, তখন' প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে 'কোন, কথন' শব্দ দুইটির বানানগত ব্যতিক্রমকে বিশিষ্ট করিবার জন্য এই ভাবে নিয়ম লিখিলেও কিছু দোষের হয় না যে—যেহেতু অজন্ত 'কোন, কথন' এবং 'কোনও, কথনও'র মধ্যে অর্থের ভেদ কিছুই নাই, অর্থাৎ 'কথন এবং কোন মতেই দিব না' এবং 'কথনও এবং কোনও মতেই দিব না' বাক্য দুইটি একই অর্থ জ্ঞাপন করে, অতএব জোর দিবার জন্য শব্দ দুইটির উত্তর 'ও'-বর্ণের সংযোগ বাহুল্য, 'ই'-বর্ণের সংযোগ বিধেয়। যথা, 'কোন্ দিন? কোন কোন লোক বর্ণান্ধ। কোনই (কোন্+অ, অর্থাৎ ও+ই) লোক আসে নাই। কথন্ হইবে? কথন মেঘ কথন রৌদ্র। এমন কথনই (কথন্+অ, অর্থাৎ ও+ই) হয় না।'

অপর পক্ষে দেখিতে পাই 'কোন, কথন'র সাদৃশ্যে যদি 'এখন, তখন' প্রভৃতি শব্দেরও অজন্ত উচ্চারণ মানিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে উপরের নিয়মে 'ও' বর্ণের ব্যবহারের বিলোপসাধন ইহাদের বেলায় খাটিবে না; ই এবং ও বর্ণের যোগহেতু ইহাদের অর্থের ভেদ ঘটে। যথা, 'কোনও, কোনই' সমার্থক, অথচ 'এখনও (yet) এখনই (this very now)' ভিন্নার্থক। তেমনি 'কথন, কথনই' সমার্থক, অথচ 'তখনও (even then; up till then), তখনই (instantly then)' সমার্থক নহে। 'কোন' ও 'কথন' শব্দ দুইটির সহিত 'এখন, তখন' প্রভৃতি শব্দের শ্রেণীভেদ বিহিত করিবার পক্ষে ইহা এক বিশেষ হেতু বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

এই সকল কারণে প্রস্তাব করিতে চাই যে, 'কোন, কথন' শব্দ দুইটি ছাড়া (ব্যতিক্রম বা ভিন্ন শ্রেণীর হিসাবে) পূর্ব্বোক্ত 'এমন' শব্দটির সাদৃশ্যে অপর শব্দগুলি হইতেও বানানের উদ্ধৃত নিয়ম বিশ্ববিদ্যালয় অবহার করুন। করিলে নিয়মটির সারল্য সাধিত হয়। আমরা 'জলও পড়ে, রোদও হয়' লিখি, পড়িবার সময় 'জল' ও 'রোদ'-এর হসন্ত উচ্চারণ অব্যাহত রাখি, বলি 'জলো পড়ে, রোদো হয়'। সেইরূপ 'এখন, তখন' প্রভৃতির বেলায় আমরা সেই নিয়মই মানিব। লিখিব 'এখন, তখন', পড়িব 'এখন্, তখন্'; লিখিব 'এখনও, তখনও', পড়িব 'এখনো, তখনো'। 'এখন, তখন' প্রভৃতি শব্দকে অজন্ত মানিলে আমরা 'জল, রোদ, দুধ, ভাত' প্রভৃতির বেলাও তাহা মানিব না কেন? 'জল পড়ে, রোদও হয়' ইত্যাদি না লিখিয়া সেই অর্থে 'জল্ পড়ে, রোদ (অজন্ত) হয়' লিখিব না কেন?

অনেকে মনে করেন 'কোন, কথন' শব্দ দুইটির অজন্ত উচ্চারণকে দ্বিধাহীন করিবার জন্যই এক শ্রেণীর লেখক 'কোনো, কখনো' লিখিয়া থাকেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস অন্যরূপ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি 'কোন, কথন'র অন্ত্য বর্ণদ্বয় বাংলা উচ্চারণের স্বাভাবিক নিয়মে হসন্ত। কিন্তু এই বর্ণদ্বয়ের উত্তর ও-যুক্ত হইলেই ও-বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণ বাঙ্গালীর মুখের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যে স্বরাশ্রিত হইতে চায়। অর্থাৎ 'কোনও, কথনও' দেখিলে লোকে 'কোন্-ও, কথন্-ও' না পড়িয়া 'কো-নও, কথ-নও' পড়িয়া ফেলেন। এইরূপ অবাঞ্ছিত উচ্চারণকে নিষেধ করিতে চাহিয়াই অধুনা এক শ্রেণীর লেখক 'কোনো, কথনো (সাদৃশ্যে 'এমনো, এখনো, আমারো, তোমারো')' প্রভৃতি বানানের সৃষ্টি করিতেছেন। পরিশেষে সেইজন্যই উপযুক্ত প্রস্তাবের অতিরেক হিসাবে এই প্রস্তাবটিও করিতে চাই যে, 'এখন, তখন' প্রভৃতি শব্দগুলির সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় শুধু এইটুকু বিশেষ করিয়া বলিয়া দিন—সকল শব্দের উচ্চারণ সর্বদাই হসন্ত। ইহাদের উত্তর ও বা ই যাহাই না কেন যুক্ত হউক ইহাদের উচ্চারণ সর্বদাই এইরূপ—'এখন্-ও, এখন্-ই, তখন্-ও, তখন্-ই' ইত্যাদি, 'এখ-নও, এখ-নই' প্রভৃতি নহে। আমরা 'ঝোল্-ও খাই, ডাল্-ও খাই' বুঝাইতে 'ঝোলও খাই, ডালও খাই' ইত্যাদিই লিখিয়া থাকি, 'ঝোলো খাই, ডালো খাই' বা 'ঝোল (অজন্ত) খাই, ডাল (অজন্ত) খাই' লিখি না।

শ্রীভোলানাথ ঘোষ

পুস্তক-পরিচয়

South Latitude—by F. D. Ommanney (Longmans, Green & Co.) 9/8.

ইউরোপের সান্নিধ্যে থাকার ফলে উত্তর হিমমণ্ডলটি বহু শতাব্দী হতে নানা জাতীয় পর্য্যটকদের দুঃসাহস আকৃষ্ট করে এসেছে। এই স্থানের বহু উৎকৃষ্ট বিবরণীতে জগতের সাহিত্য-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ। সেই তুলনায় দক্ষিণ মেরু-প্রদেশ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যল্প। অনেকে মনে করেন উভয় মেরুবৃত্তের নৈসর্গিক অবস্থা অভিন্ন যেহেতু তারা সমভাবে অগম্য, তুষারমণ্ডিত ও ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ। এর চেয়ে ভ্রান্ত ধারণা আর নেই। দক্ষিণ হিম-প্রদেশের প্রধান স্বাতন্ত্র্য হচ্ছে এর সহিত মনোষ্ণমণ্ডলের কোন সেতুবন্ধন নাই। সুদূর বিস্তৃত পারাবারের অন্তরালে, অতি সঙ্গোপনে অজ্ঞাতবাস করে এসে এর একটি স্বকীয় অভিজাত্য গড়ে উঠেছে।

আজকের বিমান রথের যুগে ভাবলে আশ্চর্য্য লাগে যে এণ্টার্টিকার মত বিশাল দেশ সেদিন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অনাবিষ্কৃত ছিল। শত বৎসরেরও ন্যূন সময় পূর্ব্বে মানচিত্রে এর কোন উল্লেখই ছিল না। আমুণ্ডসেন্, স্কট্, শ্যাকল্‌টন্ প্রভৃতি অসাধারণ কষ্টসহিষ্ণু ও সাহসী ব্যক্তির মেরু অভিযান আমাদেরই শৈশবকালের কথা।

সে সকল উর্দ্ধশ্বাস আক্রমণের ফলে যে অধিত্যকার প্রান্তটুকু মানব নামে অভিষিক্ত হয়েছে তার আয়তন অষ্ট্রেলিয়ার মত বিরাট দেশের সমতুল্য। সুতরাং তার প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য যে আমাদের জ্ঞাতব্য, বোধ করি, বলা বাহুল্য।

আলোচ্য গ্রন্থখানি এই অভাবটুকু পূরণ করবার প্রয়াসী হয়েছে আশ্চর্য্য সুন্দরভাবে। গ্রন্থকার অবশ্য মেরু-প্রবেশের মত অসাধ্য সাধন করেন নি। তাঁর অভিজ্ঞতা আহৃত হয়েছে আশে পাশের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ দ্বীপপুঞ্জ, পর্ব্বতমালা, তুষার নদী, উভচর জীব জন্তু, আকাশ, বাতাস, আলোক, মরীচিকা ইত্যাদি পার্শ্বচরদের কাছ থেকে। যুগ যুগান্তর হতে একই আবহের মধ্যে থেকে

এদের পরস্পরের মধ্যে এত নিবিড় সম্প্রীতি গড়ে উঠেছে যে যাবতীয় বৈচিত্র্যের মধ্যে একই সুর অনুরণিত হয়।

সাত বৎসরের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য্যে বোধ করি তারই প্রতিচ্ছায়া এসে পড়েছে গ্রন্থকারের লিখনভঙ্গীতে। ভাষার স্বকীয় উৎকর্ষ। সৌন্দর্য্যের সাক্ষাতে সরল সানন্দ বিস্ময়। পশু পক্ষীর প্রতি অনুগ্রহ-বর্জ্জিত দরদ। বিজাতীয় সহকর্ম্মীদের ওপর সহজ অনাবিল আস্থা। কৃষ্ণবর্ণ জাতির জীবনে বিদ্বেষ-শূন্য কৌতূহল। এই সকল সামান্য ব্যাপারের পিছনে অসাধারণ দৃঢ় অথচ প্রশান্ত ঔদার্য্যের ইঙ্গিত পাই।

গ্রন্থকার ছিলেন জীব-বিদ্যার অধ্যাপক। চিকিৎসা শিক্ষার নির্দ্ধারিত বিদ্যা বিতরণের একঘেয়ে চক্রচরণে ক্লান্ত হয়ে ফক্‌ল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জের আশে পাশে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসন্ধানের চাকুরি গ্রহণ করেন।

আলেখ্যটি উন্মোচিত হয়েছে তরুণ বয়সের তাঁর সেই প্রথম সমুদ্র যাত্রার কথায়। সেপ্টেম্বরের সন্ধ্যা। তিমি তৈলের কারখানা-জাহাজ উপসাগরের মাতি-চঞ্চল উর্ম্মিমালায় এসে পড়তে শ্যামায়মান পর্ব্বত-গাত্র হতে একটি আলোক মিট্ মিট্ করে উঠলো—কোন জাহাজ—কোন জাহাজ—কোন জাহাজ—কোন জাহাজ—

বয়োজ্যেষ্ঠ হুইলার ব্যতীত সকলেই নরউইজান এবং অধিকাংশ ব্যক্তি একবর্ণও ইংরাজি ভাষা বুঝতে অক্ষম। সুতরাং এক প্রকার গোড়াতেই সাঙ্কেতিক হলো প্রচলিত প্রথায় ভাবের বিনিময়। মুখভঙ্গী আর অঙ্গসঞ্চালনের সাহায্যে বন্ধুত্ব গঠন হলো। নৈশ ভোজনের বাক্যচ্ছটা ও মুহুর্মুহু হাস্য-ধ্বনির রহস্য উদ্ঘাটন না করেও সহানুভূতিসূচক স-রোল আনন্দ জ্ঞাপন ক'রতে আদপেই বাধলো না।

প্রথম যাত্রার কথা একটু বিশদ ক'রে উল্লেখ করছি কারণ পরবর্ত্তী অভিজ্ঞতায় অবগাহন করে বর্ণনাগুলি শাশ্বত হয়েছে। গ্রন্থকার তাঁর কোনও বিবরণে দিন-পঞ্জিকাজাত সুলভ অভ্রান্ততা দাবী করেন না এবং রচনাটির কোথাও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি নেই।

সুদীর্ঘ জলপথে আকাশ প্রাণবন্ত হয়ে প্রভাব বিস্তার করে সকলের ওপর। এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। সমুদ্র গাত্রে পর্য্যন্ত রং প্রতিফলিত হয়। চঞ্চল

মেঘের খেলার অন্তরালে অক্ষাংশে অক্ষাংশে বর্ণ পরিবর্ত্তন হয়। গ্রীষ্মমণ্ডলের কঠিন নীল কিম্বা ক্রুদ্ধ ঝটিকাক্ষুব্ধ অম্বর মন্দোষ্ণমণ্ডলে অকস্মাৎ সুস্নিগ্ধ অমিত বর্ণ ধারণ করে। ক্ষিতিজ গাত্রে উদ্ভাসিত হয় মেঘনির্মিত পীতাভ স্তম্ভনিচয়। সহসা কুয়াশা নামে। বাতাসের ঘা খেয়ে সরোষে ফুলে ওঠে ধূসর সাগর। মস্তকের শুভ্র ফেন-পুঞ্জ গাত্রে এলিয়ে দিয়ে ঠমকে চলে তরঙ্গমালা।

তারপর আসে চল্লিশ হতে পঞ্চাশ ডিগ্রীর ভয়াবহ উন্মাদ অক্ষাংশ। উত্তাল উলঙ্গ মত্ততা। পশ্চিমগামী ঝটিকার আকাশ-বিদারিত আর্ত্তনাদ।

সর্ব্বশেষে দক্ষিণ হতে আগত কঠিন তুষার পর্ব্বতের নিঃসঙ্গ প্রয়াণ নিষ্করুণ-ভাবে নির্ব্বাসিতের মত সহানুভূতি প্রার্থনা করে।

প্রভাত উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে কুহেলিকার আবরণ উন্মোচন ক'রে সেণ্ট-জর্জ্জিয়া যখন আপন সুস্নিগ্ধ সুষমা অনাবৃত করলে, গ্রন্থকার অবাক বিস্ময়ে আত্মহারা।

এই অনাবিল দেবদুর্লভ সৌন্দর্য্যের ক্রোড়ে অবস্থিত মেদ-রক্তে দুর্গন্ধ কারখানা হচ্ছে গন্তব্য স্থান। সৃষ্টির আদিম সহচর নির্ব্বিরোধী মহাকায় তিমির জবাইখানা। ইংরাজ বৈজ্ঞানিকদ্বয়ের কাজ ছিল মৃত দেহগুলির আয়তন নির্ণয় এবং পাকস্থলীস্থ ভুক্তখাদ্য ও ক্রিমির নমুনা গ্রহণ।

সভ্য জগতে সাবানের চাহিদা। বাণিজ্যের অর্থপ্রসূ চাকা ঘূর্ণায়মান। নিষ্ফল আক্ষেপ প্রকাশ অশোভন। গ্রন্থকার নির্ব্বিকার ভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিত্রিত করে গেছেন এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড। সে চিত্রের বর্ণবিন্যাসে একটি সূক্ষ্ম রেখাও অতিরঞ্জিত নয়, কোথাও ভাবোন্মাদ-দূষিত আতিশয্য নাই অথচ মন্ত্রমুগ্ধ পাঠকের চমক ভাঙে না। আদ্যন্ত রচনাটির প্রধান গুণ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মানুষের বর্ণনা। পর্য্যবেক্ষণের ক্ষমতা ও ধৈর্য্য থাকলে এই দ্বিপদ প্রাণীর মত চিত্তাকর্ষক ব্যাপার আর কিছুই নেই। সকলেই নিরীহ, মানসিক উৎকেন্দ্রিকতার দাস (একমাত্র পাঠক ব্যতীত), সুতরাং কতখানি উপভোগ্য সহজেই অনুমেয়। বিদ্রূপ না ক'রেও যে মানুষের দুর্ব্বলতা ব্যক্ত করা যায় এ সত্য বাঙলা দেশের সমালোচক-সঙ্ঘের বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য।

ভোরের সময় তুষার বৃষ্টি পাতলা হ'লে বাতায়ন-কাচের আর্দ্রতা অপসারিত করে দেখতে হতো কারখানা শিখরে শতচ্ছিদ্র রক্ত পতাকাটি উড্ডীন আছে কিনা। থাকলে বুঝতে হতো এরই মধ্যে ধরা পড়েছে শিকার। কদাচিৎ এ

নিয়মের ব্যতিক্রম হতো। দুর্গন্ধময় পরীক্ষাগার হতে পূর্ব্বদিবসের কৃষ্ণ শোণিতে আড়ষ্ট আলখাল্লাখানি চড়িয়ে নিয়ে ছুটতে হতো। ততক্ষণ শ্রমিক আহ্বানের বংশীধ্বনি হয়ে গেছে। জবাইখানার অস্ত্রাগার, পাচক ঘর, করাত ঘর একে একে বাষ্পের ফুৎকারে, যন্ত্রের নির্ঘোষে, মনুষ্য কণ্ঠে মুখরিত হয়ে উঠেছে।

আনাড়ি বৈজ্ঞানিকদ্বয়কে নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে হাসি ঠাট্টার বিরাম ছিল না। মেদ মাংসের পিচ্ছিল ভূমিতে স-শব্দে পতন ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার, তার ওপর কখনও কখনও কর্ত্তিত জিহ্বার ওপর পদার্পণ করে ফেলে পরের পর ঊর্দ্ধবাহু, উর্দ্ধাগমন ও ধরাশয়ন হলে কিছুক্ষণের জন্য কার্য্য স্থগিত রেখে প্রাণমুক্ত হাসির হুল্লোড় উঠতো। আর একটি উল্লাসের ব্যাপার ঘটতো যখন পচা দেহের উদরস্থ বস্তু সহসা অপ্রত্যাশিত ভাবে বিদীর্ণ হয়ে স্নান করিয়ে দিত।

এই প্রকার শিশুসুলভ সরলতার সঙ্গে সঙ্গে তিমি বংশ নির্ম্মূল হচ্ছিল নির্ব্বিচার নির্দ্দয় ভাবে।

লৌহ ফলকে বিদ্ধ মহাকায় প্রাণীর ঊর্দ্ধমুখী শোণিত উদ্গার ও বিরাট অভ্রভেদী মৃত্যু যন্ত্রণা দেখেছিলেন গ্রন্থকার সমুদ্র বক্ষ হতে এবং লিপিবদ্ধ করেছেন অনবদ্য ভাষায় কিন্তু সেজন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেন নি। তাঁর অব্যক্ত তিরস্কার আরও প্রবল ভাবে ধ্বনিত হয়েছে যখন নিরীহ সীলের স্বভাব ব্যাখ্যা করে হত্যার বিবরণ দিয়েছেন। দক্ষিণ মেরু বৃত্তের ক্রোড়স্থ দ্বীপপুঞ্জে সীল প্রায় নির্ম্মূল হয়ে গেছে কারণ তাদের প্রাণনাশ করে দেহ হতে তৈল অপহরণ করা অনায়াসসাধ্য।

মার্চ মাসে পুরুষ-সীল স্ত্রীজাতিকে পরিত্যাজ্য জ্ঞান ক'রে পৃথক বৈঠকের ব্যবস্থা করে। গ্রন্থকার নিছক কৌতূহল পরবশ হয়ে বধকারীদের সঙ্গ নিয়েছিলেন সেই সময়। বলেছেন—"আমরা যখন তীরে উঠলাম দুটি শাবক কর্দ্দম-শয্যা হতে তাদের রেশমী মসৃণ স্কন্ধদেশ কুঞ্চিত করে দেখে নিল। তাদের চোখে ক্লেদযুক্ত জল। ঢিল ছুঁড়তে এ্যাক্ এ্যাক্, এ্যাক্ ক্যাক্ করে ডেকে উঠলো। একটি ধাড়ীকে বাঁশের ঠেলায় তোলা হলো। পরমুহূর্ত্তেই সে একটি ভারী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বসে পড়লো। আমাদের উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হবার যেন অবসরই নেই। পুনর্ব্বার ঠেলা দিতে এক মুহূর্ত্ত ক্ষীণদৃষ্টি অধ্যাপকের

মত তাকিয়ে পুনরায় ধ্যানস্থ হয়ে পড়লো। এক সঙ্গে পনরটি প্রাণী পড়েছিল একটি অশ্লীল স্তূপের মত পরস্পরের অঙ্গ স্পর্শ করে। নিমীলিত চোখের দরবিগলিত ধারায় গুম্ফগুচ্ছ আর্দ্র ; চিন্তাশূন্য, অজ্ঞান, স্বপ্নশূন্য নিদ্রায় জড়ীভূত। অতি প্রাচীন প্রজ্ঞাসম্পন্ন মানুষের মুখের মত দেখায়। মাংসল তনুতে স্ত্রী-সম্ভোগ সময়ের ক্ষত চিহ্ন। তার মধ্যে একটি স্তূপ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে মানুষের মত কদর্য্য ভাবে পেট চুলকে নিলে। মস্তকের ওপর লগুড়াঘাত করতে করতে এক একটিকে সাগর তীরে নিয়ে গিয়ে মুখগহ্বরের মধ্যে বন্দুক চালনা করে হত্যা করা হলো। স্থূল. ওষ্ঠের প্রান্ত বেয়ে টাটকা রুধির গড়িয়ে পড়লো। পাকস্থলীর মধ্যে পাওয়া গেল ক্রিমি বিজড়িত শিলাখণ্ড কতকগুলি। কোন সুখে গলাধঃকরণ করেছে বুঝলাম না—সম্ভবত খাদ্য পেষণের উদ্দেশ্যে। যাই হোক অবিশ্রান্ত জবাই দেখতে না পেরে দ্বীপের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলাম।”

পৃথিবীর ভিতগাত্রে বিঘূর্ণিত ঝটিকাবলয় ধারণ করে পড়ে আছে মহাশ্বেত মহাদেশ ; নির্ম্মম, নিঃসঙ্গ, নিঃসাড়। এক সময় এখানেও উদ্ভিদ ও প্রাণী ছিল। তার পর বোধকরি সৃষ্টিকর্ত্তা হিমের আক্রমণ ঠেকাতে না পেরে উৎপাটন করতে চেষ্টা করেছিলেন ; কারণ দুই পার্শ্বের সঙ্কোচনে দুইটি উপসাগর সৃষ্টি হয়েছে—“ওয়েডেল” এবং “রস্” সমুদ্র—উভয়ের মধ্যেই একটি পশ্চিমগামী আবর্ত্ত ঘড়ির কাঁটার মত চক্রাকারে ঘুরে যথাক্রমে এ্যাট্‌লান্টিক্ ও প্রশান্ত মহাসাগর অভিমুখে যাত্রা করেছে। সঙ্গে চলেছে অসংখ্য তুষার খণ্ড। এক একটি লৌহশলাকা হতেও ভীষণতর। ইস্পাতের অর্ণবতরীকে বিদারিত করে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয় সামান্য মৃত্তিকা ভাণ্ডের মত। অনেক স্থান শতাধিক মাইল পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত। ‘ওয়েডেল’ উপসাগর এই কারণে অনাব্য। শ্যাক্‌লটন-এর বিখ্যাত ‘এণ্ডিয়োরেন্স’ জাহাজটি পুরাতন ভঙ্গুর বরফ ও নূতন তুষারের মাঝে পড়ে ডিমের খোলার মত নিষ্পিষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

আমুণ্ডসেন, স্কট ও শ্যাক্‌লটন অবতীর্ণ হয়েছিলেন ‘রস’ সমুদ্রের বিরাট ভাসমান হিম-প্রাকারের পাদদেশে। দৈর্ঘ্যে চারিশত মাইল, উচ্চে শতাধিক ফিট্ প্রাচীরটি জগতের একটি বিরাট বিস্ময়বস্তু। এলায়িত গৃহাচ্ছাদন হতে ভার-বস্তু যেমন করে গড়িয়ে পড়ে তেমনি ভাবে এর জন্ম ; এই অন্তরায় অতিক্রম করে মেরু স্পর্শ করা যে কতখানি দুরূহ ব্যাপার স্কটের কঙ্কাল ও দিন-পঞ্জিকার অন্তিম লিপি তার সাক্ষ্য দিয়েছে। কিন্তু মানুষের ধৃষ্টতার সীমা নাই। এই প্রাচীর-ক্রোড় হতে সাত মাইল অন্তরে উপাদান টেনে নিয়ে গিয়ে এ্যাডমিরাল বায়ার্ড সংস্থাপন করলেন ‘লিট্‌ল এ্যামেরিকা’। সে পরিত্যক্ত নিভৃত পল্লীর শুভ্র বক্ষে এখনও কৃষ্ণ স্তম্ভ দেখা যায়।

সমগ্র দক্ষিণ মেরু-বৃত্তটি পরিভ্রমণ ক'রে যখন ‘দ্বিতীয় ডিস্‌কভারি’ জাহাজটি বরফের চাপে জখম হয়ে ফিরলো, সভ্যজগত এ্যামেরিকার বিমানবীর লিন্‌কন্ এল্‌স্‌ওয়ার্থ-এর জীবনের জন্য আশঙ্কিত। গ্রাহাম্‌ল্যাণ্ডের একটি প্রায়োদ্বীপ হতে বিমানতরী উঠে সেই যে আকাশে মিলিয়ে গেলো মাসাবধি কাল কোন সংবাদ নেই। ডিস্‌কভারিকে ফিরতে হলো—সঙ্গে গ্রন্থকার, তথা পাঠক।

গ্রীষ্মের মধ্য ভাগ পড়ে ডিসেম্বর মাসে। স্ফটিক-শুভ্র বরফের ফাঁকে ফাঁকে যেন নীলকান্তের নীল ; তার ওপর রবির কিরণ পড়ে অনির্ব্বচনীয় শোভা বিকীর্ণ করে। অনন্ত শান্তির মাঝে সে স্নিগ্ধোজ্জ্বল শুচিপূর্ণ ভাতির তুলনা হয় না। বরফে বরফে ঈষৎ ঘাত-প্রতিঘাতের মৃদু ধ্বনি ও দূরাগত তিমির জলোদ্গারের একত্রিত শব্দ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে মহা স্তব্ধতায় সমাহিত হয়ে যায়। ইতস্তত তাপ গ্রহণ নিরত সীল দলের অদূরে নির্ব্বাক পেন্‌গুইন সম্প্রদায়ের কেউ কেউ অকস্মাৎ অকারণে জলে ডুব দিয়ে উঠে আসে। মহাকায় তিমির বঙ্কিম পৃষ্ঠ-রেখা দেখা যায়। লোহিত কৃষ্ণ মেঘের মত ভেসে আসে তার খাদ্য—স্বচ্ছ কুচোচিংড়ির পঙ্গপাল। তার পর ঘড়িতে সন্ধ্যা হয়। কিন্তু চক্রবালে সূর্য্যের অধোগতি স্থগিত থাকে। সময়ের পরিমাপ যন্ত্রে যখন রাত্রি ঘোষিত হয় তখন বর্দ্ধিষ্ণু পাণ্ডুরালোকে নির্ব্বাক নিস্পন্দ প্রকৃতির যাবতীয় প্রাণী যেন অবলম্বনশূন্য হয়ে পড়ে। শর্ব্বরীর শ্যামাঞ্চলের আচ্ছাদন অভাবে নিদ্রা নিরর্থক হয়। প্রভাত তার নিত্যকার ইন্দ্রজাল হারিয়ে বাসি ফুলের মত আর স্বাগত হয় না।

সমালোচনার স্বল্প পরিসর আয়তনে সমগ্র গ্রন্থখানির চুম্বক দেওয়া অসম্ভব। প্রথম পৃষ্ঠা হতে শেষ পর্য্যন্ত এমন একটি বাক্য নাই যা পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে না। ভাষার সৌন্দর্য্য ও প্রকাশভঙ্গীর অসাধারণ নৈপুণ্যে নানা জাতীয় বিজ্ঞান-কথা নির্ভার আখ্যান-মঞ্জরীর মত ধারণায় প্রবেশ করে।

তিমি, সীল, পেন্‌গুইন, পক্ষী, মৎস্য ও জলজ উদ্ভিদের প্রত্যেককে অবলম্বন ক'রে এক একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় গঠিত হয়েছে এবং এদের স্বভাবের বর্ণনা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভাবে সমগ্র গ্রন্থখানিকে অলঙ্কৃত করেছে। তথাপি আলেখ্য-খানিকে তত্ত্বমূলক ভাবলে ভুল করা হবে। পাণ্ডিত্যের আভাস-মাত্র নেই। সহযাত্রীদের গল্পতে, কারখানা সম্প্রদায়ের সামাজিক অনুষ্ঠানের বর্ণনায়, আফ্রিকার জুলু, ভারতবাসী ও অষ্ট্রেলিয়ানদের কথায় কৌতুকপ্রদ বিচিত্রতা সৃষ্টি হয়েছে।

নালিশ বা নিন্দাবাদ গ্রন্থকারের স্বভাব-বিরুদ্ধ। সব কিছুই প্রস্ফুটিত হয়েছে নির্ম্মল ভাবে। অনেক কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা নিশ্চয় বর্জ্জিত হয়েছে কিন্তু তাতে সত্যের কোন ব্যত্যয় হয়নি। গ্রন্থের প্রধান নায়ক 'এ্যাণ্টার্টিকা'কে তিনি কোন খাতির করেননি। প্রণিধান করবার সময় খেয়াল থাকে না, কিন্তু সমালোচনা ক'রতে ব'সলে প্রতীয়মান হয় যে দীর্ঘ সাত বৎসরের কর্ম্মজীবনটি আগাগোড়া ক্লেশের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে। প্রত্যহ একটানা দশ বারো ঘণ্টা পূতি-গন্ধ মেদ-মাংসের মধ্যে যাপন করা কিংবা অসহনীয় শীতের মধ্যে সমুদ্রতল হতে মাটি, উদ্ভিদ্ ও জীব জন্তুর নমুনা উত্তোলনের ক্লেশ অবশ্য স্বেচ্ছাকৃত ; কিন্তু পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডলের অনির্দ্দিষ্ট বিপ্রকর্ষণশক্তি নিত্য নিয়ত দূরে ঠেলেছে। একঘেয়ে বিবর্ণ কুয়াশা বা প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টির ফাঁকে ফাঁকে উপরিউক্ত সৌন্দর্য্যের অন্তরে মণিমুক্তাভূষিতা বারাঙ্গনার হৃদয়ের মত নীরস মনে হতো।

নিরাপদ আরাম কেদারা হতে পাঠকচিত্ত এই সমস্ত অপ্রিয় ব্যাপার খ্যাতব্য জ্ঞান করে না। তাই শেষের অধ্যায়ে এসে চমকে যেতে হয়। এ্যাণ্টার্টিকার কুহেলিকাময় রোমাণ্টিক মূর্ত্তি সহসা উলঙ্গ ভাবে অনাবৃত হয়ে পড়ে যখন গ্রন্থকার ও তাঁর পাঁচজন সঙ্গী প্রস্তরের নমুনা গ্রহণ কল্লে নৌকাতে অবতীর্ণ হয়ে জাহাজ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তিন দিন তিন রাত সেই হিম প্রপীড়িত তরঙ্গমালায় মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে তারা যখন পর্ব্বত গাত্রে প্রক্ষিপ্ত হয়ে নিজেদের অপেক্ষাকৃত নির্ব্বিঘ্ন মনে করলো তখন থেকে সুরু হলো প্রকৃতির নিষ্করুণ বিদ্রূপ।

যারা চন্দ্রমার মধ্যেও স্বজাতীয় প্রাণীর উপনিবেশ কল্পনা ক'রে থাকে তাদের

প্রণিধান করা উচিত যে নিজ বায়ুমণ্ডলভুক্ত এই বিষণ্ণ নীরস অনুপর্ব্বতটি প্রথম রাত্রি হতেই বুঝিয়ে দিল যে মানুষের সহ্যসীমা পরিমিত। গ্রন্থকারের আজন্ম অর্জ্জিত সাহস, প্রবৃত্তি ও অনুশীলন শারীরিক উত্তাপের সামান্য অভাবেই শোচনীয় ভাবে তিরোহিত হয়ে গেলো।

ঘটনার গ্রন্থনে চাতুর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু যে লিপিশক্তির গুণে গ্রন্থখানি, বিশেষ করে শেষাংশের দুঃসহ ক্লেশের কাহিনীটি, উচ্চশ্রেণীর নাটকের শক্তি ধারণ করেছে তা চেষ্টাপ্রসূত হতে পারে না। আমার মনে হয় চেষ্টার সঙ্কীর্ণ প্রণালী ছাপিয়ে প্রকটিত হয়েছে সানন্দ বিস্ময়।

পরিশেষে বক্তব্য যে গ্রন্থভুক্ত চিত্রগুলি সাতিশয়রূপে সুশোভন হয়েছে।

শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

The Civil War in Spain—by Frank Jellinek (Gollancz).

দেখতে দেখতে স্পেনের অন্তর্বিদ্রোহ প্রায় দু' বছর ছাপিয়ে গেল, এবং এই যুদ্ধের অন্তর্নিহিত কারণ উদ্ঘাটিত করবার চেষ্টায় আজ অবধি অনেকগুলি বই প্রকাশিত হ'ল। কিন্তু বিদেশী জনসাধারণের এই বিপ্লবের প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে এখনও অজ্ঞতা দূর হয়নি বলা যেতে পারে। ফ্র্যাঙ্ক জেলিনেক্-এর লেখা এই বইখানি প্রকাশ করে গল্যান্স্ বিদেশী পাঠকদের এই বিদ্রোহের কারণ সম্যক উপলব্ধি করায় প্রভূত সাহায্য করেছেন এবং সকলের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন সন্দেহ নেই। লেখক সংবাদদাতা হিসাবে বার্সেলোনার যুদ্ধ ক্ষেত্রে গোলাগুলির মাঝখানে বসে তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং সেগুলিকে অতি সুন্দর ভাবে সাজিয়েছেন ও প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

এই যুদ্ধের ভীষণ ঘটনাবলী আমরা দৈনিক সংপাদপত্রে রোজই জানতে পারছি। তার জন্যে নূতন করে ছ'শ পাতার বই আট শিলিং ছ' পেন্স দিয়ে কিনে পড়বার দরকার নেই। চলচ্চিত্রের মারফৎ যুদ্ধের নৃশংসতার চাক্ষুষ প্রমাণও আমরা পেয়ে থাকি। কিন্তু কিসের জন্য এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড, কেন নির্বিরোধী নরনারীর ওপর এই নির্ম্মম অত্যাচার তা আমরা বুঝতে পারি না। যখন বিমানপোত থেকে বোমা ফেলে অকস্মাৎ নিরস্ত্র ও নিরাশ্রয় জনপদগুলিকে

বিধ্বস্ত ও বিনষ্ট করে দেওয়ার সংবাদ পাই বা ছবি দেখি তখন সেই ধ্বংসলীলার ভীষণতায় এবং হতপ্রায় শিশু, বৃদ্ধ ও মরণোন্মুখ নরনারীর মর্ম্মন্তুদ দৃশ্যে আমরা মর্ম্মাহত হই ও সমবেদনার ব্যথা পাই, এবং সেই বিশিষ্ট ঘটনায় যে পক্ষের অপরাধ সেই পক্ষের ওপরেই যুদ্ধের সব অপরাধের বোঝা চাপাই।

লেখক প্রারম্ভেই বলেছেন যে বইটির উদ্দেশ্য যুদ্ধের বর্ণনা করা নয়—উদ্দেশ্য দেখান কি নিয়ে যুদ্ধ। এই উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে প্রয়োজন নিরপেক্ষতার। লেখক সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ না হলেও দু' পক্ষেরই যা বলবার আছে তা বিশ্লেষণ করেছেন খোলা মনেই। হয়ত এ রকম বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা অসম্ভব, কিন্তু এতটা পক্ষপাতিত্বশূন্যতাও আগে চোখে পড়েনি। বাস্তবিক পক্ষে এতবড় যুদ্ধের বিচার করা বর্ত্তমানে সম্ভব নয়, ভবিষ্যতের ওপরেই সে ভার ন্যস্ত থাকবে। এখনও লোকে এর আকস্মিকতায় ও ভীষণতায় বিমূঢ় হয়ে আছে। তা' ছাড়া, আরম্ভের সময় যুদ্ধের যে কারণ ছিল, দু' বছর ব্যাপী ঘাত-প্রতিঘাতে আরো অনেকগুলি কারণ জুটে সমস্ত ব্যাপারটাকে ঘুলিয়ে তুলেছে, প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করা দুসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণগুলিও এক প্রকারের নয়—কোনটা অর্থনৈতিক, কোনটা রাজনৈতিক বা কোনটা মনস্তাত্বিক, কিন্তু যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বের ও পরের ঘটনাগুলি বেছে দেখলে কতকগুলো মূল সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায় যেগুলির অনুসরণ করলে হয়ত অবশেষে প্রকৃত কারণের সন্ধান মিলতে পারে। লেখক এই রকমই কতকগুলি মূল সূত্রের সন্ধান করেছেন এই বইখানিতে।

স্পেনের এই অন্তর্বিদ্রোহকে আকস্মিক বলা ভুল। ইতিহাসে কোন ঘটনাই আকস্মিক নয়। বহু যুগ ধরে এই যুদ্ধের বীজ অঙ্কুরিত হবার অপেক্ষায় মাটির নীচে লুকিয়ে ছিল। স্পেনীয় জাতি দীর্ঘকাল ধরে দু'ভাগে বিভক্ত। আমেরিকা লুণ্ঠন করে স্পেনে বহুদিন ধরে ধন সম্পদ জমে উঠেছিল। কিন্তু এই ধনের ভাগ সকলে সমান ভাবে পায়নি। মুষ্টিমেয় কয়েকটি বনেদি বংশই সেই ধন ভোগ করে এসেছে, এবং মধ্যশ্রেণীর লোকেরা তাদের তাঁবেদারি করে কিছু কিছু ভাগ পেয়েছে মাত্র। নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা এর থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয়েছিল। তাদের দারিদ্র্য ঘোচেনি। লাভের মধ্যে দরিদ্রদের ওপর ধনবানদের প্রভুত্ব বেড়ে গিয়েছিল। সমাজের নেতা

বলতে ধনীরা, রাজকার্য্য চালাতে ধনীরা, কেবল ক্ষেত্রকর্ম্ম করতে, ফলের মজুর হতে ও সৈন্য হয়ে দেশের জন্য প্রাণ দিতে দরিদ্ররা। কালক্রমে ধনী দরিদ্রের প্রভেদ আরো বেড়ে গেছে। ইতিহাসের এই কথা যদি আমরা মনে রাখি তা' হ'লে বুঝতে পারব কেন স্পেনে বহুকাল ধরে একটা চাপা অশান্তি ঘানিয়ে উঠছিল। এই অশান্তির ফলেই স্পেনে রাজতন্ত্রের বদলে রিপাব্লিক নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল ও রাজা আল্‌ফন্‌সো-কে নির্ব্বাসন ভোগ করতে হয়েছিল। কিন্তু এতেও দেশে শান্তিবিধান হয়নি। গণতান্ত্রিক শাসনের ফলে ধনীদের সমূহ ক্ষতি হতে সুরু হল এবং অপর দিকে মজুররাও নিজেদের দুরবস্থা উপলব্ধি করে সঙ্ঘবদ্ধ হতে লাগল। মজুর আন্দোলন ক্রমশই ব্যাপক আকার ধারণ করল। হয়ত এই আন্দোলনের নীচে বিদেশীয়-দের হাত ছিল, কিন্তু মজুরদের প্রকৃতই এই দারুণ দুরবস্থা না হলে আন্দোলন এত সহজে সাফল্য লাভ করতে পারত না। দেশের টানের চেয়ে অর্থের টান বড়; তাই স্পেনের ধনীরা বিদেশী ধনীদের কাছে তাদের সম্মুখ বিপদ জ্ঞাপন করে ধনীদের দলবদ্ধ হয়ে পরস্পর সাহায্য করার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করল। স্বার্থ বজায় রাখতে ধনীরা দেশভক্তি, জাতিপ্রীতি সবই ভুলে যেতে পারে। সাড়া মিলতে বেশী সময় লাগল না। স্পেনের ধনীরা পুনরায় রাজতন্ত্র স্থাপন করবার অভিপ্রায়ে গণতান্ত্রিক জননায়কদের ও মজুর নেতাদের বিরুদ্ধে গুপ্ত ষড়যন্ত্র চালাতে লাগল। জার্ম্মানী, ইটালী প্রভৃতি ধনতন্ত্রবাদী দেশের সহানুভূতি ও সাহায্য পাবার অভিসন্ধিতে তারা রটিয়েছিল যে রাশিয়া স্পেনের উপর প্রভাব বিস্তার করবার অভিপ্রায়ে ঐদেশে মজুর আন্দোলনের সাহায্য করছে।

স্পেনে বলশেভিজ্‌ম বিস্তার লাভ করছে জানতে পেরে ধনতন্ত্রবাদী ফাশিষ্টরা স্পেনে রাশিয়ার প্রভাব রোধ করবার জন্যে তৎপর হয়ে উঠল ও মজুরদের সাথে ধনীদের বিরোধে যাতে ধনীরাই জয়লাভ করে তার জন্যে গুপ্ত ও প্রকাশ্য ভাবে সাহায্য করতে লাগল। ফলে, বিপ্লবী ধনী ষড়যন্ত্র-কারীরা আরো সাহস পেল গণতান্ত্রিক সরকারকে অমান্য করবার।

এইখানে আমাদের মনে রাখতে হবে একটি কথা। স্পেনের সেনাবাহিনী গরীবদের নিয়ে গঠিত হলেও নায়করা প্রায় সকলেই ধনীসম্প্রদায়ভুক্ত। সেই কারণে সৈন্যদের মধ্যে মজুর আন্দোলনের প্রভাব প্রবেশ করতে পারেনি।

তাদের স্বল্পবুদ্ধিতে তারা বুঝেছিল দেশে রাজা না থাকাতেই এই অরাজকতা এবং রাজার প্রত্যাবর্ত্তনে সাহায্য করাই তাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। অতএব সরকারের বিরুদ্ধে সেনানায়কদের বিদ্রোহে তারা রাজপক্ষই অবলম্বন করল। এর পরে বিদ্রোহ যখন প্রকাশ্য ভাবে সুরু হল তার ফলে স্পেনে যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়েছে সে কথা সকলেরই জানা আছে।

গৃহবিবাদ যদি গৃহের মধ্যেই আবদ্ধ থাকত তা'হলে বহু পূর্ব্বেই এই বিবাদের মীমাংসা হয়ে যেত। মুখে না বললেও জার্ম্মানী ও ইটালী যে গোড়া থেকেই বিপ্লবীদের সাহায্য করছে তা আর কারো অবিদিত নেই। প্রথমত, স্পেনে রাশিয়ার প্রভাব বিনষ্ট করা ও ফাশিজমের দ্বারা বলশেভিজমের রোধ করা ঐ দুই দেশের একটি প্রধান উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়ত, ক্যাটালোনিয়া, বাস্ক প্রভৃতি প্রদেশের সুবিস্তৃত লোহার খনিগুলির উপর উভয়ের যে প্রলুব্ধ দৃষ্টি আছে লেখক তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ দিয়েছেন। তদুপরে স্পেনে জার্ম্মানী ও ইটালীর প্রভাব সংস্থাপিত হলে ভূমধ্যসাগরে ইংরাজের ও ফরাসীর আধিপত্য হ্রাস হবে সুনিশ্চিত। হয় বাহিরের সাহায্য বন্ধ থাকা উচিত, না হয়, দু'পক্ষেরই বাহিরের সাহায্য পাওয়া উচিত। কিন্তু স্পেন বারবার League of Nations-এর কাছে এর প্রতিকারের জন্য অনুরোধ জানিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। এর জন্যে ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকারই প্রকৃত পক্ষে দায়ী। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স নিজ নিজ স্বার্থহানির ভয়ে এই অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে সাহস করছে না। নিজেদেরও কোনরূপ ক্ষতি না হয় অথচ বাহিরের সাহায্য যাতে বন্ধ হয় সেই উদ্দেশ্যে Non-intervention Committeeর মধ্যস্থতায় জার্ম্মানী ও ইটালীকে বারবার বৃথা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করবার চেষ্টা করছে যেন কেউই স্পেনের গৃহবিবাদে হস্তক্ষেপ না করে। কিন্তু আন্তর্জাতিক নীতি বলতে এখন আর কিছু নেই। অঙ্গীকার করাও যত সহজ ভাঙ্গাও তত সহজ। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের এখনও অস্ত্র সজ্জা শেষ হয়নি, কাজেই এই নিরপেক্ষতার অছিলায় স্পেনকে সাহায্য না করা ছাড়া উপায় নেই। কেবলমাত্র রাশিয়া দূর থেকে যৎসামান্য সাহায্য সরকার পক্ষকে পাঠাচ্ছে। কিন্তু এর ফলে বিপ্লবীদল সরকারী সেনাকে ক্রমশই হটিয়ে আনছে। যদিও সরকার পক্ষ এখনও নির্ভীক ভাবে যুদ্ধ করে যাচ্ছে তথাপি অর্থাভাবে, অস্ত্রাভাবে ও লোকাভাবে তারা ক্রমশই হীনবল হয়ে পড়ছে।

সংক্ষেপে যা বলা হল তারই সুবিস্তৃত ও সুবিন্যস্ত আলোচনা রয়েছে এই বইটিতে। লেখকের স্পেনীয় রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে যে একটা প্রগাঢ় জ্ঞান রয়েছে তার প্রমাণ প্রতি পাতায় পাওয়া যায়। স্থানীয় রাজনৈতিক অবস্থার যে বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন তা আধিক্য-দোষে দূষিত হতে পারে, কিন্তু অধিকন্তু ন দোষায়ঃ, অনেক স্থলেই হয়ত বিদেশী পাঠকদের স্পেনের রাজনৈতিক দলগুলির ঝগড়া বিবাদের ছোট ছোট ঘটনাগুলি অনর্থক ও বিরক্তিকর বোধ হতে পারে, কিন্তু তাই বলে রাজনৈতিক জটিলতা উপলব্ধি না করলে আমরা এই বিপ্লবের দায়িত্ব সম্বন্ধে সুবিচার করতে পারব না। এক বছরের ওপর বইখানির রচনা সমাপ্ত হয়েছে, এবং ইতিমধ্যে বহু ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু বইখানি যখন যুদ্ধের ইতিবৃত্ত নয় তখন এতে তার মূল্য হ্রাস হয় না। আমার বিবেচনায় আলোচিত বইখানি স্পেনীয় বিপ্লব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করবার জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

সৌরেন্দ্রনাথ বসু

বঙ্কিম-পরিচয়—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলার দিকে দিকে ও বাংলার বাইরে বহুস্থানে বঙ্কিম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ এই উপলক্ষে বঙ্কিমের রচনাবলীর এক নব-সংস্করণ প্রকাশ করবার উদ্যোগ করেছেন। সুখের বিষয় এই সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সম্প্রদায়কে উপহার দেবার জন্য "বঙ্কিম-পরিচয়" নামে ১৭৩ পৃষ্ঠার এই পুস্তিকাখানি সঙ্কলন করে বাংলার বঙ্কিম উৎসবকে সমৃদ্ধ ও অলঙ্কৃত করেছেন।

বঙ্কিম-পরিচয়ের ভূমিকা লিখেছেন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার স্বয়ং মুখোপাধ্যায় মহাশয়। তিনি বলেছেন বঙ্কিম বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর গৌরব এবং বাংলা দেশে বঙ্কিমের অভাববোধ বৎসর গণনার দ্বারা নিরূপিত হয় না। ভূমিকায় প্রকাশ যে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাসমুদ্র মন্থন করে এই পুস্তিকায় সংগৃহীত হয়েছে ছাত্রগণের উপযোগী রচনামৃত,—বঙ্কিমের প্রতিভা তাঁদের নিকট প্রতিভাত করার উদ্দেশ্যে। বাস্তবিক বঙ্কিমের প্রতিভা কতখানি,

তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির মূল্য কিরূপ, তাঁর নানাবিধ রচনায় বাংলাদেশ কি সম্পদ লাভ করেছে তার সম্যক ও সমূহ সমালোচনার সময় নিশ্চয় উপস্থিত হয়েছে। বঙ্কিম শতবার্ষিকী উপলক্ষে যে সব প্রবন্ধাদি পাঠ ও বক্তৃতা উৎসৃত হোল তাতে দেখা যায় যে ঐ বিষয়ে বেশ রীতিমত মতদ্বৈধ আছে। সেদিনের খবরের কাগজের রিপোর্টে পড়া গেল যে সংস্কৃতজ্ঞ কতিপয় পণ্ডিত বলেছেন যে বঙ্কিমের সাহিত্য-সৃষ্টি ব্যাস ও বাল্মীকির সঙ্গে তুলনীয়। যিনি একাধারে বিমলা, প্রফুল্ল, কপালকুণ্ডলা, শৈবলিনী, রজনী শ্রী, কুন্দ, কমল, রোহিণী, চন্দ্রশেখর, ভবানীপাঠক, ভবানন্দ প্রভৃতি চরিত্র সৃজন করেছেন, তিনি Shakespeare-এর চেয়ে কম কিসে? আধুনিক সাহিত্যসেবীরা কেউ কেউ বলেন যে বঙ্কিমের লেখায় দেশ কাল অতিক্রমনকারী কোন বৈশিষ্ট্য নেই, বঙ্কিম ছিলেন শুধু এক ডেপুটি সাহিত্যকার মাত্র; যে কারণে তাঁর প্রতিভা তখনকার মত সাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত করেছিল তা তাঁর সাহিত্যের অসাধারণত্বের জন্য নয়, তা সাহিত্যাতীত কারণে। বোধ হয় উভয় শ্রেণীর মতই চরমপন্থী ও বঙ্কিমের প্রকৃত প্রতিভা উপরোক্ত দুই চরমসীমার মধ্যবর্ত্তী। সাহিত্য বা রচনা দেশকালাতীত হবে এ দরকষার মধ্যে একটু গলদ নিশ্চয় আছে, কেননা কে বলতে পারে যে যাঁরা বিদেশী রচনায় ও সাহিত্যে দেশকালাতীত গুণাবলী দেখেন তাঁরা ভাষা, দেশাচার ও পারিপার্শ্বিক সমাবেশের দ্বারা প্রবঞ্চিত হন না? বিষবৃক্ষের tragedy বা শৈবলিনীর tragedy কেন ও কিসে যে শেক্সপীরীয় tragedyর চেয়ে নিকৃষ্ট এর কি কোন তর্কাতীত প্রকৃষ্ট নির্দ্দেশ লাভ সম্ভব? বঙ্কিম যদি কিছুই না হয় তবে বাংলা ভাষায় বড় বেশী কিছু আছে কিনা, যা দেশকালের প্রভাবের বাইরে, সেও সন্দেহের বিষয় হতে পারে।

এ সব বিষয়ে পণ্ডিত ও সাহিত্যসেবীদের যাই মতামত হোক বঙ্কিমের রচনাবলী পাঠ—যা ছাত্রসমাজ থেকে প্রায় বহিষ্কৃত হতে চলেছিল তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়া বড়ই বাঞ্ছনীয় এবং আশা করা যায় "বঙ্কিমের জীবন কথা", "বন্দেমাতরম", "বাঙ্গালীর উদ্দেশে", "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য", "ধর্ম্ম ও সমাজ", "নানাকথা", "বর্ণনা" ও "পরিশিষ্ট" (সমসাময়িক ঘটনা) এই আটটি অধ্যায় সম্বলিত বঙ্কিম-পরিচয় ও বঙ্কিম অধ্যয়ন ছাত্রদের মধ্যে সমাদৃত হবে।

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য

The Future of Parliamentary Democracy—by Sir Charles Grant Robertson, Vice-Chancellor of Birmingham University (The Proportional Representation Society, London.)

১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাসে Proportional Representation Societyর উদ্যোগে Aneurin Williams-এর স্মৃতিরক্ষার্থে লেখক কর্ত্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া উক্ত পুস্তিকাখানি লিখিত। Aneurin Williams (১৮৫৯-১৯২৪) ইংলণ্ডের বহু আন্দোলনে নেতৃত্ব করিয়াছেন। তন্মধ্যে সমবায় ও আন্তর্জ্জাতিক শান্তি স্থাপনের আন্দোলন অন্যতম। পার্লামেণ্টের বর্ত্তমান নির্ব্বাচন পদ্ধতির পরিবর্ত্তে সংখ্যানুযায়ী প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation) প্রবর্ত্তন করার নিমিত্ত ইংলণ্ডে বহুদিন হইতে আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছিল। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের সময় সংখ্যালঘিষ্ঠ দলগুলির সংখ্যানুযায়ী আইন সভায় আসন লাভ করা অনেকের নিকট বাঞ্ছনীয় বলিয়া গণ্য হইত। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টারী শাসনতন্ত্রে দুইটি দলের অধিক থাকিলে শাসনকার্য্যের অসুবিধা হয়, অন্যদিকে আবার দুইটি দল থাকিলে সংখ্যালঘিষ্ঠদের পার্লামেণ্টে আসন পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। ইংলণ্ডের নির্ব্বাচনপদ্ধতির ফলে অন্যান্য অসুবিধার মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠদের অত্যাচার প্রধানতম। সুতরাং এই পদ্ধতি পরিবর্ত্তন করিয়া তাহার স্থলে দলের সংখ্যানুযায়ী পার্লামেণ্টে আসন পাইতে হইলে Hare Scheme কিম্বা তদনুরূপ কোন নির্ব্বচনপদ্ধতি অবলম্বন করার নিমিত্ত আন্দোলন চালাইবার উদ্দেশ্যে Proportional Representation Society গঠিত হইয়াছিল। ১৯০৫ সালে এই সমিতিটিকে Aneurin Williams ও অন্যান্য কয়েকজন নেতা পুনরুজ্জীবিত করেন ও পরে কিছুদিনের জন্য তিনি এই সমিতির সভাপতি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৩২ সালে Prof Gilbert Murry প্রথম বক্তৃতা করেন, বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল "The Reform of Parliamentary Government in Great Britain।" দ্বিতীয় বক্তৃতা দেন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক Sir Charles Grant Robertson। এই দ্বিতীয় বক্তৃতার বিষয়বস্তু বর্ত্তমান আলোচ্য পুস্তিকার নাম স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে।

ইংলণ্ডের পার্লামেন্টারী পদ্ধতিতে গণশাসনের (Parliamentary Democracy) ভবিষ্যৎ আলোচনা করিতে গিয়া লেখক চিরাচরিত পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার আলোচনার সবটুকুই historical method-এ, critical method নাই বলিলেও চলে। তাঁহার বক্তব্য বিষয় দুইভাগে ভাগ করা চলে। প্রথমটি, বর্ত্তমান ইংলণ্ডের Parliamentary Government-এর প্রধান দোষ হইতেছে প্রচলিত নির্ব্বাচনপদ্ধতি, দ্বিতীয় বিষয়বস্তু হইতেছে যে Parliamentary Democracy ডিক্টেটারী শাসনতন্ত্র অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেয় এবং এই গণশাসনকে জয়যুক্ত করার প্রধান সহায় ইংরাজ জাতি। ইহা ছাড়াও পুস্তিকাটিতে অন্যান্য বিষয় আলোচিত হইয়াছে যথা functional representation অর্থাৎ পেশানুযায়ী প্রতিনিধি নির্ব্বাচন। Sir John Marriot-এর মতে "Parliamentary democracy implies something more than the legislative omnipotence of parliament, it implies, also, a continuous control, exercised by the legislative sovereign over the executive।" এই সংজ্ঞা গ্রহণ করতঃ লেখক বলিয়াছেন যে তিনটি জিনিষের উপর ইহার সাফল্য নির্ভর ক'রে। প্রথমটি, সৎ ও কর্ম্মকুশল Civil Service, দ্বিতীয়টি, সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা ও তৃতীয়টি হইতেছে স্বায়ত্তশাসনের উৎকর্ষ। এই তিনটিই থাকার দরুণ ইংলণ্ডে গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে পর্য্যন্ত Parliamentary democracy বেশ সফলই হইয়াছিল কিন্তু যত গোলযোগ বাধিল ১৯১৮ ও ১৯২৮ সালের Franchise Act-এর পর হইতে। নারীরা ভোটাধিকার পাইল ও বহুলোক ভোটাধিকার পাওয়ায়, Constituency বিপুলায়তন ও পার্লামেন্ট সুবৃহৎ হইয়া উঠে। এমতাবস্থায় শাসনতন্ত্রের বহু দোষ পরিলক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং এই দোষ সংশোধন করিতে হইলে Parliamentary Democracyতে Proportional Representation প্রবর্ত্তন করা একান্ত আবশ্যক। ইহা না হইলে কোন রাজনৈতিক দল নিজেদের উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধিত্ব না পাইলে কোনদিন শক্তিপ্রয়োগ দ্বারাও কার্য্যসিদ্ধ করিতে পারে ও এইরূপে জনশাসনের মূলে কুঠারাঘাত হওয়া সম্ভব। "If powerful sections in the total voting power fail to secure a proportionate share of representation,

there is a strong impulse given to securing what they demand by 'direct action'।" ১৯১৮ সালে যে House of Commons সংখ্যানুপাতে প্রতিনিধিত্বের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছিল তাহা লেখকের মতে অদূরদর্শিতার পরিচায়ক। লেখক Proportional Representation-এর বিপক্ষে মাত্র দুইটি যুক্তির কথা উল্লেখ করিয়া তাহার সংক্ষেপে উত্তর দিয়াছেন। প্রধানতঃ জটিলতার প্রশ্ন তুলিয়া বলিয়াছেন যে "It is also a profound mistake to underrate the intelligence of even the youngest elector of either sex.···We are really, or have made ourselves, a politically capable people", সুতরাং Mill-এর সময়ে যে আপত্তি চলিত তাহা এখন আর টেঁকে না; সুতরাং Proportional Representation হওয়া উচিত। ইংরাজ জাতি রাজনীতিতে যতই বিশারদ হউন একজন ইংরাজের মুখে এটা অনেকটা "বড়াই" করার মত শোনায়। যদি প্রত্যেক ভোটার এতই বিচক্ষণ তাহা হইলে Proportional Representation না হইলেই বা ক্ষতি কি?

বর্ত্তমান Parliamentary democracyর দোষ আছে সে সম্বন্ধে সকলেই লেখকের সহিত একমত; কিন্তু মাত্র proportional representation দ্বারাই যে সব দোষ স্খালন করা যাইবে তাহাতে ষোল আনা সন্দেহ আছে। তিনি নিজেই অনেক ত্রুটি দেখাইয়াছেন যথা আইনসভার সময়াভাব, Cabinet dictatorship ইত্যাদি। তাহাদের উপায় কি? Functional Representation ত লেখক একেবারে পছন্দ করেন না, তিনি বলেন, "The House of Commons cannot be made a tesselated mosaic of competing vocations and functions...if democracy must be functional, it cannot be Parliamentary"। লেখকের এই মতও সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করিয়া লওয়া অসম্ভব। তাঁহার Proportional Representation দ্বারাও এইরূপ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হরেক রকমের বহু দল ও বহু ব্যক্তির পার্লামেন্টে আমদানী হইবে, তাহা তিনি স্বীকার করুন বা না করুন।

তাঁহার দ্বিতীয় প্রধান বিষয়বস্তুটি এইবার দেখা যাউক, তাঁহার মতে ১৯২০ সালের পর হইতে Parliamentary democracyর প্রধান শত্রু হইয়াছে

ডিক্টেটারী শাসনতন্ত্র। এই শাসনতন্ত্রের উদ্দেশ্য totalitarian বা authoritarian কিম্বা corporative (libertarian এর উল্টা) State বা রাষ্ট্র এবং ইহার প্রধান ও একমাত্র সহায় স্বাধীন ইচ্ছা (will) নয়, শক্তিপ্রয়োগ (force)। বাস্তব স্বাচ্ছন্দ্যের দিক হইতে ডিক্টেটারী শাসনতন্ত্র গণশাসন (democracy) অপেক্ষা কার্য্যকরী হইলেও, আধ্যাত্মিক ও মানসিক উন্নতির দিক হইতে Parliamentary democracy শতগুণে শ্রেয়। তিনি বলেন, "Twenty-four hours in a Totalitarian state leaves me, on the spiritual and intellectual side, almost asphyxiated...knowledge consists in knowing what a government allows you to know and ignorance in not knowing what a government has decided you must not know"। এখানে তাহার সহিত একমত হইলেও totalitarian system-এর উদাহরণ-স্বরূপ ইতালী ও জার্ম্মানীর সহিত তাঁহার রাশ্যাকেও সমানচক্ষে দেখা অনেকে নিশ্চয় পছন্দ করিবেন না। সর্ব্বশেষে তিনি ডিক্টেটারী শাসনতন্ত্রকে বাধা দিবার নিমিত্ত একমাত্র গ্রেটব্রিটেনের উপরই ভরসা করেন, "There is, therefore, a sacred trusteeship imposed to-day, particularly on the British people". ইতিপূর্ব্বে Dr. Gooch-ও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। বৃটেন proportional representation অবলম্বন করিয়া সত্যকারের "free state" হইবে ও democracyকে জয়যুক্ত করিবে। যদিও লেখক বলেন, "The centre of resistance in duty bound to take up the challenge is here in Great Britain." তথাপি বর্ত্তমানের ঘটনা সমূহে বেশ বোঝা যায় যে লেখকের এই আশা দুরাশা মাত্র। বৃটেন ডিক্টেটারী কার্য্যকলাপে বাধা দিতে অগ্রণী হইলে বোধ হয় ইউরোপের ছোট ছোট রাজ্যসমূহ অনেকটা নিরাপদ হইতে পারিত। বর্ত্তমানে বৃটিশ রাজনৈতিকগণের দুর্ব্বল ও প্রতিক্রিয়াপন্থী বৈদেশিক নীতি ও তদ্ধেতু ডিক্টেটারী কবলে আত্মসমর্পণ দেখিয়া লেখক নিশ্চয় হতাশ হইবেন।

লেখক একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এবং সেইজন্যই অতীতে বৃটিশ ডেমোক্রেসীর সাফল্য দেখিয়া, এই শাসনতন্ত্রকেই একটু আধটু সংস্কার করিয়া চালান পছন্দ করেন। তাহা হইলেই তাঁহার মতে অতীতের সহিত যোগসূত্র

বজায় থাকিবে। কিন্তু Parliamentary democracyর এমন কতকগুলি ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে যাহার আমূল পরিবর্ত্তন প্রয়োজন যদি ইহাকে অবশ্য প্রকৃত গণশাসনে পরিণত করিতে হয়। Hobson বলিয়াছিলেন, "Modern democracy is the economic product of the nineteenth century lords of business" সামাজিক ও আর্থিক অন্যায় ও অসমতার মধ্যে পড়িয়া democracy নিষ্পেষিত হইতে চলিয়াছে। এই সমস্ত সমস্যার দিকে লেখক কোন মনোযোগই দেন নাই। তিনি বর্ত্তমান democracy-তে যে মানসিক উন্নতির সুযোগ দেখিয়াছেন তাহা কতকটা "giving freedom to the working-man to pursue arts and sciences so long as he will not trouble about wages." এই সমস্যাকে "mere material test" বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

শ্রীনীরদকুমার ভট্টাচার্য্য

স্বরবিতান—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সম্পাদনা শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার। মূল্য ১।৹। বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়।

ভারতীয় সমাজে প্রতিভাশালী ও গড়পড়তা লোকের মধ্যে পার্থক্য এত বেশী যে পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ যদি বা কখনো হয়, খোশগল্প ছাড়া মনের অন্যবিধ আদান প্রদান প্রায়ই সম্ভব হয় না। সাধারণের উপযোগী করে কঠিন বিষয় পরিবেশন করবার মত প্রবুদ্ধ সমালোচক এবং সহৃদয় রসিকের মধ্যবর্ত্তী সমাজ অন্যদেশের মত এখানে নেই। সুতরাং যা বড় তাকে স্বর্গে তুলবার প্রবৃত্তি প্রথমে হয়। তারপর লোকে ভাবে হয়ত ভুল করছি এবং সেই প্রতিক্রিয়ায় অহেতুক মত পরিবর্ত্তনে যে বিদ্রূপ বৃষ্টি হয় তা অতুলনীয়।

রবীন্দ্রনাথের গান সম্বন্ধেও তাই হয়েছে। তাঁর গানের স্থান সঙ্গীত সমাজে কোথায় ও কতটুকু তার বিচার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে নানাবিধ অন্যান্য প্রশংসা ও নিন্দায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। সমালোচনা কিরকম হয় তার নমুনা দুএকটি দিলে মন্দ হয় না :—

"The very fact that the direct inspiration of his beautiful and deeply moving songs is to be found in folk-music makes it unacceptable to musicians of the old style, who do not recognize anything not (?) conforming to the rules of the now petrified system of ragas and raginis.

Tagore has always revolted against rigidity in every sphere of life, and flow of his inspiration discards fixed rules, not through ignorance, for he knew the classical system throughly well, but because his destiny was to realize something else that was incorporated in the unrestrained beauty and direct appeal to the heart of the music of his own people. It is in this that lies his true greatness." Dr. Arnold A. Bake. Different Aspects of Indian Music. Indian Art and Letters. Vol. VIII no. 1. New Series.

লেখক বিদেশী বলেও তাঁর মতের সঙ্গে অনেক স্বদেশীয় মতের খুব তফাৎ নেই। কিন্তু কথাটায় অত্যুক্তি যথেষ্ট আছে। ক্লাসিকাল গানে কিছু পরিবর্ত্তন আনতে হলে যে পরিমাণ ভারতীয় ওস্তাদী গান আয়ত্ত থাকা প্রয়োজন, একজন বড় কবির পক্ষে তা সম্ভব নয় এবং রবীন্দ্রনাথের গানে ওস্তাদসমাজে উৎকণ্ঠা বা আক্ষেপের কোন কারণ ঘটেছে বলে আমার জানা নেই। এরকম মন্তব্যে রবীন্দ্রনাথের গানে বা ভারতীয় সংস্কৃতিতে কোন প্রবুদ্ধ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় না। মিথ্যাভাষণে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ পায় না, কারণ তাঁর গানে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য্য আছে। কোন শ্রেষ্ঠ কবি তাঁর অবসরে এমন কিছু সাঙ্গীতিক সৃষ্টি করতে পারেন না যার দ্বারা আব্দুল করিমের মত প্রতিভাশালী গায়কের সুরলোক রচনা করার চেষ্টা ক্ষুণ্ণ বা ব্যর্থ হতে পারে। ভারতের বর্ত্তমান সঙ্গীত-সম্পদ দেড়হাজার বছরের অজন্তার ছবির মত অতীত থেকে ধার করে আনতে হয়নি, তার ধারা চিরদিন বহমান ছিল ও রয়েছে এবং তথাকথিত তানসেনের গানে বর্ত্তমানে তানসেনত্ব একপাই আছে কিনা সন্দেহ। রাগরাগিণী চিরদিন গ্রামে ও সহরে সৃষ্টি হয়ে চলেছে। যদি বা কখনো সুরের স্রোত মন্দগতি হয়, ওস্তাদরাই তার সংস্কার করে নতুন খাতে বইয়ে দেন। একাজ কবির নয়।

শুধু ওস্তাদী গানে নয়, বাংলা টপ্পা, তানবিস্তারযুক্ত আধুনিক বাংলাগান বা

কীর্ত্তনেও যদি বড় কিছু দিতে হয়, ত সে তাঁরাই দেবেন যাঁদের এই সব বিভিন্ন শাখার সঙ্গে সর্ব্বাঙ্গীণ ও সুষ্ঠু পরিচয় আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাজ তা ছিলনা। তাঁর সর্ব্বপ্রথম ও প্রধান পরিচয় তিনি কবি। কাব্যের প্রতি এই মমত্ব ছিল বলেই তিনি এত বড় কবি হতে পেরেছেন এবং এই কারণেই গাইয়ের মত তিনি সুরের জন্য কথার প্রতি অকরুণ হতে পারেন নি। ওস্তাদী তান, বিস্তার, মিড়, শ্রুতিবৈচিত্র্য বাদ দিয়ে তিনি রাগরাগিণী থেকে উপাদান সংগ্রহ করে গান রচনা করেছেন এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এতদিকে সীমাবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তিনি সুরের মিষ্টতা অটুট রাখতে পেরেছেন। হিন্দুস্থানী রাগাশ্রয়ী গানের অনুকরণে তাঁর যে গানগুলি প্রথমে তৈরি হয়েছিল, শুনতে পাই তিনি তার বিশেষ মূল্য দেন না এবং সেখানে তিনি ঠিক কথাই বলেন। এ পথ ছেড়ে যখন নিজের খেয়াল অনুযায়ী সুরের রচনা আরম্ভ করেছেন, তখনই ব্যক্ত হয়েছে তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব ও ব্যক্তিত্ব। তাঁর গান যে সাধারণে আদৃত হয়েছে তার কারণ শুধু তাঁর গীতোপযোগী সুধ্বনি ও সুচ্ছন্দ কথা নয়—বলা বাহুল্য তাতে তিনি অদ্বিতীয়। তার সঙ্গে রয়েছে তাঁর মিষ্টি সুর দেওয়ার ক্ষমতা এবং এ যদি না থাকত, কথার অপর্য্যাপ্ত সমারোহ নিয়ে তাঁর গান একদিনও দাঁড়াতে পারত না। ওস্তাদরা এ গান গেয়ে বা শুনে পূর্ণ তৃপ্তি লাভ না করতে পারেন, কিন্তু সংকীর্ণ পরিবেষ্টনীতে অল্প উপাদানে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুরে যে সুন্দর স্বরসংহতিগুলির সৃষ্টি করেছেন, নিরপেক্ষ হয়ে দেখলে তাতে আনন্দ পাওয়া কঠিন হবেনা। এই জন্যে রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে ওস্তাদী গানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকতে পারেনা, কারণ প্রত্যেকের রচনা ও সৌন্দর্য্য ভিন্ন-রীতির। এই সঙ্গে একটা কথা বিশেষ করে মনে হয় যে অনেক খ্যাতনামা হারমোনিয়ম-আশ্রয়ী ওস্তাদদের চেয়ে রবীন্দ্রনাথের সুরুচি জ্ঞান যে কত বেশী তার প্রমাণ তাঁর গানে হারমোনিয়ম ব্যবহারের বিরোধিতা।

তাঁর গানে কথার সঙ্গে সুরের অন্তরঙ্গতা আছে এমনিই শোনা যায় এবং একথা একটু ভেবে দেখা দরকার। কিছুদিন পূর্ব্বে কথা ও সুরের প্রসঙ্গে 'বঙ্গশ্রী'তে লিখেছিলাম "কথা ও সুরের মিতালি একেবারে থাকেনা এমন নয়। যেমন প্রশ্নসূচক বাক্যে :—উদাহরণ স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের 'কেন বাজাও কাঁকণ কণকণ কত ছল ভরে' গানের লাইনে 'কেন'র জায়গায় গানের সুরের টান আছে,

তার কিছু পরিমাণে কথার টানের সঙ্গে মিল দেখা যায়, কিন্তু আবৃত্তি করলে দেখতে পাওয়া যাবে, মিলের চেয়ে প্রভেদ কোন অংশে ন্যূন নয়। হিন্দি ঠুংরিতেও এইরকম চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক জায়গায় এ মিল দেখা যায়। 'নীপবনে' গানটিতে 'নীপবনে' 'ছায়াবীথি' 'স্নান', 'নব-ধারা-জলে' ইত্যাদি কথাগুলির ব্যঞ্জনা প্রকাশ করবার কোন নির্দ্দিষ্ট সুর-সংগতি নেই, প্রতিভা থাকলে রচয়িতা নানাভাবে তা প্রকাশ করতে পারেন, কিন্তু একাধারে শব্দ ও সুর-চয়নের প্রতিভা সংসারে দুর্লভ।" রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলাগান রচনা করতে হলে তাঁর অনুসরণ করা ছাড়া উপায় নেই। গানের বিষয়-বস্তু নিয়ে তাঁর কথার সৃষ্টি এত বিচিত্র ও ব্যাপক যে তাকে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। ভাষাও তত নয়, যত দুরতিক্রমণীয় তাঁর বলবার কথা। তবে কখনো কখনো যা একান্ত কবিতা তাতেও সুর দেওয়া হয়। কৃষ্ণকলি নামক গীত কবিতা তার দৃষ্টান্ত। ওস্তাদরা কথার প্রতি কর্ণপাত করেন না এমনিই জনশ্রুতি আছে, তবে ওস্তাদেরও এমন ক্ষণ আসে, যখন অন্ধকার রাত্রে সুরের চর্চ্চা ছেড়ে নিভৃতে গুণ গুণ করতে মন স্বতই উন্মুখ হয়—'বনে যদি ফুটল কুসুম, নেই কেন সেই পাখী।'

য়ুরোপীয় গীতরচয়িতাদের মধ্যে Schubert, Brahms বা Wolfর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনা হয় না কারণ তাঁরা ছিলেন সঙ্গীতে পাকা ওস্তাদ। তাঁদের গানে সাময়িক য়ুরোপীয় কণ্ঠসঙ্গীত পূর্ণ প্রসার লাভ করেছে এবং তাঁরা অন্যের তৈরি গানে সুর দিতেন। কবিরা নিজের গানে সুর দিয়েছেন এমন নজির কদাচিৎ পাওয়া যায় এবং এদিক থেকে Burns'র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কিছু মিল আছে—'In this one is strongly reminded of Robert Burns, who had a similar faculty of fitting words to a folk-tune or popular melody so faultlessly that it is difficult to believe that they ever existed apart from each other'—Gray। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের ধারা একান্ত ব্যক্তিগত এবং যাদের শব্দ ও সুরগ্রথনে প্রতিভা থাকবে তারাই তা রক্ষা করতে পারবে, কিন্তু এরকম লোক পৃথিবীতে বিরল। অবশ্য নকল কিছু হচ্ছে ও হবে। তাতে কিছু এসে যায় না। রবীন্দ্রনাথের গানে যা সত্যি বড় তা কোন না কোনরূপে সমস্ত গানে ছড়িয়ে পড়বে।

এবার যে সূত্রে এত কথা উঠল সেই 'স্বরবিতান' তৃতীয় ভাগ নিয়ে সামান্য দু এক কথা বলা যায়। স্বরবিতানে যে গানের স্বরলিপিগুলি দেওয়া হয়েছে, যে গানগুলি কবেকার, স্বরলিপি পূর্ব্বে প্রকাশিত কি না, এ সম্বন্ধে কোন ভূমিকা নেই বা তার কোন পরিচয়ও নেই। এগুলি থাকা উচিত ছিল। যে স্বরলিপি ব্যবহৃত হয় প্রত্যেক বইতে তার একটা সংক্ষিপ্ত নির্দ্দেশক থাকলে ভাল হত কারণ ভারতে এ পর্য্যন্ত সর্ব্বজন-অনুমোদিত স্বরলিপির এখনও চল হয়নি। পুরোনো স্বরলিপির পুস্তকে যা প্রকাশিত হত, তা কিছু বিস্তারিত ও পরিমার্জ্জিত করে পুনরায় প্রত্যেক স্বরলিপি-গ্রন্থে দেওয়া উচিত। স্বরলিপি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলবার নেই, তবে আমার মনে হয় এই তৃতীয় ভাগ এবং অন্যান্য ভাগে স্পষ্ট স্বরের (হিন্দুস্থানীকণ) জায়গায় কোন কোন স্থলে অর্দ্ধমাত্রার স্বর ব্যবহৃত হয়েছে। ছাপাখানার ঔদাসীন্যে মিড়ের চিহ্নগুলি সরল ও বক্ররেখার নানা বিচিত্র সমন্বয়ে তৈরি এবং প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য আছে। চারমাত্রার বেশী মিড়ের বোধ হয় কোথাও ব্যবহার নেই, কিন্তু এই স্বল্পসংখ্যক চিহ্ন যোগাড় করতে না পারা বিশ্বভারতীর সুবিখ্যাত ছাপাখানার পক্ষে অমার্জ্জনীয়। ছাপা কাগজ চলনসই।

হেমেন্দ্রলাল রায়

সমাজ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বিশ্বভারতী)

আধুনিক শ্রেষ্ঠ গল্প—শ্রীরমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত। (ভারতী-ভবন)

না—হীরালাল দাশগুপ্ত। অগ্রগতি পাব্লিশিং ওয়ার্কস্।

সমাজের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩১৫ সালে। এত দিন পরে এর পঞ্চম ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ বেরিয়েছে। 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা', 'ভারতবর্ষীয় বিবাহ', 'স্ত্রীশিক্ষা', 'নারীর মনুষ্যত্ব', 'সমুদ্র যাত্রা', 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' 'পূর্ব্ব ও পশ্চিম', 'হিন্দু বিবাহ' প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত প্রবন্ধগুলি এতে আছে। এই সব সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতের সঙ্গে সকলেরই পরিচয় থাকা দরকার। কবিতাই পড়তে হ'বে, অন্য কিছু নয়—এমন কোনো

কথা নেই। অননুকরণীয় ভাষার সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ যে-ভাবে তাঁর বক্তব্য বিষয়গুলি প্রকাশ করেছেন, তা বাস্তবিকই পরম উপভোগ্য।

রমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত আধুনিক শ্রেষ্ঠ গল্পে কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বনফুল, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু, সরোজকুমার রায়চৌধুরী ও স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্যের ছোট গল্প প্রকাশিত হয়েছে। গল্প নির্ব্বাচনে সম্পাদক মহাশয় নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন ব'লে মনে হয় না। প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের গল্পকে বাদ দিয়ে আধুনিক শ্রেষ্ঠ গল্পের সঞ্চয়ন বার করা যায় কিনা সন্দেহ। পুরোভাগে কেদার বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রমথ চৌধুরী আছেন। কিন্তু পরশুরাম, মণীন্দ্রলাল বসু নেই কেন? কেদার বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রমথ চৌধুরীর পিছনে যাঁরা মিছিল ক'রে এসেছেন, তাঁদের দলবদ্ধতাই পীড়াদায়ক হ'য়ে উঠেছে।

হীরালাল দাশগুপ্তের 'না' উৎকট আধুনিক কবিতার বই। 'না'-তে না আছে, এমন জিনিষই নেই। মহাকাল, সমুদ্র, জরায়ু, ঠোঁট, ক্লিওপাত্রা, কলিকাতা, কসাইখানা, উপনিষদ, শকুন্তলা রায় থেকে আরম্ভ ক'রে কবিতার মধ্যে অজস্র ইংরেজী শব্দ, উদ্ভট বাংলা বানান এবং মাঝে মাঝে গদ্যের প্যারা। ছন্দের উপর লেখকের তেমন অধিকার নেই, ভাষাও অপরিণত। তবু তাঁর দু'একটি কবিতা মোটের উপর খারাপ হয়নি, যথা 'কালের যাত্রা', 'কসাইখানা'। বইখানির ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই সুন্দর। প্রচ্ছদসজ্জাখানি কয়েকটি কবিতার মতোই অর্থহীন।

অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীগোবর্দ্ধন মণ্ডল কর্ত্তৃক আলেক্জান্ড্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত
ও শ্রীকৃষ্ণভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক ১১, কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত।

৮ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা
আশ্বিন, ১৩৪৫

পরিচয়

বসুবন্ধুর বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি*

পূর্ব্বপ্রবন্ধে বিজ্ঞানবাদের ক্রমবিকাশের কথা আলোচনা করা হইয়াছে। এইবার এই মতের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বসুবন্ধুর (জীবিতকাল আনুমানিক ৪০০ খৃঃ) "বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধিবিংশতিকা"য় (Sylvain Lévi কর্ত্তৃক প্রকাশিত) বিজ্ঞানবাদের যে চিত্র পাওয়া যায় তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিব। যে কোন দার্শনিক মতবাদের সম্যক্ পরিচয় পাইতে হইলে তৎসম্বন্ধে নানা জনের নানা কথা শ্রবণ করা অপেক্ষা সেই মতের প্রতিষ্ঠাতার নিজের কথার প্রতি মনোযোগ দেওয়াই নিশ্চয় শ্রেয়স্কর। বিজ্ঞানবাদ সম্বন্ধে অনেক কথাই হিন্দু দার্শনিকদের গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায়, এবং অধ্যাপক Hiriyanna প্রমুখ লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকগণও বিরুদ্ধপক্ষীয় হিন্দু দার্শনিকদের উক্তির উপরেই নির্ভর করিয়া তাঁহাদের গ্রন্থে বিজ্ঞানবাদের আলোচনা করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। কিন্তু ইহা হইতে বিজ্ঞানবাদের যে প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে না তাহা বলাই বাহুল্য। যেখানে জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে গ্রন্থসকল অতি বিস্তীর্ণ সেখানে অবশ্য সারসঙ্কলন করা ছাড়া গত্যন্তর নাই; এই কারণে বসুবন্ধুর ভ্রাতা অসঙ্গের মতবাদের সারসঙ্কলন করিয়াই আমাদের ক্ষান্ত থাকিতে হইবে। কিন্তু বসুবন্ধু মাত্র বিংশতিটি কারিকায় তাঁহার মতবাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া গিয়াছেন; সুতরাং সেগুলির সম্যক্ আলোচনা না করা আমাদের পক্ষে অন্যায় হইবে। এই কারিকাগুলির উপর বসুবন্ধুরই স্বরচিত বৃত্তি আছে, এবং এই বৃত্তি ব্যতীত কারিকাগুলি বুঝাও যায় না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে বসুবন্ধুর কারিকাসহ এই বৃত্তিরও

* Prabodh Basu Mullick Fellowship Lecture No. 2.

পরিচয় দেওয়া হইবে, কিন্তু বৃত্তির সম্যক্ আলোচনা করা এক্ষেত্রে সম্ভব হইবে না।

বিজ্ঞপ্তিমাত্রমেবৈতদসদর্থাবভাসনাৎ।
যথা তৈমিরিকস্তাসৎকেশচন্দ্রাদিদর্শনং ॥ ১ ॥ *

"বিজ্ঞান (consciousness) মাত্রেই এমন সব বস্তুর অবভাসনের (appearance) বিজ্ঞান যাহাদের প্রকৃত অস্তিত্বই নাই; (উপমা:—) চক্ষুরোগগ্রস্ত ব্যক্তি যেমন (যেখানে কেশ নাই সেখানেও) কেশ দেখিতে পায় বলিয়া মনে করে, এবং আকাশে (দুইটি) চন্দ্র উঠিয়াছে বলিয়া মনে করিয়া থাকে।"

একথায় প্রতিপক্ষ বলিবেন:—

যদি বিজ্ঞপ্তিরনর্থা নিয়মো দেশকালয়োঃ।
সন্তানস্যানিয়মশ্চ যুক্তা কৃত্যক্রিয়া ন চ ॥ ২ ॥

অর্থাৎ, যদি রূপাদি ব্যতিরেকেই রূপাদির বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, এবং কোন প্রকার অর্থের (substance) অপেক্ষাই তাহাতে না থাকে, তবে যে কোন স্থানে যে কোন দ্রব্য উৎপন্ন হয় না কেন? এবং একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানেই বা বস্তু যে কোন সময়ে উৎপন্ন না হইয়া বিশেষ সময়ে হয় কেন? অর্থের অপেক্ষা না করিয়াই যদি রূপাদির উৎপত্তি হয় তবে একই দেশ ও কালের অন্তর্গত সকল বস্তুরই একই প্রকার বিজ্ঞানক্ষণসন্তানের উদ্ভব হইবে, কোন একটি বিশেষ বস্তুর কোন বিশেষ বিজ্ঞানক্ষণসন্তান হইবে না। † কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় যে চক্ষুরোগ-গ্রস্তাদি ব্যক্তিরই কেবল কেশাদি ভ্রম ঘটিয়া থাকে, অন্য লোকের তাহা ঘটে না। (বিজ্ঞান যদি অবস্তুরই হয়) তবে কেন কেবল চক্ষুরোগগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষেই কেশভ্রমরাদিদর্শনজনিত কার্য্য সিদ্ধ হয় না, অপরের পক্ষে হয়? স্বপ্নে যে অন্ন, পান, বিষ, আয়ুধাদি দেখা যায়,—কেবল তাহাদেরই কেন অন্নাদি ক্রিয়া সিদ্ধ হয় না, অথচ অন্যত্র এরূপ ক্রিয়া সিদ্ধ হয়? সুতরাং দেখা যাইতেছে যে,

* যে পুঁথি হইতে অধ্যাপক লেভি বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধির প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে প্রথম পত্রটি না থাকায় প্রথম দুইটি কারিকাও পাওয়া যায় না। এ দুইটি তিনি তিব্বতী ও চীনা অনুবাদের সাহায্যে পুনর্গঠন করিয়াছেন মাত্র।

† তদ্দেশকালপ্রতিষ্ঠিতানাং সর্ব্বেষাং সন্তান উৎপত্ততে, ন কেবলমেকস্ত।

অর্থাভাব যদি সত্য হয় তবে দেশ ও কালের সাধারণত্ব, বিজ্ঞানসন্তানের বিশেষ বিশেষ বস্তুবিষয়ে বৈশিষ্ট্য, এবং সাধারণ ক্রিয়া সিদ্ধ হয় না। ইহাই গেল পূর্ব্বপক্ষ।

সিদ্ধান্তী এখন বলিতেছেন দেশকালাদিনিয়মের ব্যতিক্রম না ঘটিলেই যে বস্তুসত্তা প্রমাণিত হয় তাহা নহে, কারণ স্বপ্নেও তো দেশ ও কালের নিয়ম অক্ষুণ্ণই থাকে!—

দেশাদিনিয়মঃ সিদ্ধঃ স্বপ্নবৎ প্রেতবৎ পুনঃ।
সন্তানানিয়মঃ সর্বৈঃ পূযনদ্যাদিদর্শনে ॥ ৩ ॥

স্বপ্নবৎ, অর্থাৎ কি না স্বপ্নে যেমন হইয়া থাকে তদ্রূপ। তাহা কিরূপ? স্বপ্নে অর্থ (substance) ব্যতিরেকেও কোন একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানেই ভ্রমর, বাগান, স্ত্রী, পুরুষ প্রভৃতি দৃষ্ট হইয়া থাকে, সকল স্থানেই নহে। সুতরাং অর্থব্যতিরেকেও দেশকালাদিনিয়ম সিদ্ধ হইতে পারে। বিজ্ঞানসন্তানাবলীর* যে বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় তাহাও প্রেতবৎ (প্রেতবৎ পুনঃ সন্তানানিয়মঃ)। অর্থাৎ সমস্ত প্রেতগণই যেমন তুল্যরূপ কৃতকর্ম্মের ফলভোগবশতঃ (নরকদ্বারে উপস্থিত হইয়া) পূযপূর্ণ নদী প্রভৃতি দেখিতে পায়,—কাহারও এই অভিজ্ঞতা হইতে অব্যাহতি লাভ ঘটে না; এবং আরও দেখিতে পায় যে সেই পূয, মূত্র, পুরীষাদি পরিপূর্ণ (বৈতরণী নদীর তীরে) দণ্ডাসিধারী পুরুষগণ পাহারা দিতেছে,—সেইরূপেই মূলে বাস্তব কিছু না থাকিলেও বিজ্ঞানাবলীর সন্তানের বৈচিত্র্য সিদ্ধ হয়।—পার্থিব বিষয় বুঝাইবার জন্য নরকের উপমা দেওয়া বিস্ময়কর লাগিতে পারে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে বসুবন্ধুর নিকট পৃথিবীও ছিল স্বর্গ ও নরকের মতই সমভাবে অলীক। সুতরাং তাঁহার পক্ষে নরকের উপমা গ্রহণ করা অসঙ্গত নয়।

স্বপ্নোপঘাতবৎ কৃত্যক্রিয়া নরকবৎ পুনঃ।
সর্বং নরকপালাদিদর্শনে তৈশ্চ বাধনে ॥ ৪ ॥†

মূলে বাস্তব কিছু না থাকিলেও কার্য্য তাহা হইলে সিদ্ধই হয় বুঝিতে হইবে। কিরূপে সিদ্ধ হয়? "যথা স্বপ্নে দ্বয়সমাপত্তিমন্তরেণ শুক্রবিসর্গলক্ষণঃ

* সন্তান = Continuity। সন্তানানিয়ম = সন্তানের বৈচিত্র্য।

† শ্লোকটিতে যতিদোষ রহিয়াছে

স্বপ্নোপঘাতঃ”।* অন্যান্য দৃষ্টান্তদ্বারা দেশকালনিয়মাদিও এইরূপ সিদ্ধ করা যায়। ক্রিয়া যে স্বপ্নোপঘাতবৎ, তাহাই নহে, ইহা নরকবৎও বটে; অবাস্তব নরকের দ্বারে অবাস্তব নরকপ্রহরী লক্ষ্যগোচর হইয়াছে মনে করিয়া প্রেতগণ যেমন সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে, অর্থাৎ অবাস্তব বিষয় হইতেও বাস্তব ফল ভোগ করিয়া থাকে,—ক্রিয়াও তদ্রূপ। এই কথাই বসুবন্ধু বৃত্তিতে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতেছেন :—নরকদ্বারস্থ প্রেতগণের নরকপ্রহরীদর্শন প্রভৃতি কার্য্যে যেমন দেশকালাদিনিয়মের ব্যতিক্রম হয় না, এবং (সেখানে) বায়স, সারমেয় ও অয়োময় পর্ব্বতাদির গমনাগমনও তাহাদের কয়েকজন মাত্র নয়, সকলেই, দেখিতে পায়, এবং দেখিতে পাইয়া ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে, যদিও প্রকৃতপক্ষে নরকপ্রহরী প্রভৃতির অস্তিত্বই নাই, এবং সমস্ত (ভ্রান্তিই) কর্ম্মবিপাকবশতঃ একই পন্থায় ঘটিয়া থাকে। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে অন্যান্য স্থলেও ঐ উপায়েই দেশকালাদি নিয়ম সিদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু নরকপ্রহরী, সারমেয়, বায়স প্রভৃতি বাস্তব হইতে ক্ষতি কি? তাহা অসম্ভব, কারণ তাহা হইলে তাহারাও নরকস্থ জীব হইয়া পড়িবে, অথচ দুঃখানুভূতি তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে (দুঃখাপ্রতিসংবেদনাৎ)। আরও কথা এই যে, ইহারা যদি পরস্পরকে এইরূপ যন্ত্রণাই দিতে থাকিবে তবে নরকপ্রহরী ও নারকীয় জীবের মধ্যে ভেদ কোথায় রহিল? তাহারা যদি আকৃতি, প্রমাণ ও বলে সমতুল্য হইয়া পরস্পরকে যাতনা দিতে সমর্থ হয় তবে (নরকপ্রহরীকে) কেহ ভয়ও করিবে না। প্রদীপ্ত অয়োময় ভূমিতে অবস্থানজন্য নিজেরা দাহদুঃখ অনুভব না করিয়া নরকপ্রহরীগণ অপর সকলকেই বা কিরূপে যন্ত্রণা দিতে সমর্থ হইবে? আরও বিবেচ্য এই যে, যাহারা নারকীয় নহে তাহাদেরও এইরূপ স্থলে নরকবাস সিদ্ধ হইয়া পড়ে,—তাহাই বা কিরূপে সম্ভব? তির্য্যক্ প্রাণীদের স্বর্গবাস যেরূপে হইতে পারে, সেইরূপে তির্য্যক্ প্রেতবিশেষেরও নরকরক্ষী প্রভৃতি হওয়া সম্ভব নহে। এই কথাই পরবর্ত্তী কারিকায় বলা হইতেছে :—

তিরশ্চাং সম্ভবঃ স্বর্গে যথা ন নরকে তথা।
ন প্রেতানাং যতস্তজ্জং দুঃখং নানুভবন্তি তে ॥ ৫ ॥

* সঙ্গতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া "স্বপ্নোপঘাত" কথাটির অন্য অর্থ করাও সম্ভব; কিন্তু বসুবন্ধু স্বয়ং যখন এই অর্থ করিয়াছেন তখন তাহাই আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে।

অর্থাৎ, স্বর্গে তির্য্যক্ যোনিস্থ জীবগণের যেরূপে উৎপত্তি হয় নরকে সেরূপে হয় না। প্রেতগণের (উৎপত্তি নরকে হয় না) কারণ তাহারা নরকের দুঃখ সকল অনুভব করে না।

তির্য্যক্‌যোনিস্থ যে সকল জীব স্বর্গে উৎপন্ন হয়, তাহারা স্বর্গসুখভোগরূপ ফলদায়ক কর্ম্মদ্বারাই সেখানে জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ অনুভব করিয়া থাকে। নরকপ্রহরীগণ কিন্তু উক্ত পন্থায় নরকদুঃখ ভোগ করে না। সুতরাং নরকে তির্য্যক্‌যোনিস্থ প্রাণিগণের বা প্রেতগণের উৎপত্তি সম্ভব নয়। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে নরকস্থ জীবগণের কর্ম্মাবলীর দ্বারাই তথায় ভূতবিশেষের উৎপত্তি হয়, এবং তাহারাই বর্ণ, আকৃতি, প্রমাণ ও বলবিশিষ্ট হইয়া নরকরক্ষী প্রভৃতি সংজ্ঞালাভ করিয়া থাকে। এই সকল নরকরক্ষীদের পরিবর্ত্তনও ঘটিয়া থাকে (পরিণমন্তি), কারণ ভয়োৎপাদনের জন্য তাহাদিগকে হস্তপদাদি সঞ্চালন করিতেও দেখা যায়। সুতরাং এই সকল ব্যাপার অবাস্তব হইলেও যে ঘটে না তাহা নহে (ন তে ন সংভবন্ত্যেব)।

যদি তৎকর্মভিস্তত্র ভূতানাং সংভবস্তথা।
ইষ্যতে পরিণামশ্চ কিং বিজ্ঞানস্য নেষ্যতে ॥ ৬ ॥

অর্থাৎ, কর্ম্মাবলীর* দ্বারাই যদি ভূতগণের উৎপত্তি ও পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, তবে সেই উৎপত্তি ও পরিণাম যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই সংঘটিত হয় না—তাহা মনে করিবার কি কারণ আছে? মনে করিয়া লওয়া যাউক না কেন যে কর্ম্মাবলীর দ্বারা বিজ্ঞানেরই এই সকল পরিণাম ঘটিতেছে, ভূতাবলী কল্পনা করার প্রয়োজন কি? আরও কথা এই যে,

কর্ম্মণো বাসনান্যত্র ফলমন্যত্র কল্প্যতে।
তত্রৈব নেষ্যতে যত্র বাসনা কিং নু কারণং ॥ ৭ ॥

এইটি অতি প্রয়োজনীয় কথা। ইহার অর্থ, "তাহা হইলে দাঁড়ায় এই যে কর্ম্মের বাসনা হয় একজনের কিন্তু সেই কর্ম্মের ফলভোগ করে অপরে; যেখানে বাসনা সেইখানেই ফল,—ইহা স্বীকার না করিবার কি কারণ আছে?" কিন্তু

* মনে রাখিতে হইবে যে অপর সমস্ত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মত বিজ্ঞানাবাদীগণও কর্ম্মবাদে সম্পূর্ণ আস্থাশীল। বিজ্ঞানক্ষণসন্ততি যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে তাহার কারণই এই কর্ম্ম।

এমন কি পদার্থ আছে যাহা কর্ম্মবাসনা ও কর্ম্মফল এই উভয়েরই সন্নিহিত? তাহা হইল বিজ্ঞান। এই কথাই বৃত্তিতে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে :—

যে কর্ম্মদ্বারা নারকীয় ভূতাবলীর উৎপত্তি ও পরিণাম সংঘটিত হয়, তাহাদের সেই কর্ম্মের বাসনা কেবল বিজ্ঞানসন্তানেই সন্নিবিষ্ট, অন্য কোথাও নহে। যেখানে বাসনা সেইখানেই তাহার ফল, এবং তদনুযায়ী পরিণাম কেবল বিজ্ঞানেরই ঘটিয়া থাকে,—ইহা কেন না স্বীকার করা হইবে? যেখানে বাসনা নাই সেখানে তাহার ফল কল্পনা করার কি কারণ?

পূর্ব্বপক্ষী ইহাতে বলিতে পারেন, শাস্ত্রই ইহার কারণ (আগমঃ কারণম্)। বিজ্ঞানমাত্রই যদি রূপাদির অভিব্যক্তির কারণ হয়, এবং রূপাদি কোন সদ্বস্তু কিছু না থাকে, তবে ভগবান্ বুদ্ধদেব রূপাদি আয়তনের কথা বলিতেন না।

কিন্তু একথা অযৌক্তিক (অকারণমেতৎ), যেহেতু :—

রূপাদ্যায়তনাস্তিত্বং তদ্বিনেয়জনং প্রতি।
অভিপ্রায়বশাদুক্তমুপপাদুক*সত্ত্ববৎ ॥ ৮ ॥

অর্থাৎ, রূপাদি আয়তনের কথা কেবল শিক্ষার্থিদের অববোধনার্থেই বলা হইয়াছে,—দিব্য পুরুষদের কথা যেমন বুদ্ধদের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই বলিয়া গিয়াছেন। যে অভিপ্রায় লইয়া তিনি আয়তনাদির কথা বলিয়াছেন তাহা এই যে নিরবচ্ছিন্ন গতিতে বিজ্ঞানসন্ততি প্রবাহিত হইতেছে। শাস্ত্রবচনও আছে—"নাস্তীহ সত্ত্ব আত্মা বা ধর্ম্মাস্ত্বেতে সহেতুকাঃ", অর্থাৎ জগতে সত্ত্বও নাই আত্মাও নাই,—আছে কেবল হেতুযুক্ত ধর্ম্মসকল।** সুতরাং বুঝা যাইতেছে, রূপাদি আয়তনের অস্তিত্বের কথা যে বুদ্ধদেব বলিয়াছেন তাহা কেবল প্রকৃত তত্ত্ব যাহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ তাহাদের জন্যই।

যতঃ স্ববীজাদ্বিজ্ঞপ্তির্যদাভাসা প্রবর্ত্ততে।
দ্বিবিধায়তনত্বেন তে তস্যা মুনিরব্রবীৎ ॥ ৯ ॥

এই কারিকাটি অত্যন্ত অস্পষ্ট। ইহার স্থূলার্থ খুব সম্ভব এই যে, বিজ্ঞপ্তি

* উপপাদুক—স্বয়ংভূ। ** 'ধর্ম্ম' কথাটির অর্থ এখানে 'অবস্থা' ধরিতে হইবে।

স্ববীজ হইতে উৎপন্ন হইয়া (বস্তু সকলের) আভাসরূপে প্রতীয়মান হয়, কারণ বুদ্ধদেব বলিয়াছেন যে দ্বিবিধ আয়তনের জন্যই বিজ্ঞপ্তির এই সকল অবভাস ঘটিয়া থাকে।

ইহার বৃত্তিতে বলা হইয়াছে :—বিশিষ্ট রূপদ্যোতক বিজ্ঞপ্তি একটি বিশেষ পরিণামে পর্য্যবসিত স্ববীজ হইতেই উৎপন্ন হয়; এই বীজ এবং বিজ্ঞপ্তির ঐ অবভাস,—এই উভয়ই প্রকাশ করিবার জন্য বুদ্ধদেব বিজ্ঞপ্তির একই সঙ্গে দ্রষ্টৃত্ব ও দৃষ্টত্বের কথা বলিয়া গিয়াছেন।* স্পর্শবিষয়ক প্রতিভাসেরও উৎপত্তি হয় এইরূপে,—অর্থাৎ, স্পর্শানুভূতির বীজও একটি বিশেষ পরিণামে পর্য্যবসিত হইলে তাহা হইতে তদ্বিষয়ক বিজ্ঞপ্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পূর্ব্বপক্ষী এখন বলিতেছেন, যদি ধরিয়াও লওয়া যায় যে ইহাই বুদ্ধদেবের অভিপ্রায় ছিল, তাহাতেই বা লাভ হইল কি? তাহার উত্তর :—

তথা পুদ্গলনৈরাত্ম্যপ্রবেশো হ্যন্যথা পুনঃ।
দেশনা ধর্ম্মনৈরাত্ম্যপ্রবেশঃ কল্পিতাত্মনা ॥ ১০ ॥

এইরূপ উপদেশের ফল এই যে এতদ্দ্বারা পুদ্গলনৈরাত্ম্য (essencelessness) অববোধনের পথ সুগম হইল। (বিজ্ঞপ্তি ও অবভাস) এই দুই হইতেই ছয় প্রকারের (অর্থাৎ ষড়ায়তনের) বিজ্ঞান উদ্ভূত হয়। কোন দ্রষ্টা বা মন্তার আসলে কোন অস্তিত্বই নাই,—ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া যাহারা পুদ্গলনৈরাত্ম্য বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকে তাহারাই সেই বিষয়ে প্রবেশ লাভ করিতে সমর্থ হয়।

কিন্তু এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তিমাত্রতারই অববোধন, হউক, ধর্ম্মনৈরাত্ম্য সম্বন্ধে প্রতিপত্তি তাহা হইতে জন্মাইবে কেন? ইহার উত্তর, বিজ্ঞপ্তিমাত্রই রূপাদি ধর্ম্মের প্রতিভাস রূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে, কারণ জানাই আছে যে রূপাদিলক্ষণ ধর্ম্ম আসলে কিছুই নাই (ন তু রূপাদিলক্ষণো ধর্ম্ম কোঽপ্যস্তীতি বিদিত্বা)।

এখন প্রশ্ন, কোন কিছুরই যদি অস্তিত্ব না থাকে তবে বিজ্ঞপ্তিরই বা অস্তিত্ব থাকিবে কেন? ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, কোন প্রকার ধর্ম্ম নাই এই

* এই অনুবাদ আনুমানিক মাত্র, কারণ বৃত্তির ভাষাও এখানে অত্যন্ত অস্পষ্ট :—তচ্চ বীজং যৎপ্রতিভাসা চ সা তে তস্যা বিজ্ঞপ্তেশ্চক্ষুরূপায়তনত্বেন যথাক্রমং ভগবানব্রবীৎ।

বোধ জন্মিলেই যে ধর্ম্মনৈরাত্ম্য উপলব্ধি করা যায় তাহা নহে। বালবুদ্ধি ব্যক্তিগণ যে ধর্ম্মাবলীর গ্রাহ্যগ্রাহকাদি স্বভাব কল্পনা করিয়া থাকে সেই কল্পনার আত্মার সম্বন্ধেই কেবল ধর্ম্মাবলীর নৈরাত্ম্য বুঝিতে হইবে, বুদ্ধগণের উপলব্ধ অনির্ব্বচনীয় আত্মার পক্ষে কিন্তু নহে।* এক বিজ্ঞপ্তির নৈরাত্ম্যের উপলব্ধির জন্য যখন অপর এক বিজ্ঞপ্তির উপর নির্ভর করিতে হয় তখন সর্ব্বত্র বিজ্ঞপ্তি মাত্রই স্বীকার করিলে তবে সর্ব্ব ধর্ম্মের নৈরাত্ম্য উপলব্ধি করা যায়; বিজ্ঞপ্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে যায় না। অপর দিকে, একটি বিজ্ঞপ্তির উপলব্ধির জন্য যদি অপর এক বিজ্ঞপ্তির উপর নির্ভর করিতে হয় (অর্থাৎ "আমি একটি বিশেষ বস্তু জানি" এই সমুদয় জ্ঞানটিকে object রূপে গ্রহণ করিবার জন্য আবার যদি এক নূতন subject-এর প্রয়োজন হয়) তাহা হইলে বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা আর সিদ্ধ হয় না, কারণ তখন এইখানে বিজ্ঞপ্তির বিশেষ বিশেষ অর্থ আসিয়া পড়িবে (অর্থবতীত্বাৎ বিজ্ঞপ্তীনাং)।—পরবর্ত্তী যুগের দার্শনিকগণ বসুবন্ধুর এই যুক্তি গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদের মতে বস্তুর বিজ্ঞান ও সেই বিজ্ঞানের বিজ্ঞান একই সঙ্গে সঙ্ঘটিত হয়। ইহার নাম সহোপলম্ভবাদ।

ন তদেকং ন চানেকং বিষয়ঃ পরমাণুশঃ।
ন চ তে সংহতা যস্মাৎ পরমাণুর্ন সিধ্যতি ॥ ১১ ॥

এই কারিকাটির বিশদ আলোচনা প্রয়োজন, কারণ এখানে স্পষ্টতঃই বৈশেষিক দর্শনের প্রতি আক্ষেপ করা হইতেছে। কারিকাটির অর্থ, "বস্তু একটি মাত্র অণুদ্বারাও গঠিত নয়, একাধিক অণুদ্বারাও গঠিত নয়; বস্তু যে বিভিন্ন পরমাণুর সংহতি,—তাহাও নয়, কারণ পরমাণুর নিজেরই পৃথক অস্তিত্ব নাই।" পরমাণুর অস্তিত্ব অস্বীকার করাই হইল এখানে বসুবন্ধুর উদ্দেশ্য। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে তখন পরমাণু হইতে বস্তুর উৎপত্তি বিভিন্ন উপায়ে সিদ্ধ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। প্রথম মতে, বস্তুর সত্তা পরমাণুর সহিত তাহার অনন্যত্বের উপরেই নির্ভর করে; ইহাই বৈশেষিকগণের মত, কারণ তাঁহারা অণু ও বস্তুর মধ্যে অবয়ব ও অবয়বীর সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া থাকেন।† দ্বিতীয় মত

* ন তু অনভিলাপ্যেনাত্মনা যো বুদ্ধানাং বিষয়ঃ। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই বেদান্তের অনির্ব্বচনীয় খ্যাতির আভাষ পাওয়া যাইতেছে।

† একং বা ত্বান্তখাবয়বিরূপং কল্প্যতে বৈশেষিকৈঃ।

এই যে বিভিন্ন বস্তু বিভিন্ন প্রকার পরমাণু হইতে উৎপন্ন। এই মতে তাহা হইলে বিভিন্ন বস্তুর পার্থক্য তাহাদের পরমাণুর পার্থক্যের উপরেই নির্ভর করিতেছে। তৃতীয় মতে বস্তুজগৎ পরমাণুর সংহতি (organic compound) হইতে উৎপন্ন।

বসুবন্ধু কিন্তু এই তিন প্রকার মতই প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন যে পরমাণু হইতে বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে না, কারণ অবয়বসমষ্টি হইতে পৃথকরূপে অবয়বীকে কখনই প্রত্যক্ষ করা যায় না। অর্থাৎ সমজাতীয় অণ্বাবলীর সমবায়ের ফলেই যদি বস্তুর উৎপত্তি হয় তবে বস্তু হইল অবয়বী এবং অণু হইল তাহার অবয়ব। এ ক্ষেত্রে অবয়বীটি প্রত্যক্ষগোচর হইতেছে অথচ কোন অবয়ব প্রত্যক্ষগোচর হইতেছে না ইহা কিরূপে সম্ভব? বহু পরমাণুর সমবায়ের ফলেও বস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে না, কারণ একক ভাবে পরমাণু কখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারে না (প্রত্যেকমগ্রহণাৎ)। অর্থাৎ যখনই আমরা বলি যে বহু পরমাণুর সমবায়ে কোন বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে তখন অবশ্যই ধরিয়া লওয়া হইয়া থাকে যে এক একটি পরমাণুর পৃথক অস্তিত্বও আছে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে এক একটি পরমাণুর পৃথক অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই। আর পরমাণু সকল যে সংহত হইয়া বিষয় উৎপাদন করিয়া থাকে তাহাও বলা যায় না, কারণ পরমাণু একক, তাহা দ্রব্য রূপে সিদ্ধ হয় না।

বসুবন্ধুর এই আলোচনা হইতে মনে হয় যে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে সংখ্যার যে অর্থ দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহার যুগে খুব সম্ভব তাহা অজ্ঞাত ছিল। বৈশেষিকগণ বলেন না যে পৃথক দুইটি পরমাণুর সামান্য সংযোগের ফলেই একটি দ্ব্যণুকের সৃষ্টি হয়। তাঁহারা বলেন, অণুত্বে দ্বিত্ব সংযুক্ত হইয়াই দ্ব্যণুকের সৃষ্টি করে। এইরূপে মস্তক প্রদক্ষিণ করিয়া নাসিকা দেখাইবার কারণ কি? কারণ এই:— সকল বস্তুর ধর্ম্ম হইল এই যে সমজাতীয় বস্তুর সহিত সম্মিলিত হইলে তাহাতে জাতিগত ধর্ম্মের প্রাবল্যই পরিলক্ষিত হয়। যেমন হস্তীর একটি প্রধান গুণ তাহা ভারবিশিষ্ট; সেই জন্য দুইটি হস্তীর সমবায় যদি ঘটে তবে ভারের বৃদ্ধিই ঘটিবে, ন্যূনতা ঘটিবে না। এখন ভার যেমন হস্তীর গুণ, ক্ষুদ্রতা ও লঘুতা সেইরূপ পরমাণুর গুণ। সুতরাং যে যুক্তিতে দুইটি হস্তী একটি হস্তী অপেক্ষা অধিক ভারবিশিষ্ট সেই যুক্তিতেই দুইটি অণু একটি অণু অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর ও লঘুতর হইবে। কিন্তু দুইটি পরমাণু (=দ্ব্যণুক) একটি পরমাণু অপেক্ষা

ক্ষুদ্রতর হইতে পারে না কারণ পরমাণু অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বা লঘুতর কিছু নাই। সুতরাং দুইটি বিভিন্ন পরমাণু সংযুক্ত হইয়া একটি দ্ব্যণুকের সৃষ্টি করে একথা বলা যায় না। বলিতে হইবে অণুত্বে দ্বিত্ব সংযুক্ত হইয়া যে অভিনব বস্তুর সৃষ্টি করে তাহার নাম দ্ব্যণুক ; অর্থাৎ hydrogen ও oxygen মিলিত হইয়া যেরূপ জলে পরিণত হয় পরমাণু ও দ্বিত্ব নামক দুইটি পদার্থ সম্মিলিত হইয়াও সেইরূপ দ্ব্যণুকের সৃষ্টি করিয়া থাকে।

একই প্রকার পরমাণু যে কেন দ্রব্যরূপে সিদ্ধ হয় না তাহাই বসুবন্ধু পরবর্ত্তী কারিকায় বলিতেছেন ঃ—

ষট্‌কেন যুগপদ্ যোগাৎ পরমাণোঃ ষড়ংশতা।
ষণ্ণাং সমানদেশত্বাৎ পিণ্ডঃ স্যাদণুমাত্রকঃ ॥ ১২ ॥

অর্থাৎ, বস্তু যদি মধ্যস্থিত একটি পরমাণুতে ছয় দিক হইতে সমাগত ছয়টি পরমাণুর সহযোগে উৎপন্ন হয় তাহা হইলে পরমাণুর ছয়টি বিভিন্ন অংশ স্বীকার করিতে হইবে ; আর ছয়টি পরমাণু যদি সমদেশীয় হয় তাহা হইলে বস্তু অণুমাত্রেই পর্য্যবসিত হইবে।

একাধিক পরমাণুর সংযোগ বা সংস্থাপন স্বীকার করার অর্থই হইল এক একটির তদনুরূপ অংশ স্বীকার করা, নতুবা সংযোগ সম্ভবই হইবে না। অথচ বৈশেষিকগণ পরমাণুকে নিরবয়ব বলিয়া থাকেন। ষড়ংশত্ব ও নিরবয়বত্ব কখনই একত্র পরমাণুতে সমন্বিত হইতে পারে না। ইহার উত্তরে অবশ্য বলা যাইতে পারে যে ছয়টি পরমাণুই মধ্যস্থ পরমাণুর সহিত একই স্থানে অবস্থিত হইতে পারে, সুতরাং তাহাদের সাবয়ব হইবার প্রয়োজন নাই (য এবৈকস্য পরমাণোর্দ্দেশঃ স এব ষণ্ণাং)। কিন্তু একথাও বলিবার উপায় নাই, কারণ সমস্ত পরমাণু সমদেশস্থ হইলে সকল বস্তুই অণুমাত্রে পরিণত হইবে (সর্বেষাং সমানদেশত্বাৎ সর্ব্বঃ পিণ্ডঃ পরমাণুমাত্রঃ স্যাৎ)। অর্থাৎ পরমাণুর যদি কোন বিস্তৃতি না থাকে তবে পরমাণুসংহতি যে পিণ্ড,—তাহারই বা বিস্তৃতি থাকিবে কেন ? কোন পিণ্ডই তাহা হইলে দৃশ্য হইবে না।

এই দুই যুক্তির দ্বারাই বসুবন্ধু বৈশেষিকগণের পরমাণুবাদের প্রত্যাখ্যান করিলেন। বস্তুর অংশ বিভাগ করিতে করিতেই বৈশেষিকগণ পরমাণুতে

আসিয়া পৌঁছিয়াছেন ; কিন্তু এই বস্তুর যেহেতু বিস্তৃতি আছে পরমাণুরও সেই হেতু বিস্তৃতি স্বীকার করিতে হইবে। আর পরমাণু যদি সাবয়ব বস্তুরই অংশ মাত্র হয় তবে সেই অংশেরও সাবয়বত্ব স্বীকার করিতে হইবে ; কিন্তু পরমাণু কখনও সাবয়ব হইতে পারে না।

কিন্তু একথারও উত্তর দেওয়া চলে। বৈশেষিকগণ বলিতে পারেন বস্তু অংশবিশিষ্ট বলিয়াই যে বস্ত্বংশগুলি, অর্থাৎ পরমাণু সকল, বস্তুনিরপেক্ষ অবস্থাতেও পৃথক ভাবে বর্ত্তমান ছিল তাহা ধরিয়া লইবার কি কারণ আছে ? প্রকৃত পক্ষে একথা মনে করিবার কোনই কারণ নাই যে বস্তুর উৎপত্তির পূর্ব্বেই তাহার অংশস্বরূপ এই পরমাণুগুলি কোন কালে স্বতন্ত্রভাবে বর্ত্তমান ছিল। পরমাণু সর্ব্বত্র সংহত অবস্থাতেই দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং ইহাকেই তাহাদের আদিম অবস্থা বলিয়া স্বীকার করিয়া লই না কেন ? বিচার-মুখে বস্তুবিভাগ করিতে করিতে শেষে সেই পরমাণুতেই গিয়া পৌঁছিতে হয় ইহা সত্য, কিন্তু সেই পরমাণুর এক একটি যে স্বতন্ত্রভাবে কখন বর্ত্তমান ছিল তাহা ধরিয়া লইবার আবশ্যকতা নাই। বসুবন্ধু বলিতেছেন যে ইহাই ছিল কাশ্মীর-দেশীয় বৈভাষিকদের মত (সংহতাস্তু পরস্পরং সংযুজ্যন্ত ইতি কাশ্মীর-বৈভাষিকাঃ)। কিন্তু তাহাদের প্রতি বক্তব্য এই (ত ইদং প্রষ্টব্যাঃ) যে পরমাণুগণের সংহতি সেই অন্বাবলী হইতে পৃথক্ কোন বস্তু নহে (যঃ পরমাণুনাং সংঘাতো ন স তেভ্যোঽর্থান্তরম্)।

বৈশেষিকগণ আপত্তি তুলিয়াছেন যে সংঘাতাবস্থাই অণ্বাবলীর আদিম অবস্থা। এই যুক্তি খণ্ডনের জন্য বসুবন্ধু বলিতেছেন ঃ—

পরমাণোরসংযোগে তৎসংঘাতেঽস্তি কস্য সঃ।
ন চানবয়বত্বেন তৎসংযোগো ন সিধ্যতি ॥ ১৩ ॥

অর্থাৎ, বিভিন্ন পরমাণু যদি অসংযুক্তই হয় তবে তাহাদের সংঘাত কিরূপে সম্ভব হইবে। আর পরমাণু নিরবয়ব বলিয়া যে অণ্বাবলীর সংযোগ সিদ্ধ হইবে না তাহা নহে। পরমাণুর সংযোগ (mixture) হইতেই যদি সংঘাত (compound) উৎপন্ন না হইয়াও থাকে, তাহা হইলেও একথা বলা যায় না যে যেহেতু পরমাণু নিরবয়ব সেই হেতু সংযোগ সম্ভব নহে। অর্থাৎ পরমাণুর

নিরবয়বত্ব ও অণ্বাবলীর সংযোগের মধ্যে কোন সম্বন্ধই নাই। কারণ সংঘাত সাবয়ব হইলেও অণ্বাবলীই যে সংহত হইয়াছে তাহা বলা যায় না।* সুতরাং পরমাণুর সংযোগ স্বীকার করা হউক আর নাই হউক দ্রব্যরূপে পরমাণু কিছুতেই সিদ্ধ হয় না।

বসুবন্ধুর এই কথাগুলি ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা দরকার। পূর্ব্বপক্ষী বলিয়াছেন যে সংহতাবস্থাই পরমাণুর আদ্যবস্থা হইতে পারে। ইহার উত্তরে বসুবন্ধু যে প্রশ্ন করা উচিত তাহাই করিয়াছেন :—বিভিন্ন পরমাণুই যদি সংহত না হয় তবে সংঘাত হয় কিসের ? বৈশেষিক যদি বলেন যে পরমাণুর বিস্তৃতি নাই তবে তাহার উত্তর এই যে নিরবয়ব হওয়ার জন্য পরমাণু যদি বিস্তৃতিবিহীন হয় তবে বিস্তৃতিবিশিষ্ট কোন বস্তুই পরমাণুর সংঘাত হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, পূর্ব্বপক্ষী যে ধরিয়া লইয়াছেন যে বস্তু নিরবয়ব হইলেই তাহার বিস্তৃতি থাকে না,—তাহাতেই বসুবন্ধুর আপত্তি ; অর্থাৎ তাঁহার মতে বস্তু নিরবয়ব হইলেও তাহার বিস্তৃতি থাকিতে পারে। বাস্তবিকও, নিরবয়বত্ব ও বিস্তৃতিহীনতা সমজাতীয় জ্ঞান নহে। প্রথমতঃ, বস্তুর সাবয়বত্ব বস্তুটির উপরেই প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু বস্তুর বিস্তৃতি নির্ভর করে spaceএর উপর। সুতরাং বস্তুর নিরবয়বত্ব আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে না পাইলেও অনুমান করিতে পারি, বিশেষ যখন দেখিতেও পাওয়া যায় যে বিভাগবশতঃ বস্তু সর্ব্বাবস্থাতেই ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া পড়িতে পারে। কিন্তু বস্তু যে কখনও বিস্তৃতিহীন হইতে পারে তাহা কল্পনাও করা যায় না। অর্থাৎ বস্তুর সাবয়বত্ব empirical, কিন্তু তাহার বিস্তৃতি metaphysical। এই দুই প্রকারের জ্ঞান হইল সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয় ; সুতরাং এতদ্দ্বয়ের একটি যে অপরটির উপর নির্ভর করিবে,—একথা মনে করা অযৌক্তিক। অতএব বস্তু নিরবয়ব হইলেই যে তাহার বিস্তৃতি থাকিতে পারে না তাহা বলিতে পারা যায় না। এই সূক্ষ্ম যুক্তি প্রয়োগ করিয়া বসুবন্ধু বৈশেষিক মত খণ্ডন করিলেন। বসুবন্ধু অবশ্য কথাটি আদৌ এত স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই ; কিন্তু তাঁহার অস্পষ্ট ভাষার ইহা ভিন্ন আর কি অভিপ্রায় হইতে পারে তাহা বুঝিতে পারা দুষ্কর।

* ইহাই বসুবন্ধুর প্রকৃত উদ্দেশ্য কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে, কারণ ভাষা এখানে বড়ই অস্পষ্ট :—সাবয়বত্বাপি হি সংঘাতস্য সংযোগানভ্যুপগমাৎ।

দিগ্‌ভাগভেদো যস্যাস্তি তস্যৈকত্বং ন যুজ্যতে।
ছায়াবৃতী কথং বান্যো ন পিণ্ডশ্চের তস্য তে ॥ ১৪ ॥

এখানেও বসুবন্ধু পরমাণুবাদের বিরুদ্ধে আরও যুক্তি দেখাইতেছেন :—যে বস্তুর বিভিন্ন দিক্ বা ভাগ পৃথক্ করা যায় তাহার "একত্ব" সিদ্ধ হইতে পারে না। পরমাণুর পূর্ব্ব দিকের অংশ অধোদিক্ পর্য্যন্ত অন্যান্য অংশ হইতে পৃথক হইলেও পরমাণুর একত্ব অসিদ্ধই হয়। কিন্তু এক একটি পরমাণুর বিভিন্ন দিগ্‌ভাগ যদি না থাকে তবে ইহা কিরূপে সম্ভব যে সূর্য্যোদয়কালে যেদিকে সূর্য্য তাহার অপর দিকে ছায়া হয় ? কিন্তু পরমাণুর এমন কোন দিক নাই যেদিকে রৌদ্র পতিত হয় না। একটি পরমাণুদ্বারা অপর পরমাণুর আবরণই বা কিরূপে সিদ্ধ হয়, যদি পরমাণুর বিভিন্ন দিগ্বিশিষ্টতা স্বীকার না করা যায় ! পরমাণুর এমন কোন দিক নাই যে দিক হইতে সঙ্গত হইলে সেই পরমাণুর সহিত অপর পরমাণুর প্রতিঘাত ঘটিতে পারে। আর প্রতিঘাত যদি না ঘটে তবে সমস্ত পরমাণুই সমদেশবর্ত্তী হইয়া পড়িবে এবং তজ্জন্য সমস্ত বস্তুই বিন্দুমাত্রে পরিণত হইবে।

ইহার পরেই বসুবন্ধু সম্পূর্ণ একটি নূতন বিষয়ের অবতারণা করিতেছেন :—বস্তুর রূপাদি লক্ষণই যদি সিদ্ধ হইয়া যায় তবে পরমাণু, সংঘাত প্রভৃতি কল্পনা করার কি প্রয়োজন ? বস্তুর লক্ষণ দৃশ্যাদিত্ব ও নীলাদিত্ব। এখন প্রশ্ন নীল-পীতাদি যে সকল বিষয় চক্ষুরাদির গোচর হয়, তাহা একই দ্রব্য না বহু। যদি বহু হয় তবে বৈশেষিকগণের যুক্তি খণ্ডনোপলক্ষে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে এখানে তদতিরিক্ত আর কিছু বলিবার নাই। যদি তাহা একটি মাত্র বিষয় হয় তবে বক্তব্য :—

একত্বে ন ক্রমেণেতির্যুগপন্ন গ্রহাগ্রহৌ।
বিচ্ছিন্নানেকবৃত্তিশ্চ সূক্ষ্মানীক্ষা চ নো ভবেৎ ॥ ১৫ ॥

অর্থাৎ, যাহা কিছু দৃষ্টিগোচর হয় তাহা যদি অবিচ্ছিন্ন ও একবস্তু মাত্র হয় তাহা হইলে পৃথিবীতে গতিই আর সম্ভব হয় না, কারণ একটি পদক্ষেপেই তাহা হইলে সর্ব্বত্র গমন সিদ্ধ হইয়া যায় (সকৃৎপাদক্ষেপেণ সর্ব্বস্য গতত্বাৎ)। বস্তুজগতের একত্ব সত্য হইলে বস্তুর পূর্ব্বভাগ ও পশ্চাদ্ভাগ একই সঙ্গে গ্রহণ করা যাইত, কিন্তু তাহা তো সম্ভব নহে। দেখিতে পাওয়া যায় হস্ত্যশ্বাদি বিবিধ

জন্তু পৃথক্ স্থানে পৃথক্ রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে, কিন্তু একত্ব যদি সত্য হয় তবে তাহা সম্ভব হইত না, যেখানে একটি জন্তু সেখানেই অপর সমস্ত জন্তু অবস্থান করিত। সুতরাং লক্ষণ পৃথক বলিয়াই যদি দ্রব্যান্তরত্ব কল্পনা করা হয় তাহা হইলে অবশ্যই পরমাণুরও ভেদ স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং পরমাণু যে একই বস্তু তাহা সিদ্ধ হইল না। আর পরমাণুর অস্তিত্বই যদি সিদ্ধ না হয় তাহা হইলে রূপাদির চক্ষুরাদিবিষয়ত্বও অসিদ্ধ হইয়া পড়ে, এবং তদ্দ্বারা সিদ্ধ হয় কেবল বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা।

বস্তুর অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব প্রমাণদ্বারাই অবধারিত হয়; এবং সকল প্রমাণের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ হইল প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এখন বস্তু যে অসৎ,—তদ্বিষয়ক কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে কি? পরবর্ত্তী কারিকায় ইহারই উত্তর দেওয়া হইতেছে :—

প্রত্যক্ষবুদ্ধিঃ স্বপ্নাদৌ যথা সা চ যদা তদা।
ন সোঽর্থো দৃশ্যতে তস্য প্রত্যক্ষত্বং কথং মতম্ ॥ ১৬ ॥

অর্থাৎ প্রত্যক্ষবুদ্ধিও স্বপ্নাদিরই মত; স্বপ্নেও যেমন বাস্তব বস্তু ব্যতিরেকেও তদ্বিষয়ক জ্ঞানের আভাস হইয়া থাকে, প্রত্যক্ষেও তাহাই। কারণ যে মুহূর্ত্তেই এক প্রকার প্রত্যক্ষ বুদ্ধি জন্মে যে "ঐ বস্তু আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছে" তখনই সেই বস্তু আর অনুভূত হয় না, "আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি"—এই প্রকার বিশেষ বুদ্ধির দ্বারাই প্রকৃত প্রত্যক্ষজ্ঞান বাধিত হইয়া যায়। প্রত্যক্ষ জ্ঞান তাহা হইলে কিরূপে সম্ভব হয়? বিষয় ক্ষণিক, সুতরাং তাহার রূপ বা রসাদি ক্ষণ-মধ্যেই নিরুদ্ধ (ক্ষণিকস্য বিষয়স্য তদানীং নিরুদ্ধমেব)।

বসুবন্ধু এখানে অল্প কয়েক কথাতেই সর্ব্বদেশীয় দর্শনশাস্ত্রের একটি গূঢ়তম তত্ত্বের পরিচয় দিয়া গেলেন। Perception ও judgment-এর মধ্যে কি সম্বন্ধ, তাহাই এখানকার আলোচ্য বিষয়। যে কোন বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়সংযোগ হইলেই আমরা মনে করি যে বস্তুটি আমাদের প্রত্যক্ষ হইয়াছে। কিন্তু ব্যাপারটি এত সহজ নহে। কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়সংযোগ হইলেই প্রত্যক্ষ হইয়াছে বলা যায় না। ইন্দ্রিয়সংযোগ প্রত্যক্ষের কারণ মাত্র, তাহা প্রত্যক্ষের প্রমাণ নহে। ইন্দ্রিয়সংযোগ না হইলে প্রত্যক্ষ হইতে পারে না একথা মানিয়া লইলেও কখনই বলা যায় না যে ইন্দ্রিয়সংযোগ হইলেই প্রত্যক্ষ হইবে। প্রকৃত কথা এই যে,

কোন বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়সংযোগের পর যতক্ষণ না তাহার উপর আরও এই প্রকার একটি জ্ঞান জন্মায় যে, "আমি বস্তুটিকে প্রত্যক্ষ করিতেছি" ততক্ষণ বলা যায় না যে সেই বস্তু সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মিয়াছে। কিন্তু ইন্দ্রিয় সকল মনের দ্বারাই পরিচালিত হয় এবং "আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি" এইরূপ পরবর্ত্তী জ্ঞানটিও মনেই জন্মাইবে। সুতরাং বস্তু প্রত্যক্ষ করা এবং সেই প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে উপলব্ধিজ্ঞান একই সঙ্গে হইতে পারে না। শুধু তাহাই নহে, প্রত্যক্ষা-নুভূতি বিনষ্ট করিয়া দিয়া তবে তৎসম্বন্ধে উপলব্ধিজ্ঞান জন্মাইতে পারে। কারণ প্রত্যক্ষানুভূতি ও তাহার উপলব্ধিজ্ঞান সম্পূর্ণ বিভিন্ন; প্রথমটিতে মন বাহ্য বস্তুতে সংযুক্ত হয়, কিন্তু দ্বিতীয়টিতে মন আপনারই একটি বিশেষ অবস্থার আলোচনা করিয়া থাকে। একত্র এই দুইয়ের সামঞ্জস্য সম্ভব নহে। সুতরাং ধরিয়া লইতে হইবে যে প্রথমে বাহ্যবস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়সংযোগ এবং তাহার পর সেই ইন্দ্রিয়সংযোগ সম্বন্ধে আন্তরিক উপলব্ধি। কিন্তু পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে এইরূপ আন্তরিক উপলব্ধিজ্ঞান ইন্দ্রিয়সংযোগজাত প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে বাধিত করিয়াই জন্মাইতে পারে। অতএব বুঝা যাইতেছে যে প্রত্যক্ষ দ্বারা বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না। এক কথায়, বিষয়ের জ্ঞান বিষয়ের উপলব্ধি-জ্ঞানের দ্বারাই বাধিত হইয়া যায়।

পূর্ব্বপক্ষী কিন্তু এখনও বলিতে পারেন মনোবিজ্ঞান বা স্মৃতি যখন অস্বীকার করা হইতেছে না তখন বিষয়ের অস্তিত্বই বা কিরূপে অস্বীকার করা যায়? যাহা পূর্ব্বে অনুভূত হয় নাই মনোবিজ্ঞান দ্বারা তাহার স্মরণ কখনই সম্ভব নহে। সুতরাং বস্তুর প্রকৃত অনুভব নিশ্চয়ই পূর্ব্বে ঘটিয়া থাকিবে। এবং তাহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে দর্শনাদিদ্বারা বস্তুর প্রত্যক্ষ অনুভব এক সময়ে সাধিত হইয়াছিল। তদুত্তরে বসুবন্ধু বলিতেছেন যে অনুভূত বস্তুরই যে স্মরণ হয় তাহা বলা যায় না, কারণ—

উক্তং যথা তদাভাসা বিজ্ঞপ্তিঃ স্মরণং ততঃ।
স্বপ্নে দৃগ্বিষয়াভাবং নাপ্রবুদ্ধোঽবগচ্ছতি ॥ ১৭ ॥

অর্থাৎ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বস্তু না থাকিলেও বস্তুর আভাসরূপ বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে; স্মৃতিও তাহা হইতেই উৎপন্ন। স্বপ্নে দৃষ্ট

বস্তু যে নির্বিষয় তাহা অপ্রবুদ্ধ ব্যক্তি কখনও বুঝিতে পারে কি? সুতরাং স্মৃতি উৎপাদনের জন্য যে প্রকৃত বস্তু অনুভব করাই প্রয়োজন তাহা বলা যায় না।

এ পর্য্যন্ত দার্শনিক বিচারে বিশেষ কিছু সুবিধা করিতে না পারিয়া পূর্ব্বপক্ষী এইবার common sense হইতে একটি প্রশ্ন করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন স্বকীয় বিজ্ঞানের বিশেষ অবস্থা বশতঃই যদি বাহ্য বস্তু সম্বন্ধীয় ভ্রমজ্ঞান জন্মে, তাহা হইলে শত্রু মিত্র সম্বন্ধে, বা সদসদ্ধর্ম্ম সম্বন্ধে মানুষের বিভিন্ন প্রকারের বিজ্ঞান হইবে কেন? সৎ বা অসতের সহিত সম্পর্ক বাস্তবিক যখন বিদ্যমানই নাই তখন তাহাদের ভিন্নপ্রকার অনুভূতিই বা হয় কি করিয়া? ইহার উত্তর:—

অন্যোন্যাধিপতিত্বেন বিজ্ঞপ্তিনিয়মো মিথঃ।
মিদ্ধেনোপহতং চিত্তং স্বপ্নে তেনাসমং ফলং॥ ১৮॥

অর্থাৎ, বিভিন্ন পৃথক্ সত্ত্বের বিজ্ঞানধারা সকল পরস্পরের দ্বারা প্রভাবান্বিত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। একটি বিজ্ঞানসন্তানের বৈশিষ্ট্য হইতেই অপরাপর বিজ্ঞানধারার বৈশিষ্ট্য আসিয়া পড়ে; যে বস্তুসকলের (বলা উচিত "বস্ত্বাভাব সকলের") বিজ্ঞান, তাহাদের মধ্যেই যে কোন বৈশিষ্ট্য থাকিতে হইবে তাহার কোন কারণ নাই। এক কথায় বিভিন্ন বিজ্ঞানধারাও পরস্পরাপেক্ষী বা relative, absolute নহে।

এ পর্য্যন্ত স্বপ্নাবস্থার সহিত জাগ্রতাবস্থার তুলনা করিয়া প্রত্যক্ষ জগতের অলীকত্ব প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। এখন পূর্ব্বপক্ষী জিজ্ঞাসা করিতেছেন স্বপ্নাবস্থাতেই বা তাহা হইলে জাগ্রতাবস্থার সমুদয় ফল পাওয়া যাইবে না কেন? তিনি বলিতেছেন, স্বপ্নের বিজ্ঞপ্তি যদি অর্থশূন্য হয় তবে জাগ্রতাবস্থার বিজ্ঞপ্তিও নিরর্থক হউক। কিন্তু সুপ্তাবস্থার ও জাগ্রতাবস্থার কার্য্যাবলীর ফলাফল তুল্যরূপ হয় না কেন? তাহার উত্তর—স্বপ্নে চিত্ত মোহাচ্ছন্ন হইয়া থাকে (মিদ্ধেনোপহতং), সেই জন্যই ফলাফল তুল্যরূপ হয় না।

পূর্ব্বপক্ষী আবার আপত্তি করিতেছেন, এক বিজ্ঞপ্তিই যদি সত্য হয় তবে

কাহারও শরীরও থাকিবে না আর বাক্যস্ফূর্ত্তিও হইবে না। মেষপালগণ যে ক্রমানুযায়ী মেষ বধ করিয়া থাকে,—তাহাই বা কিরূপে সম্ভব হয়? যদি বল মেষপালগণই মেষ বধ করিতেছে ইহা মনে হইলেও প্রকৃত পক্ষে মেষপালগণ তাহা করে না, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করিব তজ্জন্য মেষপালগণেরই কেন প্রাণীবধজনিত পাপ হয়? ইহার উত্তরে বসুবন্ধু বলিতেছেন:—

মরণং পরবিজ্ঞপ্তিবিশেষাদ্বিক্রিয়া যথা।
স্মৃতিলোপাদিকান্যেষাং পিশাচাদিমনোবশাৎ॥ ১৯॥

অর্থাৎ একটি বিশিষ্ট বিজ্ঞানসন্তানের পরিবর্ত্তনবশতঃ মৃত্যু যেমন অপর এক জীবের জন্ম রূপে দেখা দেয়,—অপরাপর ব্যক্তির স্মৃতিলোপও সেইরূপে পিশাচাদির প্রভাববশতঃই ঘটিয়া থাকে। পিশাচাদির প্রভাবে যেমন নানা অঘটনও ঘটিয়া যায় স্মৃতিলোপাদিও সেইরূপেই ঘটিয়া থাকে। পিশাচাদির প্রভাব যে মিথ্যা নহে তাহা বসুবন্ধু বৃত্তিতে কতকগুলি পৌরাণিক দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এখানে তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, যে ভ্রমকে আশ্রয় করিয়া এই জীবন তাহা মূলতঃ পিশাচাদির প্রভাববশতঃই ঘটিয়া থাকে। পরবর্ত্তী কারিকাতেও এই কথা বলা হইয়াছে। দেখা যাইতেছে যে পরপক্ষ খণ্ডনের নিমিত্ত বসুবন্ধু অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু স্বপক্ষ সমর্থনের জন্য তত মনোযোগী হন নাই। নতুবা পার্থিব কর্ম্মফল বুঝাইবার জন্য তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ ভূত ও পিশাচের আশ্রয় লইতে হইত না। প্রকৃত কথা এই যে বসুবন্ধু "বিংশিকা"য় স্বমত প্রতিষ্ঠার চেষ্টাই করেন নাই, "ত্রিংশিকা"তে করিয়াছিলেন। স্থিরমতির বৃত্তিসহ এই "ত্রিংশিকা"র আলোচনা পরে করা যাইবে।

শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ

দাবী

(৪)

বি-এস্-সি পরীক্ষায় অসিতের ফল আশানুরূপ ভালো হইল না। বিনয়কৃষ্ণ পুত্রের নিকট অনেক বেশী প্রত্যাশা করিয়াছিলেন; মাত্র পাশ করিলেই খুসী হইবেন এমন লোক তিনি ন'ন। তিনি বিরক্ত হইলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল, অনিলের সহিত ঘনিষ্ঠতা ও তাহাদের বাড়ী ঘন ঘন যাতায়াত এই দুর্ঘটনার একমাত্র কারণ। অনিল ভালো করিয়াই পাস করিয়াছে, সুতরাং তাঁহার সন্দেহ ইহাতে আরও বদ্ধমূল হইল। এমনি করিয়া উহারা নিজে ভালো থাকিয়া অন্যকে বিগ্ড়াইয়া দেয়। অসিত নিজে ভিতরে ভিতরে ক্ষুব্ধ হইয়াছিল বটে, তবে তাহার সাংসারিক প্রতিষ্ঠার লোভ ছিল অল্প, তাই সে ভাঙিয়া পড়ে নাই। অনিলদের সম্বন্ধে তাহার পিতার মনোভাব টের পাইয়া সে মর্ম্মাহত হইল। স্থির করিল তাহাদের সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবে। নিতান্ত দৃষ্টিকটুত্বের আশঙ্কায় তাহাতে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য না হইলেও যাতায়াত অনেক কমাইয়া দিল। এম্-এস্-সিতে দুইজনে বিভিন্ন পাঠ্য বিষয় গ্রহণ করায় এ পার্থক্য কাহারও চোখে পড়িল না। হঠাৎ এক একদিন অনিল তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইত। তখন সুনয়নীর স্নেহে ও পূর্ণিমার প্রীতিতে সে কিছুক্ষণের জন্য মানসিক ব্যবধান দূরে সরাইয়া পূর্ব্বের মত অসঙ্কোচে মেশামিশি করিত। এটুকু অভিনয়পটুত্ব ও বয়সে সহজেই আসে।

এমনি করিয়া দিন কাটিতেছিল এমন সময় একদিন অনিল অসিতের ল্যাবোরেটরিতে আসিয়া পিছন হইতে তাহাকে একটা ঝাঁকানি দিয়া কহিল,—এই, আমি চল্লুম।

—কোথায়?

—দেশ ছেড়ে।

—জাভায়, নাচ দেখতে?

শিল্পকলার প্রসঙ্গ অনিলের রুচিকর নয়, অসিত তাহা জানে বলিয়াই ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। অনিলও চটিবার ভান করিয়া বলিল—

—সে তুমি যেয়ো। আমি চল্লুম ইউরোপে উড়তে।

—এদেশেও ত আকাশের অভাব নেই।

—তা নেই, কিন্তু ডানা ছড়িয়ে ওড়বার মত বিদ্যা এদেশে কোথায়? আমি এরোনটিক্স্ শিখতে যাচ্ছি; সব ঠিক হয়ে গেছে।

অসিত বন্ধুর সৌভাগ্যে আনন্দজ্ঞাপন করিয়া বলিল—সামনের পরীক্ষাটা দিয়ে গেলেই পারতে—এবারে তোমারই ফার্ষ্ট হওয়ার ষোল আনা সম্ভাবনা।

—বাবা সেকথা লিখেছিলেন। কিন্তু আমার যে আর তর সইছে না। পাখীর মত উড়ে একবার সারা পৃথিবীটাকে চক্র দিয়ে না আসতে পারলে আমার ঘুম হচ্ছে না যে। তাই বাবাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে এ ব্যবস্থাটা করে নিলাম।

সমস্ত যোগাড় করিয়া দিয়া নৃপেশনাথ জানাইলেন যে অনিলের যাইবার সময় তিনি কিছুতেই কলিকাতায় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না। পুত্রের বিদেশ গমনের অজুহাতে চাকরীর কর্ত্তব্যে ক্রুটি করার মতো মনোবৃত্তি তাঁহার নয়। অনিল যেন ইহাতে ক্ষুণ্ন না হয়। দেখা হওয়াটা ভাবাবেগের আতিশয্য মাত্র, তাহাতে আবশ্যিকতা কিছুই নাই। এই কঠিন সংযত যুক্তি অনিলের হৃদয়ে কোন সান্ত্বনা দিল না। সে ঠিক করিল রেঙ্গুন হইতে জাহাজ লইয়া ইউরোপ অভিমুখে যাত্রা করিবে। এদিকে সুনয়নীও শেষ পর্য্যন্ত অনিলকে কাছে রাখিতে চান, আর পূর্ণিমার পরীক্ষা সন্নিকট বলিয়া তাঁহার পক্ষে রেঙ্গুন যাওয়াও সম্ভব নয়। পূর্ণিমা অবশ্য একা থাকিতে রাজী ছিল, কিন্তু সুনয়নী রাজী হইলেন না। শেষে অনিলের কথাই রহিল।

জাহাজ ঘাটে অনিলকে সদলবলে বিদায় দিয়া সুনয়নী ও পূর্ণিমাকে লইয়া অসিত বরাহনগরে ফিরিল। বহুকাল পরে সেদিন সে অনেকক্ষণ ওখানেই কাটাইল। অনিলের অবর্ত্তমানে তাহার শূন্যস্থান সেই অনেকাংশে পূরণ করিতে পারে, একথা মুখোমুখি না বলা হইলেও অন্তরে অন্তরে যেন বলাবলি হইয়া গেল। বাড়ী ফিরিবার পথে সে হঠাৎ আবিষ্কার করিল অজ্ঞাতসারেই সে তুলনা জুড়িয়া দিয়াছে অনিলের সহিত তাহার নিজের ভাগ্যের। আপন বাড়ীতে সে যেন কি একটা অভাব অনুভব করিল। কিন্তু কিসের সে অভাব? স্নেহের? তাহা সে কেমন করিয়া বলিবে? সে জানে তাহার আত্মীয় মহলে সে অমূল্য রত্ন বলিয়া পরিগণিত। সে রাত জাগিয়া পড়ে, আর সৌদামিনী রাত জাগিয়া

বসিয়া থাকেন; ছেলে না শুইলে তিনি শুইতে যান না। দুবেলা একসঙ্গে না খাইলে বিনয়কৃষ্ণের আহারে তৃপ্তি হয় না। সারাদিন পরিশ্রমের পর বাড়ী ফিরিয়া প্রথম অনুসন্ধান তাহারই সম্বন্ধে। ছুটির সময়েও তাহাকে কাছ ছাড়া করিতে চান না—সাধ্যমত তাহাকে সঙ্গে লইয়া ফেরেন। তাহার জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত্তকে তিনি যেন সহস্র চক্ষু হইয়া লক্ষ্য করিতে চান। অনিলদের সংসার সে তুলনায় কত শিথিল। নৃপেশনাথ ত প্রবাসী; পূর্ণিমা কি করে না করে সে-বিষয়ে অনিলের আগ্রহ নাই বলিলেই হয়; আর অনিলের গতিবিধি জানিবার জন্যও সুনয়নীর কোন দাবী আছে বলিয়া মনে হয় না।

এই 'দাবী' কথাটায় আসিয়া অসিত মনে পার্থক্যের রহস্যের কিনারা দেখিতে পাইল। বিনয়কৃষ্ণের স্নেহের মধ্যে মুক্তির পরিসর নাই, দাবীর বন্ধন আছে। তাঁহার পুত্র তাঁহারই আদর্শ ও কল্পনা অনুযায়ী বাড়িয়া উঠিবে, ইহাই হইল, তাঁহার দাবী। এক্ষেত্রে সৌদামিনী স্বামীর মূক প্রতিধ্বনি মাত্র। বিনয়কৃষ্ণ যে কোন ভুল করিতে পারেন, এরূপ স্বপ্নও বোধ হয় তিনি কখনও দেখেন নাই। আর নৃপেশনাথের স্নেহে বন্ধনের গ্রন্থি নাই—সেখানে আছে দাবীর পরিহার। অনিলের বাসনা পুরাইতে নৃপেশনাথ সাধ্যাতিরিক্ত যত্ন করেন, অথচ বিনয়কৃষ্ণ কোনদিন অসিতের অন্তরের আশা আকাঙ্ক্ষা বুঝিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। অসিত কাব্য-প্রিয়, অথচ তাহাকে বিজ্ঞান পড়িতে হইয়াছে পিতার আদেশে। সে জানে, তাঁহার ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য তাহাকে আইন-অধ্যয়নও করিতে হইবে, যদিও আইনজ্ঞ হইবার উৎসাহ তাহার নাই বলিলেই হয়। ইহা ঠিক যে অসিত বোঝে সাংসারিক উন্নতির দিক দিয়া দেখিলে পিতৃনির্দ্দিষ্ট পন্থাই সাফল্যের অনুকূল। কিন্তু তাহার মর্ম্মের স্বপ্নসৌধ যে শুভানুধ্যায়ী পিতার অনুকম্পনহীন স্পর্শে চূর্ণ হইয়া গেল—এ ব্যথার প্রতিকার কি? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী ঢুকিয়াই অনুভব করিল এতটা সময় নষ্ট হওয়ায় বিনয়কৃষ্ণ অপ্রসন্ন হইয়া রহিয়াছেন।

(৫)

এস্‌-এস্‌-সি পরীক্ষা শেষ করিয়াই অসিত বুঝিল তাহার ভাগ্যাকাশে শনিগ্রহ এখনও প্রবল। পাশ করিবে বটে, কিন্তু পিতাকে তৃপ্ত করার সম্ভাবনা অতি সুদূর। সে নিশ্চয় জানিত, এই দুর্ঘটনাকে বিনয়কৃষ্ণ ইচ্ছাকৃত অপরাধের মতই ক্ষমা করিতে পারিবেন না। পরীক্ষায় অদৃষ্টের কুটিল লীলা পুরুষকারের অপেক্ষা কম প্রবল নহে, একথা তাঁহার মত লোকের নিকট অশ্রদ্ধেয়। আশাভঙ্গের সমস্ত দায়িত্ব তিনি বিনা বিচারে অসিতের ঘাড়েই চাপাইয়া দিবেন। তিরস্কার তিনি করিবেন না, কিন্তু তাঁহার সেই কঠিন মৌন গাম্ভীর্য্য দুঃস্বপ্নের মতই শ্বাসরোধকারী হইয়া বুকের উপর চাপিয়া রহিবে।

অসিতের মনে এবারে কোন ক্ষোভ, কোন গ্লানি ছিল না। অনন্যচিত্ত হইয়া সে পরীক্ষার সাধনা করিয়াছে, চিত্ত বিক্ষেপের কারণ হইতে নিজেকে সাধ্যমত সম্বৃত রাখিয়াছে। আপন শক্তির এই স্পষ্ট পরিচয়ে তাহার অন্তরে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় একটি অবিচলিত প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। সুনয়নী ও পূর্ণিমার বাধাহীন সঙ্গকে সে আর এড়াইয়া চলিবার আবশ্যক বোধ করিল না। নির্ব্বিরোধ আনন্দে সে তাহার নূতন পাওয়া অবকাশের স্বেচ্ছা-চালিত সম্ভোগে প্রবৃত্ত হইল। সে আসে, টেনিস্‌ খেলে, সাঁতার দেয়, বাঁশী বাজায়, বেহালা শোনে, গল্প করে, তর্ক বাধায়। এই অবাধ মেলা মেশায় বিনয়কৃষ্ণ তুষ্ট না হইলেও প্রকাশ্যত রুষ্ট হইতে পারেন না—এই বোধ, স্বাধীনতার এই প্রথম আস্বাদ তাহাকে মাতাইয়া তুলিল।

সেদিন সন্ধ্যার পর সুনয়নী হিসাব পত্র ঠিক করিবার জন্য নিজের ঘরে নামিয়া গিয়াছেন। অসিত হঠাৎ আসিয়া পড়ায় পূর্ণিমার বৈকালিক প্রসাধন যথাসময়ে সারা হয় নাই। তাই অসিত একা ছাতে বসিয়া বাঁশী বাজাইতে লাগিল। পূর্ণিমা ফিরিয়া আসিলেও সে নিজের মনে বাজাইয়া চলিল—এখন আর শ্রোতা সামনে থাকিলে তাহার স্নায়ু-চাঞ্চল্য ঘটে না। বাঁশী থামিয়া গেলেও কিছুক্ষণ দুজনেই স্তব্ধ হইয়া রহিল। তারাভরা আকাশ অগণিত চক্ষু মেলিয়া উৎকর্ণ হইয়া রহিয়াছে—যেন কোন্‌ অকথিত বাণীর প্রকাশের প্রতীক্ষায়। এমন সময় পূর্ণিমা প্রশ্ন করিল—আচ্ছা অসিতদা, আপনাদের বাড়ী আমায় কখনো নিয়ে যান্‌ না কেন?

এ প্রশ্নের জন্য অসিত একরূপ প্রস্তুতই ছিল। সুনয়নী অনেকবার তাহাদের পরিবারের সহিত পরিচিত হইবার বাসনা প্রকাশ করিয়াছেন। প্রতিবারই অসিত কোন না কোন অছিলায় ঠেকাইয়া রাখিয়াছে। শেষে অসিতের

অনিচ্ছা বুঝিয়া তিনি আর ও প্রসঙ্গ তুলিতেন না। তাঁহার এই বিবেচনায় অসিত স্বচ্ছন্দ বোধ করিত। কিন্তু কোনরূপ অস্পষ্টতা পূর্ণিমার ধাতে সহে না, সর্ব্ব বিষয়েই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হইলে তাহার শান্তি নাই। অসিত জানিত একদিন ইহা লইয়া পূর্ণিমার সহিত তাহার বোঝাপড়া অবশ্যম্ভাবী। তবু এড়াইবার জন্য বলিল—

—আমিই ত আসি।

—আপনি আর আপনার বাড়ী বুঝি একই কথা? আপনি ত আর শামুক বা কচ্ছপ নন্ যে সমস্ত বাড়ী ঘাড়ে করে বেড়ান্।

—খোলাটাকে দেখে কি লাভ? প্রাণীটিকে ত দেখতেই পাও।

—না পাই না। চার পাশ থেকে ছিনিয়ে নিলে কোন প্রাণীকেই যথার্থ করে দেখতে পাওয়া যায় না। আমাকে আপনি দেখতে পান পরিপূর্ণভাবে; আমার রাগে দুঃখে হাসিতে খেলায়। আমার ছোটখাট ত্রুটিও আপনার চোখে না পড়ে' উপায় নেই। অথচ আমি আপনাকে দেখি আপনি যতটা দেখান তার বেশী নয়। তাই জান্‌তে ইচ্ছে করে আপনার নিত্যকার জীবন কাটে কেমন করে।

—জান্‌লে তোমার কল্পনার সৃষ্টি ভেঙে চুরমার হবে।

—সত্যের সংঘাতে মিথ্যা যদি ভাঙে ত চিন্তা কিসের?

—সত্য কি তা জানা কি এতই সোজা, প্রুণ? এত শতাব্দীর অনুসন্ধানের ফলেও একটা অণুর সত্য প্রকৃতি কি বৈজ্ঞানিকেরা তা স্থির করতে পারছেন না—আর তুমি একদিন আমাদের বাড়ী বেড়াতে গিয়েই একটা আস্ত সজীব প্রাণীর সত্য প্রকৃতি জেনে ফেলতে চাও।

—সেই জন্যই ত আমি বিজ্ঞানের চেয়ে কবিত্বের পক্ষপাতী। বিজ্ঞান তার মাপকাঠি নিয়ে যে সত্যের নাগাল পায় না, কবি-দৃষ্টি অনায়াসেই তা প্রত্যক্ষ করতে পারে।

—প্রথমতঃ কবিদৃষ্টিই যে সত্য দৃষ্টি সে বিষয়ে প্রমাণাভাব। তাছাড়া, কবিদৃষ্টিও কিছু অনায়াসলভ্য নয়।

—আয়াসলভ্যও নয়—চেষ্টা করে কেউ কখনও কবি হয়েছে কি?

—তবে চেষ্টা না করলেই কবি হওয়া যায়, কি বল?

—আমি কি তাই বলেছি? আমি বলছি, চেষ্টা ছাড়াও কবি হওয়া সম্ভব যদি ওই শক্তিটি নিয়ে জন্মানো যায়। তখন ঐ শক্তিই তার প্রকাশের পথ আপনি কেটে নেয়।

—কথাটা বেশ শোনালো বটে বিজ্ঞের মতন। কিন্তু বর্ত্তমানে তার প্রয়োগটা কোনখানে বুঝতে পারছি না?

—সেটা এই,—আপনাদের বাড়ী যেতে চাওয়াটা আমার নিছক কৌতূহল মাত্র। আপনাকে চেনার জন্য তার দরকার নেই; কারণ আপনাকে আমি চিনি, প্রত্যক্ষ্যভাবেই চিনি।

—তোমার কবিদৃষ্টি ফুটলো কবে থেকে?

—মানুষ তখনই কবি, যখনই সে ভালোবাসে।

ইঙ্গিত ব্যর্থ হইল না, অসিত বুঝিল। সে এত নির্ব্বোধ নয় যে এ-সম্ভাবনা আগে কখনো তাহার মনে জাগে নাই। আর নির্ব্বোধ নয় বলিয়াই গোড়া হইতে তাহার চিন্তাধারাকে এ পথে অগ্রসর হইতে দেয় নাই। তাহাদের জাতি বিভিন্ন, পারিবারিক আচার-ব্যবহার মতি-গতি বিভিন্ন; সর্ব্বোপরি ইহাদের প্রতি বিনয়কৃষ্ণের চিত্ত যে প্রসন্ন নয় তাহা সে জানে। তাই অসম্ভবের আশাকে গোপনে লালন না করিয়া সে অঙ্কুরেই তাহার মূলোৎপাটন করিয়াছে। সে বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছে, তাহাদের সংসারের ফ্রেমে পূর্ণিমার ছবির স্থান হয় না। তাই সে এখন নিষ্কম্প স্বরেই উত্তর দিতে পারিল—মিথ্যা আশা তোমার, প্রুণ; আমি ত স্বাধীন নই।

—আজ নন্ কাল হতে পারেন।

—কেমন করে?

—ধরুন, যদি কোন ভালো কাজ পান বিলেত টিলেত ঘুরে এলে।

—আমি জানি বাবা আমাকে পাঠাবেন না। আর এত ভালো ছেলে নই যে স্কলারশিপ পাবো।

—আপনার ইচ্ছে যদি মাকে জানান, তাহলে মা আপনাকে এত ভালো-বাসেন যে আপনার ইচ্ছে পূরণ করতে পারেন।

রসিকতা করার লোভ অসিত সংবরণ করিতে পারিল না; বলিল—বিনা সর্ত্তে?

পূর্ণিমা ইহার ভিতরের শ্লেষকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া বলিল—সর্ত্তটা হয়ত খুব অসহ্য নাও হতে পারে।

এইবার অসিত গম্ভীর হইয়া বলিল—তুমি আমাকে চেনোনি প্রুণ; তোমার কবি-দৃষ্টি তোমায় ভুলই দেখিয়েছে। মা বাবার সঙ্গে আমার একান্ত অন্তরের যোগ নেই, একথা হয়ত সত্য। তবুও আমি তাঁদের ভালোবাসি, এত ভালোবাসি যে তাঁদের অমতে তোমায় বিয়ে করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

এই নির্ম্মম স্পষ্ট উত্তরের জন্য পূর্ণিমা প্রস্তুত ছিল না। এইবার সে-ও একটা খোঁচা না দিয়া পারিল না। বলিল—বড় বড় বিদ্রোহবাদের কথার এই বুঝি পরিণাম?

—তুমি ঠিক বলেছ প্রুণ; বিদ্রোহবাদ আমার মত মাত্র। আমি ওটাকে বুদ্ধি দিয়ে মানি, হৃদয় দিয়ে অনুভব করি; কিন্তু কাজ দিয়ে সার্থক করার শক্তি আমার নেই। নিজের সামর্থ্যের সীমা আমি জানি।

অসিত আত্মপক্ষ সমর্থন করিলে হয়ত পূর্ণিমার চিত্ত ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় তাহার প্রতি বিমুখ হইতে পারিত। এই বিনম্র স্বীকারোক্তিতে, এই নিষ্করুণ আত্ম-বিশ্লেষণে তাহার ক্রুদ্ধ হইবার উপায় রহিল না। তাই বলিয়া ব্যর্থতার জ্বালা সহজে লোপ পায় না; আত্মসংবরণের প্রবল চেষ্টায় তাহার হৃদয়ে সমুদ্র মন্থন হইতে লাগিল। শেষ পর্য্যন্ত তাহার চোখ ফাটিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল। যতই থামাইতে চায় ধারার বেগ ততই বাড়িয়া চলে। কে জানিত একটি নিতান্ত ক্ষুদ্র স্বচ্ছ আবরণের আড়ালে এত অশ্রু গোপন থাকে।

হঠাৎ পূর্ণিমাকে কাঁদিতে দেখিয়া অসিত অপ্রতিভ হইয়া গেল। মনে হইল দোষ বুঝি তাহারই, অথচ স্থির চিত্তে ভাবিয়া নিজের অপরাধ খুঁজিয়া পাইল না। পূর্ণিমা তখন তাহার দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতেছে। তাহাকে শান্ত করিবার জন্য তাহার মাথায় ও পিঠে সস্নেহে ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। কয়েক মিনিট পরে বেয়ারা আসিয়া খবর দিল, সুনয়নী অসিতকে ডাকিতেছেন। সে নামিয়া আসিতেই তিনি প্রশ্ন করিলেন—প্রুণ এলো না যে?

—আপনি ত শুধু আমাকেই ডেকেছেন।

—তবু তোমায় একলা ছেড়ে দিলে যে বড়।

—তার রাগ হয়েছে, বলিয়াই সে ভয়ে ভয়ে ভাবিতে লাগিল সুনয়নী কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে কি উত্তর দিবে।

—ভালোই হয়েছে, আমার তোমাকেই দরকার। একটা সমস্যায় পড়েছি, তুমি বুদ্ধি দেবে? ওঁকে আর বিরক্ত করতে ইচ্ছা করছে না।

—যার মীমাংসা আপনি করতে পারছেন না, তা করব আমি? হাসির কথা বটে। তবু বলুন ব্যাপারটা কি? হয়ত বল্‌তে গিয়ে আপনি নিজের পথ নিজেই খুঁজে পাবেন।

—বলব বলেই ত ডেকেছি। আজ মিসেস দত্ত এসেছিলেন। তুমি জানো না এই মিসেস দত্তর কাছে আমরা কত ঋণী। এক সময়ে আমরা, অর্থাৎ আমি আর উনি, এমন বিপদে পড়ি যে সংসারে আমাদের মাথা গোঁজ-বার ঠাঁই ছিল না। অসিত অবাক হইয়া চাহিয়া আছে দেখিয়া তিনি বলিলেন—বিশ্বাস করো, আমি একটুও বাড়িয়ে বল্‌ছি না। সে কাহিনী আজ বলার নয়, পরে হয়ত কোন দিন বল্‌তেও পারি। যাই হোক, মিসেস দত্ত তখন আমাদের আশ্রয় দেন। সেই থেকে আমরা ওঁর কাছে পরম কৃতজ্ঞ। উনি আজ এসেছিলেন সেই কৃতজ্ঞতার মূল্য দাবী কোরতে। বলিয়া তিনি একটু চুপ করিলেন।

অসিত হাসিয়া কহিল—তাহলে ত আপনি ঋণমুক্ত হয়ে গেছেন।

—দাবী পূরণ না কোরেই?

—হ্যাঁ। আমার মতে উপকার করার পর কৃতজ্ঞতা দাবী করলেই উপকারের উপকারত্ব যায় ঘুচে। কাজেই তার প্রতিদান নিষ্প্রয়োজন।

—চমৎকার যুক্তি ত তোমার! যে উপকার পেলে তার বুঝি কোন কর্ত্তব্যই নেই, স্বার্থ সাধনের পর ফাঁকি দেওয়া ছাড়া?

—না তা কেন, ন্যায়ের জগতে ফাঁকি কোথাও নেই। উপকৃতের কর্ত্তব্য উপকারীর কাছে নয়, অন্য উপকার-প্রার্থীর কাছে। অর্থাৎ যে লোক একের কাছে উপকার পেয়েছে তার প্রধান কর্ত্তব্য অন্য কেউ তার কাছে প্রার্থী হলে তার যথাসাধ্য উপকার করা। উপকারের যথার্থ প্রতিদান এতেই। এমনি করেই পরহিতৈষণার ধারা লোক হতে লোকান্তরে ছড়িয়ে যেতে পারে। নইলে আমি একজনের উপকার করেছি বলে সে

আমার উপকার করতে বাধ্য, এ আদর্শ অত্যন্ত সংকীর্ণ; এর মধ্যে যুক্তি কোথায়?

একটু চিন্তা করিয়া সুনয়নী বলিলেন—

—কিন্তু উপকারী কি উপকৃতের কাছে ন্যায্য দাবীও করতে পারে না?

—অবশ্য, তবে সেটা মান্‌তে হবে ন্যায্য দাবী বলে; উপকারের মূল্য বলে নয়।

—খুব সম্ভব আমি মিসেস দত্তর ওপর অবিচার করছি। তিনি হয়ত কোন দাবীই করেন নি যাকে আমি কৃতজ্ঞতার মূল্য বলে ভাবতে পারি। আজ তিনি আমাকে তাঁর ইচ্ছা জানিয়েছেন প্রুণকে তাঁর ছেলের বৌ করতে।

—এটাকে আপনি কৃতজ্ঞতার মূল্য বলে ভাবছেন কেন? আপনি কি সুরথ দত্তকে পছন্দ করেন না?

—করি, কিন্তু আমি জানি প্রুণ করে না। মিসেস দত্তের সহায়তা না পেলে আমাদের জীবন কিরূপ বিষময় হোত, তার খবর প্রুণ জানে না। আমি তাকে জানাতেও চাইনে। আমাদের কৃতজ্ঞতার বোঝা তার ঘাড়ে চাপিয়ে তার ভালোবাসার পরিধিকে সংক্ষিপ্ত করতে আমার মন চায় না। বড় হয়ে তার মনের মানুষ সে চিনে নিক, এই আমি চাই। হয়ত এ পথে তাকে ঘা খেতে হবে—কিন্তু উপায় কি? যেমন ধরো, আমি বেশ বুঝতে পারি, আমাদের পরেই সে তোমাকে সব থেকে ভালবাসে। আমি জানি, এখানে তাকে ঘা খেতে হবে। কিন্তু আমি তাকে বাধাও দিই নে উৎসাহও দিই নে। অদৃষ্টের সঙ্গে তার শক্তি পরীক্ষা হোক। জয়ী হলে খুসী হবো, না হলে দুঃখ করব না।

সুনয়নীর পরিণত বয়সের তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির ও তাঁহার সহজ উদার বুদ্ধির নিঃস্বার্থ উক্তিতে সে যেমন বিস্মিত তেমনি আনন্দিত হইল। এবং যে আঘাত এখনি সে প্রুণকে দিয়া আসিয়াছে তাহার মায়ের সহিত সেই কথা আলোচনা করার সুযোগ সে হারাইতে চাহিল না। ঘোরপ্যাঁচ না করিয়া সোজাসুজি সে প্রশ্ন করিল—

—আপনি কি চান, আমি প্রুণকে বিয়ে করি?

—না; তোমায় অপছন্দ করি বলে নয়, তুমি ওকে সব মন দিয়ে চাও না বলে। তোমার কুণ্ঠার কারণও আমি বুঝি; বুঝি বলেই তোমার সম্বন্ধে আমার কোন ক্ষোভ নেই।

অসিত আশ্বস্ত হইয়া বলিল—কিন্তু মিসেস দত্তের প্রশ্নের কি উত্তর হবে?

—তোমার কাছেই ত তার উপযুক্ত উত্তর পেয়েছি।

—কখন? আমি ত বুঝতে পারিনি।

—যখন তুমি বল্‌লে উপকার শেষ হয়ে যায় তার প্রতিদান চাইলেই। সত্য কথাটা এর আগে এত স্পষ্ট করে বুঝিনি।

—আমি ত আগেই বলেছিলাম আপনার প্রশ্নের উত্তর আপনি নিজেই খুঁজে পাবেন; আমি তার উপলক্ষ্য মাত্র। আপনার সমস্যার মীমাংসা ত হোল, এখন আমি উঠি, বাড়ী ফিরতে হবে।

—কিন্তু প্রুণের রাগ?

এমন সময় প্রুণ আসিয়া ঢুকিল। চোখ মুখ ধুইয়া বেশ সংযত হইয়া আসিয়াছে। প্রশান্তভাবেই কহিল—আপনি যাচ্ছেন নাকি? চলুন।

সুনয়নী কহিলেন—গেটের কাছে বেশীক্ষণ আট্‌কে রাখিস নি ওকে; ওর অনেক দেরী হয়ে গেছে।

পাশাপাশি চলিতে চলিতে প্রুণ বলিল—ক্ষমা করুন, যদি বিরক্ত করে থাকি।

এ কথার কোন উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া অসিত চুপ করিয়া রহিল। পূর্ণিমা বলিতে লাগিল—আপনাকে ভালো করে না জেনে আমার মনের পাগ্‌লামিকে প্রশ্রয় দেওয়া অত্যন্ত ভুল হয়েছিল। তা এখন বুঝতে পারছি। তার জন্য আমি দুঃখিত নই। মা ঠিকই বলেন, ভুলের ভিতর দিয়েই ত মানুষকে এগিয়ে যেতে হয়—অন্য কোন সোজা পথ ত নেই। আপনার কাছে আজ যে শিক্ষা পেলুম তাতে লাভ হোল এই, এ রকম পাগলামি আর কোন বার করার আগে আমার মন নিশ্চয়ই অনেক বেশী সাবধান হবে।

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ। পূর্ণিমা হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে বলিল—

—ভাব্‌বেন না যেন আজকের এই ব্যর্থতায় আমার সারা জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে। হয়ত আমার ভবিষ্যৎ জীবন এমন কোন নতুন প্রেমের আনন্দ অপেক্ষা

করে আছে যার মূল কারণ আজকের এই প্রত্যাখ্যান। সেদিন আন্তরিক ভাবেই আপনার উদ্দেশ্যে আমার সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাবো।

এ বাড়ী আর আসা উচিত কিনা ভাবিতে ভাবিতে অসিত বাড়ী ফিরিল।

(৬)

বিনয়কৃষ্ণ মনস্থ করিয়াছেন এইবার অসিতের বিবাহ দিবেন। পাত্রীর সন্ধান মিলিতেছে যথেষ্ট, অসিত নিজের খেয়ালে মাতিয়া থাকিয়াও মাঝে মাঝে তাহার আভাস পাইতেছিল, কিন্তু গ্রাহ্য করে নাই। সে তাহার নবলব্ধ স্বাধীনতাকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করিতে উদ্যোগী। এই স্বাধীনচিত্ততাকেই বিনয়কৃষ্ণ ভয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। একথা তাঁহার বারবার মনে হইয়াছে কন্যানির্ব্বাচনে হয়ত অসিতের নিজস্ব বক্তব্য কিছু থাকিতে পারে। কিন্তু তাঁহার আন্তরিক হিতাকাঙ্ক্ষা তখনি বাধা দিয়া বলিয়াছে, তাঁহার নির্ব্বাচন এমনই নির্দ্দোষ ও মনোরম হইবে যে অসিতের আপত্তি করিবার কিছুই থাকিবে না। তিনি জানিতেন অসিত তাহার অবকাশের অধিকাংশই অনিলদের বাড়ী কাটায়। অনিলকে দেখিয়া তাঁহার বেশ ভালো ধারণাই হইয়াছিল। কিন্তু তাহার বিদেশ গমনের পরও যে অসিত তাহাদের পরিবারে অন্তরঙ্গ হইয়া মেশে, এটা তিনি পছন্দ করিতেন না। অনিলের বোন আছে এ সংবাদ পাইয়া অবধি অগ্নি ও ঘৃতের সামীপ্যের প্রবাদটি তাঁহার প্রায়ই মনে পড়িয়াছে। সকল পিতাই পুত্রকে ছোট করিয়া দেখেন। তাই এতকাল বিপদের সম্ভাবনাকে সন্নিকট বলিয়া তিনি ভাবেন নাই। আজকাল কেমন তাঁহার সন্দেহ হইতেছে, কোথা হইতে অগ্নির স্পর্শ আসিয়া তাঁহার পুত্রের চিত্তকে তপ্ত করিয়া তুলিতেছে। তিনি পূর্ণিমার বিষয়ে খোঁজ লইবার ব্যবস্থা করিলেন।

খোঁজ লইতে গিয়া বিপদ বাধিল। বিনয়কৃষ্ণ দেখিলেন অসিতের মনে ব্যথা দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। তিনি নিতান্ত সেকেলে নন, বিবাহ সম্বন্ধে হিন্দু সমাজের সমস্ত কঠিন নিয়ম মানিয়া লইতে চাহেন না, এমন কি জাতিভেদ সম্বন্ধেও তাঁহার মত বেশ উদার। অসবর্ণ বিবাহে তাঁহার বিচার-বুদ্ধি সায় দিত। কিন্তু অনুসন্ধানের ফলে যে রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়িল, তাহাতে তাঁহার চক্ষুস্থির হইয়া গেল, তাঁহার সামাজিক নীতি-জ্ঞানের মূলে আঘাত পড়িল।

তিনি জানিতে পারিলেন, অনিলের পিতার মৃত্যুর পর নৃপেশনাথ সুনয়নীকে লইয়া সরিয়া পড়েন পূর্ণিমার জন্মের আশঙ্কায়। শুনিয়াছিলেন পরে তাঁহাদের বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু বিনয়কৃষ্ণের নিকট এরূপ বিবাহের কোনই সার্থকতা নাই। যে-সন্তান নীতিবিরুদ্ধ ব্যভিচারের ফল, তাহাকে পুত্রবধূরূপে কল্পনা করিতেই তাঁহার সমস্ত চিত্ত বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল। আর যাহাদের জীবনে এইরূপ কুৎসিত আচরণ গুপ্ত হইয়া রহিয়াছে, সকল পাপকর্ম্মই তাদের দ্বারা সম্ভব, এ বিষয়ে তাঁহার একটুও সন্দেহ রহিল না। এই পারিবারিক কলুষ তাঁহার পুত্রের মধ্যে কতখানি সংক্রামিত হইয়াছে এই ভাবনা তাঁহার অন্তরে তাণ্ডবের সৃষ্টি করিল। তিনি ঠিক করিলেন, যত কঠিন হইতে হয় হউক, যতই অশান্তি হউক, এই পাপের সংস্পর্শ হইতে অসিতকে বাঁচাইতে হইবে—মরণাধিক বিপদের বেড়াজাল হইতে তাহাকে মুক্ত করিতে হইবে।

সেদিন সন্ধ্যার সেই ঘটনার পর অসিত কয়েকদিন আর বরাহনগর অভিমুখে যাইতে পারিল না। সঙ্কোচের বাধা কিছুতেই কাটিতে চাহে না। সুনয়নীর উন্মুক্ত স্নেহ, অগাধ বিশ্বাস মনে করিয়া তাঁহার সহিত কোন গোপন আচরণ করিতে তাহার মন ক্ষুব্ধ হয়। দুঃখ পায় এই ভাবিয়া যে একটি শান্তিনীড় গড়িয়া উঠিতেছিল তাহা অকারণে ভাঙিয়া গেল। কিন্তু প্রেমের অকপট প্রকাশের এমনই মাধুর্য্য, পূর্ণিমার উপরেও সে রাগ করিতে পারে না। ওখানে যায় না বলিয়াই, পূর্ণিমার কথা ভুলিতে পারে না। ক্রমে এমন হইল, উপস্থিতি যাহা পারে নাই, পূর্ণিমার স্মৃতি তাহা ঘটাইয়া তুলিল। অসিত ঠিক করিল সে বাড়ীতে জানাইবে যে সে পূর্ণিমাকে বিবাহ করিতে অভিলাষী।

ঠিক করিল বটে, কিন্তু বলিয়া ফেলিতে পারিল না। তাহাদের সংসারে এ বিষয়ে খোলাখুলি কথা হইবার জো ছিল না। এই ভাবিয়া সে ক্ষুণ্ণ হইল, অনিলের এরূপ অবস্থা হইলে তাহার মাকে বা বাবাকে জানাইতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করিলেও চলিত। নিবিড় স্নেহের ক্ষেত্রেও এই মানসিক ব্যবধানে সে অত্যন্ত পীড়িত বোধ করিল।

অসিতের আকস্মিক অনুপস্থিতিতে সুনয়নী ব্যস্ত হইলেন। পূর্ণিমা বুঝিয়াও স্পষ্ট কিছু বলিতে পারিল না। তথাপি অসিতের এই ব্যবহারের কোন অর্থ খুঁজিয়া পাইল না। তাহার মনের কথা সে একান্ত বিশ্বাসে প্রকাশ করিয়া

দিয়াছে বলিয়াই কি এই শাস্তি তাহাকে পাইতে হইবে যে অসিতের সঙ্গও তাহার পক্ষে এখন দুর্লভ। আর মা যদি সত্য কারণটি সন্দেহ করিয়া বসেন—সে লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। কিন্তু প্রেমের গতি এমনি দুশ্চিন্ত্য, এই লজ্জার মধ্যেই পূর্ণিমা আপনার অনুকূল অবলম্বন খুঁজিয়া পাইল। সে আবিষ্কার করিল, অসিত নিজেকে দুর্ব্বল মনে করে বলিয়াই নিজেকে দূরে রাখিয়াছে। তাহার আশা হইল, একদিন এই দুর্ব্বলতাই সবল হইয়া অসিতের সমস্ত চিত্তকে অধিকার করিবে ও তাহার নিকট টানিয়া আনিবে।

সমস্ত দুপুর নিজের সহিত যুদ্ধ করিয়া অসিত ক্লান্ত হইয়া পড়িল। তাহার মনের বাসনা প্রকাশ করিয়া বলিবার কোন সুযোগই সে পাইতেছে না অথচ পর্ণিমার সঙ্গের প্রচণ্ড আকর্ষণ ক্রমেই দুর্নিবার হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু তাহার মনের ভিতরকার চিরদিন পিতৃআজ্ঞা পালনে অভ্যস্ত মানুষটি তাহাকে বলিতে লাগিল—যতদিন না পিতার সম্মতি পাইতেছ, ততদিন এ আকর্ষণে গা ভাসাইয়া দিবার অধিকার তোমার নাই। মনের এমনি একটা তৃপ্তিহীন বিস্রস্ত অবস্থায় সেদিন এমন একটা ঘটনা ঘটিয়া গেল যাহার জন্য কেহই প্রস্তুত ছিল না এবং বিরাট ভূমিকম্পে যেমন শোনা যায় যে পৃথিবীর ভূসংস্থান কখনো কখনো বিধ্বস্ত হইয়া সম্পূর্ণ নূতন আকার গ্রহণ করে, অসিতের জীবনে ঠিক সেইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া তাহার জীবনেতিহাসের ধারাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিল।

বিকালের দিকে সে বাহির হইয়া যাইতেছিল, বিনয়কৃষ্ণ ডাকিয়া বলিলেন, তোমার একটা চিঠি আছে নিয়ে যাও।

খামখানি হাতে পাইয়া অসিত দেখিল, পূর্ণিমার চিঠি; আরো দেখিল তাহা খোলা হইয়াছে। বিস্মিত হইয়া পিতার মুখের দিকে চাহিল। বিনয়কৃষ্ণ বলিলেন—এমন সময়ও আসে যখন বাপ ছেলের চিঠি খুলে দেখতে কুণ্ঠিত বোধ করে না। তোমার এ চিঠি খুলেছি বটে, পড়িনি। যে চিঠি থেকে এই ছবি বেরোয়, তার কথাগুলি পড়া দরকার করে না। এই বলিয়া তিনি ফতুয়ার পকেট হইতে একখানি ছোট ফটোগ্রাফ বাহির করিয়া অসিতের হাতে দিলেন। অসিত দেখিল—পর্ণিমার স্ন্যাপ্—তাহার একপাশে লেখা—"with kisses four."

ব্যাপারটা এই, সুনয়নীর তাগাদায় পর্ণিমা অসিতকে আসিবার জন্য লিখিতে বসিয়া একেবারে কেতাদুরস্ত কেজো চিঠি লিখিতে পারিল না। তাই শেষ ছত্রে

লিখিয়া দিল,—অনেকদিন আসেন নি, হয়ত দেখে চিনতে পারবেন না; তাই আমার নতুন-তোলা ছবি একটা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

অসিতের তৎক্ষণাৎ মনে পড়িয়া গেল—কিছুদিন পূর্ব্বেই কীট্স-এর সুবিখ্যাত গাথাটির ব্যাখানে ও আলোচনায় তাহারা অনেক সময় কাটাইয়াছিল। সে বেশ বুঝিতে পারিল, এই ছোট্ট কোটেশনটি দিয়া কাব্যোক্তা নিষ্ঠুরা মোহিনীর নির্ম্মম নির্দ্দয়তা পর্ণিমা উল্টাইয়া তাহারই স্কন্ধে আরোপ করিতে চাহিয়াছে।

এই সব সূক্ষ্ম জটিল তথ্য বিনয়কৃষ্ণকে বুঝাইয়া বলা অসিতের পক্ষে অসম্ভব। সে শুধু সংযতভাবে নিবেদন করিল—ব্যাপারটা খুব মারাত্মক নয়; ওরা যে বিলিতি ধরণে মানুষ।

—তবে তাঁরা তাঁদের মেম-সাহেবী চাল নিয়ে থাকুন—ওদের বাড়ী যাবার তোমার আর দরকার নেই।

হঠাৎ ঘা খাইয়া অসিত কেমন একটু বেপরোয়া হইয়া উঠিল। আসলে ভিতরে ভিতরে উষ্মা জমিতেছিল, তাহার সমস্ত বাষ্পটুকুকে সে আর গলাধঃকরণ করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিল—

—আমি বোধ হয় এখন এত ছোট নেই যে আপনি এরকম আদেশ করতে পারেন।

—তুমি এখনও এত বড় হওনি যে আমার কথার বিরুদ্ধে যেতে পার।

অসিতের নব-আস্বাদিত স্বাধীনতার অভিমানে ঘা লাগিল, বলিল—

—সব অধিকারেরই একটা সীমা আছে, আপনারা তা না মান্লে—

বিনয়কৃষ্ণ অত্যন্ত রাশভারি মানুষ, প্রতিবাদ তাঁর অসহ্য। তাঁর ফলাও কারবার তিনি সামান্য আরম্ভ হইতে স্বহস্তে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন বলিয়া কখনও কাহারো তাঁবেদারি করেন নাই—চিরদিন প্রভুত্ব করাই তাঁহার অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। পারিবারিক ব্যাপারে তিনি একেবারে রুষ সম্রাট; কোন বিষয়ে যে তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধে অন্য মত হইতে পারে, ইহা তাঁহার ধারণার অতীত। রাগিলেও চীৎকার করা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ; তাই সংযত স্বরেই বলিলেন—পিতার অধিকারের সীমা! আমি যতদিন আছি, যা বলি তাই শুন্তে হবে। তারপর একটু থামিয়াই বলিলেন, কালসাপিনী দেখছি এরই মধ্যে বিষ চারিয়েছে কম না।

সুনয়নীর উদ্দেশ্যে এই ব্যঙ্গোক্তিতে অসিত ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। বলিল—

—আপনি যাঁর বিরুদ্ধে এই বিশ্রী ইঙ্গিত করলেন তাঁকে আমি মায়ের মতই শ্রদ্ধা করি, তাঁর মত মহৎ চরিত্র—

—তুমি আর কোথাও দেখনি এই ত? বলি এই খবরটি জান কি, তোমার এই নতুন মাটি তোমার নতুন বাবার বিবাহিতা স্ত্রী নন্?—এই বলিয়া বিনয়কৃষ্ণ ভাবিলেন, অসিতকে তিনি একেবারে নিবাইয়া দিয়াছেন।

অসিত এ সংবাদ জানিত না। শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। কিন্তু তখন তাহার রক্তে আগুন ধরিয়া গিয়াছে। বিদ্রোহের তীব্র মদিরা তাহার মগজের মধ্যে চন্‌চন্ করিয়া উঠিল। সে বলিল—না, জানি না; কিন্তু জান্‌লেও কিছু এসে যেতো না। তাঁর প্রতি ভক্তি না কমে বেড়েই যেতো। তাঁর সংসার পাপের আর আমাদের পুণ্যের, এই যদি সত্যি হয় তবে আমি বিবাহের পবিত্রতায় সিকি পয়সা বিশ্বাস করি না। আমার মতে স্বাধীন মুক্ত প্রেমের চেয়ে মহত্তর সংসারে কোন কিছুই নেই। এইবার বিনয়কৃষ্ণ চমকিয়া উঠিলেন। এ প্রত্যুত্তর তিনি প্রত্যাশা করেন নাই। ছেলের মুখে বাপ মায়ের বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে এই বিরূপ কটাক্ষে তাঁহার সমস্ত মন বিষাইয়া উঠিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন—মুক্ত প্রেমে যদি এতই তোমার রুচি, যাও সেই মুক্ত জীবনই যাপন করো গে। আমার সংসারে তোমার আর স্থান নেই।

—বেশ, তাই হোক, আমি চল্লুম; স্নেহের অত্যাচারের চেয়ে ঘৃণার স্বাধীনতা বেশী অসহ্য হবে না।

কোন হাঁকডাক হইল না, কাহারও কণ্ঠস্বর উচ্চ হইল না, সংসারে তৃতীয় প্রাণীটি জানিল না, অথচ পিতা পুত্রে অতি নির্ম্মম ব্যবধান হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়

দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র

[৩]

কোঁতের দৃষ্টবাদ (Positivism)

বঙ্কিমচন্দ্রের কিশোর বয়সে কোঁৎ (Auguste Comte)-এর Positivism (দৃষ্টবাদ) বঙ্গদেশে বেশ প্রসারলাভ করিয়াছিল। কি সূত্রে কাহার মারফৎ ঐ মতবাদ প্রথম এ প্রদেশে আনীত হয়—বাংলার দর্শনালোচনার ইতিহাসে উহা একটি স্মরণীয় ঘটনা; কিন্তু তাহা আমার ইতিহাস-জ্ঞানের সংকীর্ণ গণ্ডীর বহির্ভূত। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বয়সে তিনি যে ঐ Positivism বা দৃষ্টবাদ দ্বারা সবিশেষ প্রভাবিত হইয়াছিলেন, ইহা নিঃসন্দেহ।* এমন কি তাঁহার প্রবীণ বয়সের উপন্যাস 'দেবী চৌধুরাণী'র মুখবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র কোঁতের 'Catechism of Positive Religion' হইতে নিম্নোক্তিটি সমাদরের সহিত উদ্ধৃত করিয়াছেন—"The general law of Man's progress, whatever the point of view chosen, consists in this that Man becomes more and more religious" এবং 'ধর্মতত্ত্বে'র কয়েকস্থলে নিজ মত সমর্থনের জন্য কোঁতের অভিমতের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ১২৯২, ফাল্গুনের 'প্রচারে' লিখিয়াছিলেন—

চিত্তশুদ্ধি কেবল হিন্দুধর্মেরই সার, এমত নহে—ইহা সকল ধর্মের সার। ইহা হিন্দুধর্মের সার, খৃষ্টধর্মের সার, বৌদ্ধধর্মের সার, ইসলামধর্মের সার, নিরীশ্বর কোমৎ-ধর্মেরও সার। যাঁহার চিত্তশুদ্ধি আছে, তিনি শ্রেষ্ঠ হিন্দু, শ্রেষ্ঠ খৃষ্টিয়ান, শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ, শ্রেষ্ঠ মুসলমান, শ্রেষ্ঠ পজিটীভিষ্ট।

---

* এ সম্পর্কে 'বিবিধ প্রবন্ধ' প্রথম ভাগ, 'সাংখ্য দর্শন' দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, 'কমলাকান্তের দপ্তর' প্রথম সংখ্যা, 'কমলাকান্তের পত্র' প্রথম সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১২৮১, পৌষ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্রের অকৃত্রিম সুহৃদ্ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'কোম্‌ৎ দর্শন' সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ প্রবন্ধের আরম্ভ এই :—'কোম্‌ত দর্শন লইয়া এক্ষণে এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য সমাজে অনেক আন্দোলন চলিতেছে।'

বঙ্কিমচন্দ্রের এক বিশিষ্ট সুহৃৎ ছিলেন খিদিরপুরের প্রখ্যাত Positivist যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ। ইনি বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন। ইঁহার সহিত পরিচয়ের আমার সুযোগ ঘটিয়াছিল। দেখিয়াছিলাম ইনি শেষ অবধি Positivist মতবাদে অবিচলিত ছিলেন।

অধিকন্তু সমাজের শিক্ষকরূপে কোঁৎকে বঙ্কিমচন্দ্র অত্যুচ্চ বেদিতে স্থাপন করিয়াছেন।

রাজার অপেক্ষাও যাঁহারা সমাজের শিক্ষক তাঁহারা ভক্তির পাত্র।* * * রাজগণ ইহাদিগের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া তবে সমাজ শাসনে সক্ষম হয়েন। এই হিসাবে ভারতবর্ষে ভারতীয় ঋষিদিগের সৃষ্টি—এইজন্য ব্যাস, বাল্মীকি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, কপিল, গৌতম—সমস্ত ভারতবর্ষের পূজ্যপাদ পিতৃগণস্বরূপ। ইউরোপেও গলিলীও, নিউটন, কান্ত্, কোমৎ, দান্তে, সেক্সপীয়র প্রভৃতি সেই স্থানে।

কোঁতের Positivism-এর সার কথা কি? কোঁতের মতে মানবের চিন্তাধারা পর পর তিনটি 'ক্রম' পার হইয়া অগ্রসর হইয়াছে—আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক। 'In his opinion, the progress of human knowledge passed through three stages,—the theological, the philosophical and the 'positive' or scientific।* প্রথম বা আধিদৈবিক 'ক্রমে', মানুষ প্রত্যেক প্রাকৃতিক ব্যাপারের পশ্চাতে তাহার কারণ স্বরূপ দেবদেবীর কল্পনা করে—'regards all effects as the productions of supernatural agents.'

দ্বিতীয় বা আধ্যাত্মিক 'ক্রমে', ঐ সকল দেবদেবী অ-দৃষ্ট প্রতীকে পরিণত হইয়া ('The supernatural agents give place to abstract forces, personified abstractions') ধর্ম ও দর্শনের সাংকর্য্য সৃষ্টি করে।†

তৃতীয় বা আধিভৌতিক ক্রমই বৈজ্ঞানিক 'ক্রম'। এই 'ক্রমে' কার্য্যকারণের সুশৃঙ্খলা (the invariable relations of succession and similitude) সাব্যস্ত হইয়া মানবচিন্তা দৃষ্টবাদের (Positivism-এর) তুঙ্গ চূড়ায় সুস্থিত হয়।

কোঁতের সাক্ষাৎশিষ্য লুইস্ (George Henry Lewis) গুরুর ঐ ত্রি-ক্রম-বাদ এইরূপে বিবৃত করিয়াছেন :—

* An Outline of Modern Knowledge (Gollancz), p. 65.

† ২।২০ 'গীতাভাষ্যে' বঙ্কিমচন্দ্র কোঁতের এ মতের সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার উক্তি এই :—প্রাচীনকালে সকল দেশে, দর্শন ধর্মের স্থান অধিকার করে এবং ধর্ম দর্শনের অনুগামী হয়। ইহা উভয়েরই অনিষ্টকারী। ধর্ম দর্শন পরস্পর হইতে বিযুক্ত হইলেই উভয়ের উন্নতি হয়, নচেৎ হয় না। এই তত্ত্বটি সপ্রমাণ করিয়া কোম্‌ৎ ও তৎশিষ্যগণ দর্শন ও ধর্ম উভয়েরই উপকার করিয়াছেন। আমাদিগেরও সেই মার্গাবলম্বী হওয়া উচিত।

Every branch of knowledge passes successively through three stages—1st, the *supernatural* or fictitious; 2nd, the *metaphysical* or abstract; 3rd, the *positive* or scientific. * * In the *supernatural* stage the mind seeks after causes; aspires to know the *essences* of things and their modes of operation. It regards all effects as the productions of supernatural agents, whose operation is the *cause* of all the apparent anomalies and irregularities. Nature is animated by super-human beings. * * In the metaphysical stage, the supernatural agents give place to abstract forces (personified abstractions) supposed to inhere in the various substances, and capable themselves of engendering phenomena. In the positive stage, the mind, convinced of the *futility* of all inquiry into causes and essences, applies itself to the observation and classification of laws which regulate effects; that is to say, the invariable relations of succession and similitude, which all things bear to each other.

অতএব কোঁতের মতে অধ্যাত্ম-চর্চ্চা একেবারেই নিষ্ফল—শুধু নিষ্ফল নয়, নিরর্থক—যেহেতু 'Positivism treats experience (অনুভূতি) as the *only* source of knowledge and is consequently opposed to all metaphysical speculation' (See 'Outline' p. 546)। অতএব ধর্ম নয়, দর্শন নয়—বিজ্ঞানই মানুষের উপজীব্য। কোঁতের মতে ঐ বিজ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ এইরূপ :—

He classifies the sciences in the order of their development, proceeding from the simpler to the more complex—mathematics, astronomy, physics, chemistry, biology and sociolgy.—The Modern Cyclopedia, Vol. VI, p. 507.

বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্মতত্ত্বে' কোঁতের এই বিদ্যাবিভাগ মোটের উপর অনুমোদন করিয়াছেন কিন্তু তিনি বিজ্ঞানের উপর 'প্রজ্ঞান' যোগ করিয়াছেন। গীতা বলিয়াছেন—তাহাই প্রকৃষ্ট প্রকৃত জ্ঞান যদ্দ্বারা—যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি (৪।৩৫)—ভূত, অহং ও ঈশ্বরকে জানা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন—

ভূতকে জানিবে কোন শাস্ত্রে? বহির্বিজ্ঞানে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীতে কোম্‌তের প্রথম চারি—Mathematics, Astronomy, Physics, Chemistry—গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থতত্ত্ব এবং রসায়ন। এই জ্ঞানের জন্য আজিকার দিনে পাশ্চাত্যদিগকে গুরু করিবে। তারপর আপনাকে জানিবে কোন শাস্ত্রে? বহির্বিজ্ঞানে এবং অন্তর্বিজ্ঞানে অর্থাৎ কোম্‌তের শেষ দুই—Biology ও Sociology; এ জ্ঞানও পাশ্চাত্যের নিকট যাচ্ঞা করিবে।

তারপর ঈশ্বর জানিবে কিসে? হিন্দুশাস্ত্রে। উপনিষদে, দর্শনে, পুরাণে, ইতিহাসে, প্রধানতঃ গীতায়।

কোঁৎ বিজ্ঞানকে যে উচ্চ কোঠায় স্থাপন করিয়াছেন, পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিক অনেকে তাহার অনুমোদন করেন না। তাঁহাদের মতের উল্লেখ করিয়া 'Outline of Modern Knowledge'-এর গ্রন্থকার যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আমাদের প্রণিধানযোগ্য।

There is also grave difference of opinion among students of natural science concerning the status of scientific knowledge. It is maintained by many that science can *never* be more than an abstract and descriptive series of formulas. There is therefore a need for philosophy in some deeper sense than a synthesis of the results of science, which was the humble role assigned to it by Comte.

তবেই 'বিজ্ঞান' পর্য্যাপ্ত নয়—'দর্শন' চাই।

সে যাহা হ'ক, দেখা যায় কোঁৎ ঈশ্বরতত্ত্বে অবিশ্বাসী বটেন, কিন্তু ধর্ম্মের প্রতি পক্ষপাতী। অর্থাৎ 'he had respect for religion but distrust of theology'। এ সম্পর্কে কোঁতের নিজের উক্তি এই :—

Religion in itself expresses the state of perfect *unity* which is the distinctive mark of man's existence both as an individual and in society, when all the constituent parts of his nature, moral and physical, are made habitually to converge towords one common purpose। অর্থাৎ Religion consists in regulating one's individual nature, and forms the rallying point for all the separate individuals.

অর্থাৎ ধর্ম চাই কিন্তু ঈশ্বর নাই। উপায়?

After doing away with theology and metaphysics, and reposing his system on science or positive knowledge alone, Comte discovered that there was something positive in man's craving for a being to worship. —Modern Cyclopedia p. 508.

সেইজন্য কোঁৎ ঈশ্বরের স্থলে 'মানব-দেবীর পূজা (The Cultus of Humanity)' প্রবর্ত্তিত করিতে চাহিলেন।

"He therefore had recourse to what he calls the 'cultus of humanity,' considered as a corporate being in the past, present and future, which is spoken of as the *Grand Etre.*

* * Yet the religious impluses of mankind were of the first importance and essential to social progress. He proposed therefore as a substitute for Deity the *Grand Etre*, Humanity, as the object of devotion and worship. Let us transfer the religious emotions from the Deity of the traditional religions to the conception of Humanity as a whole."

এ সম্পর্কে 'ধর্মতত্ত্বে' বঙ্কিমচন্দ্র এইরূপ লিখিয়াছেন—

"সমাজকে ভক্তি করিবে। ইহা স্মরণ রাখিবে যে, মনুষ্যের যত গুণ আছে, সবই সমাজে আছে। সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দণ্ডপ্রণেতা, ভরণপোষণ এবং রক্ষাকর্ত্তা। সমাজই রাজা, সমাজই শিক্ষক। ভক্তিভাবে সমাজের উপকারে যত্নবান্ হইবে। এই তত্ত্বের সম্প্রসারণ করিয়া ওগুস্ত কোমৎ 'মানবদেবীর' পূজার বিধান করিয়াছেন। সুতরাং এবিষয়ে আর বেশী বলিবার নাই।"

তাই কি? কিছুই কি বলিবার নাই? আছে বলিয়াই ঐ 'Outline'-এর লেখক 'মানবদেবীর' পূজার প্রতি কটাক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন—

The idea of humanity as an object of worship opens up insoluble difficulties. Humanity, as we know it, does not appear worthy of worship, and if we amend our creed to indicate that we worship *idealised* humanity, we are confronted with the somewhat remarkable demand that we should worship what, in the theory of Positivism itself, does not exist and is, moreover, incapable of being adequately described.

অতএব ঈশ্বরকে বাদ দিয়া ধর্মস্থাপন অনেকটা শূন্যে গন্ধর্বনগর রচনের অনুরূপ 'অঘটনঘটন'। বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরের সহিত সম্পর্কহীন ধর্মে বিশ্বাস করিতেন না। তিনি বলিয়াছেন ঈশ্বরভক্তিই ধর্মের সারাৎসার। তাঁহার মতে ভক্তি মনুষ্যের সেই উন্নততম অবস্থা—যখন তাহার সকল বৃত্তিগুলি ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানুবর্ত্তিনী হয়। অর্থাৎ 'ঈশ্বরে ভক্তিই পূর্ণ মনুষ্যত্ব'। তিনি লিখিয়াছেন 'ধর্ম ঐশ নিয়মাধীন' এবং বলিয়াছেন যে জ্ঞান উপাদেয় এই জন্য যে, জ্ঞান ভিন্ন ঈশ্বরকে জানা যায় না, ঈশ্বরের বিধিপূর্ব্বক উপাসনা করা যায় না।

সত্য বটে, কোঁৎ বলিতেন, 'শিক্ষা ধর্মের অংশ'। বঙ্কিমচন্দ্রও বলিয়াছেন নিরীশ্বর কোঁৎ-ধর্ম অনুশীলনের অনুষ্ঠান পদ্ধতি মাত্র বলিয়াই বোধ হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের আদরের 'মটো' ছিল, ধর্মের সার কর্ষণ, অনুশীলন—The substance of religion is culture। কিন্তু তাঁহার অনুমোদিত সেশ্বর অনুশীলনতত্ত্ব ও দৃষ্টবাদী কোঁতের নিরীশ্বর অনুশীলনতত্ত্বে আকাশ পাতাল প্রভেদ। বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মতত্ত্বে এ সম্পর্কে লিখিয়াছেন—

বিলাতী অনুশীলনতত্ত্ব নিরীশ্বর এইজন্য উহা অসম্পূর্ণ ও অপরিণত—অথবা উহা অসম্পূর্ণ বা অপরিণত বলিয়াই নিরীশ্বর,—ঠিক সেটা বুঝি না। কিন্তু হিন্দুরা পরম ভক্ত, তাহাদিগের অনুশীলনতত্ত্ব জগদীশ্বরের পাদপদ্মেই সমর্পিত।

অতএব বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ঈশ্বর ভিন্ন ধর্ম নাই এবং 'ধর্মতত্ত্ব' প্রচারের কিছুদিন পূর্বে 'Nineteenth Century'তে হার্বার্ট স্পেন্‌সর্ কোঁতের মত-প্রতিবাদে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন ('Inscrutable Power in Nature')—যাহা মর্মতঃ বেদান্তের অদ্বৈতবাদের প্রতিধ্বনি—বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে সাদরে ধর্মতত্ত্বে স্থান দিয়াছেন।

ইহাও বক্তব্য, 'মানব-দেবী' পূজার বিধান থাকিলেও কোঁৎ-ধর্ম নীরস। বঙ্কিমচন্দ্র 'ভালবাসার অত্যাচার' প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন :—

কিন্তু জ্ঞানেরও অত্যাচার আছে। তাহার উদাহরণ হিতবাদ ও প্রত্যক্ষবাদ (আমি যাহাকে 'দৃষ্টবাদ' বলিতেছি)। এতদুভয়ের বেগে মনুষ্যহৃদয়-সাগরের অনন্তভাগ চড়া পড়িয়া যাইতেছে।

যাইবারই কথা। যে বাদে সেই রসামৃতসিন্ধুর বিন্দুমাত্র নাই—তাহা ত' নীরস হইবেই হইবে।

কোঁতের মতে প্রত্যক্ষ ও তন্মূলক অনুমান ব্যতীত প্রমাণান্তর নাই। ঈশ্বর খুব সম্ভব কাল্পনিক—যদিই বা না হন, তিনি যখন অ-দৃষ্ট, তখন অবশ্যই দৃষ্টবাদীর পরিত্যাজ্য।

এক সময় বঙ্কিমচন্দ্র প্রমাণ সম্পর্কে অনুরূপ ধারণাই পোষণ করিতেন। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 'জ্ঞান' প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন—'অতএব প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র মূল—সকল প্রমাণের মূল'। পরে যখন 'বিবিধ প্রবন্ধে' সংকলিত হইয়া ঐ 'জ্ঞান' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তখন বঙ্কিমচন্দ্র পাদটীকায় লিখিলেন—'এই সকল মত আমি এক্ষণে পরিত্যাগ করিয়াছি' এবং 'ধর্মতত্ত্বে' পাঠককে সতর্ক করিলেন—'সকল জ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক নহে। ইহা ভগবদ্‌গীতার টীকায় বুঝান গিয়াছে—পুনরুক্তি অনাবশ্যক'।

কোনও কোনও দার্শনিকের মতে আমাদের যে আত্মা বা অহংতত্ত্ব, তাহা কখনও জ্ঞানের গোচর হয় না—হইতে পারে না। ভগবদ্‌গীতার টীকায় বঙ্কিমচন্দ্র ইহার প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন—'চিত্তবৃত্তিসকল সম্যক্ মার্জিত হইলে আত্মসম্বন্ধীয় এই জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ হয়।' এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ঈশ্বরও যোগশুদ্ধ চিত্তের প্রত্যক্ষ হন। 'দেবী চৌধুরাণী'তে দেবীর মুখ দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র একথা প্রতিপন্ন করিয়াছেন—

দেবী।—চক্ষুরাদি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, হস্ত-পদাদি পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়—আর ইন্দ্রিয়াধিপতি মনঃ উভয়েন্দ্রিয়। * * মনের দ্বারাও প্রত্যক্ষ আছে—ইহাকে মানস প্রত্যক্ষ বলে। ঈশ্বর মানস প্রত্যক্ষের বিষয়।

নিশি।—'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ প্রমাণাভাবাৎ'

(সাংখ্যসূত্র)

প্রফুল্ল।—সূত্রকারস্ত উভয়েন্দ্রিয়-শূন্যত্বাৎ—ন তু প্রমাণাভাবাৎ * * চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয়—রূপ, বহির্বিষয় ; মানস প্রত্যক্ষের বিষয়—অন্তর্বিষয়। মনের দ্বারা ঈশ্বর প্রত্যক্ষ হইতে পারেন।

সেই প্রাচীন কথা—

দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ

—কঠ উপনিষদ্

অতএব দেখা গেল হার্বার্ট্ স্পেনসরের অজ্ঞেয়বাদ (Agnosticism)—যাহা বলে ঈশ্বর অজ্ঞেয় অমেয় অচিন্ত্য অতর্ক্য—বঙ্কিমচন্দ্র ইহার অনুমোদন করেন না। বস্তুতঃ, শ্রীমতী অ্যানি বেসান্টের ভাষায়,—Man, being divine in essence, *can* know God'. তবেই বঙ্কিমচন্দ্র Agnostic নন, Gnostic.

আমরা দেখিয়াছি, কোঁতের কাছে প্রত্যক্ষ ও অনুমান ভিন্ন প্রমাণান্তর নাই —অর্থাৎ কোঁৎ আপ্তবাক্য বা আগমের প্রামাণ্য মানিতেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের কি মত ?

আমরা দেখিয়াছি—'ঈশ্বর জানিব কিসে ?' এ প্রশ্নের উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন—'হিন্দু শাস্ত্রে—উপনিষদে, দর্শনে, পুরাণে, ইতিহাসে, প্রধানতঃ গীতায়'। এই সকল হিন্দুশাস্ত্র-প্রণেতা ঋষিদিগকে বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ সমাদর করিতেন। তিনি 'ধর্মতত্ত্বে' লিখিয়াছেন—

'প্রাচীন ঋষি এবং পণ্ডিতগণ অতিশয় প্রতিভাসম্পন্ন এবং মহাজ্ঞানী। তাঁহাদের প্রতি বিশেষ ভক্তি করিবে, কদাপি অমর্য্যাদা বা অনাদর করিবে না। * * আমিও সেই আর্য্য ঋষিদিগের পদারবিন্দ ধ্যানপূর্ব্বক, তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথেই যাইতেছি।

ভগবদ্গীতার টীকায় বঙ্কিমচন্দ্র স্থানে স্থানে গীতোক্তিকে ভগবদ্-উক্তি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।* ভগবদ্গীতা তাঁহার দৃষ্টিতে চরম আগম। গীতা এক্ষণে আমরা যে শ্লোকাকারে পাই, উহাই যে ভগবানের মুখকমল-নিঃসৃত, বঙ্কিমচন্দ্র এরূপ মনে করিতেন না কিন্তু গীতার মুখ্য প্রতিপাদ্য যে ভগবদ্-উক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন।

কেহ কেহ অনুমান করেন, বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্ম কোঁৎ-ধর্মেরই পূর্ব্বরূপ—অর্থাৎ বুদ্ধদেবও দৃষ্টবাদী ছিলেন। এ অনুমান ভিত্তিহীন। যে বুদ্ধদেব বলিতেন—দৃষ্টের চেয়ে অ-দৃষ্ট অনেক বড় ('The unseen things are more') —যিনি চর্মচক্ষুর পশ্চাতে দৈব চক্ষুঃ মানিতেন ('The superhuman celestial

* ৩।১৬ ও ৩।৩৭ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

seeing)—যে বুদ্ধদেব প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, এই 'জাত ভূত কৃত সংখত' বিশ্বের পশ্চাতে এক 'অজাত অভূত অকৃত অসংখত (unborn, uncreate, unbecome, unevolved)' শাশ্বত সত্তা বিদ্যমান আছে—তাঁহাকে দৃষ্টবাদী বলা খুব সাহসিকতা নয় কি ?

সে যাহা হ'ক, একথা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, বঙ্কিমচন্দ্র কোঁতের যথেষ্ট অনুরাগী হইলেও 'দৃষ্টবাদী' ছিলেন না।

আগামী বারে আমরা হিতবাদের আলোচনা করিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

থার্মোফ্লাস্ক ও চীনের যুদ্ধ

সদ্য ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর চেতনা যখন ধীরে ধীরে সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে যেতে থাকে তখনকার অবস্থাটা প্রশান্তর কাছে বিশেষ উপভোগের জিনিষ।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে নিজেকে যেন সে আবিষ্কার করতে থাকে সবিস্ময়ে,—এক এক করে' সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, তারপর অত্যন্ত কাছের আবেষ্টন, তারপর আরও জটিল, আরো বহুদূর প্রসারিত, বহু সম্পর্কে জড়িত সত্তা।

তার মনে হয়, বাঁচাটাও একটা আপেক্ষিক ব্যাপার, জেগে ওঠা সচেতনতার নানা স্তরে ভাগ করা। সকলে সব স্তরে পৌঁছোয় না, সব সময়ে একই স্তরে থাকে না। ক্যামেরার লেন্সের মত সচেতনতার ক্ষেত্রও সীমাবদ্ধ, দূরের দিকে ফেরালে কাছের জিনিষ ঝাপসা হয়ে আসে। ক্যামেরা তবু অনন্ত লক্ষ্য করে' মোটামুটি সব কিছুই স্পষ্ট করতে পারে, আমাদের সচেতনতা তেমন নয়।

আজ কিন্তু প্রশান্ত এসব কিছু ভাবছে না। ঘুম তার এইমাত্র ভেঙ্গেছে। চেতনার জোয়ার শরীর মনের প্রান্তে গিয়ে পৌঁছেছে। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে এতক্ষণ সে শেলফের ওপর চটা-ওঠা তোবড়ান থার্মো-ফ্লাস্কটার দিকে চেয়েছিল বুঝে সে নিজেই অবাক হয়ে যায়।

সেদিন পর্য্যন্ত এরকম ত সে কখন করেনি। চোখ গিয়ে পড়লেও সে ইচ্ছে করে ফিরিয়ে নিয়েছে। মনের এদিকের কপাট সে সযত্নে রেখেছে বন্ধ করে, প্লাবনের জল রুদ্ধ করে রাখবার জন্যে এ যেন তার অবচেতন মনের বাঁধ। কিন্তু আজ হঠাৎ কি হল! বাঁধের কপাট খোলা, তবু কিছুই ত ভেসে যায় নি দুর্বার বন্যায়!

অবশ্য থার্মোফ্লাস্কটা ছাড়া আরো অনেক কিছু সে লক্ষ্য করেছে। বিছানার ধারে 'টিপয়ে' চাকরে চা রেখে গেছে। তারই সঙ্গে খবরের কাগজ। চীনের ওপর জাপানের অত্যাচার সম্বন্ধে ছাপার হরফের তীব্র আর্ত্তনাদ সেখানে সমস্ত কাগজটার ওপর এমনভাবে বিস্তৃত যে লক্ষ্য না করে উপায় নেই। জাপানী উড়ো জাহাজের বোমায় বিধ্বস্ত চীনের নগরের খানিকটা বড় হরফে ছাপা

বিবরণও বুঝি অন্যমনস্কভাবে সে পড়ে ফেলেছে, কিন্তু তবু তার দৃষ্টি যে বেশীর ভাগ থার্মোফ্লাস্কটার ওপরই ছিল একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

শুধু দৃষ্টি নয় তার চিন্তাও ওই থার্মোফ্লাস্ককে কেন্দ্র করে অনেক দূর ঘুরে এসেছে—সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর। সেইটেই আশ্চর্য্য! এসব চিন্তাকেই ত সে এতদিন সাবধানে, সযত্নে দূরে ঠেলে রেখেছে। এত প্রবল ভাবাবেগে যে সমস্ত চিন্তা, যে সমস্ত স্মৃতি উদ্বেলিত যে একবার আমল দিলে আর সে থই পাবে না, বাস্তবতার বাঁধা স্বাভাবিক সুস্থ বুদ্ধির নোঙরও তার উপড়ে যাবে, একথা সে জানত, তাই সে কবাট বন্ধ করে রেখেছে, মনের সুইচ কেটে দিয়েছে সামান্য একটু বিপদের আভাসে।

কিন্তু আজ অনায়াসে তার মন ত ঘুরে এল, সুদূর ও অতি নিকট সেই পাঁচ বৎসরের ওপর দিয়ে! কোথায় গেল সে দুঃসহ জ্বালা, বুক-ভেঙে-দেওয়া যন্ত্রণা। স্মৃতির সামান্য একটু ছোঁয়ায় যে ক্ষত টনটনিয়ে উঠত তা যেন অসাড় হয়ে এসেছে। সূর্য্যাস্তের মেঘের মত ভাবাবেগের উজ্জ্বল আভা হারিয়ে স্মৃতি এখন বিবর্ণ। তার দিকে তাকাতে চোখ আর ঝলসে যায় না। তার রূপ আছে, রঙ নেই।

অথচ একদিন এই স্মৃতির কোন অবলম্বন না রাখবার জন্যেই সে সব চিহ্ন ব্যাকুলভাবে মুছে ফেলেছিল। কিছুই সে রাখেনি, একটা ছবি পর্য্যন্ত না। শুধু এই থার্মোফ্লাস্কটা কেমন করে আর ফেলে দেওয়া হয়নি। মাথার দিকে চোখের আড়ালে একটা রঙ-চটা টোল-খাওয়া পুরানো থার্মোফ্লাস্ক! সেটা ভুলেই থেকে গেছে, সেটাকে ভুলে থাকাও খুব কঠিন হয়নি।

একটা রঙ-চটা পুরানো থার্মোফ্লাস্কও অবশ্য অনেক দূর নিয়ে যেতে পারে, —তিন বৎসর আগেকার সুদূর লক্ষ্ণৌ শহরের ষ্টেশনে।

শীত! হ্যাঁ তখন শীত বইকি। গাড়িতে উঠেই মনে আছে সে জানলার কাঁচ তুলে দিতে চেয়েছিল। মায়া বলেছিল, না এখন থাক।

কিন্তু ভয়ানক ঠাণ্ডা, তুমি বুঝতে পারছ না! গাড়ি চলতে সুরু করলেই হাওয়ায় একেবারে জমে যাবে।

আমার কণকণে হাওয়া ভাল লাগে।—বলে মায়া শুধু গায়ের আলোয়ানটা ভালো করে জড়িয়ে নিয়েছিল।

প্রশান্ত একটু অপ্রসন্ন স্বরে বলেছিল,—এদিকে ঠাণ্ডাও ত লাগে কথায় কথায়!

সেই ভয়ে জবুথবু হয়ে থাকতে পারব না।

বেশ! নিউমোনিয়া হলে কিন্তু জানি—না!

মায়া হেসেছিল—তখন আমায় না হয় নামিয়ে দিও!

কোথায়?—প্রশান্ত এবার পরিহাস করে বলেছিল—এলাহাবাদে?

মায়া তার দিকে অদ্ভুতভাবে খানিকক্ষণ চেয়েছিল নীরবে। শুধু আহত অভিমান নয়, সে দৃষ্টিতে তখনই বুঝি একটু দুর্বোধ আতঙ্কের ছায়া পড়েছে।

যেন অনেকক্ষণ বাদে নিজেকে সংযত করে মায়া বলেছিল—এলাহাবাদ হয়ে ত আমরা যাচ্ছি না।

এই রকম উত্তরই প্রশান্তকে সবচেয়ে বিচলিত করেছে তখন। এরকম উত্তর সে চায় না, বুঝতে পারে না তার মানে। মায়া ত অনায়াসেই কথাটাকে পরিহাস হিসেবেই গ্রহণ করতে পারত। বলতে পারত অনায়াসে—হ্যাঁ তাই দিও। কিন্তু মায়া তার ধার দিয়েও যায় না। এটা কি তার কাছে পরিহাসের জিনিষ নয় বলেই! প্রশান্তর অস্বস্তি তীব্র হয়ে উঠেছে।

তবু সে পরিহাসের সুর বজায় রেখে বলেছে—ভাগ্যিস্ যাচ্ছি না।

তারপর মায়ার কাছে কোন উত্তর না পেয়ে বলেছে,—জানলা যখন খুলে রাখবেই তখন একটু ওষুধের ব্যবস্থা করতে হয়।

ষ্টেশনের 'ষ্টল' থেকে তখনই থার্মোফ্লাস্কটা সে কিনে এনেছিল—কিনে, ধুয়ে, গরম চা ভর্ত্তি করে।

গাড়ি তখন ছাড়ে ছাড়ে। মায়া বলেছিল,—এই জন্যে তুমি নেমে গেছলে? কি দরকার ছিল?

দরকার খানিক বাদেই টের পাবে—দু একবার হাঁচি সুরু হোক্ না!

কত নিলে শুনি?

তা বেশ নিলে,—তিন টাকা!

তিন টাকা! মায়া বিরক্ত হয়ে ভর্ৎসনা করে উঠেছিল—তিন টাকা দিয়ে তুমি এইটে কিনতে গেলে! বাজারে যে দু টাকার কমে পাওয়া যায়!

কিন্তু এটা ত বাজার নয়, ষ্টেশন, এবং বাড়ী নয়, আমরা ট্রেণের যাত্রী।

মায়া ব্যাপারটাকে তবু উড়িয়ে দিতে পারেনি। একটা টাকা অকারণে লোকসান করে' আনবার জন্যে অনেকক্ষণ ধরে ভর্ৎসনা করেছে।

এখানেও মায়া দুর্বোধ। তুচ্ছ লাভ লোকসানের হিসাব সম্বন্ধে তার এই ব্যাকুলতায় প্রশান্ত আগেও অবাক হয়ে গেছে। জীবনের গভীরতম ব্যাপারে যে নিরাসক্ত, প্রশান্তর সমস্ত আকুলতা যার কঠিন নির্ব্বিকার ঔদাসীন্যে আঘাত খেয়ে ফিরে আসে, সংসারের সামান্য এই লাভ লোকসানের হিসাব তার কাছে এত মূল্যবান কি করে হতে পারে!

প্রশান্ত চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে খবরের কাগজটা টেনে নেয়। বিধ্বস্ত চীন চীৎকার করে' তার মনোযোগ দাবী করছে। প্রত্যক্ষদর্শী একজন সাংবাদিকের বিবরণ বেরিয়েছে। চোখের ওপর তিনি বিশাল নগরকে ধ্বংস হতে দেখেছেন। নগরের বিচিত্র জটিল জীবন-লীলায় পড়েছে অকস্মাৎ রাসায়নিক ছেদ। নগরের ধ্বংসস্তূপের মাঝে মৃত ও মুমূর্ষু নরদেহ সব প্রোথিত হয়ে আছে, মাতার ও শিশুর, প্রিয়া আর প্রেমিকের, বন্ধু ও শত্রুর। ছাপার হরফে সে ছবি আর কতটুকু পাওয়া যায়! অক্ষরগুলো অনুবাদ করে যে ছবি গড়ে ওঠে তার উপকরণ ত প্রত্যেকের নিজের মন থেকেই নেওয়া। নিজের মনের ছবিই ত অস্পষ্ট হয়ে আসে। থার্মোফ্লাস্কের টিনের খোলে যে টোল-খাওয়ার দাগ;—সেটা কখনকার?

সেই মাছ ধরতে গিয়ে বোধহয়। কলকাতা থেকে কিছু দূরে রেলওয়ে 'কাটিংসে'র বিরাট জলায় সেবার গেছল মাছ ধরতে বেশ সমারোহ সহকারে।

মাছ ত কত ধরবে জানি! আয়োজনে যা খরচ করলে তাতে দু'চারটে বড় বড় মাছ কেনা যেত—মায়া বলেছিল যাবার সময়।

প্রশান্ত হেসে বলেছিল—সেটা মাছ কেনা হ'ত, মাছ ধরা নয়। মাছ ধরায় মাছটা নগণ্য। পুরুষের এ নিষ্কাম বিলাসের মর্ম্ম তোমরা বুঝবে না। তুমি ফ্লাস্কটা ভর্ত্তি করে চা দাও দেখি।

অত চা কি হবে। তুমি যা চা-খোর, এক পেয়ালাই ত যথেষ্ট তোমার একলার।

একলা কি! অরুণবাবু যাচ্ছেন ত! এলাহাবাদ থেকে গ্রীষ্মের ছুটিতে এসেছেন, তোমায় বলিনি বুঝি!—যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক কণ্ঠে সাধারণ ভাবে বলার চেষ্টা করেছে প্রশান্ত।

এই ত বল্লে !—মায়ার চোখের দৃষ্টি দুর্বোধ।—কিন্তু একসঙ্গে মাছ ধরতে যাওয়ার মত আলাপ তোমাদের কখন হ'ল।

এবারেও মায়ার এ ধরণের প্রতিক্রিয়া প্রশান্ত আশা করেনি। নিজের তৈরী যন্ত্রণাটা নিদারুণ করে তোলার নেশায় সে বলেছিল,—হ'ল এই দু'দিনেই। ইচ্ছে থাকলে আলাপ করতে কতক্ষণ লাগে। তবে মাছ ধরতে যাচ্ছেন আমার পেড়াপীড়িতে। তাঁর বিশেষ সখ নেই।

তোমারই কি শুধু মাছ ধরার সখ !—বলে মায়া চলে গেছল প্রশান্তকেই কেমন একটু অপ্রস্তুত করে রেখে।

সারাক্ষণ সেদিন বৃষ্টি পড়েছে, কখন মুষলধারে, কখন ঝিরঝিরিয়ে। তার সঙ্গে মাঝে মাঝে প্রবল হাওয়া। কাটিংসের বিস্তীর্ণ জলার ধারে প্রকাণ্ড মাছ ধরবার ছাতির তলায় ওয়াটারপ্রুফ মুড়ি দিয়ে নিরাপদে নির্জ্জনে বসে থাকাটাই উপভোগের জিনিষ। জলের গায়ে বৃষ্টির ছাটে ক্ষণে ক্ষণে কাঁটা দিয়ে উঠ্ছে, মসৃণ সিল্কের কাপড়ের মত জল ভাঁজে ভাঁজে কুঁচকে যাচ্ছে হাওয়ার বেগে, দূরে রেলের বাঁধ ঝাপ্‌সা হয়ে যাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। আকাশে গাঢ় কালো থেকে ফ্যাকাশে ছাই রঙের নানা জাতের মেঘের বিচিত্র আলোড়ন। আর প্রকৃতির এই বিশুদ্ধ অসীমতার রূপের মধ্যে মানুষের একটু জুৎসই যান্ত্রিক ভেজাল—মাঝে মাঝে দূরের এম্‌ব্যাঙ্কমেণ্টের ওপর দিয়ে দুরন্ত বেগে ট্রেণ যাচ্ছে ছুটে, সমস্ত দৃশ্যকে দুর্লভ অপ্রত্যাশিত মহিমা দিয়ে।

কিন্তু প্রশান্ত এসব উপভোগ করেছে কি ? বোধ হয় না।

আপনার চারে যেন মাছ এসেছে মনে হচ্ছে !—প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করেছে। কাছাকাছি দুটি ছাতির তলায় তাদের আসন।

না, ও শুধু জলের ছাটে ফাৎনা কাঁপছে।—অরুণবাবু বলেছেন।

মাছের ত দেখা নেই। এসেছেন বলে এখন আফশোষ করছেন না ত ?

কোন কিছুর জন্যে বৃথা আফশোষ করা আমার স্বভাব নয়।—অরুণবাবু বেশ বক্তৃতার মত সুর করে বলেছেন।

প্রশান্ত মনে মনে হেসেছে। অরুণবাবুর এই সস্তা খেলো দিকগুলো আবিষ্কার করে এ ক'দিন তার আনন্দের সীমা নেই। লোকটাকে ঘৃণা করবার এমন সৌভাগ্য তার হবে সে বিশ্বাস করতে পারেনি।

সত্যি লোকটা মেকী, আগাগোড়া নকল—নকল, কখন কোন উপন্যাসের, কখন কোন নতুন-পড়া মনস্তত্ত্বের বইএর, কখন একেবারে সাধারণ গড্ডলিকা-সংস্কারের। তৃতীয় শ্রেণীর নাটকের এক সাজান হতাশ প্রেমিক।

এই সস্তা নকল লোকটাকে উপলক্ষ্য করে নিজেকে এতখানি যন্ত্রণা দেওয়ার কি কোন প্রয়োজন আছে ? এ প্রশ্ন তার মনে না উঠেছে তা নয়। কিন্তু তবু একেবারে নির্ব্বিকার হ'তে তখনো সে পেরেছে কই !

হয়ত এমন করে বিচলিত হবার কিছুই নেই। সে নিজেও বুঝি নকল, তৃতীয় শ্রেণীর না হোক প্রথম শ্রেণীর নাটকের নায়কের। পুঁথিগত আবেগের তাড়নায় চালান যন্ত্র। এই ধার-করা খোলসটা খুলে ফেল্লেই হয়ত সব সহজ হয়ে যায়, সমস্ত সম্বন্ধ যায় সরল হয়ে। আসলে কোন জটিলতাই হয়ত নেই, কাল্পনিক জগতে কাল্পনিক সত্তা সৃষ্টি করে সে নিজেকে দগ্ধ করছে অকারণে।

কিন্তু এ কাল্পনিক সত্তা বিসর্জ্জন দেবার আর বুঝি উপায় নেই। একদিন ব্যাপারটা নিয়ে সে অনায়াসে পরিহাস করেছে। চার বছর বাদে বিদেশ থেকে ফেরবার পর গায়ে-পড়া হিতৈষীরা তার বাগ্দত্তা ভাবী পত্নী সম্বন্ধে সত্য মিথ্যায় মিলিয়ে শোনাতে তাকে কিছু বাকী রাখেনি।

সে নিজেই মায়াকে তাই পরিহাস করে' বলেছিল—আমার অসাক্ষাতে আর একটু হলেই নাকি তুমি লুট হয়ে যাচ্ছিলে। এলাহাবাদের এক অধ্যাপক নাকি উঠে পড়ে লেগেছিলেন।

মায়াও পরিহাসের সুরে ঘুরিয়ে উত্তর দিয়েছিল—তুমি কি আমাকে অতটা দামীও মনে কর না !

প্রশান্ত হেসে বলেছিল—নিশ্চয়ই করি এবং সেই জন্যে আমার মত বিচক্ষণ জহুরী আর কে আছে দেখতে চাইছি। তাঁর সঙ্গে আলাপ হ'লে খুশী হ'তাম।

মায়া গম্ভীর হয়ে বলেছে—না খুশী হ'তে না।

প্রশান্ত তখন হেসেছিল উচ্চৈস্বরে, কিন্তু সে হাসি কবে থেকে নিভে গেছে সে নিজেই ঠিক বুঝতে পারেনি। নিজেকে সে বোঝাবার চেষ্টা করেছে—এটা ভাল নয়, এটা অপ্রকৃতিস্থতার লক্ষণ। আধুনিক সভ্য মানুষের মনে এসব জিনিষের জায়গা নেই। কিন্তু ধীরে ধীরে তবু তার মন বদলে গেছে। হৃদয়ের কোন গভীরতায় গোপন এক ক্ষত ক্রমশঃ উঠেছে জেগে। আশ্চর্য্য

এই যে, সে ক্ষতের বেদনা যত দুঃসহ হয়ে উঠেছে তত প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে তার ভালবাসার তীব্রতা। মায়াকে এমন করে কোনদিন সে ভালবাসতে পারেনি।

সেই জ্বলন্ত আকুলতার তুলনায় এই মেকী লোকটির ভেজাল অভিনয়ের কি মূল্য থাকতে পারে! যতই আন্তরিক, যতই অচেতন সে অভিনয় হোক না কেন! কিন্তু তাহলে মায়ার এই নির্লিপ্ত নিস্পৃহ ঔদাসীন্যের মূল কোথায়!

প্রশান্ত ফ্লাস্কটা খুলে পেয়ালায় চা ঢালতে ঢালতে এবার বলেছে,—আফশোষ করবার তেমন কিছু গুরুতর ব্যাপার আপনার জীবনে ঘটেনি বলে' তাই—

অরুণবাবু নাটকীয় হয়ে উঠেছেন তৎক্ষণাৎ—গুরুতর ব্যাপার! না গুরুতর ব্যাপার আমাদের জীবনে কি ঘটতে পারে, প্রশান্তবাবু,—আমাদের পোষাকী পোষ-মানা জীবনে? আমাদের পৃথিবী ওলটপালট হয় না। একটু কেঁপে ওঠে না পর্য্যন্ত কখন।

প্রশান্ত ঈষৎ হেসে বলেছে—কলকাতায় এসেছেন অথচ দেখা করতে যাননি ব'লে মায়া দুঃখ করছিল।

অত্যন্ত করুণ পরিহাসের সুরে, অরুণবাবু বলেছেন—তার কাছে অনেক বড় দুঃখ আমার পাওনা। অত সামান্য দুঃখে আমার অপমান হয়—বলবেন!

হেসে উঠে প্রশান্ত এবার ফ্লাস্কটা এগিয়ে দিয়ে বলেছে,—বলব। এখন একটু চা-খাওয়া যেতে পারে,—কি বলেন! আপনি আসছেন শুনে মায়া নিজেই তৈরী করে দিলে।

তাই নাকি! তা হলে এ চায়ের সম্মান রাখতেই হয়—বলে অরুণবাবু হাত বাড়িয়েছেন। দিতে গিয়ে হঠাৎ ফ্লাস্কটা বুঝি দৈবাৎ ফসকে গেছে প্রশান্তর হাত থেকে। ছিপিটা বুঝি আল্‌গা ছিল, খুলে গিয়ে সব চা মাটিতে পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। প্রশান্ত লজ্জিত হয়ে উঠেছে—দেখুন দিকি! এত যত্ন করে তৈরী, এত কষ্টে বয়ে আনা...

ফ্লাস্কের খোলে তখনই টোল পড়েছিল বোধ হয়। বাড়িতে ফেরবার পর মায়া সেটা লক্ষ্য করে' জিজ্ঞেস করেছিল—এটা আবার তুবড়ে আনলে কি করে?

ওঃ! হঠাৎ হাত ফস্কে পড়ে গেছল যে! তোমার হাতের চা খেয়ে কিন্তু অরুণবাবু তারিফ করেছেন।

মুখ ফিরিয়ে চলে যেতে যেতে মায়া শুধু বলেছিল—তিনি ত চা খান না!

তুমি ত তাও মনে করে রেখেছ দেখছি!—প্রশান্তর কণ্ঠের জ্বালা বুঝি লুকোন যায়নি। আত্মসংযম হাবারার ভয়ে সে নিজেও তাই সেখানে আর দাঁড়ায় নি। চলে যেতে যেতে হঠাৎ তার মনে হয়েছে—অরুণবাবুর সস্তা নাটুকেপনাও কি একটা ভান! এটা কি একটা আবরণ!

প্রশান্ত চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে এবার খবরের কাগজটা নিয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়ে। চীনের সংবাদটা আদ্যোপান্ত তার পড়ে ফেলতে হবে এখুনি, মৃত্যুর উন্মত্ত তাণ্ডব লীলার সেই ভয়ঙ্কর রূপ ধরা যায় কিনা দেখতে হবে। চীন অবশ্য সুদূর, ভৌগলিকের চেয়ে মানসিক জগতে বুঝি আরো বেশী। তার মুখ অস্পষ্ট ধূসর, ফ্যাকাসে পুরানো রঙ-উঠে যাওয়া ছবির মত। প্রত্যক্ষ বাস্তবতায় তাকে তলিয়ে ভাবা সহজ হয় না। তার বোমা-বিধ্বস্ত নগরের আর্ত্তনাদ যেন স্বপ্নে শোনা কান্নার মত কাগজের হরফের ভেতর নেমে অশরীরী ক্ষীণ হয়ে বেরোয়। কিম্বা চীন সুদূর ও স্পষ্ট বলে নয়, যে কোন খানেই এত বিরাট প্রলয় লীলার সামনে মানুষের মন অভিভূত বিকল পঙ্গু—তার ধারণায় এত বড় বিস্তৃত ট্র্যাজিডির উপলব্ধি কুলোয় না। মৃত্যুকে একটি ছোট ঘরে প্রিয়জনের শীর্ণ বিবর্ণ মুখে সে বড় জোর চেনবার চেষ্টা করতে পারে। তাও তার কাছে দুঃসহ।

থার্মোফ্লাস্কটা অবশ্য অনেক আগেই ফেলে দেওয়া যেত, তখুনি সেটা অকেজো হয়ে গেছে।

মায়া শীর্ণ বিবর্ণ মুখটা একটু বিকৃত করে বলেছে—কই জল ত ঠাণ্ডা নয়।

প্রশান্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছে—এই ত ফ্লাস্ক থেকে ঢাললুম। ফ্লাস্কটা খারাপ হয়ে গেছে দেখছি। দাঁড়াও...

মায়া জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন অবস্থাতেই চোখ মেলে বলেছে—না, না ব্যস্ত হতে হবে না। ওই জলই দাও আরেকটু।

কিন্তু এত ঠাণ্ডা নয়, তোমার খারাপ লাগবে।

না লাগবে না—অতিরিক্ত জোর দিয়ে বলবার চেষ্টায় মায়ার শরীর কেঁপে উঠেছে।

অত জোর দিয়ে কথা বোলোনা—প্রশান্ত শঙ্কিত ব্যাকুলতায় মায়াকে জড়িয়ে ধরেছে।

মৃত্যুর গাঢ় ছায়া প্রশান্ত তখনই দেখতে পেয়েছিল সেই ম্লান রোগশয্যার

ওপরে, শুনতে পেয়েছিল তার নিঃশব্দ পদক্ষেপ। বুক তার হাহা করে উঠেছিল, শুধু মায়াকে হারাবার হতাশায় বুঝি নয়। শুধু তার মৃত্যুম্লান যন্ত্রণা-কাতর মুখ সহ্য করতে না পারায় নয়।

জানা হল না, কিছুই জানা হল না। নিষ্ঠুর যবনিকা এল নেমে, তবু উত্তর মিললনা রক্তাক্ত হৃদয়ের ব্যাকুল প্রশ্নের,—বিষাক্ত কীটের মত যা তার বুক ভেদ করে বেরিয়েছে।

মায়া অনেক দিনই নিজেকে সরিয়ে রেখেছিল, এবার সরে গেল একেবারে, সমস্ত জিজ্ঞাসার বাইরে, যেন আগ্রহে স্বেচ্ছায়।

শেষ পর্য্যন্ত সেই নিরুত্তর অন্ধকার যদি এতটুকু সরে যেত!

ডাক্তার পরীক্ষা শেষ করে মাথা নেড়ে চলে গেলেন। শুধু বলে গেলেন,—আপনি এবার ভেতরে যান।

চেতনা তখন নিভে আসছে,—মাঝে মাঝে একটু ঝিলিক দিয়ে উঠে। মায়া তাকে চিনতে পারলে কিনা কে জানে, কিন্তু বল্লে,—তুমি এসেছ!—চোখের পাতা একটু খুলেই বন্ধ হয়ে গেল।—তুমি আর যেওনা। জড়িত অস্পষ্টস্বরে অতিকষ্টে কথাগুলো বেরিয়ে এল।

আবার আচ্ছন্নতা। প্রাণপণে নিঃশ্বাস টানার চেষ্টার অস্বাভাবিক শব্দ।

মায়া!—প্রশান্ত তাকে জাগাবার চেষ্টা করলে ধরা গলায়।

চোখের পাতা বুঝি একটু কাঁপল, আভাস পাওয়া গেল একটু চেতনার।

—মায়া, অরুণবাবু এসেছেন দেখতে, অরুণ···

চোখ বুজেই মায়া বল্লে—জানি।

তাঁকে ডাকব?—প্রশান্তের নিষ্ঠুর আত্ম-পীড়নের নেশা কি তখনও কাটেনি!

কিন্তু কোন উত্তর পাওয়া গেল না। মায়া আবার বুঝি তলিয়ে গেছে অচেতনতায়।

হঠাৎ আচ্ছন্নতার ভেতরে নিজে থেকেই সে বলে উঠল—আমায় তুমি ভুল বুঝো না। আমি তোমাকে দুঃখ দিতে চাই নি···।

চেতনার শেষ স্ফুলিঙ্গ অন্ধকারকে চমকিত করেই মিলিয়ে গেল।

কাকে বলছ মায়া? কাকে?—প্রশান্তর আর্ত্তকণ্ঠ ঘরের বাইরে থেকেও বুঝি শোনা গেল।

তখন অনন্ত স্তব্ধতা নেমেছে।

···শত্রুর আক্রমণের আভাস পেতেই দলে দলে কাতারে কাতারে নগরের লোক বিদেশীদের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ আস্তানার দিকে ছুটেছে। কিন্তু সেখানে পৌঁছোবার ভাগ্য সকলের হয়নি। যারা পৌঁছেছে তাদেরও সকলের জায়গা সেখানে কোথায়! বিদেশী আস্তানার ভেতরে বাইরে ভীত উন্মত্ত জনতা ব্যাকুল ভাবে ঠেলাঠেলি করেছে অসহায় পশু-যূথের মত। আকাশে মৃত্যুদূতের মত শত্রুর এরোপ্লেন গর্জ্জন করে এসেছে। নির্ম্মম নির্ব্বিকার ভাবে নির্ব্বিচারে ছিঁড়ে নিয়ে গেছে অসংখ্য জীবনের পাতা,—কত সূক্ষ্ম বিচিত্র রঙে, রেখায়, ভঙ্গিতে আঁকা। বিচিত্র অনুভূতিতে রঙীন, জটিল হৃদয়াবেগে উদ্বেল, স্মৃতি ও স্বপ্নের অজস্র ধারায় সরস অসংখ্য জীবন এক পলকে রক্তাক্ত মাংসস্তূপ হয়ে উঠেছে।

জীবনের দেবতার এরকম পাইকিরি ট্র্যাজিডির কারবার এই প্রথম নয়। যুগে যুগে পৃথিবীময় ছড়ানো ধ্বসস্তূপের আবর্জ্জনায় একটা রঙ-চটা টোল-খাওয়া থার্মোপ্লাস্ক, আর একটা বুক-চেরা প্রশ্ন!

প্রেমেন্দ্র মিত্র

দম্পতী

একাঙ্ক নাটিকা

(রেবা তার শোবার ঘরে আলমারি দেরাজ বাক্‌স তোরঙ্গ সুটকেস বিছানা একবার খুলছে একবার বন্ধ করছে, ভয়ঙ্কর ব্যস্ত। শীতকালের সাড়ে পাঁচটা, অন্ধকার হয়ে আসছে।)

নীরেন। (প্রবেশ করে) ওঃ! আপনি!

রেবা। (সজোরে বেডিং বাঁধতে বাঁধতে) হাঁ। আমিই।

নীরেন। ও কী! কোথাও যাচ্ছেন নাকি ?

রেবা। হাঁ। চললুম। বিদায়।

নীরেন। দিন, আপনি পারবেন না, আমাকে দিন। (চামড়ার ষ্ট্র্যাপ টানতে টানতে) কই, কোথাও যাবার কথা তো ছিল না।

রেবা। (ইতিমধ্যে সুটকেসে একরাশ শাড়ি ঠেসে বন্ধ না করতে পেরে হাঁপাতে হাঁপাতে) যাঃ কিছুতেই বন্ধ হবে না দেখছি।

নীরেন। (তখনো বেডিং বাঁধা সারা হয়নি।) দাঁড়ান, আমি আসছি।

রেবা। দাঁড়াবার সময় থাকলে তো ? আমি যে এক মিনিট সবুর করতে পারছিনে।

নীরেন। ট্রেনের তো এখনো ঢের দেরি।

রেবা। না, না, আমাকে যেতেই হবে এখুনি। কোই হ্যায় ?

নেপথ্যে। হুজুর।

রেবা। গাড়ী আনতে মালীকে পাঠিয়েছে ?

নেপথ্যে। হুজুর।

রেবা। (সুটকেসের উপর বসে চাপ দিতে দিতে) বেশী কিছু নিতে চাইনে, এই সুটকেসটা, ওই বিছানাটা আর ঐ বেতের বাক্‌সটা।

নীরেন। ওটা তো খালি পড়ে রয়েছে। কী কী দিতে হবে ওর মধ্যে ?

রেবা। আপনি পারবেন না। আমি দেখছি। আপনি যদি অনুগ্রহ করে এই সুটকেসটা—

নীরেন। নিশ্চয়। নিশ্চয়। (সুটকেসের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করতে করতে) এক কাজ করলে হয়। বিছানাটা খুলে খানকয়েক শাড়ি গুঁজে দিই।

রেবা। (বেতের বাক্‌সে নানা খুচরো জিনিষ ঢোকাতে ঢোকাতে) তা হলেই হয়েছে আমার যাওয়া! থাক, খুলতে হবে না।

নীরেন। কিন্তু এই সুটকেসটা—

রেবা। আমি জানি ও সুটকেসটা সয়তান। জায়গা আছে, তবু জায়গা ছাড়বে না। আমিই জব্দ করছি ওকে।

নীরেন। (সুটকেসের সঙ্গে কুস্তি করতে করতে) সয়তান!

রেবা। (হেসে) রাখুন, আমি আসছি।

নীরেন। (দাঁত কিড়মিড় করে) এই বার।

রেবা। (শশব্যস্তে) গেল, গেল, গেল ওটা! ফাটবার শব্দ হলো না ?

নীরেন। দুঃখিত।

রেবা। (কাষ্ঠ হেসে) আপনার দোষ নেই। ওটার দস্তুর ওই রকম। চলুক ওই ভাবে। কুলীর উপর কড়া নজর রাখতে হবে আর কী।

নীরেন। কোই হ্যায় ?

নেপথ্যে। হুজুর।

নীরেন। গাড়ী আসছে তো ?

নেপথ্যে। হুজুর।

রেবা। (আয়নার কাছে গিয়ে চুল ঠিক করতে করতে) বাতিটা জ্বালিয়ে দিতে পারেন ?

নীরেন। (সুইচ টিপে) এই যে।

রেবা। ধন্যবাদ।

নীরেন। আপনি যাচ্ছেন, কিন্তু মোহিতকে ত দেখছিনে।

রেবা। বুলবুলকেও দেখছেন কি ? (আয়নায় মুচকি হাসি।)

নীরেন। নাঃ। বুলবুল কোথায় ?

রেবা। আমি কী করে জানব ?

নীরেন। ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, জেগে দেখি বুলবুল নেই, কেউ নেই,

আপনাকেও দেখব আশা করিনি। আপনার ঘরে আওয়াজ শুনে ভেবেছিলুম চোর নয় তো!

রেবা। তাই আপনি চোরের মতো ঢুকলেন?

নীরেন। অন্যায় করেছি। আচ্ছা, যাই।

রেবা। যাবার আগে একটা কাজ করতে পারেন? আমার চাবীটা স্যুটকেস থেকে খুলে নিয়ে আলমারিটা আরেকবার খুলুন, কিছু টাকা নিতে হবে। আমি এই আসছি।

নীরেন। চাবী? কই, দেখছিনে তো?

রেবা। সে কী? খুঁজুন না একটু দয়া করে। আমার এই শেষ হলো।

নীরেন। না, বৌদি। আমার চশমায় অত পাওয়ার নেই।

রেবা। (রাগ করে) সেই আমাকেই আসতে হলো। যান, আপনি কোনো কাজের নন।

নীরেন। (যেতে উদ্যত।)

রেবা। কই, না! কে নিতে পারে, কেউ তো আসেনি এ ঘরে!

নীরেন। যদি আমাকে না ধরেন।

রেবা। আপনি নেবেন কেন? কী আপদ! খাটের নীচেও নেই, আলমারির নীচেও নেই—(ব্যস্তসমস্ত হয়ে হাতড়ে বেড়ানো।)

নীরেন। কত টাকা দরকার, বৌদি?

রেবা। (আলমারি ভাঙতে চেষ্টা করে) খুলবে, খুলবে, খুলতেই হবে।

নীরেন। (আরেকবার চাবী খুঁজতে খুঁজতে) দাঁড়ান, ভাঙবেন না—

রেবা। দাঁড়াবার সময় নেই। খুলবে, খুলবে, খুলতে-ই হ-বে। (আলমারির একটা পাল্লা ভেঙে গেল। রেবা আছাড় খেয়ে পড়ল। নীরেন ছুটে গিয়ে তাকে ধরে খাটে শুইয়ে দিল।)

নীরেন। লাগেনি তো?

রেবা। লাগুক। মরণ হলে বাঁচি। আলমারিটা সুদ্ধ উলটিয়ে মাথায় পড়লে ঠিক মরে যেতুম। না?

নীরেন। ছি ওকথা মুখে আনতে নেই। ভালোই হলো যে আপনার যাওয়া হলো না, বৌদি।

রেবা। হলো না কী রকম! আমি যাবই। কোই হ্যায়?

নেপথ্যে। হুজুর।

রেবা। গাড়ী আসছে না কেন?

নেপথ্যে। দেখছি, হুজুর।

নীরেন। কাল আমরা এলুম আপনাদের অতিথি হয়ে, আর আজ আপনারা চললেন।

রেবা। আমরা নই, আমি।

নেপথ্যে। Bye bye, Bulbul. See you later.

নেপথ্যে। Thanks for that lovely game of tennis.

মোহিত। (ঘরে ঢুকে) হ্যালো।

নীরেন। হ্যালো।

মোহিত। (টেনিস র‍্যাকেট রেখে) কী ব্যাপার বলো দেখি। এ সব বাক্স প্যাঁটরা কিসের?

নীরেন। বৌদি কোথায় যাচ্ছেন।

মোহিত। যাচ্ছেন? কই, তা তো শুনিনি?

রেবা। (আলমারি থেকে টাকা বার করতে করতে) আহা, শোননি! কী আফশোষ! এতক্ষণ যখন শোননি তখন দু মিনিট পরে শুনলেও চলবে।

মোহিত। নীরেন, তুমি বলতে পার?

নীরেন। দুঃখিত। আমি তোমার চেয়েও কম জানি।

মোহিত। কই, টেলিগ্রাম কোথায়?

রেবা। কিসের টেলিগ্রাম?

মোহিত। তবে যাচ্ছ কী পেয়ে?

রেবা। এমনি।

মোহিত। (বিছানায় ধপ করে বসে) Well, I never—

নেপথ্যে। আসতে পারি?

রেবা। তোমার ইচ্ছা।

বুলবুল। (ঘরে ঢুকে নীরেনকে লক্ষ্য করে) এঁর গলার সুর শুনে ভাবলুম দেখি না কী হচ্ছে।

রেবা। দেখ বসে।

বুলবুল। কেউ কি কোথাও যাচ্ছে?

রেবা। হাঁ, আমিই কলকাতা যাচ্ছি। বিদায়।

বুলবুল। Sorry to hear that! কার অসুখ?

রেবা। কারুর না।

মোহিত। ভালো কথা, তোমার মাথাধরা কেমন আছে?

রেবা। যাক, এতক্ষণে মনে পড়ল? আমার মাথাধরা সার্থক।

বুলবুল। মাথাধরার খবর তো পাইনি।

রেবা। ঐ যাঃ। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে ভুলে গেছি। কোই হ্যায়?

নেপথ্যে। হুজুর।

রেবা। গাড়ী এসেছে?

নেপথ্যে। এসেছে, হুজুর।

রেবা। চললুম। বুলবুল, তুমি থাকলে, তুমিই দেখবে শুনবে। এ সংসারের ভার তোমাকেই দিয়ে গেলুম, বোন।

বুলবুল। বা, আমরা এলুম দুদিনের জন্যে বেড়াতে। সংসারের ভার কী রকম!

রেবা। দুদিনের জন্যে কেন, চির দিনের জন্যে।

বুলবুল। ও কী বলছ, দিদি!

রেবা। ঠিকই বলছি। চাবীটা তোমাকে দিয়ে যেতে পারলুম না, কিন্তু আমিও নিয়ে যাইনি। এই ঘরেই আছে কোথাও।

মোহিত। এটা কি তামাসা হচ্ছে?

রেবা। কী বললে? তামাসা? না, তামাসা নয়। সত্যিই আমি যাচ্ছি। সাত বছর সহ্য করেছি, আর না। তোমরা সুখী হও।

নীরেন। (হঠাৎ কী মনে করে) আমরাও সুখী হব, বৌদি। আমাদের প্রোগ্রামটি তো কম লোভনীয় নয়। কলকাতা থেকে আগ্রা, সেখানে তাজমহলেই আমাদের কত পূর্ণিমা কাবার হবে, তারপর বসন্তে আমাদের লীলাভূমি কাশ্মীর—

বুলবুল। তুমিও যাচ্ছ নাকি?

নীরেন। যাব না? ওই যে সুটকেসটা দেখছ, ওটা কে ফাটিয়েছে? আর এই যে বেডিংটা, এটা কে এঁটেছে? আমি।

বুলবুল। অসম্ভব। তুমি তো ঘুমোচ্ছিলে।

নীরেন। চোখ বুজে অপেক্ষা করছিলুম কখন তুমি যাবে। যেই তুমি গেলে অমনি আমিও গুছিয়ে নিলুম। চল, বৌদি। কাশ্মীর থেকে করাচী, ওখান থেকে ইউরোপ। জলে কি আকাশে যেমন তোমার খুশি।

মোহিত। আচ্ছা, আমার কথাটা কি শুনবে একবার?

রেবা। শোনার কী আছে! চেনাটাই আসল। তোমাকে চিনিনে?

মোহিত। বাড়ীতে গেষ্ট এসেছে, টেনিস খেলতে চায়, নিয়ে গেলুম ভদ্রতার খাতিরে। তোমার মাথা না ধরলে তুমিও তো যেতে।

রেবা। কী দয়া! আমি কি অত দয়ার যোগ্য!

মোহিত। নীরেনের জন্যে অপেক্ষা করা উচিত ছিল, কিন্তু শীতকালের দিন, খেলতে হলে দেরি করা চলে না। ভেবেছিলুম নীরেনও একটু পরে আসছে।

রেবা। জানি গো জানি। তোমার কৈফিয়তের অভাব কোন দিন হয়েছে যে আজ হবে! সারাক্ষণ চোখে চোখে না রাখলে তুমি যে কখন কার সঙ্গে কোথায় অদৃশ্য হও তা কি এই প্রথম!

নীরেন। আমিও এই তিন বছরে জর্জরিত হয়েছি। একটু আরাম করে ঘুমোবার জো নেই, ঘুম ভাঙলেই দেখি দশ দিক শূন্য। নাঃ কোনো কৈফিয়ৎ শুনব না, বুলবুল।

নেপথ্যে। হুজুর।

রেবা। কে, মালী? এসো।

(মালী ও বেয়ারা মাল তুলে নিয়ে গেল।)

বুলবুল। আচ্ছা, আমি কেন শুধু শুধু এ ঘরে রয়েছি? (প্রস্থান)

নীরেন। ও কী! দাঁড়াও! আমার বিদায় নেওয়া হয়নি। (প্রস্থান।)

রেবা। বেশ আছে ওরা। যত গণ্ডগোল আমাদেরই।

মোহিত। আমরাও তো বেশ থাকি, রেবা। মাঝে মাঝে কেউ বেড়াতে এলেই তোমার এই পাগলামি চাপে। কেন তোমার এত সন্দেহ?

রেবা। বা, চোরকে সন্দেহ করব না ?

মোহিত। কে চোর ? আমি না নীরেন ? যাকে আজ আমার শোবার ঘরে আবিষ্কার করলুম।

রেবা। যাই বল, তোমার মন বড় ছোট।

মোহিত। কিন্তু আলমারিটা ভাঙলো কী করে ?

রেবা। ওটা আমার কীর্ত্তি। চাবী না পেয়ে টান মেরে ভেঙেছি।

মোহিত। এত বল তোমার। অবলা তবে কেন এত বলে।

রেবা। ফলও তেমনি পেয়েছি। পিঠে চোট লেগেছে।

মোহিত। (হাত বুলিয়ে দিতে দিতে) পাগল মেয়ে।

রেবা। যাও। তুমি তো আমার জন্যে ভারী কেয়ার কর। খেলতে চললে আমার মাথাধরা দেখেও।

মোহিত। না গেলে তুমি খুশি হতে ?

রেবা। কে না হয় !

মোহিত। আচ্ছা, তা হলে আর টেনিস খেলব না।

রেবা। তা কে তোমাকে বলছে ?

মোহিত। অর্থাৎ টেনিস খেলব তোমায় পাহারায়। এই তো ?

রেবা। অমন বললে আমি সত্যিই চলে যাব। আমার মন অত ছোট নয়।

মোহিত। না, আমিই যাব।

রেবা। বা, তুমি কেন যাবে ?

মোহিত। আমি যে যাব বলে কথা দিয়েছি।

রেবা। কাকে ?

মোহিত। বুলবুলকে।

রেবা। ওমা। এত !

মোহিত। গাড়ী বাইরে দাঁড়িয়েছে, আমি আর দেরি করব না। বুলবুলও তৈরি হয়েছে এতক্ষণে।

রেবা। (কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে) কথা দিয়েছ বুলবুলকে।

মোহিত। হাঁ, টিকিটও কিনে রেখেছি।

রেবা। (বিমূঢ়ভাবে) এত দূর।

মোহিত। টাইম হলো, যাই, চেঞ্জ করি।

রেবা। (কেঁদে) ওমা ! আমি তবে কী করব !

মোহিত। ছি কাঁদছ কেন ? তুমিই তো যাব যাব করছিলে।

রেবা। (মাথা খুঁড়ে) মরব, মরব, নিশ্চয় মরব।

মোহিত। (গুনগুন করে) মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব !

রেবা। আমাকে মেরে ফেল। মারো, মারো আমাকে।

মোহিত। তুমি মরবে, তবু হুকুম করা ছাড়বে না ?

রেবা। না, ছাড়ব না। (পা জড়িয়ে ধরল।)

মোহিত। অমন করে দেরি করিয়ে দিলে আজ আর যাওয়া হবে না। শেষে তুমিই বকবে—

রেবা। না, আমি বকব না।

মোহিত। চার চারখানা টিকিট লোকসান হলে তুমি বকবে না ?

রেবা। চারখানা কেন ?

মোহিত। বা, তোমাকে কি আমরা সত্যিই ফেলে যেতুম নাকি ? মাথাধরা থাকলেও টেনে নিয়ে যেতুম।

রেবা। কোথায় ?

মোহিত। সিনেমায়।

(রেবার মুখে স্বর্গীয় আভা। ধীরে ধীরে—যবনিকা)

লীলাময় রায়

দেশ-বিদেশ

ই, এম্, ফর্ষ্টার একবার লিখেছিলেন যে অনেক সময় তাঁর নিজের মৃত্যু-ভয়ের চাইতে বর্ত্তমান যুগে সভ্যতাধ্বংসের আশঙ্কা তাঁর মনকে বেশী পীড়া দেয়। অদূর ভবিষ্যতে মহাযুদ্ধের আতঙ্কই এই আশঙ্কার মূল কারণ। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে' মধ্য-ইয়োরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হবার উপক্রম সাধারণ লোকের মনেও ভয় ও ভাবনা এনে ফেলেছে। ঠিক এই মুহূর্ত্তে চেকোস্লোভাকিয়ার সমস্যার উপরেই সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ। স্পেন ও চীনের থেকে সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা অবশ্য আপাতত কমে এসেছে যদিও সেখানে সঙ্ঘর্ষের শেষ এখনও দেখা দেয় নি। স্পেনের গণতন্ত্রকে ইংরাজ ও ফরাসী গভর্ণমেণ্ট্ এতদিনে খোলাখুলি ভাবেই একেবারে ত্যাগ করেছে—নিরপেক্ষতা-নীতির প্রতি অঙ্গই এখন ইটালি ও জার্মানির অনুগত ফ্রাঙ্কোর দলের সহায়ক, একথা সহজেই বোঝা যাচ্ছে। বহুদূরস্থিত সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষে স্পেনের বিপন্ন জনশক্তিকে সাহায্য পাঠানো প্রায় অসম্ভব—কাজেই এই নবীন রেপাব্লিক্‌টির ভবিষ্যৎ এখন অন্ধকারাচ্ছন্ন। স্পেনের উন্নতিকামী দলসমূহের অসাধারণ বীরত্বের মতনই চীনে জনসাধারণের আত্মরক্ষার প্রচেষ্টাও আমাদের মন স্পর্শ ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। বস্তুত উভয় দেশেই প্রবল আততায়ীর বিরুদ্ধে নিরস্ত্রপ্রায় সাধারণ লোকের সংগ্রাম মানব-সমাজের মুক্তি-আন্দোলনের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কিন্তু চীনেও ইংল্যাণ্ড্ বা আমেরিকার দিক থেকে জাপানকে বাধা দেবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এর প্রধান কারণ অবশ্য চীনে সাম্যবাদী প্রভাবের বিস্তার ; পারতপক্ষে এই নূতন জাগরণকে সাম্রাজ্যতন্ত্রীরা সাহায্য করবে না। কিছুদিন আগে কোরিয়ার সীমান্তে রুষ-জাপানের যুদ্ধ বেধে উঠবার উপক্রম হয়েছিল ; তবে জাপানী রণনায়কেরা শীঘ্রই বুঝলেন যে রাশিয়াকে না ঘাঁটানোই উচিত। পক্ষান্তরে অন্তত আভ্যন্তরিক সংগঠনের খাতিরেও সোভিয়েট্ রাশিয়া আপনা থেকে যুদ্ধে নামবে না। সুতরাং স্পেনের মতন সুদূর প্রাচ্যেও আপাতত সঙ্ঘাত সীমাবদ্ধ থাকছে, স্থানীয় যুদ্ধবিগ্রহ মহাসমরে পর্য্যবসিত হচ্ছে না। মধ্য-ইয়োরোপে অবস্থা কিন্তু এখনও অনিশ্চিত।

ফাশিষ্ট্ অত্যাচারের হাতে পর পর আবিসিনিয়া, স্পেন ও চীন সমর্পিত হওয়াতে শান্তিবাদীরা প্রতিবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলেন কিন্তু চেকোস্লোভাকিয়ার ব্যাপারে নূতন বিপদ ঘনিয়ে এল। এর থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে ফাশিজম্‌এর অন্তর্নিহিত এমন কোন গলদ আছে যা' আন্তর্জাতিক শান্তির পরিপন্থী। মহাযুদ্ধের ভয়াবহতা সম্বন্ধে আজকের দিনে ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। সেই বিভীষিকার দিকে ক্রমাগত জগৎকে টানবার অপরাধে ফাশিষ্ট্ মতামত সভ্যতার শত্রু আখ্যা পেতে পারে। সুদেৎ প্রদেশের জার্মান অধিবাসীদের চেক্ সরকারের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ থাকা সম্ভব কিন্তু নানাদেশের সংখ্যান্যূন নানা সম্প্রদায়ের অবস্থার তুলনায় তাদের ভাগ্য এমন কিছু দুর্বিবহ নয় যে সেজন্য ইয়োরোপে যুদ্ধের আগুন জ্বালাতে হবে। মধ্য-ইয়োরোপে ভিন্ন ভিন্ন জাতির এমন মিশ্র বসতি যে সকল রাষ্ট্রের ভিতরই কিছু পরিমাণে সংখ্যান্যূন সম্প্রদায় থেকে যাওয়া অনিবার্য্য। এক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক কলহের আপোষে নিষ্পত্তির আয়োজনই যুক্তিযুক্ত অথচ হিট্‌লার বাহুবলে সমস্যার সমাধান করতে উদ্যত হয়েছেন। ওদিকে নর্ডিক্ বিজ্ঞানে য়িহুদীরা সম্পূর্ণ বিশিষ্ট জাতির আখ্যা পেলেও জার্মানির সীমান্তের মধ্যে তাদের নিগ্রহের আজ পর্য্যন্ত অন্ত নেই। সুতরাং সুদেতীয়দের প্রতি অত্যধিক অনুকম্পার সমর্থন পাওয়া যায় শুধু এই বিশ্বাসে যে জার্মান জাতি ভগবানের বিশেষ সৃষ্টি। কিন্তু বলা বাহুল্য সুদেৎ অঞ্চলের প্রতি সুবিচারের দাবী একটা উপলক্ষ্য মাত্র। হেন্‌লাইনের আন্দোলনের পিছনে রয়েছে নাৎসি অভিসন্ধি। হিট্‌লারের যুদ্ধ-আয়োজনের তাগিদা যোগাচ্ছে ফাশিষ্ট্ শাসনে আথকসমস্যাক্লিষ্ট জাতির প্রসারের ভিতর দিয়ে ভারলাঘবের প্রয়াস, মধ্য-ইয়োরোপের কেন্দ্রস্থানীয় বোহেমিয়া অধিকারের ফলে জার্মানির সামরিক শক্তি সুদৃঢ় করবার অভিলাষ এবং ডানিয়ুব উপত্যকায় জার্মান কর্ত্তৃত্ব বিস্তারের সংকল্প। এ অভিযান সার্থক হ'লে রাশিয়ার হাত থেকে পরে সম্পদশালী উক্রেন্ প্রদেশ কেড়ে নেওয়া সহজ হয়ে পড়বে এবং বল্‌শেভিজমের উচ্ছেদসাধনও এগিয়ে আসতে পারে। হিট্‌লারের আত্মজীবনীতে তাঁর জীবনের সাধনার যে-পরিচয় আছে, সুদেৎ-আন্দোলনের বর্ত্তমান রূপ তার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। তাই শুধু স্থানীয় সমস্যা হিসাবে একে অগ্রাহ্য করা অসম্ভব। তাছাড়া চেকোস্লোভাকিয়াকে অষ্ট্রিয়ার মতন

ফাশিষ্ট্ করকবলিত হ'তে দিলেও ইয়োরোপে শান্তি স্থাপিত হবে না। তখন আবার নাৎসি-প্রকোপ নূতন আকার ধারণ করবে মাত্র।

ঠিক কোন মুহূর্ত্তে মহাযুদ্ধ অনিবার্য্য হয়ে পড়বে সেকথা কারও পক্ষে জোর করে বলা অসম্ভব। ইতিহাসকে অদৃষ্টলিপি কিম্বা ঐতিহাসিককে গণক মনে করা চলে না। তবে ঘটনাধারাকে বিশ্লেষণ করলে স্রোতের গতি ও লক্ষ্য সম্বন্ধে একটা ধারণা গড়ে ওঠা স্বাভাবিক। এবং এই দিক থেকে ইয়োরোপকে আজ আবার ১৯১৪-র মতন সমরোন্মুখ বলা যায়। কিন্তু চেকোস্লোভাকিয়ার ব্যাপারে শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধকে আটকে রাখতে পারা বিচিত্র নয়। চেক্ রাষ্ট্রশক্তি জার্মান্ প্রজাদের ন্যায্য দাবী মেটাবার চেষ্টা করছে এবং অন্তত এই কারণেও এ রাজ্য আক্রান্ত হওয়া অসঙ্গত। তবে ফাশিষ্ট্ সাম্রাজ্যবাদ বর্ত্তমান অশান্তির প্রধান আকর ব'লে জার্মানি, জাপান ও ইটালির শাসনযন্ত্রের পরিবর্ত্তন না হওয়া পর্য্যন্ত যুদ্ধাতঙ্কের অবসান হওয়ার সম্ভাবনা কম। চেক্ রাষ্ট্রকে নাৎসি পদদলিত হ'তে দিলেও ফাশিষ্ট্ অভিযান শেষ হবে না। সুতরাং ফাশিজ্‌ম্-এর পতন ক্রমশই বেশী বাঞ্ছনীয় হয়ে পড়ছে—জগতের সর্ব্বত্র ফাশিষ্ট্-বিরোধী মতামত গড়ে তুলবার দায়িত্ব আজ প্রগতিকামী ব্যক্তিমাত্রের পক্ষে অপরিহার্য্য।

চেকোস্লোভাকিয়াকে আত্মরক্ষায় সাহায্য করা তাই গণতান্ত্রিক ও শান্তিপ্রার্থী রাষ্ট্রগুলির কর্ত্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এ-নীতি অনুসরণের ফলে মহাযুদ্ধ আরও নিকটতর হবে মনে হওয়া স্বাভাবিক। সেইজন্যই এর সম্বন্ধে অনেকের মনে আপত্তি ওঠে। পূর্ণশান্তিবাদীর চোখে যুদ্ধমাত্রই ঘোর অন্যায় এবং কোন ক্রমেই তার আশ্রয় নেওয়া উচিত নয়। সুবিধাবাদীদের মতে কোনক্রমে যুদ্ধকে সাময়িকভাবে ঠেকিয়ে রাখাই যথালাভ, ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই;—অধ্যাপক কেন্‌স্ কিছুদিন আগে এই দ্বিতীয় যুক্তির সাহায্যে আধুনিক ব্রিটিশ বৈদেশিক নীতির সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু পরিপূর্ণ অহিংস শান্তিবাদ লোকবিশেষের আরাধ্য হ'লেও রাষ্ট্রনীতিতে তার প্রয়োগ আজ পর্য্যন্ত চলেনি; অন্তত আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার খাতিরে রাষ্ট্রমাত্রেই শক্তি প্রয়োগের উপর শেষ পর্য্যন্ত নির্ভর রাখতে বাধ্য হয়েছে; আর বিভিন্ন রাষ্ট্রের উপর এক কর্ত্তা না থাকায় তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে পশুবল একেবারে বিসর্জ্জন দেওয়া অসম্ভব বলেই মনে হয়। শক্তিকে মানুষের মঙ্গলের জন্য নিয়োগ করাই

বাঞ্ছনীয়—শান্তিস্থাপনের জন্য স্থল-বিশেষে বলপ্রয়োগ আবশ্যক হয়ে উঠতে পারে। পরিপূর্ণ শান্তিবাদের মতন অলীক স্বপ্নের আশ্রয় না নিয়ে স্বীকার করা উচিত যে আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার একমাত্র উপায় দলবদ্ধভাবে আততায়ীর গতিরোধ (collective security)। এ উপায়কে ত্যাগ করে' শান্তিবাদের দোহাই দেওয়া আজকের দিনে ফাশিষ্ট্ অগ্রগতিকে সাহায্য করারই সামিল। সুবিধাবাদের বিপদ এই যে ক্রমাগত আত্মসমর্পণ করতে থাকলে আততায়ীরই শক্তিবৃদ্ধি হ'তে থাকে—প্রতি পদে শান্তিপ্রার্থীদের দলক্ষয় এবং শক্তিহ্রাস পরিণামে আত্মরক্ষাকে দুরূহতর করে ফেলে। ১৯৩১ থেকে এই সুবিধাবাদ রাষ্ট্রসঙ্ঘকে ধ্বংসের পথে নিয়ে গেছে এবং জাপান, ইটালি ও জার্মানির অভিযানকে উত্তরোত্তর প্রবলতর হয়ে উঠতে দিয়েছে। শান্তিবাদ এখন অপ্রযুজ্য, সুবিধাবাদ শুধু বিপদকে বাড়িয়ে চলে।

দলবদ্ধভাবে আত্মরক্ষার স্বপক্ষে আর এক যুক্তি আছে। সম্মিলিত শক্তিবৃন্দ যথেষ্ট প্রবল হলে নাৎসি-আস্ফালন থামলেও থামতে পারে। ইংরাজ-সাহায্যের পরিষ্কার প্রতিশ্রুতি থাকলে চেক্ রাষ্ট্রকে আজ এতটা বিপন্ন হ'তে হ'ত না—এবং এ প্রতিশ্রুতির অভাবই ইংরাজ সরকারের ফাশিষ্ট্-প্রীতির অধুনাতম প্রমাণ। হিট্‌লারের উগ্রনীতির পিছনে সাময়িক পরিস্থিতির উপর অনেকখানি নির্ভর আছে। রাশিয়ায় ট্রট্‌স্কি-পন্থীরা যদি শক্তিক্ষয় ও গণ্ডগোল সৃষ্টির ষড়যন্ত্রে লিপ্ত না হ'ত, ফ্রান্সে পপুলার ফ্রন্টে ভাঙ্গন না ধরলে, চেম্বারলেন্ ও হালিফ্যাক্স্ ইংরাজ জনসাধারণকে যদি ভোলাতে না পারতেন, বড় কথার আড়ালে মার্কিন্ সরকার যদি ক্ষুদ্র স্বার্থসন্ধানে ব্যস্ত না থাকত—তবে জার্মানির পক্ষে এত অস্ত্রঝঞ্ঝনা ও যুদ্ধের আংশিক আয়োজন দ্বারা চেকোস্লোভাকিয়াকে ভয় প্রদর্শন সম্ভব হ'ত না। শান্তির জন্য দীর্ঘনিঃশ্বাস না ফেলে যে-উপায়ে ইয়োরোপে সম্মিলিত আত্মরক্ষার ব্যবস্থা সচল করা যেতে পারে তার নির্দ্দেশ উপরের বিশ্লেষণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। আমেরিকায় শান্তিপ্রার্থীদের উচিত যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির মোড় ফেরাবার চেষ্টা। ইংরাজদের উচিত জনমতের তাড়নায় মন্ত্রীদের ঠিক পথে চালনা। ফ্রান্সের প্রয়োজন পপুলার ফ্রন্টের পুনর্গঠন। রুষদেশে জনগণের ষ্টালিনের নেতৃত্বে সাম্যবাদীদলের নির্দ্দিষ্ট পথে অবিচলিত থাকাই বাঞ্ছনীয়। আর জার্মানি, ইটালি কিম্বা জাপানে শান্তিবাদীদের

আদর্শ হওয়া উচিত নিজ নিজ ফাশিষ্ট্ শাসকদের সঙ্গে অসহযোগ ও তাদের বিরুদ্ধাচরণ।

ইউনাইটেড্ ফ্রন্টের এই কর্ম্মপদ্ধতির বিরুদ্ধে আপত্তি ওঠে এই যে শেষ পর্য্যন্ত আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড বা ফ্রান্স কখনই ফাশিষ্ট্ শক্তিদের গতিরোধ করবে না, কারণ তারাও সাম্রাজ্যবাদী এবং সকল সাম্রাজ্যতন্ত্রীর মূল স্বার্থ এক। ফাশিষ্ট্দের সঙ্গে মৈত্রীস্থাপনে দক্ষিণপন্থী ফরাসীদল এবং ইংরাজ মন্ত্রীসভার বিশেষ উৎসাহ আছে। তাই স্পেনে অপমান সহ্য করে'ও তথাকথিত নিরপেক্ষ-নীতির উদ্ভব হ'ল, চীনে জাপানীদের পথ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, ইডেন্‌কে বিদায় দিয়ে চেম্বারলেন্ ইটালির সঙ্গে চুক্তি করেছেন, চেক্‌দের উপর চাপ দিয়ে নাৎসি-দের তুষ্ট করার অভিপ্রায়ে রান্সিমানকে প্রাগে পাঠানো হ'ল। এ সকল চেষ্টাই অবশ্য সোভিয়েট রাশিয়াকে একঘরে করে' অন্য ভদ্রস্থ মহাশক্তিদের একজোট করবার পরিকল্পনার অন্তর্ভূ'ত। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে সাম্রাজ্যতন্ত্রের ভিতরেই মারাত্মক দুর্ব্বলতা আছে, বিভিন্ন সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বার্থের সঙ্ঘাত প্রকটতর হয়ে উঠতে বাধ্য। সাম্রাজ্যতন্ত্র ধনতন্ত্রেরই রূপবিশেষ—তার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বই তাকে পতনের দিকে টানে। সাম্রাজ্যবাদের সম্মিলিত অভিযান, আলট্রা ইম্পিরিয়ালিজমের আদর্শ, বেশীদিন টি'কতে পারে না। ইতিহাস এই স্বার্থের সঙ্ঘাত সম্বন্ধে বারবার সাক্ষ্য দিয়েছে। তাই সাময়িক ভাবে গণতান্ত্রিক দেশগুলিকে ফাশিষ্ট্দের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ করা অসম্ভব নয়।

তাছাড়া ধনতন্ত্রের আওতার মধ্যেও স্তরভেদ থাকা সম্ভব—ফাশিষ্ট্ শক্তি-গুলিকে অন্যদের চাইতে বেশী বিপজ্জনক মনে করা অন্যায় নয়। এই বিশ্বাসের উপর সোভিয়েট্ রাশিয়ার বর্ত্তমান বৈদেশিক নীতি নির্ভর করছে। আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে তাই ফাশিষ্ট্-বিরোধী ইউনাইটেড্ ফ্রন্ট্ গড়বার চেষ্টা করা স্বাভাবিক। শান্তি রক্ষা করতে পারলে একটা সুফলও আশা করা যেতে পারে। আভ্যন্তরিক সমস্যায় জর্জ্জরিত ফাশিজম্-এর পতন এতে সহজ হয়ে আসা সম্ভব। প্রগতিশীল দল ও বামপন্থী ব্যক্তিদের সাময়িক লক্ষ্য আজ এইভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠ্‌ছে।

* * *

বহির্জগতের আজকের দিনের দ্বন্দ্বের থেকে ভারতবর্ষকে সরিয়ে রাখার উপায় নেই। ধনতন্ত্রের কল্যাণে সারা জগৎ ক্রমশ অন্তরঙ্গ ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছে। হিন্দু মহাসভার নূতন নেতা সাভারকার ভারতবর্ষকে নিরপেক্ষ কল্পনা করে' জওহরলাল নেহরুর বিদেশী বামপন্থীদের সঙ্গে সংযোগের নিন্দা করেছেন। সাভারকারের দৃষ্টিভঙ্গী তিরিশ বছর আগেকার আত্মসর্ব্বস্ব জাতীয়তার গণ্ডি এখনও ছাড়াতে পারেনি—এখন সে-দৃষ্টি অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এই তথাকথিত নিরপেক্ষতা পরিণামে ফাশিষ্ট্ মতামতের দিকে ঝুঁকে পড়তে বাধ্য নয় কি? বস্তুত বাম ও দক্ষিণের মতভেদ আজ ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিতেও প্রবলতর হয়ে উঠছে এবং তার সঙ্গে সারা জগতের সমস্যার যোগ থাকাই স্বাভাবিক।

ভারতবর্ষের বিশেষ অবস্থায় ধর্ম্মমূলক ও সাম্প্রদায়িক আন্দোলন ধনতন্ত্র কিম্বা সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃত বিরোধী হ'তে পারে না। এ-জাতীয় আন্দোলনের বাইরের আবরণ যাই থাক, এদের আন্তরিক গতি দক্ষিণ পন্থার দিকে ঝুঁকতে বাধ্য। এই সিদ্ধান্ত অমূলক হ'লে আমাদের নূতন করে' ইতিহাস শিখতে হবে। হিন্দুসভার মতন মুসলিম্ লীগ্ সম্বন্ধেও একথা খাটে। লীগ্-নেতা জিন্নার সাম্প্রতিক উত্তেজক কথাবার্ত্তা, জনসাধারণের মধ্যে লীগের প্রচার-কার্য্য, কাণপুরে ধর্ম্মঘট সমর্থন, জমিদারদের ও রাজন্যবর্গের নিন্দাবাদ ইত্যাদি ঐতিহাসিকের কাছে কৌতুকপ্রদ মনে হয়—হিট্‌লারের আন্দোলনের গোড়ার দিকে এই ধরণের উত্তেজনা এখনও সকলে বিস্মৃত হয়নি। কোন দল বা প্রতিষ্ঠানকে বিচার করতে হ'লে তার বাক্যচ্ছটা বা সাময়িক আচরণের উপর নির্ভরকরা উচিত নয়—তার দৃষ্টিভঙ্গী, ফিলজফি ও লক্ষ্যের মধ্যেই প্রকৃত স্বরূপ ধরা পড়ে।

কংগ্রেস সম্বন্ধে ব্যাপক ভাবে কিছু বলা কঠিন কারণ এখন সমগ্র প্রতিষ্ঠানটির কোনও ঐক্য খুব সুস্পষ্ট নয়। এর ভিতরে অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব চলেছে, একথা সকলেই স্বীকার করবেন। বাইরের ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা হিসাবে বলা যায় যে কংগ্রেসের আদর্শ হ'ল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। বক্তৃতায় ও সাহিত্যে এই কথা শুনে আমরা অভ্যস্ত। বিপদ এই যে স্থল বিশেষে এ মন্ত্র বাঁধা বুলিতে পরিণত হওয়া সহজ। অর্থাৎ কোনও ক্ষেত্রে কংগ্রেস কার্য্যত সাম্রাজ্যতন্ত্রের সমর্থক হয়ে পড়া কিছু আশ্চর্য্য নয়। তাই কংগ্রেসকে ঠিক পথে রাখবার উপায় হচ্ছে তার মধ্যে বামপন্থী ঝোঁকের উত্তরোত্তর বৃদ্ধিসাধন। এই চাপই কংগ্রেসকে

তার আদর্শের দিকে চালাতে পারবে এবং এর সঙ্গে বহির্জগতের বামপন্থী আন্দোলনের প্রকৃতিগত মিলন রয়েছে।

কংগ্রেস নেতাদের আজকাল একটা প্রশ্ন মাঝে মাঝে উত্যক্ত করে—যুদ্ধ এসে পড়লে কংগ্রেস কি করবে। নেতারা বুদ্ধিমানের মতন আগে থাকতে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করেন—তবে এ সম্বন্ধে তাঁরা চিন্তা করতেও রাজি নন কিনা জানা প্রয়োজন। বামপন্থীরাও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করবে অবস্থা অনুসারে কিন্তু তাদের অন্তত কতকগুলি স্থির বিশ্বাস থাকাই সম্ভব। সোভিয়েট্ রাশিয়াকে রক্ষা করবার কাজে জগতের সমস্ত শ্রমিক সমাজের সহানুভূতি স্বাভাবিক। ফাশিষ্টদের পরাজয় বাঞ্ছনীয়। সংগ্রামের মধ্যে সাম্রাজ্যতন্ত্রের বাঁধন আলগা করে' ফেলাই উদ্দেশ্য—তার উপায় অনেকখানি সাময়িক অবস্থার উপর নির্ভর করতে বাধ্য।

কিন্তু অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা তখনই সার্থক হতে পারে যখন দলের একটা বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী ও স্থির লক্ষ্য থাকে। কংগ্রেসকে এই গুণগুলি অর্জন করতে হ'লে তার মধ্যে বামপন্থার উত্তরোত্তর শক্তিবর্দ্ধন প্রয়োজন। কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ স্পষ্টতই এই ঝোঁকের বিরোধী—কাজেই দ্বন্দ্ব ক্রমশ প্রস্ফুট হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ শুধু নামের মোহ কাটিয়ে উঠে কংগ্রেসকে কার্য্যত জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান করে' তোলা দরকার—আর বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে বামপন্থায় ঝোঁকা কংগ্রেসের পক্ষে স্বাভাবিক। কংগ্রেসের প্রসিদ্ধ নেতারা কিন্তু দক্ষিণী মতবাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছেন।

আমাদের জাতীয় আন্দোলনের সাময়িক সমস্যাগুলির মধ্যে এই বোধ হয় সর্ব্বপ্রধান। হরিজন পত্রিকায় আমরা দিনের পর দিন যে উপদেশ পাচ্ছি তাতে মনে হয় মহাত্মাজি আপতত কংগ্রেসী আন্দোলনকে একটি নূতন সত্যধর্ম্মে পরিণত করতে পারলে বাঁচেন। সত্যমূর্ত্তির দল ফেডারেশনের জালে জড়িয়ে পড়ে দিল্লীর শাসন-যন্ত্রের অঙ্গ হতে পারলেই খুসী। কাশ্মীর থেকে ত্রিবাঙ্কুর পর্য্যন্ত দেশী রাজ্যগুলিতে আত্মকর্ত্তৃত্বের যে ধ্বনি উঠেছে কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষেরা তাকে ধামা চাপা দেবার পক্ষপাতী। কাণপুরের শ্রমিকবিজয়ে স্থানীয় কংগ্রেস কর্ম্মীদের হাত থাকলেও প্রাদেশিক বা জাতীয় প্রতিষ্ঠান তাকে বিশেষ সাহায্য করেনি। বিহারে কৃষকদের সঙ্গে কংগ্রেসের বিরোধ বাধবার উপক্রম দেখা যাচ্ছে। বাংলা

দেশে কংগ্রেস মৃতপ্রায়, তাকে নানারূপ কৃত্রিম উত্তেজনার আশ্রয় নিতে হচ্ছে। শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করার চেষ্টার অভাবে একদিকে শক্তিক্ষয় ভাবনার কথা, অন্যদিকে কৃষকমহলেও কংগ্রেসী প্রভাব সীমাবদ্ধ। শ্রমিক ও কৃষকেরা কংগ্রেসের শুধু কথায় তুষ্ট হবে না। কংগ্রেসের প্রচণ্ড শক্তি থাকলে হক্ মন্ত্রীমণ্ডলীর সমর্থনে কলিকাতায় সেদিনকার বিরাট জনসমাবেশ অসম্ভব হ'ত।

প্রতিকূল সমালোচনার বিপক্ষে কংগ্রেসী কর্ত্তৃপক্ষদের এক যুক্তি আছে—ইউনাইটেড্ ফ্রন্ট্। প্ল্যানিং-এর মতন এও একটা কথার কথা হয়ে যেতে পারে। লোকে সম্মিলিত হবে কিসের বিরুদ্ধে—এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর ফাশিজম্ ও তদনুরূপ মতামতের বিপক্ষে লড়বার আবশ্যকতা। কংগ্রেসের নেতারা শুধু নামের মহিমায় ঐক্য দাবী করলেই সকলের আনুগত্য পাবেন না। সমাজ দ্বিধাবিভক্ত থাকলে সম্পূর্ণ ঐক্যের কামনাও অসার।

শ্রীবিজন রায়

কবিতাগুচ্ছ

সন্ জি, পি-র গান

বেগোনিয়া ঝরে, ক্ষীণ পদভরে দোলায় শাখা
কৃষ্ণচূড়া ও পাতাবাহার ও শুপারি তাল,
ম্যাগ্‌নোলিয়ার পাতা খসে' পড়ে রূপালি আঁকা।
বাতাসের পিঠে চেপেছে সিন্ধবাদী বেতাল।

মনে হয় যেন স্পানিশ গরম গীটার্-গীতে
নরম দেহের ইসারা বিছায় আঙুর-ক্ষেতে।
আলহাম্‌ব্রার জ্যোৎস্নামদির সন্ধ্যামায়া।
গরম হাওয়ায় টোলেডো ছড়ায় গ্রেকোর ছায়া।

চীনে জুঁই কবে ফুট্‌বে কে জানে স্বদেশী বেল!
রজনীগন্ধা, তন্বী উজ্জয়িনীর ক্ষামা।
এস নীপবনে ছায়াবীথিতলে, দগ্ধ ঝামা
আকাশে ছড়াও হাবসী মেঘের কঠিন শেল।

হে পর্জন্য! ঐরাবতেরা দোলাক্ শাখা—
কৃষ্ণচূড়া ও আম্‌লকি আর শুপারি তাল।
ভেঙে যাক্ ঝড়ে ল্যাম্পপোষ্টের কাচের ঢাকা।
হে ত্রিশূলপাণি! কোথায় বিশপঁচিশ বেতাল!

বিষ্ণু দে

নবজন্ম

অনেক স্মৃতির অনেক জাগা'র স্পন্দনে
ঝিকিমিকি দিন রাতের তারার মত।
কৃষ্ণ আকাশে কোন্ সে কিশোরী নারী
পাণ্ডুর স্তন মস্‌লীন নীলে ঢেকে'
চঞ্চল হাতে মুক্তা ছড়ায় কত
ভ্রমর চক্ষু ঘন পল্লবে ভারী।
ঝিকিমিকি তারা অনেক স্মৃতির মত।

সে মায়া মিলেছে আজিকার জাগরণে
কেরাণী জীবনে কোন বাহুল্য নেই।
সান্ধ্য আকাশে তারাদের স্পন্দনে
মস্‌লীনে ঢাকা কিশোরীর মায়া নেই।
মুক্তা ছড়ানো?—মিথ্যে, ব্যঙ্গ সবই;
আকাশেতে আঁকা বর্শার বিদ্রূপ!

তীক্ষ্ণ বর্শা, শাণিত চিকন ফলা:
কত সমস্যা, কত নিরাশায় ভারী।
সান্ধ্য আকাশে ষ্টিলের তীক্ষ্ণতায়
কোথায় আজিকে চঞ্চল সেই নারী—
পাণ্ডুর স্তন মস্‌লীন নীলে ঢাকা।
কোথায় আজি এ কালো অরণ্যে আঁকা
ভ্রমর চক্ষু ঘন পল্লবে ভারী?

মুক্তা ছড়ানো?—মিথ্যে, ব্যঙ্গ, সবই:
আকাশেতে আঁকা বর্শার বিদ্রূপ!

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র

রজনী তামসী ঘোরা, মৃত্যুমোহে নিদ্রিতা ধরণী,
নিশ্ছিদ্র অরণ্যশীর্ষে নিষ্ফল ঝড়ের হাহাকার,
নিশ্চেতন, সূচীভেদ্য সে গহনে জীবনসঞ্চার,—
একদা আনিলে তুমি বজ্রকণ্ঠে সেথা দৈবধ্বনি,

"তুচ্ছ এ জীবনপণ, দৈবযুদ্ধে জয়-বিনিময়ে।
চাই ভক্তি, আনো ভক্তি, ভক্তির তপস্যা হোক্ ব্রত,
বন্দিতে মাতারে গড়ো চিত্তে তাঁর মূর্ত্তি শত শত।
শুধু কর্ম্মে নহে, পূজা ধর্ম্ম ও কর্ম্মের সমন্বয়ে।"

তুচ্ছ এ জীবনপণ, অবজ্ঞা ও অহঙ্কার যথা
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বেদী রচিয়াছে উদ্ধত শিখর।
সংস্কারাভিলাষী সেবা, সে শুধু ব্যঙ্গের নামান্তর,
নম্র প্রেম, লোকসাম্য, সে কি শুধু অর্থহীন কথা?

আজিকে নৈরাশ্য ঘন ব্যাপ্ত হল দিকে দিগন্তরে,
বর্ব্বর-সভ্যের খড়্গে ঝলসায় ধ্বংস-বিভীষিকা,
অসভ্য-বর্ব্বর শিরে হানি তীব্র সর্ব্বনাশ লিখা
লালসার নরকীয় নরমেধ উদ্‌যাপন করে।

লুপ্ত সূর্য্য, চন্দ্র, তারা; ক্লীব সৈন্য-সন্তানের দল,
ভক্তি নাই, ধর্ম্ম নাই, নাই চিত্তে তপস্যার বল।
তুচ্ছ এ জীবনপণ, তুচ্ছ শুধু কর্ম্ম আড়ম্বর,
হে ঋষি কোথায় তুমি, কোথা তব মন্ত্র শুভঙ্কর?

নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে বিস্ময় সম দাঁড়ায়েছ একা,
জাতির দৃষ্টির পথে জ্বালিয়াছ জলদর্চ্চি রেখা,—
সে দীপ্তি নিভিয়া আসে। হৃদে পুন জাগে শঙ্কা, ভয়,
মরণের পার হতে মৃত্যুরে আবার করো জয়।

মনীশ ঘটক

আত্ম-নির্ব্বাসিত

আমি আজ নির্ব্বাসিত অন্তরের অন্তঃপুর হতে
জনারণ্যে,—অথবা সুদূরে ছায়াহীন মরুভূ প্রান্তরে,
প্রতপ্ত বালুর দেশে;—নিশ্চিহ্ন পথের ধূলি সম
গৃহহারা পথিকের ত্রস্ত পদে সঞ্চালিত আমি
অতি ক্ষুদ্র অতি তুচ্ছ, লোক-লোচনের অন্তরালে
ক্ষীণপ্রাণ কীট সম জীবযাত্রা করিয়া নির্ব্বাহ
রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষায় ধ্যান করি আসন্ন মৃত্যুর,
সে মৃত্যু আসে না কাছে, দেয় শুধু মৃত্যুর যন্ত্রনা।
আত্ম-নির্ব্বাসিত আমি, মৃত্যু তাই কামনা আমার;
প্রতি পলে অপমৃত্যু, তার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়স্কর।
আমারে ঘেরিয়া এই প্রেতনৃত্য চলে রাত্রিদিন,
কবন্ধ দু'বাহু মেলি বন্ধন করিতে চায় মোরে
শশ্মান-বহ্নির ধূমে অবলুপ্ত ধরণীর কায়া,
বলির শাণিত খড়্গ স্কন্ধদেশ স্পর্শ মাত্র করে—
আসেনা বাঞ্ছিত মৃত্যু অবাঞ্ছিত স্তিমিত জীবন,
বিলম্বিত মৃত্যুদণ্ডে শিরে বহে নিষ্ঠুর লাঞ্ছনা।

এই মোর নির্ব্বাসন! দেবতার নিষ্ঠুর বিধান!
ধরণীর শ্যাম স্নেহ নীল হ'ল নয়নে আমার,
আমার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপি' জ্বলিতেছে বিষবহ্নি জ্বালা
জ্বলিতেছি রাত্রিদিন, এ জ্বালার নাহি শেষ সীমা।
হৃদয় হইতে মোর স্নেহ প্রেম দিছি বিসর্জ্জন
অন্তর হইতে মোর নির্ব্বাসিতা রাণী অনাদৃতা,
বিনা অপরাধে আমি করেছি এ কঠোর বিধান
স্মৃতিতীর্থ পরপারে কাঁদে মোর প্রবঞ্চিতা প্রিয়া
মাঝখানে বয়ে যায় উদ্বেলিত নদী অশ্রুমতী।

নির্ব্বোধের প্রতিহিংসা, নিরুপায়ে আত্মনির্য্যাতন
এমনি বিফলে যায়। নিয়তির দুর্ব্বার বিক্রম !

আমার কি অপরাধ ? আমি কারে করেছি বঞ্চনা ?
চিরশ্যাম ধরণীরে চিত্ত ভরি করেছি বরণ,
প্রাণ-পুষ্পে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিত্যদিন অর্পণ করিয়া
চেয়েছিনু মাধুর্য্য-প্রসাদ ;—বহু মানে শির পাতি
অভিশাপ করিনু গ্রহণ ; আপনারি হাতে তাই
নিষ্ঠুর কঠিন দণ্ড সহিতেছি অম্লান বদনে।
পৃথিবী চাহেনি মোরে, সংসার রাখিল ঠেলে দূরে
ঘরের মঙ্গল শঙ্খ সেও মোরে ডাকিল না ঘরে ;
প্রিয়ার সজল আঁখি স্বপ্নেও ভুলাতে আসেনারে
দিক হ'তে দিগন্তরে আস্তীর্ণ জটিল মায়াজাল।
গগন-সীমান্ত-রেখা নিরুদ্দেশ যাত্রার সম্মুখে
যেমন ফুটিয়া ওঠে নবারুণ-আশার আলোকে,
হৃদয়-স্পন্দনে জাগে অসীমের আনন্দ সুন্দর,
তেমনি জাগিছে মনে, রূপায়িত মানসী আমার
মুক্তি দিতে চায় মোরে, নির্ব্বাসন কারাগৃহ হতে
টানিয়া লইতে চায়—লোকালয় হ'তে কল্পলোকে।
আমারে চিনেছি আমি ভ্রষ্টলগ্ন সুন্দর অতিথি
পৃথিবীর এ পান্থশালায় ; যে পথে এসেছি আমি
ফিরিতে হইবে সেই পথে ; নিরুদ্দেশ যাত্রা নহে মোর ;
অন্তর ব্যথায় রাঙা রক্ত শতদলে অর্ঘ্য ভরি
সন্ধ্যার বন্দনা সহ অর্ঘ দিব মানসী প্রিয়ারে।

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

ভারতপথে*

(১৮)

আজিজ মিনিটখানেক গুহার মধ্যে অপেক্ষা করল। এডেলার কাছে ফিরে গিয়ে একটা অজুহাত দেওয়া চাই তো—"ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল তাই পালিয়ে গিয়েছিলাম"—কিম্বা ঐ রকম একটা কিছু, তাই একটা সিগারেট সে ধরিয়ে নিল। তারপর ফিরে এসে দেখে কেউ কোথাও নাই, শুধু গাইড একপাশে ঝুঁকে কি দেখছে। একটা কি শব্দ নাকি সে শুনেছে, আজিজও তা শুনতে পেল—মোটর গাড়ির আওয়াজ। কাউয়া দোলের মাথার কাছাকাছি তারা পৌঁছেছিল, আরো প্রায় হাত দশেক উপরে উঠে তারা নিচের সমতলভূমি দেখতে পেল। চন্দ্রপুরের রাস্তা দিয়ে একটা মোটর গাড়ি আসছিল পাহাড়ের দিকে, কিন্তু ভালো ক'রে তা ওদের চোখে পড়ল না, কেননা খাড়া খাড়া পাথরগুলো মাথার কাছে এমনি ক'রে বেঁকে গিয়েছিল যে পাহাড়ের তলা সহজে দেখা যাচ্ছিল না। মোটর গাড়িটা তাই কাছাকাছি এসে পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হোলো। ঠিক যেখানে তারা দাঁড়িয়ে তার তলার এসে গাড়িটা অবশ্য থামবেই —যে জায়গায় পাকা রাস্তাটার শেষ হয়ে কাঁচা পাথর সুরু হয়েছে, হাতীটা যেখানে হঠাৎ ঘুরে পাহাড়মুখো হয়ে চলতে আরম্ভ করেছিল।

অতিথিদের এই অদ্ভুত খবর শোনাবার জন্যে আজিজ ছুটে গেল। গাইড বলল, এডেলা একটা গুহার মধ্যে ঢুকেছে।

"কোন গুহা ?"

গাইড একসঙ্গে অনেকগুলো গুহা দেখিয়ে দিল।

আজিজ খুব কড়া সুরে তাঁকে বলল, "তোমার উচিত ছিল তাঁকে চোখে

* E. M. FORSTER-এর বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস A PASSAGE TO INDIA আদ্যন্ত সমান উপাদেয় হইলেও আকারে এত বড় যে সম্পূর্ণ বইখানির তর্জ্জমা ধারাবাহিক ভাবেও প্রকাশযোগ্য নহে। সেইজন্য অগত্যা আমরা আখ্যায়িকার সারটুকুই নিয়মিতরূপে মুদ্রিত করিব। কিন্তু হিরণকুমার সান্যাল মহাশয় সমগ্র গ্রন্থখানিই ভাষান্তরিত করিতেছেন এবং নির্ব্বাচিত অংশের প্রকাশ 'পরিচয়ে' সমাপ্ত হইলেই তাহার সম্পূর্ণ অনুবাদ পুস্তকাকারে বাহির হইবে।—পঃ সঃ

চোখে রাখা। এখানে অন্তত বারোটা গুহা আছে, এখন এর মধ্যে কোনটিতে উনি গেছেন তা কেমন ক'রে আমি টের পাব ? আর আমিই বা ঢুকেছিলাম কোনটাতে ?"

গাইড আবার সেইরকম অস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিল গুহার সার। তাকিয়ে দেখে আজিজের সন্দেহ হোলো যে গুহার মধ্যে সে ঢুকেছিল তা হয়তো ঐগুলির মধ্যে আদবেই নাই। যেদিকে চাওয়া যায় শুধু গুহা—এই হোলো তাদের আদিম উৎপত্তিস্থান—প্রত্যেকটির মুখ একেবারে সমান। ওর মনে আতঙ্ক হোলো, মিস কেষ্টেড বুঝি হারিয়ে গেছেন। নিজেকে সামলে নিয়ে আবার ও খুঁজতে সুরু করল।

গাইডের উপর হুকুম হোলো—"চীৎকার করো"।

খানিকক্ষণ চেঁচামেচির পর গাইড বলল, বৃথা চেষ্টা, কেননা মারাবার গুহার ভিতরে এক ঐ প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কোনো আওয়াজ শোনা যায়না।

আজিজ মাথা মুছল, ওর পোষাকের ভিতর দরদর ধারায় ঘাম ছুটছিল। জায়গাটা বিষম গোলমেলে, খানিকটা সমতল, খানিকটা আঁকাবাঁকা, আর সরু সরু সব খাঁজ এদিকে ওদিকে চারদিকে গিয়েছে, সাপের চলার দাগের মতন। ও চেষ্টা করল প্রত্যেকটার ভিতর ঢুকে দেখতে কিন্তু কোনটার থেকে যে আরম্ভ তা গেল ওর গুলিয়ে—একটার পিছনে আর একটা গুহা, কতকগুলো বা জোড়ায় জোড়ায়, কতকগুলো আবার একটা গলির মুখে।

বেশ নরম সুরে আজিজ গাইডকে বল্‌ল, "শুনে যাও," তারপর বেচারি কাছে আসা মাত্র দিল তার মুখে এক থাপ্‌পড়—এই হোলো তার সাজা। লোকটা দিল দৌড়, ও পড়ল একা। ওর মনে হোলো, "আমার অতিথি হারিয়ে গেছেন—আমার ভবিষ্যতের দফারফা।" তারপরেই রহস্যটা ওর কাছে পরিষ্কার হ'য়ে গেল।

মিস কেষ্টেড আসলে হারিয়ে যাননি, মোটরে যারা এসেছিলেন তাদের দলে গিয়ে যোগ দিয়েছিলেন, নিঃসন্দেহ তাঁরা ওঁর বন্ধু, বোধ হয় হিসলপ হবেন। বহুদূরে—সেই সরু লম্বা পথটার উপর হঠাৎ আজিজ ওঁকে দেখতে পেল, সামান্য একটু দেখা, কিন্তু খুব স্পষ্ট ; চারদিকে পাথর, তারি মাঝখানে দাঁড়িয়ে উনি আর একটি মহিলার সঙ্গে কথা বলছিলেন। দেখে ওর এত আশ্বস্তি হোলো যে

ব্যাপারটা একটুও অদ্ভুত মনে হোলো না। হঠাৎ ব্যবস্থাপত্রের ওলটপালট হওয়া আজিজের কাছে কিছু নতুন নয়, তাই ওর মনে হোলো বুঝি উনি একটু মোটরে ঘুরে আসার লোভে এক দৌড়ে কাউয়া দোলে গিয়ে হাজির হয়েছেন। একলা একলা ও আস্তানার দিকে ফিরতে সুরু করল আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখে পড়ল এমন একটা জিনিষ একটু আগে যা দেখলে ও অস্থির হ'য়ে উঠত : মিস্ কেষ্টেডের দূরবীন। একটা গুহার একেবারে ধার ঘেঁষে, ঢোকবার একটা সুড়ঙ্গপথের মাঝামাঝি দূরবীনটা পড়ে ছিল। ও সেটিকে তুলে চেষ্টা করল কাঁধে ঝুলিয়ে নিতে, কিন্তু ঝোলাবার চামড়ার ফিতে গিয়েছিল ছিঁড়ে, তাই জিনিষটা স্থান পেল পকেটে। কয়েক পা গিয়েই ওর মনে পড়ল মিস কেষ্টেড যদি আরো কিছু ফেলে আসেন, দেখবার জন্যে ও গেল ফিরে, কিন্তু আবার সেই মুস্কিল, কোন গুহা ও তা চিনতে পারল না। ওর কানে এল নীচে মোটরগাড়ির রওনা হবার আওয়াজ, কিন্তু দ্বিতীয়বার তা আর দেখা গেল না। অগত্যা ও সুরু করল পাহাড়ের গা বেয়ে উপত্যকার দিকে নামতে, উদ্দেশ্য মিসেস্ মূরের কাছে ফেরা। এতক্ষণে যা হোক তবু একটা হিল্লে হোলো, কেননা একটু পরেই ওর চোখে পড়ল ওদের ক্ষুদ্র আস্তানার এলোমেলো রং বেরং, আর এ সবের মাঝখানে খাস সাহেবি এক টুপি, আর তার তলায়—কি মজা!—মিষ্টার হিসলপের না, ফিলডিং-এর হাসিভরা মুখ।

এই প্রথম 'মিষ্টার' বর্জ্জন ক'রে ও চেঁচিয়ে উঠল, "ফিলডিং, কি ভয়ানক যে তোমাকে চেয়েছি।"

ওর বন্ধুও গেলেন ওর দিকে দৌড়ে, ট্রেণ সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ আর নিজের কসুরের উচ্চৈঃস্বরে ব্যাখ্যায় একেবারে শতমুখ হ'য়ে। মোটের উপর দুই বন্ধুর মিলনটা হোলো বেশ স্ফূর্ত্তি আর হৈ চৈ ক'রে—আদব কায়দার কোনো বালাই তাতে ছিল না। আর একটি মহিলা হলেন মিস ডেরেক। ফিলডিং এসেছিলেন তাঁরই নতুন মোটরে চড়ে। সুরু হোলো বক্‌বক্, চাকররা, সব রান্না ছেড়ে উৎকর্ণ হ'য়ে উঠল তা শোনার জন্যে। খাসা লোক বটে মিস ডেরেক্। পোষ্ট আফিসে হঠাৎ ফিলডিং-এর সঙ্গে তাঁর দেখা, অতঃপর প্রশ্ন, "মারাবারে যাননি কেন ?" ট্রেণ ধরতে পারেন নি শোনামাত্র অমনি মোটরে তাঁকে নিয়ে আসার প্রস্তাব—একেবারে কালবিলম্ব না ক'রে। এই আর একটি ভালো ইংরেজ

মহিলা। উনি গেলেন কোথায় ? ফিলডিং যতক্ষণে আস্তানার খোঁজ করেছেন ততক্ষণে উনি গাড়ি আর ড্রাইভার সহ চম্পট দিয়েছিলেন। গাড়িটা অবশ্য অতদূর ঠেলে উঠতে পারেনি—দলে দলে লোক তাই ছুটল মিস ডেরেককে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসতে। স্বয়ং হস্তীপ্রবর…

"আজিজ, একটু গলা ভিজোবার কিছু হতে পারে ?"

"অবশ্য না"—ব'লে ও ছুটল গলা ভিজোবার জিনিষ আনতে।

মিসেস মূর ছিলেন ছায়াতে বসে, 'মিষ্টার ফিলডিং' বলে তিনি ডাকলেন। এতক্ষণ তাঁদের কথা হয়নি কেননা ফিলডিং-এর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে পাহাড় থেকে নেমেছিল যেন বন্যার ধারা।

সব কিছু ঠিক দেখে আশ্বস্ত হয়ে ফিলডিং উত্তর দিলেন, "এই যে, আর একবার তাহলে 'গুডমর্ণিং' বলি।"

"মিষ্টার ফিলডিং, মিস কেষ্টেডকে দেখেছেন ?"

"কিন্তু আমি তো এই আসছি। তিনি কোথায় ?

"আমি বলতে পারি না।"

"আজিজ, মিস কেষ্টেডকে কোথায় রেখেছ ?"

পানীয় ভরা গেলাস হাতে আজিজ ফিরছিল। প্রশ্ন শুনে একটু ওকে ভাবতে হোলো। ওর মন নতুন আনন্দে হয়েছিল ভরপুর। অত্যন্ত বেখাপ্পা রকমের দু একটা ঘটনা ঘটবার পর এই 'পিকনিক'টা যে এমন একটা অভাবনীয় ব্যাপারে পরিণত হবে স্বপ্নেও ও তা ভাবেনি, কেননা ফিলডিং তো এসেছিলেন বটেই, সঙ্গে এনেছিলেন আবার অনিমন্ত্রিত এক অতিথিকে। "মিস কেষ্টেড ঠিক আছেন, মিস ডেরেকের সঙ্গে উনি দেখা করতে গিয়েছেন। এই যে ফিলডিং তোমার গলা ভিজোবার ওষুধ।"

মিস ডেরেককে নিয়ে আসার জন্যে যে মিছিল হাজির হয়েছিল, তাঁর ড্রাইভার তাদের মাঝপথে থামিয়ে খবর দিল যে তিনি অপর তরুণীটিকে নিয়ে চন্দ্রপুরে ফিরে গেছেন আর ওকে পাঠিয়েছেন সেই কথা জানাতে। গাড়ী তিনি নিজেই চালিয়ে নিয়ে গেছেন।

শুনে আজিজ বল'ল, "খুবই তা সম্ভব। জানতাম ওঁরা একটু টহল দিতে গেছেন।"

ফিলডিং ব'লে উঠলেন, "চন্দ্রপুর ? লোকটা নিশ্চয়ই ভুল শুনেছে।"

"না, না, কেন ?" একটু দমে গেলেও ব্যাপারটা আজিজ খুব হালকা ভাবে নিল ; ঐ তরুণী দুটি নিশ্চয় পরস্পরের বিশেষ বন্ধু। চারজনকেই ব্রেকফাষ্ট খাওয়াতে পারলে হোতো ভালো, তবে অতিথিদের ওপর তো আর জোর চলে না, তাহলে যে তাঁরা একেবারে কয়েদীর সামিল হয়ে যাবেন। মনের আনন্দে ও গেল 'পরিজ' আর বরফের ব্যবস্থা তদারক করতে।

ফিলডিং জিজ্ঞাসা করলেন, "হোলো কি ?" তাঁর সন্দেহ হয়েছিল কিছু গোল ঘটেছে। সারাপথ মিস ডেরেক এই বনভোজনের কথা বল্‌তে বল্‌তে এসেছিলেন, তাঁর পক্ষে এটা নাকি একটা অভাবিত সৌভাগ্য। আর এ দেশের লোকেরা যারা তাকে নিমন্ত্রণ টিমন্ত্রণে ডাকে তাদের চাইতে যারা ডাকে না তাদেরই নাকি তাঁর বেশী ভালো লাগে। মিসেস মূর বোকার মতন গোমড়া মুখ করে ব'সে বসে পা দোলাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, "মিস ডেরেককে নিয়ে এরকম অসুবিধা তো আকছারই হয়, কি রকম যেন অস্থির পঞ্চানন, সব সময়েই তাঁর বাড়াবাড়ি, সব সময়েই তাঁর নূতন একটা কিছু চাই ; জগতে যা কিছু বলো করবেন, কিন্তু এদেশের যে মহিলাটির ঘাড়ে ভর ক'রে আছেন তাঁর কাছে ফিরে যাবেন না।"

ফিলডিং মিস ডেরেককে অপছন্দ করতেন না। তিনি বললেন, "কই, আমি যখন ওঁর কাছ থেকে আসি ওঁর তাড়া তো কিছু দেখলাম না। চন্দ্রপুরে ফেরার কোনো কথাই ওঠেনি। আমার তো মনে হয় তাড়া মিস কেষ্টেডেরই।"

বৃদ্ধা অমনি চটাং করে জবাব দিলেন, "এডেলোর তাড়া ? ওর জীবনে কখনো তা হয়নি।"

মাষ্টার মশায় না বলে পারলেন না, "যাই বলুন, দেখবেন মিস কেষ্টেডের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজই হয়েছে—আমি জানি বলেই বলছি।" ভদ্রলোক কেমন যেন খাপ্পা হ'য়ে উঠেছিলেন, বিশেষ ক'রে নিজের উপর। প্রথমতঃ করলেন ট্রেণ ফেল—ইতিপূর্ব্বে এহেন পাপ কখনো তিনি করেননি ; তারপর যদিই বা এসে পৌঁছলেন, তাতে আজিজের ব্যবস্থাপত্র দ্বিতীয়বার গেল উল্টে। মন তাঁর চাইছিল দোষের ভাগী আর একজন কাউকে করতে। মিসেস মূরের দিকে তীব্র হাকিমি দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি বললেন, "আজিজ খাসা ছেলে !"

বৃদ্ধা হাই তুলতে তুলতে জবাব দিলেন, "তা জানি।"

"এই বনভোজনটা যাতে ঠিকমত হয় তার জন্যে বেচারি কি মেহনৎই না করেছে।"

পরস্পরকে তাঁরা অল্পই চিনতেন, ভারতবর্ষের একজন লোকের টানে তাঁরা যে নিকটতর হচ্ছেন, এটা তাঁদের খুব অদ্ভুত লাগছিল। জাতিগত সমস্যা সময়ে সময়ে অত্যন্ত সুক্ষ্ম আকার ধারণ করে। এঁদের বেলায় এই সমস্যার ফলে হয়েছিল কি রকম একটা ঈর্ষার ভাব, পরস্পরের প্রতি একটা সন্দেহ। ফিলডিং চেষ্টা করছিলেন বৃদ্ধার উৎসাহ জাগাতে, কিন্তু তিনি বিশেষ সাড়া দিচ্ছিলেন না। আজিজ এঁদের দু'জনকেই নিয়ে গেল ব্রেকফাষ্ট খেতে।

ও মন্তব্য করল, "মিস কেষ্টেডের এই ব্যাপারটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।" এই বেখাপ্পা ব্যাপারটা ভোলার জন্যে মনে মনে ও কেবল এই সম্বন্ধে আলোচনা করছিল। "গাইডের সঙ্গে আমরা কথা বলছিলাম, বেশ জমে উঠেছিল, এমন সময় গাড়িটা দেখা গেল, আর উনি তাই বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।" বাজে কথা ও বলবেই, এক্ষেত্রে ইতিপূর্ব্বেই ও ধরে নিয়েছিল যে আসলে তাই ঘটেছিল। ওর মনটা ছিল সুকুমার, তাই এত বাজে কথা বলত। বহুবিবাহ সম্বন্ধে মিস কেষ্টেডের উক্তি ও কিছুতে মনে করে রাখতে চায়নি। কেননা অতিথির অযোগ্য ওরকম উক্তি, তাই মন থেকে এই কথা ও দিয়েছিল ঝেড়ে ফেলে আর সেই সঙ্গে মিস কেষ্টেডের কাছ থেকে ছাড়া পাবার উদ্দেশ্যে এক গুহার মধ্যে ওর নিজের প্রবেশের কথাও। আসলে মিস কেষ্টেডের যথোচিত সম্মানই ছিল ওর অভিপ্রায়, তাই এমন যা নয় সেই কথা ও বলছিল, কেননা জটিল সব ঘটনার যথাযথ সন্নিবেশ করতে হচ্ছিল মিস কেষ্টেডের কাছ ঘেঁষে, ঠিক যেমন আগাছা উপড়ে ফেলার পর জমি পরিষ্কার করতে হয়। ব্রেকফাষ্ট শেষ হ'তে না হ'তে অনেকগুলি মিথ্যা কথা ও ব'লে ফেলল। হাসিমুখে ও ব'লে যাচ্ছিল, "উনি গেলেন দৌড়ে ওঁর বন্ধুর কাছে, আমি এলাম আমার বন্ধুর কাছে। এখন আমি রয়েছি আমার বন্ধুদের কাছে আর তাঁরাও রয়েছেন আমার আর পরস্পরের কাছে—একেই তো বলে সুখ।"

ওঁদের দু'জনকেই আজিজ ভালোবাসত, তাই ও ধরে নিয়েছিল যে ওঁরাও পরস্পরকে ভালোবাসবেন। কিন্তু ওঁদের সে রকম অভিপ্রায় মোটেই ছিল না।

ফিলডিং চ'টে গিয়ে মনে মনে বলছিলেন, "এই মহিলারা একটা কাণ্ড বাধাবেন তা আগেই জানতাম।" আর মিসেস মূর ভাবছিলেন, "লোকটি নিজে করেছে ট্রেণ ফেল, এখন দোষ চাপাবার চেষ্টা করছে আমাদের ঘাড়ে"; কিন্তু বিশেষ জোর করে কিছু ভাববার শক্তি তাঁর ছিল না; সেই যে গুহার মধ্যে তাঁর প্রায় দমবন্ধ হয়ে এসেছিল, তারপর থেকে তাঁর মন ভরে উঠেছিল ঔদাসীন্যে আর বিরূপতায়। প্রবাসের প্রথম কয় সপ্তাহে ভারতবর্ষের যে আশ্চর্য্য রূপ তিনি দেখেছিলেন, স্নিগ্ধ রাত্রি আর অনন্তের মধুর আভাসের মধ্য দিয়ে, তা গিয়েছিল মিলিয়ে।

ফিলডিং গেলেন একটি গুহা দেখতে। বিশেষ ভালো লাগল না। তারপর সবাই করলেন হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ। অভিযানের প্রত্যাবর্তন সুরু হোলো পাহাড়তলীর সঙ্কীর্ণ পথ বেয়ে, তারপর সেই খাড়া গিরিশৃঙ্গের তলা দিয়ে ষ্টেশনের খোলা পথে গিয়ে তা পড়ল। ছোরার মতন তাদের পিছনে বিঁধছিল গরম হাওয়ার ঝলক। ফিলডিং যেখানে গাড়ীটা রেখে গিয়েছিলেন, সে জায়গায় সবাই পৌঁছলে তাঁর মনে কি রকম একটা সন্দেহ হোলো। আজিজকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, মিস কেষ্টেডকে তুমি ঠিক কোথায় আর কি অবস্থায় ছেড়ে গিয়েছিলে?

"ঐ ওখানে"—ব'লে সে হাসিমুখে 'কাউয়া দোল' দেখিয়ে দিল।

"কিন্তু, কি ক'রে"—পাথরগুলোর মধ্যে ঐখানে একটা খাঁজের মতন ছিল, কাঁটাগাছে তা ভরা।—"বোধ হয় গাইড ওঁকে সাহায্য ক'রে থাকবে।"

"তা তো বটেই—খুবই সাহায্য তারা করেছে।"

"ওপর থেকে কি কোনো পথ আছে?"

"পথ? কত চাও? অজস্র পথ আছে।"

ফিলডিং-এর চোখে পড়ছিল শুধু ঐ খাঁজটা, আর সর্ব্বত্র পাথরের চাপ নেমে এসেছে মাটি পর্য্যন্ত।

"নিরাপদে ওঁদের নেমে আসতে দেখেছিলে?"

"দেখেছি বইকি, মিস ডেরেক আর উনি, মোটরে দুজন রওনা দিলেন।"

"তারপর গাইড কি তোমার কাছে ফিরে এল?"

"হ্যাঁ। সিগারেট আছে?"

সাহেব বললেন, "আশা করি ওঁর অসুখ করেনি।" ঐ খাঁজটা সমতল ভূমিতে এসে একটা নালায় পরিণত হয়েছিল, এই দিয়ে গঙ্গায় গিয়ে পড়ত এখানকার সব জল।

"অসুখ করলে দেখবার জন্যে আমাকে উনি নিশ্চয় ডাকতেন।"

"সে কথা যুক্তিযুক্ত বটে।"

আজিজ খুব সহৃদয়তার সঙ্গে বলল, "তোমার বুঝি ভাবনা হচ্ছে ? এস, অন্য কথা বলা যাক। মিস কেস্টেড যখন যা খুসি করবেন, এই ছিল আমাদের ব্যবস্থা। তোমার বুঝি ভাবনা হচ্ছে আমার জন্যে ? আমার কিন্তু কিছু এসে যায় না, এসব তুচ্ছ ব্যাপার আমার চোখেই পড়ে না।"

"তোমার জন্যেই তো ভাবনা হচ্ছে। ওঁদের খুব অভদ্রতা হয়েছে এরকম করা"—খুব মৃদুস্বরে ফিলডিং বললেন। "তোমার পার্টি থেকে মিস কেস্টেডের চম্পট দেওয়ার আর মিস ডেরেকের ওঁকে সাহায্য করার কোনো মানে হয় না।"

স্বভাবত অভিমানী হ'লেও, আজিজের মনে এ ব্যাপারে একটুও ঘা লাগেনি। যে পক্ষে ভর ক'রে সে উর্দ্ধ আকাশে উড়ছিল তার শক্তি ছিল সম্পুর্ণ অক্ষুণ্ণ, কেননা মোগল সম্রাটের মতন সে তার কর্ত্তব্য সম্পাদন করেছে। হস্তীপৃষ্ঠের উচ্চ আসন থেকে সে দেখছিল মারাবার পাহাড় ক্রমশ যাচ্ছে দূরে চলে; কঠিন এলোমেলো সমতলভূমি আবার তার চোখে পড়ল, আবার সেই কূয়ো থেকে জল তোলার বালতিগুলোর ক্ষীণ আন্দোলন, শাদা শাদা সব মন্দির, নীচু নীচু কবর, একঘেয়ে আকাশ, গাছের মতন সেই সাপ—এক একটি দৃশ্য যেন তার বিপুল সাম্রাজ্যের এক একটি অংশ। অতিথিদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে যথাসাধ্য সে করেছে—যদি কেউ দেরি ক'রে এসে বা তাড়াতাড়ি চ'লে গিয়ে থাকেন, সে তাঁরা বুঝুন। হাওদার শিকগুলোতে হেলান দিয়ে ঢুলতে ঢুলতে মিসেস্ মুর ঘুমোচ্ছিলেন; বিশেষ শ্রদ্ধা ও সতর্কতার সঙ্গে তাঁকে জড়িয়ে বসেছিল মহম্মদ লতিফ; আজিজের পাশে ব'সেছিলেন ফিলডিং, ওঁকে আজিজ ভাবতে সুরু করেছিল 'সিরিল' ব'লে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

পুস্তক-পরিচয়

Social Interest: A Challange to Mankind—by Alfred Adler (Faber and Faber).

ফ্রয়েডীয় মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ফল মেনে নিতে যাঁরা সঙ্কোচ এবং দ্বিধা বোধ করেন তাঁদের মনোভাব সাধারণতঃ বৈজ্ঞানিক চিন্তাপ্রসূত মোটেই নয়। তাঁরা ফ্রয়েডের থিওরির বিরুদ্ধে যে-সব যুক্তি প্রয়োগ করবেন তার থেকে ঢের সারবান এবং গভীর যুক্তি আমরা যে কোন ফ্রয়েড-বিরোধী মনস্তাত্ত্বিকদের কাছে নিশ্চয়ই পাব। নিরপেক্ষ অর্থাৎ অনধীত মনে প্রত্যেক সুগঠিত অর্থাৎ প্রত্যয়জনক যুক্তি-সম্বলিত থিওরিকেই সত্য বলে মেনে নেওয়ার একটা সাবলীল আকিঞ্চন থাকে। Adler-এর মনস্তত্ত্ব খুবই সুসজ্জিত; অতিরিক্ত লজ্জানিষ্ঠাযুক্ত অথবা অপ্রিয় সত্যভীত মনোভাবের কাছে খুবই আদরণীয়। এখানে কিন্তু এমন হাস্যাস্পদ ইঙ্গিত করা হচ্ছে না যে Adler স্বয়ং এই মনোভাবের প্রভাববর্ত্তী, এবং এই মনোভাবের কাছে প্রিয় বলেই তাঁর থিওরি অসার এবং পরিত্যাজ্য। যা বলা হচ্ছে তা হ'ল এই যে ফ্রয়েডীয় যৌন প্রবর্ত্তনাকে মানব মনস্তত্ত্বের মূল কথা বলে অস্বীকার করার ঝোঁকেই Adler-এর "ব্যক্তিগত মনস্তত্ত্বকে" সম্পূর্ণভাবে মেনে নিলে Adler এবং ফ্রয়েড উভয়ের প্রতিই অবিচার করা হবে। যেখানে ঝাঁঝাল রাষ্ট্রনৈতিক মতের বালাই নেই সেখানে হয়ত মনটা খোলা রাখা খুব শক্ত নয়।

গ্রন্থকার তাঁর বইয়ের নাম দিয়েছেন Social Interest: A Challenge to Mankind। এই থেকেই তাঁর থিওরির পূর্ব্বাভাস পাওয়া যায়। প্রথমেই মনে হতে পারে যে এখানে ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক জীবনের সজ্ঘর্ষের ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু তা ঠিক নয়। Adler বলতে চান যে ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত সাম্প্রদায়িকতাবোধের সমস্যা হ'ল মানবজাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমস্যা। ব্যক্তি সমাজের অংশ বিশেষ এবং ব্যক্তিত্বের স্ফুর্ত্তি কেবল সমাজেই সম্ভব। এক কথায় Aristotle-এর 'মানব সাম্প্রদায়িক জীব'-এরই পুনরুক্তি। সজ্ঘর্ষের কথা

ওঠে কেবল তাদের বেলায় যারা জীবন-সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় সামান্য অথবা ক্রটিযুক্ত সাম্প্রদায়িকতাবোধের পুঁজি নিয়ে।

জীবনে তিনটি প্রধান সমস্যার সম্মুখীন মানুষকে হ'তে হয়—সহজীবীদের প্রতি, ধর্ম্মের প্রতি এবং প্রেমের প্রতি মানুষ যে দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করে। এই তিনটি সমস্যাই প্রথমটির দ্বারা পরস্পরের সহিত নিবিড়ভাবে সম্বন্ধিত। এ প্রশ্নগুলি আকস্মিক নয়, অপরিহার্য্য। মানব সমাজের সঙ্গে, জাগতিক ব্যাপারের (cosmic factors) সঙ্গে এবং স্ত্রীজাতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক থেকে এগুলি উদ্ভূত। এগুলির সমাধানের উপর মানবজাতির, তথা ব্যক্তিগত মানবের, ভাগ্য এবং কল্যাণ নির্ভর করছে। ব্যক্তি সমাজের অংশ বিশেষ। সমাজ ছাড়া ব্যক্তির কোন মূল্যও নেই, অর্থও নেই। সমষ্টির কল্যাণে যে-ব্যক্তির কোন অবদান নেই সে ব্যক্তির জীবন অর্থহীন, ব্যর্থ। তার মৃত্যুতে সমাজের বা জগতের কিছু এসে যায় না। এই ব্যর্থ জীবন তারাই যাপন করেছে বা করছে যাদের জীবনের "goal of perfection" দোষযুক্ত। প্রকৃত "goal of perfection" কি তার সুস্পষ্ট উত্তর Adler দেননি এবং তাঁর আগেও কেউ কখনও দিতে পারেনি, এক ধর্ম্মের কল্পনামূলক অথচ স্পষ্ট উত্তর ছাড়া। Adler নিজেও সে কথা বলেছেন, ফ্রয়েডও বলেছেন, ইয়ুঙ্গও বলেছেন। Individual Psychology নিশ্চিতভাবে যা বলতে পারে তা হ'ল negative। অর্থাৎ যে-সব লোকের মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসার প্রয়োজন তারা যে-লক্ষ্যের অনুবর্ত্তী সে লক্ষ্য প্রকৃত পূর্ণতার লক্ষ্য নয়। তথাপি "ব্যক্তিগত মনস্তত্ত্ব" ভূয়োদর্শনের প্রসাদে আদর্শ পূর্ণতা লাভের পথ নির্দ্দেশ করে দিতে সমর্থ "and indeed it has shown this direction by establishing the norm of social feeling।" চরম উৎকর্ষের জন্য এবং আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থা সংস্থাপনের জন্য মানুষের যে শাশ্বত সংগ্রাম সেইটিই হল সাম্প্রদায়িকতাবোধের পূর্ণতম বিকাশ। অর্থাৎ সেই লক্ষ্যই ঠিক, যার আকাঙ্ক্ষা হ'ল বিবর্ত্তনের চরম সমাধান। সাম্প্রদায়িকতাবোধ তা হলে এক কথায় দাঁড়াচ্ছে মানবতার চরম পরিণতি। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে ভাববাদবিলাসী কথার বাঁধুনি বেশ স্পষ্ট।

প্রত্যেক মানুষের জীবনের আচরণ তার idea'র দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয়। এমন ভাবে মানুষ তার জীবন পরিচালনা করে যে মনে হয় যেন তার নিজের শক্তি এবং

সামর্থ্য সম্বন্ধে একটা বিশিষ্ট ধারণা আছে। জীবনকে আমরা কি ভাবে অভিব্যক্ত করি তা নির্ভর করে আমাদের style of life-এর উপর। জীবন-সংগ্রাম সুরু করবার আগেই জীবন সম্বন্ধে আমাদের একটা ধারণা গঠিত হয়ে যায়। বাস্তব যদি আমাদের এই জীবন-ব্যাখ্যার সঙ্গে সংঘাতে আসে তাতে আমাদের মূল ধারণার কোন পরিবর্ত্তন হয় না, কেবল খুঁটিনাটি বিষয় অল্প বিস্তর একটু বদল হয়। এর কারণ হল যে বহিরাশ্রয়ী বাস্তব প্রত্যক্ষভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। আমাদের ইন্দ্রিয় কেবল বহির্জগতের একটা subjective প্রতিরূপকে অনুভব করে। উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, যেমন মায়ের অন্যায় আদরে নষ্ট শিশু তার মায়ের অনুপস্থিতিতে তস্করের ভয়ে ভীত হয়, বাড়িতে তস্কর থাকুক বা না থাকুক তাতে কোন তফাৎ হয় না। বহির্জগত ব্যক্তির মনের উপর যে subjective প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত করে তারই উপর শিশু তার জীবন-প্রণালী গঠন ক'রে নেয়।

"The sense of inferiority, the struggle to overcome and social feeling" এই তিনটি গণ্ডির মধ্যে ব্যক্তিগত জীবনের সবটাই ধরা পড়ে। ব্যক্তিগত মনস্তত্ত্বের কারবার হ'ল এই তিনটি উৎস সম্বন্ধে গবেষণা করে' ব্যক্তিত্বকে উপলব্ধি করা। ব্যক্তিকে একটি সমষ্টি হিসাবে ধরলে তাকে তার জীবনের সম্বন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। জীবন-প্রণালী থেকে সমাজের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায়। অতএব ব্যক্তিকে বুঝতে হলে, তার সার্থকতা জানতে হ'লে জীবনের সমষ্টির সঙ্গে তার নিবিড় সম্পর্ককে অধ্যয়ন করতে হবে। অর্থাৎ জীবনের সমস্যাত্রয়কে এবং ব্যক্তিগত জীবনের উপর তাদের দাবীগুলিকে ভাল করে' বুঝতে হবে। 'Social interst'-এর উপর সন্নিবিষ্ট এই সমস্যাগুলি যেহেতু অপরিহার্য্য, তাদের সমাধানের জন্য যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সাম্প্রদায়িকতা-বোধের দরকার আছে তা স্বীকার করতে হবে। মানুষের জীবনের উদ্যোগপর্ব্বের একচ্ছত্রী অধিনায়িকা হ'ল মা। মায়ের কাছ থেকেই আসে "The earliest impulses urging the child to make his appearance in life as a part of the whole and seek the right contact with other persons in his world"। মা যদি সর্ব্বদা এমন লোকেদের সংসর্গে আসেন যাদের সঙ্গে শিশুর পক্ষে কোন রকম সংস্পর্শে আসা শক্ত হয়, অথবা প্রায়ই যা হয়ে থাকে,

যদি মা শিশুকে 'আলালের ঘরের দুলাল' করে' তাকে একটা সম্পূর্ণ অন্য রকমের এমন একটা জগৎ সৃষ্টি করে দেন যেখানে সে একাই রাজত্ব করে, তাহ'লে তার আত্ম-বিকাশের সম্ভাবনা খণ্ড হ'য়ে যায় এবং সাম্প্রদায়িকতাবোধ গড়ে ওঠবার সুযোগ পায় না। সন্তানের শৈশবে বাপেরও একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। মা যদি সন্তানের সঙ্গে বাপের ঠিক সম্বন্ধ স্থাপন না করে দেয় তারও ফল অত্যন্ত খারাপ হয়। বাস্তবের সংস্পর্শে এসে মানুষ যখন নিজের যা প্রাপ্য ভাবে তা পায় না তখন সে সমাজের এবং জগতের প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে। শৈশবে অত্যধিক মাতৃস্নেহের আশ্রয় এবং প্রশ্রয় পেয়ে, ভ্রান্ত এবং অনিষ্টকর শিক্ষা পেয়ে, দোষযুক্ত আবেষ্টনে থেকে যারা ভ্রান্ত 'goal of perfection' নিয়ে জীবন সুরু করে তাদের জীবনে সার্থকতা লাভ করার কোন শক্তিই থাকে না। তাদের জীবন ব্যর্থ হয় এবং তারা বিবিধ রকমের মনোবিকারের খপ্পরে পড়ে।

কতটা সাম্প্রদায়িকতাবোধ আমাদের আছে তা জীবনের সমস্যাগুলি ক্রমাগতই পরীক্ষা করে দেখছে এবং তদনুযায়ী জীবন আমাদের গ্রহণ করছে নয় ত পরিহার করছে। মানুষ সর্ব্বদাই পূর্ণতম আদর্শ জীবনের লক্ষ্য অভিমুখে চলেছে। Darwin এবং Lamarch-এর জীবতাত্ত্বিক মত অনুসারে জীবন হল একটি সংগ্রাম। বহির্জগতের দাবীদাওয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিবর্ত্তনের ধারায় নিজের গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলতে হবে। এই জীবনধারার অংশ হিসাবে ব্যক্তিগত জীবনও হল একটা শাশ্বত সংগ্রাম। প্রকৃতি বলবতী, মানুষ দুর্ব্বল। প্রকৃতির মাতৃসুলভ ব্যবহার পায় মানবেতর জীবেরা, মানুষকে হয় কৃত্রিম বাসস্থান, খাদ্য এবং বস্ত্র প্রস্তুত করতে। প্রকৃতির এই বিমাতাসুলভ ব্যবহারের প্রসাদেই যে ব্যক্তিগত মানুষকে স্বীয় দুর্ব্বলতাবোধের তীক্ষ্ণ তাড়নার চাপে নির্ব্বিঘ্নতর অবস্থা লাভের জন্য নিরন্তর সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে হয় তাতে কোন সন্দেহ নেই। জীবনের মৌলিক নীতি হ'ল অতিক্রম করার নীতি, জয়ী হওয়ায় নীতি। তাই "to be a human being means the possession of a feeling of inferiority that is constantly pressing on towards its own conquest"। মানুষ সর্ব্বদাই চেষ্টা করছে minus অবস্থা থেকে plus অবস্থায় যাবার জন্য। নিকৃষ্টতাবোধের ঠেলাতেই মানুষ শ্রেষ্ঠতার আকাঙ্ক্ষা করে। Adler-এর মতে যারা শৈশবে এই জীবন সংগ্রামের জন্য উপযুক্তভাবে

সজ্জিত না হয়, অর্থাৎ তাদের যদি উপযুক্ত পরিমাণে প্রকৃত সাম্প্রদায়িকতাবোধ না হয়, তারা জীবনে কোন সমস্যার সম্মুখীন হলেই তাদের শরীর এবং মনের নিকৃষ্টতা ও বিপৎসঙ্কুলতা শত সহস্র ভাবে আত্ম-প্রকাশ করে। ব্যক্তির এই নিকৃষ্টতাবোধ বা inferiority complex-এর দু'টি আদি কারণ থাকতে পারে—ইন্দ্রিয়গত নিকৃষ্টতা অথবা শৈশবে অত্যধিক আদর যত্ন। এই অবস্থার বাহ্যিক লক্ষণ অনেক আছে, যথা, হৃদযন্ত্রের, উদরের ও পাকস্থলির গোলযোগ ইত্যাদি। এই শ্রেণীর লোকেরা সমাজের দাবীকে অস্বীকার করে' অথবা তফাতে রেখে তাদের বিশিষ্ট জীবন-যাপন করে। Neurosis, psychosis, masochistic আচরণ, আত্মহত্যা, dipsomania, crime অথবা কোন অস্বাভাবিকতা এদের মধ্যে খুব সুলভ। এই সব লক্ষণ প্রস্ফুট হয় যখন এরা কোন বড় সমস্যার সম্মুখীন হয়। অন্য সময় তাদের উদ্বেগ, লজ্জা ও সঙ্কোচ, pessimism, অসামাজিকতা, আত্মকেন্দ্রিকতা প্রভৃতি লক্ষণ দেখে তাদের অবস্থা ধরা যায়। প্রশ্ন উঠতে পারে যে এই সব পরাজিত পশ্চাদগামী লোকেদের বেলায় প্রাধান্যের জন্য সংগ্রামের কি হ'ল? তার উত্তর রয়েছে যে প্রাধান্যের জন্য সংগ্রামের প্রবর্ত্তনার জন্যই ত এরা হয় সাম্প্রদায়িক সমস্যা থেকে পশ্চাদগমনের পথ আঁকড়িয়ে থাকে সেই পথে প্রাধান্য লাভ করবে বলে', নয় ত সমস্যাকে এড়িয়ে অন্য পথে প্রাধান্যের সন্ধান করে। সাধারণ সহজবুদ্ধির পরিবর্ত্তে তাদের একটা ব্যক্তিগত বুদ্ধি থাকে—'private intelligence', যার সুচতুর প্রয়োগের দ্বারা তারা ঠিক পথ থেকে দূরাপসারিত তাদের ভ্রান্ত জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করে নেয়। জীবন যুদ্ধে পরাজিতদের অধিকাংশই অন্যের অবদানকে তাদের নিজের সম্পত্তি বলে গণ্য করে। সমাজের কাছে পরাজয়ের কবল থেকে তারা যে নিষ্কৃতিটা খোঁজে সেই নিষ্কৃতিটাও তাদের কাছে নিজেদের একটা শ্রেষ্ঠতাবোধের সঙ্গে বিজড়িত থাকে। পরাজয়ের ভয় যখন তাদের সহকর্ম্মীদের কাছ থেকে তফাতে সরিয়ে রাখে তারা তখন জীবনের সমস্যা থেকে তাদের সেই বিচ্ছিন্নতাকে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রাপ্য হিসাবে উপভোগ করে এবং বিশ্বাস করে যে তদ্দ্বারা লোকেদের উপর প্রভুত্ব করার স্বত্বাধিকার তাদের থাকে। Superiority complex এবং inferiority complex-এর খুব নিবিড় সম্বন্ধ আছে। এ সমস্তরই তলায় রয়েছে সাম্প্রদায়িকতাবোধ। সাম্প্রদায়িকতাবোধের নিকষ পাথরে হিসাব

করে ব্যক্তির এবং সমষ্টির উভয়েরই মনস্তাত্বিক গঠন এবং উপাদান নির্ণয় করা যায়।

Adler আলোচনা করে বলেছেন যে বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার অনেক গলদ আছে যার জন্য ব্যক্তি এবং সমষ্টি উভয়ের মধ্যেই সাম্প্রদায়িকতাবোধের মাত্রা কম। তাঁর বই লেখার প্রধান উদ্দেশ্যই হল, তিনি বলেছেন, যে তার সাহায্যে কেবলমাত্র যে আমরা অন্যেদেরই বুঝতে পারব শুধু তাই নয়, আমরা নিজেরাও সাম্প্রদায়িকতাবোধের গুরুত্ব উপলব্ধি করে সেটাকে জীবন্ত করে তুলব।

Adler-এর গবেষণাজনিত যে-ব্যাখ্যা এবং আদর্শ আলোচ্য পুস্তকে দেওয়া হয়েছে তার মূলের ভাববাদী সূক্ষ্মতা আমাদের মনকে নাড়া দেয় বটে, কিন্তু নাড়া দিয়ে যেখানে ছিল সেইখানেই রেখে যায়। ভাববাদী দার্শনিকদের "absolute", "self", "unfolding of the idea" প্রভৃতি মনে যেমন একটা অনমুভবনীয়তার এবং অসম্পূর্ণতায় অবকাশ রেখে যায় Adler-এর "goal of perfection", "law of movement" প্রভৃতি তেমনি একটা ফাঁকা ভাব রেখে যায়, যদিও তাঁর লালন-পালন এবং সাম্প্রদায়িকতাবোধ সম্বন্ধে অনুসন্ধান তার থেকেও অনেক বেশি সারবান এবং সহজ-বোধগম্য ব্যাখ্যার ছাপ রেখে যায়। Adler-এর মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে ফ্রয়েড এক জায়গায় টিপ্পনী করেছেন ছ' চরণ কবিতা উদ্ধৃত করে :—

If the idea were not so deuced clever,
One might be tempted just to call it stupid.

আমাদের মত অদীক্ষিতদের কবিতার তীক্ষ্ণতায় মত প্রকাশ করার সাহস নেই। ফ্রয়েডের সঙ্গে আমরা এই পর্য্যন্ত বলতে পারি যে "ব্যক্তিগত মনস্তত্ত্বে" কিছু সত্য আছে বইকি, কিন্তু Adler প্রমুখ মনস্তাত্বিকেরা সেই আংশিক ব্যাখ্যাকে মানব মনের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা বলে প্রতিপন্ন করতে চান।

যাই হোক, মোটের উপর বইটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষী এবং চিন্তা-উদ্দীপক। স্থানাভাবে Adler-এর স্বপ্নতত্ত্ব প্রভৃতি বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা সম্ভব হ'ল না।

শ্রীপ্রবীরচন্দ্র বসু মল্লিক

The Writings of E. M. Forster—by Rose Macaulay
(The Hogarth Press).

ই, এম, ফরষ্টার এখনও জীবিত আছেন। Abinger Harvest-এ তাঁর একটি প্রবন্ধ আছে—'আমার নিজের শত বার্ষিকী' এই নামে। প্রবন্ধটি লেখা হয় ১৯২৭ সালে। এই প্রবন্ধে, ভবিষ্যতে লেখক হিসাবে তাঁর স্থান কোথায়, এই প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই দিতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর যশের সৌরভ চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়বে—বিভিন্ন শ্রেণীর লোক তাঁর লেখার শতমুখে প্রশংসা করবে—কেউ বলবেন, তাঁর লেখার মধ্যে এমন একটি পংক্তি নেই যা মহৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে লেখা হয় নি—কেউ বা তাঁর প্রস্তর মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করবেন—তাঁর নিজের এই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চিত্র তিনি এই প্রবন্ধে এঁকেছেন।

যে ভাবে লেখা হয়েছে, তাতে প্রবন্ধটি প'ড়ে প্রথম প্রথম অনেকেরই বেশ কৌতুক বোধ হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় এ প্রশ্নও মনে জাগবে—ফরষ্টার নিজের লেখার বিষয়ে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, তা কি সফল হ'বে? ইংলণ্ডের একজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ও লেখক বলে তাঁর খ্যাতি আজকাল চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ থেকে আজ পর্য্যন্ত তিনি মাত্র পাঁচখানি উপন্যাস লিখেছেন, কিন্তু এই পাঁচখানি বইই এত উঁচু দরের বলে মনে হয় যে আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তাঁকে খুব উচ্চ আসন দিতে বোধ হয় কেউই ইতস্তত করছেন না। তিনি কতকগুলি ছোট গল্প, প্রবন্ধ প্রভৃতিও লিখেছেন, এগুলিও যে সংখ্যায় খুব বেশী তা নয়। কিন্তু তিনি যা কিছু লিখেছেন, তার উপরই যেন আমরা একটি অসামান্য প্রতিভার ছাপ দেখতে পাই। কাজেই নিজের লেখার বিষয়ে ফরষ্টারের ভবিষ্যদ্বাণী, কৌতুকাবহ হলেও, মিথ্যা হবে বলে মনে হয় না।

আলোচ্য বইখানিতে মিস রোজ মেকলে এই ফরষ্টারের সমস্ত লেখার সমালোচনা করেছেন। প্রথমেই তিনি কি পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে শিক্ষা লাভ করেন ও লিখতে আরম্ভ করেন, তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইংলণ্ডের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের

মধ্যে যে-শিক্ষা ও কৃষ্টি প্রচলিত ছিল, তারই মধ্যে ফরষ্টারের চরিত্র গড়ে ওঠে। তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়া তাঁর খুবই ভাল লেগেছিল বলেই মনে হয়। কেম্ব্রিজকে তিনি কি চক্ষে দেখতেন তার প্রমাণ তাঁর লেখার অনেক জায়গায় পাওয়া যায়। এই সম্পর্কে মিস্ মেকলে বলেছেন, "It is apparent that he fell in love with Cambridge. His second novel, *The Longest Journey*, is partly a glorification of University under-graduate life, as being nearer the true and shining world of reality than is the dark, chaotic muddle and falsity of most life outside."

লেখক ব'লে ফরষ্টার যে খ্যাতি লাভ করেছেন, তার জন্য কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়কে হয়ত অনেকটা ধন্যবাদ দিতে হবে, কারণ মিস্ মেকলের মতে, "He left the enclosure with a classical degree, a passion for ancient Greece, a passion less reverent and more amused for modern Italy, a profound interest in people, in personal relationships, in modes of life, in life itself, a quick perceptive awareness of individuals, the novelist's gift of taking in, registering and reproducing the authentic speech and idiom of all sorts of people."

পারিপার্শ্বিক অবস্থা বর্ণনা করার পর মিস্ মেকলে ফরষ্টারের উপন্যাস, ছোট-গল্প, প্রবন্ধ প্রভৃতির বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করেছেন। তাঁর সমালোচনার বৈশিষ্ট্য এই যে এ সমালোচনা নিছক প্রশংসা বা নিন্দামূলক নয়। তিনি দোষ গুণ উভয়েরই বিচার করেছেন। মিস্ মেকলের মতে ফরষ্টারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস হচ্ছে *Howards End*। এই উপন্যাসখানির মধ্যেও এমন দু একটি চরিত্র আছে ও এমন দু একটি ঘটনা আছে যা স্বাভাবিক বলে মনে হয় না। মিস্ মেকলে সেগুলির উল্লেখ করে, কেন সেগুলি অস্বাভাবিক মনে হয় তা আমাদের দেখাতে চেষ্টা করেছেন।

অবশ্য তাঁর সঙ্গে আমরা সব সময়ে একমত নাও হতে পারি। এমন কি তিনি যে বইখানাকে ফরষ্টারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে মত প্রকাশ করেছেন,

আমরা সেখানাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস ব'লে নাও মানতে পারি। আমাদের কাছে A Passage to India-খানাকেই ফরষ্টারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে ধরা উচিত বলে মনে হতে পারে—এই বইখানাতে তাঁর শক্তির পূর্ণ বিকাশ হয়েছে বলে আমরা মনে করতে পারি, কিন্তু তাহ'লেও স্বীকার করতে হবে যে মিস্ মেকলে অপক্ষপাত ভাবেই তাঁর কাজ করবার চেষ্টা করেছেন এবং অনেকটা কৃতকার্য্যও হয়েছেন।

ফরষ্টারের নানাবিধ লেখার বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করবার পর মিস্ মেকলে তাঁর নিজের সিদ্ধান্তগুলি শেষ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করেছেন। মানুষ এবং মানুষদের পরস্পরের মধ্যে যে সম্পর্ক তার উপরই ফরষ্টার তাঁর সব লেখাতে বিশেষ জোর দিয়েছেন। এ সম্বন্ধে মিস্ মেকলে বলেন, "He believes in the permanent value and importance of human beings and perhaps of their relationships with one another, he believes in culture that can understand beauty; and he believes in freedom intellectual, social and personal"। কিন্তু তাঁর একটি বিশেষত্ব এই যে তিনি প্রেম বা যৌন সম্পর্ককে কোন জায়গাতেই বড় বলে দেখান নি। মিস্ মেকলের ভাষায়, "He handles it now casually, now with a gingerly aloofness, now with a welcome in which its particular incidence appears submerged or sublimated by reverence for it as a token coin of further and more important immensities। ফরষ্টারের আর এক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, "He does not live in his characters or induce his readers to do so; they perform something which his sense of them, and of life, requires, and, in so doing, live for themselves"। কিন্তু এই বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও তাঁর গড়া চরিত্রগুলি প্রায়ই অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না। ফরষ্টারের লেখার ধরণ সম্বন্ধে মিস্ মেকলে যা বলেছেন তা উদ্ধৃত হবার যোগ্য। তিনি বলেন—"I do not know where the charged effect of his prose is to be parallelled in English fiction, except in some of the prose of Virginia Woolf and here and there in D. H. Lawrence's,

It is something far more than style ; it suggests such presence of thought and meaning on language that no word or phrase is empty, and nothing said or done by any of his creatures is idle".

শ্রীদর্শন শর্ম্মা

Joseph in Egypt—by Thomas Mann. (Martin Secker)

টমাস মানের অসমাপ্ত কাহিনীর এটি মধ্যাংশ। কূপ থেকে উদ্ধারের পর জোসেফের মিশর আগমন, পটিফারের গৃহে ক্রমোন্নতি, এবং পটিফারের স্ত্রীর অবৈধ কামনার ফলে জোসেফের কারাবাস, মোটামুটি এই তিনটি অংশে জোসেফ ইন ইজিপ্ট-এর দুই খণ্ডকে ভাগ করা যায়। প্রাচীন মিশরের জীবনযাত্রার পদ্ধতি, পূজারীতি, কুসংস্কার ইত্যাদি মান জোসেফের দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে সুকৌশলে বর্ণনা করেছেন। প্রথম খণ্ডে জোসেফের নিজের দৈব লিখন সম্বন্ধে সচেতনতা, এবং মরুভূমি, পিরামিড, স্ফিন্‌ক্স্‌, সূর্য্যমন্দির ইত্যাদির অপরূপ বর্ণনা মনের উপর গভীর রেখাপাত করে।

ঐতিহাসিক পটভূমির বর্ণনা উল্লেখযোগ্য। বাইবেলের একটি গল্পের কাঠামোকে মান যে ভাবে রক্তমাংসে প্রাণবন্ত করেছেন সেটা বিস্ময়ের বিষয়। শুধু পুরানো কাঠামোকে প্রাণবন্ত করা যেতে পারে বোধ হয় তখনি যখন লেখকের সাম্প্রতিক সমাজবোধ তীক্ষ্ণ থাকে। জেকব ও জোসেফের গল্পটির উপরে মান আধুনিক মনস্তত্ত্বের আলোকপাত করেছেন। অবচেতনের নামে মনস্তত্ত্বের অপলাপ এত করা হয়েছে যে মানের সহজ সাফল্য বিস্ময়কর। সাফল্যের কারণ বোধ হয় এই যে মানের সমাজবোধ এবং পাপবোধ (sense of sin) আছে। তাঁর কাহিনীতে বরাবর সঙ্গতির সুদীর্ঘ রেখা বর্ত্তমান। চরিত্রসৃষ্টির দিক দিয়ে জোসেফ, পটিফার এবং পটিফারের স্ত্রী, এঁরাই প্রধান স্থান অধিকার

করেন। কিন্তু এঁদের আবহাওয়ায় মান আরো কয়েকটি চরিত্র বর্ণনা করেছেন যাদের মূল্য মোটেই স্বল্প নয়, যেমন সণ্ট-কাও, পটিফারের গৃহস্থিত বামনদ্বয়।

জোসেফের চরিত্রে যে জিনিষটি উল্লেখযোগ্য সেটি হচ্ছে তার মিশরীয় সভ্যতা সম্বন্ধে সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গী, পাপবোধ, এবং নিজের ভবিষ্যৎ বিষয়ে সহজ সচেতনতা। নবীন বর্দ্ধিষ্ণু সভ্যতার দৃঢ়তা তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এই দৃঢ়তা কখনো কাঠিন্যে পরিণত হয়নি। ব্যাবহারিক অভিজ্ঞতার এবং আদর্শবাদের সঙ্গত সংমিশ্রণ জোসেফের চরিত্রের এবং জীবনের মূলধন।

এক দিক থেকে পটিফারই 'জোসেফ ইন ইজিপ্ট'-এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চরিত্র। বর্দ্ধিষ্ণু সভ্যতার প্রতিনিধি জোসেফ, ভবিষ্যতের নবীন সূর্য্য তার সামনে ; কিন্তু আধুনিক পাঠকের সঙ্গে আরো অন্তরঙ্গ যোগাযোগ স্থাপিত হয় পটিফারের সঙ্গে। তার জীবনযাত্রার এবং মনস্তত্ত্বের মধ্যে দিয়ে মান পরজীবী, অলস সভ্যতার একটি অধ্যায় আশ্চর্য্য দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। পটিফারের চরিত্রে মানের অন্তর্দৃষ্টি,তার জীবনযাত্রায় লেখকের সংযত সহানুভূতি, এ দুয়ের ফলাফল বিস্ময়কর। এ চরিত্রের, এবং মিশরীয় সভ্যতার সে অধ্যায়ের শ্রেষ্ঠাংশের বিশেষত্ব ছিল আত্মকেন্দ্রিক অনুভূতির তীক্ষ্ণতা। পটিফারের ক্ষেত্রে পরশ্রমজীবী বিশ্রাম ছাড়া সে তীক্ষ্ণতার আর একটি কারণ ছিল নিরুদ্ধরতি। পটিফার সম্বন্ধে বামপন্থী পাঠকের সহানুভূতির অভাব আশা করি হবে না, কারণ বর্ত্তমান সভ্যতার বিকর্ষণে ধ্বংসপ্রায় শ্রেণীর এককালীন মূল্য বিষয়ে তাঁদের জ্ঞানের অভাব হওয়া অনুচিত। পটিফার এবং মুটের কথোপকথনে মান এই শ্রেণীর আত্মকেন্দ্রিক আতঙ্কের এবং স্বার্থপর অর্থহীনতার ইঙ্গিত করেছেন বটে, তবুও এই আরামবিলাসী, সুসভ্য মানুষটির উপর পাঠকের আকর্ষণ শেষ পর্য্যন্ত অবিচলিত থাকে।

পটিফারের স্ত্রীর কাহিনীতে মান তাঁর স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। বইটি মাঝে মাঝে একঘেয়ে লাগে, কিন্তু শেষের দিকে নিরুদ্ধরতি এই স্ত্রীলোকটির আশাহীন কামনা এবং ক্রমোবনতি, জোসেফের মানসিক দ্বন্দ্বের উপর অতীত জীবনের সর্ব্বদা প্রসারিত সতর্ক ছায়া ইত্যাদি আমাদের স্তিমিত কৌতূহলকে

আবার উত্তেজিত করে। তাছাড়া, সমস্ত মহৎ উপন্যাস সম্বন্ধেই স্থানে স্থানে একঘেয়েমীর অভিযোগ বোধ করি আনা চলে। 'জোসেফ ইন ইজিপ্ট' মহত্ত্বের এই বৈশিষ্ট্যের ব্যতিক্রম নয়।

সমর সেন

ছিন্নপত্র— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত	—২৲	}	একত্রে মূল্য ৩৷৹
ভানুসিংহের পত্রাবলী— "	—১৲		
পথে ও পথের প্রান্তে— "	—১৲		(বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়)

পত্রধারা পর্য্যায়ে বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয় রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলি নতুন ক'রে প্রকাশ ক'রছে। এ পর্য্যন্ত তিন খণ্ড বেরিয়েছে। ভবিষ্যতে আরো নিশ্চয় বের'বে। রবীন্দ্রনাথের বিপুল পত্র-সাহিত্য এইভাবে নতুন ক'রে প্রকাশের ভার গ্রহণ করার জন্য বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কোন্ দূর অতীতে পত্র-সাহিত্যের সূচনা হ'য়েছিল বলা শক্ত। তবে তার প্রচুর প্রচলন সর্ব্বপ্রথম রুসোর হাতে হ'য়েছিল। অন্ততঃ সাহিত্যবিদ্ হ্যাভ্‌লক এলিস্-এর এই মত।

সাহিত্য-সৃষ্টিতে কতক পরিমাণে লেখককে লেখকের রচনার আড়ালে পড়তেই হয়। রসসৃষ্টির সংজ্ঞা তাঁকে সংযত করে, আবরণ ও আভরণ অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে পড়ে। সাহিত্যিকের অন্তরতম প্রদেশের সন্ধানও হয়ত মেলে কিন্তু তা' সোজা-সুজিভাবে মেলে না এবং যা মেলে তাও আবার লেখকের আবেগময় ও ভাবময় জীবনের অতিরঞ্জন-মিশ্র কোন বিশেষ মুহূর্ত্ত। কিন্তু পত্র-সাহিত্য ব্যক্তিবিশেষকে লেখা, তাই হাটের মাঝে নিজেকে উন্মোচন করার স্বাভাবিক সঙ্কোচ থেকে লেখক সেখানে মুক্ত। ফলে লেখকের অন্তর্লোকের ও ব্যক্তিত্বের এমন একটি নগ্ন ঘরোয়া সৌন্দর্য্য পত্র-সাহিত্যে ব্যক্ত হয় যা তাঁর লেখার অন্যত্র দুর্ল ভ। "পথে ও পথের প্রান্তে" নামক পত্রধারার তৃতীয় পর্য্যায়ের চিঠিগুলিতে যে ভূমিকা

সংযোজন করা হ'য়েছে, তাতে পত্র-সাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যা ব'লেছেন তার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা গেল।—

"সাধারণ সাহিত্যকে টানে বিরাট পাঠককেন্দ্র, চালায় দূরদেশে দূরকালের পথে ব্যক্তিগত জীবনের সীমানা ছাড়িয়ে। আর চিঠির সাহিত্যে ধরা দেয় লেখকের কাছঘেঁসা জগতের দৈনিক ছায়া প্রতিচ্ছায়া, ধ্বনি প্রতিধ্বনি, তার ক্ষণিক হাওয়ার মর্জি আর তার সঙ্গে মিলিয়ে থাকে সত্যপ্রত্যক্ষ সংসার পথের চলতি ঘটনা নিয়ে আলাপ প্রতিলাপ।"

ভারতীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে সমৃদ্ধ হ'য়ে য়ুরোপীয় রোমান্টিক যুগ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে শেষবারের মত তার বিচিত্র ও ব্যাপক বর্ণচ্ছটা বিস্তার করলো। 'ছিন্নপত্র' তারই সাক্ষ্যবাহ। 'ছিন্নপত্রে'র চিঠিগুলিতে প্রকৃতির প্রতি কবির যে গভীর অনুরাগ ও একাত্মবোধ প্রকাশ পেয়েছে তার উদাহরণ য়ুরোপীয় রোমান্টিক সাহিত্যে বিরল। শেলির কাছে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের সার্থকতা ছিল প্রিয়-জনের সঙ্গে মিলনের পটভূমিকা হিসাবে। প্রিয়জনের উপস্থিতিতে প্রকৃতি শেলির কাছে অর্থময় হ'য়ে উঠত। আর তার ব্যতিক্রম ঘট্‌লে তিনি ক্ষুব্ধ ও চঞ্চল হ'য়ে ভাবতেন এ সৌন্দর্য্য কাকে উৎসর্গ ক'রে তিনি সার্থক ক'রে তুলবেন —"Oh to whom ?" কীট্‌স তাঁর বেদনাদগ্ধ হৃদয়কে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে সিঞ্চিত ক'রে নিজের বেদনা মুছে নিতে চেষ্টা ক'রেছিলেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রকৃতি-প্রীতির প্রেরণার মূলে ছিল প্রকৃতির মধ্যে গভীর শান্তি ও পরম আধ্যাত্মিক শক্তি আস্বাদনের সম্ভাবনা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত এঁরা কেউ প্রকৃতির সঙ্গে "নিগূঢ় আত্মীয়তা" অনুভব করেন নি। বিশ্বের প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে মনোভাব তা হ'চ্ছে প্রধানতঃ "Home feeling in the universe"। তিনি এই বিশ্বসৃষ্টির "সাতমহলা ভবনে" তাঁর "চিরজনমের ভিটাতে" "হাজার বাঁধনে বাঁধা যে গিঠাঁতে গিঠাঁতে"।—এই হ'চ্ছে 'ছিন্নপত্রের' অন্তর্নিহিত সুর।

"জগতের সমস্ত অণুপরমাণু যদি আমাদের সগোত্র না হ'তো...তা হ'লে কখনোই এই বাহ্যজগতের সংস্পর্শে আমাদের অন্তরের মধ্যে আনন্দ সঞ্চার হ'তো না। যাকে আমরা জড় বলি তার সঙ্গে আমাদের যথার্থ জাতিভেদ নেই ব'লেই

আমরা উভয়ে এক জগতে স্থান পেয়েছি, নইলে আপনিই দুই স্বতন্ত্র জগৎ তৈরী হ'য়ে উঠত"। "এক সময় যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হ'য়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্য্যকিরণে আমার সুদূর বিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হ'তে থাকত—আমি কত দূর দূরান্তর কত দেশ দেশান্তরের জলস্থলপর্ব্বত ব্যাপ্ত ক'রে উজ্জ্বল আকাশের নিচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম, তখন শরৎসূর্য্যালোকে আমার বৃহৎ সর্ব্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্দ্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ডভাবে সঞ্চারিত হ'তে থাকত তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে।"—ক্রমবিবর্ত্তনধারায় প্রকৃতির সব কিছুর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হ'য়ে কবি তাঁর বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হ'য়েছেন এই তাঁর বিশ্বাস। তাই যাদের মধ্যে এককালে তিনি ছিলেন তাদের সঙ্গে যদিও রক্তের যোগসূত্র এখনো অবিচ্ছিন্ন তবু তাদের কাছ থেকে বর্ত্তমান দূরত্বের বিচ্ছেদ বেদনা কবির হৃদয় মন মথিত ক'রে তোলে।

অকৃত্রিম অনায়াস সহজ প্রকাশ "ছিন্নপত্রের" চিঠিগুলির বৈশিষ্ট্য। হাল্কা মেঘের মত এগুলি ভারশূন্য, বিস্ময়সূচক শুচিতাবোধে পূর্ণ। দিনের পর দিন কবির সম্মুখে একই প্রকৃতি—সেই চর, সেই নদী, সেই মাঠ, সেই পল্লী—কিন্তু কবির স্পন্দনসক্ষম প্রকৃতিতে তার কত নব নব অভিব্যক্তি। সামান্যতম দৃশ্যটুকু পর্য্যন্ত বিস্ময়জাগরূক চিত্তে কবি লক্ষ্য ক'রে চিঠিতে তা' ব্যক্ত ক'রছেন—"স্থির জলের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে মশা উড়ছে"; "শুয়োরগুলো বাচ্ছাকাচ্ছা সমেত সকলের গায়ে গায়ে লাগাও হ'য়ে একটা গর্ত্তের মত ক'রে তার মধ্যে মস্ত একতাল কাদার মত প'ড়ে আছে।" যেমন দৃশ্য তেমনি সামান্যতম শব্দ ও কম্পন কবির হৃদয়ে স্পন্দন তুলছে। সমস্তক্ষণ কবি তাঁর "সর্ব্বাঙ্গে এবং সমস্ত মনের উপর নিস্তব্ধ নতনেত্র প্রকৃতির কী একটা বৃহৎ উদার বাক্যহীন স্পর্শ অনুভব" ক'রছেন।

পত্রধারার দ্বিতীয় পর্য্যায়ের "ভানুসিংহের পত্রাবলী" রসিকতা ও ছোটখাটো ঘটনার সরস বর্ণনায় চিত্তাকর্ষক।

"ছিন্নপত্রের" চিঠিগুলিতে বিশ্বপ্রকৃতির রূপ বর্ণনা যেমন কবির প্রধান উদ্দেশ্য

তেমনি "পথে ও পথের প্রান্তের" চিঠিগুলিতে তাঁর আপন প্রকৃতির স্বরূপ নির্ণয়ের প্রচেষ্টা অত্যন্ত পরিস্ফুট। রবীন্দ্রনাথের হৃদয়-তন্ত্রী অতি বেশী সূক্ষ্ম ও স্পন্দনসক্ষম। নানা রাগিণী তাতে ধ্বনিত হ'য়ে ওঠে। এ ছাড়া তাঁর প্রকৃতির মধ্যে আছে অনধিগত নানা কিছুকে অধিকৃত ক'রবার অদম্য বাসনা। এই বহু বিচিত্র বাসনা ও ধ্বনির টানে প্রকৃতি বিক্ষিপ্ত হ'য়ে পড়ে। কিন্তু সেই বিক্ষিপ্তকে সংক্ষিপ্ত করা কবির অভিপ্রেত নয়, তার সমন্বয় সাধন করা তাঁর সাধনা। তিনি "Damn braces, bless relaxes" নীতির উপাসক নন। ও-দুয়ের মধ্য থেকে তিনি পরিপূর্ণ সুরটি উদ্ধার ক'রে জীবনকে সার্থক ক'রে তুলতে চান। "পথে ও পথের প্রান্তের" অধিকাংশ চিঠিতে এই সার্থকতা সন্ধানের কথা উল্লেখ করা হ'য়েছে। তারই একটা অংশ সমালোচনা-শেষে উদ্ধৃত করা হ'লো।

"নানা অনুভূতিকে নিয়ে যাদের ব্যবহার, জীবনের পথে সোজা রথ হাঁকিয়ে চলা তাদের পক্ষে একটুও সহজ নয়—এ যেন একাগাড়িতে দশটা বাহন জুড়ে চালানো। তার সবগুলোই যদি ঘোড়া হ'তো তা' হ'লেও একরকম ক'রে সারথ্য করা যেতে পারত। মুশকিল এই, এর কোনটা উট, কোনটা হাতি, কোনটা ঘোড়া, আবার কোনটা ধোপার বাড়ীর গাধা, ময়লা কাপড়ের বাহক। এদের সকলকে একরাশে বাগিয়ে এক চালে চালাতে পারে এমন মল্ল ক'জন আছে। কিন্তু আমি যদি নিছক কবি হতুম তা হ'লে এজন্যে মনে ভাবনাও থাকত না, এমন কি যখন ঘাড়ভাঙা গর্ত্তের অভিমুখে বাহনগুলো চার পা তুলে ছুটত তখনও অট্টহাস্য ক'রতে পারতুম,—এমন-সকল মরীয়া কবি সংসারে মাঝে মাঝে দেখা যায়। * * * কিন্তু এটুকু প্রতিদিনই বুঝতে পারি কবি-ধর্ম্ম আমার একমাত্র ধর্ম্ম নয়—রসবোধ এবং সেই রসকে রসাত্মক বাক্যে প্রকাশ ক'রেই আমার খালাস নয়। অস্তিত্বের নানা বিভাগেই আমার জবাবদিহি—সব হিসাবকে একটা চরম অঙ্কে মেলাব কী ক'রে।"

পূর্ণেন্দু গুহ

Peace with the Dictators—by Sir Norman Angell.
(Hamish Hamilton)—7/6

এখনও জগৎ গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের শোচনীয়তা বিস্মৃত হয় নি, কিন্তু এরই মধ্যে যে আবার একটি প্রলয়ের সূচনা হচ্ছে তা এই বিগত কয়েক বছরের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলেই বেশ বোঝা যায়। জার্ম্মানী, ইটালী, জাপান প্রভৃতি দেশে জাতীয়তা এক অভিনব আকার ধারণ করেছে ও অকস্মাৎ ধূমকেতুর মত উদয় হয়ে এক ধ্বংসের বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে। এই নতুন জাতীয়তা ঝঞ্ঝার মত এসে মানুষের আশা, আকাঙ্ক্ষা, অধিকার সব ধূলোর মত উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে—ভেঙ্গে দিচ্ছে মানুষের সভ্যতার গর্ব্ব, ব্যক্তিত্বের অধিকার, ধর্ম্মের পবিত্রতা। ভ্রান্ত স্বার্থের অন্বেষণে ইউরোপীয় নেতারা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধাচরণ করছে; ইউরোপীয় জাতিগুলি উন্মত্ত জনতার মত কেবল দ্বন্দ্ব কোলাহল করছে, ভেবে দেখছে না কিসের জন্য এই উত্তেজনা, কোন্ উদ্দেশ্যে তারা পরস্পরের প্রতি খড়্গহস্ত। এই হৈ-চৈ-এর মধ্যে যে কয়েকজন মনীষী প্রকৃতিস্থ হয়ে সমস্যা ও সমাধানের কথা চিন্তা করছেন তার মধ্যে স্যার নরম্যান এঞ্জেল অন্যতম।

ইতিপূর্ব্বে "The Unseen Assasins", "Preface to Peace" প্রভৃতি কয়েকটি বই-তে আমরা স্যার নরম্যানের গভীর রাজনীতিজ্ঞান ও সত্যদর্শনের পরিচয় পেয়েছি। "Peace with the Dictators"-এও তিনি শান্তি সমস্যার মূল প্রশ্নগুলি তুলেছেন ও সেগুলির প্রকৃত সমাধানের পন্থা প্রদর্শন করেছেন সুচিন্তিত যুক্তির সংযোগে। বইখানি কথোপকথনের আকারে হওয়াতে কয়েক জায়গায় পুনরুল্লেখ আছে, কিন্তু অন্য দিকে সেই কারণে মূল বক্তব্যগুলি খুব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ভের্সাই সন্ধিতে জার্ম্মানীর প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছে সে কথা আজ কেউই অস্বীকার করতে পারবে না। জার্ম্মানী যে আজ সেই অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হয়েছে তা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সেই গর্হিত কাজের জন্য যারা দায়ী আজ পৃথিবীর অশান্তির জন্য প্রকৃত পক্ষে তারাই

দায়ী। বিজিত জার্ম্মানীর ওপরেই যুদ্ধের সব অপরাধ চাপান হয়েছিল ও তার শাস্তি স্বরূপ তাকে নিরস্ত্র করা হয়েছিল, কেড়ে নেওয়া হয়েছিল তার সাম্রাজ্য ও ক্ষতিপূরণের জন্য ঋণভার চাপান হয়েছিল অসম্ভব রকমের। এই অপরিসীম দেনার ফলে জার্ম্মান মার্কের মূল্য এত হ্রাস হয়ে গিয়েছিল যে বৈদেশিক বাণিজ্যের দ্বারাও সে ঋণ পরিশোধের উপায় ছিল না। অসহায় জার্ম্মানী নীরবে মাথা পেতে নিয়েছিল এই সব অবিচার, কিন্তু তার ফলে যে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠেছিল তার বুকে সেই আগুনেই ইউরোপ আজ ছারখার হতে চলেছে।

জার্ম্মানী আজ ফিরে চাইছে তার কেড়ে নেওয়া উপনিবেশগুলি। সাম্রাজ্যের গর্ব্ব করতে না পারলে এখন উন্নত সভ্যজাতি হওয়া যায় না। সাম্রাজ্য চাওয়ায় যদি অপরাধ হয় সে অপরাধে ইংরাজ, ফরাসী, ডাচ সবাই অপরাধী। ইংরাজ বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্য অধিকার করে আজ জার্ম্মানদের উপদেশ দিচ্ছে সাম্রাজ্যের দাবী না করে বর্ত্তমান ব্যবস্থা নিয়েই খুসী হয়ে থাকতে। জার্ম্মানীকে দোষ দেওয়া হচ্ছে বর্ত্তমান ভাগাভাগিতে সন্তুষ্ট না হ'য়ে League of Nations পরিত্যাগ করবার জন্য। রাণী এলিজাবেথের সময়ে ইংলণ্ডের যা রাজত্ব ছিল আজ যদি তাকে সেই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে বলা হয় তাতে যেমন ইংলণ্ডের অপমান বোধ হবে, জার্ম্মানীরও আজ এই প্রস্তাবে সেই রকম অপমান বোধ হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

তবে জার্ম্মানী, ইটালী প্রভৃতি Have-not দেশগুলির দোষ এই যে তারা চাইছে গায়ের জোরে তাদের দাবী পূরণ করতে। আন্তর্জাতিক নীতি তারা মানে না। তাদের দাবী ন্যায় বা অন্যায় সে বিচারের ভার তারা নিজেদের ওপরেই রাখতে চায়। হিটলার, মুসোলিনী প্রভৃতি Dictatorরা দেশের লোকদের যন্ত্রের মত নির্ব্বিচারে আদেশ পালন করতে বাধ্য করছে ও দেশবাসীরাও মন্ত্রমুগ্ধের মত তাদের আদেশ পালন করছে। ফাশিষ্ট ডিক্টেটাররা কমিউনিজ্‌মকে সাপের মত ঘৃণা করে ও পূর্ব্ব ইউরোপের ছোট ছোট দুর্ব্বল দেশগুলি সাপের গর্ত্ত হতে পারে মনে করে সেগুলিকে কবলিত করতে চায়। জার্ম্মানী অষ্ট্রিয়াকে টুঁটি টিপে বশ করে নিল বিনা যুদ্ধে। চেকোস্লোভাকিয়ারও সেই

দখল করবার জন্য কত রকমের চাতুরী চলছে। তরবারির আঘাতে জার্ম্মানী প্রচার করতে চায় জার্ম্মানদের শ্রেষ্ঠতা; যে সব দেশে জার্ম্মানরা গৌণ সম্প্রদায় হয়ে আছে সেই সব দেশের আভ্যন্তরীণ শাসন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করতে চায় ও সেই দেশগুলিকে একত্র করে জার্ম্মানীর একছত্র আধিপত্য বিস্তার করতে কৃতসংকল্প। এই কারণে গণতন্ত্র-শাসিত ও ডিক্টেটার-শাসিত দেশের মধ্যে বিরোধ চলছে।

ডিক্টেটারদের সঙ্গে শান্তি স্থাপনের পথ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে কি সখ্যতার মধ্য দিয়ে ইংল্যাণ্ডকে আজ সেই সমস্যার সমাধান করতে হবে। ইংল্যাণ্ডের কাছে দু'টি পথ খোলা আছে—হয় ফ্রান্স, রাশিয়া ও Little Entente-এর দেশগুলির পক্ষ অবলম্বন করে ঘোষণা করা যে জার্ম্মানী যদি যুদ্ধের মধ্য দিয়ে তার দাবী পূরণ করতে চায় ত ইংল্যাণ্ড জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত আছে; অথবা ডিক্টেটারদের কাছে সম্পূর্ণ মাথা হেঁট করে স্বীকার করা সে তারা যা চায় তা যদি ইংল্যাণ্ডের স্বার্থবিরুদ্ধ না হয় তাহ'লে ইংল্যাণ্ড তা দিতে প্রস্তুত আছে। ১৯১৪ সালেও যদি ইংল্যাণ্ড আগে থেকে কর্ত্তব্য স্থির করত জার্ম্মানী তাহলে হয়ত ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া, জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের বিরুদ্ধে হাত তুলতে সাহস করত না। "Once more it is necessary to insist that the Great War might have been prevented if Germany had foreseen that she would have to meet the forces which she did meet. The vast power finally arrayed against her was impotent to deter her for the childishly simple reason that she did not know it would be used against her.।" ইংল্যাণ্ড বরাবরই ভাবে যে যদি তার নিজের স্বার্থের কোন হানি না হয় তা হলে শুধু শুধু ইউরোপের আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ বিগ্রহে হস্তক্ষেপ করে নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যুক্তিযুক্ত নয়। কিন্তু এ যুক্তি যে কত অসার তা একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়। ফ্রান্স যদি জার্ম্মানীর কাছে পরাজিত হয় তাহলে ইংল্যাণ্ডের অবস্থাও যে খুব নিরাপদ হবে তা নয়। গত যুদ্ধের সময় রব উঠেছিল যে রাইন নদীই ইংল্যাণ্ডের সীমান্ত বলে গণ্য করা উচিত, কিন্তু আজ ইংল্যাণ্ড সে কথা ভুলে যেতে বসেছে।

Collective Security বা সমবেত সংরক্ষণের কথা মুখে যতই বলুক না

কেন কাজে ইংল্যাণ্ড বরাবরই মিত্রতা অগ্রাহ্য করে আপনাকে বাঁচিয়ে এসেছে। এই ত সকলের চোখের সামনে দিয়ে ইটালী কি সহজে আবিসিনিয়া দখল করে নিল। বাধা দেওয়া দূরে থাকুক ইংল্যাণ্ড 'কৃতকর্ম্ম' বলে ইটালীর রাজত্ব স্বীকার করে নিয়েছে। জাপান যখন প্রথম চীন আক্রমণ করে তখন আমেরিকা রাজী ছিল ইংল্যাণ্ডের সাথে মিলিত হয়ে জাপানকে বাধা দিতে, কিন্তু ইংল্যাণ্ড তাতে কিছুতেই সম্মত হয়নি। ইংরাজ প্রতিনিধিকে গুলি করল জাপানীরা; অম্লান বদনে অপমান করল ইংরাজ সেনাপতিদের; জাহাজ ডুবিয়ে দিল নিঃসঙ্কোচে। ইংল্যাণ্ড প্রতিবারেই আপত্তি জানাতে ভোলেনি, কিন্তু তার বেশী কিছু করতে সাহস পায়নি।

বাস্তবিক পক্ষে আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হলে League of Nations-এর বিধি পরিত্যাগ করলে চলবে না। যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে আন্তর্জাতিক বিবাদের প্রকৃত মীমাংসা হয় না এ কথা যদি মানুষ আজও শিখে না থাকে তা হ'লে বলতে হবে মানবজাতি এখনও বর্ব্বরতায় নিমগ্ন। যদি শান্তির চিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠা করতে হয় তা'হলে আন্তর্জাতিক বিবাদে তৃতীয় পক্ষের বিচার মেনে নিতে শিখতে হবে। "In grievances or disputes we must be prepared either to accept third party judgment or peaceful settlement or await the operation of peaceful change।" জার্ম্মানীকে এইটাই বুঝিয়ে দিতে হবে যে তার যা দাবী আছে তার বিচার করবার ভার নিজের ওপর নিলে চলবে না—তার বিচার করবে তৃতীয় পক্ষ। আর এই তৃতীয় পক্ষের বিচার প্রথাকে কার্য্যকরী করতে হলে সমবেত সংরক্ষণের নীতিকে কার্য্যে পরিণত করা প্রয়োজন। একজনের বিপদকে আর একজনের বিপদ বলে গ্রহণ করতে না পারলে কোন দিনই যুদ্ধের অবসান হবে না। যতদিন যুদ্ধ করে আত্মলাভের সম্ভাবনা থাকবে ততদিন মানুষ যুদ্ধ থেকে বিরত হবে না।

আত্মরক্ষার উপায় কেবলমাত্র অস্ত্রশস্ত্রের সংখ্যা বাড়ান নয়। কারণ যুদ্ধের সময়ে দলাদলি, মিত্রতা, শত্রুতা অনিবার্য্য। অতএব আততায়ীর বিপক্ষের শক্তি যাতে এত বেশী হয় যে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আততায়ীর সাহস না হয়—এই

পন্থা অবলম্বন করে ইংল্যাণ্ডের উচিত মৈত্রী স্থাপনের চেষ্টা করা। ইংল্যাণ্ড ইউরোপের প্রায় সংলগ্ন হয়ে যদি কেবল আপনাকে বাঁচাতে চায় তাহলে আমেরিকা কোন্ স্বার্থে সে যুদ্ধে যোগ দেবে? তা'ছাড়া ইংল্যাণ্ডের ওপর যদি ছোট ছোট দেশগুলির ভরসা না থাকে তা'হলে খুব সম্ভব তারা আত্মরক্ষার জন্য বিপক্ষদলে যোগ দেবে।

বৈদেশিক ব্যাপারে ইংরাজদের মধ্যে বড় মতভেদ বিদ্যমান। "One half of your country would refuse to fight for the League, the other half for the Empire—" এ কথা এ বই-র জার্ম্মান বক্তা জোর করে বলেছে। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের কর্ত্তব্য স্থির করার ওপর নির্ভর করছে গণতন্ত্র-শাসনের ভাগ্য। আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনের সময় ইংরাজ জনসাধারণকে এ বিষয়ে মতস্থির করতে হবে এবং মতস্থির করার আগে তাদের ভেবে দেখতে হবে প্রকৃত শান্তির পথ কোন্‌দিকে। স্যার নরম্যান এঞ্জেল এই বইটিতে সেই পথই দেখিয়েছেন।

সৌরেন্দ্রনাথ বসু

শ্রীগোবর্দ্ধন মণ্ডল কর্ত্তৃক আলেকজান্ড্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও শ্রীকুঞ্জভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক ১১, কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত।

৮ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা
কার্ত্তিক, ১৩৪৫

পরিচয়

দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র

[৪]

বেন্থামের হিতবাদ

যাহাকে 'Utilitarianism' বা 'হিতবাদ' বলা হয়, পাশ্চাত্যে তাহার প্রবর্ত্তক জেরিমি বেন্থাম। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—'বেন্থাম হিতবাদ-দর্শনের সৃষ্টি করিয়া ইউরোপে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।'

'The name 'Utilitarianism' is especially applied to the School founded by Jeremy Bentham'.

সে জন্য এ মতবাদকে কেহ কেহ 'Benthamism' বলেন।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে বেন্থামের বিখ্যাত গ্রন্থ 'Principles of Morals and Legislation' এবং ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার 'Introduction to the Principles of Morals and Legislation' প্রকাশিত হয়। উভয় গ্রন্থের অন্তরালে (১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে) ডাঃ পেলি (Dr Paley, D. D.) তাঁহার 'Principles of Moral and Political Philosopy' প্রকাশ করেন। পেলির মতেরও দার্শনিক ভিত্তি ঐ হিতবাদ—

His system of Moral Philosophy is founded purely on Utilitarianism. —Modern Cyclopedia.

বেন্থামের প্রধান শিষ্য জন ষ্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill)। তাঁহার বাহনে 'হিতবাদ' সবিশেষ প্রসার ও প্রতিপত্তি লাভ করে।* এ সম্পর্কে 'Outline'-এর গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—

* ১৮৬২ অব্দে মিলের প্রখ্যাত গ্রন্থ 'Utilitarianism' প্রকাশিত হয়।

Benthamism was indeed and remained for the rest of the (nineteenth) century, the most powerful influence on English political thought and action.†

Utilitarianism বা হিতবাদের সার কথা কি? হিতবাদী বলেন সুখই জীবের কাম্য—'Pleasure is the ultimate end of every rational being'। হিতবাদের কথা এই যে, তাহাই বিধেয়, যদ্দ্বারা বহুজনের বহুল হিত (greatest good of the greatest number) সাধিত হয়; এবং তাহাই হেয়, যদ্দ্বারা বহুজনের বহুল অহিত সংঘটিত হয়। এখানে হিত (good)-অর্থে সুখ (Pleasure বা Happiness)—কল্যাণ বা Well-being নয়।

'Utilitarianism postulates as the end of Ethics and Politics the greatest happiness of the greatest number * * and maintains that increase of happiness ought to be the sole object of the moralist and legislator—pleasure and pain being the sole test of actions'। সেই জন্য অধ্যাপক সিজবিক্ (Henry Sidgwick) হিতবাদকে Universalistic Hedonism (সমষ্টি-গত সুখবাদ) বলিয়াছেন।*

এক কথায়, হিতবাদীর মতে সুখ-দুঃখই ধর্মাধর্মের একমাত্র কষ্টিপাথর। The first principle of Utilitarianism is "that actions are right and wrong in proportion as they tend to promote happiness. * * By happiness is intended pleasure, and the absence of pain; by unhappiness, pain, and the privation of pleasure."—Mill's Utilitarianism, p 9, etc

ব্যাবহারিক জগতে এই মূল সূত্রের কিরূপে প্রয়োগ করিতে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন।

যদি ভূতমাত্রের হিতসাধন ধর্ম হয়, তবে একজনের হিতসাধন ধর্ম, আবার একজনের

† An Outline of Modern Knowledge (Gollancz), p 716.

* Henry Sedgwick's The Methods of Ethics, 3rd Edition p 407.

হিতসাধন অপেক্ষা দশজনের তুল্য হিতসাধন অবশ্য দশগুণ ধর্ম। যদি এক দিকে একজনের হিতসাধন ও আর এক দিকে দশজনের তুল্য হিতসাধন পরস্পর বিরুদ্ধ কর্ম হয়, তবে একজনের হিত পরিত্যাগ করিয়া দশজনের তুল্য হিতসাধনই ধর্ম, এবং দশজনের হিত পরিত্যাগ করিয়া একজনের তুল্য হিতসাধন করা অধর্ম। এখানে "Good of the *greatest number*"।

পক্ষান্তরে যেখানে একজনের অল্প হিত, আর একদিকে আর একজনের বেশী হিত পরস্পর বিরোধী, সেখানে অল্প হিত পরিত্যাগ করিয়া বেশী হিত সাধন করাই ধর্ম, তদ্বিপরীতই অধর্ম। এখানে কথাটা "greatest *good*"।—ধর্মতত্ত্ব, একবিংশ অধ্যায়।

'হিতবাদ' এ দেশের পক্ষে নূতন কথা নহে—আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে আমরা বুদ্ধদেবের মুখে শুনিয়াছিলাম—'বহুজন-হিতায় বহুজন-সুখায়।' তৎপূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—যাহাতে লোকের হিত, তাহাই ধর্ম, যাহাতে লোকের হিত, তাহাই সত্য। যাহা তদ্-বিরুদ্ধ, তাহা অসত্য, তাহা অধর্ম।* গীতাতেও পুনঃ পুনঃ শুনিতে পাই—'সর্বভূত-হিতে রতাঃ।'

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥—১২।৪
লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণম্ ঋষয়ঃক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥—৫।২৫

সে যাহা হ'ক—আমাদের লক্ষ্যের বিষয়, যখন বাংলার সাহিত্যাকাশে বঙ্কিমচন্দ্রের উদয় হইল, তখন এ দেশে পাশ্চাত্য হিতবাদের পূর্ণ প্রভাব।

* বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র, ষষ্ঠ খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ। এ প্রসঙ্গে 'যদ্দ্বারা প্রাণিগণের রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম' এই কৃষ্ণ-বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন:—

"এই হইল কৃষ্ণকৃত ধর্মের লক্ষণ নির্দেশ। কথাটায় এখনকার Herbert Spencer, Bentham, Mill-ইতি সম্প্রদায়ের শিষ্যগণ কোন প্রকার অমত করিবেন না জানি। কিন্তু অনেকে বলিবেন, এ যে ঘোরতর হিতবাদ, বড় Utilitarian রকমের ধর্ম। বড় Utilitarian রকম বটে, কিন্তু আমি প্রকারান্তরে বুঝাইয়াছি যে, ধর্মতত্ত্ব 'হিতবাদ' হইতে বিযুক্ত করা যায় না;—জগদীশ্বরের সার্বভৌমিকত্ব এবং সর্বময়তা হইতেই ইহাকে অনুমিত করিতে হয়। সঙ্কীর্ণ খৃষ্টধর্মের সঙ্গে হিতবাদের বিরোধ হইতে পারে, কিন্তু যে হিন্দুধর্ম বলে যে, ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন, 'হিতবাদ' সে ধর্মের প্রকৃত অংশ। এই কৃষ্ণবাক্য যথার্থ ধর্ম লক্ষণ।" ইহার পাদটীকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—'বেন্থামের' কথা ইংলণ্ড শুনিল—কৃষ্ণের কথা ভারতবর্ষ শুনিবে না?'

দেখা যায় বঙ্কিমচন্দ্রও তদ্দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তিনি 'বঙ্গদর্শনে' 'ভালবাসার অত্যাচার' প্রবন্ধে লিখিতেছেন—

যেখানে সত্যলঙ্ঘনাপেক্ষা সত্যরক্ষায় অধিক অনিষ্ট, যেখানে সত্য রাখিবে, না সত্য ভঙ্গ করিবে? * * আমরা এ তত্ত্বের মীমাংসা এ স্থলে করিব না—কেন না, হিতবাদীরা ইহার এক প্রকার মীমাংসা করিয়াছেন। স্থূল কথার উত্তর দিব। * * কিন্তু যখন এমন ঘটে যে, সত্যপালনে পরের গুরুতর অনিষ্ট, সত্যভঙ্গে ততদূর নহে, তখন সত্য পালনীয় নহে। দশরথের সত্যপালনে রামের গুরুতর অনিষ্ট, সত্যভঙ্গে কৈকেয়ীর তাদৃশ কোন অনিষ্ট নাই। দৃষ্টান্তজনিত জনসমাজে যে অনিষ্ট, তাহা রামের স্বাধিকারচ্যুতিতেই গুরুতর। উহা দস্যুতার রূপান্তর। অতএব এমত স্থলে দশরথ সত্য পালন করিয়াই মহাপাপ করিয়াছিলেন।

এই হিতবাদের প্রভাব বঙ্কিমচন্দ্রের উপর শেষ জীবন পর্য্যন্ত ছিল।

আরও দেখা যায়, যুবাকালে বঙ্কিমচন্দ্র হিতবাদী জন ষ্টুয়ার্ট মিলের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। মিলের মৃত্যু-সন ১৮৭৩। পর বৎসর তাঁহার Three Essays (Nature, the Utility of Religion and Theism) মুদ্রিত হয়। ইহার অল্পকাল পরেই বঙ্কিমচন্দ্র ১২৮২ বৈশাখের 'বঙ্গদর্শনে' তাঁহার বিখ্যাত প্রবন্ধ 'মিল, ডার্বিন ও হিন্দুধর্ম' প্রকাশিত করেন। এমন কি, ১২৮৪ বৈশাখের 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 'প্রকৃত মনুষ্যত্ব কি?' প্রবন্ধ (যাহা পরবর্তী কালে সম্প্রসারিত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্মতত্ত্ব' রচনা করেন)—ঐ প্রবন্ধও মিলের 'Autobiography'-অবলম্বনে লিখিত হইয়াছিল।

শেষ জীবনে কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র মিলের সম্পূর্ণ মোহমুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার শেষ উপন্যাস সীতারামের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিতেছেন—

হায়! কুমারসম্ভব ছাড়িয়া স্মুইনবার্ণ পড়ি, গীতা ছাড়িয়া মিল্ পড়ি, আর উড়িষ্যার প্রস্তরশিল্প ছাড়িয়া সাহেবদের চীনের পুতুল হাঁ করিয়া দেখি। আরও কি কপালে আছে, বলিতে পারি না!

ঐ প্রসঙ্গে উড়িষ্যার প্রস্তরশিল্পে বিমুগ্ধ হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা অমর অক্ষরে খোদিত রাখা উচিত—

পাথর এমন করিয়া যে পালিশ করিয়াছিল, সে কি এই আমাদের মত হিন্দু? এমন করিয়া বিনা বন্ধনে যে গাঁথিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু? আর এই প্রস্তরমূর্ত্তি সকল

যে খোদিয়াছিল, তারা কি হিন্দু? এখন হিন্দুকে মনে পড়িল। তখন মনে পড়িল, উপনিষৎ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিক; এসকলই হিন্দুর কীর্ত্তি—এ পুতুল কোন ছার! তখন মনে করিলাম, হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।

পাঠক জানেন, হিতবাদের উপর কার্‌লাইলের বেশ কোপদৃষ্টি ছিল—তিনি উহার উপর অনেক বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রও কমলাকান্তের মুখ দিয়া ইউটিলিটিকে 'উদর-দর্শন' বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন—

কমলাকান্তের উদর-দর্শনের দ্বিতীয় সূত্র এই :—

উদরের ত্রিবিধ পূর্ত্তিই পরম পুরুষার্থ।

ষষ্ঠ সূত্র :—উদরপূর্ত্তি বা পুরুষার্থ কেবল হিতসাধনের দ্বারা সাধ্য।

ভাষ্য। উদাহরণ। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা লোকের কাণে মন্ত্র দিয়া তাহাদের হিতসাধন করিয়া থাকেন। ইউরোপীয় জাতিগণ অনেক বন্য জাতির হিতসাধন করিয়াছেন, এবং রুসেরা এক্ষণে মধ্য আসিয়ার হিতসাধনে নিযুক্ত আছেন। বিচারকগণ বিচার করিয়া দেশের হিতসাধন করিতেছেন। অনেকে সুবিক্রেয় এবং অবিক্রেয় পুস্তক ও পত্রাদি প্রণয়ন দ্বারা দেশের হিতসাধন করিতেছেন। এসকলে প্রচুর পরিমাণে উদরপূর্ত্তি অর্থাৎ পুরুষার্থ লাভ হইতেছে।

সপ্তম সূত্র :—অতএব সকলে দেশের হিতসাধন কর।

ভাষ্য। এই শেষ সূত্রের দ্বারা হিতবাদ-দর্শন এবং উদর-দর্শনের একতা প্রতিপাদিত হইল।

ইহা ব্যঙ্গ মাত্র। 'ধর্মতত্ত্বে' বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—'হিতবাদ-মতটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার বস্তু নহে। হিতবাদ ধর্ম—অধর্ম নহে'।

বস্তুতঃ হিতবাদের যাহা দোষগুণ থাকুক—হিতবাদী স্বার্থপর নহেন, পরার্থপর। হিতবাদ ব্যষ্টির সুখ অন্বেষণ করে না—সমষ্টির করে। অতএব হিতবাদ 'Egoistic Hedonism' নহে, 'Universalistic Hedonism.'

The good man with take care that the pleasure realised is not his alone but includes that of others.—Bentham.

The standard is not the agent's own happiness, but the greatest amount of happiness *altogether*—Mill's Utilitarianism, p 16

হিতবাদের আদ্যাচার্য্য জেরিমি বেন্থাম সুখের জাতিভেদ স্বীকার করিতেন না—তাঁহার দৃষ্টিতে সর্বজাতীয় সুখ তুল্য মূল্য—তা' সে রোষ্ট-বিফ-আস্বাদন-জনিত সুখই হ'ক আর হ্যামলেটের অভিনয়দর্শন-জনিত সুখই হ'ক।

One pleasure is just as good as another—বেন্থাম বলেন আমোদ যখন সমান, তখন কাব্যের ও পুস্-পিন খেলার একই দর।

'*Quantity* is the only standard of measuring difference among pleasures and there is no *qualitative* difference among them.'

এই মত লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র 'বিবিধ প্রবন্ধে' একটু মৃদু উপহাস করিয়াছেন।

কাব্যেও চিত্তরঞ্জন হয়, শতরঞ্চ খেলায়ও চিত্তরঞ্জন হয়। বরং অনেকেরই 'আইভেনো' অপেক্ষা এক বাজি শতরঞ্চ খেলায় অধিক আমোদ হয়। তবে তাঁহাদের পক্ষে কাব্য হইতে শতরঞ্চ উৎকৃষ্ট বস্তু? এবং স্কট কালিদাসাদি অপেক্ষা একজন পাকা খেলোয়াড়্ বড় লোক?

কার্য্যক্ষেত্রে হিতবাদী ঐ বিধির কিরূপ প্রয়োগ করেন, অধ্যাপক সিজবিক্ তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন—

By 'Greatest Happiness' is meant the greatest possible surplus of pleasure over pain, the pain being conceived as balanced against an equal amount of pleasure, so that the two contrasted amounts annihilate each other for purposes of ethical calculation.

ব্যবহারে ঐরূপ নিক্তির তৌল সম্ভব কিনা বিচার্য্য। যদিই বা সম্ভব হয়—তথাপি কবির কাব্যকলায় যে আনন্দ, ধ্যানীর 'ঋতম্ভরা' প্রজ্ঞায় যে আনন্দ, স্বদেশ-প্রেমিকের প্রাণ-বলিদানে যে আনন্দ, বুদ্ধদেবের 'মহানিষ্ক্রমণে' যে আনন্দ, ক্রাইষ্টের বিশ্বহিত-ব্রতে আত্মাহুতিতে যে আনন্দ—সে আনন্দের সহিত জরাজীর্ণ কামুকের কামসেবার আনন্দ বা ব্যাধিদীর্ণ পেটুকের জিহ্বাতৃপ্তির আনন্দকে তুল্য মূল্য জ্ঞান করা বাতুলতা নহে কি?

সেই জন্য বেন্থামের প্রধান শিষ্য মিল সুখের শ্রেণীবিভাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মিল বলেন সুখে সুখে 'তর তম' আছে বৈকি—সকল সুখ সমজাতীয় নয়—সুখের মধ্যে উচ্চ নীচ ভেদ বিস্পষ্ট।

'Mill maintains that in addition to the *quantitative* differences of pleasure, there are *qualitative* differences among them. In the sphere of morals, we have to regard *quality* as higher than, or superior to, *quantity*. When we find one pleasure is greater in *quantity* (পরিমাণে

বৃহত্তর) but worse in *quality* (প্রকৃতিতে ইতর) than another, we should prefer the latter to the former'.

সুখের উচ্চনীচ নির্দ্ধারণ পক্ষে মিল 'advises every person to refer to his *superior nature* or *sense of dignity* as man'। তাঁহার নিজের কথা এই :—

It is better to be a Socrates dissatisfied than a fool satisfied—better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied.*

এ কথায় বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ণ অনুমোদন আছে। তিনি ধর্মতত্ত্বে লিখিয়াছেন—

ভক্তি ও জাগতিক প্রীতির সুখ উচ্চতর ও তীব্রতর, কিন্তু তাহা অনুশীলন ভিন্ন পাওয়া যায় না, সে অনুশীলনও কঠিন ও জ্ঞান-সাপেক্ষ।

অধিকন্তু তিনি বলেন, সুখ ত্রিবিধ—স্থায়ী, ক্ষণিক কিন্তু পরিণামে দুঃখশূন্য, এবং ক্ষণিক কিন্তু পরিণামে দুঃখের কারণ।

"শেষোক্ত সুখকে সুখ বলা অবিধেয়,—উহা দুঃখের প্রথমাবস্থা মাত্র। সুখ তবে, হয় যাহা স্থায়ী—নয়, যাহা অস্থায়ী অথচ পরিণামে দুঃখশূন্য। আমি যখন বলিয়াছি যে, সুখের উপায় ধর্ম, তখন এই অর্থেই সুখ-শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। এই ব্যবহারই এই শব্দের যথার্থ ব্যবহার; কেন না, যাহা বস্তুতঃ দুঃখের প্রথমাবস্থা, তাহাকে ভ্রান্ত বা পশুবৃত্তিদিগের মতাবলম্বী হইয়া সুখের মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে না। * * দুঃখ-পরিণাম সুখও দুঃখের প্রথমাবস্থা, নিশ্চয়ই তাহা সুখ নহে। * * অনুশীলনের উদ্দেশ্য সুখ; যেরূপ অনুশীলনে সুখ জন্মে, দুঃখ নাই, তাহাই বিহিত। অতএব সুখই সেই কষ্টিপাথর।"

ইহাই এ দেশের প্রাচীন শিক্ষা। গীতাকারও শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়া সুখের সাত্ত্বিক, রাজসিক, ও তামসিক—এ বিবিধ ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তং চ নিগচ্ছতি।
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিনামেঽমৃতোপমম্।
তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তম্ আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্॥
বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগাদ্ যৎতৎঅগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্॥
যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তৎ তামসমুদাহৃতম্॥ ১৮।৩৬-৯

* বিষ্ঠা মাঝে কীট নড়ে, কর্দমে শূকর, তাবে হেন সুখী নাই অবনী ভিতর। —কুমুদনাথের 'কাব্যগুচ্ছ'

'অভ্যাসের ফলে যে সুখে চিত্ত রমিত হয় এবং দুঃখ অবসিত হয়—যে সুখ আরম্ভে বিষতুল্য এবং পরিণামে অমৃতোপম, যাহা আত্মবুদ্ধির প্রসাদজনিত—সেই সুখই সাত্ত্বিক সুখ।

যে সুখ আরম্ভে অমৃতোপম এবং পরিণামে বিষতুল্য—যে সুখ ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংস্পর্শে উৎপন্ন—তাহাই রাজসিক সুখ।'

আর যে সুখ আরম্ভে ও অবসানে আত্মার মোহজনক—যাহা নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ হইতে উত্থিত—সেই সুখই তামসিক সুখ।

এখানে আমরা সুখের প্রকৃতিগত প্রভেদ (Qualitative difference) জানিলাম। বলা বাহুল্য, সাত্ত্বিক সুখই জীবের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

প্রাচীন 'ব্যাস ভাষ্যে' একটি প্রাচীনতর শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—

যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং পরং সুখম্।
তৃষ্ণাক্ষয়-সুখস্যৈতে নাহতঃ ষোড়শীং কলাম্॥

'ইহলোকে যাহা কামসুখ এবং পরলোকে যাহা দিব্য পরম সুখ—তৃষ্ণাক্ষয়-সুখের তুলনায় তাহারা ১৬ ভাগের এক ভাগও নয়।'

ইহা সুখের পরিমাণগত (Quantitative difference) ভেদ-নির্দেশ। সুখের 'তর-তমে'র চরম বিবৃতি আমরা উপনিষদে প্রাপ্ত হই। উপনিষদে মুক্তির অবস্থাকে 'ভূমানন্দ' বলা হইয়াছে। বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্য জনককে ঐ ভূমানন্দের পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন—

মনুষ্যের মধ্যে যে ব্যক্তি বিশেষ সৌভাগ্যবান্ সমৃদ্ধিমান্ সকলের অধিপতি, সর্ববিধ মনুষ্য-ভোগে সম্পন্ন—তাহার যে সুখ, তাহাই মনুষ্যলোকের চরম আনন্দ।

স যো মনুষ্যানাং রাদ্ধঃ সমৃদ্ধো ভবতি অন্যেষাম্ অধিপতিঃ সর্বৈ র্মানুষ্যকৈঃ ভোগৈঃ সম্পন্নতমঃ, স মনুষ্যানাং পরম আনন্দ—বৃহ, ৪।৩।৩৩

পিতৃলোকের যে আনন্দ, সে আনন্দ ঐ আনন্দের শতগুণ; গন্ধর্বলোকের যে আনন্দ, পিতৃলোকের আনন্দের তাহা শতগুণ; দেবলোকে কর্মদেবগণের যে আনন্দ, গন্ধর্বলোকের আনন্দের তাহা শতগুণ এবং আজানদেবগণের যে আনন্দ, কর্মদেবগণের আনন্দের তাহা আবার শতগুণ; প্রজাপতিলোকের যে আনন্দ, আজান-দেবগণের আনন্দের তাহা শতগুণ; কিন্তু ব্রহ্মলোকের যে আনন্দ, ঐ প্রজাপতিলোকের আনন্দ তার শতাংশের একাংশ মাত্র।

অথ যে শতং প্রজাপতিলোক আনন্দ স একো ব্রহ্মলোক আনন্দঃ—ইহাই চরম আনন্দ, পরম আনন্দ—যিনি শ্রোত্রিয়, অবৃজিন, অকামহত, তাঁহার আনন্দের ঐ পরিমাণ—

যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতঃ অথ এষ এব পরম আনন্দঃ—বৃহ, ৪।৩।৩৩

অর্থাৎ নির্বাণী বা জীবন্মুক্ত পুরুষের আনন্দের মাত্রা মানবীয় চরম-আনন্দের দশলক্ষ কোটি গুণ (billion times)। সেই জন্য উপনিষৎ ইহাকে 'অতিস্নীম্ আনন্দস্য' (acme of bliss) বলিয়াছেন। এই 'অতিস্নীম্ আনন্দস্য'ই গীতার 'সুখম্ আত্যন্তিকম্'—

সুখম্ আত্যন্তিকং যত্ বুদ্ধিগ্রাহ্যম্ অতীন্দ্রিয়ম্—গীতা

—ইহাই বুদ্ধদেবের 'বিপুলং সুখং'

পস্সে চ বিপুলং সুখং—ধম্মপদ, পকিন্নকবগ্গ

অর্থাৎ, 'যে সুখের এক কণ, ডুবায় সব ত্রিভুবন'। ইহাই সুখ-তত্ত্বের চরম কথা।

ধর্মতত্ত্বের আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন—'কেন একে দশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিবে? কেন কোটি লোকের হিতের জন্য এক লক্ষ লোকের অনিষ্ট করা হইবে?' বঙ্কিমচন্দ্র বলেন—এ কথার উত্তর হিতবাদী দিতে পারেন না—কারণ, এ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক—যাহা ভারতবাসীই দিতে পারেন। সে উত্তর কি?

ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন—

ময়া ততম্ ইদং সর্বং জগদ্ অব্যক্তমূর্তিনা—গীতা

'তিনি সর্বভূতের অন্তরাত্মা, সর্বভূতময়। কোন মনুষ্য তাঁহা ছাড়া নহে, সকলেই তিনি বিদ্যমান। সেইজন্য সর্বভূতে সমদৃষ্টি করিতে হইবে। সকল মনুষ্যকে না ভালবাসিলে তাঁহাকে ভালবাসা হইল না।' (কারণ, 'from the immanence of God, the solidarity of Man follows as an inescapable corollary—for, we are all rooted in the one Life).

'যতক্ষণ না বুঝিব যে সর্ব লোকে আর আমাতে অভেদ, ততক্ষণ আমার জ্ঞান হয় নাই, ধর্ম হয় নাই, ভক্তি হয় নাই, প্রীতি হয় নাই, অতএব নিয়ম—আত্মবৎ সর্বভূতেষু—সমস্ত জগৎকে আত্মবৎ প্রীতির আধার কর।' * —ধর্মতত্ত্ব, ২১ অধ্যায়।

* এ সম্পর্কে ডাঃ পেলির অভিমত উল্লেখযোগ্য :—

Among those who maintain the utilitarian theory of morals is Paley, who holds that men ought to act so as to further the greatest possible happiness of the race, because God wills the happiness of men, and rewards and punishes them according to their actions, the divine commands being ascertained from Scripture and the light of nature. কিন্তু Bentham's utilitarianism is considerably different from Paley's It was entirely dissociated from theology or Scripture.

সেইজন্য service-এর সার্থক নাম 'সেবা' স ইব আ (সমন্তাৎ)—স (তিনি) সর্বভূতাধিবাস—অতএব 'সর্বত্র দৈত্যাঃ সমতাম্ উপেত—সমত্বম্ আরাধনম্ অচ্যুতস্য' (প্রহ্লাদোক্তি)।

বঙ্কিমচন্দ্র 'হিতবাদ' সম্পর্কে আর একটা গুরুতর কথা উৎথাপন করিয়াছেন —ধর্মতত্ত্বে হিতবাদের স্থান কোথায় ?

হিতবাদীদিগের ভ্রম এই যে, তাঁহারা বিবেচনা করেন যে সমস্ত ধর্মতত্ত্বটা এই হিতবাদ-মতের ভিতরই আছে। তাহা না হইয়া, ইহা ধর্মতত্ত্বের সামান্য অংশমাত্র। আমি যেখানে উহাকে স্থান দিলাম, তাহা আমার বিখ্যাত 'অনুশীলন তত্ত্বের' একটি কোণের কোণ মাত্র। তত্ত্বটা সত্যমূলক, কিন্তু ধর্মতত্ত্বের সমস্ত ক্ষেত্র আবৃত করে না। ধর্ম্ম ভক্তিতে, সর্বভূতে সমদৃষ্টিতে। সেই মহাশিখর হইতে যে সহস্র সহস্র নির্ঝরিণী নামিয়াছে—'হিতবাদ' তাহার একটি ক্ষুদ্রতম স্রোতঃ। ক্ষুদ্রতম হউক—ইহার জল পবিত্র। হিতবাদ ধর্ম—অধর্ম নহে।

পুনশ্চ—হিতবাদের এতটুকু বুঝাইবার আমার উদ্দেশ্য এই যে, তুমি বুঝ যে, অনুশীলনে হিতবাদের স্থান কোথায় ? প্রীতিবৃত্তির সামঞ্জস্যে। সর্বভূত সমান, কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের হিত যেখানে পরস্পর বিরোধী হইয়া থাকে, সে স্থলে ওজন করিয়া বা অঙ্ক করিয়া দেখিবে। অর্থাৎ 'greatest good of the greatest number' আমি যে অর্থে বুঝাইলাম, তাহাই অবলম্বন করিবে।

'হিতবাদ'-সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ কথা এই—

উপসংহারে আমার ইহাও বক্তব্য যে 'যদ্দ্বারা লোকরক্ষা বা লোকহিত সাধিত হয় তাহাই ধর্ম'—আমরা যদি ভক্তি সহকারে এই কৃষ্ণোক্তি হিন্দুধর্মের মূলস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে হিন্দুধর্মের ও হিন্দুজাতির উন্নতির আর বিলম্ব থাকে না। * *

যদি কখনও আমাদের ভাগ্যোদয় হয় তবে আমরা সমস্ত হিন্দু একত্র হইয়া 'নমো ভগবতে বাসুদেবায়' বলিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রণাম করিয়া তদুপদিষ্ট এই লোকহিতাত্মক ধর্ম গ্রহণ করিব। তাহা হইলে নিশ্চিতই আমরা জাতীয় উন্নতি সাধিত করিতে পারিব।

হিতবাদের আলোচনা এখানেই সমাপ্ত করিলাম। আগামী বারে বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্বের সবিশেষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

দাবী

(৭)

পথে বাহির হইয়া অসিতের প্রথম ঝোঁক হইল সটান্ পূর্ণিমাদের বাড়ী যাওয়ার। তাহার জন্ম সম্বন্ধে যে গোপন তথ্য বিনয়কৃষ্ণ প্রকাশ করিয়া দিলেন তাহাকে সে অবিশ্বাস করে নাই, অথচ যে উদ্দেশ্যে বিনয়কৃষ্ণ এই বোমাটি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল ; অসিতের মনে কোন বিকারেরই সঞ্চার হইল না। বরং নিজের জীবনেই বিবাহ রূপ সামাজিক কুপ্রথার এতবড় প্রতিবাদ করিবার সুযোগ ঘটিয়া গেল ভাবিয়া নিজেকে অনেক বড় করিয়া দেখিতে পারিল। কিন্তু বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া হঠাৎ তাহার খেয়াল হইল, এ বাড়ীতে একবার ঢুকিলে বাহির হইতে রাত্রি হইয়া যাইবে, তখন রাত্রি কাটাইবে কোথায়। পরদিন হইতে জীবন যাপনের কি ব্যবস্থাই বা সে করিবে। নিজের একান্ত সম্বলহীন, আশ্রয়হীন অবস্থা উপলব্ধি করিয়া তাহার অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। ইহা নিশ্চিত, যে-পিতৃগৃহ হইতে সে বিদায় লইয়া আসিয়াছে, সেখানে সে কোনমতেই আর ফিরিবে না। কিন্তু এই অসহায় অবস্থায় উহাদের বাড়ীতে যাইতেও তাহার আত্মসম্মানে বাধিল ; তাহার অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উহাদেরও চিত্ত-পরিবর্তন ঘটিবে কিনা কে বলিতে পারে। সে একটা মোড় ফিরিয়া গঙ্গার ধারে গিয়া হাজির হইল।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, ওপারে বিজলী আলো ঝলমল করিয়া উঠিল। ষ্টীমার হইতে সার্চ্চলাইটের জ্বলন্ত রেখা ধূমকেতুর বিরাট পুচ্ছের মত দিক্‌বিদিকে পরিচালিত হইয়া মাঝে মাঝে নদীবক্ষে অন্ধকারকে ঝাঁটাইয়া ফিরিতেছে। তাহাতে সচল কালো বিন্দুর মত দু একটি নৌকা হঠাৎ দৃষ্ট হইয়া আবার অন্ধকারে মিলাইয়া যাইতেছে। থাকিয়া থাকিয়া বিপরীত পথগামী দুই ষ্টীমারের আলোয় আলোয় আকাশ-প্রাঙ্গনে জ্যোতির্ম্ময় অসিযুদ্ধের অভিনয়। লোক চলাচল বিরল, ঘাট নিস্তব্ধ, দীর্ঘ শ্রেণীবদ্ধ অনেকগুলি মালগাড়ী যেন সমরাভিযানের মাতঙ্গের সারি। একটা জেটিতে একটু নির্জ্জন স্থান দেখিয়া অসিত সেখানে বসিয়া পড়িল।

নিজের অবস্থা কিছুক্ষণ পর্য্যালোচনার পর অসিত মনে প্রাণে বিপ্লববাদী হইয়া উঠিল। তাহার বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, স্বাস্থ্য আছে, ইচ্ছা আছে, অথচ করিবার মত কোন কাজ নাই। এই সহরে অন্নসংস্থান করা কি কঠিন ব্যাপার—উপার্জ্জনহীন বেকারের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়িয়াই চলিয়াছে। যে সমাজ, যে রাষ্ট্র প্রত্যেক কর্ম্মক্ষম লোকের খাদ্যের সংস্থান করিতে না পারে, তাহার অস্তিত্বের প্রয়োজন সে ভাবিয়া পাইল না। তাহার মনে হইল, যতদিন সম্পত্তিতে ব্যক্তির অধিকার লোপ করিয়া সমষ্টির অধিকার স্থাপন করা না যাইবে, ততদিন এই অর্থগত বৈষম্য, এই ধনী ও দরিদ্রের পাশাপাশি অবস্থান, এই প্রাণশক্তির অপচয় কিছুতেই রোধ করা যাইবে না। লেনিনের সেই মহাবাণী "যতদিন না প্রত্যেক লোকের রুটি জোটে ততদিন কেহই পিঠা পাইবে না" তাহার মস্তিকের মধ্যে ধ্বনিত হইতে লাগিল। এই প্রসঙ্গে মনে পড়িল বিজয়ের কথা—যে প্রথমে তাহাকে এই সাম্যবাদী সাহিত্যের সহিত পরিচিত করিয়া দিয়াছিল। এক একজন লোক ললাটে নেতৃত্বের রাজটীকা লইয়াই জন্মায়—বিজয় ছিল সেই জাতীয় মানুষ। স্কুলে সে অসিতের কয়েক ক্লাস উপরে পড়িত; তখন হইতেই বিজয় একজন ছাত্র-নেতা। তাহার কর্ত্তৃত্বাধীনে অসিত অনেক স্বেচ্ছাসেবকগিরি করিয়াছে, মুষ্টিভিক্ষা করিয়াছে, নৈশ বিদ্যালয় চালাইয়াছে, বন্যায় চাঁদা তুলিয়াছে। কলেজে পড়িবার সময় একটি ষ্ট্রাইক্ পরিচালনা করিবার অপরাধে বিজয় বিতাড়িত হইল, তারপর রাজনৈতিক অপরাধে জেল খাটিয়া আসিল, ও এখন শ্রমিক আন্দোলনে নেতা হইয়া উঠিয়াছে। অসিত ঠিক করিয়া ফেলিল, বিজয় যদি আশ্রয় দেয়, তাহা হইলে তাহার নির্দ্দেশ অনুযায়ী সে নিজেকে একান্তভাবে নিযুক্ত করিবে। না হইলে যে কি হইবে তাহা ভাবিবার মত সামর্থ্য তখন তাহার ছিল না।

বিজয় খাইতে বসিয়াছে, এমন সময় তাহার ঘরে হঠাৎ অসিতের আবির্ভাব দেখিয়া সে বিস্মিত হইল। কলেজ ছাড়ার পর হইতে তাহাদের জীবনের বৃত্ত ভিন্ন-কেন্দ্র হইয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে সভা সমিতিতে ও এখানে ওখানে তাহাদের দেখা হইয়াছে। বিজয় অসিতকে স্নেহ করিত, তাহার আন্তরিকতার মূল্য বুঝিত, তাই এখনও তাহার মনের নিভৃত কোণে এই অনুগত অনুচরটির জন্য কিছু কোমলতা সঞ্চিত ছিল। অসিত ভূমিকা না করিয়া বলিয়া ফেলিল—বিজয়দা আজ তোমার ঘরেই রাত কাটাবো, আপত্তি আছে?

—আপত্তি করলেই বা তুই শুনবি কেন? আর একটা বউও ত নেই যে ওজর দেখাব!

—বাঁচা গেল, কি ভয়ই যে হয়েছিল। আজ আর তোমাকে ঘুমোতে দিচ্ছি না; আমার অনেক কথা আছে।

—আচ্ছা সে সব পরে হবে। বলি, শুধু শয়নেই হবে, না ভোজনও চাই? ইচ্ছে থাকে ত বসে পড়ো ভাগ কোরে খাওয়া যাক। এত রাত্রে ঠাকুরও চলে গেছে, দোকানে খাওয়াও তোমার পোষাবে না। কাজেই দেরী কোরলে আর কিছু জুটবে না।

অসিত বিনা দ্বিরুক্তিতে বসিয়া গেল। খাইতে খাইতে বিজয় বলিল—কৈ শুনি, কি তোর বলার আছে? বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে বুঝি? তাহলে ঠিক লোকের কাছে পরামর্শ করতে এসেছিস্?

—সম্বন্ধ নয়; একেবারে পাত্রী এসে হাজির।

—কপাল ভালো হলে এমনি হয়! মাঝের বাজে ধাপগুলো একেবারে ডিঙিয়ে যাওয়া যায়। তা শুভদিনটি কবে?

—তোমার যেদিন সুযোগ হবে। তুমিই এখন বরকর্ত্তা। বাবা ত বিদেয় কোরে দিয়েছেন।

—কেন, বুড়োর বুঝি টাকার খাঁই মেটেনি?

—টাকা নয় বিজয়দা, এ একেবারে ক'নের কুল ধরে টানাটানি।—এই বলিয়া সে তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বলিয়া গেল। সব শুনিয়া বিজয় বলিল—ব্যাপার মোটেই সুবিধের নয়। দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। নে ওঠ্, এখন ত শোয়া যাক। রাত্রে ঘুমের ঘোরে নিশ্চয়ই কোন একটা বুদ্ধি গজাবে।

তেতলায় একটি মাত্র ঘর, বিজয় তাহাতে একা থাকিত। কাজেই অসিতের থাকিয়া যাওয়াতে বিশেষ কোন অসুবিধা হইল না।

সকালে অসিতের ঘুম ভাঙিবার পূর্ব্বেই বিজয় বাহির হইয়া গিয়াছিল। অসিত জাগিয়া দেখে সে একা। দিনের আলোয় এই নূতন আবেষ্টনের

অপরিচয়ত্ব স্ফুট হইয়া তাহার জীবনের সমস্যাটিকে তাহার চোখের উপর যেন আরও স্পষ্ট তীব্র রেখায় ফুটাইয়া তুলিল। বিজয়ের স্নেহে ও কর্ম্মকুশলতায় তাহার অগাধ বিশ্বাস। তবুও একটা কিছু স্থির না হওয়া পর্য্যন্ত সে স্বস্তি পাইতেছিল না।

অনেক বেলায় বিজয় ফিরিল। তাহাকে সেই দিনই কলিকাতা ছাড়িতে হইবে। যাইবার পূর্ব্বে অসিতকে বলিয়া গেল—তোর মত ছেলে পেলে আমাদের দলের খুব সুবিধা হয় বটে, কিন্তু তোকে নিতে আমার সাহস হচ্ছে না। যারা প্রেমে পড়ে, আর তাই নিয়ে বাপের সঙ্গে ঝগড়া কোরে বেরিয়ে আসে, তাদের দিয়ে দেশের কাজ বেশী কিছু হয় না। ভাবুকতা অনেক স্থলেই কর্ম্মের অন্তরায়। তাই বলে আবার একেবারে নিরেট গদ্য নিয়েও কাজ চালানো দায়। আসল কথা, তোর কিছু পোড় খাওয়া দরকার। তোর এখনও দলে ভর্ত্তি হয়ে' কাজ নেই। তুই আমার অতিথি হয়েই থাক কিছুদিন। আমি আজ বম্বে চললুম। ফিরতে এক সপ্তাহ, হয়ত দু' সপ্তাহও লাগতে পারে। মেসে বলে দিয়ে যাচ্ছি ততদিন তুই আমার বদলে থাকবি। ঐ টানাটায় খুচরো টাকাও কটা রইল—তাতেই চালিয়ে নিস্। বাড়ীর মায়া কাটিয়ে একলা থাকতে কেমন লাগে, একবার চেখে দেখ। —তারপর একটু থামিয়া, দুষ্টামির হাসি হাসিয়া বলিল—এখন থাকতে পারলে হয়।

অসিত জোর দিয়া বলিল—পারব।

—আমার বিশ্বাস আজ নয় কাল তুই ফিরে যাবি।

—কক্‌খনো না।

—সন্ধান পেলেই এ বাড়ীর কিংবা ও বাড়ীর লোক এসে তোকে ধরে নিয়ে যাবে।

—তা হবে না।

—আর যদি স্বয়ং শ্রীমতী এসে ডাক দেন!—এই বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বিজয় বাহির হইয়া গেল।

অসিত মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল সে আজই এমন কিছু করিবে যাহাতে দু'বাড়ীরই সহিত তাহার সকল সম্পর্ক চুকিয়া যায়।

(৮)

অসিত যখন ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল, কত বড় বিপ্লব যে ঘটিয়া গেল, নিজের সুপরিচিত ঘরটিতে বসিয়া বিনয়কৃষ্ণ তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। বহুদিনের অভ্যস্ত ধারায় কয়েক ঘণ্টা কাটিবার পর খাইতে বসিয়া তাঁহার মন প্রথম আঘাত পাইল। চিরদিন যে সঙ্গে থাকে, আজ সে নাই। অসিতের খোঁজে এতক্ষণ কাহারও দরকার ছিল না। এখন বিনয়কৃষ্ণ গম্ভীর কণ্ঠে সৌদামিনীকে জানাইলেন, কোন একটা বিশেষ কাজে তিনি অসিতকে পাঠাইয়াছেন, সে রাত্রে তাহার ফিরিবার সম্ভাবনা নাই। ঘটনাটি অভাবনীয় হইলেও সৌদামিনী তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। বিনয়কৃষ্ণ নীরবে ভোজনে রত হইয়া কোন্ দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়া হঠাৎ এ মিথ্যাটি বলিয়া ফেলিলেন তাহারই বোঝাপড়া নিজের মনে করিতে লাগিলেন। সৌদামিনী লক্ষ্য করিলেন, সমস্ত রাত্রি তাঁহার অনিদ্রায় কাটিল। ভোর না হইতেই বাড়ীর সম্মুখে পদচারণা করিতে লাগিলেন—এবং ত্রিশ বৎসরের মধ্যে যাহা কখনও ঘটে নাই,—ইচ্ছা করিয়া অফিস কামাই করিলেন। চারিদিকে বাণিজ্যে ব্যবসায়ে মন্দা পড়িয়াছিল। সুখেরই হউক আর দুঃখেরই হউক নিজের কারবারের কোন কথার আলোচনা বাড়ীতে করা বিনয়কৃষ্ণের অভ্যাস ছিল না। তাই তাঁহার ব্যবসায়ে আসন্ন কোন সঙ্কটের আশঙ্কায় সৌদামিনী উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিলেন। সন্ধ্যার সময় একটি ছোক্‌রা আসিয়া বিনয়কৃষ্ণের হাতে একটি প্যাকেট দিয়া তিনি কোন কিছু প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বেই অদৃশ্য হইয়া গেল। খুলিয়া দেখিলেন, অসিত যে কাপড় জামা জুতা পরিয়া চলিয়া গিয়াছিল, তাহা সমস্তই মায় পকেটের রুমাল ও খুচরা টাকা পয়সা পর্য্যন্ত ফেরৎ দিয়াছে। এইবারে বিনয়কৃষ্ণের নিরুদ্ধ সংযম ভাঙিয়া পড়িল। তাঁহার বিশ্বাস হইল সুনয়নীর আশ্রয় পাইয়াই অসিত এই চরম দুর্ব্যবহার করিতে পারিয়াছে। তিনি সৌদামিনীকে ডাকিয়া সমস্ত বিবৃত করিলেন। সৌদামিনীর চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। বিনয়কৃষ্ণ অনভ্যস্ত স্নেহের সুরে বলিলেন—কেঁদো না, শক্ত হও। যে আমাদের বিবাহকে এমনি কোরে অপমান কোরেছে, আমাদের সংসারে তার আর কোন স্থান নেই। সৌদামিনী স্থির প্রস্তর মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিলেন, তাঁহার দৃষ্টিতে শূন্যতার পূর্ণ প্রকাশ। বিনয়কৃষ্ণ দেখিয়া ভীত

হইলেন। পরে ধরা গলায় কহিলেন—তোমাকে আজ আমি যে ব্যথা দিলাম, আমার অন্তরের ব্যথা বুঝে তুমি তা ক্ষমা কোর্‌তে পারবে না কি? এইবার সৌদামিনী হঠাৎ ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া পতির পদপ্রান্তে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

এক দিককার বন্ধন ছিন্ন করার ব্যবস্থা করিয়া অসিত চলিল বরাহনগরে অন্যদিকের ব্যবস্থা করিতে। বিজয় ফিরিলে দেখাইতে চাহে যে সে মনে প্রাণে মুক্ত, ও তাহার দলভুক্ত হইবার সম্পূর্ণ অধিকারী। এই বিশ্বাসেই বিজয়ের টাকা নিজের মত করিয়া খরচ করিতে তাহার বাধে নাই। দলের টাকায় দলের সকলের সমান অধিকার, অবশ্য প্রয়োজনমতো, বিজয়ের এই মত তাহার জানা ছিল। অসিতকে দেখিয়া সুনয়নী অভিমান করিয়া কহিলেন—

—এরই মধ্যে এলে? সবে ত কাল তোমায় ডাকা হ'য়েছে। না ডাক্‌লে আসা ত ছেড়েই দিয়েছ। অথচ অনি ভাবছে তার সমস্ত অভাব তুমিই পূরণ কোরছ।

—মা, কদিন না আসায় এত রাগ! এত ঝাঁজ যে প্রুণের মুখেও বেমানান হোত, সে কোথায়?

সুনয়নী হাসিয়া বলিলেন,—তার রাগ যে কি রকম তা এলেই দেখতে পাবে। কাল সারাদিন তোমার অপেক্ষায় ছিল। আজ তার জুলিয়ার জন্মদিন; না গেলে নয় তাই গেছে। বলে গেছে, তুমি এলে তার ফেরার আগে যেন ছেড়ে দেওয়া না হয়।

এমন সময় নৃপেশনাথ ঘরে ঢুকিলেন। অসিত সবিস্ময়ে কহিল—আপনি কবে এলেন? নৃপেশনাথ বলিলেন—কেন প্রুণ তোমায় লেখেনি? সুনয়নী বলিলেন—না ওকে একটা সারপ্রাইজ দেবার জন্য।

নৃপেশনাথ বলিলেন—সে কি ভাবে যে তার বুড়ো বাবা খুব একটা ডিলাইটফুল সারপ্রাইজ। সে যাই হোক এখন আমি একটা সারপ্রাইজ এনেছি;—তারপর সুনয়নীর দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিয়া বলিলেন—ডিলাইটফুল কিনা জানি না।

সুনয়নী বলিলেন—উদ্ভট কল্পনায় তোমার সঙ্গে কে পারবে বল? জানো অসিত, পূর্ণিমা হবার পর উনি আমায় কি উপহার দিয়েছিলেন! আমরা তখন গারো হিলস্‌-এ থাকি। উনি চারিদিকে কাপড় দিয়ে ঢাকা বড় পুঁটুলির মত কি একটা এনে দিলেন—খুলে দেখি বাঘের বাচ্চা।

নৃপেশনাথ বলিলেন—বাঘের বাচ্চার বদল।

সুনয়নী বলিলেন—আচ্ছা ব্যাঘ্রমশাই, এখন আজকার ব্যাপার কি তাই বলো।

—সে ব্যাপার আরও চমকপ্রদ। ব্যাঘ্রমশাই বুড়ো হয়েছেন, আর বাঘিনীর সঙ্গ ছাড়া হ'তে রাজি নন্। তাই তিনি আপাততঃ বর্ম্মার জঙ্গল ছেড়ে বরাহ-নগরের জঙ্গলে বাস কোরবেন। তিনি আশা করেন বাঘিনী মহোদয়ার কোন আপত্তি হবে না।

সুনয়নী বলিলেন—সত্যি! যাক্ এতদিন পরে তাহলে বদ্‌লি হ'তে পারলে! প্রুণ শুনে কি খুসীই হবে।

নৃপেশনাথ বলিলেন—কিন্তু অনি বেচারী ক্ষুণ্ণ হবে। তাকে লিখে দিয়েছি, এবার যদি ট্রান্‌স্‌ফার না হয় তাহ'লে ছুটি নিয়ে বিলেত গিয়ে তাকে দেখে আসব। হয়ত তোমাদেরও নিয়ে যাব।

সুনয়নী বলিলেন—তুমি সাহেব লোক, ও দেশের লোভ তোমার আর মেটে না। আমরা দেশী লোক, আমাদের অত আগ্রহ নেই, কি বল অসিত।

নৃপেশনাথ বলিলেন—তুমিও যেতে চাও না নাকি হে? তোমার বাবা তোমায় পাঠাতে চান না?

অসিত বলিল—যেতে আমি চাই, তবে বাবার টাকায় নয়। একটা স্কলার-শিপ্ পেলে যেতে পারতাম। শেষ পর্য্যন্ত বোধ হয় মার কথাই ঠিক, দেশে এখন এত রকমের কাজ ও কর্ম্মীর এত অভাব যে বিদেশে গিয়ে বিশেষ কিছু লাভ হয় না।—তাহার মনের চোখে বিজয়ের ছবি ফুটিয়া উঠিল।

—দেশে অনেক কাজ, কিন্তু তুমি কি করবে শুনি। এম-এস্‌-সি ত পাশ করেছ তারপর?

—বাবার ইচ্ছে অবশ্য ল' পড়ি ও তাঁর কারবার দেখি। আমি তা করবো না, ঠিক করেছি।

—কিন্তু কি করবে সেটাও কি ঠিক করেছ? সেটা হয়ত অত সোজা নয়।

—অনেকটা; ঠিক করেছি, শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দিয়ে আমাদের দেশের মূঢ়, অশিক্ষিত মজুরদের সঙ্ঘবদ্ধ কোরে তুল্‌বো।

নৃপেশনাথ অবিশ্বাসের হাসি হাসিলেন—তোমার বাবার অমতে এ-সব চালাতে পারবে ?

—সেই জন্যই বাড়ী ছেড়ে দিয়েছি।

সুনয়নী চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বাড়ী ছেড়ে দিয়েছ ? কবে থেকে ?

—কাল থেকে। তাই ত কাল আসা সম্ভব হয়নি।

—কোথায় আছ ?

—আশ্রয় একটা জুটেছে বৈকি। এখন সেখানে টিঁকে থাকবার মত শক্তি পেলে হয়।

নৃপেশনাথের অবিশ্বাসের হাসি নিবিয়া গিয়াছে।

সুনয়নী বলিলেন,—তুমি আমার কাছে এলে না কেন ? আমি ত তোমায় বাধা দিতাম না।

—ঠিক এই ব্যাপার নিয়ে ত বাড়ী ছাড়িনি, বাড়ী ছাড়ার পর এ পথ অবলম্বন করেছি। বাবার বিশ্বাস, আমি পূর্ণিমাকে বিয়ে করতে চাই। আর আমার এ-ইচ্ছা আপনাদের ষড়যন্ত্রের ফল।

সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া গেলেন। বেয়ারা আসিয়া চা দিয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া নৃপেশনাথ কহিলেন,—

—হুঁ, তোমার বাবার পক্ষে এরকম ভাবা মোটেই অস্বাভাবিক নয় তা স্বীকার করতে হবে। আমাদের সম্বন্ধে হয়ত তিনি কিছুই জানেন না।

—তা ঠিক নয়। খুব সম্ভব তিনি অনেক খোঁজ নিয়েছেন। আমি যেখানে এত মিশি তাদের সম্বন্ধে উদাসীন হওয়া বাবার পক্ষে অসম্ভব।

নৃপেশনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন—তাহলে তাঁর কি আপত্তি ? আমরা ভিন্ন জাত ; তা অসবর্ণ বিবাহ ত আজকাল চল্‌তে আরম্ভ করেছে।

অসিত সুনয়নীকে দেখাইয়া বলিল—মার সম্বন্ধে তিনি এমন ইঙ্গিত করেছেন, যার পর তাঁর সঙ্গে এক বাড়ীতে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠ্‌ল।

অসিতের বক্তব্যের মর্ম্ম নৃপেশনাথ ও সুনয়নীর নিকট দুর্ব্বোধ্য না হওয়ায় ঘরের ভিতর আবার নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। একটু পরে সুনয়নী আরম্ভ করিলেন—আমারই ভুল হয়ে গেছে, আগে জানানো হয়ত উচিত ছিল। কিন্তু তাই বা কেন ? আমার ছেলে মেয়ে মনুষ্যত্বে কারো চেয়ে কম নয়—পিতৃমাতৃস্নেহও তারা কারো চেয়ে কম পায়নি। পূর্ণিমার জন্মবৃত্তান্তে আমাদের লজ্জিত হবার কিছু নেই বলেই, বলে বেড়ানোর কোন সার্থকতা দেখ্‌তে পাইনে। কিন্তু আমাদের জন্য তুমি কেন গৃহত্যাগী হবে অসিত ? তুমি কি এখন পূর্ণিমাকে বিয়ে করতে চাও ?

—না ; বাবার যে কারণে আপত্তি সে কারণে নয়। আমি এখন যে পথ ধরেছি তাতে বিয়ে করা চলে না।

নৃপেশনাথ বলিলেন—দেখো অসিত কিছু না মনে করো ত বলি। আমি তোমাকে যতটা জেনেছি, তাতে মনে হয় শ্রমিক আন্দোলন চালানো তোমার কাজ নয়। তুমি মজুর নও, দারিদ্র্যের সঙ্গেও তোমার চাক্ষুষ পরিচয় নেই। ও তোমার একটা ক্ষণিক কল্পনার বিলাস মাত্র। আমার বিশ্বাস হয় না ও পথে তুমি কোন গভীর আনন্দ বা বড় সফলতা পাবে। আজ বাদে কাল তোমার ও পথ ছাড়তেই হবে, হয় দেশবাসীর নয় পুলিশের অত্যাচারে। তার চেয়ে বরং আমরা যদি তোমার বাবাকে জানাই পূর্ণিমার সঙ্গে তোমার বিয়ের কোনই সম্ভাবনা নেই, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই তোমায় ডেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন।

—না, সে হয় না। পূর্ণিমার বিয়ে নিয়ে ত আমি বাড়ী ছাড়িনি। তাছাড়া আমিও তাঁকে এমন অপমান করেছি যে ফিরে গেলেও আর সে অবাধ স্নেহ আমায় তিনি দিতে পারবেন না। তার চেয়ে না যাওয়াই ভালো।

—তা হলে এক কাজ করো। তোমার এ ভাগ্য পরিবর্ত্তনের জন্য মূলতঃ আমরাই দায়ী জ্ঞানতঃ না হলেও। তুমি ইউরোপে যাও, আমি তোমার শিক্ষার ভার নিচ্ছি। এর সঙ্গে পূর্ণিমার বিয়ের কোন সম্বন্ধ থাকারই দরকার নেই। মনে করো এ একটা স্কলারশিপ্‌।

—আপনার স্নেহ আমার মনে থাকবে। কিন্তু তাও হবে না। হয়ত ভবিষ্যতে আপনার কথাই সত্য হবে। আমি এ পথে টিঁকে থাকতে পারব না কিন্তু আমার জীবনে আমি প্রথম একটা সংকল্প করেছি, এত শীঘ্র তার থেকে বিচ্যুত হতে চাই না। আত্মপরীক্ষায়-ও সময় লাগে, নিজেকে সে অবসরটুকু থেকে বঞ্চিত করা উচিত হবে কি ?

তারপর উঠিয়া সুনয়নীর দিকে চাহিয়া বলিল—আজ চলি, প্রণবের সঙ্গে দেখা হোলো না ; হয়ত আর আসার সময় পাবো না।

সুনয়নী বলিলেন—সে কি কথা! আসাই একেবারে বন্ধ করবে?

অসিত এ কথার কোন স্পষ্ট উত্তর দিল না। ম্লানভাবে একটু হাসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। সুনয়নী বুঝিলেন তাঁহার সংসার নাট্য হইতে অসিতের নিষ্ক্রমণ হইয়া গেল। উপস্থিত ভাবনার বিষয়, পুর্ণিমাকে কি বলিয়া বোঝান যায়। কার্য্যতঃ উহা অত্যন্ত সহজ হইয়া গেল। পুর্ণিমা ফিরিয়া আসিতে যথাসাধ্য ত্বরা করিয়াছিল। তবুও অসিত আসিয়া তাহার সহিত দেখা না করিয়াই চলিয়া গিয়াছে শুনিয়া সে ভাবিয়া লইল, অসিত ইচ্ছা করিয়াই তাহাকে এড়াইয়া চলিতেছে সেই দিনের সেই মূঢ় আত্ম-প্রকাশের প্রতিবিধান স্বরূপ। ইহাতে তাহার অভিমানে আঘাত লাগিল। তাহার উদ্বেল চিত্তবৃত্তিকে শাসনের প্রতিজ্ঞা করিয়া সেও অসিতের চিন্তা সযত্নে পরিহার করিয়া লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করিতে চেষ্টা করিল। নৃপেশনাথ কলিকাতায় থাকায় সাহচর্য্যেরও বিশেষ অভাব সে বোধ করিল না।

(৯)

বিজয় ফিরিয়া আসিয়া সব শুনিল। আরো শুনিল অসিত ঘুরিয়া ঘুরিয়া একটি নব প্রতিষ্ঠিত দৈনিক সংবাদ পত্রে কাজ যোগাড় করিয়া ফেলিয়াছে। বিজয়ের দরকার হইলে তাহা সে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। বিজয় বলিল—না, না, তার দরকার নেই। আপাততঃ খাওয়া পরার জন্যে দলের উপর নির্ভর না কোরে স্বাবলম্বী হওয়াই ভালো। কে জানে আমাদের সঙ্গে তোর বনবে কিনা। দেখে মনে হচ্ছে তুই পারবি। বাবার সঙ্গে ও অভদ্র ব্যবহারটা না করলেই পারতিস। যাক, যা কোরে ফেলেছিস তার ত আর চারা নেই। কিন্তু পূর্ণিমা কি তোকে এত সহজে ছাড়তে পারবে?

বস্তুতঃ এখন অসিতের সম্বন্ধে এইটাই ছিল সবচেয়ে বেশী ভয়। এই ভয়েই সে অসিতকে চাকরী রাখিতে বলিতেছে, এই ভয়েই সে তাহাকে তাহার বিপ্লবী সভার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে অনিচ্ছুক। বিজয়ের তাসের জগতে বিবি নাই, আছে শুধু সাহেব আর গোলাম, ধনিক ও শ্রমিক। প্রেমের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় তাহার কখনো ঘটে নাই, তবু সে এতটুকু বুঝিয়াছে, তাহার কর্ম্মের পথে

প্রধান অন্তরায় নারী। তাহার পথ দুঃখের নহে, আনন্দ তাহাতে তীব্র, কিন্তু তাহা দুর্ভোগের, নির্য্যাতনের পথ, হয়ত বা মৃত্যুরও। সে বিশ্বাস করে না কোন নারী তাহার প্রেমাস্পদকে চোখ চাহিয়া এই রুক্ষ, বন্ধুর পথে পাঠাইতে পারে—শুধু আদর্শের অনুপ্রেরণায়। প্রেম বিফল হইলে প্রচণ্ড শক্তির সঞ্চার করিতে পারে, কিন্তু সফল প্রেমের চরম নির্ব্বাণ তাহার সাফল্যেই। তাহার সন্দেহ ছিল, পুর্ণিমার ডাক আসিলে অসিত তাহাতে সাড়া না দিয়া পারিবে না।

অসিত একটু নিবিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তাহলে তুমি আমায় কি করতে বল?

—কি আবার করবি; যেমন আছিস্ থাক্।

—তাহলে আমায় একটা ঘর দেখতে হয়।

—কেন? এ ঘরটায় কি অসুবিধে হচ্ছে? আমি কি তোর স্বপ্ন-দেখায় বাধা দেব?

—তোমার অসুবিধার কথা ভেবে বলেছিলাম।

—আমার যেদিন অসুবিধা হবে, তোকে বিদায় কোরে দিতে আমার একটুও বাধবে না।—আসল কথা অসিতের এইরূপ মানসিক অবস্থায় বিজয় তাহাকে চোখের আড়াল করিতে সাহস করে না।

অগত্যা অসিত বিজয়ের ঘরেই রহিয়া গেল। বিজয় তাহাকে খাটাইতে আরম্ভ করিল। বিজয়ের খুব ভালো করিয়াই জানা আছে যে বক্তৃতা করিবার, লোক ক্ষ্যাপাইবার, গবর্ণমেণ্টকে গালি দিবার লোকের অভাব হয় না। কিন্তু লোকচক্ষুর অন্তরালে যে স্থির সংযত ও নিত্য-বিধেয় কর্ম্মাবলী—তাহারই জন্য কর্ম্মীর একান্ত অভাব। তাহার নির্দ্দেশ মত অসিত শ্রমিক পল্লীর গৃহে গৃহে প্রবেশ করিয়া আলাপ করে, তাহাদের জীবনযাত্রার তুচ্ছ কাহিনীর সহিত পরিচিত হয়, অভাব অভিযোগের কথা মন দিয়া শোনে, তথ্য সংগ্রহ করে, বিবরণী প্রস্তুত করে, দেশ বিদেশের শ্রমিক জীবনের সহিত বৈজ্ঞানিক প্রথায় তুলনামূলক আলোচনা লিখিয়া দেয়। শ্রমিক সঙ্ঘগুলির গতি ও স্থিতি নিরীক্ষণ করিয়া বিজয়ের নিকট তাহাদের সুপরিচালনের পন্থা নির্দ্দেশ তাহার আর এক কাজ। কর্ম্মের প্রচণ্ড তাড়নায় বিজয়ের জীবনে শিক্ষার, চিন্তার,

তথ্যানুসন্ধানের, সত্যানুধাবনের অবসর ক্রমশঃই স্বল্প হইয়া আসিতেছিল, অসিতের প্রাণান্ত পরিশ্রমে তাহার কথঞ্চিৎ পরিপূরণ হইতে লাগিল। অসিত মাঝে মাঝে ক্লান্তি বোধ করিত, কিন্তু বিজয়ের সেই ক্লান্তিহীন বিরামহীন জীবনযাত্রা চোখের সামনে দেখিয়া তাহার বিরসতা মনের মধ্যেই লয় পাইত। দিবারাত্রির প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত বিজয় দেশসেবায় উৎসর্গ করিয়া দিয়াছে। অথচ অসিত কোনদিন তাহার মুখে বিরক্তির বা নিরুৎসাহের আভাস দেখে নাই। বিজয়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সে নির্দ্দয় ভাবে আপনার শক্তির অতিরিক্ত কর্ম্মোদ্যমে নিজেকে নিযুক্ত করিল। বস্তুতঃ তাহার দেশসেবা বিজয়-আনুগত্যের নামান্তর হইয়া উঠিল। নিজের ব্যক্তিগত চিন্তার অবসর মাত্র সে রাখিল না এবং সুখদুঃখ সমাচ্ছন্ন অতীত কেমন করিয়া যে তাহার মন হইতে মুছিয়া গেল তাহা সে অনুভবও করিতে পারিল না।

অসিতের অভাবে বিনয়কৃষ্ণের সংসার চাকা-ভাঙা গাড়ীর মত একপেশে হইয়া হেলিয়া পড়িয়াছে। অথচ হঠাৎ দেখিয়া তাহা বুঝিবার জো নাই। অন্তরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া বিনয়কৃষ্ণ তাহাকে ঠেলিয়া তুলিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার দৈনন্দিন কর্ম্ম দৈনন্দিন ভাবেই চলিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার দেহ যে দিন-দিন শুষ্ক ও ক্ষীণ হইয়া জ্বলন্ত মোমবাতির মত বিন্দু-বিন্দু করিয়া মর্ম্মবেদনার তাপে ক্ষরিয়া পড়িতেছে তাহা সৌদামিনীর দৃষ্টি এড়াইল না। বিবাহিত জীবনের দীর্ঘযুগে তিনি কোনদিন স্বামীর কোন কার্য্যে প্রতিবাদ বা মন্তব্য করেন নাই, আজিও করিতে পারিলেন না। প্রতি মুহূর্ত্তে চরম বিপদের আশঙ্কায় কম্পমান হইয়া রহিলেন।

তাঁহার আশঙ্কা অমূলক হইল না। শেষে একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবেই বিনয়কৃষ্ণের হৃদয়যন্ত্র বিকল হইয়া পড়িল। কিন্তু জীবনের শেষ নিশ্বাসের সহিত স্পষ্টস্বরে তিনি সৌদামিনীকে বলিয়া গেলেন—ভুলো না যেন শক্ত হতে হবে।

সংবাদ পাইয়া অসিত যখন আসিল, শবদেহ তখন শ্মশান অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। সে শ্মশানে না গিয়া সৌদামিনীর কাছেই গেল। তাঁহার চারিপাশে আত্মীয়-কুটুম্বিনীরা বসিয়া ছিলেন। সে বিরক্ত হইয়া চাহিতেই তাঁহারা উঠিয়া

গেলেন। বিনয়কৃষ্ণ যাহাই করুন সৌদামিনীর নিকট যে সে অপরাধী, এ বিষয়ে তাহার মনে একতিলও সন্দেহ ছিল না। সে-অপরাধ ক্ষালনের কোন উপায় সে খুঁজিয়া পায় নাই। প্রায়শ্চিত্তের কোন পথ খোলা আছে কিনা আজ সে এখন মায়ের নিকট জানিতে চায়। তাহাকে দেখিয়া সৌদামিনীর শরীর একবার শিহরিয়া উঠিল—তাহার পর স্থির নিষ্পন্দ। অবিরাম অশ্রুধারা জীবনের একমাত্র বাহ্য লক্ষণ। অসিত কাঁদিতে পারিল না—কান্না তাহার আসে না—সে সৌদামিনীর কাছে বসিয়া নির্নিমেষ নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ যেন সৌদামিনীর চমক ভাঙিল। অসিতের দিকে কঠিন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশে তিনি তাহাকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। অসিত কিছু বুঝিতে না পারিয়া মূঢ়ের মত চাহিয়া রহিল। অঙ্গুলির পুনর্নির্দ্দেশ তাহার নিকট ব্যর্থ হইল না। এইবার তাহার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইয়া আসিল। সে কোনমতে তাহা চাপিয়া রাখিয়া ভূলুণ্ঠিত হইয়া সৌদামিনীকে প্রণাম করিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে যেন বাতাসে ভাসিতে ভাসিতে পথে আসিয়া পৌঁছিল। দেখিতে পাইল মায়ের মনের মধ্যে মৃত পিতার ইচ্ছা সম্পূর্ণ জীবিত। যে প্রেম মৃত্যুর ব্যবধানকে স্বীকার না করিয়া মাতৃস্নেহকে স্তম্ভিত করিয়া রাখে, তাহার শক্তি ও মহত্ত্বের উপলব্ধি অসিতকে অভিভূত করিয়া ফেলিল।

বিজয় তাহাকে বলিল,—"তোর কাগজের আফিস থেকে দিনকতক ছুটি নে; আর এখানকার কাজগুলো আমি অন্য লোকের উপর ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তুই চল, আমার সঙ্গে কিছুদিন ঘুরে আসবি।

অসিত তাহার সহৃদয়তায় কৃতজ্ঞ হইয়া বলিল—তার দরকার নেই বিজয় দা। আমি কাজের মধ্যেই থাকব ভাল।

বিজয় প্রতিবাদ না করিয়া চলিয়া গেল। দিনকতক বাদে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, অসিত তাহার কথা রাখিয়াছে। নিজেকে অশ্রান্তভাবে কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া তাহার মানসিক প্রশান্তি ফিরিয়া পাইয়াছে।

একদিন রাত্রে বিজয় কথা তুলিল—"জানিস্ অসিত, তোর বাবা কোন উইল কোরে যাননি। আইনতঃ তাঁর সম্পত্তির তুই একমাত্র অধিকারী।"

এ কথার উত্তরে অসিত কি বলে শুনিবার জন্য বিজয় চুপ করিল। অসিতের তরফ হইতে কোন উত্তর আসিল না। তখন বিজয় আবার বলিল—এইবার তোর পরীক্ষা।

—কিসের ?

—দেশকে কতখানি ভালোবাসিস, তার। তোর টাকাটায় দলের দরকার।

বিজয়ের তীব্র দৃষ্টিকেও অগ্রাহ্য করিয়া অসিত বলিল—তা আমি পারবো না। ও টাকা আমার নয়। বাবা উইল না রেখে যেতে পারেন, কিন্তু তাঁর ইচ্ছা আমার জানা। তিনি আমাকে মনেপ্রাণে ত্যজ্যপুত্র করেছিলেন।

—আইনের চোখে সে অপ্রকাশিত ইচ্ছার কোন দাম নেই। একজন মৃত ব্যক্তির যুক্তিহীন ইচ্ছা দেশের কাজের অন্তরায় হতে পারে না।

—বাবা মৃত বটে, তাঁর ইচ্ছা আমার মায়ের মধ্যে সম্পূর্ণ জীবিত। আমি তাঁকে অমান্য করতে পারি না।

—তাঁকে কে অমান্য করতে চাইছে। তাঁর যাতে আজীবন ভরণপোষনের কোন কষ্ট না হয় তার ব্যবস্থা করা হবে। বাকী টাকাটা আমরা চাই। তুই যদি কোন দাবী না করিস তাহলে যা ব্যবস্থা হচ্ছে তাতে সব টাকাটা পুরুত-পাণ্ডাদের পেটে যাবে। তুই কি তাই চাস্ ?

অসিত দেখিল ঘটনার দিক দিয়া, ব্যবহারিক সত্যের দিক দিয়া বিজয়ের এ অমোঘ যুক্তির উত্তর দিবার ক্ষমতা তাহার নাই। তাই সে বলিয়া উঠিল—আমাকে রক্ষা কর বিজয় দা। তুমি আমার সব নাও। আমার শিরার প্রত্যেক রক্তবিন্দুটি তোমায় দিচ্ছি। শুধু আমার ন্যায়বোধ আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবার দাবী কোরো না।

বিজয় একটু উষ্ণ ভাবেই বলিল—রক্তবিন্দুর কি লোভ দেখাচ্ছিস অসিত ; আমাদের দলে এমন কেউ নেই যে মরণে ভয় পায়। শুধু মরায় ত দেশ উদ্ধার হয় না। তাহলে প্রতি বৎসর ম্যালেরিয়া রোগী দিয়েই আমাদের কাজ হয়ে যেত। আমরা চাই, দেশকে ভালোবাসা, এমন ভালোবাসা যার কাছে ন্যায়বোধ তুচ্ছ। তুই তা পারিসনে বলেই ন্যায়বোধের কথা তুলতে পারলি।

অসিত চুপ করিয়া রহিল। বিজয়ের প্রস্তাবে সে সায় দিতে পারিল না। বিজয়ের প্রতি তাহার অবিচলিত অকৃত্রিম শ্রদ্ধা সত্বেও সে তাহার কথা মানিয়া লইতে পারিল না। যাঁহার সহিত সকল সম্পর্ক নিঃশেষে চুকিয়া গিয়াছে আইনের ফাঁকিতে তাঁহারই সম্পত্তি অধিকার করিবার মতো প্রবৃত্তির কথা মনে করিতে তাহার ঘৃণা হইল। আর ন্যায়বোধকেই যদি তুচ্ছ করিতে হয়, তাহা হইলে কিসের উপর ভর করিয়া তাহারা দেশের কাজের নাম করিয়া মজুরদের সম্বন্ধে ধনিকদের অন্যায়ের প্রতিকারে লাগিয়াছে।

বিজয় পাশ ফিরিতে ফিরিতে বলিল—তুই আমায় হতাশ করলি।

সুনিবিড় বন্ধুত্বের মধ্যে সূক্ষ্ম ব্যবধানের পর্দ্দা পড়িয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়

মানুষের মন, মগজ ও আত্মা

মানুষের মনের কথা চিরকালই মানুষের কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা উদ্রেক করে এসেছে। প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ যখন সবে মাত্র পাথর ও হাড়ের হাতিয়ার ভাল করে তৈয়ারী করে কাজে লাগাতে শিখেছে, তখনও মানুষ তার নিজের মনের প্রক্রিয়াকে বোঝবার চেষ্টা করেছে। সে আমলে মানুষের জ্ঞান খুবই সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে বদ্ধ ছিল; ফলে তখনকার মানুষের অনেক বিশ্বাসকে আজ যুক্তির বাহিরের মনে হয়। বর্ত্তমান যুগের অনেক আদিম জাতির বিশ্বাস ও ব্যবহার সম্বন্ধেও একথা খানিকটা প্রযোজ্য। এজন্য একদল বৈজ্ঞানিক এই শ্রেণীর মানুষের মনকেই যুক্তির পূর্ব্বস্তরের (Prelogical) অবস্থায় স্থিত বলে মনে করেন। কিন্তু, বর্ত্তমান যুগে, আমাদের আপেক্ষিকভাবে অশেষ জ্ঞানসম্ভারের সাহায্যে, যে সকল সিদ্ধান্ত ও রীতিকে যুক্তি বিভ্রমেরও নিম্নস্তরের বলে মনে হ'তে পারে, বহু প্রাচীন যুগে, যখন মানুষ প্রকৃতিদেবীর অনুকম্পায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করত, তখন মানুষের মন সম্বন্ধে ঐ সকল সিদ্ধান্ত ভিন্ন অন্য কিছু কথা মানুষের মনে স্থান পাওয়া সম্ভব ছিল না, বলা যেতে পারে।

প্রাচীন প্রস্তরযুগের মানুষ লিপি উদ্ভাবন করে নাই। এজন্য সে যুগের মানুষের মন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে অনুমানের উপর নির্ভর করে। এই আনুমানিক জ্ঞান ঠিক কি না, আমরা বর্ত্তমান যুগের আদিম জাতির মনের পরিচয় হ'তে বিচার করবার চেষ্টা করে থাকি। এ পদ্ধতি নিখুঁত না হ'লেও, ব্যবহারযোগ্য ও বিজ্ঞানসম্মত। আদিম জাতি কথাটি এই প্রবন্ধে অতঃপর, অন্যরূপ নির্দ্দেশ না থাকলে, বর্ত্তমান যুগের এই শ্রেণীর মানুষের সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হ'বে।

মানুষের মন ও জীবন সম্বন্ধে বোঝবার জন্য আদিম মানুষ, তার পক্ষে সম্ভব যে সহজ উপায়, সেইটিরই ব্যবহার করেছিল। সে তার নিজের মন সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করে। জাগ্রত অবস্থায় মানুষ এত ব্যস্ত থাকে যে, সে সময়ের চিন্তা সম্বন্ধে আলোচনা,

এরূপ আদিম অবস্থায় বিশেষ সম্ভব হয় না; অথবা বিচারযোগ্য মনে হয় না। কিন্তু মানুষ যখন সংসারের কাজ কর্ম্ম হ'তে বিরত হ'য়ে নিদ্রার আশ্রয় অবলম্বন করে' বিশ্রাম করে ও স্বপ্ন যখন তার মনে নানা চিত্র এনে দেয়, তখন প্রশ্ন উঠে, এ স্বপ্নরাজ্য কোথায়? আদিম মানুষ তার স্বপ্নকে জাগ্রত অবস্থার অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে বিশ্বাস করে যে সত্যই সে কোথাও গিয়েছিল; ও নানা কার্য্যে নিরত হ'য়েছিল। কিন্তু তার আত্মীয় স্বজন সকলেই তা'কে জানায়, যে সে নিজের ঘরে বা প্রাঙ্গণে সুপ্ত ছিল। সে ব্যক্তি নিজেও অপরের কাছে শোনে এই রকম স্বপ্নের কথা। তখন তার ও তারই মত, তাদের সমাজের লোকদের ধারণা দৃঢ়মূল হয়, যে, মানুষ ঘুমের ঘোরে যখন আচ্ছন্ন থাকে, তখন তা'র দেহ ঘরে থাকলেও তা'র কোনও একটি শক্তি যা' বুঝতে ও কাজ করতে পারে সেটি অন্যত্র চলে যেতে পারে, ও যায়; এবং আবার ফিরে আসে। দেহে বাস করে, অথচ দেহ পরিত্যাগ করে' দূরে যেতে পারে, এই যে শক্তি সম্বন্ধে বিশ্বাস এই যুগে বা অবস্থায় জন্মায়, তারই ভিত্তির উপর সভ্য জগতের "আত্মা" বা soul সম্বন্ধে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত।

স্বপ্নের অভিজ্ঞতার চেয়েও আর একটি অভিজ্ঞতা আদিম মানুষকে চিন্তা ও বিচার করতে বাধ্য করেছিল। সে অভিজ্ঞতা মৃত্যু ও তার আনুষঙ্গিক পরিবর্ত্তন। স্বপ্ন ও মৃত্যুর অভিজ্ঞতা হ'তে আদিম মানব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে দেহ হ'তে যে আত্মা নিদ্রার সময় দূরে যেতে পারে, সেই আত্মা অবশেষে দেহ হ'তে যখন সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে যায়, তখনই মরণ ঘটে। এই দেহ হ'তে বিচ্ছিন্ন আত্মাকে আদিম মানুষ অনেক সময়েই ভয় করে; ও ভক্তিও করে। অনেক পূজা ও দেউল এই ভয় ও ভক্তির ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আদিম ও বর্ত্তমান ও সর্ব্ব যুগের মানুষের প্রধান ভয়—এ বিচ্ছিন্ন আত্মাকে নয়; তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে পরিবর্ত্তন,—মৃত্যু—তাকেই। নিজেকে রক্ষা করার সংস্কার মানুষের, ও অন্য জীবেরও, সবচেয়ে প্রবল অন্তর্নিহিত শক্তি। তাই মানুষ মৃত্যু অনিবার্য্য জেনেও, মৃত্যুকে স্বীকার করতে চায় না। আদিম মানুষ আদিম যুগেই তার স্বপ্নের ভিত্তিতে কল্পনা করেছিল যে তার "আত্মা" জীবদ্দশাতেই যেমন অন্যত্র যেয়ে

সাংসারিক কাজে কর্ম্মে লিপ্ত হয়, তেমনই, মৃত্যুর পরও পৃথিবীর মতই অন্য কোনও স্থানে ঐ আত্মা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। সেই অপর লোকই পরলোক। পরলোক ও ইহলোকের সম্পর্ক অনেক আদিম জাতি আরও ভালরূপেই পরিষ্কার ক'রে কল্পনা করে। তারা মনে করে পরলোক হ'তে আত্মা ইহলোকে জন্মলাভ করে; আবার সেইখানেই মৃত্যুর পর ফিরে যায়।

পরবর্ত্তী যুগে ও অন্য অবস্থায় মানুষ সভ্যতার স্তরে অনেক উচ্চে আরোহণ করলেও, পরলোক সম্বন্ধে এ বিশ্বাস মানুষ পরিত্যাগ ক'রতে পারে নাই। মানুষ ব্যক্তিগত জীবনের মরণ সহ্য করতে পারে না; তাই সে দেহতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ও সূক্ষ্ম দর্শনের মতবাদ এ বিষয়ে গ্রহণ করতে পারে না। এই কারণেই সভ্যতার সব স্তরেই মানুষের মনে "আত্মা" সম্বন্ধে এই বিশ্বাস পাওয়া যায়। এ বিষয়ে বিজ্ঞানের বিশেষ সেবাস্থল ও নিরক্ষরতা-দোষমুক্ত পশ্চিম য়ুরোপের লোকের স্পিরিটুয়ালিস্‌ম্ বা ভৌতিক রহস্য চর্চ্চা একটি ভাল রকমের উদাহরণ। আমাদের দেশেও এই ধরণের বিশ্বাস-সম্পন্ন লোক শিক্ষিত সমাজে খুবই বেশী।

মানুষের মনের এ দুর্ব্বলতা আমাদের যোগ-শাস্ত্রকার ভালরূপেই বুঝেছিলেন; ও তাই বলেছেন যে অভিনিবেশ বা মৃত্যুর সংস্কার-গত ভয় দ্বারা তাড়িত হ'য়েই মানুষ জীবনের পথে চলে। ঐ যুগের ভারতীয় ও অল্পকাল পূর্ব্বে পর্য্যন্ত অন্যান্য দেশের দার্শনিক ও মনস্তত্ত্ববিদেরাও (তখন এ দুই বিদ্যা বিচ্ছিন্ন হয় নাই) প্রধানতঃ আদিম মানবের অবলম্বিত প্রণালীরই আশ্রয় গ্রহণ করে মনের বিশ্লেষণ করতেন। অবশ্য আদিম যুগের আত্মবিশ্লেষণ ও ভারতীয় এবং গ্রীক দর্শনের রচয়িতাদের আত্মবিশ্লেষণে প্রভেদ কাহিনী-লেখকের পাতাল ও আকাশের মত। কিন্তু বিরাট পরিমাণে পার্থক্য থাকলেও, পদ্ধতি মূলতঃ এক—ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হ'তে মন সম্বন্ধে বিচার ও সিদ্ধান্ত। এ অভিজ্ঞতা অন্যকে দিয়ে যাচাই করা অসম্ভব; শুধু একের বর্ণনাকে অন্যের বিবরণের সঙ্গে মেলান চলে, এই পর্য্যন্ত। কিন্তু এ যুগের দার্শনিক ও মনস্তত্ত্ববিৎ প্রধানতঃ আত্মদর্শনের উপর নির্ভর করলেও, তাঁরা সম্পূর্ণরূপে এই পদ্ধতির দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিলেন না। মানুষের আচরণ হ'তেও মানুষের মন সম্বন্ধে

তাঁরা অনেক সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়েছিলেন। এই আচরণ পর্য্যবেক্ষণ কেন্দ্র করে বহুপরের বর্ত্তমান যুগে, মন সম্বন্ধে গবেষণার একটি উৎকৃষ্ট পদ্ধতি গ'ড়ে উঠে।

মানুষের মন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার অস্ত্র ও অবস্থা বর্ত্তমান যুগের আরম্ভে কিন্তু এই রকমই ছিল। তারপর এল প্রগতিবাদ; ও তার প্রভাবে অন্য জীবজন্তুর সঙ্গে মানুষের দেহ ও মনের তুলনা; ও সে সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণা। এ যুগে একজন বৈজ্ঞানিক জীবজন্তুর আচরণ লক্ষ্য করে' তাদের মানসিক ক্রিয়া সম্বন্ধে অনেক গবেষণা সুরু করেন। অনেক প্রাণীর বিচিত্র সংস্কারগত কর্ম্মশক্তি লক্ষ্য করে' একদল বৈজ্ঞানিক এই সকল জীবে বুদ্ধিশক্তির অস্তিত্ব অনুমান করেন। কিন্তু "বুদ্ধি" অর্থে চেতনার সাহায্যে বুঝে কাজ করার সামর্থ্য এ সকল প্রাণীদের ক্ষেত্রে অন্য বৈজ্ঞানিকেরা স্বীকার করেন নাই। এই ধরণের মত-ভেদের ফলে নানাস্তরের প্রাণীদের আচরণ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে মৌলিক গবেষণা আরম্ভ হয়। এ কাজ প্রধানতঃ দুই দিক দিয়ে চলে। দেহতত্ত্ববিৎগণ স্তন্যপায়ী জীবের স্নায়ু ও মস্তিষ্কের নানা অংশ বিনষ্ট করার পর তাদের আচরণের পার্থক্য লক্ষ্য করেন ও মানুষের দেহে স্বাভাবিক উপায়ে বা ঘটনাক্রমে ঐ রকম পরিবর্ত্তন ঘটলে, মনের ও ব্যবহারের কি প্রভেদ ঘটে তা'রও কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন। একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক তাঁর নিজের হাতেরই স্নায়ু বিচ্ছিন্ন করে' দেখলেন, ঐ অবস্থায় রুগ্ন দেহের স্নায়বিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সুস্থ দেহের স্নায়বিক পরিবর্ত্তন মেলে কি না। তারপর এল ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধ; এই বিরাট রণক্ষেত্রে শত শত আহত লোকের নানারূপ মগজের আঘাত ও ক্ষত এবং তার ফলে আচরেণর পরিবর্ত্তন হ'তে, বৈজ্ঞানিকরা মগজের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে মনের নানা বৃত্তির সম্পর্ক সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান লাভ করেন। বলা বাহুল্য, এই ধরণের আঘাত ও ক্ষত পরীক্ষামূলকভাবে কোনও গবেষণাগারে করা চলে না।

আর একদল মনস্তত্ত্ববিৎ এই সময়ে মানুষ ও জীবের উপর অন্য ধরণের পরীক্ষা করে চলেছিলেন। তাঁরা বলেন যে আত্মবিশ্লেষণে ব্যক্তিগত ঝোঁক বড় বেশী থাকার সম্ভাবনা। এজন্য প্রধানতঃ আচরণ পর্য্যবেক্ষণ করেই মন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করবার চেষ্টা করা উচিত। এই বৈজ্ঞানিকেরা মানুষ ও জীবের উপর নানারূপ পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। প্রাচীন পদ্ধতিতে শুধু স্বাভাবিক

ব্যবহারের পর্য্যবেক্ষণই প্রধান স্থান গ্রহণ ক'রত। এবার এ প্রণালীর পরিবর্ত্তন করে' পরীক্ষাগারে নানারূপ সঙ্কেতের ব্যবস্থা করা হয়; এবং বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সাড়া কি ও কিরূপ পাওয়া যায় তা'র আলোচনা ক'রে মনের স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হয়। বিশেষ করে আমেরিকায় কয়েকজন বৈজ্ঞানিক মানুষের অল্পাধিক নীচের স্তরের জীবকে পরীক্ষাগারে নানা উপায়ে পরীক্ষা করে' তাদের আচরণের পদ্ধতি হ'তে মনের ক্রিয়া বোঝবার চেষ্টা করেন। এই বিষয়ে বনমানুষ নিয়ে আমেরিকা ও জার্ম্মানী দুই দেশেরই কয়েকজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও মতভেদ নিতান্ত অল্প হয় নাই। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেল এই মতভেদকে উল্লেখ ক'রে পরিহাস ক'রে একস্থলে লিখে গেছেন যে, মার্কিন দেশের জন্তুগুলি পরীক্ষাগারে মার্কিনদেশীয় লোকের মতই উৎসাহ ও উদ্যমের সঙ্গে ঘোরাঘুরি, লাফালাফি ক'রে কার্য্যসিদ্ধি করে; ও জার্ম্মান দেশের প্রাণীগুলি, সেখানকার লোকের মতই ধীর স্থির ভাবে ভেবে চিন্তে কাজ করে। এই ধরণের মতভেদ সম্ভব হ'লেও, এই পরীক্ষাগুলি খুবই মূল্যবান; এবং এর ফলে নিম্নস্তরের নির্ব্বাক জীবের মন সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে।

মানুষের আচরণ দেখে তার মন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করার পদ্ধতির একটি বিশেষ দিক—অসুস্থ বা বিকৃত মনের চর্চ্চা—চিকিৎসক মনস্তত্ত্ববিদের হাতে অসাধারণ উৎকর্ষ লাভ ক'রে, এই বিশেষ বিজ্ঞানের একটি নূতন অধ্যায় সৃজন করেছে। এ বিষয় এতই সুপরিচিত যে বিশেষ কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। প্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিৎ ফ্রয়েড্ যখন মনোবিজ্ঞানের এই বিভাগটি সৃষ্টি ক'রে তার উৎকর্ষ-সাধন করছিলেন, এবং শেরিংটন, হেড্ প্রমুখ দেহতত্ত্ববিৎগণ মগজ ও স্নায়ুর ক্ষত হ'তে মনোবৃত্তির দৈহিক ভিত্তি স্পষ্ট করে তোলবার চেষ্টায় নিরত ছিলেন, তখন রুষদেশের প্রসিদ্ধ দেহতত্ত্ববিৎ পাভ্‌লভ্ মন ও মগজের প্রক্রিয়া নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করবার আর একটি নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

পাভ্‌লভের পদ্ধতি ও তার বৈশিষ্ট্য বুঝতে হ'লে স্নায়বিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে দু'একটি মূলকথা জানা দরকার। জীবদেহে বাহিরের কোনও স্পর্শে সাড়া

দেওয়ার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। কতকগুলি স্পর্শে যে সাড়া পাওয়া যায় সেগুলি জীবের জন্মগত ও স্বাভাবিক; আবার কতকগুলি সাড়া জীবের জন্মের পর অভিজ্ঞতার ফলে আসে। যেমন, শিশু জন্মমাত্র নিঃশ্বাস ফেলে ও মাতৃস্তন হ'তে দুধ চোষে ও পান করে। কিন্তু প্রথমেই শিশু সম্পূর্ণ ঠিকভাবে দুধ চুষে নিয়ে পান করতে পারে না। অল্প কয়েকবারের অভিজ্ঞতার ফলে এ কাজে সে পারদর্শী হ'য়ে উঠে। কুকুরের ছোট বাচ্ছা প্রথমেই মাংসের টুকরা দেখলে খেতে যায় না। কিন্তু তার মুখে সেটি দিলেই স্বভাবতঃ লালা নিঃসৃত হয়; ও সে তৃপ্তির সঙ্গে মাংসখণ্ডটি খায়। তারপর হ'তে মাংসখণ্ড দেখলে, তার মুখে লালা বাহির হয়। সুতরাং দেখা যায় যে জীবের আচরণের মূল ভিত্তি, স্বাভাবিক সংস্কারজাত সাড়া।

অভিজ্ঞতার ফলে এই স্বাভাবিক সাড়ার সঙ্গে অন্যরূপ আচরণ জড়িত হ'য়ে ওঠে। দেহতত্ত্ববিৎগণ স্বাভাবিক সাড়াকে স্বাভাবিক রিফ্লেক্স্ (Natural Reflex); ও নূতন অর্জ্জিত তার সংশ্লিষ্ট সাড়াকে কণ্ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্স্ (Conditioned Reflex) বা "অভ্যস্ত" (অভ্যাস করান) সাড়া বলেন। শেষোক্ত নামটি পাভ্‌লভের দেওয়া।

এই "অভ্যস্ত" সাড়া কি রকম তার দু'একটি সহজ উদাহরণ দেওয়া আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলেছি, যে এক টুকরা মাংস বা খাবার মুখে পড়লে কুকুরছানার মুখে লালা আসে। এটি স্বাভাবিক সাড়া। কিন্তু খাবার দূরে দেখলেই, ক্রমশঃ এই লালা নির্গমন সুরু হয়। এটি স্বাভাবিক নয়; খাওয়ার সঙ্গে, খাওয়ার পূর্ব্বে খাবার দেখা বারবার ঘটার ফলেই এই সাড়াটি গড়ে ওঠে। অতএব এটি অভ্যাসজাত বা অভ্যস্ত সাড়া। খাবার দেখার সঙ্গে খাওয়ার যোগ নিত্য নৈমিত্তিক। সুতরাং এ "অভ্যস্ত" সাড়াটি গ'ড়ে ওঠা খুবই সহজ। কিন্তু খাওয়ার সময় যদি নিয়মিতভাবে কোনও অবান্তর ঘটনা ঘটিয়ে সেদিকে কুকুরটির দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়, তাহ'লে সেটিও এমনইভাবে খাওয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হ'য়ে পড়ে; অর্থাৎ লালা নির্গমন উদ্রেক করে। পাভ্‌লভ্ এইরূপে একটি মেট্রনোম (Metronome) বা তাল দেওয়ার যন্ত্র বিশেষ তালে চালিয়ে ঐ তালের সঙ্গে, বিশেষ পর্দ্দার ধ্বনি বাজিয়ে ঐ ধ্বনির সঙ্গে ও বিশেষ আলোর ঝলক দেখিয়ে ঐ আলোর সঙ্গে কুকুরের মুখে লালা নির্গমনের সম্পর্ক সৃষ্টি করেন। লালা

নিঃসরণ হয় কিনা, ও কি পরিমাণে হয়, তার পর্য্যবেক্ষণের জন্য কুকুরের গালে লালা নিষ্ক্রমণের গ্লাণ্ডটির (Gland) বাহিরের দিকে একটি ছিদ্র করে নল জুড়ে দেওয়া হয়। নলের পথে যে লালা আসে সেটি মেপে নেবার ব্যবস্থা থাকে।

এক একটি বিশেষ অবান্তর খোঁচার সঙ্গে যেমন লালা নিঃসরণের সম্পর্ক সৃষ্টি করা যায়, তেমনই আবার বিশেষ বিশেষ খোঁচাকে এদিক দিয়ে নিঃসাড় করা যায়। অর্থাৎ সে খোঁচার ফলে লালা নির্গমন বন্ধ থাকে। প্রথমে খাবার দেখিয়ে, শেষে সেই খোঁচার বেলা খাবার খেতে না দিয়ে এ অবস্থা সৃষ্টি করা যায়। এইভাবে একটি বিশেষ পর্দ্দার ধ্বনিকে অন্যান্য ধ্বনি হ'তে খুব পরিষ্কার আলাদা করে লালা নির্গমন অর্থাৎ খাওয়ার যে সাড়া, তার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া যায়। মনে করুন, কুকুরটিকে এভাবে কোমল রেখাব ধ্বনিতে "অভ্যস্ত" করা হ'য়েছে। কুকুরটিকে ঘুম পাড়িয়ে তার কানের কাছে কাফি আলাপ হ'তে পারে, বাগেশ্রী আলাপ হ'তে পারে; সে চুপ করে পড়ে থাকবে। কিন্তু পূরবীর কোমল রেখাব শুনলেই কুকুরটি উঠে বসবে; ও তার মুখে লাল ঝরবে !!

এইভাবে নানা রকমের খোঁচা "অভ্যস্ত" ও "নিঃসাড়" করে কুকুরের ও অন্যান্য জীবের মগজের ভিন্ন ভিন্ন অংশের সংশ্লিষ্ট বৃত্তি খুবই নিখুঁত ভাবে পরীক্ষা করা সম্ভব হ'য়েছে। এই সকল পরীক্ষার ফলে মগজ ও মনোবৃত্তি সম্বন্ধে পাভ্‌লভের পূর্ব্ববর্ত্তী ও সমসাময়িক অনেক দেহতত্ত্ববিৎ-এর সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়েছে। উপরন্তু মগজের বিভিন্ন অংশের বিশেষ করে করটেক্সের (cortex) পরস্পর সম্পর্ক ও বৃত্তি সম্বন্ধে জ্ঞান অনেক বিশদ ও পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে।

পাভ্‌লভ্ কিন্তু শুধু এভাবে মনের বিভিন্ন বৃত্তির সঙ্গে মগজের নানা অংশের সম্পর্ক নির্ণয় করেই ক্ষান্ত হ'ন নাই। তিনি পরীক্ষাগারে প্রথমে এই রকম সহজ ও সরল সাড়াগুলি পর্য্যবেক্ষণ ক'রে, পরে জটিল ও পরস্পর বিরোধী সাড়ার সমন্বয়ে জন্তুটির আচরণ কিরূপ দাঁড়ায়, তাই পর্য্যবেক্ষণ করেন।

উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে, ক্ষুধার তাড়না এবং ব্যথার বিরাগ

এই দুই-এর বিরোধে জীব কিভাবে আচরণ করে তার পরীক্ষা করা হ'য়েছে। পরীক্ষার পদ্ধতি এই ধরণের :—একটি কুকুরকে প্রথমে পরীক্ষাগারে একটি বিশেষ আসনে উঠে আধার হ'তে খাওয়া অভ্যাস করান হয় ও তার লালা নির্গমন প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করা হয়। তারপর, এমন ব্যবস্থা করা হয় যে কুকুরটি ঐ আসনে উঠে আহার গ্রহণ করতে গেলেই একটি বৈদ্যুতিক আঘাত পায়। আঘাতটির পরিমাণ এই রকম করা থাকে যে, তার ফলে দেহে মাঝারি গোছ যাতনা হয়, কিন্তু কিছুই জখম হয় না। আঘাত পাওয়া মাত্র কুকুরটি পিছিয়ে আসে; ও তারপর কিছুতেই আসনে উঠে খাবার নিতে চায় না। কয়েকদিন এই রকম বৈদ্যুতিক ধাক্কা খাওয়ার পর কুকুরটিকে পরীক্ষাগারে নিয়ে যাওয়াই শক্ত হ'য়ে ওঠে। অন্য কোনও উপায়ে কুকুরটির খাবার পাওয়া বন্ধ করে দেওয়া হ'ল। ফলে অনাহারে কুকুরটি শীর্ণ হ'য়ে পড়ে; কিন্তু তবুও খেতে যায় না। অবশেষে কিন্তু ক্ষুধারই জয় হয়; বিদ্যুতের ধাক্কার যাতনা সত্ত্বেও কুকুরটি খেতে থাকে; ও তার লালা নির্গমন হয়। ক্রমশঃ এই ধাক্কা ও তার যন্ত্রণা এমনই অভ্যাস হ'য়ে যায়, যে খাবার দেবার আগে বিদ্যুতের স্রোত চালালেই কুকুরটির লালা নির্গমন সুরু হয়, ও কুকুরটি তৃপ্তিসূচক লেজ নাড়ার ভঙ্গী করে। যে অনুভূতি যন্ত্রণাদায়ক; যার প্রতি জীবের তীব্র বিরাগ আছে; সে অনুভূতি অন্য প্রবল তাড়নায় শেষ পর্য্যন্ত কি করে গৃহীত হয়; ও শুধু গৃহীত নয়, প্রীতিদান পর্য্যন্ত করে, এ পরীক্ষা পাভ্‌লভের বিজ্ঞানাগারে এইভাবে দেখা হ'য়েছে। মনের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে এই জাতীয় পরীক্ষা হ'তে অনেক নূতন জ্ঞানলাভ হয়। কথিত আছে যে এই পরীক্ষাটি দেখে বিখ্যাত স্নায়ুতত্ত্ববিৎ শেরিংটন (Sherrington) বলেছিলেন, এবার আমি বুঝতে পারছি কি করে আদিম খ্রীষ্টিয়ানগণ দগ্ধ হওয়ার তীব্র দৈহিক যন্ত্রণাকে আনন্দের সঙ্গে বরণ করতে পেরেছিলেন।

পাভ্‌লভের পরীক্ষাগারে এর চেয়ে অনেক জটিল পরীক্ষা করা হ'য়েছে। দেহের ত্বকে বিভিন্ন অংশবিশেষ খোঁচায় "অভ্যস্ত" ক'রে ও একটি অংশ ঐ খোঁচা সম্বন্ধে নিঃসাড় ক'রে, পরীক্ষা করা হ'য়েছে যে খোঁচার উত্তেজনা বা নিঃসাড় ভাব কিভাবে মগজের কর্টেক্সে পৌঁছে ছড়িয়ে পড়ে। এ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা এ ধরণের প্রবন্ধে সম্ভব নয়। মোটামুটি শুধু বলা যায়

যে খোঁচার তীব্রতা হিসাবে এ বিষয়ে অনেক পার্থক্য ঘটে। মাঝারি খোঁচার ফলে, নিঃসাড়ভাব অনেকটা জলের মৃদু তরঙ্গের মত মগজের কর্টেক্সে ছড়িয়ে পড়ে ও সীমা হ'তে আবার ফিরে এসে কতকটা কেন্দ্রে জড় হয়। এই জাতীয় পরীক্ষা হতে যে জ্ঞান লাভ করা যায় তার সাহায্যে পাভ্লভ্ নিদ্রার প্রকৃতি সম্বন্ধে গবেষণা করেন। পরীক্ষা করে দেখা যায় যে (পাভ্লভের মতে) নিদ্রা মগজের নিঃসাড় ভাবের বিস্তারেরই প্রকাশ। পরীক্ষাগারে নিদ্রার প্রকৃতি সম্বন্ধে আরও অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হ'য়েছে; ও ফলে পরীক্ষিত জীবকে নিদ্রার বিভিন্ন স্তরে রাখবার উপায়ও আবিষ্কৃত হ'য়েছে। এ বিষয়ে এর চেয়ে বেশী সংবাদ জানতে হ'লে পাভ্লভের লেখা কিম্বা তাঁর কর্ম্ম ও জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত পড়া আবশ্যক।*

জীবের মন, মগজ ও আচরণ সম্বন্ধে পাভ্লভ্ ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ আরও অনেক পরীক্ষা করেছেন। জীবের মনোবৃত্তি কিভাবে গড়ে ওঠে ও প্রকাশ পায় এই তথ্য এই সকল পরীক্ষার ফলে আগের চেয়ে অনেক পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে। সব চেয়ে বেশী পরিস্ফুট হ'য়েছে এই কথা যে মনের সকল বৃত্তিই মগজের ও দেহের সঙ্গে জড়িত। পাভ্লভ্ ছিলেন পুরাদস্তুর জড়বাদী বৈজ্ঞানিক। তিনি "চেতনা" (consciousness) এই বাক্যটি দীর্ঘকাল তাঁর পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত হ'তে দেন নাই—পাছে তার ফলে কোনও ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়। সুদীর্ঘ গবেষণাপূর্ণ জীবনের শেষের দিকে পাভ্লভ্ এই বাক্যের ব্যবহার হ'তে দিতে তাঁর আপত্তি প্রত্যাহার করেন। তাঁর মতে, তখন আর এ বিষয়ে ভুলের সম্ভাবনা ছিল না। মানুষের মন সম্বন্ধে পাভ্লভের নিজের মত তাঁর এই ছোট নিয়মটি হ'তে পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে।

এ কথা সত্যই যে বিদেহী মন ও আত্মার অস্তিত্ব নিয়ে তর্ক করা পাভ্লভের পরীক্ষাগুলির পর পূর্ব্বের চেয়ে আরও দুরূহ হ'য়ে উঠেছে। সত্যের এইরূপ প্রকাশে দুঃখের কিছু নাই। কারণ মিথ্যা কল্পনায় বিশ্বাস করে শান্তি লাভের চেষ্টা কাহিনী-কথিত শশকের চক্ষু মুদে আত্মগোপনের প্রয়াসেরই মত।

* Pavlov and His School—Frolov.

তবে এ কথা বলা কর্ত্তব্য যে, এই সকল পরীক্ষার ফলে বিশ্বব্যাপী প্রাণ-শক্তির প্রকাশ ও তার বিচিত্র বিকাশ অস্বীকৃত হয় না। কিন্তু অধ্যাত্ম জগতের স্বরূপ যে জড়বর্জ্জিত নয়; জড়নামে আখ্যাত বস্তুই যে তার আধার ও রূপ বিশেষ; ও এই জড়কে পরিত্যাগ করলে যে কিছুই পাওয়া যাবে না, এ কথা মেনে নেওয়া ভিন্ন গতি নাই। স্বীকার করতেই হবে যে, জড়কে অবিদ্যা বলে পরিত্যাগ করে তার স্থলে শুধু কল্পিত বিদ্যার উপাসনা করলে সত্যই উপনিষৎকার বর্ণিত অন্ধ তমসায় প্রবিষ্ট হ'তে হবে।

শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

নদী ও নারী

জায়গাটা সুন্দর।

রাক্ষসী পদ্মার এমন ছায়ানিবিড় শ্যামল সমতল তটরেখা সহজে চোখে পড়ে না। কথামত তীরের প্রকাণ্ড অশথগাছের গুঁড়ির সঙ্গে লক্ষণ মাঝি নৌকো বেঁধে ফেললে।

নির্ম্মলা যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। কটা দিন একটানা নদীর উপর ভেসে ভেসে অরুচি ধরে গেছে।

বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হেসে লক্ষণ বললে, 'ইচ্ছে হলে দুটো দিন জিরিয়ে নাও মা,—অসুবিধে নেই, এককোশ উত্তরে গঞ্জ আছে, ওই হোথা, ওটার নাম নীলগাঁও।'

তীরে নেমে এদিকে-ওদিকে একটু পাইচারী ক'রে নির্ম্মলা আবার এসে নৌকোয় উঠল। সম্মুখে যতদূর দৃষ্টি যায় নদীর পাড় ধরে মাঠের পর মাঠ। পরিষ্কার স্বচ্ছ শস্পতটের মাঝখান দিয়ে আঁকাবাঁকা সরু পথ গঞ্জে যাবার। এখানে ওখানে দুটি একটি নারকেল গাছ। চারিদিক নিঃঝুম। নির্ম্মলার শাড়ীর খসখস শব্দ ও হাতের চুড়ীর আওয়াজ টের পেয়ে একটা মাছরাঙা 'ক্রিক্' শব্দ করে উড়ে গেল।

নৌকোর গলির উপর বসে হুকো টানছিল লক্ষণ। বললে, 'সইবে না, রাক্কুসী এও একদিন গিলে সাবাড় করে দেবে—'

ছইয়ের ভিতর গুটীসুটী বসে সুরপতি মেঘনাদ বধের পাতা উল্টোচ্ছিল। নদীতীর সম্বন্ধে নির্ম্মলার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা এবং লক্ষণের মুখে পদ্মাগর্ভে এর পরিণতি সম্ভাবনার খেদোক্তি শুনে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল।

জায়গাটা সত্যিই মনোরম।

একদিকে জল একদিকে মাটি।

পরিব্যাপ্ত অগাধ আকাশের তলে অনন্তের স্তিমিত বিধুর সুরটি এসে কানে লাগে।

ঠিক হয়ে গেল, কাল দুপুরের পর দিন ভাল থাকলে সন্ধ্যা নাগাদ নৌকো ছেড়ে দেওয়া হবে।

কিন্তু একটা জিনিষ সকাল থেকে তারা লক্ষ্য করে আসছে। অদূরে কার জানি সাদা রঙের একটা বোট চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। কোন সাড়া-শব্দ নেই। ওটায় মানুষ-জন আছে কিনা তাও বোঝা গেল না। বোটটা দেখতে ভারি সুন্দর।

অনুমান করে সুরপতি বলেছিল, 'সাহেব-সুবা কেউ হবে হয়ত,—হাওয়া খেতে বেরিয়েছে।'

গম্ভীর মুখে লক্ষণ বললে, 'কাশীপুরের কুমার বাহাদুর ইদিকে প্রায়ই চরে শীকার করতে আসেন।'

শুনে নির্ম্মলা ত প্রথমে ভয়েই অস্থির।

তারপর আস্তে আস্তে ভয় কেটে যায়।

সারাদিনের মধ্যে অন্ততঃ একবার হলেও সাহেব অথবা কুমার বাহাদুরের নিশ্চয় দেখা পাওয়া যেত। সুতরাং ঠিক হল—বোটটা অমনি,—ওতে কেউ নেই।

নদীর অপর পারে প্রকাণ্ড চর মরুভূমির মত ধূ ধূ করে। কোথাও যেন শেষ নেই। মাঝে মাঝে এক ফালি জলের রেখা রৌদ্রে চিক চিক করে। কথা হ'ল কাল খুব সকালে নৌকো নিয়ে চরের ওদিকটায় একবার বেড়িয়ে আসা যাবে,—খুব বেশি দূরে নয় যখন।

এক ঝাঁক বালি-হাঁস সোঁ সোঁ শব্দ করে আকাশের অনেক উঁচু দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। ছুটে নৌকোর ছইয়ের বাইরে এসে নির্ম্মলা হাঁ করে তাকিয়ে দেখছিল।

দুপুরবেলা।

খাওয়া দাওয়ার পর সুরপতির আলসেমি এসেছে, একটু তন্দ্রার ভাব।

হাতের মেঘনাদ বধ এক পাশে সরিয়ে রেখে কাৎ হবে এমন সময় নির্ম্মলা ব্যস্ত হয়ে বললে, 'ওগো দেখো।'

'ব্যাপার কি।' সুরপতি উঠে বসল।

নির্ম্মলার চোখে মুখে বিস্ফারিত বিস্ময়।

সুরপতি জিজ্ঞেস করলে, 'কি হয়েছে শুনি।'

—'হবে আবার কি, দেখ না চেয়ে।' ব্যাপারটা কি দেখবার জন্য হাত-পা ঝাড়া দিয়ে উঠে সুরপতি বাইরে যাবার উপক্রম করছিল, হাত ধরে নির্ম্মলা তাকে বসিয়ে দিল।—'এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যায়।'

ছইয়ের গায়ে ছোট-বড় কয়েকটা ছিদ্র ছিল। আঙ্গুল দিয়ে সেই দিকে ইঙ্গিত করে নির্ম্মলা চুপি চুপি বললে,—

'সাদা বোট,—দেখ কাণ্ড।'

বেড়ার গায়ে সুরপতি চোখ রেখে চেয়ে রইল। নির্ম্মলা দেখছিল আর একটা ছিদ্রপথ দিয়ে।

ব্যাপারটা উভয়ের নিকট সত্যি কেমন অদ্ভুত ঠেকছিল।

তেমনি অস্ফুট অনুচ্চ গলায় নির্ম্মলা কতক্ষণ পর প্রশ্ন করলে,—

'কিছু বুঝলে?'

'না—'

'একেবারে ফ্যাশানের ফানুস।'

'তাই ত দেখছি।'

'কতো বয়েস হবে, উনিশ-কুড়ি?'

'ঠিক অনুমান করতে পারছিনে',—স্ত্রীর মুখের দিকে একবার মাত্র তাকিয়ে ফের ছিদ্রপথে চোখ রেখে সুরপতি বললে,

'হ্যাঁ,—তার নীচে নয়, একুশ বাইশও হতে পারে।'

'মেয়ে মানুষ বঁড়্‌শী ফেলে আবার মাছ ধরে নাকি।'

'তাতে আর দোষ কি।'—বললে বটে সুরপতি, কিন্তু তার চোখেও সমস্তটা কেমন বিসদৃশ ঠেকছিল।

'বিয়ে হয়েছে?—না বোধ হয়।' বেড়ার ফাঁক দিয়ে দৃষ্টিটা সূক্ষ্মতর করে চালিয়ে দিয়ে নির্ম্মলা যেন আপন মনেই বললে, 'তা'লে মাথায় কাপড় থাকত।'

সুরপতি চুপ করে ভাবছিলো, সাম্রাজ্ঞীর মত বোটের ছাদ আলো ক'রে ইনি কে। কি তাঁর পরিচয়। অথচ সঙ্গে ভিতরে কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে না। মেয়েটার পরনে ফিকে নীল রঙের সাড়ী,—ঘাড়ের উপর দিয়ে মাথার পিছনে খোলা আঁচলটা বাতাসে নিশানের মত পত্‌পত্‌ করে উড়ছিল। বেঁটে ছাতা বাঁ হাতে, রোদের দিকে তেরছা করে ধরা। বেশবিন্যাসে তিনি যে উগ্র রকমের একজন আধুনিকা সে বিষয়ে সুরপতির সন্দেহ রইল না। সুরপতি চেয়েই আছে।

পিঠে নির্ম্মলা আঙ্গুল দিয়ে খোঁচা দিতে চমকে সোজা হ'য়ে বসল।

'—কানে যায় না কথা, কেমন?' নির্ম্মলার চোখে দুষ্ট হাসি।

'কি বলছ?'

'একেবারে মজে গেলে দেখছি।'

'অ, সে কথা।' সুরপতি হাসল। পরে গম্ভীর হয়ে বললে, 'তা মন্দ কি।'

'মন্দ আমিই বলছি নাকি'—কৃত্রিম অভিমানে নির্ম্মলার মুখ থম্‌ থম্‌ করে ওঠে।

উঠে গিয়ে দড়িতে ঝুলান পাঞ্জাবীর পকেট থেকে সিগ্রেট এনে সুরপতি আবার বেড়ার ধার ঘেঁসে বসল। '—দেখ, ওসব ঢের দেখেছি, যাকে বলে ফাঁপা বেলুন।'

স্বামীর কথায় নির্ম্মলা খিল্‌ খিল্‌ করে হেসে ফেললে।

'সত্যি বলছি, ওদের কেবল ঠাট আর ঠমক।'—সুরপতি সিগ্রেট ধরাল: 'অত বড় ধিঙ্গী মেয়ের আবার বব্‌ড কাটা চুল, যেন কচি খুকী।'

'ঢং আর কি'—নির্ম্মলা বললে,—

'মেয়েমানুষের বেহায়াপনায় চোখ টাটায়।'

এবং এই নিয়ে স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলে প্রসঙ্গটা কথায় কথায় আরো বিস্তৃত ব্যাপক করে তুলল। বস্তুতঃ তারা কেউ আন্দাজ করে ঠিক করতে পারলে না, মেয়েটা কে।

লক্ষ্মণ সেই দুপুরবেলা তীরে উঠে কোন দিকে বেড়াতে বেরিয়েছে।

পাটাতনের উপর পা ছড়িয়ে দিয়ে সুরপতি গা এলিয়ে দিল।

নির্ম্মলা ঠায় বসে আছে।

বেড়ার ছিদ্রপথে একটা চোখ তেমনি ঠেকান। অসীম ধৈর্য্যসহকারে আশ্চর্য্য দ্বীপের মত সেই সাদা বোটের দিকে সে তাকিয়ে দেখছিল। ইতি-মধ্যে দু'বার ছাদ থেকে নেমে গিয়ে বোটের ভিতরে ঢুকে' কি জানি কতক্ষণ টুক্‌টাক্ করে মেয়েটা আবার উঠে এসেছে উপরে।

ক্রমে বেলা পড়ে গেল।

আকাশ ও পদ্মার প্রসারিত বক্ষ ছেয়ে নেমে এল দিনাবসানের নির্ম্মল অবসাদ। পরপারে ধূসর বালির বিছানায় আঁকাবাঁকা জলের রেখা অস্ত-সূর্য্যের আভা লেগে সোনা হয়ে উঠেছে।

একটা কাণ্ড ঘটল।

বোট থেকে নেমে ডাঙ্গায় উঠে মেয়েটা কি নিয়ে জানি একটা লোকের সঙ্গে রীতিমত কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে তুলেছে।

কথাগুলো পরিষ্কার বোঝা না গেলেও মেয়েটার গলার চীৎকার ওখান থেকেও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল। হাত মুখ নেড়ে কখনো হিন্দী, কখনো বাঙ্গালা, কখনো বা মিশ্রভাষার শ্রাদ্ধ ক'রে লোকটাকে পর্য্যুদস্ত করে দিচ্ছে। একটা কথা মুখ তুলে বলবার ফুরসৎ পাচ্ছে না বেচারা। মেয়েটা তুব্‌ড়ী বাজির মত ফেটে পড়ছিল।

সুরপতির মুখের দিকে নির্ম্মলা হাঁ করে তাকিয়ে রইল। তার বুদ্ধিলোপ পেয়ে গেছে।

'কি নিয়ে কিছু বুঝলে?'

'না—'

'একেবারে রণরঙ্গিণী!'

'আচ্ছা দজ্জাল মেয়ে।'

ব্যাপারটা কতদূর গড়ায় দেখবার জন্যে ফের ছইয়ের গর্ত্তে নির্ম্মলা চুপি দেবার চেষ্টা করতেই সুরপতি বললে,

'থাক— ঢের হয়েছে।'

সুরপতির রুচিতে বাধে এ সব। বললে,—'উনি উড়নচণ্ডী দলের একজন, বলিনি? শুধু পথে ঘাটে,—হাটে গঞ্জেও কোমর বেঁধে ওরা বাইরের লোকের সঙ্গে ঝগড়া করতে পারে, আবার মস্করাও জানে।'

কিন্তু ছইয়ের ফাঁক দিয়ে নির্ম্মলা তবু চেয়ে রইল। কৌতূহল দমন করতে পারে না।

কতক্ষণ পর লক্ষণের দেখা পাওয়া গেল। মাঠ ভেঙ্গে ওদিক দিয়েই সে আসছিল। আস্তে আস্তে বোটের সামনে একটু এগিয়ে গিয়ে ব্যাপারটা কি শুনে নিয়ে লক্ষণ নৌকোয় ফিরে আসতেই নির্ম্মলা জিজ্ঞেস করলে,

'কি হয়েছে?'

'সামান্যি একটা ডিম নিয়ে।'

'লোকটা বুঝি ডিমের বেপারি।'

'হ্যাঁ, সকালে দু'গণ্ডা ডিম দিয়ে গেছল, একটা নাকি পচা পড়েছে।'

'একটা,—একটা ডিম পচা পড়েছে বলে এত। অমন গলা শাসানি, চোখ রাঙ্গানি—বলিস কি রে!'

নির্ম্মলার ভ্রূযুগল কপালে উঠে গেছে, বললে সুরপতির দিকে চেয়ে,

'শুনলে,—শুনলে কাণ্ড?'

লক্ষণ বললে, 'একেবারে তিরিক্ষি মেমসায়েবি মেজাজ।'—

'মেজাজ বলে মেজাজ'—নির্ম্মলা হেসে উঠল—'মনে করেছিলুম, কি না জানি রাহাজানি হয়ে গেল।'

'মেজাজ না ছাই'—উপেক্ষায় সুরপতি ঠোঁট উল্টল—'ঐ ত ফড়্‌ফড়ানিটুকু সম্বল, আর আছে লোক দেখান ফুটুনি। বলো না আর আমার কাছে।'

প্রসঙ্গটা তখন সেখানেই চাপা পড়ে গেল।

নৌকোয় আসবার পর থেকে রাতে ভাতের হাঙ্গামা হয় না, রুটি চলে।

আটার ডেলাগুলো থালায় সাজিয়ে রেখে পাটাতনের নীচে থেকে বেলুন আর চাকতি তুলে নিয়ে নির্ম্মলা রুটি গড়তে বসল।

পাশে বসে সুরপতি গল্প করছিল। ওদিকে গলুইয়ের উপর অন্ধকারে চুপচাপ বসে থেকে লক্ষণ মাঝে মাঝে ঝিমোয়, কখনো বা গুন গুন করে গান গায়, হুঁকোয় দম দেয়।

এক একটা দমকা বাতাস এসে নৌকোটা দুলিয়ে দেয়—ছইটা নড়ে ওঠে,

সঙ্গে সঙ্গে বাতিটা কাঁপতে থাকে। তীরে আঘাত লেগে জলের ছলছল শব্দ হচ্ছিল, আর ঝিঁঝি পোকার একঘেয়ে একটানা ডাক। নির্ম্মলার রুটি গড়া প্রায় হয়ে এসেছে, এমন সময় সহসা ওদিকের বোট থেকে নারীকণ্ঠের সঙ্গীত-লহরী আরম্ভ হল।

উৎকর্ণ হয়ে নির্ম্মলা বললে,

'কে গান গায়?'

'আবার কে হবেন, উনিই'—সুরপতি সোজা উত্তর দিলে।

'মেয়েটা!'

'আমার তাই মনে হচ্ছে। নইলে কে আর হবে।'

'এই রাতে, নৌকোয়, নদীর উপর!'—নির্ম্মলার চোখ ছুটো কপালে উঠে গেল—'সাহস ত কম নয়!'

'তুমি গিয়ে মানা করে দাও না,—বলে কিনা কারো মানা ওর শুনতে বয়ে গেছে বড়ো।' সিগ্রেট ধরিয়ে সুরপতি বললে, 'যার যেমন রুচি,—মরুকগে সারারাত চেঁচিয়ে আমাদের কি।'

নির্ম্মলা স্তম্ভিত হয়ে গেল। অজানা অপরিচিত জায়গায় রাতে নৌকোয় বসে গলার কালোয়াতি করে এ কোন জাতের মেয়েমানুষ। তবু যদি ব্রহ্ম সঙ্গীত, শ্যামা সঙ্গীত একটা কিছু হ'ত। একেবারে থিয়েটারী গলা।

সুরপতির কানে কানে বললে,

'আমার কিন্তু মোটেই ভাল ঠেকছে না।'

ইঙ্গিতটা ধরতে পেরেও সুরপতি চুপ করে রইল।

অনেক রাত পর্য্যন্ত শুয়ে শুয়ে নির্ম্মলা ব্যাপারটার একটা হিল্লে করতে পারলে না। গান থেমে গেলেও গানের রেশটা কুৎসিৎ সরীসৃপের মত তার কানের কাছে কিলবিল করছিল।

কথামত পরদিন খুব সকালে লক্ষণ নৌকো ছেড়ে দিল। দূরে ধূসর নীল আকাশের প্রান্তসীমায় জলের ধার ঘেঁসে একটা বড় তারা তখনো দপ্ দপ্ করছে।

লক্ষণ বললে, 'চর দেখে ফিরে আসতে এক পহর বেলা হবে খুব।'

নির্ম্মলা বললে, 'একটু হাত চালিয়ে বৈঠা ফেল বাপু,—ফিরে এসে আবার আমার রান্না-বান্না আছে।'

ছলছল শব্দ করে একটা জেলে ডিঙ্গী পাশ কেটে চলে গেল।

সুরপতি বললে, 'তোমার সব কিছুতেই তাড়া। রান্না-বান্না একদিনের জন্য বন্ধ থাকলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না,—আপাততঃ চরে পৌঁছানো যাক,—কি বলিস লক্ষণ?'

লক্ষণ সে কথার উত্তর দেয়নি। মৃদু হেসে শুধু মাথা নাড়ল। তার বাঁ হাতে হুঁকো। বৈঠাটা রেখে ডান হাতে হালটা তখন সে সজোরে চেপে ধরেছে। জায়গায়টায় একটা পাক আছে।

খানিকক্ষণ পর সুরপতি একদিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, 'ওটা বুঝি লক্ষীপুর-ঝিকড়ছড়া?'

'হ্যাঁ, বদন ফকিরের দরগা ছিল ও-গাঁয়ে, কত রাজ্যের লোক এসেছে ওষুধ নিতে, ফকিরের ওষুধ খেয়ে ব্যামো ভাল হয়ে গেছে।' লক্ষণ পুনরায় হাতে বৈঠা তুলে নিল।

'বদন ফকির অনেক দিন মরে গেছে?'

'কবে!' লক্ষণ মাথা নেড়ে বলল, 'সেই বাইশ বাংলার জলে এক সন্ধ্যার দরগাটা জলের নীচে তলিয়ে গেল আর এক সন্ধ্যায় ফকিরও চোখ বুজল,—একটা গান আছে।'

গুন্ গুন্ করে লক্ষণ বদন ফকিরকে নিয়ে রচিত গানের একটা কলি ভাঁজতে থাকে।

সুরপতি চুপ করে রইল।

গান থামিয়ে লক্ষণও হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল।

ভয়ের কিছু নেই অবশ্য, তবু নৌকোটা তখন নদীর একেবারে মাঝখানে। চতুর্দ্দিকে পদ্মার দিগন্ত-বিস্তৃত বিস্ফারিত জলরাশির কলকল শব্দ। ভয়ে নির্ম্মলার মুখ একেবারে এতটুকু হয়ে গেছে। সুরপতির হাতের মধ্যে নির্ম্মলার একটা হাত। ঢেউয়ের সঙ্গে নৌকো ভীষণ দুলছে, টলছে।

কোন দিকে যেন ষ্টীমারের ক্ষীণ গম্ভীর 'ভোঁ' শোনা গেল।

লক্ষণ বললে, 'গোয়ালন্দর ইষ্টিমার।'

তারপর ভয়টা কেটে গেল।

দেখতে দেখতে মাঝ নদী পার হয়ে নৌকো একদিকে সরে এল।

চোখের সামনে নির্জ্জন, নিঃশব্দ বালুচর। পূব দিকে আকাশের রঙ উঠেছে গোলাপী লাল হয়ে।

তীরের বালি ঘেঁসে লক্ষণ নৌকো এনে দাঁড় করালে।

সুরপতি বললে, 'চল।'

'কোথায়!' নির্ম্মলার চোখ বড়ো হয়ে উঠেছে।

'এই ত চর'—সুরপতি নির্ম্মলার হাতে ধরে উঠে দাঁড়াল—'একটু ঘুরে দেখবে না!'

'তা ত এখান থেকেই দেখা চলে'—ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে নির্ম্মলা তীরের দিকে চেয়ে ঢোক গিলতে লাগল—'নেমে আবার দেখতে হবে নাকি!'

এবার আর সুরপতি হাসি সংবরণ করতে পারলে না—'তাই অত তোড়জোড় করে' চর দেখতে আসা—এস, বাঘ কুমীর এখানে নেই।'

লক্ষণ পূর্ব্বেই বলেছিল চর দূর থেকে দেখতে ভাল। কথাটা সত্য।

বালির উপর দিয়ে হাঁটবার সময় এমন কোন নূতনত্ব চোখে পড়ল না। কেবল এখানে সেখানে সাদা আর কালো মাটির ছোপ। কেমন একটা সোঁদা গন্ধ। আর দেখা গেল রাশি রাশি ঝিনুক, শামুক ইতস্ততঃ ছড়ান।

নির্ম্মলার আঁচল ঝিনুকে ভারী হয়ে উঠল। হেসে সুরপতি বললে, 'তবু দেখছি শেষ পর্য্যন্ত তোমারই লাভ হল।'

কথায় কথায় তারা তখন একটা সরু নালার ধারে এসে গেছে।

মানুষের আওয়াজ পেয়ে ফর্‌ফর্ করে কয়েকটা বন্য হাঁস এদিকে ওদিকে উড়ে গেল। একটা হাঁস নির্ম্মলার কান ঘেঁসে মাথার উপর দিয়ে পার হয়ে গেল।

ঠাট্টা করে' সুরপতি বললে, 'হাত বাড়িয়ে ধরলে না কেন।'

সামনে কি যেন দেখতে পেয়ে নির্ম্মলা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে' সুরপতিও দাঁড়িয়ে পড়ল। লক্ষণ এক পাও এগোচ্ছে না। নালার পাশে বালির ঢিপিটার উপর সকলের দৃষ্টি।

সেই মেয়েটা, হাতে বন্দুক।

চোখাচোখি হতেই বালির ঢিপি থেকে নেমে নিকটে এসে ঘাড় নেড়ে ছোট একটা অভিবাদন জানিয়ে উচ্চকিতে হেসে উঠল: 'আমার শিকার তাড়িয়ে দিলেন, মাত্র নিশানা ঠিক করছিলুম।'

বিমূঢ় সুরপতির মুখ দিয়ে কথা বেরনো দূরে থাকুক প্রতিনমস্কার জানাতে গিয়ে হাত উঠল না। একপাশে দাঁড়িয়ে নির্ম্মলা কেমন হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে।

দীর্ঘছন্দ নিটোল নিভাঁজ গড়ন, কোমরে আঁট করে জড়ানো আঁচলটা, হলদে ছোপ দেওয়া শাড়ীতে মেয়েটাকে দেখাচ্ছিল একটা চিতাবাঘের মতন।

রাইফেলটা বাঁ হাতে এনে ডান হাত দিয়ে কপালের চুল কানের ওপিঠে ঠেলে সরিয়ে দিতে দিতে বললে, 'অবিশ্যি কাল আপনাদের দু'একবার দেখেছি, ওই নৌকো ত, অশথ গাছে বাঁধা ছিল?'

সুরপতি আর নির্ম্মলা তাকিয়েই রইল। চিবুক দুদিকে ঈষৎ চাপা, পুরুষের মতন, একটু ধারালো, শক্ত। বললে, 'আপনারা এই সবে এলেন ত? আমি এসেছি অন্ধকার থাকতে—'

অপরিচয়ের কুণ্ঠা এ মেয়ে জানে না;—কণ্ঠে রূপোলী হাসির বান ডেকে গেল—'এসে অবধি একটা হাঁস ফেলতে পারিনি, আর পারব না আজ, রোদ চড়ে গেল।'

একবার থেমে গম্ভীর হয়ে নদীর দিকে তাকাল, ঘাড়ের রেখায় ফুটে উঠে সতেজ ভঙ্গিমা।

'আচ্ছা, আসি তবে, বেলা হলে বাবু রাগ করবেন।'

চলতে গিয়ে রহস্যময়ী ফিরে দাঁড়াল, বললে সুরপতি আর নির্ম্মলার দিকে চেয়ে—'যাবেন কিন্তু আমার বোটে দয়া ক'রে একটিবার।'

মধ্যাহ্নের আকাশের মতন স্বচ্ছ প্রখর চাউনি। শিস দিতে দিতে বালির উপর দিয়ে তর্‌তর্ করে সে চরের ওদিকটায় নেমে গেল।

ছোট ডিঙ্গী, কেউ নেই সঙ্গে, নিজের হাতে বৈঠা ফেলে দেখতে দেখতে মাঝ নদীতে ভেসে পড়ল।

দেখে নির্ম্মলা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে' উঠল। স্তম্ভিত ভাবটা কেটে গিয়ে সুরপতি ফিরে এসেছে তার সহজ স্বাভাবিকতায়। ঠোঁট উল্টে গলায় অদ্ভুত

একটা সুর করে বললে, 'একেবারে তোয়ের হয়েছেন, অতিরিক্ত নাই পেয়ে যা হয়,—আধুনিক—ছোঃ'—

হো হো শব্দ করে সুরপতি হেসে উঠল—'ঢের দেখেছি, এর এমন লেফাফা-দুরস্ত উগ্র সংস্করণটাই বুঝি এ্যাদ্দিন দেখবার বাকি ছিল।'

কাণ্ডকারখানা দেখে বেচারা লক্ষণ বেকুব হয়ে গেছে।

নৌকোয় করে' ফিরবার পথে নির্ম্মলা ফিস্‌ফিস্ করে বললে, 'বাবুটি কে, বলে যে গেল ও ?'

'হবে আর কি কেউ,—দুয়েক জন ওঁরা সঙ্গে নিয়ে ঘোরাফেরা করেন।' সুরপতির ঠোঁটের ফাঁকে ইঙ্গিতময় গূঢ় হাসি।

নির্ম্মলার মনে পড়ল কাল রাতে গানের কথাটা।

উভয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে' থাকে। লক্ষণ ঝপাঝপ বৈঠা ফেলে। নৌকা চলেছে হেলে-দুলে। পদ্মার বিস্তৃত বক্ষ জুড়ে তরঙ্গে তরঙ্গে চলেছে প্রভাত সূর্য্যের কোটি বন্দনা গান।

একটা চিল সোঁ করে' লক্ষণের মাথা ঘেঁসে একদিকে উড়ে গেল।

সুরপতি বললে, 'আমরা আধুনিক, সুতরাং মেমের মত মেয়েদের চুল রাখব, সিগ্রেট খাওয়াতে শেখাব, তারা ঘোড়ায় চড়বে, রেস খেলবে, পুরুষ বন্ধু নিয়ে হুল্লোড় করবে,—কি কাণ্ড!'

কৌতূহল মানুষের রক্তগত।

বিদ্বেষ বা বিতৃষ্ণা যতই পোষণ করুক, বোটের ভিতর একবার উঁকি না দিয়ে তারা থাকতে পারলে না।

ও পক্ষ থেকে আর কিছু না হোক মৌখিক শিষ্টাচারের অভাব হবে না এ তারা পূর্ব্বাহ্নেই ধরে রেখেছিল।

বাস্তবিক হ'ল তাই, অভ্যর্থনায় অবারিত হয়ে উঠল মেয়েটা।

বোটের ভিতর এসে নির্ম্মলা ও সুরপতি অবাক হয়ে গেল।

ছোটখাট সংসার,—সাজান গোছান, মেয়েটির চোখের তারার মত ভারি উজ্জ্বল ও পরিচ্ছন্ন। দুদিকের জানালায় নীল পর্দ্দা প্রশান্তির নীল অঞ্জনের মত ঘরের আবহাওয়াকে এনেছে নিবিড় করে'।

সুরপতি ও নির্ম্মলাকে পাশাপাশি দুটো চেয়ার দিয়ে মেয়েটা ওদিকে খাটের শিয়রে গিয়ে দাঁড়াল।

পাশ ফিরে ভদ্রলোক শুয়েছিলেন। ঝুঁকে প্রায় তার কানের কাছে মুখ রেখে মেয়েটি জোরে জোরে বলল,'—ওঁরা এসেছেন,—স্বামি-স্ত্রী।'

ভদ্রলোক ধীরে ধীরে এপাশে, সুরপতি ও নির্ম্মলার দিকে মুখ করে ফিরে, শেষে শোয়া থেকে হয়ত উঠবার চেষ্টা করছিলেন, মেয়েটি তাড়াতাড়ি ধরে সাহায্য করলে; পিঠের দিকে একটা বালিস দাঁড় করিয়ে দিলে পর ভদ্রলোক তাতে ঠেস দিয়ে বসে হাঁপাতে লাগলেন।

'অসুস্থ', ইতস্ততঃ করছিল সুরপতি কথাটা জিজ্ঞেস করবার জন্যে, বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল। নির্ম্মলা চমকে উঠল।

লোকটির একটা হাত কাটা, বাঁ পা-টা হাঁটু অবধি এসে থেমে গেছে।

অত্যন্ত অস্পষ্ট, মৃদু কণ্ঠস্বর। বললেন, 'সকাল বেলা নীলিমা আমাকে বলছিল—এসেছেন বড় সুখী হলুম,—পদ্মায় বেড়াচ্ছেন বুঝি ?'

উদাস, নিষ্প্রভ দুটি চক্ষু।

কথার উত্তর দেবার সহজ সৌজন্য সুরপতি ও নির্ম্মলার লোপ পেয়ে গেছে। অসহায় পঙ্গু দেহখানার দিকে তারা তখনও বিমূঢ়ের মত চেয়ে।

খানিকক্ষণ পর সুরপতি প্রশ্ন করলে,—

'কি করে' এমন হ'ল ?'

'একটা ক্রেন্ পড়ে'—' মেয়েটিই উত্তর দিলে—'উনিশ শ' তেত্রিশ ইংরেজী সেটা, আমরা ভিজগাপট্টমে; বিলেত থেকে ফিরে আসবার পর ওঁকে ওখানেই প্রথম চীফ ইঞ্জিনিয়র করে' পাঠানো হয়—'

'আর সেটা আমাদের বিয়ের প্রথম বৎসর—'

উৎকর্ণ হয়েছিলেন, মাঝখানে কথাটা জুড়ে দিয়ে ভদ্রলোক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

সুরপতি এবং নির্ম্মলা আবার সমস্বরে অস্ফুট ধ্বনি করলে।

'হ্যাঁ, তাই বলি, হয়ত আমিই তোমার জীবনে'—শূন্য, স্থির দৃষ্টিতে জানালার দিকে কতক্ষণ চেয়ে থেকে নীলিমা বললে,—'অকল্যাণ এনেছিলাম—'

'ছি'—ব্যস্ত, একটু বা উত্তেজিত হয়ে ভদ্রলোক সামনের দিকে ঝোঁকবার চেষ্টা করতেই নীলিমা তাড়াতাড়ি ধরে ফেলে সান্ত্বনা দিতে লাগল।

'না, তোমার মাঝে মাঝে ও কথাটা আমার কী যে বাজে—'

'আচ্ছা আর বলব না।' গাঢ় গদগদ কণ্ঠস্বর।

'না, আর বলো না।'

'সেই থেকে বুকে একটু দোষ হ'ল। ডাক্তারের আদেশ, গ্রাম, তার চেয়েও ভাল নদীতে, গিয়ে থাকুন। আজ তিন বৎসর নৌকোয় আছি।' কথার শেষে উভয়ের দিকে তাকিয়ে মেয়েটি ক্ষীণ হাসলে।

ওদিক থেকে ক্ষীণ কণ্ঠের উত্তর এল—'পদ্মায় ভেসে বেড়ালেই কি শরীর ভাল থাকে, না কেউ বেঁচে ওঠে? ওর অজস্র প্রাণশক্তি আমাকে ধরে রেখেছে।'

মেয়েটি নিরুত্তর।

সুরপতি ও নির্ম্মলা গভীর নিঃশ্বাস ফেললে।

বিদায় নিয়ে উঠে আসবার সময় বোটের দরজা পর্য্যন্ত মেয়েটি এগিয়ে এল।

'আপনাদের পেয়ে বেশ কাটল সময়টা, উনি যদি দেখতে পেতেন আরো সুখী হতেন।'

'তার অর্থ?' সুরপতি ও নির্ম্মলা তীব্রভাবে চমকে উঠল।

'নার্ভে চোট লেগে ওঁর চোখ দুটো নষ্ট হয়ে গেছে।'

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে নৌকো ছেড়ে দেওয়া হল। ছইয়ের বাইরে দাঁড়িয়ে হাত ধরাধরি করে সুরপতি ও নির্ম্মলা একদৃষ্টে চেয়ে রইল সেই সাদা ধূসর বোটটার দিকে আর কান পেতে রইল। নারীকণ্ঠের অপূর্ব্ব সঙ্গীত-লহরী সেখান থেকে তখন উঠে আসছিল। জীবনের তীরে দাঁড়িয়ে সে মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করছে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

দেশ-বিদেশ

দুর্ব্বল চেকোস্লোভাকিয়ার অঙ্গচ্ছেদ করে' ইয়োরোপে এবারকার মতন শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা হ'ল। বার্লিন্ এবং রোমে এখন আনন্দোচ্ছ্বাস স্বাভাবিক কারণ বিনা যুদ্ধে ফাশিষ্ট্‌দের সকল দাবী চেক্‌দের মেনে নিতে হয়েছে এবং তার প্রধান কারণ চেক্‌রাজ্যের তথাকথিত মিত্র ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের পশ্চাদ্‌গমন। চীন, আবিসিনিয়া, স্পেন এবং অষ্ট্রিয়ার মতন এক্ষেত্রেও শেষ পর্য্যন্ত ফাশিষ্ট্‌দের অগ্রগতির সামনে পথ ছেড়ে দেবার নীতিই অবলম্বিত হ'ল। প্যারিস্ এবং লণ্ডনেও নাকি আসন্ন বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য আনন্দোৎসব হচ্ছে, তবে তার মধ্যে আত্মগ্লানির চিহ্ন একেবারে অনুপস্থিত নয়।

চেম্বারলেন্ ও দালাদিয়ার মন্ত্রিসভার সাম্প্রতিক কীর্ত্তি ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে—ইয়োরোপে শান্তিরক্ষার জন্য নয়, সমগ্র মহাদেশটিকে অন্ততঃ সাময়িক ভাবে ফাশিষ্ট্‌দের কর্ত্তৃত্বের হাতে সমর্পণ করে' দেবার জন্য। একথা বারম্বার বলা প্রয়োজন যে সুদেৎ-প্রদেশ এখন জার্ম্মানিকে ছেড়ে দেবার কথা শুধু একটা সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ প্রশ্ন নয়; এই শক্তিপ্রসার যে-আন্দোলনের অন্তর্গত তার একটা অতীত ইতিহাস আছে এবং তার ভবিষ্যৎ আস্ফালনও জনসাধারণের দিক থেকে বাঞ্ছনীয় হ'তে পারে না। আজকের দিনে জার্ম্মানদের সুদেৎ-অঞ্চল অধিকারকে শত চেষ্টা সত্ত্বেও নাৎসি-অভিযান থেকে পৃথক করে' দেখা সম্ভব নয়। কূটনীতিজ্ঞ চেম্বারলেন্ ও ধার্ম্মিকপ্রবর হ্যালিফ্যাক্সের মুখে আন্তর্জাতিক শান্তিস্থাপনের মহান আদর্শ, ন্যায়ধর্ম্মকে বিজয়ী দেখবার স্পৃহা, এবং অতঃপর ইউরোপে সকল দ্বন্দ্বাবসানের সম্ভাবনা ইত্যাদি নানা স্তোকবাক্য বারবার শুনলেও ভোলা যায় না যে তার আড়ালে ফাশিষ্ট্ প্রকোপ এখন আরও ছড়িয়ে পড়ল। তাতে ক্ষতি কি এ-প্রশ্ন যাঁরা এখনও করেন তাঁদের সঙ্গে অবশ্য তর্ক বৃথা! মুখে যাই বলুন মনে মনে তাঁরা ফাশিষ্ট্-মিত্র, অর্থাৎ তাঁরা সকল প্রকার সমাজসংস্কার এবং কোন স্থায়ী উপায়ে জনসাধারণের অবস্থা উন্নত করবার ঘোর বিরোধী। শ্রেণীবিহীন সমাজগঠনের সকল প্রয়াস সবলে দমন, প্রগতিশীল ব্যক্তি ও মতবাদমাত্রের উৎপীড়ন, শ্রমিকদের শোষণ, দুর্ব্বল সম্প্রদায় ও জাতির

উপর অত্যাচার—এক কথায় ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের সকল অমঙ্গলগুলির প্রসারবৃদ্ধি তাঁদের কাছে তুচ্ছ ব্যাপার। ধনিক ও পার্শ্বচর শ্রেণীদের শ্রেণীগত স্বার্থ বজায় থাকলেই তাঁরা সন্তুষ্ট, মূর্খ জনসাধারণকে নানা উপায়ে বড় কথার মায়ায় ভুলিয়ে রাখাই তাঁদের ব্যবসা।

১৯৩১ থেকে ফাশিষ্ট্‌দের বিজয় অভিযান আরম্ভ হয়েছে, দেশে দেশে তার প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা গত কয়েক বছরের ইতিহাসের প্রধান কথা। এই আন্দোলনকে সমগ্রভাবে না দেখলে কিম্বা এর স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম না করলে ব্যাপকদৃষ্টির অভাব এবং ফাশিষ্ট্‌ আদর্শের সঙ্গে গুপ্ত বা প্রকাশ্য সহানুভূতিই সূচিত হয়। ফাশিষ্ট্‌ মতবাদের প্রধান অঙ্গ যে শ্রমিক দমন ও জনসাধারণের মধ্যে আর্থিক সংস্কারের কামনাকে দাবিয়ে রাখা একথা এতদিনে তর্কাতীত হওয়া উচিত। কাজেই চেকোস্লোভাকিয়ার বিপদকে স্থানীয় সমস্যা বলা চলে না। যুদ্ধান্তের গণতান্ত্রিক জার্মানির উপর ফরাসী ও ইংরাজ শাসকেরা অশেষ উৎপীড়ন করতে ছাড়েন নি, তখন একমাত্র বামপন্থীরাই সে-আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করেছিল। আজকের দিনে যখন নাৎসিরাষ্ট্র দেশে বিদেশে অত্যাচারে উদ্যত তখন হঠাৎ তাকে তুষ্ট করার উদ্যমে লণ্ডনে ও প্যারিসে রেশারেশি লাগবার প্রকৃত অর্থ কি?

এর প্রধান কারণ এ নয় যে দুর্ব্বল জার্মানি আজ আবার পরাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। ইংরাজ ও ফরাসীদের সামরিক শক্তি নিতান্ত সামান্য না এবং সাম্প্রতিক সঙ্কটে সোভিয়েট্‌ রাশিয়ার পূর্ণ সহযোগিতা তাদের দিকে প্রথম থেকে প্রতিশ্রুত ছিল। চেম্বার্‌লেনের সমর্থনে এখন বলা হচ্ছে যে সঙ্কটের সময় হঠাৎ দেখা গেল যে সমরসজ্জা নাকি এখনও সুসম্পন্ন হয়নি তাই পশ্চিম ইয়োরোপের মহাশক্তি দুটিকে অগত্যা মিউনিকের চুক্তি মেনে নিতে হয়েছে। এটা কিছু কৃতিত্বের কথা নয়; কিন্তু বস্তুতঃ এ-যুক্তি অবিশ্বাস্য—এতদিনের আয়োজনের পরও কি গণতান্ত্রিক দেশগুলি জার্মানির তুলনায় এতই দুর্ব্বল? আবিসিনিয়ার বেলায় একা ইটালিকে বাধা দেবার প্রসঙ্গেও ঠিক এই আপত্তি উঠেছিল। ডেমক্রাটিক্‌ দেশগুলির সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি ফাশিষ্ট্‌দের থেকে দুর্ব্বলতর একথা পরীক্ষিত সত্য নয়। স্পেনে ও চীনে অসম্পূর্ণ অস্ত্রসজ্জা নিয়েও জনসাধারণ যে বিস্ময়জনক বীরত্ব মাসের পর মাস দেখিয়েছে, সেই উৎসাহ এক্ষেত্রেও ফাশিষ্ট্‌দের গতিরোধে

ব্যবহার করা যেত। আর্থিক সামর্থ্যের দিক থেকে ইটালি ও জার্মানি দীর্ঘ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত আছে কিনা সন্দেহ। আমেরিকার সহানুভূতি ফাশিষ্ট্‌দের বিপক্ষে। চেকোস্লোভাকিয়ার প্রতি সমবেদনা পৃথিবীর সর্ব্বত্র দেখা গিয়েছিল—ইংরাজদের তীব্র সমালোচক ভারতীয় কংগ্রেস পর্য্যন্ত জনমতের প্রভাবে ফাশিষ্ট্‌দের বিরুদ্ধে যেতে বাধ্য হ'ত। আসলে সমরসজ্জা যথেষ্ট নয়, ফাশিষ্ট্‌দের গতিরোধ করতে হ'লে তাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়সংকল্প চাই এবং যে কারণেই হোক, ইংরাজ ও ফরাসী মন্ত্রীদের মধ্যে তার অভাব দেখা যাচ্ছে।

একথা বলা বৃথা যে জনমতের প্রভাবে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সকে শান্তিপ্রার্থনা করতে হয়েছে, চেকোস্লোভাকিয়ার উপর অত্যাচার সঙ্ঘটিত হ'তে দেবার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে দক্ষিণভাবাপন্ন ফরাসী ও ইংরাজ গভর্ণমেন্টের। চেক্‌দের রক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করতে হ'লে জনসাধারণের পরিপূর্ণ সমর্থন পাওয়া যেত; বাধ্য হয়ে যুদ্ধে প্রবেশ করতে হ'লে, লণ্ডন ও প্যারিসের জনতা তখন নিঃসন্দেহে সামরিক আয়োজনকেই সম্বর্দ্ধনা করে' নিত। হিট্‌লারের আনুগত্যের সংকল্প ডেমক্রাটিক্‌ দেশগুলির জনসাধারণের দিক থেকে আসেনি, তারা যুদ্ধের আনুষঙ্গিক সকল ক্ষতি স্বীকার করে' নিতে প্রস্তুতই হচ্ছিল। সে সংকল্প উঠেছে নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে, তার প্রেরণা শাসকশ্রেণীর স্বার্থসংরক্ষণ মাত্র। আধুনিক যুদ্ধ এতই ভয়াবহ যে স্বভাবতঃই যুদ্ধ সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা ও বিভীষিকা সাধারণ লোকের মনে বিরাজ করে, এবং সেই মনোভাবকেই ইংরাজ ও ফরাসী মন্ত্রীরা নিজেদের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করেছেন। সংগ্রাম ঠেকিয়ে রাখবার মঙ্গলময়তা সম্বন্ধে তাঁদের সমর্থকদের কাছ থেকে আমরা গত কয়েকদিন যত নীতিকথা শুনেছি তা' শোভা পায় শুধু তাঁদেরই মুখে, যাঁরা বস্তুতঃই পরিপূর্ণ শান্তিবাদী। চেম্বারলেন্‌ ও দালাদিয়ার মহাত্মাজি কিম্বা লান্স্‌বেরির শিষ্য হয়েছেন একথা এখনও জানা যায়নি। পক্ষান্তরে শান্তির গুণগান করার পর মুহূর্ত্তেই চেম্বারলেন্‌ অস্ত্রসজ্জা আরও বাড়াবার প্রস্তাব করেছেন। এ অবস্থায় শান্তিবাদের আশ্রয় অসম্ভব বলে' তিনি এই যুক্তি প্রয়োগ করেছেন যে হাতে অস্ত্র থাকলেই শান্তিরক্ষা সহজ হয়। এই উক্তি অসার, কেন না অস্ত্রের ঝঙ্কনা বরং শান্তিভঙ্গেরই সম্ভাবনা বাড়ায়। অবশ্য সম্মিলিত শক্তির সাহায্যে আততায়ীকে আটকানো খুবই সম্ভব; কিন্তু তার জন্য যে সংকল্পের প্রয়োজন

ইংরাজ ও ফরাসী সরকার ক্রমাগত তার সমূহ অভাব দেখিয়েছেন এবং যে প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আত্মরক্ষার এই ব্যবস্থা কার্য্যকরী হ'তে পারত সেই লীগ্‌কে ১৯৩১ এর পর থেকে এঁরাই ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে গিয়েছেন। সুতরাং জিজ্ঞাস্য এই যে শান্তির স্তুতির আড়ালে ইংরাজ ও ফরাসী মন্ত্রী এবং শাসকশ্রেণী কোন্ গূঢ় অভিসন্ধি সিদ্ধির পথে চলেছেন?

রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে কোন প্রশ্নকে তলিয়ে দেখবার অভ্যাস এতই অপ্রচলিত যে এখনও চেম্বার্‌লেন্‌নীতির বহু সমর্থক সগৌরবে বল্‌ছেন যে সুদেৎ-প্রদেশ ন্যায্যতঃ জার্মানির প্রাপ্য বলে' চেকোস্লোভাকিয়াকে এ ক্ষেত্রে সাহায্য করা অন্যায় হ'ত। তাঁরা হয়ত খোঁজই রাখেন না যে সুদেৎ-অঞ্চল কোন কালেই জার্মানির অন্তর্গত ছিল না, মধ্যযুগ থেকে এতদিন পর্য্যন্ত এই জনপদগুলি বোহেমিয়া নামে এক স্বতন্ত্র দেশের অন্তরঙ্গ অংশরূপেই গণ্য হয়ে এসেছে। এখন অবশ্য বোহেমিয়ার সীমান্তে জার্মান্ জনসংখ্যাই বেশী, কিন্তু আত্মকর্ত্তৃত্বের দাবীর একটা স্বাভাবিক সীমা আছে মনে রাখা প্রয়োজন। প্রতি গ্রাম, নগর ও জনপদের যদি আত্ম-কর্ত্তৃত্বের অধিকার গ্রাহ্য হয়, তবে মধ্য-ইয়োরোপের মতন যেখানে নানা জাতির মিশ্র বসতি আছে, সেখানে রাষ্ট্রগঠন অসম্ভব হয়ে পড়ে। বোহেমিয়া দেশের কতকগুলি সুনির্দ্দিষ্ট প্রাকৃতিক সীমা কোন কোন দিকে পাওয়া যায়, সুদেৎ-প্রদেশ সেই সীমার মধ্যে স্থিত। সুদেতীয়দের দাবী যদি ন্যায়সঙ্গত হয়, তবে ভারত-বর্ষের কোন কোন অংশেরও স্বতন্ত্র হয়ে যাবার অধিকার আছে বলা চলে। সিন্ধুপ্রদেশে এক সভায় নাকি ইতিমধ্যেই এ-প্রস্তাব উঠেছে। জার্মান্ বসতি, শুধু বোহেমিয়ায় কেন, ইয়োরোপে আরও বহুদেশে, বিদ্যমান রয়েছে—সে সব জনপদই কি হিট্‌লারের প্রাপ্য? রুমানিয়া, হাঙ্গেরি, ইটালি, সুইট্‌জারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড্, ডেন্‌মার্ক, পোল্যাণ্ড্ এবং বল্‌টিক্ রাজ্যগুলিতে কোন কোন জেলা ঠিক এই যুক্তিতে জার্মান্ অধিকারে আসা উচিত। সে-দাবী স্বীকৃত হ'লে ইয়োরোপে শান্তি কোথায় আর না হ'লে শুধু সুদেৎ প্রসঙ্গে ন্যায়ধর্ম্মের কথা তোলা হয় কেন? চেক্‌রাজ্যের মধ্যে থেকেও জার্মান্ প্রজাদের অটোনমি অথবা স্বায়ত্ত-শাসনের ন্যায্য অধিকার স্বীকার করে' নিতে রাষ্ট্রপতি বেনীশ্ অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিলেন, সুবিচারের পক্ষে এই কি যথেষ্ট ছিল না? আসলে হিট্‌লারের উদ্দেশ্য বিদেশস্থিত জার্মান্‌দের মুক্তিসাধন নয়,—তাঁর প্রকৃত লক্ষ্য ছিল চেক্‌দের

স্বতন্ত্র শক্তির নাশ, সুদেতীয়দের মধ্য থেকে চার লক্ষ নূতন সৈন্য সংগ্রহের বন্দোবস্ত, বোহেমিয়ার আর্থিক সম্পদ করায়ত্ত করে' জার্মান্ ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসার এবং জাতির মুক্তিদাতা হিসাবে প্রোপাগাণ্ডার খোরাক জোগানো। তারপর কথা ওঠে যে আত্মশাসনের অধিকার কি শুধু জার্মান্‌দের ভগবৎ-দত্ত দাবী? তিরিশ লক্ষ জার্মানের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে অন্ততঃ দশলক্ষ চেকের স্বাধীনতা নাশ হ'ল, তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য কি ব্যবস্থা হয়েছে? চেকেরা জার্মান্‌দের থেকে সংখ্যান্যূন বলা হয়, কিন্তু সংখ্যাগণনার আগে গণনাক্ষেত্রের সীমানির্দ্দেশ আবশ্যক—সমগ্র বোহেমিয়ার বদলে সুদেৎ-প্রদেশ কোন হিসাবে সেই ক্ষেত্ররূপে নির্দ্ধারিত হ'ল? সুদেতীয়দের চেক্‌রাজ্যের বাইরে যাবার অধিকার থাকলে পোল্যাণ্ডের রুষ প্রজা এবং ব্রিটেনে আইরিশ্ বা স্কচ্‌দের-ও সে-অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না। আত্মকর্ত্তৃত্বের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন ব্রিটিশ, ফরাসী বা ইটালিয়ান্ সাম্রাজ্যবাদীরা কোন মুখে করেন? সুদেতীয়দের উপর কিছু অত্যাচার হয়ে থাকলেই কি নাৎসিদের সোশ্যালিষ্ট-নির্য্যাতন ও য়িহুদি-উৎপীড়ন ভুলে যেতে হবে? তার উপর যে উপায়ে চেক্‌রাষ্ট্রের অঙ্গচ্ছেদ হ'ল সে-পদ্ধতি কি অত্যন্ত নিন্দনীয় নয়? এর থেকে কি এ-সিদ্ধান্তই মনে আসে না যে যথেষ্ট সামরিক শক্তি থাকলেই দাবী ন্যায্য হয়ে পড়ে? চিরস্থায়ী শান্তির আশা এখন মরীচিকা মাত্র। চেম্বার্‌লেনের শান্তির পরিকল্পনা আক্রান্তকে রক্ষার বদলে আততায়ীর সঙ্গে একজোটে দুর্ব্বলকে বিপন্ন করা। সে-নীতিকে একটা ভদ্র আবরণ দেবার জন্যই সমরসজ্জার অসম্পূর্ণতা, শান্তিরক্ষার উচ্চ আদর্শ, সুদেতীয়দের ন্যায্য দাবী ইত্যাদি নানা বাক্যচ্ছটার আশ্রয় নিতে হয়েছে।

কথায় বলে আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় অপর পক্ষকে আক্রমণ। চেম্বারলেনের সমর্থকেরা তাই বল্‌তে আরম্ভ করেছেন যে, মোটের উপর ডেমক্রাটিক্ দেশগুলিই জিতেছে, হিট্‌লার নাকি এই প্রথম বাধাপ্রাপ্ত হ'লেন। চেম্বারলেন্ স্বয়ং বল্‌ছেন যে প্রকৃতপক্ষে তিনি নাকি চেকোস্লোভাকিয়ার রক্ষাকর্ত্তা, কারণ যুদ্ধ এসে পড়লে বাইরে থেকে সাহায্য পৌঁছবার আগেই নাকি চেক্‌রাষ্ট্র বিধ্বস্ত হয়ে যেত। গত মহাযুদ্ধে বেল্‌জিয়ামের কথাটা চেম্বার্‌লেন্ অবশ্য তাঁর বক্তৃতায় চেপে গেছেন;—প্রথমে বিধ্বস্ত হ'লেও বেল্‌জিয়ামের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় পরে কোন

বাধা হয়নি। তাছাড়া যে-উপায়ে চেকোস্লোভাকিয়াকে প্রথমে খানিকটা সমর্থন করবার পর অকস্মাৎ নির্ম্মম ভাবে পরিত্যাগ করা হয়েছে তার গর্হিত ভঙ্গীটাই সবিশেষ নিন্দনীয়। চেক্ জাতিকে মারাত্মক আঘাতের পর তাদের এই কথা বলে' অপমান না করলেই শোভনীয় হ'ত। চেকোস্লোভাকিয়াকে অন্যদের সুবিধার জন্য বিশাল ক্ষতি স্বীকার করতে হ'ল ; শুধু ভূখণ্ড নয়, তার সঙ্গে খনিজ সম্পদ এবং বহুকষ্টে নির্ম্মিত সীমান্ত-রক্ষার দুর্গগুলি পর্য্যন্ত ছেড়ে দিতে হয়েছে—অথচ তার জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা এখন পর্য্যন্ত হয়ে ওঠেনি।—সঙ্কুচিত চেক্‌রাষ্ট্রের নূতন সীমানা বজায় রাখবার দায়িত্ব নাকি মহাশক্তিরা গ্রহণ করবে—গত কয়েকদিনের ব্যাপারের পর এবং হিট্‌লারের নানা সন্ধি ভঙ্গের নিদর্শন মনে রাখলে, এ-প্রতিশ্রুতি প্রহসন বলে' মনে হয়। চেক্‌রাজ্যকে রক্ষা করা দূরে থাক্, সমস্ত বোহেমিয়া এখন জার্মানির পদানত আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়ে পড়বার পথ পরিষ্কার হয়েছে বলা চলে এবং এর মধ্যেই ঘটনা-স্রোত সেইদিকে মোড় ফিরেছে মনে হয়।—হিট্‌লারকে আটকানো দূরে থাকুক, নাৎসি-প্রভাবের দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইয়োরোপে এর পর দ্রুত প্রসার লাভের সম্ভাবনাই বেশী। ফাশিষ্ট্ অগ্রগতির পথে প্রধান বাধা ছিল রুষদের সঙ্গে ফরাসীদের সখ্য কিন্তু এর পর সে-চুক্তির আর কোন অর্থ থাকল না, সোভিয়েট্ রাশিয়াকে বাধ্য হয়েই হয়ত আত্মরক্ষার নূতন উপায় দেখতে হবে। এক মাসের মধ্যে সমগ্র ইয়োরোপের চেহারা বদলে গেল—এর পরও হিট্‌লার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন বলবার কোন সার্থকতা নেই।—হিট্‌লার নাকি আর কোনও নূতন দাবী করবেন না ; ব্রিটেনের রণসজ্জা কি এখন তাহলে তাঁকে রক্ষা করবার জন্য ? গত সাত বছরের নানা ঘটনার পরও ফাশিষ্ট্‌দের উপর বিশ্বাস রাখা হয় বাতুলতা, নয়ত তাদেরই সঙ্গে সহযোগিতার নামান্তর মাত্র।—সুবিধাবাদীদের পরম যুক্তি এই যে কোনক্রমে যুদ্ধকে ঠেকিয়ে রাখাই পরম লাভ, ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যৎ ভাববে। চেম্বার্‌লেনকে তাই শান্তিরক্ষার জন্য নোবেল্ প্রাইজ্ দেবার কথাও উঠেছে, যদিও মুসোলীনি কিম্বা স্বয়ং হিট্‌লার কেন বাদ পড়বেন বোঝা সহজ না। কিন্তু একে একে মিত্রস্থানীয়দের উচ্ছেদ সাধিত হ'তে দেওয়াই কি সুবিধাবাদের প্রকৃত অর্থ ? হিট্‌লারকে তাঁর দাবী কিছু ছাড়তে হয়েছে, চেম্বার্‌লেনের এযুক্তি শুধু বিদ্রূপেরই উপযুক্ত—কমন্স সভায় এই কথাটি উচ্চ হাস্যের সম্বর্দ্ধনা লাভ করেছিল। দাবী

ছাড়বার পরিমাণ হচ্ছে যে এখন সুদেৎ-অঞ্চল অধিকার সম্পূর্ণ করতে জার্মানদের ১লা অক্টোবরের জায়গায় ১০ই তারিখ হয়ে যাবে।—মিউনিক্ চুক্তির সমর্থনে চেম্বার্‌লেন্ বলেছেন যে এর মূলসূত্র অর্থাৎ সুদেৎপ্রদেশ ছেড়ে দেওয়া আগেই গৃহীত হয়েছিল, কিন্তু হিট্‌লারের কাছে সে-প্রস্তাব আনবার দায়িত্ব ত' চেম্বার্‌লেনেরই, ইংরাজ ও ফরাসী মন্ত্রীরা অর্দ্ধপথে চেক্‌দের পরিত্যাগ না করলে ত' সে-প্রস্তাবের উদয় হ'ত না।

চেম্বার্‌লেন্ ও দালাদিয়ারের অবলম্বিত নীতির স্বপক্ষে প্রচারিত সকল যুক্তিই অবাস্তব প্রতিপন্ন হ'লে প্রশ্ন উঠে যে তাঁদের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ? বামপন্থী লেখকেরা গত কয়েক মাস ধ'রে এর উত্তর দিয়ে এসেছেন, সাম্প্রতিক ঘটনাবলী তাঁদের ব্যাখ্যার যাথার্থ্য অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করল। ইংল্যাণ্ডে কয়েক বৎসর ধরে' এবং ফ্রান্সে পপুলার ফ্রণ্টে ভাঙ্গন ধরবার পর থেকে মন্ত্রীরা প্রচ্ছন্ন ফাশিষ্ট্ হয়ে পড়েছেন, বর্ত্তমান সঙ্কটে তাঁদের স্বরূপ শুধু প্রকাশিত হয়ে পড়ল। প্রতিপত্তি বজায় রাখার জন্য হিট্‌লারকে উগ্রনীতি অবলম্বন করতে হয়েছে, তাঁকে সবলে বাধা দিলে যে-সংগ্রাম উপস্থিত হবে তাতে নাৎসিদের পরাজয় কিছুই বিচিত্র না। তার ফলে জার্মানিতে শ্রমিকবিপ্লব অনিবার্য্যপ্রায় হবে। চেম্বার্‌লেন্ প্রমুখ ফাশিষ্ট্ মিত্রদের আন্তরিক ভয় হ'ল এই সম্ভাবনা। এর নিরাকরণের উপায় ফাশিষ্ট্‌দের সঙ্গে সদ্ভাব, কিন্তু সে-সদ্ভাবের জন্য উপযুক্ত মূল্য দিতে হবে। তাই আবিসিনিয়ার বেলায় ইটালিকে শাস্তি দেওয়া চল্‌ল না, স্পেনে গণতন্ত্রকে বিনষ্ট করবার আয়োজনে বাধা অসম্ভব, চীনকে আত্মরক্ষায় সাহায্য করার উপায় নেই, চেকোস্লোভাকিয়ার পতনকেও মেনে নিতে হবে। মধ্য ইয়োরোপে বল্‌শেভিক্ প্রভাব আটকাতে হ'লে এখন গণতন্ত্র পর্য্যন্ত রাখতে দেওয়া চলে না দেখা যাচ্ছে। সোভিয়েট্ রাশিয়াকে একঘরে অবস্থায় অসহায় করে ফেলার চক্রান্ত কিছুদিন থেকে চল্‌ছে—ভদ্রভাষায় তার নাম হ'ল পশ্চিমের চার মহাশক্তির সখ্যবন্ধন।

বামপন্থার কি তাহলে এতদিনে অবসান হ'ল ? সাময়িক অবসাদ কিম্বা পরাজয়ে এ-আন্দোলনের কোন চিরস্থায়ী ক্ষতি হয় না, প্রায় এক শতাব্দী ধরে' ইতিহাস তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। ধনতন্ত্র নিজের ভারেই ভেঙ্গে পড়ছে, তার লুপ্ত স্বাস্থ্যের সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধার অসম্ভব। ইতিমধ্যেই আবার আমেরিকায় নূতন

আর্থিক সঙ্কটের আভাস দেখা গেছে শোনা যাচ্ছে। সাম্রাজ্যতন্ত্রের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব বরাবর চেপে রাখবার উপায় নেই, নূতন নূতন দিকে তা' ফুটে বের হতে বাধ্য। শত ইচ্ছা সত্ত্বেও সে-বিরোধকে অপসারিত করে' সাম্রাজ্যতন্ত্রের আওতায় স্থায়ী সহযোগ স্থাপিত হবে না। বামপন্থার প্রাণস্বরূপ মার্ক্সবাদের বৈশিষ্ট্য এই যে শ্রমিকশ্রেণী থাকলে এ মতবাদ লোপ পেতে পারে না, কাজেই তার জীবনীশক্তি নষ্ট করা অসম্ভবপ্রায়। লেনিন্ একবার বলেছিলেন যে দশবিশ বৎসর সাম্যবাদীদের কাছে কিছুই নয়। ইউনাইটেড্ ফ্রন্টের আদর্শ একেবারে ব্যর্থ হয়েছে বলা চলে না, স্পেনে ও চীনে তার সাফল্য সুস্পষ্ট, ইংরাজ ও ফরাসী মন্ত্রীরাও হিট্‌লারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে প্রায় বাধ্য হয়েছিলেন। নূতন কোন নীতি অবলম্বিত হ'লেও মূল লক্ষ্য অবিচলিত থাকবে—দেশে দেশে ফাশিষ্ট্ ভাবাপন্ন শাসকদের বিরুদ্ধাচরণ এবং সকল শত্রুর হাত থেকে সোভিয়েট্ রাশিয়ার রক্ষণাবেক্ষণের চেষ্টা। সংগ্রাম চল্‌বেই, বামপন্থার আংশিক পরাজয়ে তার বিরাম হবে না।

* * * *

ইয়োরোপে সঙ্কটাবসানের খবরে কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষেরা আনন্দ প্রকাশ করেছেন শোনা যায়। ভারতবর্ষের মুক্তিসংগ্রামকে কংগ্রেসী নেতারা বরাবরই সংকীর্ণ ক্ষেত্রে নামিয়ে সারা জগৎ থেকে পৃথক রাখবার চেষ্টা করেছেন, চেক্‌রাজ্যের বিপদের মতন সমস্যা সেই চিরাভ্যস্ত ধারণাকে জটিল করে' তোলে, সুতরাং কোনপ্রকারে সমস্যার সমাধান হ'লেই তাঁদের মানসিক শান্তি ফিরে আসে। তবে এক হিসাবে ইয়োরোপে যুদ্ধ থেকে সাময়িক নিবৃত্তি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিক পরিস্থিতি সরলতর করবে, দক্ষিণ ও বামের সঙ্ঘাতের থেকে আপাততঃ আন্তর্জাতিক সঙ্কটের ছায়া অপসারিত হ'ল।

দিল্লীতে নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে পুরাতন নেতৃত্বের আধিপত্যই বজায় রইল; কিন্তু দেশের মধ্যে বামপন্থার প্রসার হচ্ছে একথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করবেন। কংগ্রেসের মধ্যে বামমার্গীয় নীতির লক্ষ্য এখন সুস্পষ্টভাবেই নির্দ্ধারিত হয়েছে—একদিকে নেতৃমণ্ডলীর উপর চাপ দিতে হবে যাতে কংগ্রেসের পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতিগুলি রক্ষিত হয়, অন্যদিকে শ্রমিক ও কৃষকদের

সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে কংগ্রেসকে প্রভাবান্বিত এবং শক্তিশালী ক'রে তুলতে হবে। ফেডারেশনের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রামে জনসাধারণের উদ্বোধন, দেশের ভবিষ্যৎ শাসনপদ্ধতি নির্দ্ধারণের জন্য মহাপরিষদ আহ্বানের ধারণা প্রচার, শ্রমিক ও কৃষকদের প্রাধান্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে কংগ্রেসকে বস্তুতঃই জনসাধারণের প্রতিষ্ঠানের পর্য্যায়ে আনয়ন,—বামপন্থীদের কর্ম্মপদ্ধতি এইভাবে রূপ নিচ্ছে। এর সাধারণ নাম ইউনাইটেড্ ন্যাশনাল ফ্রন্ট আখ্যা লাভ করেছে। সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃত্বকে এখন এ পথে চালিত করাই উপস্থিত কর্ত্তব্য।

সাময়িক কার্য্যপদ্ধতি অথবা ট্যাক্‌টিক্স কিন্তু দৃঢ় মতবাদ বা থিওরির অভাবে অনেক সময় সাফল্য থেকে বঞ্চিত হয়। ইয়োরোপে সোশ্যালিষ্ট আন্দোলনের ইতিহাসে পাতায় পাতায় এর উদাহরণ ছড়ানো আছে। কংগ্রেসের সঙ্গে বামপন্থীদের বর্ত্তমান সংযোগ নির্ভর করছে সাম্যবাদের এক সুবিখ্যাত সূত্রের উপর—যেখানেই জনসাধারণকে পাওয়া যায় সেখানেই সাম্যবাদীদের কর্ম্মক্ষেত্র। ইউনাইটেড্ ন্যাশনাল ফ্রন্টের কর্ম্মপ্রণালী ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মিলন; কিন্তু সেই সঙ্গে থিওরির প্রসার ও প্রচার উপেক্ষা করা অনুচিত। এখানে আপোষে নিষ্পত্তি চলে না, চল্‌লে সুবিধাবাদ (opportunism) বামপন্থাকে গ্রাস করে ফেল্‌বে।

কংগ্রেসকে কার্য্যতঃ সাম্রাজ্যতন্ত্রের ঘোর বিরোধী জনসমূহের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে চাইলে থিওরির রাজ্যে বামপন্থার প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী হবে মহাত্মাজির মতবাদ। সে-মতবাদকে মেনে নেওয়া বামমার্গীয়দের পক্ষে অসম্ভব। সম্প্রতি বিদেশের প্রবল সমস্যাগুলির সম্বন্ধেও গান্ধিজি তাঁর সুবিদিত পন্থা প্রযুজ্য বলে' দাবী করেছেন; স্পেনীয়, চীন ও চেক্ জাতিকে তিনি সত্যাগ্রহ অবলম্বনের উপদেশ দিয়েছেন। এসব ক্ষেত্রে গান্ধির নীতি ফাশিষ্ট্‌দের কাছে আত্মসমর্পণের নামান্তর নয় কি? ফাশিষ্ট্‌দের আটকাবার কাজে সত্যাগ্রহ সফল হবার সম্ভাবনা কতটুকু? পরিণামে চেম্বার্‌লেনের কূটনীতি এবং গান্ধির নৈতিক শক্তি একই ফল আন্‌বে না কি? ভারতীয় কংগ্রেসের আংশিক সাফল্য কতখানি সত্যাগ্রহের প্রভাব ও কতখানি জনসাধারণের জাগরণের ফল সেকথাও বিবেচ্য। মনে রাখতে হবে যে গান্ধিবাদে সত্যাগ্রহ জনগণকে উদ্বুদ্ধ করবার সাময়িক অস্ত্র

নয়, এছাড়া অন্য কোন উপায় মহাত্মাজি বৈধ বলে'ই স্বীকার করবেন না। এটাও লক্ষ্য করা উচিত যে এই অহিংসনীতির অজস্র স্তুতিবাদ সত্ত্বেও কংগ্রেস কর্তৃক বিরোধীদলকে দমন চেষ্টা গান্ধিজি নিন্দনীয় মনে করেন নি। গান্ধিবাদের সত্যনিষ্ঠা এতই প্রবল যে একদিকে শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্ঘ ভঙ্গ ক'রে তাদের নিরস্ত্র করা এবং অন্যদিকে কারখানার মালিক, ভূস্বামী ও দেশী রাজন্যবর্গের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা এর কাছে অন্যায় মনে হয় না। কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থার প্রসার লক্ষ্য করে'ই বোধ হয় হরিজন পত্রিকায় মহাত্মা গান্ধী ৩রা সেপ্টেম্বর এক বিবৃতি প্রকাশ করেন। তাতে তিনি তাঁর নীতিবাদে অবিশ্বাসী লোকদের কংগ্রেস ত্যাগ করতে বলেছেন, নয়ত তাঁর অনুচরদের শেষ পর্য্যন্ত কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসতে হ'তে পারে। এর প্রকৃত উত্তর এই যে কংগ্রেস যে-কোন নেতার চাইতে বৃহত্তর। তাকে একটা ধর্ম্মসমিতিতে পরিণত করার চেষ্টা ব্যর্থ হ'তে বাধ্য। পক্ষান্তরে কংগ্রেস-ত্যাগের সংকল্প কার্য্যে পরিণত হ'লে সে-জাতীয় উদ্যম আন্দোলনকে দুর্ব্বল ক'রে ফেলবার উপায় রূপেই গণ্য হবে। এ জাতীয় মতবাদের সঙ্গে বামপন্থার আমূল পার্থক্য। উভয়ের মধ্যে আপোষে নিষ্পত্তির কোন উপায় নেই একথা দৃঢ়ভাবে বলবার সময় এসেছে।

শ্রীবিজন রায়

ভারতপথে*

(১৯)

"আজিজ, এই পিকনিকে কত খরচ পড়বে ভেবে দেখেছ ?"

"ওসব কথা কেন ? বিস্তর টাকা। হিসাবটা পুরোপুরি হ'লে একেবারে সর্ব্বনেশে ব্যাপার দাঁড়াবে। আমার বন্ধুটির ভৃত্যবর্গ একেবারে দুহাতে লুটেছে—আর ঐ হাতী—মনে তো হয় একেবারে সোনা গেলে। বিশ্বাস ক'রে বললাম, আশা করি কাউকে এসব কথা বলবে না। আর 'এম-এল'—পুরো নামটা নাই করলে, কান খাড়া ক'রেই আছে—হোলো সব চেয়ে ওস্তাদ।"

"আমি তো বলেইছিলাম লোকটা বাজে মার্কা।"

"বাজে নিজের বেলায় মোটেই নয় ; লোকটা চুরি ক'রে আমায় ডোবাবে।"

"সত্যি, আজিজ, কি ভীষণ।"

"যাই বলো আমি খুব খুসী ওকে পেয়ে, আমার অতিথিদের খুব আদর যত্ন করেছে। তার ওপর আমার সম্পর্কে ভাই, সুতরাং আমার কর্ত্তব্যই ওকে কাজ দেওয়া। টাকা যায়, টাকা আসে। আর টাকা থাকলে—মৃত্যু। এই সুন্দর উর্দ্দু প্রবাদ কখনো শুনেছ ? সম্ভব নয়, কেন না এইমাত্র আমি এটি বানালাম।"

"আমার পছন্দমত প্রবাদ সব কি জানো ? 'এক পয়সা বাঁচানো মানে এক পয়সা রোজগার করা', 'সময়মত ব্যয় করলে পরে অপব্যয় হয় না', 'যা করো, চোখ খুলে কোরো'—এই সব প্রবাদই হোলো ব্রিটিশ রাজত্বের ভিত্তি। ঐ 'এম-এল'-এর মতন লোকদের যতদিন না তাড়াও ততদিন আমাদের তাড়ানোর আশা ছাড়তে হবে।"

---

* E. M. FORSTER-এর বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস A PASSAGE TO INDIA আদ্যন্ত সমান উপাদেয় হইলেও আকারে এত বড় যে সম্পূর্ণ বইখানির তর্জ্জমা ধারাবাহিক ভাবেও প্রকাশযোগ্য নহে। সেইজন্য অগত্যা আমরা আখ্যায়িকার সারটুকুই নিয়মিতরূপে মুদ্রিত করিব। কিন্তু হিরণকুমার সান্যাল মহাশয় সমগ্র গ্রন্থখানিই ভাষান্তরিত করিতেছেন এবং নির্ব্বাচিত অংশের প্রকাশ 'পরিচয়ে' সমাপ্ত হইলেই তাঁহার সম্পূর্ণ অনুবাদ পুস্তকাকারে বাহির হইবে।—পঃ সঃ

"আহা, তাড়াবার কথা কেন? এ সব নোঙরামি ঐ চাণক্য-পন্থীদেরই সাজে, আমার তা নিয়ে মাথা ঘামবার দরকার কি? ছাত্রাবস্থায় অবশ্য তোমার দেশের হতচ্ছাড়া লোকগুলো সম্বন্ধে একেবারে গরম হ'য়ে উঠতাম। কিন্তু যদি আমার নেশায় তাঁরা বাধা না দেন, আর বড় কর্ত্তারা কথায় কথায় চোখ না রাঙান, বাস্—আর কিছু চাই না ”

"চাও বই কি—তাদের নিয়ে বনভোজনে যাও।"

"বনভোজনে আবার ইংরেজ বা ভারতবাসী কি? এ হোলো কয় বন্ধু মিলে একটু উৎসব।"

এই ভাবে অভিযানের শেষ হোলো, খানিকটা তার প্রীতিকর, খানিকটা নয়। পথ থেকে ব্রাহ্মণ পাচককে আবার তুলে নেওয়া হোলো। আগুন-ভরা গলা বাড়িয়ে খোলা মাঠের উপর দিয়ে এল ট্রেন, ষোড়শ শতাব্দীর ভার বিংশশতাব্দী করল গ্রহণ। মিসেস মূর গিয়ে উঠলেন তাঁর গাড়িতে। পুরুষ তিনজন তাদের কামরায় ঢুকে, খড়খড়ি বন্ধ ক'রে পাখা খুলে ঘুমোবার চেষ্টায় মনোনিবেশ করল। আলোছায়ার অস্পষ্টতায় মনে হচ্ছিল যেন এরা সব মরা মানুষ—এমন কি ট্রেনটা যদিও সচল তবু যেন প্রাণহীন একটা কফিন—তার কাজ বিজ্ঞানের আলয় উত্তর থেকে দিনে চারবার ক'রে এসে চারপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্যকে ক্ষুব্ধ করা। মারাবার ছাড়িয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে এই বিশ্রী জগৎটাও পেল লোপ, তার বদলে দেখা দিল দূরের মারাবার, নির্দ্দিষ্ট তার সীমা, রোমান্টিক তার রূপ। কয়লার গাদা জলে ভিজিয়ে নেবার জন্যে ট্রেনটা একবার একটা পাম্পের তলায় গিয়ে দাঁড়াতে তার চোখে পড়ল দূরে মেন লাইন। অমনি তার সাহসের সঞ্চার হোলো, আর একেবারে উদ্দাম গতিতে, সিভিল ষ্টেশনকে প্রদক্ষিণ করে, রোদে তাতা লেভেল ক্রসিং বেয়ে' উঠে খটাং খটাং ক'রে তা এসে দাঁড়াল গন্তব্য স্থানে। চন্দ্রপুর! চন্দ্রপুর! অভিযানের এই শেষ।

আর তারই সঙ্গে, সেই অন্ধকার গাড়ির মধ্যে উঠে ব'সে আবার বাস্তব জীবনে ফিরে আসার জন্যে তারা যেই প্রস্তুত হোলো, অমনি সেই দীর্ঘ সকালবেলার মোহ একেবারে নিমেষে গেল ভেঙে। পুলিশের দারোগা হক্ সাহেব, গাড়ির দরজা ঝনাৎ ক'রে খুলে কর্কশ গলায় ব'লে উঠলেন, "ডাক্তার

আজিজ, অত্যন্ত অপ্রীতিকর একটি কাজের ভার আমার উপর পড়েছে, আপনাকে গ্রেপ্তার করা।"

ফিলডিং অমনি সব ভার নিজের হাতে নিয়ে বললেন, "সে কি? একটা কিছু ভুল নিশ্চয় হয়েছে?"

"মশায়, আমি শুধু আদেশ পালন করছি, আর কিছুই আমি জানি না।"

"কি অভিযোগে ওঁকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে?"

"আমার উপর হুকুম আছে এ সম্বন্ধে কিছু না বলতে।"

"ও ভাবে কথা বলবেন না—ওয়ারেণ্ট কই, বের করুন।"

"মশায়, মাপ করবেন, এ ক্ষেত্রে ওয়ারেণ্টের দরকার নেই, ম্যাকব্রাইড্ সাহেবকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখুন।"

"বেশ, তাই করব। ওহে আজিজ ছোকরা, চলে এস, এমন কিছু হৈ চৈ করার মতন ব্যাপার ঘটেনি, একটা কোনো ভুলচুক হয়ে থাকবে।"

"ডাক্তার আজিজ, অনুগ্রহ ক'রে আসবেন কি? একটা বন্ধ গাড়ি আপনার জন্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

আজিজ এতক্ষণে সাড়া দিল—ফুঁপিয়ে কেঁদে, তারপর চেষ্টা করল গাড়ির উল্‌টো দিকের দরজা দিয়ে পালিয়ে ও দিকের লাইনের উপর গিয়ে পড়তে।

হক্ কাতরভাবে বললেন, "দেখুন, ওরকম করলে আমাকে বাধ্য হ'য়ে বলপ্রয়োগ করতে হবে।"

"দোহাই তোমার"—বলে কিছু কেলেঙ্কারি ঘটবার আগেই ফিলডিং তাকে জোর করে টেনে ধরে প্রচণ্ড এক নাড়া দিলেন—যেন সে একটা শিশু। এই বিশ্রী ব্যাপারে ভদ্রলোকের নিজের মনের অবস্থাও হয়েছিল শোচনীয়। আর এক মুহূর্ত্ত দেরি করলেই, আজিজ পড়ত বেরিয়ে, তারপর পুলিশের বাঁশি বেজে উঠত, আর রীতিমত একটা চোর-ডাকাত ধরার ব্যাপার সুরু হোতো। "ওহে ছোকরা, শোনো, দুজনে মিলে চল ম্যাকব্রাইডের কাছে গিয়ে শুনি কি ব্যাপার ঘটেছে। লোকটি ভদ্র, নিশ্চয় ইচ্ছে ক'রে এ সব করেননি, এর জন্যে মাপ চাইবেন। যাহোক, কখনো সত্যিকারের চোর-ডাকাতের মতন ভাব কোরো না।"

বেচারি আজিজ, তার ডানা গিয়েছিল একেবারে ভেঙ্গে, কাতর কণ্ঠে

সে বলল, "ছেলেপিলেদের দশা কি হবে? আর আমার নামে এ কি দারুণ কলঙ্ক?"

"কিচ্ছু হবে না। টুপিটা সোজা ক'রে প'রে আমার হাত ধরো। আমি সব ঠিক করে দেব।"

দারোগা স্বস্তির স্বরে বললেন, "যাক বাঁচা গেল, ও নিজে হতেই আসছে।"

হাত ধরাধরি ক'রে দুজনে গাড়ির কামরা থেকে বের হলেন দ্বিপ্রহরের গরমের মধ্যে। ষ্টেশন লোকে লোকারণ্য। প্রতি রন্ধ্র থেকে যাত্রী আর কুলির দল ঠেলে বেরোচ্ছে, বহু সরকারি কর্ম্মচারী, পুলিশের আরও সব লোক। রনি এসে মিসেস্ মূরকে আগলে নিয়ে চলল। মহম্মদ লতিফ সুরু করল চেঁচিয়ে বিলাপ। এই গোলমাল আর ভিড় ঠেলে বেরোবার আগেই টার্টন সাহেব জবরদস্ত গলায় ফিলডিংকে ডেকে নিলেন, আজিজ গেল হাজতে—একলা।

(২০)

ওয়েটিং রুমের ভিতর থেকে কালেক্‌টার সাহেব আজিজকে গ্রেপ্তার করা লক্ষ্য করেছিলেন, অতঃপর জালের দরজা ঠেলে তিনি প্রকট হলেন—মন্দিরাভ্যন্তরস্থ বিগ্রহের মতন। ফিলডিং প্রবেশ করা মাত্র ঝনাৎ ক'রে আবার দরজা বন্ধ হল, আর একটি চাকর তা আগলে রইল, আর ঘটনাটি যে নিতান্ত তুচ্ছ নয় তা প্রমাণ করার জন্যে মাথায় উপরকার টানা পাখার নোংরা ফালিগুলো পত পত করতে সুরু করল।

কালেক্‌টার তো প্রথমে কথাই বলতে পারেন না। তাঁর মুখের রং হয়েছিল একেবারে ফ্যাকাশে, ভাবে ছিল চরম উত্তেজনার ছাপ, দেখাচ্ছিল কিন্তু বেশ সুন্দর। এই ঘটনার পর চন্দ্রপুরের ইংরেজদের মুখের ভাব এই রকম ছিল বহুদিন। নির্ভীক ও নিঃস্বার্থ তিনি ছিলেন চিরদিনই, তার উপর প্রচণ্ড উত্তাপের বশে তাঁর মন হয়েছিল অসম্ভব সংহত, প্রয়োজন বোধ করলে তিনি নিজের প্রাণ সংহার করতে এখন কুণ্ঠিত হতেন না। অবশেষে তাঁর মুখে কথা ফুটল। "মারাবারের একটি গুহার মধ্যে মিস্ কেষ্টেড্ বে-ইজ্জত হ'য়েছেন।"

ফিলডিং-এর কেমন যেন গা ঘিন ঘিন ক'রে উঠল। রুদ্ধস্বরে তিনি জবাব দিলেন, "না, না, মোটেই না।"

"ঈশ্বরের কৃপায় তিনি পালিয়ে বেঁচেছেন।"

"না, না—আজিজ কিন্তু নয়, আজিজ নয়···

টার্টান ঘাড় নাড়লেন।

"অসম্ভব, সেরেফ আজগুবি।"

তাঁর প্রতিবাদ একেবারে অগ্রাহ্য করে, বোধ হয় ওঁর কানেই তা ঢোকেনি, টার্টন বললেন, "ওর সঙ্গে থানায় গেলে আপনার নামে কলঙ্ক রটবে, তার থেকে বাঁচানোর জন্যেই আপনাকে এখানে ডেকে পাঠিয়েছি।"

বোকার মতন ফিলডিং শুধু বললেন, "না, না"। আর কোনো কথাই তাঁর মুখে আসছিল না। তাঁর মনে হচ্ছিল যেন মাটি থেকে এক রাশ পাগলামি একেবারে ঠেলে সকলকে পিষে মারার চেষ্টা করছিল। তাকে আবার মাটির ভিতর কোনো রকমে ঠেলে ঢুকিয়ে দিতেই হবে; কিন্তু কি ক'রে তা তাঁর জানা নাই, কেননা পাগলামি ফাগলামি তিনি কিছু বুঝতেন না; সোজাসুজি গণ্ডগোল না ক'রে চলাই ছিল তাঁর অভ্যাস, গোলমাল কিছু ঘটলে আপনিই তা সিধে হ'য়ে যেত। প্রকৃতিস্থ হ'য়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "এই কুৎসিৎ অভিযোগ করেছে কে?"

"মিস ডেরেক এবং—ভুক্তভোগী স্বয়ং···" বল্‌তে বল্‌তে তিনি এত অভিভূত হ'য়ে পড়লেন যে মেয়েটির নাম উচ্চারণ করতে পারলেন না।

"মিস কেষ্টেড স্বয়ং অভিযোগ করছেন যে···"

ঘাড় নেড়ে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

"তা হলে তিনি পাগল হয়েছেন।"

"এ কথা কিছুতেই আমি বরদাস্ত করতে পারি না।" এতক্ষণে কালেক্টার সাহেবের খেয়াল হোলো যে ফিলডিং তাঁর কথায় সায় দিচ্ছেন না। রাগে তাঁর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল। "এক্ষণি এ কথা ফিরিয়ে নিন, চন্দ্রপুরে আসা অবধি আপনি ক্রমাগত এই ধরণের সব মন্তব্য করেছেন।"

"আমি অত্যন্ত দুঃখিত; আমি আমার কথা সম্পূর্ণ ফিরিয়ে নিচ্ছি।" ফিলডিং নিজেও প্রায় পাগলের মতন হয়ে গিয়েছিলেন।

"আচ্ছা, মিষ্টার ফিলডিং, আমার সঙ্গে ও-ভাবে কথা বল্‌লেন কেন বলুন তো?"

"আমাকে মাপ করবেন, খবরটা শুনে একেবারে দমে গিছলাম ; আজিজ যে সত্যি কিছু করেছে আমার বিশ্বাস হয় না।"

টেবিলের উপর হাত চাপড়ে কালেক্টার সাহেব বল্‌লেন, "আপনি আবার—এবং আরো বেশী—অপমানজনক কথা বল্‌ছেন মনে রাখবেন।"

ফিলডিংএর মুখও বিবর্ণ হ'য়ে গেল কিন্তু তবু তিনি কথা ফিরিয়ে নিলেন না। "যদি অনুমতি দেন তো বলি, তা নয়। ঐ মহিলা দুটির সত্যবাদিতা সম্বন্ধে আমি কোনো মন্তব্যই করছি না। কিন্তু আজিজের নামে যে অভিযোগ তাঁরা আনছেন আমার মনে হয় তার মূলে একটা ভুল আছে আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তা পরিষ্কার হয়ে যেতে পারে। লোকটির ধরণধারণ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, তাছাড়া আমি জানি ওরকম কদর্য্য কাজ ওর পক্ষে অসম্ভব।"

ছুরির মতন তীব্র কণ্ঠে জবাব এল, "মূলে ভুল—বটেই তো! তা বলতে! আমার এ দেশের অভিজ্ঞতা পঁচিশ বছরের—" এই ব'লে একটু তিনি হাসলেন, আর মনে হোলো যে পঁচিশ বছরের জীর্ণতায়, সংকীর্ণতায় সারা ওয়েটিংরুম ভ'রে গেল—"আর এই পঁচিশ বছর ধ'রে দেখে আসছি যখনই ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সামাজিক যোগাযোগের চেষ্টা হয়েছে তখনই একটা না একটা অনর্থ ঘটেছে। ভদ্রতা—একশবার, কিন্তু অন্তরঙ্গতা—কখনও না! খুব জোর গলাতেই আমি একথা বলব। এই যে দু'বছর আমি চন্দ্রপুরে আছি এর মধ্যে কোনো গণ্ডগোল না হ'য়ে থাকে, দুই পক্ষই যদি পরস্পরকে শ্রদ্ধা ক'রে চলে থাকে, তার কারণ ঐ সহজ নিয়মটি দুই পক্ষই মেনে চলেছে। নতুন সব লোক এসে আমাদের নিয়মকানুন ওলটপালট ক'রে দেয়, তার ফলে মুহূর্ত্তের মধ্যে যে কি হয় দেখতেই পাচ্ছেন—অনেক বছরের কাজ গেল একদিনে নষ্ট হয়ে, আর আমার এই জিলা এক পুরুষের মতন দুর্নাম কিনল। মিষ্টার ফিলডিং, এই আজকে যে ব্যাপারটি ঘটল তার শেষ যে কোথায় তা আমি বুঝে উঠতে পারছি না; আপনি নিশ্চয় পারছেন, কেননা আপনারা হলেন সব আধুনিক ভাবাপন্ন। আমার এই ইতি। একটি মহিলা—তরুণী—আমার সেরা অধস্তন কর্ম্মচারীর সঙ্গে যার বিবাহ ঠিক—তাকে—ইংল্যাণ্ড থেকে সদ্য আগত একটি মেয়েকে যে—আমার জীবনে যে—"

টার্টন সাহেব আর বলতে পারলেন না, আবেগে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হোলো।

যা তিনি ইতিপূর্ব্বেই বলেছিলেন তা মূল্যবান ও মর্ম্মস্পর্শী সন্দেহ নাই, কিন্তু আজিজের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক? যদি ফিলডিংএর কথাই ঠিক হয়, তা হলে কোনো সম্পর্কই নাই। একই দুর্ঘটনা দুই ভাবে দেখা যায় না—টার্টন মেয়েটির পক্ষ থেকে চাচ্ছিলেন প্রতিশোধ আর ফিলডিং যাচ্ছিলেন আজিজকে বাঁচাতে। তাঁর মনে হোল ওখান থেকে পালিয়ে ম্যাকব্রাইডের কাছে যেতে পারলে হয়। ম্যাকব্রাইড লোকটি ছিলেন তাঁর প্রতি সদয় ভাবাপন্ন, আর মোটের উপর বেশ স্থিরবুদ্ধি—অন্তত: মাথা ঠাণ্ডা রেখে তিনি বলবেন এটুকু নির্ভর তাঁর উপর করা চলে।

"বেচারী হিসলপ এল তার মাকে নিয়ে যাবার জন্য, আর আমি এলাম বিশেষ ক'রে আপনারই জন্য। মনে হোলো, এখন এই হবে সেরা বন্ধুর কাজ। আজকে ক্লাবে সন্ধ্যায় এই ব্যাপার নিয়ে একটা আলোচনা হবে তাও বলা ছিল আমার ইচ্ছে, কিন্তু আসবেন কিনা বলতে পারিনা, খুব কমই তো আপনি ওদিক মাড়ান।"

"আমার উদ্দেশে এতটা কষ্ট করেছেন তার জন্যে আমি অতি কৃতজ্ঞ। ক্লাবে নিশ্চয়ই আসব। মিস্ কেষ্টেড কোথায় জিজ্ঞাসা করতে পারি?"

টার্টন সাহেবের ভঙ্গীতে বোঝা গেল তিনি অসুস্থ।

আবেগের সঙ্গে তিনি বললেন, "মন্দের ওপর মন্দ—একেবারে জঘন্য ব্যাপার।"

কিন্তু কালেক্টার সাহেব কটমট ক'রে তাঁর দিকে তাকালেন, কেননা ফিলডিং আবেগে আত্মহারা হ'য়ে "ইংল্যাণ্ড থেকে সদ্য আগত তরুণী"—এই কথাগুলি উচ্চারণ মাত্র একেবারে উন্মাদের মতন স্বজাতির জয়পতাকার তলে গিয়ে জোটেননি। ফিলডিংএর দলের লোক সিদ্ধান্ত করেছিলেন এক্ষেত্রে আবেগ প্রকাশই তাঁদের বিহিত কর্ম্ম, কিন্তু ফিলডিং তখনো চেষ্টা করছিলেন আসল ঘটনাটি কি নির্দ্ধারণ করতে। যুক্তির প্রদীপ নিবিয়ে দেওয়াই যদি ধার্য্য হয়, তারপর এক মুহূর্ত্তের জন্যও তা জ্বাললে 'এ্যাংলো ইণ্ডিয়া' অর্থাৎ ভারতীয় ইঙ্গ-সমাজ একেবারে ক্ষিপ্ত হ'য়ে যায়। সেইদিন সারা চন্দ্রপুরের সাহেব সম্প্রদায় তাঁদের ব্যক্তিগত বুদ্ধিবিবেক নির্বিচারে রুদ্ধ ক'রে গোষ্ঠীগত স্বার্থে একেবারে অঙ্গীভূত হয়েছিল। বীরত্বে, ক্রোধে, করুণায় তাদের মন গিয়েছিল

ভ'য়ে ; কিন্তু দুয়ে দুয়ে যে চার হয় একথা ভেবে দেখার কথা পেয়েছিল লোপ।

ফিলডিংএর সঙ্গে আর দ্বিতীয় কথা না ব'লে কলেক্টার সাহেব গেলেন প্ল্যাটফর্ম্‌এ। সেখানে তুমুল হৈচৈ বেধে গিয়েছিল। রনির এক চাপ্‌রাশিকে বলা হয়েছিল মহিলা দুটির টুকিটাকি জিনিষগুলি নিয়ে আসতে, সে মহানন্দে যা হাতে পাচ্ছিল তাই সংগ্রহ করছিল, যেহেতু সে হোলো ক্রুদ্ধ সাহেব সম্প্রদায়ের অনুচর। মহম্মদ লতিফ তাকে বাধা দেবার চেষ্টাও করল না, আর মাথার পাগ্‌ড়িটা ছুড়ে ফেলে কাঁদতে সুরু ক'রে দিল। অত যে আরামের আয়োজন হয়েছিল তা ধূলায় রৌদ্রে সব গড়াগড়ি যেতে লাগল। কালেক্টার এক নিমেষে সব বুঝে ফেললেন। রাগে আত্মহারা হ'লেও তাঁর ন্যায়বিচারের প্রবৃত্তি জেগে উঠল। তাঁর হুকুম দেওয়া মাত্র লুট গেল থেমে। তারপর গাড়ি হাঁকিয়ে বাংলার দিকে যাবার সময় আবার তাঁর রুদ্ধ ক্রোধ ছাড়া পেল। পথের ধারে কুলিরা ঘুমাচ্ছিল, দোকানদারেরা তাদের দোকানের ছোট ছোট মঞ্চের উপর উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সেলাম জানালো। এদের দেখে মনে মনে তিনি বললেন, "অবশেষে বুঝতে পেরেছি তোমরা কি চিজ! এর সাজা তোমরা পাবে, একেবারে চিঁ চিঁ করতে হবে।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

কবিতাগুচ্ছ

রজনীগন্ধা

সে-রাতে আমার চোখে ঘুম ছিল না—
তোমার কি ছিল ?…

খোলা ছিল দখিণের বাতায়ন ;
ছিল উতলা ফাগুন হাওয়া
মদির তোমার আদিম চুম্বনের উন্মাদনায়।
নিশীথের নীল অন্ধকার
নিবিড় হয়েছিল
দীর্ঘপক্ষ্ম তোমার নিমীল নয়নের আবশে।
আধো আলো আধো অন্ধকারে
বাধো বাধো
তোমার প্রথম প্রেমের বাণী
থরথর ক'রে কাঁপ্‌চে
তার সীমাহীন স্রোতনায়।
ঝিল্লীঝনকিত রাত্রি
মুখর হয়েছিল
তোমার কম্প্র আবেগের
অন্তহীন অনুরণনে ;
ভালোবাসি, ভালবাসি,
অসম্ভব ভালোবাসি—
সে-সুর তরঙ্গায়িত হল
ছায়া-পথে,
ঘূর্ণ্যমান সুদূর নীহারিকায়,—
পুঞ্জ পুঞ্জ তারার ফুল ফোটায়
তমিস্র শূন্যতার গহনে।…

বাসনার বহ্নি আজ লেলিহান—
প্রথম-স্পর্শের আসবে
শোণিত হয়েছে উত্তাল
শিরায় শিরায়—স্নায়ুতে স্নায়ুতে।…
সে-রাতে আমার চোখে ঘুম ছিল না—
তোমার কি ছিল ?

আজ রাতে আমার চোখে ঘুম নেই—
প্রহর যায়, হে ক্ষণিকা,
প্রহরের পর প্রহর যায়—
আমি একা জাগি আজ রাতে।
পাইনের বনে
বর্ষণ হয়েছে উতরোল।
শুনেচো কি পাইনের বনে
নিশীথের হাওয়ার স্বনন,
অবিরল ধারার মর্ম্মর
অগণন প্রল্লোল পল্লবে ?
নিরবধি অতীতের
নিরন্ত ভাবীকালের
বিস্মৃতির পুঞ্জিত দীর্ঘশ্বাস,
বিরহের গুমরিত ক্রন্দন—
শোনোনি কি
পাইনের বনে ?…

প্রান্ত থেকে প্রান্ত
আকাশ মেঘে ঢাকা আজ রাতে,—
এক-রঙা, বিধুর ধূসর।
আজ রাতে আমার চোখে ঘুম নেই।

শ্রীগৌরগোপাল মুখোপাধ্যায়

বিচ্ছেদ

"যুগান্তের প্রান্তে এসে দাঁড়ায়েছি আজ ;
মিলনের হ'ল অবসান।—
সেদিনের কান্না-হাসি হ'য়ে আসে ম্লান।
সুখস্মৃতি ডুবিয়াছে বিস্মৃতির মাঝে
সম্মুখে পড়িয়া আছে দীর্ঘ দিনমান।
তোমার চোখের আলো জাগাবে না আর
ছন্দোময় অনুভূতি অন্তরে আমার।
তাই তো তোমার মুখে চাহিছে নয়ন,
সে দিঠিতে নাহি আর হৃদয় স্পন্দন।
বন্ধ যদি হ'ল তব হৃদয়ের দ্বার
শান্তচিত্তে তুমি তবে বল এইবার
ঝড় কেন তুলেছিলে চিত্তের গহনে ;
কোন্ দোষে ভিন্ন পথে চলি দুইজনে—
মিলন-সূর্য্য কেন চির-অস্তমিত ?"

"ক্ষতি ক্ষোভ নাই আর, নাই অভিমান
চাহি না তো আর কোনও তুচ্ছ প্রতিদান।
এ আমার অন্তরের কামনার ভার
নিঃশেষে সঁপিয়াছিনু চরণে তোমার।
তুমি তো বোঝ নি মোর মৌন আকিঞ্চন
চাহিয়া দেখ নি ফিরে অন্তর-স্পন্দন।
অশ্রুবাষ্পে ঘন হ'ল দিগন্তের রেখা
ম্লান হ'য়ে এল মোর দীপ্ত দীপশিখা
প্রশ্ন কেন জাগে আজ ? জাগিছে সংশয় ?
সব মিথ্যা, প্রিয় ! প্রেম সত্য নয় !"

"তোমারে যা' ভেবেছিনু তুমি তাহা নও।
শুধুই মানবী তুমি, মগ্ন হয়ে রও
আপনার ক্ষুদ্র সুখ তুচ্ছ দুঃখ মাঝে।
দূর হ'তে দেখেছিনু যে উজ্জ্বল সাজে
মুহূর্ত্তে তা ম্লান হ'ল কাছে এলে যবে।
তোমারে বুঝি নি আমি, তাই সত্য তবে।
ছিন্নমূল আশা মোর, ভেঙ্গেছে স্বপন ;
মরুপথে হ'ল হারা, ব্যর্থ এ জীবন।"

শ্রীশোভা মহলানবিশ

আসার আগে

আকাশে সহস্রাক্ষ ইন্দ্রের সবুজ চোখ যখন
আমাদের এই পৃথিবীর দিকে নির্নিমেষে চেয়ে থাকে,
তখন আমি তোমার জন্যে বসে থাকি পূর্ণিমা।
পথহারা ছায়াপথে জিজ্ঞাসার চিহ্ন,
জিজ্ঞাসা আমার মনে,
তুমি কি আসবে ?
তুমি কি আসবে না পূর্ণিমা ?

কতশত ভাঙ্গা ভাঙ্গা মুহূর্ত্ত,
সঞ্চারিত, সঞ্জীবিত হয়ে আমার কামনায়
চলে যায়,
চলে যায় তোমার নব পল্লবিত প্রেমাঙ্কুরের পাশে।
অক্ষত কৌমার্য্য তোমার তখন
ওঠে না কি শিহরিত হয়ে ?

রাত্রির গূঢ়তম রহস্যের মত
যে সৃষ্টি-বেদনায় সারাদেহ তোমার কম্পমান
তারি সার্থকতা আমারই পাশে।
রক্তলোলুপ বুনো বাঘিনীর মত
এখনও ওঠোনি তুমি জেগে,
এখনও অতনু তনুতে আমার মেশেনি তোমার দেহ।
তাইত এখনও ডাকিনি তোমায়—
তুমি কি আসবে ?
তুমি কি আসবে না পূর্ণিমা ?

আমি তোমায় ডাকব তখন,
যখন ওই ছায়াপথের জিজ্ঞাসা থেকে
ছোট নীল তারার শেষ বিন্দুটা যাবে খসে পড়ে
মৃত্যু হবে একটি তারার ;
যখন আমার মনের জিজ্ঞাসাটা হয়ে যাবে
শেষ দৃঢ় দাঁড়ি,
তখনই ত ডাকার সময়!
জান না কি ওই তারাদল
ছুঁচোল সহস্র বিন্দুর মত আমাদেরই অতৃপ্ত কামনা ?
তাইত একটা তারার মরণের সাথে সাথে
আমরা কামনা করি,
সার্থক কামনা তখন।
তখনই ত আশার সার্থকতা ;
জানি আমি আসবে তখন তুমি।
আসবে না পূর্ণিমা ?

সুকুমার দে সরকার

"স্বর্গ হইতে বিদায়"

স্মরণের নীড় হ'তে
একে একে উড়ে গেল দিন
—স্তিমিত, মলিন—
মেঘের অনন্ত পথে অন্ধকার হ'তে অন্ধকারে
এলোমেলো বলাকার স্রোতে।

বিবর্ণ ঘুমের মত
হৃদয়ে জড়তা আসে ছেয়ে।
ভুলে যাই, বহু স্বপ্ন তোমার নামেরে ঘিরে কোনোকালে উঠেছিল জ'মে।

চেতনার শিরা বেয়ে বেয়ে
শুধু কাঁপে অবিরত
ঝিঁঝিঁর ডাকের মত
শেষহীন মূর্চ্ছাতুর গাঢ় কোলাহল ;—
গহন স্মৃতির পথে নিরুদ্দিষ্ট হ'ল যবে বিগতের শীর্ণকায় দিবসের দল।

এবার বিদায় নিতে হবে।
কালের স্থবির যাত্রা টেনে নিক্ তুমি-হারা মোর মূর্খ শবে।
পৃথিবীর পাকে পাকে এল বিস্মরণ।
তোমার অনেক হাসি, বেদনা অনেক
রাতের ঘুমন্ত বুকে তোলে না-ক' ঘন-ঘন আর শিহরণ।
স্মরণের নীড় গেল ভেঙ্গে।
অসহ্য শূন্যতা আজ কাঁপে শুধু শ্রাবণের ঝিঁঝিঁর মতন।

মণীন্দ্র রায়

পুস্তক-পরিচয়

Social and Cultural Dynamics—by Pitrim Sorokin (Allen & Unwin) 3 Vols.

বইখানির তিনটি ভল্যুম আমেরিকায় প্রকাশিত হয়েছে গত বৎসর, চতুর্থটি এখনও হয়নি। প্রায় বছর খানেক ধরে বইখানি নাড়াচাড়া করছি; ইতিমধ্যে সমালোচনার তাগিদ ভারী হয়ে উঠেছে। ভেবেছিলাম চতুর্থ ভল্যুমে মূলতত্ত্ব ও আলোচনাপদ্ধতির বিচার পড়ে আমার বক্তব্য লিখব। কিন্তু নানা কারণে তার সুযোগ হয়ত মিলবে না। তা ছাড়া, লেখকের পাণ্ডিত্যের ও স্থির সিদ্ধান্তের কবলে পুনরায় পড়তে মন নিতান্তই গররাজি হয়েছে। তাই বইখানির ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশের উপলক্ষে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হলাম। সুবিধা হয় ত' চতুর্থ ভল্যুমটি পৃথকভাবে দেখা যাবে।

আলোচনার গোড়ায় বলে রাখি যে বইটির দৃশ্যপট এতই বিরাট, তার প্রতিপৃষ্ঠা পাণ্ডিত্যে এতই ভরাট যে তার যথার্থ মূল্য দেওয়া আমার পক্ষে দুঃসাধ্য ও কল্পনাতীত। আমেরিকান সোশিয়োলজিকাল এসোসিয়েশনের সমিতি বসেছিল এই বইখানির জন্য। তাঁদের মতামত আমি পড়িনি, তবে একাধিক বিদেশী পত্রিকায় এবং ক্যালকাটা রিভিউএ বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের-উপযোগী পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনা আমি পড়েছি। তবে ব্যাপার এই যে তাঁরা কি লিখেছেন সাফ্ ভুলে গেছি। কারুর সাধ্য নেই যে সোরোকিনের বক্তব্য ও তার ওপর মন্তব্যের সব কথা মনে রাখে।

সোরোকিনের বিষয় হল সমাজ ও পরিশীলনের পরিবর্তন। এতদিন ধরে সমাজতত্ত্বে সমাজকে, পূর্ণভাবেই হোক আর খণ্ডভাবেই হোক, জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে, ইচ্ছা ও অনিচ্ছাসত্ত্বেও গতিহীন জড়সমষ্টির মতন দেখা হত। বিবর্তনবাদের প্রভাবে সমাজকে জীব ভাবা সম্ভব হয় বটে, কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত

জৈব পরিণতির বর্ণনা ও ব্যাখ্যা ঘাতপ্রতিঘাতেরই বর্ণনার সামিল ছিল। অর্থাৎ ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে যে-সব দ্বিতীয় স্তরের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় তার কোনো প্রকার ন্যায়সঙ্গত বৈজ্ঞানিক বর্ণনা ও ব্যাখ্যা এতদিন সম্ভবপর হয়নি। প্রয়াস যে হয়নি তা নয়, তবে সেগুলি আংশিক। সোরোকিন সেই সব আংশিক প্রয়াসকে সমন্বিত করেছেন।

তাঁর পদ্ধতি বিচার করতে গেলে হেগেল, কার্ল মার্কস প্রভৃতি ইতিহাসের দার্শনিকবৃন্দের কথা ওঠে। ঐতিহাসিক নিয়ম আবিষ্কারে হেগেল যে-সব দোষ করেছিলেন তার মধ্যে ঐতিহাসিক ঘটনাকে অবহেলাটাই বোধ হয় সর্ব্বপ্রধান। কার্ল মার্কস তাই হেগেলের অ-বাস্তবিকতা দূর করতে তৎপর হন। তিনি তাঁর সময়কার অবস্থান বুঝে একটা ব্যাখ্যা বার করলেন যেটা সর্ব্বব্যাপী না হলেও বর্ত্তমান যুগের পক্ষে যথার্থ। কিন্তু যাঁদের কার্ল মার্কসের রচনার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় আছে তাঁরাই বলবেন যে তাঁর বিশ্লেষণ অদ্ভুত রকমের সূক্ষ্ম হলেও উনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক গবেষণার অপূর্ণতার জন্য ও তখনও সমাজতত্ত্বের আবির্ভাব হয়নি বলে সেটি বিচিত্র ঘটনার ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রধান সমাজশক্তির জের এখনও মেটেনি, তাই মার্কসের ঐতিহাসিক নিয়ম এখনও খাটছে, এবং খুব সম্ভব এখনও খাটবে, কিন্তু তাই বলে তাঁর আবিষ্কৃত নিয়মের সাহায্যে পৃথিবীর আদিম, মধ্যযুগীয় এবং যাবতীয় সমাজ-সংস্থান ও বিবর্ত্তনের ব্যাখ্যা করা সেন্ট পিটারের চাবি দিয়ে স্বর্গের দ্বার খোলার মতন গোঁড়ামি মাত্র। অর্থাৎ মার্কসীয় ব্যাখ্যার সাহায্যে এই যুগের আকস্মিক পরিবর্ত্তন ঘটান সম্ভবপর হলেও সর্ব্বপ্রকার ও সর্ব্বকালীন সামাজিক নক্সার ধীর বিবর্ত্তনের প্রকৃত ব্যাখ্যা তাতে পাওয়া যায় না।

কিন্তু সাধারণ লোকে ও অসাধারণ পণ্ডিতে একটা চাবি দিয়ে সব চাবি খুলতে চায়। ফলে অদ্ভুত রকমের মতামত তৈরী হয়, যার ফল সব সময় শুভ নয়, যদিও তাতে কাজ চলে। কিন্তু কাজ চালান যাদের কাছে বড় নয়, তারা বৈচিত্র্যকে খাতির করতে যায়। এইটাই সোরোকিনের পদ্ধতির মূল কথা। এক কথায় সোরোকিন সমাজতত্ত্বের প্লুরালিষ্ট।

কিন্তু প্লুরালিজমের বিপদ কোন বিবাহিত পুরুষেরই কাছে অজ্ঞাত নয়।

এর চিঠি ওর কাছে চলে যায়, সব সময় কিছু পৃথক বাক্সে ভিন্ন ভিন্ন পত্র রাখা চলে না। ফলে সংসারে অশান্তির সৃষ্টি হয়। টয়েনবী সাহেব প্লুরালিষ্ট হতে গিয়ে ভীষণ অশান্তিতে পড়েছেন। তাঁর সামাজিক টাইপের সংখ্যা ডজন খানেক। কেবল তাই নয়, বাধ্য হয়ে তিনিও চ্যালেঞ্জ-রেস্‌পন্‌স্‌এর ফর্ম্মুলা ব্যবহার করেছেন। ফলে তাঁর বই কোটেশন-কণ্টকিতই হয়েছে। টয়েনবীর যে-রচনা-মাধুর্য্য বিখ্যাত ছিল সেটি বহুর প্রলোভনে পড়ে আত্মঘাতী হয়েছে। প্লুরালিজমের বিপদ এই—বৈচিত্র্যে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়, বিজ্ঞান হয়ে ওঠে অর্থহীন বর্ণনা।

সোরোকিনের সমস্যা হল পূর্ব্বোক্ত দুটি পদ্ধতির দোষ বর্জ্জন করে সামাজিক পরিবর্ত্তনের মোটামুটি প্রধান প্রধান টাইপ আবিষ্কার করা। বিজ্ঞানে এই প্রকার শ্রেণী-বিভাগের প্রয়োজন আছে, তবে সেই সঙ্গে অক্যামের ক্ষুরও চালাতে হয়। ইদানীং প্যারেটো তাই করেছিলেন তাঁর Mind and Societyতে, তবে তিনিও বিপদে পড়েন নি যে তা নয়। বিপদের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি—চিঠি গুলিয়ে যায়। এ-টাইপের সঙ্গে অন্য টাইপ সব সময় খাপ খায় না, অথচ গায়ের জোরে খাপ খাওয়াতে হয়। এই বিপদ কেবল সমাজতত্ত্বে নয়, মনোবিজ্ঞানে, দেহতত্ত্বে, প্রমাণ—ইয়ুং, ক্রেৎস্‌মার প্রভৃতির জবরদস্তীতে। কোনো বিজ্ঞানের প্রারম্ভে জাতিবিচার প্রয়োজনীয় হলেও একবার স্বারাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর সেই জাতিবিচার নিয়ে বাড়াবাড়ি করা দ্বিতীয় শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকেরই শোভা পায়।

সোরোকিন সাত প্রকারের কালচার-মনোভাব ভাগ করেছেন। Ascetic ideational, Active sensate, Active ideational, Idealistic, Passive sensate, Cynical sensate, and Pseudo-ideational। মোটামুটি কালচার-মনোভাব তিন প্রকারের, ideational, sensate এবং mixed। মনোভাব বলতে যদি তত্ত্ববোধ, প্রধান প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য-সাধনের পন্থা, জীবন-সংজ্ঞা, শক্তির ব্যবহার, ক্রিয়া-পদ্ধতি, আত্মজ্ঞান, জ্ঞান, সত্য সম্বন্ধে ধারণা, ধর্ম্মতাৎপর্য্য, সৌন্দর্য্যবোধ, এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রিক কল্পনা ও আচার-ব্যবহার বোঝা যায় তবে সোরোকিনের মতে ideational টাইপের সঙ্গে sensate টাইপের

সম্বন্ধে মূলগত পার্থক্যই ধরা পড়বে। কিন্তু পার্থক্য সত্ত্বেও সমাজের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে এই দুটি প্রধান টাইপ অনেক ক্ষেত্রে মিশেছে। এই তিন ভল্যুমে কিভাবে তাদের মিশ্রণ ঘটেছে তারই বর্ণনা আছে। আর্ট, সত্যানুসন্ধান, ধর্ম্মতত্ত্ব, ব্যবহার-নীতি, সামাজিক সম্বন্ধ, যুদ্ধ ও বিপ্লবের এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ আমি অন্ততঃ ইতিপূর্ব্বে কোথাও পড়িনি। সঙ্গীতের রূপ পরিবর্ত্তনেও যে সংখ্যাতত্ত্বের প্রয়োগ সম্ভব আমার জানা ছিল না। অবশ্য আপাতদৃষ্টিতে এই প্রকার বিচার পাণ্ডিত্যেরই অভিমান মনে হয়, কিন্তু সংখ্যার সাহায্যে যে অনেক সাধারণ ধারণার ভুল ধরা পড়ে এ-কথা অনস্বীকার্য্য। তা ছাড়া, সমাজতত্ত্ব জানতে হলে সঙ্গীতে জ্ঞান থাকা নিতান্ত প্রয়োজন, কারণ দুটিরই বিষয় রূপ-পরিবর্ত্তন, এই সুসংবাদে আনন্দ পাওয়া আমার পক্ষে স্বাভাবিক।

সোরোকিনের শেষ প্রতিপাদ্য হল এই: পশ্চিমী সভ্যতা লোপ পেতে বসেনি, যেমন স্পেংলার বলেছেন; মাত্র, পশ্চিমী সভ্যতার sensate অধ্যায়টি শেষ পৃষ্ঠায় পৌঁছেছে। এর পর, তাঁর বিশ্বাস, নতুন অধ্যায় সুরু হবে। তাঁর ইচ্ছা পশ্চিমী মানুষ এইবার বহির্জ্জগতের অধিকার বিস্তার থেকে ক্ষান্ত হয়ে আত্মসংযমে নিযুক্ত হোক; কিন্তু যেকালে আত্মসংযম absolute values ভিন্ন অসম্ভব, তখন তাঁর ভাষায় 'hence the logical necessity and practical urgency of the shift to a new Ideational Culture'।

চমৎকার কথা, হাজার বার হাজার লোকে তাই মানছে, লিখছে, বলছে, অনুভব করছে। আমরা নাকি আজ হাজার বছরের ওপর তাই বলে আসছি, তবু মজা এই—পশ্চিমী সভ্যতার কোনো উপকারই হচ্ছে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হিটলার ও মুসোলিনি সেরোকিনের এই তিন ভল্যুম পড়েন নি। কিন্তু, সন্দেহ হয় যে চেম্বারলেন বৃদ্ধ বয়সে উড়ো জাহাজে হিটলারের দরজায় ধর্ণা দেওয়ার বদলে এই তিন ভল্যুম air-mail-এ পাঠালে বড় বেশী লাভ হত না। ব্যাপার হল এই: সামাজিক শক্তির সূক্ষ্মতম বর্ণনায় জ্ঞানলাভ হয়, কিন্তু জ্ঞানের বাজার দর এখন নেই বল্লেই চলে। সেটা স্বাভাবিক; কারণ যে-জ্ঞান জেনেই নিঃশেষিত হয়, সেই জ্ঞানের গোড়াতেই গলদ রয়েছে—অর্থাৎ সেটা বিষয়-পরিবর্ত্তনের সাহায্য করে না। এক কথায় সেটা জ্ঞানই নয়। এই

দুহাজার পৃষ্ঠার বইখানিতে গরু হারালে গরু খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু কেন ভিন্ন ভিন্ন টাইপ জন্মায়, কেন একটি টাইপ অন্য টাইপে মিশে যায় তার কোনো ব্যাখ্যাই নেই। এক কথায় সোরোকিন dynamics কথাটি ব্যবহার করেছেন হাল্‌কাভাবে, যেমন ঐতিহাসিকরা এতদিন করে এসেছেন। কিন্তু আমার মতে ইতিহাস কেবল ক্যালেণ্ডারের পাতা ওল্টান নয়। যে-মানুষ জলে ডুবে মারা যাচ্ছে তার সামনে শুনেছি এমনি পুরাতন জীবনের অনেক ছবি সারিসারি ভেসে আসে—বোধ হয় সোরোকিনের অবস্থা তাই; কিন্তু অন্যধারে তিনি বিশ্বাসী পুরুষ, পশ্চিমী সভ্যতার ভবিষ্যতে তাঁর আস্থা অটল। তাঁর কাছে ইতিহাসের গূঢ় নিয়মের আবিষ্কারই প্রত্যাশা করেছিলাম। বলতে বাধ্য, হতাশ হয়েছি। সোরোকিন নিশ্চয়ই কার্ল মার্কস-এর চেয়ে বিদ্বান, কিন্তু তাঁর চেয়ে বোধ হয় একটু কম বুদ্ধি ধরেন। বলশেভিকের দল এঁকে নির্ব্বাসিত করে রুশিয়ার বিশেষ কিছু ক্ষতি করে নি, অধ্যাপকবহুল আমেরিকারই লাভ হয়েছে। পৃথিবী অবশ্য কখনও অধ্যাপকের কাছ থেকে বিশেষ কিছু প্রত্যাশা করে না—এক কর্ত্তৃপক্ষের কৃতিত্বের সমর্থন ও গুণগান ছাড়া।

তাই এই তিন ভল্যুম অধ্যাপকেরই ভাল লাগবে—জগতের পরিবর্ত্তনে বিশেষ কাজে লাগবে না।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

Three Guineas—by Virginia Woolf. (Hogarth Press)

তিনটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে এক এক গিনি চাঁদা লেখিকার কাছে চাওয়া হ'য়েছিল। একটির উদ্দেশ্য, শিক্ষিত মেয়েদের চাকরী জোগাড় করে' দেওয়া, দ্বিতীয়টির, যুদ্ধনিবারণ, এবং তৃতীয়টির—মেয়েদের কলেজ গঠন। তিনটির মধ্যে যোগ কোথায় তাই দেখানোই লেখিকার উদ্দেশ্য। দুর্ম্মুখের একথা বলা

স্বাভাবিক যে চাঁদা চাইতে গেলে যদি এত কথা শুনতে হয়, তবে না চাওয়াই নিরাপদ।

আবহমানকাল পুরুষ নারীর সর্ব্ববিধ স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করে' এসেছে। পুরুষবুদ্ধিচালিত জগতে আজ শান্তি অপগত; পাশববলের নিকট বৈদগ্ধ্য পরাহত। সেই বৈদগ্ধ্য ও শান্তির দোহাই দিয়ে মেয়েদের কাছে সাহায্য চাওয়া হচ্ছে। অথচ মেয়েদের সকল স্বাধীনতাই হরণ করা হয়েছে—ভালো বা মন্দ কিছুই করার অধিকার তাদের নেই। এবং যদিও তাদের গৃহস্থালীর সাম্রাজ্ঞী আখ্যা দেওয়া হয়, ক্ষমতা তাদের কিন্তু ব্রিটিশ সম্রাটের অপেক্ষাও কম।

মেয়েদের কিছু করতে হ'লে প্রথমেই চাই স্বাধীনতা। চিরকাল তারা টাকার জন্য পিতা, ভ্রাতা কিম্বা স্বামীর মুখাপেক্ষী, এবং এই জন্য সর্ব্ববিষয়ে তাদেরই মতানুগামী হ'তে হয়। অতএব গোড়াতে মেয়েদের উপার্জ্জনক্ষম হওয়া দরকার। তারপর, শিক্ষিত ও বিদগ্ধমনোবৃত্তি ব্যতীত যুদ্ধের অনৈসর্গিক অমানুষিকতা অনুভূত হয় না, কাজেই—চাই উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা। এই প্রসঙ্গে লেখিকা মেয়েদের চিরকাল দাবিয়ে রাখার বিরুদ্ধে কঠিন অভিযোগ করেছেন। এ অভিযোগ ন্যায্য, অস্বীকারের উপায় নেই।

পুরুষদের সর্ব্বপ্রকারে কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে লেখিকা তীব্র শ্লেষ হেনেছেন। সাধারণ জীবনযাত্রায় তারা পদে পদে পরিচয় দেয়, তাদের আত্মাভিমান আর মিথ্যা অহঙ্কারের। কথাবার্ত্তায় ও সাজসজ্জায় পর্য্যন্ত লক্ষিত হয় তাদের তথাকথিত পৌরুষগর্ব্ব। বিচারহীন আচারেই ওদের মিথ্যা পৌরুষের প্রতিষ্ঠা। প্রথামাত্রকেই কায়েমী করায় ওদের সকল বুদ্ধি নিয়োজিত। "Whether the master's pom or the mistress's pug should enter the room first" ইত্যাদি গুরুতর বিষয়ে চুলচেরা নিয়মকানুন প্রবর্ত্তন করতেই তা'রা ব্যস্ত। এবং যদিও তারা মেয়েদের সজ্জাপ্রিয়তার প্রতি কটাক্ষ করতে ছাড়ে না, এ বিষয়ে কিন্তু তাদের নিজেদের দৌর্ব্বল্যও বড় কম নয়। উদাহরণ—সেনানীদের উর্দ্দি, খৃষ্টান যাজকদের পরিচ্ছদ, ব্রিটিশ জজ কৌন্স্‌লির পরচুল যে-সমস্তের উপভোগ্য ফোটোগ্রাফে বইখানি অলঙ্কৃত।

Tyrant ও Dictator এই দুটি কথার উচ্ছেদকল্পে লেখিকা বদ্ধপরিকর এবং তাঁর মতে যেহেতু উইম্‌পোল্‌ ষ্ট্রীটবাসী Mr. Barrett Hitler ও Mussolini-রই জাতভাই, কাজেই স্ত্রীলোক মাত্রেরই এ ব্যাপারে সহানুভূতি থাকবে।

প্রবীণ উকিল যেমন নিপুণভাবে স্বপক্ষের যুক্তিগুলি একটির পর একটি সাজিয়ে যান, কোথাও ফাঁক না রেখে—মনে হয় যেন প্রতিপক্ষের আর কিছু বলবার থাকতে পারে না—তেমনই নৈপুণ্যের সঙ্গে Woolf মহোদয়া ওকালতি করেছেন মেয়েদের পক্ষে। এ ওকালতির ভাষায় মুগ্ধ হ'বেন অনেকেই। তাঁর বর্ণনা-চাতুরী প্রশংসনীয়।

পুরুষদের বিরুদ্ধে যে কথা বলা হয়েছে তা মোটের ওপর সত্য হ'লেও সেই সকল দোষই কি মেয়েদের মধ্যেও বহুলভাবে বিদ্যমান নয়? মেয়েরা কি সবাই দেবী? Vanity কি তাদের পুরুষ অপেক্ষা কিছুমাত্র কম? চিরাচরিত আচারে কি তাদের একেবারেই আস্থা নেই? তাদের প্রত্যেকটি কাজই কি বিচারপ্রসূত? হিংসা দ্বেষ ইত্যাদি যে পুরুষদেরই একচেটিয়া নয়, ইতিহাসে কি তার অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না? বিগত মহাসমরের সময়ে অ-সামরিক পুরুষদের অপমান করার জন্য কাপুরুষতার চিহ্নস্বরূপ সাদা পালক পরিয়ে দিত তাদের মেয়েরাই তো। লেখিকা বলেন তারা সংখ্যায় বেশী নয়। কিন্তু সৈন্যদের জন্য হাজার হাজার জামা, মোজা প্রভৃতি বুনে দেওয়া এবং তাদের সিগারেট ইত্যাদি ছোটখাট বিলাস দ্রব্য পাঠাবার জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন করে' টাকা তোলা, এসব কাজে তো মেয়েরাই অগ্রণী ছিল। লেখিকা কি জানেন না যে মেয়েদের বিদ্রূপ সহ্য করতে না পেরে সমরবিমুখ কত যুবক আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করেছে? সাক্ষাৎভাবে যুদ্ধে যোগদান করতে না পারলেও পরোক্ষভাবে সমরানলের ইন্ধন কি মেয়েরা জোগায় নি? নখীদন্তীরা সবাই পুরুষ নয়, এর প্রমাণ অজস্র দেওয়া যায়, কিন্তু আর বোধহয় প্রয়োজন নেই।

লেখিকার পূর্ব্ববর্ত্তী পুস্তক 'A Room of One's Own'-এ যে সকল সমস্যার অবতারণা করেছিলেন, এ বইটিতে তার অনেক পুনরাবৃত্তি আছে।

মনে হয় যে তাঁর বক্তব্য আরও অনেক সংক্ষেপে বলা যেত এবং বইখানার আয়তন অযথা বড় হ'ত না। অবশ্য পুরুষমনের কাছে এ প্রগল্‌ভতা নারীত্বেরই পরিচায়ক। পরিশিষ্টে বর্ণিত অনেক তথ্যই মূলের অঙ্গীভূত করলে বইখানা অধিকতর চিত্তাকর্ষক হ'ত। প্রয়োজনাতিরিক্ত দীর্ঘতা সত্ত্বেও বইখানি নিঃসংশয়ে সুখপাঠ্য।

সুমন্ত্র মহলানবিশ

The Unvanquished—by William Faulkner. (Chatto & Windus)

আমেরিকার আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে ফক্‌নার বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। তাঁর লেখাগুলি কিন্তু প্রায়ই সহজবোধ্য নয়, ধৈর্য্য না থাকলে ও একটু কষ্ট স্বীকার না করলে তাঁর উপন্যাসগুলির অধিকাংশেরই রসগ্রহণ করা পাঠকের পক্ষে একরকম অসম্ভব হয়ে পড়ে। সোজাসুজি ভাবে কোন জিনিসের বর্ণনা করা বা কোন বিষয় লেখা যেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নয় বলে মনে হয়।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে তিনি এ দোষ এড়াতে যথাসম্ভব চেষ্টা করেছেন। এখানি একখানি উপন্যাস। নিগ্রোদের স্বাধীনতা সম্পর্কে আমেরিকায় যে গৃহবিবাদ দেখা দেয় তারই কয়েকটি ঘটনাকে আশ্রয় ক'রে বইখানি লেখা হয়েছে। উপন্যাসখানির নায়ক হচ্ছেন বেয়ার্ড সারটোরিস। তিনি নিজেই গল্পটি বলেছেন। তাঁর বাবা ছিলেন নিগ্রো-স্বাধীনতার বিপক্ষবাদীদলের একজন নেতা, ছেলেবেলা বেয়ার্ড তাঁর সমবয়স্ক নিগ্রো সঙ্গী রিঙ্গোর সঙ্গে তাঁর পিতামহীর কাছে থাকতেন। তাঁদের এক নিগ্রো চাকরের বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁদের দুটি অশ্বেতর ও একটি রূপার বাসনপূর্ণ বাক্স লুট হয়। বেয়ার্ডের পিতামহী ভয় কাকে বলে জানতেন না। বেয়ার্ড ও রিঙ্গোকে সঙ্গী করে তিনি

এই লুণ্ঠিত জিনিসগুলির উদ্ধারের জন্য সারটোরিসের শত্রুদের সেনাপতির সম্মুখীন হন ও তাঁর কাছ থেকে এই জিনিসগুলি প্রত্যর্পণের একটি আদেশপত্র সংগ্রহ করেন। এই আদেশের বলে এবং জুয়াচুরি ক'রে তিনি তাঁর লুণ্ঠিত জিনিসগুলির অনেকগুণ বেশী আদায় করেন। অবশেষে এক দস্যুর কবলে পড়ে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। এই দস্যুকে হত্যা করে বেয়ার্ড তাঁর পিতামহী-হত্যার প্রতিশোধ নেন। বেয়ার্ড আর একটি হত্যারও প্রতিশোধ নেন,—সেটি হচ্ছে তাঁর পিতৃহত্যার। কিন্তু এ প্রতিশোধ ভিন্ন রকমের ও অপূর্ব্ব। রেডমণ্ড ছিলেন তাঁর পিতার একজন বন্ধু। কিন্তু তাঁর পিতার দোষে এই বন্ধুত্ব শত্রুতায় পরিণত হয় ও রেডমণ্ডের হাতে তাঁর পিতার মৃত্যু ঘটে। নিরস্ত্র অবস্থায় বেয়ার্ড এই রেডমণ্ডের সম্মুখীন হন। কয়েকটি বন্দুকের আওয়াজ শোনা যায়, কিন্তু বেয়ার্ড অক্ষত অবস্থায় রেডমণ্ডের ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন, রেডমণ্ডও দেশত্যাগী হ'ন। এইখানেই গল্পের পরিসমাপ্তি।

বইখানির পাত্রপাত্রীর মধ্যে তিন চার জনেরই পূর্ণাবয়ব চরিত্র গ্রন্থকার এঁকেছেন। প্রথমেই উপন্যাসের নায়ক বেয়ার্ডের উপর আমাদের দৃষ্টি পড়ে। তাঁর মধ্যে সাহসের অভাব ছিল না। যুদ্ধের আবহাওয়ায় তাঁর ছেলেবেলা অতীত হয়। প্রথমে তাঁর পিতাই ছিলেন তাঁর আদর্শ। অতি অল্প বয়সেই তিনি ও তাঁর সঙ্গী রিঙ্গো একটি বন্দুকের সাহায্যে তাঁর পিতার বিপক্ষ গবর্ণমেণ্ট তরফের একটি অশ্বেতর হত্যা করেন। এর জন্য তাঁদের বাড়ী খানাতল্লাসী হয়, কিন্তু তাঁর পিতামহীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে তাঁরা উভয়েই রক্ষা পান। তাঁর পিতামহীর মৃত্যুর যে প্রতিশোধ তিনি গ্রহণ করেন তাও তাঁর সাহসিকতারই পরিচায়ক। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পিতার দোষগুণ বিচার না করে তিনি পারেন নি। অনবরত নরহত্যা ও লোকের উপর প্রভুত্ব করতে করতে তাঁর পিতার চরিত্রের সমস্ত কমনীয়তা লোপ পেয়েছিল। বেয়ার্ড এ বিষয়টি লক্ষ্য করেছিলেন এবং এই জন্যেই, বোধ হয়, ড্রুসিলার উত্তেজনা সত্ত্বেও তিনি রেডমণ্ডকে হত্যা ক'রে তাঁর পিতৃহত্যার শোধ নিতে পারেন নি।

বেয়ার্ডের পরেই আমাদের নজরে পড়ে তাঁর পিতামহীর চরিত্র। সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, কষ্ট-সহিষ্ণুতা, চতুরতা, দয়া, দাক্ষিণ্য—এই সব উপাদানের

সংমিশ্রণে এই বৃদ্ধার চরিত্র গঠিত। গবর্ণমেণ্টকে বঞ্চনা ক'রে তিনি যে বিত্তলাভ করেন, তারও বেশীর ভাগই তিনি দীন দুঃখীকে দান করেন। নিগ্রো স্বাধীনতার বিপক্ষবাদী হলেও তিনি সকল সময়েই নিগ্রোদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতেন। বইখানির মধ্যে যে দুচার জায়গায় রসিকতা আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে, এই রসিকতার কেন্দ্রও তিনি। এই রসিকতাও আবার নিকৃষ্ট ধরণের রসিকতা নয়। কথার মারপ্যাঁচে এ রসিকতার উদ্ভব নয়। ঘটনাগুলিকে এমন ভাবে সাজান হয়েছে যে পাঠকের মুখে হাসি না এসে পারে না।

বইখানির মধ্যে আর একটি চরিত্র আছে যা অনেকেরই কাছে, উদ্ভট না হলেও, আশ্চর্য্যজনক মনে হবে। এটি হচ্ছে ড্রুসিলার চরিত্র। তাঁর সঙ্গে যাঁর বিবাহ হবার কথা ছিল, তিনি বিবাহের পূর্ব্বে যুদ্ধে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর ড্রুসিলার চরিত্রে এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটে। সে বেয়ার্ডের বাবা সারটোরিসের দলে যোগদান করে, পুরুষবেশে অপরাপর সৈনিকদের সঙ্গে মেলামেশা করে ও সৈনিকের জীবন যাপন করে। যদিও যুদ্ধের সময় স্বামীস্ত্রীভাবে সে কখনও সারটোরিসের সঙ্গে বাস করে নি, তা হ'লেও যুদ্ধান্তে জনমতের চাপে পড়ে সে সারটোরিসকে বিবাহ করতে বাধ্য হয়। এই বিবাহের আগে এবং পরেও তার আচারব্যবহার একজন হিষ্টেরিয়াগ্রস্ত রোগিণীর আচারব্যবহারের মত মনে হয়। এই চরিত্রটি বাস্তবিকই দুর্ব্বোধ্য।

বইখানির বেশীর ভাগই যদিও সোজাসুজি ভাবে লেখা হ'য়েছে, তাহ'লেও আমরা বল্‌তে পারিনা যে এখানি একেবারে "অপ্রত্যক্ষতা"-দোষ-শূন্য। লেখার ধরণ বেশ সাবলীল। গল্পটিও বেশ চিত্তাকর্ষক। প্রকাশকের মতে, এই বইখানি ফক্‌নারের উপন্যাসগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন পাবার যোগ্য!

শ্রীদর্শন শর্ম্মা

Psychology and Religion—by Carl Gustav Jung (Yale University Press).

ধর্ম্মবিশ্বাসীরা কখনও ধর্ম্ম এবং ভগবান সম্বন্ধে নৈর্ব্যক্তিক তর্ক করতে পারেন না। তাঁরা শেষ অবধি অনিবার্য্যভাবে ব্যক্তিগত যুক্তির চূড়ান্তে আশ্রয় গ্রহণ করেন—'কিন্তু আমি যে অনুভব করি।' তর্ক চালাতে হলে আলোচনাকে তখন মনস্তত্ত্বের গণ্ডির ভিতর আসতে হয়। কিন্তু মনস্তত্ত্বেও কোন চরম সমাধান হয় না। নানা মনস্তত্ত্ববিদের নানা মত। ফ্রয়েড ধর্ম্মকে লোকাতীত বলে স্বীকার করেন না। ধর্ম্মের কোন স্বাধীন সত্তায়ও বিশ্বাস করেন না। ইয়ুং ফ্রয়েডের ছাত্র কিন্তু তিনি ফ্রয়েডের সব কথা অভ্রান্ত বলে মেনে নেননি। তাঁর নিজের গবেষণা ও ভূয়োদর্শন দিয়ে কোথাও ফ্রয়েডকে অস্বীকার করেন, কোথাও বা ফ্রয়েডীয় থিওরিকে সংশোধন করে নেন। ধর্ম্ম এবং স্বপ্ন সম্বন্ধে তিনি ফ্রয়েডীয় মতের অনুগামী নয়। তিনি ধর্ম্মের বিশেষ সত্তায় বিশ্বাসী এবং ধর্ম্মকে মানবচিত্তের সত্য প্রকাশ বলে মনে করেন। ব্যক্তি বিশেষের স্বপ্নলব্ধ অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে তিনি ধর্ম্মের মনস্তাত্ত্বিক অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে তিনি দেখিয়েছেন মনস্তত্ত্ব কি ভাবে ধর্ম্ম-সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে।

ধর্ম্ম বলতে ইয়ুং বোঝেন "a careful and scrupulous observation of…the 'numinosum', that is, a dynamic existence or effect not caused by an arbitrary act of the will"। ধর্ম্ম হ'ল numinosumএর অনুভূতি এবং তার উপর বিশ্বাসের দ্বারা পরিবর্ত্তিত মানব চেতনার বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি। বিভিন্ন ধর্ম্মমত বা creed এই মৌলিক ধর্ম্ম অনুভূতির codified এবং dogmatized বিভিন্ন আচার। কিন্তু মনস্তত্ত্ববিদের কারবার হ'ল শুধু মৌলিক অভিজ্ঞতা নিয়ে। দেখা গেছে যে এ রকম কোন অভিজ্ঞতা স্বীকার করতে লোকে দ্বিধা বোধ করে। তার কারণ অবশ্য যে প্রত্যেক neurosis ব্যক্তিগত জীবনের ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে গ্রথিত। কিন্তু সমস্ত স্বীকার করতে এই ভয় বা লজ্জা বা সঙ্কোচ কেন? লোকে নিজের কাছে অনেক

জিনিষ স্বীকার করতে দ্বিধা বোধ করে ; এমন কি ভয় পর্য্যন্ত করে। কিন্তু কেন ? মানুষ অদম্য কিছুকে ভয় করে। তাহলে কি মানুষের মধ্যে এমন কিছু আছে যা তার নিজের থেকে—তার অহম্ থেকে—অধিক বলবান ? একটা কথা মনে রাখতে হবে যে neurosis মানেই নিজের উপর বিশ্বাস কমে যাওয়া। কিন্তু তেমনি আবার এমন লোকও আছে যারা নিজেদের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞ নয়। অথচ তারাও এর কবলে পড়ে। তারা একটা অবাস্তব কিছুর কাছে পরাজয় স্বীকার করে। ওইটিকে ইয়ুং অবাস্তব বলে স্বীকার করতে রাজি নন। তার কোন জড় অস্তিত্ব না থাকতে পারে। কিন্তু তাই বলে তা অবাস্তব নয়। কারণ তার মনস্তাত্ত্বিক অস্তিত্ব আছে। এবং psyche'র বা মনের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হবে। এমন কি psyche যে শুধু আছে তাই নয় "it is even existence itself"। Psyche কেবলমাত্র চেতনা নয়, অচেতন মনও psyche'র অন্তর্ভুক্ত। এবং মানুষের এমন অভিজ্ঞতা আছে যার মূল সচেতন মনে পাওয়া যায় না। "It appears to be an autonomous development intruding upon the consciousness।" এবং লোকে তাই "prefer 'to take into account and to observe carefully' factors external to their consciousness"। বেশির ভাগ লোকেরই অচেতন মনের সম্ভাব্য আধেয় বস্তুগুলি সম্বন্ধে একটা আদিম দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। সব থেকে বেশি থাকে অজ্ঞাত "perils of the soul" সম্বন্ধে একটা গোপন ভয়। অচেতনার এই অ-ব্যক্তিক (non-personal) শক্তিগুলি সম্বন্ধে মানুষের ভীত হবার যথেষ্ট কারণ আছে। এগুলি আমাদের প্রাত্যহিক ব্যক্তিগত জীবনে দেখা দেয় না বলেই এদের সম্বন্ধে আমরা নিরুদ্বেগ অজ্ঞতায় বাস করি। মানব মন বা psycheকে ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে মনে করা ভুল হবে। এমন আকস্মিক ঘটনা ঘটে থাকে যা ব্যক্তিগত প্রবর্ত্তনার আলোয় বোঝান যায় না। আকস্মিক সমষ্টিগত শক্তির দ্বারা চরিত্র যে কি ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়ে যায় তা আশ্চর্য্যজনক। লোকে বহিঃস্থ অবস্থার দোহাই দিতে চায়। কিন্তু আমাদের ভিতরে যা নেই তা কেমন করে আমাদের এমন পরিবর্ত্তন করবে ? বলতে গেলে আমরা যেন সর্ব্বদাই একটা আগ্নেয়গিরির উপর বাস করছি। এবং যতদূর আমরা জানি,

তার সম্ভাব্য অগ্ন্যুৎপাতের ধ্বংসের বিরুদ্ধে আমাদের আত্মরক্ষার কোন মানবীয় উপায় নেই। অতএব দেখা যাচ্ছে যে মানুষের মধ্যে সম্পূর্ণ নিজের সত্তা-বিশিষ্ট একটা স্বাধীন শক্তি আছে—অচেতন মন। এই অচেতন মন মানুষের সচেতন মনের থেকে অধিক বলবান এবং সচেতন মনকে ক্রমাগত প্রভাবান্বিত করতে চেষ্টা করছে। এই অচেতন মনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় স্বপ্নের মধ্য দিয়ে। আদিম লোকেরা স্বপ্নকে এই ভীতিপ্রদ অজ্ঞাতের কণ্ঠস্বর বলে বিশ্বাস করে। অচেতনার আকস্মিক এবং বিপজ্জনক প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য অজস্র ধর্ম্মমত (creeds) এবং আচার অনুষ্ঠান আছে। এই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা ক্রমশ বেড়েই গেছে এবং প্রত্যেক ধর্ম্মের মধ্যেই দেখা যায়।

ফ্রয়েডের স্বপ্ন-মতকে অস্বীকার করে ইয়ুং বলেছেন যে স্বপ্ন হ'ল একটা স্বাভাবিক ঘটনা। এবং এমন কোন কারণ নেই যার জন্য আমাদের ধরে নিতে হবে যে আমাদের বিপথে নিয়ে যাবার জন্য স্বপ্ন একটা শঠ কৌশল ভিন্ন কিছু নয়। যখন স্বপ্ন দেখা যায় তখন চেতনা এবং ইচ্ছাশক্তি লুপ্ত থাকে। যারা neurotic নয় এমন লোকেরাও স্বপ্ন দেখে। অতএব ইয়ুং বিশ্বাস করেন যে আমাদের স্বপ্ন সত্যই ধর্ম্মের কথা বলে এবং তাই বলতেই চায়। স্বপ্ন যেহেতু পূর্ণাঙ্গ হয় এবং সামঞ্জস্য রেখে চলে অতএব তাতে একটা লজিক এবং সঙ্কল্প নির্দ্দিষ্ট হয়। অর্থাৎ স্বপ্নের আগে অচেতন মনে একটা অভিপ্রায় প্রজনিত হয় (motivation) এবং সেইটাই প্রকাশিত হয়।

আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। প্রায় প্রত্যেক অভিজ্ঞতার, ঘটনার অথবা বিষয়ের খানিকটা কিছু থাকে যা আমাদের অজ্ঞাত। অতএব আমরা যদি একটা অভিজ্ঞতার সামগ্র্যের কথা বলি, 'সামগ্র্য' কথাটি কেবলমাত্র আমাদের অভিজ্ঞতার সচেতন অংশটির প্রতিই প্রয়োগ করতে পারি। আমরা যখন ধরে নিতে পারি না যে কোনও বিষয়ের সামগ্র্য আমাদের অভিজ্ঞতাভূত, তখন একথা স্বয়ম্প্রকাশ যে তার নিরবচ্ছিন্ন সমগ্রতার মধ্যে একটি অনভিজ্ঞাত অংশ থাকবে। Psyche'র বেলায়ও একথা খাটে। Psyche'র সামগ্র্য সচেতন মনের থেকেও বৃহত্তর। মানবীয় ব্যক্তিত্বে দু'টি বস্তু আছে—চেতনা এবং তার মধ্যে যা পড়ে এবং দ্বিতীয়তঃ অচেতনার অনির্দ্দিষ্ট বিস্তার।

প্রথমটি হ'ল মোটমুটি ভাবে সংজ্ঞাবদ্ধ ও সীমাবদ্ধ। কিন্তু মানুষের ব্যক্তিত্বের সামগ্র্য ধরতে গেলে কোন সম্পূর্ণ সংজ্ঞা বা বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিত্বের অনিবার্য্যভাবে একটা অপরিমেয় এবং অনির্দ্দেশ্য অন্য কিছু আছে যার অস্তিত্ব না মেনে নিলে কেবলমাত্র ব্যক্তিত্বের সচেতন অংশটির সাহায্যে গুটিকতক পর্য্যবেক্ষণীয় ঘটনাকে বোঝা যায় না। এই অজ্ঞানিত অংশটিকেই অচেতনা বলা হয়। সচেতন ব্যক্তিত্ব যে পূর্ণতর ব্যক্তিত্বের অংশ-বিশেষ স্বপ্নে সেই পূর্ণতর ব্যক্তিত্বটির শ্রেষ্ঠতর প্রজ্ঞা এবং বিশুদ্ধতা প্রকাশ পায়। কয়েকটি স্বপ্ন বিশ্লেষণ করে ইয়ুং দেখিয়েছেন যে স্বপ্নদ্রষ্টা তার অভিজ্ঞতার দুর্ব্বোধ্য numinous বৈশিষ্ট্য শেষ অবধি স্বীকার না করে পারেন নি। অর্থাৎ ধর্ম্মের অস্তিত্ব আছে বলেই তাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। ধর্ম্মকে অস্বীকার করলেও তার অনস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। ধর্ম্ম কোন না কোন আকারে মানুষের মনে তার অধিকার বজায় রাখে। এমনকি সচরাচর লোকে যাকে ধর্ম্ম বলে, যাকে ইয়ুং creed বলেছেন, মানব সমাজে তারও একটা বিশেষ সার্থকতা আছে। এই লৌকিক ধর্ম্ম বা creed বলতে গেলে একটি বদলি মাত্র। অর্থাৎ ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ অনুভূতির জায়গায় এই creed-এর সুব্যবস্থিত আকারে উপযুক্ত প্রতীকসকল বসান হয়েছে। এই creed-এর প্রাণ হ'ল dogma ও আচার অনুষ্ঠান। এই creed-এ বিশ্বাস যতক্ষণ থাকে মানুষ ততক্ষণ প্রত্যক্ষ ধর্ম্মানুভূতির বিরুদ্ধে সুরক্ষিত থাকে। প্রত্যক্ষ ধর্ম্মানুভূতি যদি হয় ত church তার সমাধান করে দেবে। যারা dogma-র সিদ্ধান্ত স্বীকার করে না তাদের মনে যে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা চলে তা যেমনি অদ্ভুত তেমনি ভয়ঙ্কর। জ্ঞানালোকিত যুক্তিবাদ যে অতিসাধারণবুদ্ধি আধুনিক প্রজ্ঞাবানদের বৈশিষ্ট্য তাদেরও একটা আত্মরক্ষার দৃঢ় আশ্রয় আছে—'বৈজ্ঞানিক' ছাপ মারা যা কিছুতে তাদের দারুণ বিশ্বাস। ইয়ুঙের মতে বৈজ্ঞানিক থিওরির, তা যতই সূক্ষ্ম হোক না কেন, মনস্তাত্ত্বিক মূল্য dogma'র থেকে কম। কারণ dogma প্রতিমূর্ত্তির ভিতর দিয়ে Psyche'র মত একটা অতি-যৌক্তিক (irrational) অস্তিত্বকে প্রকাশে করে বৈজ্ঞানিক থিওরি যা করতে অসমর্থ। বৈজ্ঞানিক থিওরি কেবলমাত্র সচেতন মনকে প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু dogma "on the contrary expresses aptly the living process

of the unconscious in the form of the drama of repentance, sacrifice and redemption".

বিপদসঙ্কুল অচেতনা এবং মানুষের মধ্যের আশ্রয় আচ্ছাদন আধুনিক কালে ভেঙে গেছে। তাই একটা প্রচণ্ড শক্তি ছাড়া পেয়ে তৎক্ষণাৎ অনুসন্ধিৎসা এবং আহরণলিপ্সার পুরানো পথে ঢুকে পড়ল, যার ফলে "Europe became the mother of dragons that devoured the greater part of the earth"। আধুনিক সময়ে dogma'র রক্ষাকারী ধর্ম্মের প্রাকার ভেঙে যাওয়াতে এবং মানুষের মন অন্যদিকে আকৃষ্ট হাওয়াতে অচেতন মনের দুর্ব্বোধ্য শক্তি-গুলির কথা মানুষ একেবারে ভুলে গেছে। সেই শক্তিগুলি আজ আমাদের অস্থিরতা এবং ভয়ের সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছে। যুক্তিবাদে আধুনিক মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস সত্ত্বেও যুক্তির দ্বারা আজ কোন সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। যে সমষ্টিগত শক্তি আজ এই বিপর্য্যয় এনেছে মানবীয় শক্তি তাকে শাসন করতে সক্ষম নয়। dogmaকে অস্বীকার করলেই ধর্ম্মকে ধ্বংস করা হয় না। অন্য কোনও নামে—রাষ্ট্র অথবা কোন ism-এর নামে—সেই একই ধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকে। এবং মানুষ তার কাছ থেকে সেই একই আশা-প্রত্যাশা করে যা সে ভগবানের কাছে করত। ইয়ুং স্বপ্নদ্রষ্ট প্রতীকের আলোচনা করে বলেছেন যে ধর্ম্মসংক্রান্ত কয়েকটি প্রতীক গ্রীকদের আমল থেকে চলে আসছে। এসব বিষয়ে অজ্ঞ লোকেরাও স্বপ্নে একই প্রতীক দেখে থাকে। অর্থাৎ যারাই ওই অভিজ্ঞতা পেয়েছে তাদের অচেতন মন দুই হাজার বৎসর ধরে একই চিন্তার ধারায় চলে আসছে। এই রকম ধারাবাহিকতা খালি থাকতে পারে যদি আমরা ধরে নিই যে একটা বিশিষ্ট অচেতন অবস্থা জীবতাত্ত্বিক উত্তরাধিকারসূত্রে চলে আসছে। অতএব বুঝতে হবে যে যে-মনস্তাত্ত্বিক অবস্থায় ধর্ম্ম সমৃদ্ধি লাভ করেছিল আজও সেই মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা রয়েছে—অন্ততঃ একটা বিশিষ্ট মনভাবসম্পন্ন শ্রেণীর লোকেদের পক্ষে।

বইখানি পড়ে মনে হয় যে ইয়ুং যেন ব্যক্তি বিশেষের অভিজ্ঞতা বিচার করে তাঁর সিদ্ধান্তগুলি সাধারণভাবে প্রয়োগ করেছেন। অন্যধারে আবার তাঁর লেখা থেকে মনে হয় যে তিনি ব্যক্তিগত অচেতন মনের অস্তিত্ব যতটা না স্বীকার করেছেন অচেতন মনের একটা সমষ্টিগত অস্তিত্বকে স্বীকার করেছেন। শেষ

অবধি তাহলে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য কোথায় দাড়ায়! অথচ ধর্ম্মকে চরম অবস্থায় ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে না স্বীকার করলে তার কোন অর্থ হয় না। ধর্ম্ম বিশিষ্ট ব্যক্তিগত মনস্তাত্বিক অবস্থাতেই বেঁচে রয়েছে। আধুনিক জগতের অবস্থার জন্য অচেতন মনকে দায়ী করার থেকে মানুষের সচেতন প্রয়াসকেই দায়ী করতে হবে। ইতিহাসের যদি কোন নৈর্ব্যক্তিক শক্তি থাকে তার মূল অনুসন্ধান করতে অচেতনার রাজ্যে যাবার কি বিশেষ প্রয়োজন আছে? ইয়ুং বলেছেন যে তিনি খুব বহিরাশ্রয়ী হয়ে তাঁর বইটি লিখেছেন। কিন্তু শেষ অবধি সে ধারণা পোষণ করা শক্ত হয়। যাই হোক, তাঁর বইখানি যে অত্যন্ত চিন্তা-উদ্দীপক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

শ্রীপ্রবীরচন্দ্র বসু মল্লিক

Japan Over Asia—By William Henry Chamberlain. (Duckworth) 15/-

'ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর' পত্রিকার সুদূর প্রাচ্যের প্রধান সংবাদদাতারূপে লেখককে দুই বৎসরের উপর টোকিওতে অবস্থান করতে হয়। জাপানের বিভিন্ন অঞ্চল ছাড়াও চীন, মাঞ্চুকুও, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ও পূর্ব্ব এশিয়ার প্রত্যেক দেশ তিনি পর্য্যটন করেন। এইভাবে বর্ত্তমান জাপান সম্পর্কে যে-সব তথ্য তিনি সংগ্রহ করেছেন, তাই এই গ্রন্থের প্রধান উপাদান। জার্ম্মেনী ও ইটালীর মতো জাপানকেও জগতের একটি প্রধান অতৃপ্ত শক্তি বলা যেতে পারে। ইটালীর ফ্যাশিষ্ট প্রজ্ঞাবাদী মহল বিশ্বাস করতেন যে, বুর্জোয়া ও প্রলিটারিয়েট-এর মধ্যে যেমন শ্রেণী-সংগ্রাম বর্ত্তমান, অনুরূপ শ্রেণী-বিরোধ ধনী ও দরিদ্র জাতিদের মধ্যেও থাকতে পারে। জার্ম্মেনীর ন্যাশনাল সোশ্যালিষ্ট নেতাগণের মতানুসারে তাঁদের দেশের অর্থনৈতিক সঙ্কটের প্রধান কারণ হচ্ছে—প্রয়োজনীয় কাঁচা মালের উপযোগী উপনিবেশের অভাব। মাঞ্চুকুও অধিকার করা সত্বেও জাপানের এই সমস্যার বিশেষ কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নি। সমাজ সম্পর্কীয় ও অর্থনীতি বিষয়ক জাপানী বই পড়লে বোঝা যায় যে, অত্যধিক জনসংখ্যাই

জাপানের সঙ্কটের জন্য মূলত দায়ী। জাপানী শিল্পের যা প্রধান উপকরণ যেমন তুলা, পশম, রবার ও তৈল, তার জন্য জাপানকে প্রায় সম্পূর্ণরূপেই বিদেশের উপর নির্ভর করতে হয়। তাদের না আছে প্রচুর পরিমাণে খনিজ পদার্থ, না আছে লৌহ সীসা প্রভৃতি ধাতুর খনি। ইংল্যাণ্ডে নর্‌ম্যান এঞ্জেল প্রমুখ এক দলের বিশ্বাস যে, অতৃপ্ত শক্তিপুঞ্জের তথাকথিত অভাব-অভিযোগ আসলে ভিত্তিহীন। কারণ তাঁদের মতে, প্রয়োজনীয় কাঁচা মালের উৎপাদকগণ ক্রেতা পাওয়ার জন্য সদাই উৎসুক। সুতরাং যে জাতির কাঁচামাল নেই, তারা অনায়াসে সুলভতম হারে তাদের দরকার মতো কাঁচা মাল কিনে দেশের শিল্প গঠন করতে পারে। এই যুক্তির মধ্যে যে সত্যের ভাগ একেবারেই নেই, তা' নয়। কিন্তু পৃথিবী আজ এমন এক অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, যখন জাতীয়তা ও সংরক্ষণশীলতার উপরই অর্থনৈতিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। ফলে গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মতো যাদের বড় বড় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য আছে, অথবা আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়ার মতো যারা নিজেদের সম্পদে সমৃদ্ধ, তাদের সঙ্গে জাপানের মতো দরিদ্র জাতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সম্ভব নয়। একে ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার চাপ; তার উপর কাঁচা মালের অভাব। সুতরাং পরস্বাপহরণ করা ছাড়া জাপানের গত্যন্তর নেই। জন্ম-নিরোধ, স্থানান্তরে বসতিস্থাপন এবং দেশকে শিল্পপ্রধান করতে পারলে জাপানের জনসংখ্যা-সমস্যার শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধান হওয়া সম্ভব। কিন্তু জন্ম-নিরোধের পন্থা জাপানের কর্ত্তৃপক্ষের মনঃপূত নয়। অন্যত্র বসবাস করবার জন্যই বা এত লোক যাবে কোথায়? গত কয়েক বৎসরের মধ্যে একমাত্র যা তারা শিল্পের আশ্চর্য্য উন্নতি করেছে। তাও রপ্তানী-বাণিজ্যে জাপানের উন্নতি শুল্কের প্রাচীরের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হ'চ্ছে। প্রাচ্যের জন্মহার ও পাশ্চাত্যের মৃত্যুহারের সমীকরণের ফলে এশিয়া ছাড়া অন্য কোথাও তাদের রাজ্যবিস্তার করবার উপায় নেই। সেই জন্য জাপান আমাদের ত্রাণকর্ত্তা সেজে এশিয়া থেকে "শ্বেত সাম্রাজ্যবাদ" উচ্ছেদ করবার সঙ্কল্প করেছে। উদ্দেশ্য সাধু, সন্দেহ নেই। চীনের নিরীহ শিশু ও নারীর উপর বর্ব্বরোচিত অত্যাচার, চীনের সংস্কৃতি লুপ্ত ক'রে দেবার জন্য গ্রন্থাগারে অগ্নিপ্রদান—এই সব কিছুর ভিতর দিয়ে আমরা জাপানের সাধুতারই পরিচয় পাচ্ছি। চীনকে সমুচিত

শিক্ষা দেওয়ার জন্য জাপান নাকি ৫৭,৪০,০০০,০০০৲ টাকা ধার্য্য করেছে। অবশ্য, পরিশেষে শিক্ষা যে কার হবে, তার আভাস এখন থেকেই কিছু কিছু পাওয়া যাচ্ছে। এই কিছুদিন আগে রজনী পাম দত্ত বলেছেন: 'সম্মিলিত জাতীয় প্রতিরোধ-শক্তির সামনে চীন-যুদ্ধে জাপানকে ভয়ানক বিপদে পড়তে হয়েছে। জাপানের ধনভাণ্ডার ক্রমশঃ ফুরিয়ে আসছে। অতিরিক্ত আমদানীর মূল্য যোগাতে গিয়ে গত বৎসর জাপানের অর্দ্ধেক স্বর্ণসঞ্চয় নিঃশেষিত হয়েছে। গত ১৮ মাসে ট্যাক্স তিনগুণ বেড়ে গিয়েছে। পণ্যমূল্য শতকরা ৩৬ ভাগ বেড়ে যাওয়ায় ও মজুরী হ্রাস পাওয়ায় সাধারণ অসন্তোষ ঘনিয়ে উঠছে।' গত বৎসর অর্থাৎ ১৯৩৭ সালে জাপানে সর্ব্বশুদ্ধ ৭০৪ বার শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয়; ৬৩,১৯৭ জন শ্রমিক এতে লিপ্ত ছিল। তাও আমাদের মনে রাখতে হবে, সেখানে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন আশানুরূপ গড়ে ওঠেনি। কারখানার ৩,০০০,০০০ শ্রমিকের মধ্যে শতকরা ১৫ জনও ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য নয়, 'লাল আতঙ্কের' জন্য জাপানীরা অত্যন্ত সাবধান। বিশিষ্ট জাপানী কথাশিল্পী তাকিজি কোবায়াশি সাম্যবাদে বিশ্বাস করতেন ব'লে ১৯৩৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি জাপানী পুলিশ তাঁর উপর এমনই অত্যাচার করে, যার ফলে তৎক্ষণাৎ তাঁর মৃত্যু হয়। এই সব দেখে শুনে মনে হয় যে, জাত হিসাবে জাপান সকল দিক দিয়েই একেবারে নিঃস্ব হ'য়ে পড়েছে। তাই তাদের বর্ত্তমান আচরণের মধ্যে দিয়ে এই কথাটাই ভালো ক'রে বুঝতে পারা যায় যে, আমরা সভ্য যুগে বাস করছি না; এখনো মধ্য যুগেই আছি।

অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

সাঙ্গীতিকী—দিলীপকুমার রায়। (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)।

(ক)

যদিও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই গ্রন্থটি মুদ্রিত করেছেন, তথাপি আমাদের মনে রাখা কর্ত্তব্য গ্রন্থকারের ভূমিকায় তাঁর নিজের উক্তি। এই বইএর দৃষ্টিভঙ্গি কি ধরণের হওয়া উচিত তার নির্দ্দেশ তিনি পেয়েছেন শ্রীঅরবিন্দের একটি লিখিত পত্র থেকে। কিন্তু ডিসেম্বর ১৯৩৫এ লিখিত পত্রের উদ্ধৃতাংশ

পাঠ করলে সেরূপ কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত আবিষ্কার করতে পারি না। সেই জন্যে পুস্তকটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দেশমত লিখিত হয়েছে অনুমান করেই এই সমালোচনা।

বইটি প্রধানতঃ দুই অংশে বিভক্ত—(১) মার্গ সঙ্গীত (২) দেশী সঙ্গীত (কাব্য সঙ্গীত)। প্রথমাংশে, রাগ, ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী ইত্যাদির ক্রমবিকাশ ও রূপ বর্ণনার চেষ্টা আছে। দ্বিতীয়াংশে, গজল, কীর্ত্তন, বাউলের বিবরণ, বাংলা গানের ক্রম, সুর ও কথার সম্বন্ধ বিচার এবং পরিশেষে বাংলা গানের চরম পরিণতির আদর্শ ও তদ্বিষয়ে গ্রন্থকারের মতামত সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

(খ)

বাংলাদেশে সঙ্গীতচর্চ্চা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। জাতির সংস্কৃতির পক্ষে এ চর্চ্চা রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আজকাল বড় একটা কেউ সন্দিহান নন্। বাংলার নিজস্ব দান সঙ্গীতে যথেষ্ট। কিন্তু হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ধারা নিজস্ব করে নিতে পারার মধ্যেও একটা তৃপ্তি আছে, এবং এখনো বাংলায় সেরূপ গুণীর অভাব নেই যাঁরা বঙ্গ-বহির্ভূত সঙ্গীতের সঙ্গ ত্যাগ না করেও বাঙালী সহৃদয় শ্রোতার মনে সুরের আনন্দ জাগিয়ে তুলতে পারেন। সুরের রাজ্যে প্রাদেশিকতার প্রাদুর্ভাব হওয়াটা বাঞ্ছনীয় নয়।

সুরলোকে সুরের সম্মান স্বাভাবিক। মর্ত্ত্যলোকে যাঁরা সুরতরঙ্গ বহন করে আনেন—তাঁরা নমস্য কিন্তু যাঁরা কর্ত্তব্য ভুলে গিয়ে শুধু কর্ত্তব্যের খাতিরে জয়োল্লাসে পাতালপুরীতে প্রবেশ করেন পাতালেই তাঁদের অবস্থান করা উচিত।

ওস্তাদিপনা সব আর্টের অবনতির সময় দেখা দেয়। যেমন আগাছা না কাটলে বাগানে ফুল ফুটলেও শ্রী ফোটে না, তেমনি ওস্তাদিপনাকে প্রশ্রয় দিলে গানের শ্রী স্বকীয় অধিকারে বঞ্চিত হয়। "সাঙ্গীতিকীতে" দিলীপকুমার ৺কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তথাকাথত ওস্তাদদের প্রতি যে ব্যঙ্গোক্তি করেছেন, তার জন্য বাঙালী পাঠক তাঁর কাছে ঋণী থাকবে।

দিলীপকুমার এককালে সুরের মোহে অভিভূত হয়েছিলেন—এত অভিভূত যে কণ্ঠসঙ্গীতে কথার মূল্য অতি সামান্যই দিতে চাইতেন। এখন তাঁর সে মোহ কেটেছে। এখন তিনি বলেন (পৃঃ ১৪৭) "যে গানে কথার কাব্যরস

আছে, সেখানে সুর যদৃচ্ছ উড়ে বেড়াতে পারে না, কেন না সে আর একলা নেই, পেয়েছে কথাকে সঙ্গিনী।"

এ মত পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে তিনি বহু তর্ক আলোচনা করেছেন, এবং সবচেয়ে বেশী লাভ করেছেন দু'জনের আলোচনায়—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অমিয়নাথ সান্যাল। রবীন্দ্রনাথের অনেক মূল্যবান উক্তি "সাঙ্গীতিকী"তে উদ্ধৃত হয়েছে। কবির পক্ষে কথাকে প্রাধান্য দেওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে কথার প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখান্ নি। কেন না, তিনি নিজে শুধু কবি নন্, গানের গুণগ্রাহী ও সঙ্গীতস্রষ্টা। "কথা বড়ো, কি সুর বড়ো" এ প্রশ্নটি অনেকটা "বর বড়ো, কি কনে বড়ো"র মতো। রবীন্দ্রনাথ বলেন—"সুরের সঙ্গে কথার মিলন কেউ রোধ করতে পারবে না। ওরা পরস্পরকে চায়, সেই চাওয়ার মধ্যে যে প্রবল শক্তি আছে সেই শক্তিতেই সৃষ্টির প্রবর্ত্তনা।" অমিয়নাথের "গানের সমালোচনা" প্রবন্ধ "পরিচয়" পত্রিকায় (পৌষ-মাঘ, ১৩৪৪) প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি কথাহীন কণ্ঠ-নিঃসৃত সুরকে যন্ত্রবাদনের সমপর্য্যায়েই ফেলেন।

(গ)

প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে গ্রন্থকারের নিতান্ত অনাস্থা। "শাস্ত্রিক ঘনঘটায়" শীর্ষক অধ্যায়ে 'ভরত-নাট্যশাস্ত্রে'র আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন (পৃঃ ১০),—"এই বইটিতে প্রাচীন সঙ্গীতাদি সম্বন্ধে দু'চারটি চিত্তাকর্ষক তথ্য পাওয়া যায় বৈকি। পাতা উলটে পালটে দেখা মন্দ নয়—যদিও এ ধরণের বই পড়তে গেলেই মনে হয় ইংরাজীতে তিনটি কথা "words! words! words!"

দেব ভাষায় প্রণীত "ভরত নাট্য-শাস্ত্র" সঙ্গীত সম্বন্ধে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। দুঃখের বিষয় সমগ্র গ্রন্থটির পাশ্চাত্য ভাষায় অনুবাদ এখনো পর্য্যন্ত না হওয়ায় সাধারণের নিকট শাস্ত্রটি সুগম নয়। মূল গ্রন্থ যাঁরা শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ করেছেন, তাঁদের কাছে দিলীপকুমারের এই মন্তব্যটি সমাদৃত হবে বলে মনে হয় না।

প্রাচীন শাস্ত্রে শ্রদ্ধার অভাব থাকলে ইতিহাস-প্রত্নতত্ত্বের প্রতি ভক্তি সহজে আসে না। সেই জন্যেই বোধ হয় গ্রন্থকার ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিকদের দিকে অকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। তাঁর দুটি প্রতিপাদ্য তাঁর ভাষাতেই বলি (পৃঃ ৯) :—

"প্রথম, আমাদের সাঙ্গীতিক ইতিহাসের যে আঁতুড়েই পঞ্চত্ব লাভ ঘটেছে এজন্যে খুব বেশি পরিতাপের হেতু নেই; দ্বিতীয়, বর্তমান সময়ে সঙ্গীতের ধারাসংবদ্ধ ইতিহাস নিয়ে বেশি গবেষণা করাটা খতিয়ে পণ্ডশ্রম হবে।... অতএব এ বইটিতে ডেটার ঘটাবহুল সাঙ্গীতিক ইতিবৃত্ত নিয়ে গুরুগম্ভীর গবেষণার দিকে আমরা আদৌ ঝুঁকব না; আমাদের আলোচনার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকুক—আমাদের সাঙ্গীতিক ক্রমবিকাশের মূল ধারাটির দিকে। এ ধারাটুকুর মর্ম গ্রহণ করতে যতখানি ইতিহাস জানার দরকার হয় কেবল ততখানি ইতিহাস অনুসন্ধান করব সাধ্যমত।"

তবেই বোঝা যায়, "সাঙ্গীতিক ক্রমবিকাশের মূল ধারাটির মর্ম" গ্রহণ করতে হলে "ইতিহাস জানার দরকার হয়।" এখানে "মূল" শব্দের মূল্য দিলে স্বীকার করতে হবে, মূল সঙ্গীতশাস্ত্রের মর্মগ্রহণ-প্রয়াসে সার্থকতা আছে, এবং প্রাচীন শাস্ত্রে সম্যক্ শ্রদ্ধা ব্যতিরেকে সে-প্রয়াস সফল হওয়া অসম্ভব।

(ঘ)

বইটি উচ্ছ্বাসবহুল। গায়ক দিলীপকুমার ও গ্রন্থকার দিলীপকুমারের এ বিষয়ে খুব মিল। একথা স্বীকার্য্য যে উচ্ছ্বাসের মৃতসঞ্জীবনী শক্তি আছে; এবং যে সময়ে বাংলাদেশে গান প্রায় মুমূর্ষু ঠিক্ সেই সময়েই হয়েছিল দিলীপকুমারের অভ্যুদয়। কিন্তু য়ুনিভর্সিটির পাঠ্যপুস্তকে—বিশেষত সঙ্গীতের ক্রমবিকাশের মূল ধারা আলোচনা করাই যে পুস্তকের মুখ্য উদ্দেশ্য—সেখানে সেরূপ উচ্ছ্বাসের স্থান আছে কিনা সন্দেহ। তাছাড়া, কী গানে, কী লেখায়, উচ্ছ্বাসের একটা বিপদ এই যে সে কখনো কখনো মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। এ উচ্ছলতার উদাহরণ 'সাঙ্গীতিকী'তে বিরল নয়। এবং তরুণ শিক্ষার্থীদের অধ্যয়নের সহায়রূপে কল্পিত গ্রন্থে উচ্ছ্বাস-প্রাচুর্য্য আপত্তিকর। ঠুংরির রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে সুদীর্ঘ কবিতার অবতারণা করায় বক্তব্য অনেকটা ঝাপ্‌সা হয়ে পড়েছে (পৃঃ ৬৩-৬৬)। "গান তীর্থপথে" শীর্ষক অধ্যায়ে প্রতিপাদ্য বিষয়টির মেলোড্রামাটিক আকার দেওয়ার সার্থকতা বোঝা যায় না। মনে হয়, অধ্যায়টির উদ্দেশ্য, 'রাগ' ও 'গান'-এর দ্বন্দ্ব দেখানো এবং পরিশেষে গানের জয়গান। গান সৃষ্টিকামী, কিন্তু রাগ পূর্ব্ব-সৃষ্ট গানের নিয়মানুগামী, সুতরাং নূতন সৃজনে পুরাতন

বিধি অতিক্রম করা অসঙ্গত নয়। তবে স্মরণ রাখ্‌তে হবে, কেবলমাত্র নিয়ম-লঙ্ঘনের দ্বারা সৃষ্টির মাহাত্ম্য প্রকাশ পায় না, লঙ্ঘনকেও নিয়মিত করা চাই।

বাংলা গানে 'সাগর-পারের শক্তিমত্তা ও প্রাণ চাঞ্চল্যের ঢেউ' কিছু নতুন আমদানী নয়, যার জন্যে ভবিষ্যদ্বাণীর প্রয়োজন আছে। দিলীপকুমারের পূর্ব্বগামী সুর-কাররাও সে তরঙ্গের প্রবাহ অনুভব করেছেন। আমাদের 'রাগ', আর পাশ্চাত্য 'মেলডি', এই দুই-এর মধ্যে কোনো মূলগত পার্থক্য নেই। শ্রুতিমধুর স্বরবিন্যাস কোনো নির্দ্দিষ্ট ভৌগলিক গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাক্‌তে পারে না।

'বাংলা গানের ক্রম' অধ্যায়ে অসম্পূর্ণ বিবরণ দেখা যায়। গ্রন্থকার বলেন, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও অতুলপ্রসাদ যথাক্রমে ধ্রুপদ, খেয়াল ও ঠুংরির ভঙ্গী বাংলা গানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। রূপচাঁদ পক্ষী, গিরীশ ঘোষ, রামতারণ সান্যাল, এঁদের অসামান্য দানের উল্লেখ এ সূত্রে করা উচিত ছিল না কি? দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন হাসির গানে অদ্বিতীয়; এ সম্বন্ধেও গ্রন্থকার উদাসীন। রবীন্দ্রনাথের দান প্রসঙ্গে তিনি যা বলেছেন (পৃঃ ১৬১) তা পড়লে হঠাৎ মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ ৺রাধিকা গোস্বামীর সহযোগেই যা কিছু 'স্মরণীয় কাজ করেন বাংলা গানের চাষ আবাদে।' বাংলা গানের কাব্যসম্পদে তথা সুরসম্পদে রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ আজও পর্য্যন্ত কেউ হয়নি—একথা বোধহয় গ্রন্থকার অস্বীকার করবেন না।

(চ)

আলোচ্য-গ্রন্থে দিলীপকুমার কিছু কিছু বিদেশী রচনার বাংলা পদ্যানুবাদ দিয়েছেন। অনুবাদগুলি কতদূর সফল হয়েছে সে-বিচার এ-সমালোচনার বহির্ভূত। সম্পূর্ণ সফল হলেও এই গানের বইয়ে তারা যে-স্থান জুড়ে আছে, সে-স্থান তাদের প্রাপ্য মনে হয় না। যদি মেনে নেওয়া যায় যে কথা ও সুরে মিলে যৌগিক সৃষ্টিকেই গান বলে, তাহলে অনুবাদে সে যোগ ভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কা বিশেষভাবে বর্ত্তমান। সে যাই হোক্‌, গদ্যাংশে দিলীপকুমারের সাহিত্য সাধনার ফল সুচারুরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাঁর লিখনভঙ্গি অনবদ্য না হলেও হৃদয়গ্রাহী। নূতন শব্দ নির্ম্মাণে তিনি দক্ষ—মন-মাতানো প্রাণ-জাগানো শব্দবিন্যাসে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা অনেকস্থলে দেখা যায়।

শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব

বাঙলা সাহিত্যের নবযুগ—শ্রীশশিভূষণ দাশ গুপ্ত (রসচক্র সাহিত্য সংসদ)
তপনকুমারের অভিযান —শ্রীহেমচন্দ্র বাগচি (বাগচি এণ্ড সন্স)
কিশোর সঙ্ঘ —শ্রীমণীন্দ্র দত্ত (সরস্বতী লাইব্রেরী)
সাহসীর জয়যাত্রা —শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল (এস কে মিত্র এণ্ড কোম্পানী)

প্রথম বই 'বাঙলা সাহিত্যের নবযুগে' আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধগুলি পৃথক পৃথক ভাবে লিখিত হলেও, লেখক তলায় তলায় একটা ঐতিহাসিক অনুক্রম বজায় রাখতে চেষ্টা করেছেন। ইংরাজী আমলের গোড়া থেকে আধুনিককাল পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার পরিণতি-সূত্র ধরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই বোধ হয় এই প্রবন্ধগুলির অবতারণা। প্রসঙ্গক্রমে এতে সমসাময়িক সমাজ, সংস্কৃতি ও জীবনের কথাও এসে পড়েছে। লেখকের পড়াশুনা, লিখনশক্তি ও বিচারবুদ্ধি প্রশংসনীয়। অবশ্য বিচার-বিবেচনার ক্ষেত্রে তিনি প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচলিত মতের অনুসরণ করেছেন—এবং জনমতের অনুকূলে রায় দেয়াই নিরাপদ পন্থা সন্দেহ নেই, কিন্তু আজও বাংলার সাহিত্য-সমালোচকের কাছে আমরা যদি নির্ভীকতা আশা করতে না পারি, তাহলে সেটা দুঃখের কথা। এই স্বল্পায়তন প্রবন্ধে লেখকের দৃষ্টি ও মতের মূলসূত্র নিয়ে আলোচনার অবকাশ নেই—কাজেই ও প্রসঙ্গ এখানেই চাপা দিতে হচ্ছে। মোটের ওপর এই বইয়ের যেটা বড় কথা, তা হচ্ছে লেখকের নূতন পথে হাঁটার উদ্যম। বাংলা সাহিত্যের ইদানীন্তন কাল (অর্থাৎ বঙ্কিম, মধুসূদন, দীনবন্ধু দিয়ে সুরু করে রবীন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, শরৎচন্দ্র পর্য্যন্ত যে স্তরটি) নিয়ে এখনো পর্য্যন্ত নির্ভরযোগ্য কোন আলোচনাই হয়নি—কাজেই এই কিছু-কম এক শতাব্দীর সাহিত্য সম্বন্ধে দেশের মনে বহু ভ্রান্ত ধারণা থেকে গেছে। সেই ভ্রান্তি দূর হয়ে গিয়ে সমালোচনার কষ্টিপাথরে এঁদের সত্যিকার মূল্য নিরূপিত হবার সময় এসেছে। এই বই সেই কাজে ষোলআনা সফল হয়েছে এমন কথা বলা যায় না—তবে এ বিষয়ে লেখক পথপ্রদর্শকের কাজ করেছেন, কতক পথ নিজেও এগিয়ে দিয়েছেন। দু'একটি রচনা স্থানে স্থানে বিশেষ কাঁচা মনে হয়েছে, সেগুলিকে লেখক বইয়ে না দিলেই পারতেন। পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ সম্বন্ধেও আর একটু সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।

'তপনকুমারের অভিযান' এবং 'কিশোর সঙ্ঘ' কিশোর-কিশোরীদের উপন্যাস এবং দুইয়েরই অবলম্বিত বিষয় বাঙালী ছেলের সাহসিকতার কাহিনী। সাহসিকতার কাহিনী ছোটদের ভালো লাগে—তাই বাংলা শিশু-সাহিত্যে এখন এডভেঞ্চার কাহিনীর ছড়াছড়ি দেখা যাচ্ছে। বাঙালীর ছেলে আফ্রিকার জঙ্গলে দুৰ্দ্ধর্ষ কাফ্রি ও ততোধিক দুৰ্দ্ধর্ষ গোরিলার সঙ্গে লড়াই করছে—আটল্যান্টিকের বুকে জেলে ডিঙি ভাসিয়ে বিরাটকায় তিমি শিকার করছে, ব্রেজিলের বনে বা কঙ্গোর সোনার খনিতে মৃত্যুপণ করে কীর্ত্তির মনুমেণ্ট গড়ছে—এই সব উদ্ভট, অস্বাভাবিক ও দেশীয় চিত্তবৃত্তির সঙ্গে সংযোগ রহিত কাহিনীর ভীড়ে শিশুদের কণ্ঠরোধ হতে চলেছে। এই বাজারে বাংলার নদী বন মাঠ ঘাটে বাঙালীর ছেলের সত্যিকার সাহসিকতার গল্প পড়লে মন খুসী না হয়ে পারে না। 'তপনকুমারের অভিযান' সত্যিই খুব ভালো হয়েছে—এর ভাষা যেমন নির্দ্দোষ ও কবিত্বময়, ঘটনাসৃষ্টিও তেমি কৌতূহলোদ্দীপক। 'কিশোর সঙ্ঘ' এর তুলনায় রীতিমতো কাঁচা লেখা, ভাষা অত্যন্ত অপটু এবং পূর্ব্ববঙ্গীয় প্রাদেশিকতা-ক্লিষ্ট। ঘটনা-সৃষ্টি নিপুণ, কয়েকটা মোটা কথাও আছে, যা ছোটদের কাজে লাগবার মতো।

'সাহসীর জয়যাত্রা'য় আধুনিক জগতের কয়েকজন ডিক্টেটার, নেতা ও কর্ম্মীর জীবন-কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে। লেখা বেশ ঝরঝরে—ছোটদের পাঠ্য হবার মতো। যে সমস্ত বীরচরিত্র এতে আলোচিত হয়েছে, খবরের কাগজে প্রত্যহই তাঁদের নাম নিয়ে হৈ হৈ হয়ে থাকে। ছোটরা নাম শোনে মাত্র, তাঁদের জীবন-বৃত্তান্ত, শিক্ষা-দীক্ষা ও কর্ম্ম-প্রচেষ্টার সমগ্র পরিচয় তাদের জানা নেই। এই বই থেকে তারা হিটলার, মুসোলিনী, কামাল পাশা, ম্যাশারিক প্রভৃতির জীবন ও কর্ম্মের ইতিহাস জানতে পারবে। বইটি সময়োপযোগী এবং সুলিখিত।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

শ্রীগোবর্দ্ধন মণ্ডল কর্তৃক আলেকজান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত
ও শ্রীকুঞ্জভূষণ ভাদুড়ী কর্তৃক ১১, কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত।

৮ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা
অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫

পরিচয়

বৌদ্ধদর্শনে ঈশ্বরজিজ্ঞাসা*

হিন্দু দার্শনিকদের মধ্যে নৈয়ায়িকগণই কেবল প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বর স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, সাংখ্য বা বেদান্ত দর্শনে সেরূপ ভাবে ঈশ্বর স্বীকার করা হয় নাই, বৌদ্ধ দর্শনের তো কথাই নাই। সাংখ্য ও বৌদ্ধদিগকে এই হিসাবে নিরীশ্বর বলা যাইতে পারে; কিন্তু নিরীশ্বর হইলেই লোকে নাস্তিক হইয়া যায় না। সুতরাং আমাদের ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা দরকার, বৌদ্ধগণ ঈশ্বর স্বীকার না করিলেও বাস্তবিক নাস্তিক ছিলেন কিনা, এবং বিচারে যদি দেখা যে বাস্তবিক তাহা নহে, তবে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে বৌদ্ধগণের ঈশ্বরবিরোধিতা প্রকৃতপক্ষে নাস্তিকতার নিদর্শন নহে।

মানুষ যে স্বভাবতঃই ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে চায় তাহার প্রধান কারণ আমরা সকলেই জীবনে এমন অনেক বিষয় অনুভব করিয়া থাকি যাহা মিথ্যা বা মায়া বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া বা সম্যক্ রূপে উপলব্ধি করা সমভাবে অসম্ভব। মানুষের অন্তরস্থ প্রীতির উৎস ও নৈসর্গিক জগতের সৌন্দর্য্য কোন মানুষই কোন দিন যুক্তি দিয়া বুঝিতে বা বুঝাইতে পারে নাই, অথচ অযৌক্তিক বলিয়া এগুলি পরিহার করিয়া বাঁচিতেও বোধ হয় কোন মানুষ চাহিবে না। বৈজ্ঞানিক এখানে আপত্তি করিতে পারেন, যুক্তি দিয়া ক্রমে ক্রমে এত বিষয় বুঝিতে পারা সম্ভব হইল, আর সৌন্দর্য্য ও সম্প্রীতি যে বুঝিতে পারা যাইবে না, এরূপ কথা মনে করিবার কি কারণ আছে? ইহার উত্তরে বলিব যুক্তিদ্বারা জগতে কোন বিষয় কোন দিন সম্যক্‌রূপে

* Prabodh Basu Mullick Fellowship Lecture No. 3.

উপলব্ধি করা যায় নাই, এবং তাহা সম্ভবও নয়। কারণ প্রশ্ন মাত্র দুই প্রকারের হইতে পারে,—how এবং why। এখন how-এর উত্তর যতই সন্তোষজনক হউক না কেন, তদ্দ্বারা প্রশ্নের যে চরম শান্তি হইতে পারে না তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু why-এর উত্তর সন্তোষজনক হইলেই কি প্রশ্ন প্রশান্ত হয়? তাহাও নয়, কারণ how এবং why একই অসম্যক্ উত্তরের দুইটি দিক, উভয়ের মধ্যে বাস্তবিক জাতিগত কোন পার্থক্য নাই। বিষয় কিরূপে সংঘটিত হয়,—তাহাকেই বলে how, এবং বিষয় কিরূপে সংঘটিত হয় না, তাহাকেই বলে why। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারসৌকর্য্যবশতঃই কেবল how ও why-এর মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য সৃষ্টি করা হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক সে পার্থক্য কাল্পনিক। একটা দৃষ্টান্ত লইলেই একথা সুপরিস্ফুট হইবে। মানুষের মৃত্যু নানা কারণে ঘটিতে পারে, জরা, ব্যাধি, অনশন, অপঘাত প্রভৃতি মৃত্যুর কারণ অসংখ্য। এখন একটি বিশেষ ব্যক্তির মৃত্যু সম্বন্ধে এই নানাবিধ কারণের সম্ভাবনা যখন বর্ত্তমান তখনই তাহার মৃত্যু সম্বন্ধীয় জিজ্ঞাসাটি আমাদের নিকট how-এর আকার গ্রহণ করে। এই সম্ভব কারণের সংখ্যা যতই কমিতে থাকে how-ও ততই why-এর নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়ে এবং পরিশেষে অপর সমস্ত কারণ অপসৃত হইলে যে কারণটি অবশিষ্ট থাকে সেইটি how হইতে হঠাৎ why-এ পরিণত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে how-এর ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণতর হইয়া পড়িলেই তাহা হইতে why-এর উদ্ভব হয়। আমাদের বাধ্যবহারের মধ্যেও why ও how-এর এই সম্বন্ধ সুস্পষ্ট। কোন লোক অসুখে মারা গিয়াছে জানিলে আমরা কল্পনা জল্পনা করিতে থাকি লোকটি "হয়তো" কলেরায় মারা গিয়াছে, "হয়তো" থাইসিসে মারা গিয়াছে, ইত্যাদি। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সঠিক খবর পাওয়া যায় যে কলেরা, থাইসিস্ প্রভৃতি যে সমস্ত ব্যাধির অনুমান করা হইয়াছিল প্রকৃতই সেই সমস্ত ব্যাধির একটিতেই ঐ ব্যক্তিটির মৃত্যু হইয়াছে, সেই মুহূর্ত্তেই আমরা "হয়তো" ছাড়িয়া বলিতে আরম্ভ করি "কারণ" তাহার অমুক ব্যাধি হইয়াছিল। কাজেই স্বীকার করিতে হইবে how-এর ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িলেই why-এর উদ্ভব হয়। কিন্তু how-এর ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ার অর্থ কি? How আমাদিগকে বলিয়া দেয় কিরূপে

একটি বিষয় সংঘটিত হইতে পারে। এখন how-এর যাহা বিপরীত তাহার দ্বারাই how-এর ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হইতে পারে,—অর্থাৎ যে যে উপায়ে বিষয়টি সংঘটিত হইতে পারে না, তাহার অনুধাবনই হইল why-এর উদ্ভবের কারণ।

বাস্তবিকই why সর্ব্বত্র প্রধানতঃ নেতিমূলক। যে কোন ব্যাপার ঘটিয়াছে শুনিলেই তৎসম্বন্ধে বহুবিধ কারণের কথা সংশয়াবস্থায় আমাদের মনে আসে। কিন্তু তাহার পর বিশেষ বিশেষ জ্ঞান বশতঃ ঐ সকল বিবিধ কারণের এক একটি মন হইতে ক্রমশঃ অপসৃত হইতে থাকে, এবং পরিশেষে অনুমিত যে কারণটি অবশিষ্ট থাকে সেইটিকেই আমরা why-এর উত্তর বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি। এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে বিবিধ সম্ভাবিত কারণের মধ্যে কোন্‌গুলি প্রকৃত কারণ নহে, তাহার বিচার করিতে করিতেই মানুষ সংশয় হইতে নিশ্চয়ে আসিয়া উপনীত হয়। সুতরাং why যে নেতিমূলক তাহা স্বীকার করিতে হইবে। অর্থাৎ how হইতে যদি বুঝিতে পারা যায় ঘটনা কিরূপে ঘটে বা ঘটিতে পারে, why হইতে সেইরূপ বুঝিতে পারা যায় ঘটনা কিরূপে ঘটে না বা ঘটিতে পারে না। উপরন্তু why-এর এইরূপ পরিকল্পনা Hegelian dialectic-সম্মত, কারণ এই মতে why ও how নামক দুইটি বিরোধী ভাববস্তুর পরস্পরাপেক্ষিতাই প্রমাণিত হইতেছে। এখন ইহাই যদি why-এর প্রকৃত রূপ হয় তবে একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে এতদ্দ্বয়ের কোনটির দ্বারাই তত্ত্বনির্দ্ধারণ সম্ভব হইবে না, কারণ ঘটনা কিরূপে ঘটে বা ঘটে না তাহা জানিতে পারিলেই তৎসম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় না, এবং উভয়ের কোনটির দ্বারাই কোন প্রশ্নের চরম সমাধান হয় না। প্রশ্ন যেরূপই হউক না কেন, তাহার সম্যক্ শান্তি মানুষের সাধ্যাতীত। শান্তির একমাত্র উপায়, প্রশ্নের সম্ভাবনা বিলোপ,—অর্থাৎ সেই চতুরক্ষরমন্ত্র "তত্ত্বমসি"র উপলব্ধি।

কোন প্রশ্নেরই চরম শান্তি যদি মানুষের পক্ষে সম্ভব না হয়, তবে সকল দার্শনিককেই ঈশ্বর স্বীকার করিতে হয়। তবে সাংখ্য, বৌদ্ধ প্রভৃতি ভারতীয় দার্শনিকগণ ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই কেন, আর বিশেষ করিয়া নৈয়ায়িকগণই বা ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন কেন? এ কথার উত্তর এই যে ঈশ্বর বলিতে আমরা যাহা বুঝি বা বুঝিতে চাই তাহা এই সকল

দার্শনিক নামে না হইলেও কাজে প্রকৃতই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন এবং নৈয়ায়িকগণ যে নামেও ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন তাহারও একটি বিশেষ কারণ আছে। ঈশ্বর বলিতে আমরা বুঝি কি? ইহার উত্তরে গ্রীক দার্শনিকগণের সেই বিখ্যাত বচনটি স্মর্ত্তব্য,—sumpátheia tôn hólôn, অর্থাৎ সার্ব্বজনীন সম্প্রীতি ও সমন্বয়। অবশ্য মানুষকে যদি এই সার্ব্বজনীন সম্প্রীতির কথা জিজ্ঞাসা করা হয় তবে নিশ্চয়ই শতকরা নিরানব্বই জন বলিয়া উঠিবে মনুষ্য সমাজে সম্প্রাতির কোন স্থানই নাই, কারণ একজন যদি হয় মিত্র তবে অন্ততঃ একশত জন হয় শত্রু। একথা যে সত্য নয় তাহা বলাই বাহুল্য, কারণ মানুষের পক্ষে যে সমাজ বাঁধিয়া বাস করা সম্ভব হইয়াছে, তাহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে মানুষ স্বল্পপরিমাণে বৈরভাবাপন্ন হইলেও মিত্রভাব পোষণ করাই তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। প্রীতি ও সহানুভূতি আমরা স্বতঃসিদ্ধরূপে ধরিয়া লই বলিয়াই তাহা আমাদের চোখে পড়ে না, চোখে পড়ে কেবল এই নিয়মের যাহা ব্যতিক্রম। কিন্তু এই সামাজিক সম্প্রীতি নিতান্তই একটি ব্যাবহারিক তথ্য মাত্র, ইহার সাহায্যে পারমার্থিক সত্য সম্বন্ধে অনুমান সম্ভব নহে, যদিও একথাও ঠিক যে তথ্য মাত্রেই পরমার্থ সত্যের ছায়া বিশেষ।

এই সার্ব্বজনীন সম্প্রীতিরই পারমার্থিক অর্থ এখানে আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়। নানা জীব ও বস্তু সারা বিশ্বে পৃথক্ পৃথক্ অবস্থান করিতেছে এবং আমাদের সুপরিচিত এমন কোন কারণই নাই যেজন্য এই সকল পৃথক্ পৃথক্ জীব ও বস্তুর পরস্পর সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠা সম্ভব হইতে পারে। বাস্তব জগতে কিন্তু দেখা যায় কি? বস্তু জীব সম্বন্ধে চেতনশীল হয় কি না সে সম্বন্ধে আমরা এখনও অজ্ঞ; কিন্তু জীবের পক্ষে যে অপর জীব বা বস্তু সম্বন্ধে সচেতন হওয়া সম্ভব তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু এই সম্ভাবনাই বা সম্ভব হয় কেন? সম্পূর্ণ পৃথক্ দুইটি জীব বা বস্তুর একটির অপরটি সম্বন্ধে সচেতন হওয়া সম্ভব নয়, কারণ সেই চেতনা বা সংবেদনা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, অনুভাবক ও অনুভূয়মান জীব বা বস্তুদ্বয় পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক্ নয়; উহাদের মধ্যে আর সকল সম্বন্ধই না হয় অস্বীকার করিলাম, কিন্তু উহাদের মধ্যে যে-বিশেষ সম্বন্ধ থাকার জন্য একটি অপরটি সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিতে পারে,—সেই সম্বন্ধটি কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যাইবে না। সুতরাং বিশ্বস্থ এই অসংখ্য বিবিধ

জীব ও বস্তুর মধ্যে একটি আন্তরিক গূঢ় সংযোগ স্বীকার করিতে হইবে। ইহারই নাম sumpátheia tôn hólôn অথবা ঈশ্বর। শব্দের সহিত বায়ুর এবং আলোর সহিত ইথারের যে সম্পর্ক, চৈতন্য বা বিজ্ঞানের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধও তদ্রূপ। অর্থাৎ, যে universal medium আশ্রয় করিয়া শব্দ (medium বায়ু) ও আলোকের (medium ইথার) ন্যায় বিজ্ঞানসঞ্চার সম্ভব হয় তাহারই লোকপ্রসিদ্ধ নাম ঈশ্বর।

এইবার বুঝিতে পারা যাইবে সাংখ্য, বেদান্ত ও বৌদ্ধ দর্শনে কেন প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বর স্বীকার করা হয় নাই, এবং কেনই বা ন্যায় দর্শনে বিশেষ করিয়া ঈশ্বর স্বীকার করা হইয়াছিল। সাংখ্যমতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ত্রৈগুণ্যময় প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে; সুতরাং বিশ্বের সমস্ত বস্তু ও ব্যক্তি যতই পৃথক্ বা পরস্পর নিরপেক্ষ বলিয়া বোধ হউক না কেন, তাহারা সকলেই যে পরস্পর অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ, তাহা সৎকার্য্যবাদী সাংখ্যের নিকট স্বতঃসিদ্ধ। অর্থাৎ প্রকৃতিই সাংখ্যমতে universal medium; সুতরাং সাংখ্যের আর বিশেষ করিয়া ঈশ্বর স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। এখানে অবশ্য আপত্তি হইতে পারে, প্রকৃতিই যদি universal medium হয়, তবে সাংখ্যগণ কেন তৎসত্ত্বেও চৈতন্যময় পুরুষের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন? এই আপত্তি দ্বারা সাংখ্যদর্শনেরই একটি স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়। সর্ব্বানুগত প্রকৃতিকে জড়রূপে পরিকল্পনা করিয়া সাংখ্যগণ বুদ্ধিকে পর্য্যন্ত জড়বস্তুরূপে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাহার উপর এ কথাই বা কিরূপে স্বীকার করা যায় যে পুরুষের ছায়াপাতে প্রকৃতি চৈতন্যময় হইয়া উঠিল? প্রকৃতি আপনা হইতেই চৈতন্যাভিমুখী না হইলে পুরুষের ছায়াপাতে তাহাতে চৈতন্যোদয় হইবে কেন, আর প্রকৃতির চৈতন্যাভিমুখিতা স্বীকার করিলেই বা তাহাকে পুরুষনিরপেক্ষ বলা যায় কি করিয়া? সাংখ্যকারিকায় আমরা সাংখ্যদর্শনের যে পরিচয় পাই তাহাতে বাস্তবিকই যে জড় ও চৈতন্যের সম্বন্ধ সন্তোষজনকরূপে মীমাংসিত হয় নাই তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। অনেকেই সেইজন্য মনে করেন, এবং আমার নিজেরও বিশ্বাস এই যে, আদি সাংখ্যদর্শন প্রকৃতিময়ই ছিল, পুরুষের তাহাতে স্থান ছিল না। এবং সাংখ্যদর্শনের এই আদ্যবস্থায় চৈতন্যও যে প্রকৃতিসম্ভূত বলিয়া পরিগণিত হইত তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে বুদ্ধিও এই দর্শনে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অন্তর্গত। অবশ্য বুদ্ধি ও চৈতন্য

অনন্ত নহে, কারণ নির্ব্বিষয় বুদ্ধিই চৈতন্ত এবং সবিষয় চৈতন্তই বুদ্ধি। কিন্তু ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে ইতরনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র তত্ত্বরূপে উপস্থাপিত হইলে, বুদ্ধি ও চৈতন্তের কোন পার্থক্য থাকে না। সুতরাং বুদ্ধিগর্ভ প্রকৃতির সংবোধনার্থে পৃথক্ একটি চৈতন্তের সংস্থাপনা অযৌক্তিক। আরও বিবেচ্য এই যে বৌদ্ধ ও সাংখ্য দর্শনের প্রকৃত বিরোধ এই পুরুষকে লইয়াই ; পুরুষনিরপেক্ষ প্রকৃতিময় জগতের পরিকল্পনা যে বিজ্ঞানবাদীর না হইলেও ক্ষণিকবাদীর অভিসম্মত তাহা পূর্ব্বে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। অথচ সাংখ্য-যোগের ভিত্তির উপরেই যে বৌদ্ধদর্শন প্রতিষ্ঠিত একথাও অধ্যাপক Jacobi প্রমাণ করিয়া দেওয়ার পর কেহই এপর্য্যন্ত অস্বীকার করিতে পারেন নাই। সুতরাং এই দিক হইতেও অনুমান হয় যে আদি সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতির স্থান পুরুষের শাসনাধীন ছিল না। সাংখ্যদর্শনের মূলতত্ত্ব যে সৎকার্য্যবাদ,—তাহাতেও পুরুষ-পরিকল্পনার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নাই। সুতরাং ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে আদি সাংখ্য-দর্শনে প্রকৃতিকেই জগদুৎপত্তির অদ্বিতীয় কারণ বলিয়া মনে করা হইত,—অর্থাৎ প্রকৃতিই ছিল এই মতে universal medium। সুতরাং সাংখ্যমতে তদতিরিক্ত ঈশ্বর স্বীকার করিবার প্রত্যক্ষ প্রয়োজন ছিল না।

ব্রহ্মবাদীর বেদান্তদর্শনেও যে পৃথক্রূপে ঈশ্বর স্বীকার করার প্রয়োজন ছিল না তাহা উপরের আলোচনা হইতেই সুপরিস্ফুট হইবে ; কারণ এই দর্শনে চৈতন্তময় ব্রহ্মরূপ universal medium-এরই কেবল প্রকৃত অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে, আর সমস্তই মায়িক ও মিথ্যা বলিয়া অস্বীকৃত হইয়াছে। সাংখ্য ও বেদান্ত উভয় দর্শনেই অবশ্য পরবর্ত্তী যুগে ঈশ্বরপরিকল্পনা করা হইয়াছিল, কিন্তু সে ঈশ্বর কেবল ভক্তের আশ্রয়, দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক যুক্তির অতীত। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ ও ব্রহ্মবাদী বৈদান্তিকের মতের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য যে কিছু প্রায় নাই বলিলেই হয় তাহা প্রথম বক্তৃতায় দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। উভয় মতের পার্থক্য এইমাত্র যে বেদান্তে মায়াময় ব্যাবহারিক জগতের পিছনে জ্ঞানাতীত একটি ব্রহ্মময় পরমার্থ সত্য স্বীকার করা হইয়াছিল, কিন্তু বৌদ্ধদর্শনে এই পরমার্থ সত্যকে বলা হইয়াছে শূন্য বা নির্ব্বাণ, কারণ সর্ব্বব্যাপী হওয়ার জন্য তাহা জীবের নিকট চিরকালই অজ্ঞেয়। ব্রহ্ম ও বিজ্ঞান দুইই সমভাবে

universal medium ; সুতরাং বেদান্ত ও বৌদ্ধদর্শনে পৃথক্ভাবে ঈশ্বর স্বীকার করার প্রয়োজন ছিল না।

ভারতের প্রধান প্রধান দার্শনিক মতবাদের মধ্যে এখনও বাকি রহিল ন্যায়-বৈশেষিক। কি যুক্তিতে যে নৈয়ায়িকগণ ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা শান্তরক্ষিত ও কমলশীলের পূর্ব্বপক্ষ* হইতেই বুঝা যাইবে। আমাদের এস্থলে অনুসন্ধেয়, নৈয়ায়িকদিগকে কেন ঈশ্বর সন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। নৈয়ায়িকগণকে যে বাধ্য হইয়াই ঈশ্বর স্বীকার করিতে হইয়াছিল তাহাও সুস্পষ্ট, কারণ আদি ন্যায়সূত্রে ঈশ্বরের কোন উল্লেখ নাই।—উপরোক্ত আলোচনার পর নৈয়ায়িকগণের ঈশ্বরপ্রবণতার কারণ সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। এক কথায় বলা যাইতে পারে সাংখ্য, বেদান্ত ও বৌদ্ধ দর্শন যেমন এক একটি universal medium আশ্রয় করিয়া গঠিত, ন্যায়দর্শন সেরূপ নহে। সর্ব্বানুপ্রবিষ্ট কোন জড় বা চেতন বস্তু ন্যায়দর্শনে স্বীকার করা হয় নাই। নৈয়ায়িকের নিকট বস্তুর অস্তিত্বও সত্য এবং তাহার অনুভূতিও সত্য,—কিন্তু অনুভাবক ব্যক্তি ও অনুভূয়মান বস্তুর মধ্যে নৈয়ায়িকের মতে স্বাভাবিক কোন সংযোগ নাই। বস্তুর উপাদান পরমাণু পর্য্যন্ত এই মতে পৃথক সত্তাসম্পন্ন, এবং এই সত্তা নির্মোঘ ও চিরন্তন। এ অবস্থায় একটি জীবে অপর কোন জীব বা বস্তুর সংবেদনাদি অসম্ভব। সুতরাং বস্তুজগতের অতিরিক্ত একটি বিশ্বচৈতন্য স্বীকার করা ছাড়া নৈয়ায়িকের গত্যন্তর ছিল না। এই বিশ্বচৈতন্যই নৈয়ায়িকের অভিসম্মত ঈশ্বর। একথা মনে করা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক যে ঈশ্বর স্বীকার করিয়া ন্যায়দর্শন দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। নৈয়ায়িকগণ যেরূপ নির্ম্মমভাবে সর্ব্বত্র সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যুক্তি প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন, ভারতের বা বাহিরের কোন দার্শনিকই তাহা করিতে পারেন নাই। অথচ এই দার্শনিকগণই যে বিনা যুক্তিতে ঈশ্বর স্বীকার করিয়া গিয়াছেন তাহা মনে করাও বাতুলতা। যতদিন পর্য্যন্ত না প্রমাণিত হয় যে matter হইতে spirit-এর উৎপত্তি সম্ভব, ততদিন দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের পক্ষে ঈশ্বর স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু

---

* উত্তর পক্ষ, অর্থাৎ বৌদ্ধদিগের দ্বারা ঈশ্বরখণ্ডন, আগামী বক্তৃতায় আলোচিত হইবে।

আধুনিক বিজ্ঞানের গতি ঠিক বিপরীত দিকে ; তাহাতে প্রমাণিত হইতে চলিয়াছে—spirit হইতেই matter-এর উৎপত্তি।

এইবার দেখা যাউক শান্তরক্ষিত ও কমলশীল নৈয়ায়িকদের ঈশ্বর-সংস্থাপক যুক্তিগুলি কিরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন। যথাসম্ভব অল্প কথাতেই তাঁহারা এই কাজ সারিয়াছেন (মাত্র দশটি কারিকা ও তাহাদের টীকা, ৪৬-৫৫), কিন্তু উদয়নের কুসুমাঞ্জলি প্রভৃতি ঈশ্বর-সংস্থাপক প্রধান গ্রন্থের সহিত তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে বিরুদ্ধপক্ষীয় হইলেও শান্তরক্ষিত ও তাঁহার শিষ্য নৈয়ায়িকদের কথা যথাযথভাবেই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিকৃত করিবার চেষ্টা করেন নাই। এই কথাটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার, কারণ তত্ত্বসংগ্রহের মধ্যে আমরা এমন সব পূর্ব্বপক্ষীয় মতের পরিচয় পাইব যাহা আর পৃথক্‌ভাবে পাওয়া যায় না। সাংখ্য, ন্যায়, বেদান্ত প্রভৃতি মতবাদ তত্ত্বসংগ্রহে পূর্ব্বপক্ষরূপে অবিকৃত ভাবেই উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া অনুমান হয় যে যে-সব মতের আদিগ্রন্থ লুপ্ত হইয়াছে সেই সব মতেরও প্রকৃত চিত্রই শান্তরক্ষিত ও কমলশীল দিয়া যাইবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

ঈশ্বর-সংস্থাপক প্রথম কারিকাটি সরল :—

সর্ব্বোৎপত্তিমতামীশমন্যে হেতুং প্রচক্ষতে।
নাচেতনং স্বকার্য্যানি কিল প্রারভতে স্বয়ং ॥ ৪৬ ॥

"অন্যে (অর্থাৎ নৈয়ায়িকাদি দার্শনিকগণ) যাহা কিছুর উৎপত্তি হয় সেই সমস্তেরই হেতুরূপে ঈশ্বরকে মানিয়া লন, কারণ অচেতন বস্তু স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া কখনই কোন কার্য্য করিতে পারে না।" এই কারিকার ব্যাখ্যায় কমলশীল প্রণিধানযোগ্য অনেক মূল্যবান কথা বলিয়াছেন :—

কারিকায় বিশেষ করিয়া "উৎপত্তিমতাম্—" কথাটি বলা হইয়াছে কেন ? কারণ এই যে, পরমাণু, আকাশ প্রভৃতি এমন সব বস্তু আছে যেগুলি বাস্তবিকই শাশ্বত ; এগুলির উৎপত্তির কোন কারণ নাই, অর্থাৎ এগুলি কাহারও দ্বারা উৎপাদিত হয় নাই। সুতরাং অণ্বাকাশাদির ন্যায় শাশ্বত বস্তু আশ্রয় করিয়া যে ঈশ্বরানুমান সম্ভব নয় তাহা পূর্ব্বপক্ষী ধরিয়াই লইতেছেন।

কোন কোন নৈয়ায়িকের মতে জগৎস্রষ্টা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর বিশিষ্টগুণসম্পন্ন

একটি বিশেষ আত্মা মাত্র। আবার কোন কোন নৈয়ায়িক বলিয়া থাকেন যে ঈশ্বর আত্মা হইতে পৃথক্ একটি দ্রব্য, কারণ ঈশ্বর এক ও নিত্য এবং সর্ব্ববস্তু-বিষয়ক জ্ঞানসম্পন্ন,—যে সকল গুণ আত্মাতে নাই।

কিন্তু এ সকল প্রশ্ন উত্থাপন করারই বা প্রয়োজন কি ? ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পরমাণু প্রভৃতি জগৎসৃষ্টির নানা কারণ তো সম্মুখেই রহিয়াছে, তবে আর ঈশ্বরকে টানিয়া আনার কি দরকার ? ইহার উত্তরেই কারিকায় বলা হইয়াছে "নাচেতনম্" ইত্যাদি। ধর্ম্মাদি কারণ যে আছে তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেগুলি অচেতন। সচেতন কোন পরিচালক ব্যতীত সেগুলি কখনও আপনা হইতেই কার্য্যোৎপাদন করিতে পারে না, কোথাও দেখা যায় না যে অচেতন বস্তু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কার্য্যোৎপাদন করিতেছে। দৃষ্টান্ত—মৃৎপিণ্ড, সলিল, সূত্রাদি উপাদান থাকিতেও সচেতন কুম্ভকার ব্যতিরেকে ঘটনির্ম্মাণ সম্ভব হয় না। পূর্ব্বপক্ষী যে বলিয়াছেন, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পরমাণু প্রভৃতি হইতেই জগদুদ্ভব হইতে পার,—তাহা এই কারণেই সম্ভব নয়, কারণ এগুলি সবই অচেতন। অতএব অনুমান এই যে, যেহেতু এই সকল অচেতন কারণ হইতে জগদুদ্ভব সম্ভব সেই হেতু সকল অচেতন কারণের নিয়ামক ও প্রযোজক একজন সচেতন ঈশ্বর আছেন। আর ঈশ্বর স্বীকার করিলেই যে ধর্ম্মাধর্ম্মাদির কারণত্ব ব্যর্থ হইবে তাহা নহে ; কারণ ঈশ্বর হইলেন নিমিত্ত কারণ, আর ধর্ম্মাধর্ম্মাদি হইল উপাদান কারণ।

কিন্তু অথাদি অচেতন কারণের সচেতন কোন প্রযোজক প্রয়োজন বলিয়াই যে ঈশ্বর স্বীকার করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই ; যে আত্মাতে ধর্ম্মাধর্ম্মাদি সমবেত হয় সেই আত্মাই তো অচেতন উপাদান কারণের প্রযোজক হইতে পারে। সুতরাং তদতিরিক্ত ঈশ্বর পরিকল্পনার প্রয়োজন নাই।

এই উত্তরও অযথার্থ। কারণ আত্মা প্রথমে থাকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। শরীরের ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা কার্য্যকারণসংঘাত উৎপন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত উপলভ্য (perceptible) রূপাদি বিষয় উপস্থিত থাকিলেও তাহা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা আত্মার থাকে না, অনুপলভ্য ধর্ম্মাধর্ম্মাদির কথা তো বাদই দিলাম।—কমলশীলের এই কথার অর্থ খুব সম্ভব এই যে ইন্দ্রিয়াদির কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া যে অভিজ্ঞতা জন্মে সেই অভিজ্ঞতা হইতেই আত্মা পরে ইন্দ্রিয়াদির কার্য্য নিয়ন্ত্রণ করিতে সমর্থ

হয়। ইহাই যদি হয় তবে জন্মের অব্যবহিত পরেই মানুষের কার্য্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করিত কে, কারণ তখন তো আর অভিজ্ঞতা হইতে জ্ঞান সঞ্চয় করিবার অবসর আত্মার ঘটে নাই। সুতরাং কার্য্যনিয়ন্তারূপে ঈশ্বর স্বীকার করা ছাড়া উপায় নাই।

ইহার পরের দুই কারিকাতে কমলশীলের মতে অবিদ্ধকর্ণ* নামক এক নৈয়ায়িকের মত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে :—

যৎ স্বারম্ভকাবয়বসন্নিবেশবিশেষবৎ।
বুদ্ধিমদ্ধেতুগম্যং তত্তদ্যথা কলশাদিকম্ ॥ ৪৭ ॥
দ্বীন্দ্রিয়গ্রাহ্যমগ্রাহ্যং বিবাদপদমীদৃশম্।
বুদ্ধিমৎপূর্ব্বকং তেন বৈধর্ম্যেণাণবো মতাঃ ॥ ৪৮ ॥

কমলশীল পঞ্জিকায় কারিকাদ্বয়ের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

এখানে বিবাদের যাহা বিষয়ীভূত (বিমত্যধিকরণভাবাপন্নং) তাহা হয় দুইটি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য কিংবা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যই নয়, এবং তাহার কারণও বুদ্ধিসম্পন্ন, যেহেতু তাহার অবয়বগুলি বিশেষ প্রণালীতে সন্নিবিষ্ট ; সুতরাং ঘটাদির সহিতই তাহার সাদৃশ্য, এবং পরমাণু প্রভৃতির সহিত অসাদৃশ্য, (কারণ নীরূপ পরমাণুতে কোন সন্নিবেশপ্রণালী কল্পনা করা যায় না)। এখন দ্বীন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু কাহাকে বলে ? ক্ষিতি, অপ্ ও তেজ হইল দ্বীন্দ্রিয়গ্রাহ্য, কারণ এগুলিকে দর্শনও করা যায়, স্পর্শও করা যায়, যেহেতু ইহারা পরিমাণবিশিষ্ট (বৃহৎ), বিবিধ দ্রব্যসমবায়ে গঠিত এবং বিশিষ্ট রূপশালী। বায়ু প্রভৃতি কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দ্বারা তাহাদের অস্তিত্ব অনুমিত হইলেও প্রকৃতি নিরূপিত হয় না), যেহেতু উপলব্ধিবিষয়ক কারণত্রয় পরিমাণশালিত্ব, বহ্বংশতা ও রূপবিশিষ্টতা বায়ু প্রভৃতিতে অবিদ্যমান। কথিত হইয়াছে যে পরিমাণশালিত্ব, বিবিধদ্রব্যবত্ত্ব ও রূপাদি হইতেই উপলব্ধি জন্মে। বিবিধ দ্রব্যসমবায়ে গঠিত নয় বলিয়াই পরমাণু উপলব্ধিগোচর হয় না। রূপহীন হওয়ার জন্য বায়ুও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। আর দ্ব্যণুকাদি যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় তাহার কারণ ইহাদের পরিমাণ নাই (অমহত্ত্বাৎ)।

এখন এইরূপ বিচারে যদি ধরিয়াই লওয়া হয় যে যাহাই দ্বীন্দ্রিয়গ্রাহ্য অথবা

* ইঁহার সম্বন্ধে অন্য কোন গ্রন্থ হইতে কোন সংবাদ পাওয়া যায় না।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় তাহারই কারণ বুদ্ধিমান্, তাহা হইলে যাহা প্রমাণ করিতে যাইতেছি তাহাই প্রমাণিত বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইল (সিদ্ধসাধ্যতা) এবং উভয় পক্ষের মধ্যে আর কোন বিরোধই থাকে না, ঘটাদির কারণের বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে যেমন কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। (নৈয়ায়িকগণ) নিজেরাই স্বীকার করিয়া থাকেন যে আকাশ, পরমাণু প্রভৃতি নিত্য, কাহারও দ্বারা সৃষ্ট হয় নাই ; অথচ যেহেতু এগুলি ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য সেই হেতু নৈয়ায়িকদিগের স্বীয় মতানুসারে ধরিয়াই লওয়া হইল যে এগুলির একটি বুদ্ধিমান্ কারণ আছে।— এই সকল অসামঞ্জস্য পরিহার করিবার জন্যই বলা হইয়াছে "বিমত্যধিকরণ-ভাবাপন্নম্", অর্থাৎ "বিবাদের যাহা বিষয়ীভূত।" ইহার ফলে শরীর, ইন্দ্রিয়, পৃথিবী প্রভৃতিই হইয়া পড়িল বিচারের বিষয় (পক্ষীকৃত), পরমাণু প্রভৃতি বাদ পড়িল।

কেবলমাত্র "কারণপূর্ব্বক" না বলিয়া "বুদ্ধিমৎকারণপূর্ব্বক" বলা হইয়াছে তাহার কারণ কার্য্যের কারণজন্যত্ব সম্বন্ধে এখানে কোন প্রশ্নই নাই, প্রকৃত প্রশ্ন সেই কারণের বুদ্ধিমত্তা লইয়া। ইহাতেও একটি আপত্তি উঠিতে পারে, এবং পূর্ব্বপক্ষী বাস্তবিকই সে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। কারণকে "বুদ্ধিমৎ" বলিয়া বিশেষিত করিলেই অনুমান হয় যে যতক্ষণ না বুদ্ধি আরোপিত হয় ততক্ষণ কারণ বুদ্ধিবিহীন। এখন সাংখ্যদর্শনানুসারে সমস্ত কার্য্যেরই কারণ প্রকৃতি, এবং বুদ্ধিও এই প্রকৃতির অন্তর্গত ; সুতরাং সাংখ্যের পক্ষে কেবলমাত্র "কারণ" কথাটি উচ্চারণ করাই যথেষ্ট, সেই কারণকে আবার "বুদ্ধিমৎ" বলিয়া বিশেষিত করিবার কোন হেতু নাই। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে অপর কোন মত না হউক, অন্ততঃ সাংখ্য মতের পক্ষ হইতে, এখানে "বুদ্ধিমৎ" কথাটি প্রয়োগ করা অসার্থক।—কমলশীল এইরূপে পূর্ব্বপক্ষটি যথাযথ ভাবেই উত্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু উত্তরে কেবলমাত্র বলিয়াছেন, কোন দ্রব্যই আপনা হইতে উৎপন্ন হয় না (ন চ তেনৈব তদেব তন্তবতি) ; এ উত্তর কিন্তু সন্তোষজনক হইল না।

সর্ব্বশেষে কমলশীল কারিকাস্থ "স্বারম্ভকাবয়বসন্নিবেশবিশেষবৎ" কথাটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যদিও মূলে এইটিই প্রথম কারণরূপে উল্লিখিত হইয়াছে।— ইহার অর্থ, বস্তুর অবয়বাবলীর এমন এক বিশেষ প্রণালীতে সন্নিবেশ ঘটিয়া

থাকে যাহাতে ফলে সেই বিশেষ বস্তুটিরই উৎপত্তি হয়। কারিকায় "স্বারম্ভক" কথাটি গ্রহণ করার উদ্দেশ্য এই যে তদ্ব্যতিরেকে গোত্বাদি (universal) হইতে গবাদির (particular) পার্থক্য থাকিবে না; গোত্বাদির দ্বারা বুঝায় একটি নির্দ্দিষ্ট জাতীয় দ্রব্যাবলীর অবয়বসন্নিবেশের প্রণালী, কিন্তু গবাদির অর্থ একটি বিশিষ্ট পদার্থে সেই অবয়বগুলির বিশেষ প্রকারের সন্নিবেশ।—এই প্রকারের সন্নিবেশ বুদ্ধিমান্ সন্নিবেষ্টা ভিন্ন সম্ভব নয়; সেই বুদ্ধিমান্ সন্নিবেষ্টাই ঈশ্বর।

অবিদ্ধকর্ণের দ্বিতীয় প্রমাণ পরবর্ত্তী কারিকায় বলা হইতেছে :—

তন্বাদীনামুপাদানং চেতনাবদধিষ্ঠিতম্।
রূপাদিমত্ত্বাত্তন্ত্বাদি যথা দৃষ্টং স্বকার্য্যকৃৎ ॥ ৪৯ ॥

অর্থাৎ শরীরাদির উপাদান পরমাণু প্রভৃতি; সেগুলি সচেতন কোন কারণের দ্বারা পরিচালিত না হইলে কখনই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হইয়াছে, দেখাও যায় যে সূত্রাদির ন্যায় দৃষ্ট কারণও সচেতন কোন কারকদ্বারা পরিচালিত না হইলে কার্য্য (বস্ত্রাদি) উৎপন্ন করিতে পারে না। আর কথিতও হইয়া থাকে, "শরীর, পৃথিবী প্রভৃতির উপাদানসকল চেতনাবান্ কোন (পুরুষের) দ্বারা পরিচালিত হইয়া স্বকার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়,—ইহাই আমরা অঙ্গীকার করিয়া থাকি; কারণ এই সকল উপাদান সূত্রাদির সমধর্ম্মী, এবং সূত্রাদিরই ন্যায় রূপাদিবিশিষ্ট"।*

ঈশ্বর-প্রমাণের জন্য উদ্যোতকর বলিয়াছেন, "জগতের হেতু হইল প্রধান, পরমাণু এবং অদৃষ্ট; এগুলি কিন্তু স্বকার্য্যের জন্য অতীব বুদ্ধিসম্পন্ন কোন এক অধিষ্ঠাতার উপর নির্ভর করিয়া থাকে, সূত্র ও মাকু যেমন বস্ত্রের কারণ হইলেও তন্তুবায়ের সাহায্য ব্যতিরেকে কার্য্যকরী হইতে পারে না।" পরবর্ত্তী কারিকায় এই কথাই বলা হইতেছে :—

ধর্মাধর্মাণবস্সর্বে চেতনাবদধিষ্ঠিতাঃ
স্বকার্য্যারম্ভকাঃ স্থিত্বা প্রবৃত্তেস্তুরিতন্তুবৎ ॥ ৫০ ॥

কমলশীল কারিকাটিকে "সুবোধম্" বলিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছেন, এবং, বাস্তবিকই, অব্যবহিত পূর্ব্বে উদ্যোতকরের মত রূপে যাহা বলা হইয়াছে

* এটি যে কাহার মত তাহা কমলশীল বলেন নাই।

তাহার পর এই কারিকা সম্বন্ধে নূতন বিশেষ কিছু আর বলিবার থাকে না। কিন্তু তথাপি কারিকাস্থ "স্থিত্বা প্রবৃত্তেঃ" এই কথা দুইটির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া দরকার। "স্থিত্বা প্রবৃত্তেঃ"—"থামিয়া থামিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় বলিয়া"। তাঁতির মাকু যেমন নিরবচ্ছিন্ন গতিতে বয়ন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে না, এক একটি সূত্র সন্নিবেশনের পর কিয়ৎক্ষণ স্থির থাকিয়া পুনরায় অপর একটি সূত্রসন্নিবেশনে প্রবৃত্ত হয়, নৈয়ায়িকদের মতে জাগতিক কারণাবলীর কার্য্যপদ্ধতিও তদ্রূপ। কার্য্য যদি নিরবচ্ছিন্ন হয় তবে কারণ হইতে তাহাকে পৃথক করা সম্ভব হয় না, এবং ইহাই সৎকার্য্যবাদী সাংখ্যগণের মত। তাঁহাদের নিরবচ্ছিন্ন বিবর্ত্তবাদের মধ্যে কার্য্যকারণ ভেদ করা অসম্ভব। কিন্তু শান্তরক্ষিত এখানে নৈয়ায়িক মতের আলোচনা করিতেছেন, যে মতে প্রত্যেক পরমাণু পর্য্যন্ত বিশেষ এবং অপরিবর্ত্তনীয় সত্তারূপে স্বীকৃত হইয়াছে; অথচ পরিবর্ত্তন অস্বীকার করিয়া বাস্তব জগতের কোন পরিকল্পনাই সম্ভব নহে। পরস্পরবিরোধী এই মতদ্বয়ের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য নৈয়ায়িকগণ (এবং বৌদ্ধগণও) এক প্রকার staccato evolution স্বীকার করিয়াছেন; আলোচ্যমান কারিকায় শান্তরক্ষিতের কথা হইতে (স্থিত্বা প্রবৃত্তেঃ) এই বিশিষ্ট বিবর্ত্তবাদেরই আভাস পাওয়া যায়।

অবিদ্ধকর্ণ ও উদ্যোতকরের ঈশ্বরসংস্থাপক যুক্তির আলোচনা করিয়া কমলশীল প্রশস্তমতি নামক আর এক নৈয়ায়িকের মতের আলোচনা করিয়াছেন। প্রশস্তমতির কথাও ভারতীয় সাহিত্যে আর কোথাও পাওয়া যায় না। তিনি বলিতেন যে সৃষ্টির আদিতে ঈশ্বরের নিকট হইতে উপদেশ না পাইলে মানুষ কখনই লোকব্যবহার শিক্ষা করিতে পারিত না, এবং এক প্রকারের বিশিষ্ট লোকব্যবহার যে বাস্তবিকই আছে তাহা ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে মানুষ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বিশেষ বিশেষ কথার দ্বারা বিশেষ বিশেষ বস্তুকেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। শিশুরা জানে না কোন্ বস্তুর কি নাম; ইহা তাহারা মাতার নিকট হইতেই শিক্ষা করে। সেইরূপ সৃষ্টির আদিতে প্রত্যেক মানুষই যখন শিশুবৎ ছিল তখন কোন উপদেষ্ট্রী মাতৃদেবীর সাহায্য ব্যতিরেকে মানুষ বাগ্ব্যবহার করিতে শিখিল কি করিয়া? অতএব অনুমান এই যে সৃষ্টির আদিতে (সর্গাদৌ) মানুষকে যিনি বাগ্ব্যবহার করিতে শিখাইয়াছিলেন তিনিই

ঈশ্বর; প্রলয়কালেও এই ঈশ্বরের জ্ঞান অক্ষুণ্ণই থাকে এবং নূতন সৃষ্টিতে জীবগণ সেই জন্যই তাঁহার নিকট হইতে জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হয়। পরবর্ত্তী কারিকায় শান্তরক্ষিত এই কথাটিই সংক্ষেপে বলিয়াছেন :—

সর্গাদৌ ব্যবহারশ্চ পুংসামন্যোপদেশজঃ।
নিয়তত্বাৎ প্রবুদ্ধানাং কুমারব্যবহারবৎ ॥ ৫১ ॥

ইহার পরেই কমলশীল পুনরায় মহানৈয়ায়িক উদ্যোতকরের মত উদ্ধৃত করিতেছেন, এবং অনুবর্ত্তী কারিকাদ্বয়ে শান্তরক্ষিতও উদ্যোতকরের ভাষা যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সেই মতেরই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। উদ্যোতকর বলিয়াছেন "মহাভূতাদিময় এই ব্যক্ত জগৎ বুদ্ধিমান্ কোন কারণের দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়াই সুখ দুঃখ সৃষ্টি করিয়া থাকে; কারণ ব্যক্ত জগৎ কুঠারাদির মতই অচেতন, উৎপন্ন কার্য্য মাত্র, বিনাশশালী এবং বিশেষ রূপবিশিষ্ট"। শান্তরক্ষিতের এতদ্বিষয়ক কারিকা দুইটি এই :—

মহাভূতাদিকং ব্যক্তং বুদ্ধিমদ্ধেত্বধিষ্ঠিতম্।
যাতি সর্বস্য লোকস্য সুখদুঃখনিমিত্ততাম্ ॥ ৫২ ॥
অচেতনত্বকার্য্যত্ববিনাশিত্বাদিহেতুতঃ।
বাশ্যাদিবদতঃ স্পষ্টং তস্য সর্বং প্রতীয়তে ॥ ৫৩ ॥

এতক্ষণে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল যে জগতের একজন স্রষ্টা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু সেই স্রষ্টা যে সর্ব্বজ্ঞ তাহা কিসে প্রমাণিত হইল, যে জন্য মুমুক্ষু ও অভ্যুদয়কামী ব্যক্তিগণ এক সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের পূজা করিয়া থাকেন? এই প্রশ্নের উত্তরেই পরবর্ত্তী কারিকায় বলা হইতেছে যে যিনি সর্ব্বস্রষ্টা তিনি আপনা হইতেই সর্ব্বজ্ঞ :—

সর্বকর্তৃত্বসিদ্ধৌ চ সর্বজ্ঞত্বমযত্নতঃ।
সিদ্ধমস্য যতঃ কর্তা কার্যরূপাদিবেদকঃ ॥ ৫৪ ॥

এই কারিকার ব্যাখ্যাচ্ছলে কমলশীল যে সকল কথার অবতারণা করিয়াছেন তাহার সারার্থ এই যে যিনি যে বিষয়ের কর্ত্তা তাঁহার সেই বিষয়ের সমস্তই জানা থাকা স্বাভাবিক। কুম্ভকার কুম্ভের কর্ত্তা; সুতরাং সে জানে যে মৃৎপিণ্ড কুম্ভের উপাদান, চক্রাদি তাহার উপকরণ, উদকাহরণাদি তাহার ব্যবহার,

আত্মীয়-স্বজনকে তাহা উপহার দেওয়া যায়, ইত্যাদি। সেইরূপ জগৎস্রষ্টা ঈশ্বরও জানেন যে পরমাণু প্রভৃতি হইল জগতের উপাদান; ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, দিক্, কাল প্রভৃতি তাহার উপকরণ; সামান্য বিশেষ ও সমবায় তাহার ব্যবহার-পদ্ধতি; সুখলাভই জগতের উদ্দেশ্য; এবং তিনি আরও জানেন যে মানুষই সেই সুখলাভের পাত্র। সুতরাং ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ।

ইহার পরের কারিকাতেই শান্তরক্ষিত তাঁহার ঈশ্বর-সংস্থাপক পূর্ব্বপক্ষ শেষ করিয়াছেন :—

বিমতেরাস্পদং বস্তু প্রত্যক্ষং কস্যচিৎ স্ফুটম্।
বস্তুসত্বাদিহেতুভ্যঃ সুখদুঃখাদিভেদবৎ ॥ ৫৫ ॥

ইহার অর্থ, বিবাদের বিষয়ীভূত বস্তু যে বিশ্বজগৎ, তাহা নিশ্চয়ই কোন না কোন স্রষ্টা পুরুষের নিকট প্রত্যক্ষ ও সুপরিস্ফুট; কারণ সাধারণ বস্তুতে যে সকল বস্তুত্ব এবং অস্তিত্বাদি ধর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায় সমগ্র জগতেও তাহা বর্ত্তমান। সুখ ও দুঃখের মধ্যে যে ভেদ পরিলক্ষিত হয় তাহার কারণ এই যে সুখ ও দুঃখ মানুষ পৃথক রূপেই অনুভব করিয়া থাকে; সেইরূপ বিবাদের বিষয়ীভূত জগতের বিশেষ অস্তিত্বও তখনই সিদ্ধ হইতে পারে যখন তাহা সমগ্রভাবে একটি বিশেষ রূপে কোন এক দ্রষ্টার অনুভূতিগোচর হয়। যাঁহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে এই বিশ্বজগৎ একটি সুপরিচ্ছিন্ন বিশিষ্ট সত্তারূপে প্রতিভাত তিনিই ঈশ্বর।

ইহার পরেই শান্তরক্ষিত নৈয়ায়িকগণের উপরোক্ত যুক্তিগুলি খণ্ডন করিয়া ঈশ্বরের অনস্তিত্ব প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ষষ্ঠ বক্তৃতায় এই খণ্ডনাংশের আলোচনা করা হইবে।

শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ

দাবী

(১০)

একঘরে বাস করা সত্ত্বেও বিজয়ের সঙ্গ অসিতের কাছে দুর্ল্লভ হইয়া উঠিল। তাহার কাজও কমিয়া গিয়াছে, এখন মাঝে মাঝে অবসর পায়, তখন পূর্ণিমার কথা মনে পড়ে। সেই সন্ধ্যার পর আর তাহার সঙ্গে দেখা হয় নাই, একথা সে ভুলিতে পারে না। তাহার ছবিটি হারাইয়া গিয়াছে। একবার ভুলক্রমে জামার পকেটে ধোপার বাড়ী চলিয়া গিয়াছিল, আর ফিরিয়া আসে নাই। মনে পড়িল, সুনয়নী তাহাকে যাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। অনিল কি করিতেছে কে জানে। টেলিফোনের কাছে বসিলেই লোভ হয় ডাক দিতে। ইচ্ছা করে একদিন ঘুরিয়া আসে। ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন গিয়া পড়িল ঠিক সেই জেটিটার উপর যেখান হইতে পিতৃগৃহ-পরিত্যক্ত সে বিজয়ের কাছে আশ্রয়ের জন্য আসিয়াছিল। নৃপেশনাথের তীব্র দৃষ্টির ভয়ে তাঁহাদের ওখানে ঢুকিতে সাহস পাইল না। তাহার স্থির বিশ্বাস, তাহার মনে যে-অশান্তির ছায়া ঘন হইয়া উঠিতেছিল, যাহার অস্তিত্ব সে নিজের কাছেও স্বীকার করিতে চাহে না, এই তীক্ষ্ণধী লোকটির নিকট তাহা গোপন করা চলিবে না। সে ইহাও বিশ্বাস করে বিজয় আবার তাহাকে কাছে টানিয়া লইবে। বিজয়ের সেই ডাকের অপেক্ষায় সে নিজেকে বন্ধনের মোহে ফেলিতে চাহে না। তাই সে জেটি হইতেই ফিরিয়া আসিল। আসিবার সময় পূর্ণিমাদের বাড়ীর কাছ দিয়া আসিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিল না। দেখিল সব ঘরে আলো জ্বলিতেছে শুধু পূর্ণিমার ঘরে আলো নাই।

তাহার অন্ধকার ঘরে ঢুকিয়া আলো জ্বালিতে যাইবে, এমন সময় বিজয় বলিল—কে অসিত? একেবারে খেয়ে আয়।—অসিত বিস্মিত হইল। এত অল্প রাত্রে যদিবা বিজয় মাঝে মাঝে ফেরে, অন্ধকারে বিনা কর্ম্মে শুইয়া থাকিতে তাহাকে অসিত কখনও দেখে নাই।

—আমি খেয়ে বেরিয়েছিলাম, কিন্তু তুমি এত সকালে, অসুখ করেছে নাকি—এই বলিয়া অসিত সুইচটা টিপিয়া দিল।

বিজয়ের মুখ দেখিয়া অসিত চমকিয়া উঠিল—তাহা দুশ্চিন্তার গাঢ় কালিমায় লিপ্ত।

বিজয় আদেশ করিল—আলো নিবিয়ে দে।

নেবানো হইলে বলিল—তোর সঙ্গে কথা আছে।

অসিতের মন আশায় দুলিয়া উঠিল, হয়ত বিজয় আবার ডাক দিয়া কর্ম্মে নিযুক্ত করিবে। সে বিজয়ের বিছানায় গিয়া বসিল।

অনেকক্ষণ ইতস্তত করার পর বিজয় বলিল—তুই বিপ্লববাদে বিশ্বাস করিস?

—হ্যাঁও বটে, নাও বটে; কিন্তু আমি ভাবছিলাম তুমি আমায় কিছু বলবে।

বিজয় চুপ করিয়া রহিল। তারপর বলিল—কাল কলকাতা ছেড়ে যাচ্ছি। আর দেখা হবে না।

—কেন? কি হয়েছে? আমায় বিশ্বাস কর। আমি শেষ পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গে থাকব। অত্যন্ত স্নেহভরে একখানি হাত বিজয় অসিতের গায়ের উপর রাখিল।

—অসিত, আমি তোকে বিশ্বাস করি। আমরা কাল দে সাহেবের বাড়ী উড়িয়ে দিতে যাচ্ছি।—অসিত তাহার অফিসে বসিয়াই সংবাদ পাইয়াছিল কাঁচড়াপাড়ার কারখানার নিকটে শ্রমিকদের বে-আইনী মিটিং বন্ধ করিয়া দেওয়ায় মজুরে পুলিশে ভীষণ দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। হরিচরণ দে নামক একজন বাঙ্গালী পুলিশ অফিসার ধনিকবর্গের পক্ষ লইয়া মজুরদের উপর গুলি চালাইয়াছে। বিপ্লববাদীদের মুখে হিংসার কথা, হত্যার কথা অসিত এত শুনিয়াছে যে কখনও পুরাপুরি বিশ্বাস করে নাই। তাহার মনে হইত এ শুধু কথার কথা, কার্য্যে পরিণত হইবার নয়। সে উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল—কি ভয়ানক, কে তোমার মাথায় এ-সব ঢোকাল? আরিফ বোধহয়? বল আমাকে।—অসিত জানিত এই মুসলমান যুবকটি এখন বিজয়ের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ সহকর্ম্মী। সে বিচারপন্থী নয় বলিয়া তাহার কর্ম্মোন্মাদনার সীমা নাই।

বিজয় বলিল—হ্যাঁ, আরিফ ও আমি প্রতিজ্ঞা করেছি।—তারপর যেন অনেকটা নিজের মনেই বলিয়া চলিল—আমরা কাউকে মারতে চাই না। যদি মারি, ওদের দোষ। অত্যাচার যদি বন্ধ করতে না পারি, তাহলে অত্যাচারীকে এমন জায়গায় পাঠানো দরকার যেখানে সে আর অত্যাচার করতে না পারে।

এই বলিয়া সে হাসিল—তীব্র, বিষদিগ্ধ সে হাসি।

অসিত বলিল—থামো, থামো অত ছুটে চোলো না বিজয় দা। তুমি নিশ্চয়ই এ কাজ করতে চাও না। তোমরা ধরা পড়বে, তখন হয় ফাঁসী নয় আজীবন দ্বীপান্তর হবে।

—ভালোই হবে; দুঃখ ও দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাবো।—কণ্ঠস্বরে অবসাদের অস্পষ্ট আভাস।

—কিন্তু এই যে মানুষটিকে তোমরা মারতে চলেছ, হয়ত এ প্রকৃত দোষীই নয়। হয়ত সে এ কাজ করেছে চাকরীর দায়ে, পেটের তাড়নায়। তারো ত ঘর সংসার ছেলে পিলে আছে।

বিজয় উঠিয়া বসিয়া অসিতের দিকে ক্রুদ্ধভাবে চাহিয়া রহিল। ঘরের একটি মাত্র জানালা দিয়া চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে। সেই ক্ষীণ আলোয় তাহার দেহের কালো অবরেখা দেখা যাইতেছে। উস্কো খুস্কো কটা চুল, কোমর পর্য্যন্ত অনাবৃত দেহ, দেখিলে ভূত বা শয়তান বলিয়া মনে হয়।

—ছাখ্ অসিত, বিপ্লববাদে কোনও কালে তোর আস্থা নেই!—স্বর উত্তেজনাপূর্ণ।

—বিপ্লববাদের মানে যদি এই হয় যে প্রভুত্বের অবসান, সর্ব্ব মানবের পূর্ণ স্বাধীনতা, তা হলে তা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে মানি। কিন্তু যদি এর মানে হয় গুপ্ত হত্যা, তবে বল্‌ব এ ক্ষ্যাপামি।

—ওরা আমাদের মারে না? ওদের সব অত্যাচার কি তুই সহ্য করতে বলিস বিনা প্রতিবাদে, হাতটি উঁচু না ক'রে? হিংসার পথে কি এতই অধর্ম্ম?

—হিংসাকে সকল ক্ষেত্রেই অধর্ম্ম বলব, এত বড় বৈষ্ণব আমি নই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ওটা তোমাদের ফাঁকির পথ। ওদের মতি পরিবর্ত্তন ঘটাতে হবে

শিক্ষা দিয়ে, আমাদের সংহত শক্তি দিয়ে। এ পথের গতি ধীরে, তবু মনে হয় হত্যার চেয়ে এতেই ফল বেশী।

—তুই পড়ে' পড়ে' নষ্ট হয়ে গেছিস্। ওদের শিক্ষা? একটা বোমা একশোটা বক্তৃতার চেয়ে বেশী শিক্ষা দেয়।

—না, দেয় না; ধর এখনকার অত্যাচারীদের সকলকে তুমি মারলে? তাহলেই কি শেষ হবে? দরিদ্রের প্রতি অত্যাচার কর্‌বার লোকের কি কখনো অভাব হয়? ইতিহাস ত জানো।

—দেশ ত স্বাধীন হতে পারে?

—যে স্বাধীনতায় শুধু প্রভুত্বের হাত বদল হয় সে স্বাধীনতা আমার কাম্য নয়।

বিজয় শুইয়া পড়িয়া ক্লান্তভাবে পাশ ফিরিতে ফিরিতে বলিল—চুলোয় যাক্‌গে, তোর কথা যদি সত্যিও হয়, তাহলেও আমার যা করার তা করব। আমি প্রতিশোধ চাই।

অসিত বকিয়া চলিল, যুক্তির পর যুক্তি দিয়া, উদাহরণের পর উদাহরণ দেখাইয়া বিজয়কে নিজের মনে ভ্রান্ত প্রমাণ করিয়া যখন উত্তরের আশায় চুপ করিল, বিজয়ের নিয়মিত শ্বাস প্রশ্বাস তাহাকে বুঝাইয়া দিল, সে যেন অনেকক্ষণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সারারাত অসিত ঘুমাইতে পারিল না। বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল কেমন করিয়া বন্ধুকে বিপন্ন না করিয়া হতভাগ্যকে রক্ষা করা যায়।

ভোর না হইতেই সিঁড়িতে পদশব্দে বিজয় ঘরের দরজা খুলিল দেখিয়া অসিত বুঝিল সে ঠিক ঘুমাইয়া ছিল না। আরিফ ঘরে ঢুকিল, তাহার হাতের স্যুটকেসের কালো রংটা অসিতের চোখে ঈশান কোণে প্রলয়ের ভ্রূকুটির মত কুটিল ঠেকিল। সে তাহাকে অভিবাদন করিলে, আরিফ ধীরে ধীরে স্যুট-কেসটি মেজের উপর রাখিয়া সন্দিগ্ধভাবে তাহার দিকে চাহিল।

—কেশরী সিং আসবে? সে বিজয়কে জিজ্ঞাসা করিল।

—না, সে ভাবে আমরা ক্ষেপে গেছি।

আরিফ ভ্রূকুঞ্চিত করিল।

—তুমি তাকে বলেছ তাহলে?

—হ্যাঁ।

—তুমি একটি আস্ত আহম্মক।

মুখের উপর হইতে এলোমেলো চুল সরাইতে সরাইতে বিজয় দাঁত চাপিয়া বলিল,—হতে পারে, হয়ত আমরা সকলেই তাই।

—কি বলছ?—আরিফ তীব্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিল। বিজয় নড়িল না, কোন উত্তরও দিল না। আরিফ তখন ঘড়ি বাহির করিয়া বলিল—আর ত বেশী সময় নেই।

অসিত মিনতি করিয়া বলিল—আরিফ, যেয়ো না।—আরিফ অসিতের দিকে চাহিল—চোখভরা ঘৃণা। বলিল—ধর্ম্মাবতার, যেমন আছ তেমনি থাক; আর ঠোঁটটি চেপে রেখো। পুলিশে যদি টের পায়, বুঝব কে তাদের সন্ধান দিয়েছে। তাহলে আমাদের প্রাণ গেলেও তোমার রক্ষা নেই। মনে থাকে যেন।

—থাকবে। ও-ভয় কোরো না। আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, তোমাদের হিতার্থে, আমাদের শ্রমিক আন্দোলনের হিতার্থে, কোরো না এ কাজ, এর ফলে আমাদের সমস্ত চেষ্টা দশ বছর পেছিয়ে যাবে।

আরিফ অসিতকে গ্রাহ্যই করিল না। বিজয়ের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তুমিও পেছোচ্ছ না কি?

বিজয় তাহার দিকে অবসন্নের মত চাহিল। বলিল—বোসো আরিফ, একটু ভেবে দেখা যাক।

—ভাবা কিসের জন্য? ভাবার সময় পেরিয়ে গেছে, আমার ভাবনা চিন্তা শেষ হয়ে গেছে।—বলিয়া সে হাসিয়া উঠিল।

—ভালো, কিন্তু আমার আরম্ভ হয়েছে।

—তাহলে তুমি ভয় পেয়েছ।

—হয় ত। মরতে নয়, মারতে।

—মিথ্যে কথা; নিজের ভয়কে চাপা দিতে চাল দিচ্ছ। আগে পালাও নি কেন? এখন আর হতে পারে না। এখন তোমায় শেষ করতেই হবে।—এই বলিয়া সে সুটকেসটি চাবি দিয়া খুলিয়া কি একটা বাহির করিল। অসিত না দেখিয়াও বুঝিল, তাহার নিঃশ্বাসের গতি দ্রুত হইয়া উঠিল। আরিফ

সেটিকে হাতে করিয়া হাসিল, সেই তীব্র বিষদিগ্ধ হাসি যা পূর্ব্ব রাতে অসিত বিজয়ের মুখে দেখিয়াছিল।

হাতে লইয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে আরিফ রসিকতা জুড়িয়া দিল।—কাঁচড়াপাড়ার দে সাহেবকে এই আমাদের উপহার। ভদ্র মহোদয়গণ, আপনাদের সঙ্গে মহারাজ মৃত্যুর পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি আপনাদের সকল সমস্যার সমাধান করে দিতে পারেন। এঁর কৃপা হলে সরকারের খাজনা দিতে হয় না, পাহারাওয়ালার গুঁতো খেতে হয় না…

অসিত আর থাকিতে না পারিয়া বলিল, রক্ষে কর আরিফ ওটাকে নামিয়ে রাখো।

—দেখি, বলিয়া বিজয় উঠিয়া আসিয়া অত্যন্ত অসাবধানে আরিফের হাত হইতে জিনিসটি লইল।

আরিফ বলিল—হাত থেকে পড়ে যদি, আমরা টুকরো হয়ে যাব।

বিজয় বলিল—জানি। স্বর চিন্তাপূর্ণ। জানালার কাছে গিয়া বিজয় বোমাটিকে পরীক্ষা করিতে লাগিল। তাহার অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যে অসিত ভীত হইয়া উঠিল। জানালার বাহিরের আকাশ যেন তাহার চোখে অস্পষ্ট বোধ হইল। কে যেন তাহার কানে কানে বলিয়া গেল, আর দেরী নাই।

হঠাৎ বিজয়ের কোমর হইতে কাপড়টা খসিয়া গেল। আরিফ আগাইয়া গিয়া বলিল, জানালা থেকে সরে এসে কাপড় পরো।

বিজয় নিজের নগ্নাবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। তারপর ধীরে মন্তব্য আরম্ভ করিল—এই ছুনিয়াটা কি মজাদার! আমরা এখানে আসি উলঙ্গ হয়ে, আর—

সে বোমাটিকে মাথার উপর তুলিয়া সজোরে মেঝেতে ছুঁড়িয়া মারিল।

তেতলার ঘরখানি চুরমার হইয়া গেল। ইটকাঠ সরাইয়া পাওয়া গেল—বিজয় ও আরিফের মৃতদেহ, আর অচৈতন্য অসিতের রক্তাক্ত কলেবর, তখনও জীবিত।

সংজ্ঞা ফিরিলে অসিত বুঝিল সে হাসপাতালে, আর তার চারিপাশে পুলিশ। তাহারা প্রশ্ন করে, অসিত বোকার মত চাহিয়া থাকে উত্তর দেয় না। তাহারা ভয় দেখাইল, লোভ দেখাইল, ছুই-ই অসিতের নিকট ব্যর্থ। যে মৃত্যুর

এত নিকট-সাক্ষাৎ পাইয়াছে, তাহার কাছে শৃঙ্খল বা মুক্তির কতটুকু মূল্য ? সে তখন এত দুর্ব্বল যে মৃত্যুভয় পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে। দিনের পর দিন সে শুধু শুইয়া কাটাইয়া দিল।

মাস ছয়েক পরে সে খবর পাইল, বিচারে সে মুক্ত। বিজয়ের পকেটে-পাওয়া মাকে-লেখা পত্রে তাহার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ হইয়াছে ; কিন্তু হাঁসপাতাল হইতে মুক্তি পাইতে আরও কিছুকাল বিলম্ব হইবে।

(১১)

মাস দুই পরে কর্ত্তৃপক্ষ হঠাৎ একদিন জানাইলেন অসিত মুক্ত, ইচ্ছা করিলে সেইদিনই চলিয়া যাইতে পারে। একখানি মোটর গাড়ী অপেক্ষায় আছে, তাহার নির্দ্দেশমত যে-কোন স্থানে পহুঁছিয়া দিবে। কাল বিলম্ব না করিয়া অসিত বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু কোথায় যাইবে স্থির করিতে পারিল না। মেসে সে ফিরিবে না, এইটুকু খবর সে পাইয়াছিল তাহার ঘর চুরমার হইয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া বিজয় ও আরিফের সেই ভয়ঙ্কর মৃত্যু-স্মৃতি বিজড়িত বাড়িটায় সে বাস করিবে কেমন করিয়া। বিজয়ের কথা মনে হইলেই তাহার কান্না আসে ; অত বড় মহাপ্রাণ কর্ম্মবীর অকালে নষ্ট হইয়া গেল শুধু একটা সুচিন্তিত জীবন-দর্শনের অভাবে। হাঁসপাতালের রোগশয্যায় অসিত প্রচুর অবসর পাইয়াছিল আত্মবিশ্লেষণের ও পরীক্ষার। তাহারই আলোকে সে নিজের ও দলের কর্ম্মাবলী বিচার করিয়া দেখিতে শিখিয়াছে। সে এখন বোঝে যে বিজয় সাম্যবাদকে ঠিকমতো না বুঝিয়া জাতীয়তাবোধ ও সন্ত্রাস-পন্থার সহিত মিশাইয়া যে বিষাক্ত আরক চোলাইয়াছিল তাহার ভয়াবহ মৃত্যু তার মর্ম্মন্তুদ পরিণাম। নিজের সম্বন্ধেও অনেক ভুল ধারণা তাহার ভাঙিল। ছাড়া পাইলেও আগের মতো গোষ্ঠীগত জীবন যাপন করা তাহার পক্ষে অসম্ভব, দলে সে আর বিশ্বাস করে না। সন্ত্রাস-পন্থা তাহার নিকট বিভীষিকাময়। সাম্যবাদের আদর্শ তাহাকে এখনও টানে কিন্তু তাহাকে দেশের মধ্যে সত্য করিয়া তুলিতে হইলে যে কর্ম্ম-প্রতিভার প্রয়োজন, সে জানে সে শক্তি তাহার নাই। ইহার ফলে সে নিজের নিকট স্বীকার করিতে বাধ্য হইল যে যে-মুক্তির সে প্রয়াসী তাহা আর্থিক নয়, আত্মিক। সামাজিক জীবন আর তাহার সহিবে না, একাকী সাধনা

করিয়া একটা নির্দ্বন্দ্ব মনোভাব আয়ত্ত করিতে পারিলেই যেন তাহার ইষ্টসিদ্ধি হয়।

তাহার আফিসে অবশ্য যাইতে হইবে। বহুকাল সেখানকার কোন সংবাদ না পাইয়া কিরূপ অভ্যর্থনা সেখানে জুটিবে, সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ ছিল। বোমার মামলার আসামী সে, পুলিশ তাহাকে ছাড়িয়া দিলেও কাগজের সত্বাধিকারী তাহাকে রাখিতে সাহস পাইবেন বলিয়া সে মনে করিতে পারিল না। মার সঙ্গে একবার দেখা করিবে। এ তাহার নূতন জীবন, মৃত্যুর গর্ভগৃহ পার হইয়া নবজন্ম লাভ, পুরানো জীবনের বিরোধের জের সে আর এ জীবনে টানিয়া আনিবে না। সেই সঙ্গেই মনে পড়িল—পূর্ণিমা ? সে যদি এখনও তাহাকে চায় ? দেখিল পুরাতনের জের সহজে মেটে না। কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া সে নামিয়া পড়িয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল। অনেকক্ষণ একটা পার্কে বসিয়া বিশ্রাম করিয়া সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল, পরে যাহাই হউক এখন একবার মার কাছে যাওয়া দরকার।

বাড়ীর সামনে আসিয়া দেখিল তালা বন্ধ। একটা দীর্ঘশ্বাস নির্গত হইল, অসিত বুঝিতে পারিল না সেটা স্বস্তির কি অতৃপ্তির। কাহারো নিকট আর কোন খোঁজ না লইয়া সে ফিরিল। কিছু দূর যাইতেই সে দেখিল, পূর্ণিমা একটা ট্যাক্সি হইতে নামিয়া তাহার দিকে আসিতেছে। সে বলিল—টেলিফোন করে খবর পেলাম আপনাকে একটু আগে ছেড়ে দিয়েছে। মেসে খবর নিয়ে জানলাম সেখানে ফেরেন নি। তাই এদিকে এলাম। দেখছি আমার আন্দাজে ভুল হয় নি। আর একটু হলেই দেখা হোত না। উঠুন গাড়ীতে চলুন আমার সঙ্গে।

অসিত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, প্রতিবাদ করিল না। পূর্ণিমা আদেশ করিল—কোঠ্ঠি।

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে অসিত বিভ্রান্তের মত বসিয়া রহিল। পূর্ণিমা বলিল—শুধু শুধু কষ্ট করে আপনার এদিকে আসা হোল। মা ত এখানে নেই। অসিত চাহিয়া আছে দেখিয়া বলিল—আমি আপনার মার কথা বলছি।

—মার খবর জানো ?

—জানি বৈকি। আপনার খবর জানতে পেরে তিনি আহার নিদ্রা ত্যাগ

করেছিলেন। তারপর যেদিন বিচারে মুক্তির খবর প্রকাশ পেল সেইদিনই কলকাতা ছেড়ে বৃন্দাবনে চলে গেলেন।

একটা উদ্গত দীর্ঘশ্বাস অসিত চাপিয়া গেল। সে ভাবিতেছিল বরাহনগর যাইতেছে। হঠাৎ একটা বাড়ীর সামনে গাড়ীটা থামায় ও পূর্ণিমা নামিয়া পড়িয়া তাহাকে ডাকায় সে চমকিত হইয়া বলিল—এ কোথায় এলাম?

—পূর্ণিমা সামান্য একটু রহস্য করিয়া বলিল—আমার বাড়ী। তারপরেই গম্ভীর হইয়া বলিল—দেখুন আপনি এখন অত্যন্ত ক্লান্ত। এখন আপনি আমায় কোন প্রশ্ন করতে পাবেন না। আগে বিশ্রাম করে সুস্থ হয়ে নিন, তখন যা চাইবেন সব জানতে পারবেন।

সে অসিতকে তাহার শয়ন গৃহে লইয়া গিয়া শয্যায় বসাইয়া জুতার ফিতা খুলিয়া দিয়া সযত্নে শোয়াইয়া দিল। অসিত না বলিয়া পারিল না—এ যে আবার নার্সের হাতে পড়লাম।

—অমন করে বল্‌বেন না বল্‌ছি। যে ভোগ আপনার গেল—। শুনুন চা আনি এখন?—তারপর একটু থামিয়া প্রশ্ন করিল, আমার হাতে খেতে আপনার কোন আপত্তি নেই ত? এই বলিয়া পূর্ণিমা তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

অসিতের স্মৃতি ও বুদ্ধি লোপ পায় নাই। বুঝিল ইঙ্গিতের লক্ষ্য কোথায়। তাই সে বলিল—আন; যে তোমার হাতে রোজ খাবে তার সৌভাগ্যে হিংসে হচ্ছে।

তাহার কণ্ঠের আন্তরিকতায় পূর্ণিমা আশ্বস্ত হইয়া বলিল—একটু শুয়ে থাকুন চুপ করে; আমি এখনই আসছি।—যাইতে যাইতে পিছন ফিরিয়া বলিল—মনে পড়ে কবে আমাদের শেষ দেখা?

অসিত সযত্ন রচিত শয্যার আরামের স্রোতে নিজেকে সমর্পণ করিল। চা লইয়া পূর্ণিমা প্রবেশ করিতে অসিত লক্ষ্য করিল, পূর্ণিমা আগের চেয়ে রোগা, কালো, ও লম্বা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার আননে এক অপরূপ দিব্য শ্রী।

অসিতকে চা দিয়া নিজেও লইয়া পূর্ণিমা বসিল। সে নিজেই কথা পাড়িল—মা বাবা এদেশে নেই। একটা অ্যাক্‌সিডেণ্টে দাদা আহত হয়ে পড়ে। তাই তাঁরা দাদার কাছে গেছেন।

—বল কি? আঘাত সাংঘাতিক নয় ত? অনিল কেমন আছে?

—আগে ভয় হয়েছিল সাংঘাতিক হবে, হয়ত একটা পা কেটে ফেলে দিতে হবে। এখন খবর পাওয়া গেছে সে ভয় নেই; শীঘ্রই সেরে উঠ্‌বে।

—তুমি গেলে না কেন?

—আমি তার আগেই বাড়ী ছেড়ে চলে এসেছিলাম।—মৃদুস্বরে পূর্ণিমা কথা কয়টি বলিল।

—সে কি? কিছুই ত বুঝতে পারছি না।

—বাবা বললেন—তিনি সরকারী চাকরী করেন। তাঁর বাড়ীতে থেকে কোন বিপ্লবীর সহায়তা করা তিনি হতে দিতে পারেন না। মা তাঁকে অনেক বুঝিয়েছিলেন, কোন ফল হয় নি। তারপর দাদার খবরে তাঁরা দুজনেই বাধ্য হলেন দেশ ছেড়ে চলে যেতে।

অসিত এখন বুঝিল কাহার চেষ্টায় তাহার জন্য উকীল-ব্যারিষ্টার নিযুক্ত হইয়াছিল। মোকদ্দমায় টাকা খরচ করা বিজয়ের দলের নীতিবিরুদ্ধ। সে আর্দ্র স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—কেন তুমি এ কাজ করলে প্রন্?

পূর্ণিমা যে দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল তাহার একমাত্র অর্থ—তুমিও একথা জিজ্ঞাসা করছ?

অসিত নিজেকে বিপন্ন বোধ করিল। হাঁসপাতালে বিছানায় শুইয়া অনেক বিশ্লেষণ ও আত্মজিজ্ঞাসার পর সে যে পন্থা স্থির করিয়া রাখিয়াছে, এই মেয়েটির আকর্ষণে কি তাহা হইতে বিচ্যুত হইতে হইবে।

পূর্ণিমা বলিয়া চলিল—বাবা মার ওপর আমার কোন রাগ নেই। তাঁরা ঠিকই বলেছিলেন, আমারও ভালো হয়েছে। সৌখীন জীবন ছেড়ে স্বাবলম্বী হতে শিখেছি। জুলিয়ার সাহায্যে একটা সিনেমা-কোম্পানীতে ঢুকে পড়েছি। এখন আমাদের দেশে এপথে কষ্ট বিপদ ও অপমানের সম্ভাবনা বড় কম নয়। তবু ইচ্ছা করেই চোখ চেয়েই এপথ বেছে নিয়েছি। আশা আছে একদিন এর মধ্যে দিয়ে দেশের জন্য হয়ত কিছু করতে পারব।

কেন যে পূর্ণিমা এপথ বাছিয়াছে, অসিত তাহা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিল। সুনয়নীর সহিত তাহার অনেক আলোচনা হইয়াছে সিনেমার সম্ভাব্যতা লইয়া। সাম্যতন্ত্রের অঙ্গ হিসাবে লেনিন সিনেমাকে যে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের চোখে

দেখিতেন, তাহা জানিতে পারিয়া সে উচ্চকণ্ঠে ইহার প্রচার করিত। তাহারই ঘোষিত আদর্শ কর্ম্মপন্থা এখন পূর্ণিমার জীবনে এরূপ বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া তাহার অন্তরে ভাবাবেগের জোয়ার লাগিল। কিন্তু সে ইহাও বুঝিল এ আলোড়ন স্থায়ী নহে, ইহার পিছনে ভাঁটা অপেক্ষা করিয়া আছে। এ যেন নিবিবার পূর্ব্বে প্রদীপের শেষবার জ্বলিয়া ওঠা।

অসিত উদাত্তস্বরে বলিল—তাই হোক পূর্ণিমা তোমার সমস্ত আশা পূর্ণ হোক। যেখানেই থাকি, জেনো, তোমার সাফল্যে আমি গৌরব বোধ করছি।

পূর্ণিমা বলিল—আপনি কোথায় যাবেন? আপনার জন্যই ত—

অসিত তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিল—আমাকে মুক্তি দাও, প্রুন, আমি তোমার কাছে মুক্তি ভিক্ষা করছি। আমার জীবন থেকে একে একে সমস্ত দাবীর বন্ধন খুলে গেছে। শুধু তোমার শেষ দাবীটা তুমি নিজের হাতে খুলে নাও। দলের মোহ, কাজের মোহ আমার কেটে গেছে। আমার এখনকার সাধনা, একা থাকার সাধনা, আত্মোপলব্ধির সাধনা। তুমি একে ব্যর্থ করে দিয়ো না।

পূর্ণিমার হৃদয় চূর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু এবারে সে আর কাঁদিল না। পিতামাতার সুরক্ষিত শান্তিনীড় ত্যাগ করিয়া বিরোধ-সঙ্কুল আত্মনির্ভরের পথ বাছিয়া লওয়ায় নানা তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে এই তরুণীটির বয়স অল্প দিনেই বাড়িয়া গিয়াছিল।

পূর্ণিমা এখন নিজের নারীত্বকে তাহার প্রেমাস্পদের অপেক্ষা বড় করিয়া দেখিতে শিখিয়াছে। মন্ত্র এখন তাহার নিকট গুরুর চেয়ে উঁচু। সে বুঝিয়াছে যে প্রেমে আদর্শগত মিল নাই আছে শুধু ব্যক্তিগত আকর্ষণ, সে আকর্ষণ যত প্রবলই হউক তাহার পরিণামে অবশ্যম্ভাবী শোচনীয়তা। তাই সে আপন ভাগ্যকে সবলে মানিয়া লইতে দ্বিধা করিল না। অসিতের মুখের উপর তাহার দীপ্ত দুটি চোখ নিবদ্ধ করিয়া সে অকম্পিত কণ্ঠেই উত্তর দিল—তাই হোক।

শেষ

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়

প্রথম রচনাকাল—১৯২৯ সাল।

দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র

[৫।ক]

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব

বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বোত্তম দার্শনিক অবদান তাঁহার 'ধর্মতত্ত্ব'। ঐ গ্রন্থের কিয়দংশ-মাত্র অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত 'নবজীবনে' প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে ১২৯৫ বঙ্গাব্দে উহা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়া 'ধর্মতত্ত্ব—প্রথম ভাগ—অনুশীলন' নামে গ্রন্থাকারে প্রচারিত হয়। 'প্রথম ভাগ' বলাতে অনুমান হয়, ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের আরও বক্তব্য ছিল—কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্যে ১৩০০ সালে অকালে ৫৬ বৎসর বয়সে তাঁহার আয়ুঃসূর্য অস্তমিত হওয়াতে সে বক্তব্য বলা হয় নাই।

'বিবিধ প্রবন্ধে'র দ্বিতীয় খণ্ডের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—'(ঐ খণ্ডে মুদ্রিত) 'মনুষ্যত্ব কি' ইতি শীর্ষক প্রবন্ধ জন ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবন-চরিতের সমালোচনার ভগ্নাংশ মাত্র। 'ধর্মতত্ত্ব' নামক গ্রন্থে যে অনুশীলন-ধর্ম বুঝাইয়াছি, তাহার বীজ ইহাতে আছে।' ঐ প্রবন্ধ ১২৮৪ আশ্বিনের 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ প্রবন্ধের এক স্থলে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"যেমন কতকগুলি মানসিক বৃত্তির চেষ্টা কর্ম, এবং যেমন সে সকলগুলি সম্যক্ মার্জ্জিত ও উন্নত হইলে, স্বভাবতঃ পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে, তেমনি আর কতকগুলি বৃত্তি আছে, তাহাদের উদ্দেশ্য কোন প্রকার কার্য্য নহে—জ্ঞানই তাহাদিগের ক্রিয়া। কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলির অনুশীলন যেমন মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য, জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলিরও সেইরূপ অনুশীলন জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। বস্তুতঃ সকল প্রকার মানসিক বৃত্তির সম্যক অনুশীলন, সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি ও যথোচিত উন্নতি ও বিশুদ্ধিই মানব জীবনের উদ্দেশ্য।"

এ বীজ উত্তরকালে কিরূপে 'ধর্মতত্ত্বে' পল্লবিত ও পুষ্পিত হইয়াছিল প্রতিভার বিকাশ-লক্ষ্য-কামীর পক্ষে তাহা আলোচনার বিষয়।

'ধর্মতত্ত্ব' গুরুশিষ্যের সংবাদ (Dialogue)-রূপে প্রপঞ্চিত। এ প্রণালীর

কয়েকটা বিলক্ষণ ও বিস্পষ্ট সুবিধা আছে—প্রশ্নোত্তরছলে বক্তব্যের ইচ্ছামত সম্প্রসারণ করা যায় এবং শিষ্যের মুখে পূর্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া গুরুর মুখে তাহার নিরাস দ্বারা স্বপক্ষ স্থাপন করা যায়। বিশেষতঃ গুরুর আসনে যদি বঙ্কিমচন্দ্রের মত এক জন তত্ত্বজ্ঞ বহুদর্শী লিপিকুশল ব্যক্তি সমাসীন হন, তবে এ প্রণালীর প্রয়োগ কিরূপ সরস ও সর্বতোমুখ হইতে পারে—এই 'ধর্মতত্ত্ব' তাহার নিদর্শন। গ্রীক গুরু প্লেটোর Dialogues বিশ্ববিশ্রুত—গীতার কৃষ্ণার্জুন-সংবাদেও এ প্রণালী অনেকটা অনুসৃত। সম্ভবতঃ বঙ্কিমচন্দ্র ঐ দুই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়াছিলেন।

ধর্ম কি? 'নবজীবনে' প্রকাশিত 'ধর্ম-জিজ্ঞাসা' নিবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, প্রচলিত ব্যবহারে 'ধর্ম' শব্দ নানার্থে প্রযুক্ত হয়—তাহাদের ইংরাজি প্রতিশব্দ Religion, Ethics, Virtue, Righteousness, Attribute (যেমন চুম্বকের ধর্ম লৌহাকর্ষণ) ও Custom (যেমন কুলধর্ম)। ধর্মতত্ত্বে বঙ্কিমচন্দ্র Religion অর্থে ধর্মশব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। 'ধর্মশব্দের যৌগিক অর্থ অনেকটা religio শব্দের অনুরূপ। ধর্ম=ধৃ+মন্ (ধ্রিয়তে লোকো অনেন, ধরতি লোকং বা)। এই জন্য আমি ধর্মকে religio শব্দের প্রকৃত প্রতিশব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি।'

ঐ 'ধর্ম-জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধে,*—Religion (ধর্ম) বলিতে আমরা কি বুঝিব, তৎসম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র নানা মুনির নানামত উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং সিলির একটি বাক্য ('The substance of religion is culture') এবং অগুস্ত্ কোঁৎ-এর অভিমত† সমাদরের সহিত উদ্ধৃত করিয়া অবশেষে বলিয়াছেন,—"যদি কেহ মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া ধর্মের সম্পূর্ণ অবয়ব হৃদয়ে ধ্যান এবং মনুষ্যলোকে প্রচারিত করিয়া থাকিতে পারেন, তবে সে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকার। যদি কোথাও ধর্মের সম্পূর্ণ প্রকৃতি ব্যক্ত ও পরিস্ফুট হইয়া থাকে, তবে সে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়।"

* পরে ঐ প্রবন্ধ 'ধর্মতত্ত্ব-অনুশীলন' গ্রন্থের 'ক' ক্রোড়পত্র রূপে মুদ্রিত হইয়াছিল।

† 'Religion in itself expresses the state of perfect unity which is the distinctive work of man's existence, both as an individual and in society,—when all the constituent parts of his nature, moral and physical, are made habitually to converge towards one common purpose'.

মনুষ্যের ধর্ম কি? 'শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলির বিহিত অনুশীলনই মনুষ্যের ধর্ম। ইহাই মনুষ্যত্ব। * * যে অবস্থায় মনুষ্যের সর্বাঙ্গীন পরিণতি সম্পূর্ণ হয়, সেই অবস্থাকেই মনুষ্যত্ব বলিতেছি। * * সেই মনুষ্যত্বের উপাদান আমাদের বৃত্তিগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতা।'

মানুষের অভ্যন্তরে কতকগুলি শক্তি অন্তর্নিহিত আছে। এই শক্তিসকলকে বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্মতত্ত্বে' 'বৃত্তি' নাম দিয়াছেন। তিনি বলেন—মানুষের সমুদয় শক্তিগুলিকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—শারীরিকী, জ্ঞানার্জনী, কার্য্যকারিণী ও চিত্তরঞ্জিনী। 'ধর্মতত্ত্বের' অন্যত্র গুরু শিষ্যকে বলিতেছেন—

দেখ, তোমার হাত পা গলা তিনেরই সহজ পুষ্টি ও পরিণতি হইয়াছে—কিন্তু একেরও সর্বাঙ্গীন পরিণতি হয় নাই। এইরূপ আর আর সমস্ত শারীরিক প্রত্যঙ্গের বিষয়ে দেখিবে। শারীরিক প্রত্যঙ্গ মাত্রেরই সর্বাঙ্গীন পরিণতি না হইলে, শারীরিক সর্বাঙ্গীন পরিণতি হইয়াছে বলা যায় না, কেন না, ভগ্নাংশগুলির পূর্ণতাই ষোল আনার পূর্ণতা। * * যেমন শরীর সম্বন্ধে বুঝাইলাম, এমনই মন সম্বন্ধে জানিবে। মনেরও অনেকগুলি প্রত্যঙ্গ আছে—সেগুলিকে বৃত্তি বলা গিয়াছে। কতকগুলির কাজ জ্ঞানার্জন ও বিচার। কতকগুলির কাজ কার্য্যে প্রবৃত্তি দেওয়া,—যথা ভক্তি, প্রীতি, দয়াদি। আর কতকগুলির কাজ আনন্দের উপভোগ, সৌন্দর্য্য হৃদয়ে গ্রহণ, রসগ্রহণ, চিত্তবিনোদন।* এই ত্রিবিধ মানসিক বৃত্তিগুলির সকলের পুষ্টি ও সম্পূর্ণ বিকাশই মানসিক সর্বাঙ্গীন পরিণতি।

'ধর্মতত্ত্বে'র আর এক স্থলে বঙ্কিমচন্দ্র এইরূপ লিখিয়াছেন—

বৃত্তিগুলিকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—(১) শারীরিক ও (২) মানসিক। মানসিক বৃত্তিগুলির মধ্যে কতকগুলি জ্ঞান উপার্জন করে, কতকগুলি কাজ করে বা কার্য্যে প্রবৃত্তি দেয়; আর কতকগুলি জ্ঞান উপার্জন করে না, কোন বিশেষ কার্য্যের প্রবর্ত্তকও নয়, কেবল আনন্দ অনুভূত করে। যেগুলির উদ্দেশ্য জ্ঞান, সেগুলিকে 'জ্ঞানার্জনী' বলিব। যেগুলির প্রবর্ত্তনায় আমরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, বা হইতে পারি, সেগুলিকে 'কার্য্যকারিণী' বৃত্তি বলিব। আর যেগুলি কেবল আনন্দ অনুভূত করায়,

* এই চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র অন্যত্র লিখিয়াছেন:—যে সকল বৃত্তির দ্বারা সৌন্দর্য্যাদির পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা নির্মল ও অতুলনীয় আনন্দ অনুভূত করি, সেই সকলের নাম দিয়াছি চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি। তাহার সম্যক্ অনুশীলনে সচ্চিদানন্দময় জগৎ এবং জগন্ময় সচ্চিদানন্দের সম্পূর্ণ স্বরূপানুভূতি হইতে পারে। চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলন-অভাবে ধর্মের হানি হয়।

সেগুলিকে আহ্লাদিনী বা 'চিত্তরঞ্জিনী' বৃত্তি বলা যাউক। জ্ঞান, কর্ম, আনন্দ, এই ত্রিবিধ বৃত্তির ত্রিবিধ ফল।

বঙ্কিমচন্দ্র বৃত্তির চাতুর্বিধ্য প্রতিপন্ন করিলেন—এ মতে আপত্তি করিবার বিশেষ কিছু নাই। তবে আমার মনে হয় বৃত্তির বৈদান্তিক শ্রেণীবিভাগ আরও বিজ্ঞানসম্মত। বেদান্তে যাহাকে ভূতাত্মা বলে (পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের 'soul') সেই ভূতাত্মা একাধারে কর্তা, ভোক্তা ও জ্ঞাতা ; অর্থাৎ ঐ ভূতাত্মা হইতে যুগপৎ জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি উৎসারিত হয়—স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ (উপনিষদ্)। ক্রিয়াশক্তির ফলে জীব কর্তা, ইচ্ছাশক্তির ফলে ভোক্তা এবং জ্ঞানশক্তির ফলে জ্ঞাতা। জ্ঞানশক্তির প্রকাশ ভাবনায়, ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ কামনায় এবং ক্রিয়াশক্তির প্রকাশ চেষ্টায়। ইহারাই পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের পরিচিত Cognition, Emotion and Conation—চলিত কথায় Thinking, Feeling, and Willing। বেদান্ত বলেন, চেষ্টা বা Conation-এর প্রকাশ হয় অন্নময় কোশের (Physical Bodyর) সাহায্যে, কামনা বা Emotion-এর প্রকাশ হয় প্রাণময় কোশের (Astral Body-র) সাহায্যে, এবং ভাবনা বা Cognition-এর প্রকাশ হয় মনোময় কোশের (Mental Body-র) সাহায্যে।

আর একটু নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, ভূতাত্মার উৎসারিত ঐ ক্রিয়াশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞানশক্তি প্রকৃতপক্ষে জীবাত্মা হইতে প্রসৃত সন্ধিনী, হ্লাদিনী ও সম্বিৎশক্তিরই আভাস (reflection)। অর্থাৎ নিম্নতর গ্রামে (on a lower level) যাহা ক্রিয়াশক্তি (Power of Action)—উচ্চতর গ্রামে (on a higher level) তাহাই সন্ধিনী ; নিম্নতর গ্রামে যাহা ইচ্ছাশক্তি (Power of Desire)—উচ্চতর গ্রামে তাহাই হ্লাদিনী ; এবং নিম্নতর গ্রামে যাহা জ্ঞানশক্তি (Power of Thought)—উচ্চতর গ্রামে তাহাই সম্বিৎ। ঐ সন্ধিনী, হ্লাদিনী ও সম্বিৎ শক্তি যথাক্রমে প্রতাপ, প্রেম ও প্রজ্ঞার আকারে স্ফুরিত হয়। খৃষ্টানেরা ইহাদিগকে Life, Light ও Love বলেন। উহাদেরই পাশ্চাত্য সংজ্ঞা Power, Wisdom ও Bliss—বেদান্তের পরিচিত সৎ, চিৎ ও আনন্দ।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, আমাদের বৃত্তিগুলি (তা' তাহাদিগকে যে নামেই

অভিহিত করা যাক না) নিরপেক্ষ নয়, পরস্পর-সাপেক্ষ। তাঁহার কথা এই :—

'সমস্ত বৃত্তিগুলির যথাযথ অনুশীলন পরস্পরের অনুশীলন-সাপেক্ষ। কেবল শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন জ্ঞানার্জনী বৃত্তির সাপেক্ষ এমন নহে। কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলিও তৎসাপেক্ষ। * * শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য মানসিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজন, মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজন।'

বঙ্কিমচন্দ্র আরও বলেন যে, বৃত্তিগুলি কেবল স্ফূর্ত্ত হইলেই হইল না—তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য চাই—যাহাকে বলে harmonious development। 'তাহা হইলেই বৃত্তিগুলির উচিত অনুশীলন ও পরিণতি ঘটিবে। ইহাই ধর্ম।' 'ধর্মতত্ত্বে' বঙ্কিমচন্দ্র একথা সবিশেষ বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন :—

অনুশীলন-নীতির স্থূল গ্রন্থি এই যে, সর্বপ্রকার বৃত্তি পরস্পর পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য-বিশিষ্ট হইয়া অনুশীলিত হইবে, কেহ কাহাকে ক্ষুণ্ণ করিয়া অসঙ্গত বৃদ্ধি পাইবে না।

পুনশ্চ—

বৃত্তিসকলের অনুশীলনের স্থূল নিয়ম পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য। ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও পরিতৃপ্তি সুখ নহে—সুখের অংশ মাত্র—সমবায়ই সুখ।

অর্থাৎ, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে সকলকেই সকল মনোবৃত্তিগুলি সংবর্দ্ধিত করিতে হইবে।

'তাহা না হইলে মানসিক বৃত্তির সকলগুলির স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি হইল কৈ? সবাই আধখানা করিয়া মানুষ হইল, আস্ত মানুষ পাইব কোথা? যে বিজ্ঞানকুশলী, কিন্তু কাব্যরসাদির আস্বাদনে বঞ্চিত, সে কেবল আধখানা মানুষ। অথবা যে সৌন্দর্য্যদগ্ধপ্রাণ, সর্ব সৌন্দর্য্যের রসগ্রাহী—কিন্তু জগতের অপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিকতত্ত্বে অজ্ঞ—সেও আধখানা মানুষ। উভয়েই মনুষ্যত্ববিহীন, সুতরাং ধর্মে পতিত।'

সেই জন্য যে মানবের সমস্ত বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্ত অথচ সমঞ্জস—বঙ্কিমচন্দ্রের মতে তিনিই পূর্ণ মানুষ।

অর্থাৎ 'জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, বিচারে দক্ষতা, কার্য্যে তৎপরতা, চিত্তে ধর্মাত্মতা এবং সুরসে রসিকতা—এই সকল হইলে, তবে মানসিক সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি হইবে। আবার তাহার উপর শারীরিক সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি আছে। অর্থাৎ শরীর বলিষ্ঠ, সুস্থ এবং সর্ববিধ শারীরিক ক্রিয়ায় সুদক্ষ হওয়া চাই।'

এ সম্পর্কে আপন বক্তব্যের সার সংগ্রহ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন ঃ—

মনুষ্যের কতকগুলি শক্তি আছে। আমি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছি। সেইগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব। তাহাই মনুষ্যের ধর্ম। সেই অনুশীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য। তাহাই সুখ।

বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার করিয়াছেন যে, সমস্ত বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ অনুশীলন, প্রস্ফুরণ, চরিতার্থতা ও সামঞ্জস্য একাধারে সুদুর্লভ। তাঁহার মতে এইরূপ আদর্শ-মানব পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত একজন মাত্র দেখা গিয়াছিল। তিনি শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু মানব নহেন, অতিমানব—অবতার। কিন্তু সে কথার এখানে আলোচনা করিব না।*

বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন—মনুষ্যত্বই মনুষ্যের ধর্ম—ঐ ধর্মেই সুখ। সুখ কি? 'সুখ সকল বৃত্তিগুলির সম্যক্ স্ফূর্ত্তি, সামঞ্জস্য এবং চরিতার্থতা।' 'শারীরিক ও মানসিক শক্তি বা বৃত্তিসকলের অনুশীলনেই† সুখ—ইহা ভিন্ন অন্য সুখ নাই।' ইহাই ধর্ম। 'ধর্মই সুখের একমাত্র উপায়। ধর্ম নিত্য—ধর্ম ইহকালেও সুখপ্রদ, পরকালেও সুখপ্রদ। সুখের উপায় যদি ধর্ম হইল, তবে ইহকালের যে ধর্ম, পরকালেরও সেই ধর্ম।' অন্যত্র বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—ধর্ম আত্মপীড়ন নহে, আপনার আনন্দবর্ধন। তাঁহার ঠিক কথাগুলি এই ঃ—

ধর্মের মূর্ত্তি বড় মনোহর। ঈশ্বর প্রজাপীড়ক নহেন—প্রজাপালক। ধর্ম আত্মপীড়ন নহে—আপনার উন্নতিসাধন ; আপনার আনন্দবর্ধনই ধর্ম। ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্যে প্রীতি এবং হৃদয়ে শান্তি—এই তিনটি শব্দে যে বস্তু চিত্রিত হইল তাহার মোহিনী মূর্ত্তির অপেক্ষা মনোহর জগতে কি আছে?—১২৯২ পৌষমাসের প্রচার।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সুখবাদী হইলেও বঙ্কিমচন্দ্র 'Hedonist' ছিলেন না। এ সম্পর্কে 'পরিচয়ে'র পূর্বসংখ্যায় প্রকাশিত 'বেন্থামের হিতবাদ' প্রবন্ধের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। পাঠক ঐ প্রবন্ধে নিশ্চয়ই

* পরবর্ত্তী 'বঙ্কিমচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ' প্রবন্ধে এ বিষয়ের যথোচিত আলোচনা থাকিবে।

† লক্ষ্য করিতে হইবে, অনুশীলন ও অভ্যাস এক জিনিষ নহে—বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন—'অনুশীলন শক্তির অনুকূল, অভ্যাস শক্তির প্রতিকূল। অনুশীলনের ফল শক্তির বিকাশ, অভ্যাসের ফল শক্তির বিকার। অনুশীলনের পরিণাম সুখ, অভ্যাসের পরিণাম সহিষ্ণুতা।'

লক্ষ্য করিয়াছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র সুখের শ্রেণীভেদ করিয়া বলিয়াছেন—সুখ ত্রিবিধ—স্থায়ী, ক্ষণিক কিন্তু পরিণামে দুঃখশূন্য, এবং ক্ষণিক কিন্তু পরিণামে দুঃখের কারণ। শেষোক্ত সুখ সুখই নয়, দুঃখের প্রথমাবস্থা মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্র যখন ধর্মকে সুখের উপায় বলিয়াছেন, তখন সুখ-শব্দ দ্বারা স্থায়ী অথবা পরিণামে দুঃখশূন্য সুখকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহার প্রচারিত অনুশীলন-ধর্মের উদ্দেশ্য ঐরূপ সুখ। অর্থাৎ 'যেরূপ অনুশীলনে স্থায়ী সুখ বা দুঃখশূন্য সুখ জন্মে, তাহাই বিহিত। এইরূপ সুখই ধর্মের কষ্টিপাথর।' অন্যত্র বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—'সুখের উপায় ধর্ম আর মনুষ্যত্বেই সুখ, অতএব সুখই সেই কষ্টিপাথর।'

বঙ্কিমচন্দ্র একথাও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, পাশ্চাত্য অনুশীলন ধর্মের লক্ষ্য সুখমাত্র, কিন্তু তিনি যে ভারতীয় অনুশীলন-তত্ত্বের পুনঃ প্রচার করিয়াছেন,—যাহা তাঁহার মতে হিন্দুধর্মের সারাংশ এবং জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ ভগবদগীতা যে অনুশীলন তত্ত্বের উপর গঠিত, সে অনুশীলন-তত্ত্বের উদ্দেশ্য মুক্তি। ঐ মুক্তি সুখমাত্র নহে—উহা আত্যন্তিক সুখ (গীতা), বিপুলং সুখং (ধম্মপদ) এবং উপনিষদের ভাষায় আনন্দং নন্দনাতীতং। বঙ্কিমচন্দ্র এই ভূমানন্দের (বৃহদারণ্যকে যাহাকে 'অতিঘ্নীম্ আনন্দস্য' বলা হইয়াছে) ইঙ্গিত করিয়াছেন—বিস্তার করেন নাই। অনুশীলনের সম্পূর্ণতায় যে মোক্ষের আনন্দ অনুভূত হয় অর্থাৎ নির্ব্বাণী বা জীবন্মুক্ত পুরুষের যে আনন্দ, তাহা সকল বিষয়ে সৌভাগ্যবান্, সমস্ত সমৃদ্ধিমান্, সর্ববিধ মনুষ্যভোগে সম্পন্ন ব্যক্তির চরম আনন্দের দশ লক্ষ কোটি গুণ (billion times)। আজ এই পর্যন্ত। ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আরও অনেক বক্তব্য আছে—আগামীতে বলিবার চেষ্টা করিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

মাদন্না

ইউরোপের পেট্রোল-চালিত লৌহ-সভ্যতা যখন পাথর-বাঁধা পৃথিবীর বুকের উপর হাতুড়ী পিটিতে পিটিতে ক্ষেপার মত ছুটিয়া বেড়ায় তখন পিঠের কালো চুলের বেণী খেলাইয়া, নানারঙের ঘাঘ্‌রার ঢেউ তুলিয়া দলে দলে বেদিনী দেমাক্-ভরা পা ফেলিয়া নৃত্যের তালে দেহ দুলাইয়া পথ চলে ক্রোশের পর ক্রোশ।

গ্রীষ্মের এক স্বেদ-সিক্ত মধ্যাহ্নে ভারশৌ-এর একখানা আফিস-মুখো ট্রামে এক নগ্নদেহ শিশুকে কোলে লইয়া যুবতী বেদিনী আসিয়া উঠিল। পরণে সবুজ জমীর উপর লাল ফুলআঁকা ঘাঘ্‌রা, হলুদ রঙের কাঁচুলী, মাথায় একখানা লাল টক্‌টকে রুমাল কাকপক্ষের মত কালো চুলের রাশি আলগোছে ধরিয়া রাখিয়াছে। দুইখানা নগ্নহাতের উষ্ণ স্নেহে শিশুকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া সে এক পাশে দাঁড়াইল। তাহার বয়স বছর কুড়ি হইবে, শরীরের প্রতি অঙ্গে যৌবনের জোয়ার উছলিয়া পড়িতেছে। পুরু ঠোঁটের কুটিল রেখা গালের উপর হাসির ঘূর্ণির মত টোল দুইটার সঙ্গে মিশিয়াছে। টানা ভুরুর কোলে চোখ দুইটা যেন কালো আগুন। শিশুর কচি আঙ্গুলগুলো চুম্বন করিয়া বেদিনী যেন তাহার মুখের উপর আঁকা কত কী গুপ্ত সৌন্দর্য্য দুই চোখ ভরিয়া দেখিতে লাগিল।

কালো আফিসী পোষাক পরা ছড়ি ও দস্তানা হাতে উচ্চপদস্থ ভদ্রলোকটি একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন। বেদেনীর আব্রুবিহীন অস্তিত্বটা তাঁহাকে একটু বিব্রত করিয়া তুলিল। খালি পায়ে পথ চলিলে অনভ্যস্ত মানুষের গা'টা যেমন সির্ সির্ করিয়া উঠে, তাঁহার সর্ব্বশরীরে ঐ রকম একটা অনুভূতি মাকড়সার মত হাঁটিয়া বেড়াইতে লাগিল। হাতের পুরাণো ইংরেজী টাইম্‌স্‌খানা খুলিয়া তিনি তাহাতে মনোনিবেশ করিলেন।

বছর তিনেকের একটি ছোট ছেলে বেদেনীর দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া ফিস্

ফিস্ করিয়া তাহার মা'র কানে কানে বলিল—"দেখ্‌চো মা, খোকাটা একবারে নেংটা।" তাহার হাতের উপর মৃদু আঘাত করিয়া মা বলিলেন—"দুষ্টু ছেলে, অসভ্য ছেলে, ওদিকে তোর তাকাতে হবে না—ঐ দেখ্, দেখ্‌চিস্, ঐ মস্ত কালো ঘোড়াটা, ইস্ ওর গায়ের কী ভীষণ জোর, ঐ প্রকাণ্ড মালগাড়ীখানাকে টেনে নিয়ে চলেচে। আর ঐ দেখ্ কী সুন্দর কুকুরটা, দেখ্‌চিস্।" মার কথায় কান না দিয়া ছেলেটি জিজ্ঞাসা করিল—"অতবড় পাণী,* ওর পায়ে জুতো নেই কেন মা?" চোখ রাঙাইয়া মা তাহাকে ট্রামের জানালা দিয়া পথের নানা বিচিত্র দ্রব্য সামগ্রী দেখাইতে লাগিলেন। "দেখ্‌চিস্ ঐ লোকটা কতগুলো ফানুস্ নিয়ে চলেচে। কিনে দেবোখন একটা—কী সুন্দর মটর গাড়ীটা গো! আচ্ছা, যখন মটর কিন্‌বো তখন কী রঙের মটর তোর পছন্দ হ'বে বল্‌ত।" উত্তরে কিছুক্ষণ ভাবিয়া ছেলেটি বলিল—"বেগুনী রঙের"। কিন্তু তাহার মনের চারিপাশে অতবড় পাণীর পায়ে জুতা নাই কেন, এবং খোকাটা নেংটা কেন, এই দুইটা প্রশ্ন ঘুরিয়া ফিরিয়া পায়চারী করিতে লাগিল।

বেদেনীর ঐ লজ্জা-সরমহীন ব্যবহার লইয়া দুইটা চাষী বুড়ী আপোসে আলোচনা সুরু করিল—"হ্যাঁঃ বেদেমাগীদের আবার লজ্জাসরম। দু'টো পা' দু'টো হাত থাক্‌লেই কি আর মানুষ বলে মা। জংলী, জংলী মানুষ ওগুলো, ওদের আবার লজ্জা-মান, সভ্যতা-ভব্যতা! কাতলিক্ হ'লেও বা কতা ছেলো! ভগমান্ জানেন আগুন জ্বেলে, নেচে কুঁদে ওদের কী ঢঙের পুজো-আচ্ছে! ওদের দেব্‌তা আবার দেব্‌তা!—শয়তান্! দেকোনা একবার ছুঁড়ীটের কাণ্ড, নিজের ত ঐ বেশ তা'র ওপর আবার ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে নে' লোকসমাজে বেরুনো! দেকোই না ছেলেটা আবার কা'র গায়ে কী না করে দেয়! ছি ছি ছি! ঐ জংলী মানুষগুলোকে গাড়ীতে ঘোঁড়াতে উট্‌তেই বা দেওয়া কেন বাপু! যত সব বিদিশী মান্‌ষে আমাদের সর্ব্বনাশ ক'রলে, এক ইহুদীতে রক্ষে নেই তা'র ওপর আবার বেদে! ঐ বেদেনী ছুঁড়ীদের রূপের ছিরি দেকেই আমাদের মিন্সেগুলোর যেন চোক ঠিগ্‌রে পড়ে গো! ব'ল্‌তে লজ্জায় মরি মা, আমার কত্তার যখন বয়েস ছেলো, তখন ঐ ওদেরই এক বেদেনী ছুঁড়ীকে নে' কী ঢলাঢলিটাই ক'রলে।

* পোলোনীয় ভাষায় "মহিলা"।

বলে, ওদের সঙ্গে বেরিয়ে যাবো ! বলে, ওদের ধম্ম নোবো, বলে, ওরা যাদু জানে, আমি সেই যাদু শিক্‌বো ! দেকো দিকি কাতলিকের কতার ছিরি, যীশুখৃষ্টের কাতলিক্ ধম্ম ছেড়ে উনি ওদের ধম্ম নেবেন ! বেদেনীরা যাদু না জান্‌লে কি আর অমন মদ্দ মিন্সেটাকে বশ ক'ত্তে পারে ! এক ইহুদীর জ্বালায় রক্ষে নেই, তা'র ওপর আবার বেদে !"

ইহুদীর নাম শুনিয়া এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক, পোষ্ট-আফিসের কেরাণীর মত চেহারা, কপালে চশ্‌মা তুলিয়া সাম্‌নের অপর এক বৃদ্ধকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—"ইহুদীগুলোই ত, প্রশেঁপানা,* জগতের সর্ব্বনাশ করলে ! হিট্‌লারকে লোকে মন্দ বলে, কিন্তু প্রশেঁপানা, জগতের শিরদাঁড়াটার ওপর ইহুদীরূপ যে পাকা ফোড়াটা, তা'র ওপর অস্তর যদি করে' থাকে কেউ ত সে ঐ পান্ হিট্‌লার ! ইউরোপ সভ্যদেশ, সেখানে অসভ্য মানুষের জায়গা নেই ! আমরা পানিয়ে, ভারী নরম মানুষ ! দেখুন না ঐ বেদেছুঁড়ীটা ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে নিয়ে ট্রামগাড়ীর একেবারে মাঝমধ্যিখানে দাঁড়িয়ে ! ভেবে দেখুন ত এরকম দৃশ্য কী কল্পনা করা যায় বার্লিনে, পারীতে, লন্দনে, নিউইয়র্কে ! দেবে ফাটকে পুরে, সাতদিনের জেল !" বলিতে বলিতে বৃদ্ধ খানিকটা কাশিয়া জানালা দিয়া মহা আড়ম্বরে মুখামৃত ত্যাগ করিলেন, পরে বলিতে লাগিলেন—"বেদেগুলো, পানিয়ে, চোরের একশেষ ! বাগানের ফল, ক্ষেতের সব্জী এই সন্ধেবেলা গুণে গেঁতে গেলে, পরের দিন সকালে প্রশেঁপানা, তা'র অর্দ্ধেকও নেই ! নতুন আন্‌কোরা পোষাকটা, পানিয়ে পেট্রোল দিয়ে পরিষ্কার করে' বারান্দায় শুকোতে দিয়ে একটু পেছন ফিরেছো, কি পোষাকটা নেই ! প্রশেঁপানা, আমি থাকি গ্রামে, বেদের উপদ্রব যে কী উপদ্রব তা আমার আর জান্‌তে বাকী নেই ! ঐ নেংটো ছেলেটা, পানিয়ে, একটু বড় হয়ে কথা ব'ল্‌তে শেখ্‌বার আগেই চুরী ক'রতে শিখ্‌বে ! চুরীবিদ্যে, পানিয়ে, ওদের রক্তে ! ভারশৌতে আমার এক জ্ঞাতি থাকে, পানিয়ে, জোয়ান মানুষটা, লেখাপড়া-জানা, অনেকগুলো বিদেশী পাশকরা, লন্দনে ছিল পুরো একটি বছর ! প্রশেঁপানা, এখানে সে থাকে বড়

* পোলোনীয় ভাষায় "প্রশেঁপানা" (পুং) "প্রশেঁপানী" (স্ত্রী) বা "পানিয়ে" (পুং) আমাদের ভাষায় "মশাই" শব্দের মত কথায় যেখানে সেখানে অজস্র পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

মানুষদের পাড়ায়, চমৎকার আপার্ত্তমেন্ত্-এ, কলঘরের মেঝেটা পর্য্যন্ত শ্বেতপাথরে বাঁধানো, কলে গরম জল, খাসা আপার্ত্তমেন্ত্, পানিয়ে। একদিন প্রশেঁপানা, একটা বেদিনী পথ দিয়ে হেঁকে যাচ্ছে, "কে হাত গোণাবে, কে হাত গোণাবে !" তা সে বলে, দেখিই না বেদেনীর কতবড় বিদ্যে ! বলে' পানিয়ে, খেলার ছলে বেদেনীটাকে ডেকে হাত গোণাতে দিলে। বেদেনীটা বলে, "আমার মুখের দিকে তাকাও"। তার খানিক পরে ঐ অতগুলো পাশকরা মানুষটা পানিয়ে, ব্যাগ খুলে পয়সাকড়ি যত ছিল সব ঐ বেদেনীটার হাতে ! বলে, "কী ব্যাপারটা হ'চ্ছে কিছুই বুঝ্‌তে পারছি না, সুধু মনে আছে যে ব্যাগ খুলে বেদেনীর হাতে টাকাকড়ি যা' ছিল সব দিয়ে দিলুম" ! দেখুন দেখি চোর মাগীটার কাণ্ড ! বেদেনী চলে' যাবার অনেকক্ষণ পরে তা'র হুঁস্ হ'লো। হুঁস হয়ে দেখে তা'র সোনার ঘড়িটা নেই। পুলিশ ডাকো, খোঁজো বেদেনীকে, আর খোঁজো ! সোনার ঘড়িটা আর নগদ চল্লিশ্‌টা জলতী,* দু'দু'খানা কুড়ি জলতীর নোট, পানিয়ে।"

বেদেনী শিশুকে হাসাইবার জন্য তার চিবুক নাড়িয়া, তাহার নিজের ভাষায় কত কী আদরের কথা বলিল, কতপ্রকার মুখভঙ্গী করিল, পরে চোখ ঠারিয়া তাহার ঐ জীবন্ত পুতুলটার কানে কানে কী বলিয়া হাসিয়া উঠিল। ঐ ক্ষুদ্র শিশুটা যেন তাহার প্রেমিক, তাহার সঙ্গে কত ঠাট্টা-তামাসা, কত রঙ্গরস, কত প্রেমালাপ চলিতে লাগিল। সে যে তাহার ছেলে, তাহাকে সে যে গর্ভে ধরিয়াছে, তাহার শরীরের রক্ত দিয়া সে যে গড়া, সে যে তাহার নিজের, সম্পূর্ণ আপনার ! বেদেনী আবার শিশুকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিল।

দুইটা উঁচুক্লাসের ইস্কুলের ছাত্র, ফিস্ ফিস্ করিয়া বেদেনীর রূপ প্রভৃতির আলোচনা করিতে লাগিল। চাপা গলায় ইস্কুলী ভাষা কাহারো বুঝিবার সাধ্য নাই। খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া একজন অপরের পিঠে চাপড় মারিয়া বলিল, —"যাঃ মাইরী, তুই একেবারে উচ্ছন্ন গেছিস্ !"

বেদেনীর শিশু হাসি ছাড়িয়া কান্না সুরু করিল। বেদেনী তাহাকে কত বোঝাইল, কত কথা বলিয়া ভোলাইবার চেষ্টা করিল। শিশুর কান্না থামিল না।

* ২ জলতী—১৲ টাকা।

তখন বেদেনী তাহার হলুদরঙের কাঁচুলী তুলিয়া তাহার ফুটন্ত স্তনের একটা শিশুর বুভুক্ষু মুখে পুরিয়া দিয়া তাহার কপালে চুমা খাইল এবং পরে সেই অবস্থায় ভিড় ঠেলিয়া, ঘাঘ্‌রা নাচাইয়া, দেমাক্‌-ভরা পা ফেলিয়া ট্রাম হইতে নামিয়া গেল।

ইস্কুলের ছাত্র দুইটি ট্রাম হইতে মুখ বাড়াইয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—এক বৃদ্ধ অপর বৃদ্ধের প্রতি চোখ ঠারিয়া কী একটা ইসারা করিল—চাষী বুড়ী দুইটা বেদেনীর ছেনালী ও বেহায়াপনায় একমত হইল—এবং ছোট ছেলেটি বায়না ধরিল—"মা, আমার ক্ষিদে পেয়েচে, চকোলেট্‌ কিনে দাও।"

সমীর রায়

দিগ্‌গজের সাহিত্যচর্চা

শকুন্তলা

পণ্ডিত হরিহর সার্ব্বভৌম মহাশয়ের চতুষ্পাঠীটি আমাদের গ্রামে মরূদ্যান-বিশেষ। গ্রামের মামলা-মোকদ্দমা, দলাদলি, পরনিন্দার আন্দোলন এখানে প্রবেশ করিতে পারে না। সার্ব্বভৌম মহাশয় পণ্ডিত মানুষ, অধ্যয়ন-অধ্যাপনাতেই মশ্‌গুল হইয়া থাকেন। তিনি সদালাপী ও বুদ্ধিমান, আমার মত মহামূর্খকেও অবজ্ঞা করেন না, নির্ব্বোধের মত প্রশ্ন করিলেও বিরক্ত হন না। তাঁহাকে নিতান্ত সেকেলে বলা চলে না। নিয়মিত সংবাদপত্র পড়েন, ইংরাজীতে নাম সই করিতে পারেন, ও ইংরাজী বুকনি দেওয়া আমাদের খিচুড়ী ভাষার কথাবার্ত্তা বুঝিতে তাঁহার কোন কষ্ট হয় না। অপরাহ্ণে তাঁহার চতুষ্পাঠীতে হাজির হওয়া ক্রমেই একটা অভ্যাস দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এইটি তাঁহার সাহিত্য পড়াইবার সময় ও দৈনন্দিন আফিম খাইবার সময়। আফিমের উপর আমার লোভ না থাকিলেও, আফিমের মৌতাত স্বরূপ যে চায়ের পেয়ালাটি আসিত তাহাতে আমার আপত্তি ছিল না। অধ্যাপক-গৃহিণীর সযত্নপালিত গাভীটি দুগ্ধ দিত প্রচুর, ও চায়ে দুগ্ধের কার্পণ্য ছিল না। সার্ব্বভৌম মহাশয় খাইতেন একটি শ্বেত-পাথরের বাটীতে চা,—এটি তাঁহার চরিত্রের সনাতন রক্ষণশীলতার সহিত আধুনিকতার সুন্দর সমাবেশ বলিয়াই মনে করিতাম। সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ছাত্র সুধীশ যেমন কাব্যালঙ্কারেও নিপুণ, গুরুসেবাতেও তেমনই অক্লান্ত ও সিদ্ধহস্ত। সেরূপ সুস্বাদু চা আর বড় কেহ প্রস্তুত করিতে পারিত না।

সার্ব্বভৌম মহাশয়ের চতুষ্পাঠীর এই শান্তিপূর্ণ সাহিত্যরসনিবিড় অপরাহ্ণ-কালে সম্প্রতি একটি উপদ্রব জুটিয়াছে। আমাদের গ্রামের যেন কাহার এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় আসিয়া জুটিয়াছেন ও এই মধুর অবসর সময়টিতে চতুষ্পাঠীতে আসিয়া নানা উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। নাম বলিলেন, গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ। সকলে হাসিয়া উঠিতে ভুরু কুঞ্চিত করিয়া সুধাইলেন,—"হাসলেন যে। বিদ্যাদিগ্‌গজটা বুঝি রুচিকর হল না। বিদ্যাসাগর, বিদ্যাবারিধি,

বিদ্যামহার্ণব অক্লেশে নিঃশেষ করছেন, আর বিদ্যাদিগ্‌গজটা বুঝি গলায় আটকাল।" মজা দেখিয়া একজন বলিলেন,—"বঙ্কিমচন্দ্র যাঁর জীবনী কীর্ত্তন করেছেন, আপনি কি সেই মহাপুরুষ?" দিগ্‌গজ মহাশয় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন,—"আজ্ঞা, হাঁ! আমি সেই বটি, কিন্তু বঙ্কিম কীর্ত্তন করেন নি, উপহাস করেছেন, ভাঁড়ের মত ভেঙিয়েছেন।" মজাটা একটু ঘনাইয়া উঠিতেছে দেখিয়া বলিলাম,—"তা'হ'লে আপনি এখন সেখ দিগ্‌গজ বলুন।" তিনি উত্তর করিলেন,—আজ্ঞা, না, আমি স্বামী দিগ্‌গজ, এইটিই আধুনিক।" সকলে হাসিয়া উঠিল,—"মুরগীর পালো ও আতপ চাউল ঘৃতের পাক দুইই চলে বলে!" দিগ্‌গজ বলিলেন,—"কেন নয় বলুন। স্বামী বিবেকানন্দ থেকে আরম্ভ করে' স্বামী হাস্যানন্দ পর্য্যন্ত কে খাদ্য সম্বন্ধে অনুদারতা দেখিয়েছেন? আমিই সে গৌরব খর্ব্ব করব এত অধম নই।"

এইবার শ্রোতাদের মধ্যে চোখে চোখে একটা ইসারা খেলিয়ে গেল, লোকটার মাথায় একটু গোল আছে। একজন টিপ্পনী কাটিলেন,—"তাঁদের ওসব খাদ্য দেওয়া হ'য়ে থাকে বৃহৎ ভোজে মহা সমারোহে, প্রচুর আদর-আপ্যায়নে; আর কৎলুখাঁর অনুচরেরা আপনাকে খাইয়েছিল গলায় হস্ত দিয়ে এই যা তফাৎ।" সার্ব্বভৌম মহাশয় এই অনাবশ্যক তিক্ততার আবির্ভাবে বিপন্ন হইয়া উঠিলেন, তাঁর অপ্রসন্ন মুখ দেখিয়া বেশ বোঝা গেল। দিগ্‌গজ মহাশয়ের উপর ফল কিন্তু ভিন্ন হইল; তাঁর মুখখানা হাসিতে ভরিয়া গেল। বলিলেন,—"আপনি সেদিন গড় মান্দারণে উপস্থিত ছিলেন দেখছি। কিন্তু আপনাকে সেদিন দেখেছি বলে মনে পড়ে না। আমায় কি খাতির করেছিল তা' তোমাদের বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন নি বলে' কি খাতিরটাও উড়ে গেল নাকি!" টিপ্পনীকার বলিলেন,—"যা' হোক, খাতির তা' হ'লে করেছিল খুব। ভাল, ভাল! তা' দিগ্‌গজ মহাশয়, তখন মুশলমান হলেন, আবার হিন্দু হয়েছেন, এই মত-বদলানটা কি ভাল?" দিগ্‌গজ মহাশয় হাস্যোদ্ভাসিত মুখে বলিলেন,—"ভাল মন্দের তোমার বঙ্কিম কি বুঝবেন, আর অর্ব্বাচীন তুমিই বা কি বুঝবে? বুঝত দ্বিজেন্দ্রলাল, তাই বলে' গেছে, অমন অবস্থায় পড়লে সবারই মত বদলায়।" একটা হাসি পড়িয়া গেল। টিপ্পনীকার যো পাইয়া গেলেন,—"সেখত্বের সময় মত বদলাবার অবস্থা ঘটেছিল স্বীকার করি, কিন্তু স্বামীত্বের সময় কি অবস্থা ঘটেছিল তা ত' বঙ্কিম লেখেন নি।

সেটা বলুন"। দিগ্‌গজ দুঃখের সহিত বলিলেন,—"স্বল্পায়ু পুরুষ বঙ্কিম, আমার জীবনের কতটুকুই বা জানতেন। দ্বিতীয় মতপরিবর্ত্তন হ'ল যখন আমি বিবাহ করি। এখন আমি হিন্দুধর্ম্মের স্বামী ও হিন্দুনারীর স্বামী, স্বামী with double honours, on double rights"। হাসির রোল পড়িয়া গেল।

সার্ব্বভৌম মহাশয় এতক্ষণ কৌতুক দেখিতেছিলেন, বিশেষ কিছু যোগদান করেন নাই। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আচ্ছা দিগ্‌গজ, তুমি ত বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ বলে আপনার পরিচয় দিলে। কিন্তু তিনি ত রাজা মানসিংহের সময়ের লোক, আর তোমার বয়স ত ত্রিশের বেশী বলে' বোধ হচ্ছে না।" দিগ্‌গজ এইবার গম্ভীর হইয়া গেলেন, ভর্ৎসনার সুরে বলিলেন,—"সাব্‌ভৌম দা, আপনার মত শাস্ত্রজ্ঞ লোকের মুখে একথা শুনে আমি বড়ই বিস্মিত হচ্ছি। বঙ্কিম দিগ্‌গজ-চরিত্র সৃষ্টি করেন নি, দর্শন করেছিলেন মাত্র,—যেমন মন্ত্রদ্রষ্টা বৈদিক ঋষিরা বৈদিক দেবতা ও তাঁদের জয়গানরূপ ঋক্‌-সত্যগুলি দর্শন করেছিলেন মাত্র। গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ একটা চিরন্তন সত্য যা' দেশ কালের ব্যবধান তুচ্ছ করে' অমর হয়ে আছে। শ্রীকৃষ্ণ ঠিক বলেছেন, নাহং ভবিতা ন ভূয়ঃ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাধনা অনুসারে এই সত্যের দিঙ্মাত্র দর্শন করেছিলেন, তাই অতি তরল উপহাস করে গেছেন মাত্র। আমি সেই সত্যের পূর্ণপ্রকাশ। বঙ্কিমচন্দ্র তার চরিত্রসৃষ্টি সম্বন্ধে এই মূল সত্যটা শেষ বয়সে অস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই প্রফুল্লের কথায় বলেছেন,—"আমি নূতন নহি, আমি পুরাতন। আমি সেই বাক্যমাত্র। কতবার আসিয়াছি, তোমরা আমায় ভুলিয়া গিয়াছ। তাই আবার আসিলাম—

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

দিগ্‌গজ তাঁহার লগুড়োপম যষ্টিটি তুলিয়া যখন "পরিত্রাণায় সাধুনাম্" বলিয়া আমার দিকে, ও "সিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্" বলিয়া টিপ্পনীকার মহাশয়ের দিকে আস্ফালন করিলেন, তখন নিঃশব্দে সরিয়া যাওয়াই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলাম।

(প্রথম প্রস্তাব)

একদিন বর্ষাকালের অপরাহ্ণে সার্ব্বভৌম মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে বসিয়া আছি, তিনি "শকুন্তলা" পড়াইতেছেন। সারাদিন থামিয়া থামিয়া বৃষ্টি হইতেছে, পাঠটি সমাপ্ত হইলেই চায়ের আয়োজন হইবে। আবার বৃষ্টি নামিল, ছুটিতে ছুটিতে দিগ্‌গজ প্রবেশ করিলেন ও যষ্টিটি রাখিয়া গা মাথা মুছিয়া বসিয়া পড়িলেন। সার্ব্বভৌম মহাশয় একমনে পড়াইতে লাগিলেন,—

অঙ্কে নিধায় করভোরু যথাসুখং তে
সংবাহয়ামি চরণাবুত পদ্মতাম্রৌ।

দিগ্‌গজ উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। বিরক্তির স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"সাব্‌ভোম দা, ও ছাই স্বৈরিণীলম্পটোপাখ্যান পড়িয়ে এই সব সোনার চাঁদ ছেলেদের কেন মাথা খাচ্ছেন?" তীব্রস্বরে সার্ব্বভৌম মহাশয়ের তন্ময়ত্ব কাটিয়া গেল। তিনি স্নিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "কি বলছো?" দিগ্‌গজ পুনরুক্তি করিলেন।

সা—কা'কে স্বৈরিণী বলছ, আর লম্পটই বা কে?

দি—স্বৈরিণী আপনার আদরের শকুন্তলা, আবার কে? বাপ ঘরে নাই, নাগর জুটিয়ে কি ঢলানটাই না ঢলালে। শেষে বামাল শুদ্ধ ধরা পড়তে বাপ বিদায় করে দিল। উপাখ্যানটা কি নক্কারজনক নয়? আপনি কবিতার পারিপাট্যে মুগ্ধ হ'য়ে প্রকৃত ঘটনা দেখতে পাচ্ছেন না। কিন্তু ফুল দিয়ে ঢাকলে কি গলিত শবের দুর্গন্ধ দূর হয়?

সার্ব্বভৌম মহাশয় বিবর্ণ মুখে চাহিয়া রহিলেন, যেন কেহ অকস্মাৎ তাঁহার গণ্ডে চপেটাঘাত করিল। বাক্যস্ফূর্ত্তি হইলে তিনি বলিলেন,—"কা'কে কি বলছো হে? শকুন্তলা তোমার কি করেছেন যে তুমি তাঁকে এমন কটূক্তি করছ?"

দি—আমার কিছু করেন নি বটে; কিন্তু লম্পট দুষ্মন্ত যেমন তাঁর মাথাটি খেয়েছিলেন, কালিদাসের কল্যাণে তিনি যুগযুগান্ত ধরে' অনেক কিশোর-কিশোরীর মাথা খেয়ে তার শোধ তুলছেন। আচ্ছা সাব্‌ভোম দা আপনি সত্য বলুন ত, শকুন্তলা যে কাজটি করেছিল, আপনার নিজের কন্যা যদি তা' করে' বসত তা'

হ'লে কি সে কাহিনী সুন্দর ভাষায় সুললিত কবিতায় কীর্ত্তন করে' আনন্দ লাভ করতেন?—না, লজ্জায় আপনি মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাইতেন?

সার্ব্বভৌম মহাশয়ের বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। তিনি ব্যথিত স্বরে বলিলেন,—"তুমি কাব্যজগতের সঙ্গে বাস্তব জগতের ভুল করছ।"

দি—একটুকুও না। বাস্তব জগতে যা' ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ কাব্যজগতে তা'-ই সুধাধবল এমন অদ্ভুত কাব্যজগতের অস্তিত্ব স্বীকার করি না।—আর কালিদাসও করেন না। তাই শার্ঙ্গরবের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—কিং পুরোভাগে স্বাতন্ত্র্যম্ অবলম্বনে।

যদি যথা বদতি ক্ষিতীপস্তথা
ত্বমসি কিং পিতুরুৎকুলায় ত্বয়া।

সা—আহা, কি বলছ। শকুন্তলা গন্ধর্ব্বমতে পরিণীতা তা' ভুলে যাচ্ছ কেন?

দি—বটে, বটে। গন্ধর্ব্বমতে বিবাহ যে বিবাহই নয়, তা' রাজাও জানতেন, আর শকুন্তলাও বুঝতেন। দুষ্মন্তের গন্ধর্ব্ববিবাহের ওকালতীটা শুনুন না—

গান্ধর্ব্বেণ বিবাহেন বহ্ব্যো রাজর্ষিকন্যকাঃ।
শ্রূয়ন্তে পরিণীতাস্তাঃ পিতৃভিরভিনন্দিতাঃ॥

"শ্রূয়ন্তে" কথাটা একটু লক্ষ্য করুন। রাজা জানতেন তাঁর বংশে বা তাঁর জানা কোন বংশে এই রকম নিকা-বিবাহ তাঁর জ্ঞানতঃ হয় নি; তাই ছেলে-ভুলান "শ্রূয়ন্তে" বলে শকুন্তলাকে ভোলাচ্ছেন। আর গান্ধর্ব্ববিবাহ বলছেন, বিবাহটা কোথায় হ'ল বলুন ত? রাজা তার পরই শকুন্তলাকে জাপটে ধরে' চুমো খাবার জন্য ধ্বস্তাধ্বস্তি বাধিয়ে দিলেন। দৃশ্যটা বড় আধুনিক, শরৎ চাটুজ্জেকেও হার মানিয়েছে। এই সব ছাই ভস্ম মাথার ভিতর দিয়ে ছেলে-গুলোর ইহকাল পরকাল নষ্ট করছেন।

সার্ব্বভৌম মহাশয় ক্রমশঃই বিরক্ত হইয়া উঠিতেছেন বোঝা গেল, তাঁর মুখের গাম্ভীর্য্য দেখিয়া। শান্তস্বরেই বলিলেন,—"দিগ্‌গজ, ভুলে যাচ্ছ যে

শকুন্তলা অপ্সরাকন্যা, মানুষের তৌলে তাঁর কার্য্য তৌল করলে কখনও সুবিচার হয় না।”

দিগ্‌গজের মুখে আনন্দের চিহ্ন দেখা গেল। বলিলেন,—“ঠিক বলেছেন কিন্তু! শকুন্তলার জন্ম-কাহিনীটি বলে কালিদাস এমনই চতুরতা দেখিয়েছেন, যে ইচ্ছা হয় তাঁকে কোলে করে’ নাচি। অমন কীর্ত্তিমতী মায়ের মেয়ে যে এমন কীর্ত্তি করবেন এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এমন কি মেনকার মত শকুন্তলাও যদি সেই রাজসভায় ছেলে প্রসব করে’ ফেলে ডানা বের করে’ উধাও হ’য়ে যেতেন তা হলেও আশ্চর্য্য হ’বার কিছুই থাকতো না। শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্তটি হচ্ছে সমস্ত উপাখ্যানের হজমিগুলি; এইটি খাইয়ে দিয়ে কালিদাস সব কিছুই হজম করার পথ করে’ রেখে দিয়েছেন।

আর একটা বস্তু লক্ষ্য করেছেন?—এই বৃত্তান্তটি বলছেন অনসূয়া, শান্ত শিষ্ট লক্ষ্মী মেয়ে অনসূয়া, মুখে মাখন দিলে মাখন গলে না, কিন্তু মেনকার কীর্ত্তি বর্ণনা করতে গিয়ে লজ্জায় মুখ নত হ’য়ে এল! আর এই বৃত্তান্ত শুনে শকুন্তলার সাড়াটি নাই, চুপচাপ, যেন কত পুণ্যকাহিনী, শুনে তন্ময় হ’য়ে গিয়েছেন।

সার্ব্বভৌম মহাশয়ের ধৈর্য্য ক্রমে শেষ হইয়া আসিতেছে দেখিলাম। তিনি কিঞ্চিৎ শ্লেষের সহিত বলিলেন,—“তুমি শকুন্তলার সব কিছুই মন্দ চোখে দেখছ। তাঁর কার্য্যের আর কি দোষ দেখলে বলে যাও।

দি—শকুন্তলার দোষ আমি দেখছি না। কবি যা’ দেখিয়ে গিয়েছেন তা’-ই কেবল আঙ্গুল দিয়ে দেখাচ্ছি মাত্র। শকুন্তলার সকল কাজই সুসঙ্গত সন্দেহ নাই। যেমন জন্ম, তেমনই মনোভাব, তেমনই ভাষা। প্রথম থেকেই মিলন আর উপভোগের চিন্তায় তার ভাব ও ভাষা ভারাক্রান্ত। প্রথম অঙ্কের তাপস কন্যাদের কথোপকথনটি একটু লক্ষ্য করুন। প্রিয়ংবদা একটু বেল্লিকগোছের, তাই “পয়োধর-বিস্তার” “সঙ্গম” প্রভৃতি সোজাসুজি কথা ব্যবহার করেছেন। কিন্তু লজ্জাশীলা শকুন্তলার “লতাপাদপমিথুন” “উপভোগসক্ষম সহকার” প্রভৃতি কথাগুলাও একই অর্থ-বোধক; একটু মার্জ্জিত মাত্র। “অবি ণাম এব্বং অহং বি অত্তণো অণুরূবং বরং লহেঅং ত্তি”—কথাগুলা যেন এই তিনটি কিশোরীর মনে ও আকাশে বাতাসে গুঞ্জরিত হচ্ছে। ঠিক তপোবন কি?

বিদূষক রাজাকে পরিহাস করে’ বলেছিল, “কিদং তুএ উববণং তবোবণং ত্তি পেক্‌খামি”, দেখছি তুমি তপোবনকে উপবন বানিয়ে তুল্লে। রাজাকে করতে হয় নি, এই তিনটি তরুণীই কাজটা অর্দ্ধেক অগ্রসর করে’ রেখেছিলেন।

আমি থাকিতে পারিলাম না। বলিলাম, “তপোবনবর্দ্ধিতা সংসারানভিজ্ঞা সরসা শকুন্তলার বেশ চিত্রটি আঁকছেন কিন্তু!”

দিগ্‌গজ মুখভঙ্গী করিয়া উঠিল,—“আপনি মশাই বুড়ী গৌতমীর কথার প্রতিধ্বনি করছেন মাত্র। কবি প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলার উপর শ্রোতার অনুকম্পা উদ্রেক করতে চান, তাই এসব কথা লিখছেন, তা’ বুঝছেন না? কিন্তু সত্যই কি “অণভিণ্ণো অঅং জনো কইতবস্‌স?” তৃতীয় অঙ্কে যখন রাজা চুমো খাবার জন্য শকুন্তলাকে ধরে’ ধ্বস্তাধ্বস্তি করছেন তখন গৌতমী আসছেন শুনে শকুন্তলা রাজাকে গাছের আড়ালে লুকাতে বললেন কেন? একে কি “অণভিণ্ণো কইতবস্‌স” বলা চলে? তিনি ত বুঝতেন যে এমন একটা কাজ করছিলেন যা’ বৃদ্ধা গৌতমীকে জানতে দেওয়া যায় না। আর একথা তাঁর সখী দুজনও বুঝতেন, তাই ইসারায় বললেন, “চক্কবাকবহুএ আমন্তেহি সহঅরং উঠ্‌ঠিআ রঅণী”, চক্রবাকবধূ, সহচরের কাছে বিদায় লও, রজনী উপস্থিত।

আমি—কাউকেই ছেড়ে কথা কইছেন না দেখছি,—অনসূয়া প্রিয়ংবদাকেও না।

দি—কালিদাস যা লিখে গেছেন তাই ত বলছি। তিনি কি এ দুটিকে তুষারশুভ্র নির্ম্মল করে’ এঁকেছেন? অনসূয়া শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্তের যে বর্ণনা করেছেন, তা’তে বেশ দেখা যায়, তিনি বুঝতেন, অনুকূল সময় ও অবস্থায় পড়লে সুন্দরী স্ত্রীলোকের সান্নিধ্যে মুনিঋষিরাও কি কাণ্ড করে বসেন। আর মদনক্লিষ্টা শকুন্তলাকে রাজার কাছে লতামণ্ডপের আবরণে নিরিবিলিতে একা রেখে যখন দুই সখীতে সরে গিয়ে বাইরে পাহারা দিতে লাগলেন, তখন কি ঘটবে তা’ তাঁরা বুঝেই করলেন। কাজটা অন্য লোকের কাছে লুকোতেও চেয়েছিলেন। কাজটা যে অত্যন্ত গর্হিত আগাগোড়াই তাঁরা জানতেন। চতুর্থ অঙ্কে অনসূয়ার স্বগত উক্তিটা পড়ুন,—“ণং সহিগামী দোসো ত্তি ববসিদা বি ণ পারেমি পবাসপড়িণি-উত্তস্‌স তাদকস্‌সবস্‌স দুস্‌সন্তপরিণীদং আবণ্ণসত্তং সউন্দলং নিবেদিদুং।” সখীর দোষ এ কথা কৃতনিশ্চয় হ’য়েও, প্রবাস থেকে প্রতিনিবৃত্ত পিতা কণ্বকে বলতে

পারছি না যে শকুন্তলা দুষ্মন্তকর্তৃক পরিণীতা এবং গর্ভবতী। এই অত্যধিক সঙ্কোচ কেন বলুন ত? আমার সন্দেহ হয় যে সখীরা ভেবেছিলেন যে রাজা যখন সমারোহে বউ নিয়ে যেতে আসবেন তখন বিবাহটা যে নামমাত্র গান্ধর্ব্ব-বিবাহ তা' প্রকাশ পেলে কণ্বমুনি কিছু বলবেন না। ফলে কিন্তু ঘটল বিপরীত রকম। রাজা গেলেন শকুন্তলাকে ভুলে, আর বাপের অনুপস্থিতিতে শকুন্তলা যে কাণ্ড ঘটিয়েছেন তা আর লুকিয়ে রাখা চল্‌ল না। এ ঘটনা যে ঘটতে পারে তা' শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত থেকেই সখী দুজনের জানা ছিল। তবে এই কুকার্য্যে তাঁদের এতদূর সহায়তার কোন সাফাই আছে বলুন।

আমি—আপনি কলনাদিনী মালিনীতীরে শান্তরসাস্পদ কণ্বমুনির তপোবনের বায়ুমণ্ডলে এমন একটা বিষাক্ত ধোঁয়া ছেড়ে দিলেন, যে জলস্থল-অন্তরীক্ষ একেবারে আবিল হ'য়ে উঠ্‌ল।

দি—কাব্য করতে চান করুন, কিন্তু কেন মিছামিছি আমায় দোষ দিচ্ছেন। এ বিষাক্ত বাষ্প ঐ বাতাসেই ছিল, আপনারা দেখতে পান নি বা দেখতে চা'ন নি। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি মাত্র। সমস্ত নাটকখানা নিঙড়ে আমায় দেখান দেখি তপোবনবাসী ও বাসিনীরা কোথায় একটা উচ্চাঙ্গের ধর্ম্মের, আধ্যাত্মিক-জ্ঞানের বা নীতির কথা বলেছেন। যাগযজ্ঞের আয়োজন আছে মাত্র, সেখানে আছে কিন্তু সংসারী পিতামাতার কন্যাদায়ের ভাবনা, আর অতি-আধুনিক তরুণ তরুণীর মদন-ব্যাথা ও তার সহজলভ্য প্রতীকার ও পরে যা' সর্ব্বত্র হয়ে থাকে তা'-ই।

আমি—আপনার বিকৃতদৃষ্টিতে সমস্তই বিকৃত দেখাচ্ছে। মুনিশাপে হৃত-স্মৃতি রাজা দুষ্মন্তের কি দোষ পাচ্ছেন বলুন ত।

দি—দোষ কি আমি দিচ্ছি। যা' গ্রন্থে আছে তা'-ই দেখাচ্ছি মাত্র। দুষ্মন্তকে কালিদাস একটি সুচতুর ব্যবহারাভিজ্ঞ মিষ্টভাষী লম্পট করে' চিত্রিত করেছেন তা' ত দেখতেই পাচ্ছেন।

সার্ব্বভৌম মহাশয় আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"সে কি রকম?"

দি—দুষ্মন্ত গোড়া থেকেই শকুন্তলার রূপে মুগ্ধ ও সে রূপটা উপভোগ করতে চান। "শুদ্ধান্তদুর্লভমিদং বপুঃ", "কুসমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্", "রতিসর্ব্বস্বমধরম্"—আর কত বল্‌ব। রাজার দৃষ্টি কেবল শকুন্তলার দেহখানির উপর,—একটি নিটোল সৌন্দর্য্যকুসুম বলে নয়, উপভোগের সামগ্রী হিসাবে। কামুক যখন শিকার করতে সারা তপোবন ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তখন মালিনীতীরে বেতসবেষ্টিত লতামণ্ডপের দ্বারে সিকতায় পদপঙ্‌ক্তি দেখে বুঝলেন শকুন্তলা এখানে আছেন, তখন পদপঙ্‌ক্তি দেখে তাঁর নজর গেল জঘন গৌরবের দিকে ("অবসায়া জঘনগৌরবাৎ পশ্চাৎ"),—রাজার মনের ভাবটা একবার বুঝুন। সখীদের কাছে প্রথমেই জেনে নিয়েছেন শকুন্তলার মদনস্য ব্যাপাররোধী বৈখানসব্রত বিবাহ পর্য্যন্ত, না চিরকালের জন্য। "মদনস্য ব্যাপার" কথাটা অতি আধুনিকতাকেও ছাড়িয়ে গেছে। রাজার আকর্ষণ ঐ মদনস্য ব্যাপারেই। "অনাঘ্রাতং পুষ্পং" প্রভৃতি বলে' যে বর্ণনাটা করেছেন তার সব বিশেষণগুলি লক্ষ্য করুন; শকুন্তলা যে একেবারেই কুমারী, কারুর উপভুক্ত ন'ন, এইটিই দুষ্মন্তের চোখে তাঁর প্রধান আকর্ষণ। তিনি ভাবছেন, হায়, অনুপভুক্ত পুণ্যফলের ন্যায় এই নিষ্পাপ রূপের না জানি বিধি কোন ভোক্তা জোটা'বেন। দুষ্মন্তের চোখে রমণী উপভুক্ত হ'লেই আর আকর্ষণ থাকে না, এ কথা বিদূষক ঠাট্টাচ্ছলে "ইত্থিআ রঅণ পরিহাইণো ভঅদো।" স্ত্রীরত্নের অবমাননাকারী এই একটি কথায় স্পষ্ট করে' বলেছেন। তিনি বহুবিবাহ করেও কাউকে সত্যসত্যই ভালবাসেন নি, সে কথা সখীদের কাছেও স্বীকার করেছেন,—

> পরিগ্রহ বহুত্বেঽপি দ্বে প্রতিষ্ঠে কুলস্য মে।
> সমুদ্রবসনা চোর্ব্বী সখী চ যুবয়োরিয়ম্॥

আমি—রাজারা বহুবল্লভ একথা এমন কি দোষের?

দিগ্‌গজ দাঁত খিঁচাইয়া উঠিলেন,—"নাঃ, দোষ আর কি? মনে থাকে যেন, এই রকম ভালবাসার ভাণ হয়ত প্রতিবার বিবাহের সময়ই তিনি করেছিলেন। পঞ্চম অঙ্ক দেখুন। ভোগের উপকরণ-রূপে তখনও রাণী বসুমতী রাজার অনুগ্রহ পাচ্ছেন, বেচারা রাণী হংসপদিকার দিকে রাজা ফিরেও চান না। রাজার বয়স হিসাবে এই নির্লজ্জ কামুকতা আরও অশোভন। রাজার বয়স হয়ত চল্লিশের উপর, একটু মোটা হ'য়ে পড়েছেন, উঠতে বসতে কষ্ট হয়। তাই সেনাপতি মৃগয়া করে' রাজার শরীরের উন্নতির কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, "মেদচ্ছেদ কৃশোদরং লঘু ভবত্যুত্থানযোগ্যং বপুঃ।"

আমি—রাজার দোষই দেখছেন, সদ্‌গুণ দেখছেন না।

দি—কোন সদ্‌গুণটা দেখতে হ'বে বলুন। মুনির আশ্রমে এসে লুকিয়ে মুনিকন্যাদের সৌন্দর্য্য দেখছেন, যেখানে কন্যারা লতামণ্ডপের আবরণে নিভৃতে গায়ের বল্কল খুলে বিশ্রাম করছেন, সেখানে গিয়ে লুকিয়ে তাদের অনাবৃত দেহের সৌন্দর্য্য পান করছেন ("কাঠিন্যমুক্তস্তনং"), নিজের পরিচয় দেবার সময় মিথ্যা কথা বলছেন, বিদূষককে শকুন্তলার কথা বলে' "ন খলু তাপসকন্যায়াং মমাভিলাষঃ" বলে' নিছক মিথ্যা কথা বলে' ভোলাচ্ছেন। এ সব সদ্‌গুণ বই কি। দুর্ব্বাসার শাপে হৃতস্মৃতি হ'য়ে যখন শকুন্তলাকে চিনতে পাচ্ছেন না, তখন তাঁর সুন্দর দেহখানির লোভ ছাড়তে কষ্ট হচ্ছে,—

ভ্রমর ইব বিভাতে কুন্দমন্তস্তুষারং
ন চ খলু পরিভোক্তুং নাপি শক্নোমি হাতুম্।

"তাপসবৃদ্ধে" বলে' গৌতমীকে অবজ্ঞা করতে তাঁর বাধে না,

স্ত্রীণামশিক্ষিতপটুত্বমমানুষীষু
সংদৃশ্যতে কিমুত যাঃ প্রতিবোধবত্যঃ।

বলে' একজন তাপস-কন্যাকে ঘৃণা দেখাতে তাঁর বাধে না। তাঁর মহা সদ্‌গুণ আত্মশ্লাঘা, আত্মবংশশ্লাঘা। মুনিকন্যা ক্ষত্রপরিগ্রহ-ক্ষমা কি না তাই বিচার করতে গিয়ে কোন প্রশ্ন করবার আগেই সিদ্ধান্ত করে' বসলেন

অসংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা
যদার্য্যমস্যামভিলাষি মে মনঃ।
কঃ পৌরবে বসুমতীং শাসতি শাসিতরি দুর্ব্বিনীতানাম্।
অয়মাচরত্যবিনয়ং মুগ্ধাসু তপস্বিকন্যাসু॥

বলে' আত্মবংশশ্লাঘা দেখালেন। শার্ঙ্গরবের ভর্ৎসনার উত্তরে সাটোপে উত্তর করলেন,—"বিনিপাতঃ পৌরবৈঃ প্রার্থ্যতে ইতি ন শ্রদ্ধেয়মেতৎ।" অথচ তাঁর পুরুবংশ কি যে অমানুষিক গৌরবের কার্য্য পৃথিবীতে করে' গেছেন তার কোন পরিচয় নাই,—অবশ্য দুষ্মন্তের নিজের কীর্ত্তির পরিচয় পূর্ব্বেই পেয়েছি।

এই মিথ্যাবাদী, কামুক, আত্মশ্লাঘাকারীর কোন গুণে আপনারা মুগ্ধ হয়ে আছেন জানিনা।

আমি—রাজার গুণে, রাজকার্য্যপালনে কিরূপ নিষ্ঠা, কিরূপ সূক্ষ্ম বিচার, একবার পঞ্চম অঙ্কটা খুলে দেখুন।

দি—রাজকার্য্য করে' তাঁর আনন্দ নাই, কষ্টের সহিত পালন করেছেন তা' লক্ষ্য করেছেন কি?—

নাতিশ্রমাপনয়ায় যথা শ্রমায়
রাজ্যং স্বহস্তধৃতদণ্ডমিবাতপত্রম্।

সুযোগ পেলেই আমোদ করতে বেরিয়ে যান, আর তখন রাজকার্য্য, রাণী, রাজমাতা কিছুই মনে থাকে না। শকুন্তলার পিছু নিয়ে মৃগয়াও ছেড়ে দিলেন, রাজমাতা তাঁরই কল্যাণে ব্রত উদ্‌যাপনের দিন অবশ্য আসতে হ'বে বলে সংবাদ পাঠালেন, জননীর সে অনুরোধ উপেক্ষা করে' বিদূষককে প্রতিনিধি করে' পাঠাতে তাঁর সঙ্কোচ হ'ল না। শকুন্তলা-উপভোগ ছেড়ে আসতে পারলেন না। গুণের কি শেষ আছে! আর যে অবস্থায় শকুন্তলা ছেড়ে পলায়ন করলেন তাতে প্রকৃত রাজোচিত ধর্ম্মের পরিচয় পাওয়া যায় বৈকি।

দেখিলাম বড় বাড়াবাড়ি করিয়া তুলিল। বলিলাম—

ন কেবলং যো মহতোঽপভাষতে
শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপভাক্।

সার্ব্বভৌম মহাশয়ের ধৈর্য্যের সীমা শেষ হইয়া আসিয়াছিল। তিনি তাড়া দিয়া উঠিলেন,—"দূর হও, হতভাগা কোথাকার।"

"রাজার দোষে শকুন্তলার অসহনীয় অবস্থা ঘটল, আমায় তাড়া দিলে কি হ'বে", বলতে বলতে দিগ্‌গজ পলায়ন করিলেন।

সার্ব্বভৌম মহাশয় খানিকক্ষণ গুম হইয়া বসিয়া রহিলেন। পরে ডাকিলেন, "সুধীশ, আফিমের কৌটাটা নিয়ে এস ত।" সুধীশ বহুপূর্ব্বে আলোচনার ধারা শুনিয়া ঘরের বাহির হইয়া গিয়াছিল, তাহার গ্রন্থখানি দিগ্‌গজ অধিকার করিয়াছিলেন। আফিম আসিল, চা-ও আসিল। চা

খাইতে খাইতে সার্ব্বভৌম মহাশয় বলিলেন, "এ উন্মাদ নিতান্ত নির্ব্বোধ নয়। যা' বলল তা'তে ভাববার কথা আছে।" তখনও টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছিল, আমরা দেখি নাই দিগ্‌গজ বাহিরে বারান্দার একধারে দাঁড়াইয়াছিল। দ্বারের কাছে উঁকি দিয়া বলিল, "ভাববার কথা অনেক আছে, সাব্বভোম দা। আমি ছাড়া সাহিত্য পড়বার সময় ভাবে কে? আমার কথা এখনও শেষ হয় নি, আর একদিন এসে আলোচনা করব। আজ আসি তবে।" জোড় হাতে প্রণাম করিয়া দিগ্‌গজ পথে নামিয়া পড়িল।

ক্রমশঃ

শ্রীসুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ভারতপথে*

ম্যাকব্রাইডদের বাংলোয় এডেলার দিন কতক কাটল—বিছানায় শুয়ে। একে তো তার হয়েছিল সর্দ্দিগর্ম্মি, তার উপর অজস্র মনসার কাঁটায় তার গা গিয়েছিল ছেয়ে, সেগুলোর প্রত্যেকটি বের করা চাই তো। তাই মিস ডেরেক আর মিসেস ম্যাকব্রাইড ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে 'ম্যাগনিফাইং' গ্লাস দিয়ে তার সারা গা দেখতেন—কেবলই চোখে পড়ত নতুন নতুন কাঁটার দল, এমনি চুলের মত সব সরু যে খুব সাবধান না হ'লে সেগুলির আগা ভেঙে থাকিটা শরীরের রক্তের সঙ্গে মিশে যেতে পারে। ওঁরা যেতেন এমনি হাত বুলিয়ে, আর এডেলা নির্জীব শুয়ে থাকত। যে আঘাতের সুরু হয়েছিল গুহার মধ্যে ক্রমে এই ভাবে তা তীব্রতর হয়ে উঠল। তার গায়ে কেউ হাত দিল বা না দিল তাতে এতদিন তার কিছু এসে যায়নি। তার দৈহিক বোধশক্তি অদ্ভুত রকমের নিঃসাড় হ'য়ে গিয়েছিল, সে ভাবতে পারত শুধু মনের সঙ্গে মনের সংস্পর্শের কথা। ক্রমে দেহের প্রতিশোধ আরম্ভ হোলো, সব কিছু অনুভূতি এসে ঠেকল শুধু ত্বকে, এতদিন উপবাসের পর অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ভাবে তা সচেতন হয়ে উঠল। সব লোকই মনে হোতো একই রকম। কেউ শুধু খুব কাছে আসে, আর কেউ থাকে দূরে। গায়ের থেকে কাঁটা বের করার সময়ে মনে মনে ও আওড়াত—"বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সংস্পর্শ হয় জড়জগতে, আর সময়ের ব্যবধানে হয় তাদের ব্যবধান।" এমনি দুর্ব্বল ছিল ওর মস্তিষ্ক যে এই বুলি শুধু একটা শ্লেষ না গভীর তত্ত্বকথা তা ও ঠাহর ক'রে উঠতে পারত না।

ওর প্রতি সবারই ছিল দরদ একটু যেন বেশি বেশি। পুরুষদের যেমন অতিরিক্ত সমীহ, মেয়েদের তেমনি অতিরিক্ত সহানুভূতি। আর মিসেস মুর—

* E. M. FORSTER-এর বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস A PASSAGE TO INDIA আজও সমান উপাদেয় হইলেও আকারে এত বড় যে সম্পূর্ণ বইখানির তর্জ্জমা ধারাবাহিক ভাবেও প্রকাশযোগ্য নহে। সেইজন্য অগত্যা আমরা আখ্যায়িকার সারটুকুই নিয়মিতরূপে মুদ্রিত করিব। কিন্তু হিরণকুমার সান্যাল মহাশয় সমগ্র গ্রন্থখানিই ভাষান্তরিত করিতেছেন এবং নির্বাচিত অংশের প্রকাশ 'পরিচয়ে' সমাপ্ত হইলেই তাহার সম্পূর্ণ অনুবাদ পুস্তকাকারে বাহির হইবে।—পঃ সঃ

একমাত্র যিনি এলে ও খুসি হোতো—তিনিই ওর কাছে ঘেঁষতেন না। কিন্তু ওর আসল কষ্ট কিসে, কেন ওর মন হিষ্টিরিয়া থেকে টনটনে সহজ বুদ্ধিতে কেবল পাক খেত তা কেউ বুঝত না। ও কথা আরম্ভ করত যেন বিশেষ কিছুই ঘটেনি এই ভাবে। খুব নীরস ভাবে হয়তো ও বলত, "এই বিচ্ছিরি গুহাটার মধ্যে তো ঢুকলাম, তারপর মনে পড়ে প্রতিধ্বনি যাতে হয় তার জন্যে আঙুলের নখ দিয়ে দেওয়ালে আঁচড় কাটছি। এমন সময়ে, বলেছি তো, ঢোকবার পথে একটা কি ছায়ার মতন এসে পড়ে' আমাকে একবারে আটক করল। তখন মনে হো'লো যেন একটা যুগ, কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা আধ মিনিটের বেশি কখনো টেঁকেনি। আমি দূরবীণ দিয়ে লোকটাকে মারলাম, লোকটা দূরবীণের চামড়ার ফিতেয় এমন টান মারল যে আমি ঘুরে গেলাম, ফিতেটা গেল ছিঁড়ে, আমিও পালিয়ে এলাম—মোট ব্যাপার এই। একবারও আমাকে ছোঁয়নি। সত্যি, ব্যাপারটার কিছু মাথামুণ্ডু নাই।" বলতে বলতে এডেলার দুচোখ ছলছল ক'রে উঠত। "এরকম হ'লে মুষড়ে পড়া ছাড়া উপায় কি? কিন্তু এ আমি কাটিয়ে উঠব।" তারপর ও একেবারে ভেঙে পড়ত, আর ও তাঁদেরই একজন ভেবে অন্য মেয়ে যাঁরা থাকতেন তাদেরও চোখের জল উথলে উঠত। তাই শুনে পাশের ঘরে ছেলেরা মৃদুস্বরে করতেন আক্ষেপ। এ কথা কারও মাথায় ঢুকত না যে এডেলা মনে করত চোখের জল ফেলা অত্যন্ত হীন, মারাবারের লাঞ্ছনার চেয়ে অনেক গভীর চোখের জলের লাঞ্ছনা—ওর উন্নত মতামতের, ওর মনের স্বাভাবিক সততার যেন তা সম্পূর্ণ বিরোধী। এডেলা অনুক্ষণ চেষ্টা করত ব্যাপারটা কি তা ভেবে ভালো ক'রে বুঝে দেখতে, অনুক্ষণ তাই ও নিজেকে বোঝাত যে এতে ক্ষতি কিছু হয় নাই। খুব একটা ধাক্কা ওর মনে লেগেছিল—কিন্তু কি হয়েছে তাতে? কিছুক্ষণের জন্যে হয়তো ওর নিজের মনের যুক্তি ও মেনে নিত, তারপরে আবার কানে আসত সেই প্রতিধ্বনি, অমনি ওর কান্না আসত, ও তখন বলত রনির যোগ্য ও নয়, আর যে ওকে আমন্ত্রণ করেছিল সে যেন চরম সাজা পায়। এই রকম এক একটা ঘটনার পর ওর ইচ্ছে হোতো বাজারের মধ্যে গিয়ে যাকে সামনে পায় তার কাছেই ক্ষমা চায়, কেন না ওর তখন কি রকম একটা স্পষ্ট ধারণা হোতো যে,

যে-পৃথিবীতে ও জন্মগ্রহণ করেছিল ছেড়ে যাবার সময় তার যেন অনেক অবনতি হয়েছে। ওর মনে হোতো যে এই অপরাধ যেন ওর নিজেরই। তারপর আবার ওর বুদ্ধি সজাগ হয়ে উঠত, ও বুঝত যে ও ভুল করেছে; তখন সুরু হোতো মনের সঙ্গে আবার সেই নিষ্ফল বোঝাপড়ার চেষ্টা।

শুধু একটিবার যদি মিসেস মূরের সঙ্গে দেখা হোতো। রনির মুখে এডেলা শুনেছিল যে বৃদ্ধার শরীর বিশেষ ভালো না থাকায় তাঁর বাইরে বেরোবার গরজ ছিল না। সুতরাং সেই প্রতিধ্বনির বহর বেড়েই চল্‌ল, ওর শ্রবণেন্দ্রিয় তোলপাড় ক'রে তা ঘুরে বেড়াত, আর ঐ গুহার ভিতরকার শব্দ, একটু ভেবে দেখলেই যা অত্যন্ত তুচ্ছ ব্যাপার মনে হোতো, ওর সমস্ত জীবনের উপর আধিপত্য বিস্তার করল। পালিশ করা দেওয়ালে সে ঘা মেরেছিল—একবারে অকারণে—আর তার প্রতিধ্বনি মিলোতে না মিলোতে, আজিজ গিয়ে সেখানে হাজির হোলো। তারপর চরম ব্যাপার হোলো তার হাত থেকে দূরবীণ পড়ে যাওয়া। এডেলা তো এল বেরিয়ে কিন্তু ওর পিছন পিছন তাড়া ক'রে এল তার আওয়াজ, আর এখন পর্য্যন্ত তার রেশ বন্যার মতন ওকে ছাপিয়ে উঠছিল। একমাত্র মিসেস্ মূর পারতেন এই শব্দকে এর উৎপত্তিস্থলে ঠেলে ঢুকিয়ে তার আলগা মুখ একেবারে এঁটে বন্ধ ক'রে দিতে। পাপ পেয়েছিল ছাড়া—ও যেন শুনতে পেত তার সঞ্চার, অন্যদের জীবনে তার প্রবেশ। দিনের পর দিন ওর কাটছিল এই দুঃখের আর নিরাশার আবহাওয়ায়। ওর বন্ধুরা দলে দলে নেটিভদের বলি হোক এই দাবী জানিয়ে উৎসাহ অক্ষুণ্ণ রাখতেন, কিন্তু দুশ্চিন্তায় দুর্ব্বলতায় কাতর এডেলার সেটুকু শক্তিও ছিল না।

গায়ের কাঁটা সব তুলে নেবার পর রনি এল ওকে নিয়ে যেতে। রাগে, দুঃখে রনি একেবারে জর্জ্জরিত হয়েছিল। এডেলোর ইচ্ছা হোলো সান্ত্বনা দেয়, কিন্তু অন্তরঙ্গতা করতে হলে মনে হচ্ছিল যেন পরিহাস। যত কথা ওরা বলে অবস্থা ততই যেন অস্বাভাবিক শোচনীয় হয়ে ওঠে। সব চেয়ে কম অসহ কাজের কথাবার্ত্তা, তাই রনি ও ম্যাকব্রাইড ওর অসুখের বাড়াবাড়ির সময়ে ডাক্তারের হুকুমে ওর কাছে যে দু একটি কথা গোপন করেছিল এতদিনে তা ভেঙে বললেন। এই প্রথম ও শুনল মহরমের গণ্ডগোলের কথা। প্রায় একটা দাঙ্গা বেধেছিল আর কি। পরবের শেষ দিনে, মুসলমানদের মিছিল

যে-রাস্তা দিয়ে যাবার কথা তা ছেড়ে সিভিল ষ্টেশনে ঢোকবার চেষ্টা করেছিল। এমন কি একটা বড় তাজিয়া আটকে যাচ্ছিল বলে এক জায়গায় টেলিফোনের তার ওরা কেটে ফেলেছিল। ম্যাকব্রাইড আর তাঁর অধীন সব পুলিশের দলের বাহাদুরি বলতে হবে ব্যাপারটাকে তাঁরা আবার সিধে কাতে ফেলেছিলেন। তারপর আর একটা অপ্রীতিকর কথা উঠল—মোকদ্দমা। এডেলাকে আদালতে হাজির হ'য়ে আসামীকে সনাক্ত ক'রে দেশী এক উকিলের জেরার জবাব দিতে হবে।

ও শুধু জিজ্ঞাসা করল, "মিসেস মূর কি তখন সঙ্গে থাকতে পারেন।"

রনি বল্‌ল, "নিশ্চয়, আর আমি নিজেও থাকব। আমার কাছে এই মোকদ্দমা আসবে না, ওরা ব্যক্তিগত কারণে তাতে আপত্তি করেছে। চন্দ্রপুরেই মোকদ্দমা হবে, যদিও আমরা একবার ভেবেছিলাম বুঝি অন্যত্র।"

ম্যাকব্রাইড বিমর্ষভাবে বললেন, "মিস কেষ্টেড ভালো ক'রেই বুঝছেন তার অর্থ কি? মোকদ্দমা হবে দাসের কাছে।"

দাস ছিল রনির সহকারী, আর মিসেস ভট্টাচার্য্যের আপন ভাই, যে-মিসেস ভট্টাচার্য্যের গাড়ি গত মাসে ওদের বসিয়ে রেখে শেষ পর্য্যন্ত আসেনি। লোকটি ভদ্র ও বুদ্ধিমান, যা প্রমাণ জোগাড় হয়েছিল তাতে ওঁর নিষ্পত্তি কি হবে তা ছিল ধরাবাঁধা। কিন্তু একজন ইংরেজ মেয়ের ওপর তিনি হবেন বিচারক—এতে সাহেবপাড়া একেবারে ক্ষেপে উঠেছিল, আর মেমেরা অনেকে ছোটলাটের স্ত্রী, লেডি মেলান্‌বির কাছে এই ব্যাপার নিয়ে তার পর্য্যন্ত করেছিল।

"কারো না কারো সামনে তো হাজির হ'তে হবেই।"

"ঠিক বলেছেন—এই তো চাই। মিস কেষ্টেড, আপনার সাহস আছে বটে।" বলতে বলতে এই সব ব্যবস্থা সম্বন্ধে তিনি উগ্র হ'য়ে উঠে বললেন, "এ হোলো ডিমোক্রাসির ফল।" আগেকার দিন হলে কোনো ইংরাজ মহিলাকে এভাবে আদালতে হাজির হতে হোত না আর এদেশী কোনো লোক সাহস করত না তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে। তিনি সটান যা বলবার ব'লে যেতেন—তারপর যথাক্রমে রায় বেরতো। দেশের এই অবস্থার জন্যে মিস কেষ্টেডের কাছে উনি ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। মিস কেষ্টেড

থেকে থেকে আচমকা অশ্রুপাত করতেন। ম্যাকব্রাইডের কথায় আর একবার তাই হোলো। বেচারি রনি আকুল হয়ে ঘরময় পায়চারি করে, একবার কাশ্মীরী গালিচার নকসা-আঁকা ফুলগুলোর উপর পা ফেলে, একবার বেনারসী পিতলের ঘটিগুলোতে ঢং ঢং করে হাত দিয়ে আওয়াজ করে। নাক ঝেড়ে অবশেষে এডেলা বলল, "রোজই এই কান্না ক'মে আসছে, শিগ্‌গিরই একেবারে ভালো হয়ে উঠব।" মনের অবস্থা হয়েছিল শোচনীয়। "আমি চাই কিছু একটা করতে। তাই আমার এই গ্যাকার মতন কান্না আসে।"

পুলিশের লোকটি আবেগের সঙ্গে বললেন, "মোটেই গ্যাকার মতন নয়, আমাদের মতে আপনি সত্যি খুব আশ্চর্য্য লোক, দুঃখ এই, আরো বেশি আপনার সাহায্য করতে পারি না। আপনি যে এখানে আছেন—এই সময়ে—এ বাড়ির এর বাড়া সম্মান—" বলতে বলতে আবেগে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হোলো। "হ্যাঁ, ভালো কথা—আপনার অসুখের সময়ে আপনার নামে একটা চিঠি এসেছিল। আমি সেটা খুলেছিলাম—অপরাধ স্বীকার করছি। যদিও এরকম অপরাধ স্বীকার করা ভারি মজার শোনায়। কিন্তু কি করি যে রকম সময় যাচ্ছে। চিঠিটা এসেছিল ফিলডিং-এর কাছ থেকে।"

"উনি আমাকে কেন লিখতে যাবেন?"

"ভারি একটা বিশ্রী কাণ্ড হয়ে গেছে। আসামীর তরফ ওঁকে তাদের দলে টেনে নিয়েছে।"

রনি কথাটা উড়িয়ে দেবার মতন ক'রে বল্‌ল, "উনি একটা মাথাপাগলা লোক।"

"তা আপনি বলতে চান বলুন। কিন্তু মাথাপাগলা হলেই যে ছোটলোক হ'তে হবে তার কোনো মানে নাই। আপনার সঙ্গে উনি যে কিরকম ব্যবহার করেছেন, মিস কেষ্টেডের তা জানা উচিত। আপনি না বললে অন্য কেউ বলবে।"

রনি তা বল্‌ল "বলা বাহুল্য, আসামীর পক্ষের উনিই এখন হলেন প্রধান নির্ভর। আমরা হলাম অত্যাচারীর দল, তার মধ্যে উনি হলেন একটিমাত্র ন্যায়পরায়ণ ইংরেজ। বাজার থেকে দলে দলে লোক সব ওঁর কাছে যায়, তারপর সবাই মিলে চলে পান চিবোনো আর পরস্পরের হাতে আতর ঘষা। এহেন লোকের মন বোঝা ভার। ওঁর ছাত্রেরা সব করেছে

ধর্ম্মঘট—ওঁর প্রতি এমনি তাদের দরদ যে লেখাপড়া তারা করবে না। ফিলডিং না থাকলে মহরমের সময়ে কোনো গোলমাল হ'ত না। সমগ্র ইংরেজ সম্প্রদায়ের বিশেষ অপকার হয়েছে ওঁর জন্মে। আপনার সেরে ওঠার অপেক্ষায় চিঠিটা দু-একদিন এখানেই পড়েছিল, কিন্তু তারপর ব্যাপার গুরুতর হ'য়ে ওঠাতে আমি চিঠিটা খুলে দেখাই স্থির করলাম, যদি আমাদের কোনো কাজে আসে।"

"এসেছে কি ?" ক্ষীণস্বরে এডেলা জিজ্ঞাসা করল।

"মোটেই না। উনি শুধু বলেছেন যে আপনার ভুল হয়েছে, আস্পর্দ্ধা দেখুন।"

"যদি হোতো, বাঁচতাম।" এডেলা চিঠিটা একবার চোখ বুলিয়ে দেখল। খুব গুছিয়ে লেখা, আর আত্মীয়তার কোনো ভাণ তাতে নাই। ও পড়তে লাগল, "ডাক্তার আজিজ নিরপরাধ।" ওর গলা আবার কাঁপতে সুরু করল। "কিন্তু, রনি, তোমার সঙ্গে কি ব'লে উনি ও রকম ব্যবহার করলেন। একেই তো আমার জন্মে তোমাকে অতখানি সহ্য করতে হ'য়েছে। কি জঘন্য ওঁর কাণ্ড। কি ক'রে আমি তোমার ঋণ শোধ করব জানি না। যার কিছুই নাই সে কি ক'রে ঋণ শোধ করবে ? দুজনে ভাব হ'য়ে কি লাভ যদি প্রত্যেকের দেবার জিনিষ তাতে কেবলই কমতে থাকে ? আমার মনে হয় অনেক শতাব্দীর জন্মে আবার মরুভূমিতে ফিরে গিয়ে সকলের উচিত ভালো হতে চেষ্টা করা। একেবারে প্রথম থেকে সুরু করতে আমি চাই। ভাবতাম অনেক কিছু শিখেছি, এখন দেখছি তাতে জ্ঞান তো কিছু হয়ই নি, হয়েছে শুধু জ্ঞানের পথে বাধা। কারো সঙ্গে গভীর সম্বন্ধ হবার মতন যোগ্যতা আমার নাই। চল, যাওয়া যাক, যাওয়া যাক। অবশ্য মিষ্টার ফিলডিং-এর চিঠিতে কিছু এসে যায় না, যা খুসি তিনি ভাবুন বা লিখুন। কেবল মনে হয়, তোমাকে যা সহ্য করতে হচ্ছে তার ওপর তোমার সঙ্গে ও রকম অভদ্রতা করা ওঁর ঠিক হয়নি। আসল জিনিষ হোলো তাই। আমার হাত ধরার দরকার নাই, আমি ভীষণ হাঁটতে পারি, আমাকে ধোরোনা, লক্ষ্মীটি।"

মিসেস ম্যাকব্রাইড খুব আদর ক'রে ওর কাছে বিদায় নিলেন। এই মেয়েটির সঙ্গে তাঁর মিল এতটুকু ছিল না, এর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা শুধু ওঁকে পীড়া

দিত। এখন থেকে বছরের পর বছর ধরে ওঁদের দেখা হবে, যতদিন না একজনের স্বামী পেনশন নেন। "এ্যাংলো-ইণ্ডিয়া" প্রবল আগ্রহে এই মেয়েটিকে একেবারে পেয়ে বসেছিল। ও বেচারি চেয়েছিল নিজের মতে চলতে, তাই ওর এই সাজা। ও হার মেনেছিল, ওর দর্প গিয়েছিল ভেঙে। মিসেস ম্যাকব্রাইডকে ও ধন্যবাদ জানালো। মিসেস ম্যাকব্রাইড বললেন, "ভালোমন্দ সবই সইতে হবে বৈকি। আর করতে হবে এ ওকে সাহায্য"। মিস ডেরেকও সেখানে ছিলেন, ওঁর সেই মজার মহারাজা ও রাণী সম্বন্ধে রঙ্গরস পুরোদমে চলছিল। মোকদ্দমায় তাঁকে স্বাক্ষী মানা হয়েছিল, উনি তাই মুদকুল রাজ্যের গাড়ি ফেরৎ পাঠালেন না ; ওরা কি চটাই না চটবে। মিসেস ম্যাকব্রাইড আর মিস ডেরেক দুজনেই এডেলাকে নাম ধরে ডেকে আদর করল। তারপর রনি ওকে মোটরে চ'ড়ে নিয়ে গেল। খুব সকালেই ওরা গেল, কেননা গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দিনগুলোও যেন রাক্ষসের মতন এবেলা ওবেলা দুদিকেই ফুলে উঠে মানুষের চলাচলের পথ প্রায় বন্ধ করে দিত।

নিজের বাংলোর কাছাকাছি এসে রনি বলল, "মা পথ চেয়ে আছেন তোমাকে দেখবার জন্মে। কিন্তু তিনি খুব বুড়ো হয়েছেন, তা যেন মনে থাকে। আমার মতে বুড়ো হলে লোকেরা আমরা যা আগে ভাবি সে ভাবে না দেখে অন্যভাবে সব কিছু দেখেন।" রনি বোধ হয় আগে থেকে গেয়ে রাখছিল, যাতে ও নিরাশ না হয়। কিন্তু এডেলা রনির কথায় কান দিল না। মিসেস মূরের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব ছিল এত গভীর আর খাঁটি যে যাই ঘটুক না কেন, তা অটুট থাকবে এডেলার মনে ছিল এই দৃঢ় বিশ্বাস। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে ও বলল, "কি করতে পারি বলো যাতে তোমার সুবিধা হয় ? ভাবনা তো তোমার জন্মেই।"

"তুমি সত্যি ভারি ভালো মেয়ে।"

"আর তুমি বুঝি ভালো ছেলে না ?" ব'লেই ও হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, "রনি, ওঁরও কোনো অসুখ টসুখ হয়নি তো ?"

রনি ওকে অভয় দিয়ে বলল, "মেজর ক্যালেণ্ডার তো কোনো খুঁৎ পাননি। কিন্তু মেজাজ ওঁর একটু খিট্‌খিটে দেখবে—আমাদের বাড়ির সবারই তাই। বুঝতেই পারবে। অবিশ্যি আমারও হাল একটু বিগড়ে আছে আর আমি আফিস থেকে ফিরে মার কাছে যতটা পাবার আশা করেছিলাম, ততটা দেওয়া ওঁর

পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু তোমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে উনি বিশেষ চেষ্টা করবেন। কিন্তু আমি চাই না তুমি একটুও নিরাশ হও—তাই বলছি, বেশি কিছু পাবে, এ আশা কোরো না।"

বাড়িটা দেখা গেল। যে বাংলো থেকে ও এসেছিল তারই জুড়ি। মিসেস মূরকে দেখা গেল একটি সোফার উপর—কি রকম ফোলা ফোলা, রঙ লাল, আর অদ্ভুত রকমের কটমটে ভাব। ওরা ঢুকতে উনি উঠলেন না। এডেলা এত আশ্চর্য্য হ'ল যে নিজের গণ্ডগোলের কথা একেবারে ভুলেই গেল।

উনি শুধু বললেন, "এই যে তোমরা দুজনেই এসেছ দেখছি।"

এডেলা পাশে বসে ওঁর হাত নিজের হাতে তুলে নিল। উনি হাত সরিয়ে নিলেন। এডেলার মনে হোলো অন্য সকলকে যেমন ওর খারাপ লাগে, তেমনি ওকেও ওঁর খারাপ লাগে।

রনি জিজ্ঞাসা করল, "ভালো আছ তো? আমি যাবার সময়ে তো ভালোই ছিলে।" ও চেষ্টা করছিল মোলায়েম ক'রে কথা বলতে, কিন্তু তবু একটু বিরক্ত ও হয়েছিল, কেননা ও বলে গিয়েছিল এডেলা এলে তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে।

গম্ভীরভাবে উনি বললেন, "আমি ঠিক আছি। জানো আমি রিটার্ণ টিকিটটা দেখছিলাম। সেটা বদল করা যায়। সুতরাং দেশে ফেরার জাহাজ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আমি যা ভেবেছিলাম তার চাইতে অনেক বেশি আমার স্বাধীনতা।"

"সে কথা পরে হতে পারে, কি বলো?"

"র‍্যালফ আর ষ্টেলা হয়তো জানতে চায় আমি কবে ফিরব।"

"ও সব ব্যাপার ভাবার অনেক সময় আছে। আচ্ছা, বলো তো, আমাদের এডেলাকে কেমন দেখাচ্ছে?"

এডেলা এক নিঃশ্বাসে বলল, "আপনার সাহায্যের উপর আমি খুব নির্ভর করছি। ভারি আরাম হচ্ছে, আবার যে আপনার কাছে আসতে পেরেছি। আর সবই তো অপরিচিত।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

কবি ও যোগী

সমালোচক, অন্ততপক্ষে সফল সমালোচক হলেন বিফল কবি—মাঝে মাঝে এ রকম বলা হয়। কবি নিজেও তেমনি আবার হলেন বিফল যোগী অর্থাৎ ভাল যথার্থ কবি হতে গেলে যোগী হওয়া চাই কিন্তু যে যোগী অসিদ্ধ ব্যর্থ—এ কথাটি কতদূর বলা যায় চিন্তা করছিলাম। এমন সময় দেখলাম একজন ফরাসী পাদরীপণ্ডিত সত্যসত্যই এ কথা বলেছেন এবং তা প্রমাণ করবার জন্য একখানা বই পর্য্যন্ত লিখেছেন।* অবশ্য মঁসিয় ব্রেমোঁ যোগী শব্দটি ব্যবহার করেন নাই, তিনি বলেছেন "মিসটিক" এবং মিসটিকের মর্ম্মগত ধর্ম্ম হল প্রার্থনা, ভগবৎ আরাধনা। আমরা তবে বলতে পারি যোগী, অধ্যাত্ম-সাধক বা শুধু সাধক—মোটের উপর অর্থ একই দাঁড়াবে।

ব্রেমোঁ কবিকে যে ভ্রষ্ট পতিত সাধক বলেছেন তার ব্যাখ্যা এই:—কবির যে আদি প্রেরণা, যে নিভৃত দৃষ্টি ও অনুভব তাঁর সৃষ্টির পিছনে রয়েছে তা হল একটা অধ্যাত্ম অনুভূতি বা অধ্যাত্মমুখী অনুভূতি; কিন্তু গোড়ার এই লক্ষ্যের দিকে তিনি সোজা চলে যান নাই, তাকে পূর্ণ মূর্ত্ত অধিগত করবার চেষ্টা করেন নাই, মাঝপথে থেমে গিয়েছেন, একটা শাখাপথে নেমে গিয়েছেন; যে নিভৃত অনুভূতি অন্তরাত্মায় পেয়েছেন তাকে বাক্যের পোষাকে অলঙ্কারে সাজিয়ে গুজিয়ে ফলিয়ে—অর্থাৎ অনেকখানি আবৃত করে ও বিকৃত করে—জাহির করেই পরিপূর্ণ তৃপ্তি তাঁর হয়েছে। অনুভূতিকে উপলব্ধি না করে, সত্তায় চেতনায় জীবনে জাগ্রত সক্রিয় না করে, তাকে কেবল কল্পনাগত স্বপ্নগত করে, কেবল মস্তিষ্কগত বিলাসের বস্তু করে রেখেছেন। শেষে অবস্থা এমন হয়েছে যে যে-অনুপাতে কবি সাধকের ধারা হতে সরে দাঁড়িয়েছেন সেই অনুপাতেই তিনি কবি হয়ে উঠেছেন। কারণ সাধনার সোজা পথ ধরে চলা অর্থ, কবিত্বের চোরাগলি এড়িয়ে যাওয়া, তার অর্থ কাব্যপ্রেরণার, কবিত্বের অবশ্যম্ভাবী বিলোপ।

* Priére et Poésie—par l'Abbé H. Brémond (de l'Academie Francaise.)

প্রথম কথাটি তা হলে প্রথমে দেখা যাক। কবি আদৌ যোগী বা সাধক কি না এবং হলে কি হিসাবে। স্বপক্ষের যুক্তি এই যে প্রায় সব কবির মুখেই—কম পরিমাণে আর বেশি পরিমাণে—শুনি অদৃশ্য, অনন্ত, অতীন্দ্রিয়, দিব্য এই সকল বস্তুর উল্লেখ। সকল কবিরই আকূতি একটা লোকোত্তর জগতের দিকে, একটা পূর্ণাঙ্গ নির্দ্দোষ সত্যের সৌন্দর্য্যের মাঙ্গল্যের দিকে। মিলতন বা ওয়ার্ডসওয়ার্থ বা দান্তের কথা ছেড়েই দিতে হয়, তাঁরা ত স্পষ্ট অধ্যাত্মপন্থী। কিন্তু শেক্সপীয়র, যিনি মানবপ্রকৃতির একান্ত ঐহিক, নিতান্ত পার্থিব জীবনযাত্রার ঘাতপ্রতিঘাতের চিত্র দিয়েছেন, তিনি যখন বলেন—

So shines a good deed in this naughty world

অথবা There's a divinity that shapes our ends
Roughhew them how we will—

তখন কি অনুভব হয় না শেক্সপীয়রের অন্তরাত্মা নিভৃতে সংযুক্ত রয়েছে আর একটা লোকাতীত চেতনার মধ্যে, তাঁর দৃষ্টি একটা প্রচ্ছন্ন জ্যোতির দ্বারা উদ্ভাসিত? এমনকি যে সব কবিকে বলা হয় ঘোর বস্তুতান্ত্রিক, যাঁরা আদর্শবিমুখী, ভগবৎদ্রোহী তাঁদের বাহ্য বক্তব্য, "মুখের কথা" যাই হোক, তাঁরা কি Lucifer বা Prometheus-এর সগোত্র নন? যাঁদের সম্বন্ধে—যাঁদের "অন্তরের ব্যথা" লক্ষ্য করে—বোদলের বলছেন—

Une Idée, une Forme, un Etre
Parti de l'azur et tombé
Dans un Styx bourbeux et plombé
Oú nul œil du Ciel ne pénètre—*

আমাদের দেশেও রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ করা বাহুল্য। তাঁর কাব্যপ্রেরণার মধ্যে ওতপ্রোত যে একটা অধ্যাত্ম আস্পৃহা এবং এই অধ্যাত্ম আস্পৃহাই যে তাঁর কাব্যপ্রেরণার মূলে তা বলবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু মধুসূদনের মত "পাষণ্ড"-ও মাঝে মাঝে কি বলেন শুনুন—

* একটি ভাব, একটি রূপ, একটি সত্তা নীলিমা থেকে ছুটে এসেছে, পড়েছে গিয়ে নরকের পঙ্কিল ধূসর এক জলধারার মধ্যে, সেখানে স্বর্গের কোন দৃষ্টিই আর প্রবেশপথ পায় না।

কোথা ব্রহ্মলোক? কোথা আমি মন্দমতি
অকিঞ্চন? যে দুর্লভ লোক লভিবারে
যুগে যুগে যোগীন্দ্র করেন মহাযোগ,
কেমনে, মানব আমি, ভবমায়াজালে
আবৃত, পিঞ্জরাবৃত বিহঙ্গ যেমতি,
যাইব সে মোক্ষধামে?—

মেঘনাদ বধের গোড়াতেও মধুসূদন শ্বেতভুজা ভারতীর আবাহন করেছেন। মধুসূদনের এই অনুভব বা সিদ্ধান্ত বা তত্ত্ব যে বীণাপাণী হলেন মোক্ষদাত্রী অর্থাৎ কাব্য হল মুক্তির সহায় ও উপায়—এটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

অবশ্য এমন কবির একান্তই যে অসম্ভাব যিনি কোথাও কখন অধ্যাত্মের বা অধ্যাত্মজাতীয় কিছু আদৌ উল্লেখ করেন নাই, তা হয়ত বলা চলে না (যেমন ধরুন লাতিন কবি কাতুল্ল (Catullus) যার সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, "He has as much philosophy in him as a red ant")। ব্রেঁমোর সিদ্ধান্তের বিপক্ষে তাই এঁদের দাঁড় করান যেতে পারে। তাঁরা যদি মুষ্টিমেয়ই হন, তাতেই সে সিদ্ধান্ত অপ্রমাণিত হয়ে যায়। কিন্তু কথাটি ঠিক তা নয়। কবির লক্ষ্য ও প্রয়াস যে বাক্যের সহায়ে একটা জীবন্ত সার্থক জিনিষ গড়ে তোলা, একটা সৌন্দর্য্য আনন্দসার সৃষ্টি করা তাই কি অতিলৌকিক, লোকোত্তরমুখী কিছু নয়? বিষয়বস্তুর মধ্যে, ব্যক্ত অর্থের মধ্যে ও-জিনিষের কোন উল্লেখ বা আভাস না থাকলেও যে নিবিড় আনন্দ সুষমা চমৎকারিত্ব তাকে ধরে ঘিরে রয়েছে তার সাদৃশ্য যোগীর সাধকের সাধ্যবস্তুর সাথেই কি নয়?

বিশ্বনাথ কবিরাজ ঠিক এই কথাই বলছেন। কাব্যের স্বরূপ বা আত্মা হল রস আর সে রস "ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর"—ব্রহ্মোপলব্ধিতে যে আনন্দ, ব্রহ্ম যে আনন্দে গঠিত তার স্বজাতীয় বস্তু কাব্যসৃষ্টির বা কাব্যাস্বাদনের আনন্দ, উভয়ে একই উৎস হতে নিঃসৃত। উভয়েই অখণ্ড-স্বপ্রকাশানন্দ-চিন্ময় এবং—এটি বিশেষ লক্ষ্য করবার জিনিষ—"বেদ্যান্তরসম্পর্কশূন্য" অর্থাৎ বাহ্যবিষয়ের সাথে উভয়েরই কোন সম্পর্ক নাই, এসকল উপকরণের উপর তাদের চিন্ময় অখণ্ড স্বপ্রকাশানন্দ

নির্ভর করে না। এই কথাই আমি পূর্ব্বে বলেছি যে কবির বাচ্য বক্তব্য যদি অধ্যাত্মবিষয়ক নাই হয় তাতে কিছু আসে যায় না—কবি যাই বলেন তা আসে এক নিগূঢ় চেতনা থেকে, যা হল "লোকোত্তরচমৎকারপ্রাণী"।

সাহিত্যদর্পণকার আরও একটি গভীর অর্থগর্ভ কথা বলেছেন কাব্যের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি বা স্বরূপ সম্বন্ধে। কাব্যরস মলিন তমোগুণ বা বিক্ষুব্ধ রজোগুণ দ্বারা গ্রাহ্য হয় না—একমাত্র তা সত্ত্বের আশ্রয়ে প্রতিফলিত হয়। সুতরাং কবিও যে সৃষ্টি করেন, তা তিনি সত্ত্বগুণের দ্বারা অধিকৃত হয়ে তবে সৃষ্টি করতে পারেন। কাব্যপাঠের ফলশ্রুতিও হল তাই সত্ত্বের উদ্রেক, রজ ও তম এই ইতর গুণদ্বয়ের দুষ্ট সংস্পর্শ থেকে প্রকৃতির শুদ্ধি ও মুক্তি। গ্রীকমনীষী আরিস্ততলের অনুরূপ সিদ্ধান্তটিও আমরা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি—ট্রাজেডির আছে যে চিত্তশোধনের ক্ষমতা (katharsis)। তবে বিশ্বনাথ কবিরাজ কাব্যের মহত্ত্ব যে পর্দ্দায় তুলে ধরেছেন ততখানি আর কেউ উঠতে পেয়েছেন কি না সন্দেহ।

বিশ্বনাথ কবিরাজের সাথে ব্রেমোঁর মূলতঃ পার্থক্য নাই। পার্থক্য কাব্যের উদ্ভব সম্বন্ধে নয়, পরিণতি সম্বন্ধে। কবির ভিতরের প্রেরণা, কবিত্বের উৎস যে একটা আধ্যাত্মিক অনুভূতি—ব্রেমোঁও বলছেন, তবে তিনি যোগ করছেন এই কথা যে যে-মুহূর্ত্তে সেই অনুভূতিকে ভাষার ছাঁচে ঢালছেন, ছন্দোবন্ধে ফলিয়ে ধরছেন, সেই মুহূর্ত্তেই কবি তাঁর নৈসর্গিক যোগী প্রকৃতির ধারায় সোজা না চলে নেমে গিয়েছেন একটা নিম্নতর প্রকৃতির ধারায়। অন্তরের ইষ্টকে নীরবে আপনার সমগ্র সত্তায় অঙ্গীভূত না করে, কেবল মুখের মুখরতায় বাহিরে ছড়িয়ে হারিয়ে ফেলেছেন। সুতরাং তিনি হয়ে পড়েছেন মিথ্যাচারী—অসত্যপরায়ণ, বিশ্বাসঘাতক। যে বস্তুকে জীবন দিয়ে মূর্ত্ত করে তুলতে হবে, তাকে তিনি সহজে সস্তায় কথার মধ্যে নিঃশেষ করে রেখেছেন, কথার কথায় পর্য্যবসিত করেছেন। জীবনের শিল্পী না হয়ে তিনি অলীক কথার শিল্পী মাত্র হয়েছেন। সত্যকার পূর্ণ উপলব্ধির পরিবর্ত্তে একটা মধ্যবর্ত্তী আপাতরমণীয় লোকে—হয়ত স্বর্গলোকে—বস্তুকে প্রত্যাখ্যান করে কল্পনার বাঙ্ময় মায়িক সৃষ্টির মধ্যে তিনি মুগ্ধ মুহ্য হয়ে রয়েছেন। অপ্সরাদের নৃত্য বুঝি সাধককে ভুলিয়ে পথভ্রষ্ট করে রেখেছে। কবির বাকসর্ব্বস্বতার অসারতা কবি নিজেও সময়ে সময়ে যে অনুভব

করেন না তা নয়—অসার বাক্যের সহায়েই আবার বাক্যের অসারতা প্রতিপন্ন করে আধুনিক এক কবি বলছেন—

চাই না আর মনে মনে অঙ্গসঞ্চালন
চাই না আর মনে মনে দূর অভিযান
চাই না আর কলমের খোঁচার বীরত্ব
চাই না আর শুধু সূত্রে-বাঁধা সৌন্দর্য্য*—

আরিস্ততলের গুরু প্লেতো কাব্যের এই দিকটিই দেখিয়েছেন—কবিত্বের মায়িক শক্তির কথাই তিনি বলেছেন। কবির হল মনোহর কিন্তু মিথ্যার জগৎ—কবির মধ্যে বা কবির জগতে আধ্যাত্মিক কিছু নাই। প্লেতো ছিলেন ধর্ম্মের নীতির শাস্তা ও গোপ্তা—কবির উপর তাঁর অসন্তোষের প্রধান কারণ কবির হাতে (যথা, হোমর) দেবতারা যে মানুষেরও অধম স্বভাব ও প্রকৃতি পেয়েছে, এই অসত্য এবং কু-আদর্শ। অসত্যকে কু-আদর্শকে সুন্দর চিত্তাকর্ষক করে ধরে কবি মানুষকে তার সত্যের মাঙ্গল্যের, যথার্থ সুন্দরের সাধনা ও সেবা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে।

কাব্যের যে এরকম একটা অবিদ্যাত্মিকা মায়িক শক্তি আদৌ থাকতে পারে না তা হয়ত সব ক্ষেত্রে বলা চলে না। এবং কোন কোন কবি যে কাব্যের পথ ধরে অন্তরাত্মার সাধনাকে খর্ব্ব করেন বা আবৃত করেন এমনও হতে পারে। পাঠকের চিত্তেও এই ধরণের মোহ উদ্রেক হতে পারে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে বলা উচিত দোষ কাব্যের নয়, কাব্যের নিজস্ব প্রকৃতির নয়—দোষ কবির ও পাঠকের অর্থাৎ মানুষ হিসাবে। এটি হল সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কথা। এভাবে দেখতে গেলে সংসারে এমন জিনিষ নাই যে সাধনার অন্তরায় হয়ে উঠতে পারে না।

সুতরাং ওকথা থেকে প্রমাণ হয় না বা সিদ্ধান্ত করা চলে না যে কবিমাত্রই ভ্রষ্ট বা পতিত যোগী। একটি উদাহরণেই সকল সন্দেহভঞ্জন হয়—উপনিষদের

* Je suis las des gestes intérieurs !
Je suis las des départs intérieurs !
Et de l'héroïsme a coups de plume
Et d'une beauté toute en formules !

Charles Vildrac—"Livre d'amour"

কবি। উপনিষদের কবি পূর্ণমাত্রায় যোগী ও ঋষি ছিলেন। উপনিষদ কবিত্ব হিসাবে যতখানি উৎকৃষ্ট, সাধনার মন্ত্র হিসাবেও ততখানি মহনীয়। কবি ও যোগী এখানে এক হয়ে, উভয়ে উভয়ের অভিব্যক্তি হয়ে প্রমূর্ত্ত—পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ। বাক্‌ সত্যের কেবল মায়িক অধ্যাস বা আবরণ হবেই তা নয়; বাক্য যেখানে বাক্‌ বা শব্দব্রহ্মের বিগ্রহ সেখানে সে হয়ে ওঠে সত্যের চারুতম শিবতম স্বরূপগত প্রভা—যেমন সূর্য্যের কিরণ, অগ্নির শিখা।

কিন্তু তাই বলে আবার অন্যদিকে এমন অত্যুক্তিও করা চলে না যে কবি ও যোগী এক ও অভিন্ন—কাব্যরচনা ও যোগসাধনায় পার্থক্য নাই। কবির তবুও হল বাঙ্ময় জগৎ এবং সেটি মানসলোকের অন্তর্ভুক্ত। কবির যে অন্তরাত্মার জ্যোতি তা এই বাঙ্ময় মানসলোককে ভাস্বর, অধ্যাত্মপ্রবণ করে তোলে। কিন্তু যোগীর ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত ও বস্তুগত—কারণ যোগীর প্রয়াস প্রাণে ও দেহে অধ্যাত্মের আলো প্রজ্বলিত করা। কবি এই প্রয়াসের আরম্ভ হতে পারেন, সহায় হতে পারেন কিংবা শেষে জয়ের প্রকাশ বা ঘোষণাও হতে পারেন। কিন্তু কবি যোগীকে সরিয়ে তার স্থান গ্রহণ করতে পারেন না—যোগী হতে গেলে যে কবি হতেই হবে তা নয়। কাব্যপুরুষ ব্রহ্মসত্তার সহোদর যদিই বা হয়, তবুও সে স্বয়ং ব্রহ্মসত্তা নয়।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

কবিতাগুচ্ছ

এখানে

সেই নাগরিক ধূসর জীবন পিছনে ফেলে'
সব থেকে দ্রুত ট্রেণে ক'রে আজ এখানে আসা
—আসানসোলে।

এখানে আকাশ পাহাড়ের গায়ে প'ড়েছে ভেঙে'
পাহাড়ের পায় সারি সারি সব চিম্‌নি-চূড়া
ধানের জমিরা পাশাপাশি শুয়ে দিগ্বিদিকে
খাড়া ক'রে কান কাস্তের শাণ শুন্‌ছে নাকি
—কামারশালে?

ঊর্মিল ভুঁই হাঁটে বনহীন তেপান্তরে
সরু সরু ঘাস, শিরে বুঝি তার শিশির ঝলে।
দুই দিকে দূর বালুদের দেশ, মধ্যে নদী
শ্বাস টেনে' টেনে' পায়ে পায়ে লেখে চিকণ লেখা।
নির্জন মাঠ, হঠাৎ কোথাও তারের বেড়া—
সর্পিল স্বরে ছোটে রেলপথ, ধনুক-আঁকা
দেশান্তরে।

দিনের পাহারা সন্ধ্যায় সেরে' সূর্য্য দেখি
অতিকায় তার ডানা মেলে কালো পাহাড় থেকে
গভীরালসে।

তাড়িখানা খোলা, রাস্তায় শুধু লোকের মেলা
পুরুষ-নারীতে মুখোমুখি ব'সে পাত্র ভরা।
কারো অসহ্য নেশা কাড়ে শেষ কপর্দকও।
বহুদিনকার ভুলে যাওয়া গ্রাম পুরানো ভিটে
স্মরণে নামে।

দূরে শিশুগাছ, ধানক্ষেত তার কিনার ঘেঁসে',
কিছু নয়, তবু কী যে সে স্বপ্ন রচনা করে।
নগরের সেই নীড় ছেড়ে' এসে' এখানে ভাবি
সিনেমায়, মাঠে রাজধানীতেই ছিলেম ভালো।
যাদের রক্ত পুড়িয়ে জীয়ানো মিলের ধোঁয়া
মুষ্টিমেয়ের খেয়ালে এখানে বেবাক্ ভোলা
হায় তাদের।

শ্রীসুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

পাতাল কন্যা

সেই ঘুমন্ত পাতালের মেয়ে ডাকে
বালুতটে একা কেন বিষণ্ণ আজ ?
ঝিনুকের গায়ে পড়ো হিজিবিজি লেখা—
উর্ব্বশী বুঝি জন্মাবে আরবার ?
ললাট-লিখনে দিয়েছ মস্ত ফাঁকি,
বিধাতাপুরুষ মরুক্ কপাল ঠুকে।
ময়ুরপঙ্খী না জোটে এখানে যদি
জাপানী ফানুস আসবে জাহাজ ভ'রে।

সাগরের নীচে কান পেতে আজ শোনো
প্রসাপিনের অশ্রুরুদ্ধ গান।
প্লুটোর প্রাসাদে রাত তো ঘনায়ে আনো
লাল ফুলে তবু কীর্ণ বুঝি বাগান ?

করাল কবলে নিজেরই এবার পালা,
ফাঁকির সাগর নিমেষে শুকিয়ে যাবে।
নিরীহ বাসুকী আবার দিলো যে সাড়া
পাতালকন্যা ডুবো জাহাজেই পাবে॥

হরপ্রসাদ মিত্র

মন্থর

ভয়ে ভয়ে মোর প্রভাতের আলো পশে জানালার ফাঁকে—
আশা-উৎসাহ-আনন্দ গান-বঞ্চিত দিনগুলি ;
পাণ্ডুর তার বিরস কপোল—সুর নাই তার ডাকে—
ক্লান্ত পথের ইঙ্গিৎ হানে কঙ্কাল অঙ্গুলি।

মরুবালুকার পথে তারা সব ক্লান্ত উটের সারি—
ভার-অবনত ন্যুব্জ বিবস মন্থর নির্ব্বোধ ;
তারা যায় শুধু যায় আর যায় অনন্ত পথচারী,
কেন যায়, কোথা যায় নাহি জানে—নাহি জানে অবরোধ।

দিবসের পিছে দিবস ফিরিছে রুদ্রাক্ষের মালা,
মরণোন্মুখ শীর্ণ করের শ্লথ সঙ্কেতে ঘুরে ;
নাহিক বিরাম উদ্দেশহীন ঘুরে মরিবার পালা,
অন্ধের মত ঘুরিছে জীবন-স্থলীর অন্তঃপুরে।

এ মরু-শ্মশান হবে অবসান কবে হায় নাহি জানি,
পশিবে কি কানে বাজে কোন খানে জীবনের মহাবাণী ?

শ্রীজীবনময় রায়

উজ্জীবন

কেন তুমি আসো না এখনো ?
ওই শোনো
নির্জ্জিতের নিরুপায় কণ্ঠস্বর শোনো
অতিদৈব দেউলের প্রতিধ্বনিপ্রহত গম্বুজে
উদয়াস্ত তোমাকেই খুঁজে,
অবশেষে ফিরে আসে আত্মঘাতী পরিহাস-রূপে।
সাঙ্কেতিক যূপে
বিনা রক্তে হয়ে গেছে বলি
ইতিমধ্যে কত শত পরাণপুত্তলি :
আর্ত্তনাদ ছাড়া আজ নৈবেদ্যের যোগ্য কিছু নেই ॥

নিবর্ত্তিত আশ্বাসের দ্বিরুক্তি শুনেই
জনশূন্য উন্মুখ গোপুর,
পিশাচী চত্বর
অগ্রগতি নিষ্কণ্টক, পর্য্যুষিত পাদ্যার্ঘ সমেত
ভূতপূর্ব্ব বিশ্বাসীরা হয় জমায়েৎ
সমুৎপন্ন সর্ব্বনাশে অর্দ্ধত্যক্ত পরস্ব কুড়াতে,
প্রতিবাতে
দুর্নিবার পতাকার প্রাগল্ভ্য কেবল
মুখরিত করে নভস্তল ॥

আসন্ন প্রলয় :
মৃত্যুভয়
নিতান্তই তুচ্ছ তার কাছে।
সর্ব্বস্ব ঘুচিয়ে যারা ব্যবচ্ছিন্ন দেহে আজো বাঁচে,
একমাত্র মুমূর্ষাই তাদের নির্ভর ;

প্রাণ আর জড়
আবার তাদের মধ্যে আশ্লিষ্ট অশ্লীল সহবাসে।
প্রত্যাগত প্রত্ন বিপর্য্যাসে
পরিপূর্ণ বিবৃত্তির অন্তিম মণ্ডল।
আখণ্ডল
নিরর্থক নামমাত্র : জরাগ্রস্ত সহস্রাক্ষে আর
পড়ে না নরকী কীট ; কুলিশপ্রহার
কম্পিত হাতের দোষে নির্দ্দোষের মুণ্ডপাত করে ॥

অস্পৃশ্য অম্বরে
তবুও অদৃশ্য তুমি ?
নিরঙ্কুশ, নিঃসন্তান, নিত্য মরুভূমি
আস্তিকের পুরস্কার—প্রতিশ্রুত ভূস্বর্গ তবে কি ?
এই পরিণতির লোভে কি
জন্মালে নারীর গর্ভে, আত্মবলি দিলে নরমেধে,
কণ্টককিরীট প'রে, বিনা ধনুর্ব্বেদে
হ'লে দুঃস্থ ধূলির সম্রাট,
মৃত্যুর কবাট
খুলে রেখে, চ'লে গেলে সার্ব্বজন্য সুধার সন্ধানে,
আশ্রিতের কানে
সাম্য-মৈত্রী-তিতিক্ষার বীজমন্ত্র ঢেলে
মিয়াদী প্রদীপ জ্বেলে
পণজীবী প্রতীক্ষার অনন্ত অভাবে ?

নিশ্চিহ্ন সে-নাচিকেতা ; নৈরাশ্যের নির্ব্বাণী প্রভাবে
ধূমাঙ্কিত চৈত্যে আজ বীতাগ্নি দেউটি ;
আত্মহা অসূর্য্যলোক ; নক্ষত্রেও লেগেছে নিছুটি।

কালপেঁচা, বাদুড়, শৃগাল
জাগে শুধু সে-তিমিরে ; প্রাগ্রসর রক্তিম মশাল
অমাকে আবিল করে ; একচক্ষু ছায়া
দীপ্ত নখ, স্ফীত নাসা, নিরিন্দ্রিয় বৈদ্যুতিক কায়া
চতুর্দ্দিকে চক্রব্যূহ বাঁধে।
অপমৃত বিধাতার লগ্নভ্রষ্ট প্রেত যেন কাঁদে
নিষেধের বহিঃপ্রান্তে কোথা ॥

ওরা কার হোতা ?
পদধ্বনি—কার পদধ্বনি
হানে মৌনে অম্বুনাদ ? আগমনী—
কার আগমনী আজ আনে আচম্বিতে
অতিশ্রুতি অন্তরায় প্রত্যাশিত আকাশবাণীতে ?
বিকল্পই তবে কি নিশ্চয় ?
যে-পশুবলের হারে হয়েছিলে তুমি মৃত্যুঞ্জয়,
এবারে কি তার উজ্জীবন ?
অন্তর্ভৌম সমাধিতে ছিলো সঙ্গোপন
যে-মিশরী শব,—
তুমি নও,—আসে কি সে-অর্দ্ধ পশু, আর্দ্ধেক মানব
সঙ্গে ক'রে দিগ্বিজয়ী মরু ?

পুরাণ পুরুষ হত ঃ বাজে বক্ষে আর্ত্তির ডমরু ॥

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

দেশ-বিদেশ

মিউনিক চুক্তি ও ৩০শে সেপ্টেম্বরের ইঙ্গ-জার্ম্মান ঘোষণার পর ইউরোপে যে স্বস্তির ভাব দেখা দিয়াছিল তাহা ক্রমশঃই অপসারিত হইতেছে। যে কোন উপায়ে সমর নিবৃত্ত করিয়া মিঃ চেম্বারলেন যে গর্ব্ব ও সম্মান দাবী করিয়া বসিয়াছিলেন তাহাও যেন ম্লান হইতে বসিয়াছে। জার্ম্মানীর পরবর্ত্তী কার্য্যাবলী ও হিটলারের পরবর্ত্তী ঘোষণাসমূহই ইহার জন্য অনেকটা দায়ী। মিউনিক চুক্তির উপকারিতা সম্পর্কে লর্ড হ্যালিফ্যাক্সও খুব আশান্বিত নয়। তাঁহার মতে— "The decision reached at Munich was not desirable in itself"। মিউনিক চুক্তির প্রতিক্রিয়া The Times-এর মতে কিঞ্চিৎ সুরু হইয়াছে—যেমন Dartford-এর পার্লামেণ্টারী উপনির্ব্বাচনে শ্রমিক দলের প্রতিনিধি রক্ষণশীল দলের প্রতিনিধিকে চারি হাজারের উপর ভোটাধিক্যে পরাজিত করিয়াছেন, অথচ ১৯৩৫ সালের সাধারণ নির্ব্বাচনে রক্ষণশীল প্রতিনিধি এইস্থানেই শ্রমিক প্রতিনিধিকে আড়াই হাজার ভোটাধিক্যে পরাজিত করিয়াছিলেন। অবশ্য অক্সফোর্ডে আর একটি উপনির্ব্বাচনে রক্ষণশীল প্রতিনিধিরই জয় হইয়াছে। এই পরিস্থিতির উপর হিটলার ও জার্ম্মান সংবাদপত্রসমূহ আবার মিঃ চার্চ্চিল, মিঃ আর্থার গ্রীনউড, মিঃ এণ্টনি ইডেনের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছে, যেহেতু ইহারা চেম্বারলেনের সাম্প্রতিক বৈদেশিক নীতির দুর্ব্বলতা ও অযৌক্তিকতা প্রমাণে সচেষ্ট হইয়াছেন। বৃটেনের সামরিক দুর্ব্বলতা থাকুক বা নাই থাকুক, চেম্বারলেনকে এইরূপ চাপে পড়িয়া সমরসজ্জা বৃদ্ধির দিকে নজর দিতে হইবে। অনেকেরই মতে বৃটেন সামরিক দিক হইতে প্রস্তুত ছিল না। Home Office-এর Deputy Under Secretary of State বলেন যে "we were unprepared, we had hardly begun to prepare"। হের ফন রিবেনট্রপ কিন্তু এই সমর-সজ্জার প্রচেষ্টাকে মিউনিক নীতি অনুযায়ী শান্তি স্থাপনের বিরোধী বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। তাঁহারই বা দোষ কি ?—হিটলার ত প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন যে মিউনিকে শান্তিরক্ষার জন্য ইঙ্গ-জার্ম্মান ঘোষণা চেম্বারলেনের গরজে ও বাসনায় স্বাক্ষরিত হইয়াছিল।

জার্ম্মানীর উপনিবেশ প্রত্যার্পণের দাবী লইয়াও চতুর্দ্দিকে অশান্তির সৃষ্টি হইতে সুরু হইয়াছে। চেম্বারলেন ও হ্যালিফাক্স এবিষয়ে অনেকটা মৌন হইয়া রহিয়াছেন। ফ্রান্সে মিউনিক চুক্তির পরিণাম সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ হইতেছে। আফ্রিকায় ও বৃটিশ ডোমিনিয়ান সমূহে অস্বস্তি দেখা দিয়াছে। Sir Stafford Cripps এবিষয়ে জনমতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ফ্রান্সই বা কি করিবে? চেম্বারলেনের পাল্লায় পড়িয়া মঃ দালাদিয়ে ফ্রান্সকে খুব শোচনীয় অবস্থায় টানিয়া আনিয়াছেন। বার্নার্ড শও থাকিতে পারেন নাই, "Without the Russian alliance and the British alliance France will find herself in Queer Street"। সত্যই পপুলার ফ্রন্ট ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পর ফ্রান্সের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার শক্তি অনেক হ্রাস পাইয়াছে এবং এই সুযোগ লইয়া হিটলারও ক্রমশঃই দৃঢ়ভাবে একটির পর একটি করিয়া জার্ম্মানীর দাবী উপস্থাপিত করিতেছেন।

সম্প্রতি পারিসে একটি সপ্তদশবর্ষীয় পোলিশ ইহুদির সন্ত্রাসবাদী কার্য্যের অজুহাত লইয়া জার্ম্মানী সভ্যতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছে। ইহুদিদলনের চরম অধ্যায় রচনা সুরু হইয়া গিয়াছে—যেহেতু দায়িত্বজ্ঞানহীন এক ইহুদি যুবক হের ফন রাটকে পারিসে হত্যা করিয়াছে। ২৫ সহস্র জার্ম্মান ইহুদি গ্রেপ্তার হইয়াছে। তাহাদের পরিণাম চিন্তা করাও ভয়াবহ ব্যাপার। ইহুদি রঙ্গালয়, সিনেমা, সংবাদপত্র, বিদ্যালয় প্রভৃতি সমস্ত প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা হইয়াছে। হের ফন রাটের মৃত্যুর ক্ষতিপূরণস্বরূপ জার্ম্মানীর ইহুদিদিগকে একশত কোটি মার্ক পাইকারী জরিমানা দিতে হইবে। ইহা ব্যতীত নিরপরাধ ও নিরস্ত্র ইহুদিগণের উপর সঙ্ঘবদ্ধ জার্ম্মানদের নৃশংস বর্ব্বরতা অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইহাই হিটলারী শাসনতন্ত্রের নমুনা। সভ্যজগতে ইহার প্রতিবাদ করিলেও জার্ম্মানীর নিকট দোষাবহ হইবে। যদি এই বর্ব্বরতার প্রতিবাদ বৃটিশ পার্লামেন্টে করা হয় তাহা হইলে জার্ম্মান আইন সভায় পালেষ্টাইনে বৃটিশ নীতি আলোচিত হইবে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ইহার প্রতিবাদ করিলেও যতদিন পর্য্যন্ত না যুক্তরাষ্ট্রের উদাসীন বৈদেশিক নীতির পরিবর্ত্তন হইবে ততদিন স্বৈরাচারের প্রতিরোধ অসম্ভব। এই সুযোগে ইহুদি-বিরোধী আন্দোলনের জনৈক পুরোহিত—Herr Julius Streicher—আবিষ্কার করিয়াছেন যে ইহুদিরা অর্থলোভে ও জার্ম্মান

জাতিকে পঙ্গু করার নিমিত্ত জার্ম্মানদের ধূমপান অভ্যাস করাইয়াছে। এই সমস্ত ঘটনা সত্ত্বেও চেম্বারলেনের মতে "Conditions in Europe were now settling down to very quiet times"। বৃটিশ জনমত প্রবল না হওয়ার ইহাই পরিণাম।

* * *

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে চীনের সংগ্রাম ইউরোপীয় শক্তিবর্গের নিকট সত্যই অসমসাহসিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। জাপানের অধিকৃত চীনের প্রদেশসমূহের উন্নতিসাধনকল্পে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হইয়াছে। ইতালীও আবিসীনিয়ার অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল। সদিচ্ছা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের ইহাও একটি কৌশল। ইতিমধ্যে তিব্বত ও বর্ম্মার সীমান্তে জাপানের অগ্রসর হইবার অভিপ্রায় ঘোষণা করার ফলে সর্ব্বত্রই একটু আন্দোলন সুরু হইয়াছে। বৃটেনে Sir Stafford Cripps এবিষয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে গভর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। বৃটিশ গভর্ণমেন্ট যথারীতি শান্তিকামী ও সকলে যদি ইচ্ছা করেন চেম্বারলেন চীন-জাপান সংগ্রামেও মধ্যস্থতা করিতে প্রস্তুত আছেন। স্পেনে চেম্বারলেনের মধ্যস্থতার ফলে ইঙ্গ-ইতালীয় চুক্তি হইয়াছিল ও সেই চুক্তি কার্য্যকরী হইতে স্পেন প্রায় ডিক্টেটারী কবলে প্রবেশ করিয়াছে। আবিসিনিয়াও বৃটেনের উপর অনেকটা নির্ভর করিয়াছিল। চীনের জনগণও বৃটেনের এই মধ্যস্থতায় ও ভরসায় না নির্ভর করিলেই যেন ভাল হয়। বৃটিশ রাজদূত ইতিমধ্যে জেনারেল চিয়াং কাইশেকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কি বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন তাহা জানা যায় নাই। প্রাচ্যে মিউনিক চুক্তির অনুরূপ কোন চুক্তি না হইলেই আশ্বস্ত হওয়া যায়। চেকোস্লোভাকিয়ার মত চীন-রক্ষার বাসনা ইউরোপীয় শক্তিবর্গের নিকট খুবই স্বাভাবিক। যে সামরিক সজ্জার অভাবের অজুহাতে বৃটেন জার্ম্মান-লালসা নিবৃত্ত করিতে পারিল না সেই অভাব লইয়াই মাসের পর মাস চীন জাপানকে বাধা দিতে প্রস্তুত ও ক্যান্টন অধিকারে অগ্রসর। সুতরাং কারণটা সামরিক দৌর্ব্বল্য নয়, রাজনীতিজ্ঞদের প্রতিজ্ঞার অভাব। নিজেদের এই দুর্ব্বলতা লইয়া সাম্রাজ্যবাদীর প্রতিনিধিরা পরের দুর্ব্বলতার অনুসন্ধান করে।

লিগুবার্গ রুশিয়ার বিমানপোত-বাহিনীর সক্ষমতা সম্পর্কে সন্দিহান, কিন্তু ইহাও সত্য যে, যে অবস্থায়ই হউক রুশিয়া চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা রক্ষায় Franco-Soviet Pact অনুযায়ী ফ্রান্সকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিল এবং অসুবিধা সত্ত্বেও যথাসাধ্য স্পেনীয় গণতন্ত্রকে ডিক্টেটারী কবল হইতে রক্ষা করিতে প্রস্তুত ছিল বা আছে।

* * *

এদিকে ভারতীয় রাজনীতিতে ইউরোপীয় পরিস্থিতির মূল্য নির্দ্ধারণ চলিতেছে; মহাত্মাজী পূর্ব্বেও স্মরণ করাইয়াছিলেন যে অহিংসাই চেকোশ্লোভাকিয়ার আত্মরক্ষার প্রশস্ত পথ, এবং এই অহিংসা ও সত্যধর্ম্মের অভাবই ইউরোপের এই গুরুতর পরিস্থিতির মূল কারণ। মহাত্মাজী এখন ভারতবর্ষকেই অহিংসা-অস্ত্র ব্যবহারের প্রশস্ত ক্ষেত্র বলিয়া মনে করেন। পণ্ডিত নেহেরু ইউরোপের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা লইয়া আসিয়া কংগ্রেস নীতির সাফল্য আনিতেও পারেন। তবে-কংগ্রেসের ন্যায় প্রতিষ্ঠানকে গণপ্রতিষ্ঠান করিতে হইলে যে কেবল আধ্যাত্মিক সংস্কার দ্বারাই সম্ভব তাহা পণ্ডিতজী নিশ্চয় সংশোধন করিয়া দিবেন। ভারতীয় সৈন্যসম্ভারে সাম্রাজ্যবাদী সমর পুষ্ট হইতে দেওয়া হইবে না—এবিষয়ে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ একমত হইলেও, যুদ্ধ এড়ান হইয়াছে ইহাতে তাঁহারাও সন্তুষ্ট, কারণ কার্য্যক্ষেত্রে ভারতীয় সাহায্য যুদ্ধে পাঠান হইলে তাঁহারা কি করিতেন সে সমস্যা হইতে রক্ষা পাইয়াছেন।

ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলিতে অশান্তি ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে, গণ আন্দোলন যে ক্রমশঃই প্রবল হইতেছে তাহাতেই রাজনীতিজ্ঞরা একটু বিচলিত, কারণ সর্দ্দার বল্লভভাই-এর ন্যায় "ধরি মাছ না ছুঁই পানি" করিয়া কতদিন দেশীয় রাজ্যের প্রজাগণকে স্তোক দেওয়া যায়। এদিকে দেশীয় রাজ্যের শাসকদিগকেও চটান যায় না, কি জানি যদি সত্যমূর্ত্তি প্রভৃতির দৌলতে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী দল যুক্তরাষ্ট্র সামান্য একটু রদবদল করিয়া চালু করিতেও পারে—তখন দেশীয় রাজন্যবর্গের সহায়তা প্রয়োজন। কিন্তু বিপদ সমূহ, উড়িষ্যার যে সমস্ত দেশীয় রাজ্যে অশান্তি, সেগুলি প্রায় ভারত গভর্ণমেণ্টের রাজনৈতিক বিভাগের আদেশ ও উপদেশ অনুযায়ী চালিত হয় বলিলেই চলে;

কারণ সেখানকার রাজন্যবর্গের রাজক্ষমতা নাই। সুতরাং যদি রাজ্যের প্রজাগণ বলে যে কংগ্রেস ভারত গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিয়া প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন চালাইতেছে, সেইজন্য ভারত গভর্ণমেণ্টকে চাপ দিয়া কংগ্রেস প্রজাদের সুবিধা আদায় করুক অথবা মন্ত্রিত্বে ইস্তাফা দিক তাহা হইলেই ত কংগ্রেসের বিপদ। দক্ষিণপন্থী দলের তখন উত্তর কি হইবে?

এদিকে আবার বোম্বাই-এ শ্রমিকদল হইতে কংগ্রেস মন্ত্রিত্বকে আত্মরক্ষার্থে গুলি চালাইতে হইয়াছে। অবশ্য শ্রমিকদল যে ন্যায্য করিয়াছে তাহা না হইতেও পারে। তবে কংগ্রেস মন্ত্রিরা শ্রমিকের প্রতিনিধিত্ব করিবার দাবী রাখে; সেইজন্যই এবিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। তবে শ্রমিকদের অন্যায় সর্দ্দার প্যাটেলের গাড়ী আক্রমণ করা, সন্দেহ নাই।

শ্রীনীরদকুমার ভট্টাচার্য্য

পুস্তক-পরিচয়

The Communist International—by F. Borkenau (Faber and Faber).

শ্রমিকজগতের তৃতীয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান অথবা কমিন্‌টার্নের কোন প্রামাণ্য ইতিহাস না থাকায় বর্কেনাউ প্রণীত এই বইখানিকে সাধারণ পাঠকেরা সেইভাবেই দেখতে চাইবেন। ভূমিকায় গ্রন্থকার স্বয়ং স্বীকার করেছেন যে অন্ততঃ সমসাময়িক ঘটনার আলোচনায় সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু লেখকের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী থাকলেই যে ঐতিহাসিক রচনা ব্যর্থ হয় না তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ প্রথম শ্রমিক ইন্‌টারন্যাশনালের ষ্টেক্‌লফ্ রচিত ইতিবৃত্ত। দুঃখের বিষয়, বর্কেনাউ-এর পুস্তকখানি সে আদর্শের কাছেও পৌঁছতে পারেনি; এই গ্রন্থ পাঠে অসাবধানী পাঠকের মনে নানাবিধ ভুল ধারণারই সৃষ্টি হবে। কমিন্‌টার্ন্ সম্বন্ধে ভিতর থেকে বহু খবর রাখা সত্ত্বেও, গ্রন্থকার তাঁর সমস্ত আলোচনা এমন বিকৃত ব্যাখ্যায় পূর্ণ করেছেন যে অভিজ্ঞ পাঠকমাত্রের মনে সন্দেহ ওঠা অনিবার্য্য যে এ-পুস্তক ইতিহাসের আবরণে সূক্ষ্ম প্রোপাগাণ্ডা মাত্র।

লেখকের সঙ্গে সকলেই এক মত হবেন যে ফ্যাক্ট্ ও ব্যাখ্যার মধ্যে সীমারেখা স্পষ্ট না হ'লেও তাদের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করা প্রয়োজন। কিন্তু তিনি যখন দাবী করেন যে তাঁর নির্ব্বাচিত ফ্যাক্ট্‌গুলিতে কোন অসম্পূর্ণতা বা একদেশদর্শিতার গলদ নেই, তখন মনোযোগী পাঠকের কাছে এ-উক্তি অসঙ্গতই মনে হবে। বর্কেনাউ বস্তুতঃ পদে পদে তাঁর নিজের মন্তব্য ও ব্যাখ্যাকে অবিসংবাদিত ফ্যাক্টের মর্য্যাদা দিতে চেয়েছেন। সাম্যবাদী সাহিত্য সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞান পাঠকজগতে এতই কম যে এই বিকৃতি অনেকেরই চোখে পড়বে না এবং তাঁরা অনেকেই গ্রন্থকারের মতামতকে সর্ব্বস্বীকৃত সত্য বলে বিশ্বাস করতে থাকবেন। সেই সম্ভাবনার জন্যই এক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন প্রোপাগাণ্ডার কথা ওঠে। প্রকাশ্য প্রচারকার্য্যে যে-স্পষ্টবাদিতা থাকে এখানে অবশ্য তার নিতান্ত অভাব কিন্তু

প্রকারান্তরে সাম্যবাদী মত ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে অপদস্থ করাই এ-গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

যে-সব অর্দ্ধসত্য বইখানির প্রতি পরিচ্ছেদে বিরাজ করছে তাদের প্রতিবাদ করতে হ'লে স্বতন্ত্র বই লিখতে হয়, সমালোচনার ক্ষুদ্র কলেবরে তাদের সম্পূর্ণ খণ্ডন অসম্ভব। তবুও উদাহরণ হিসাবে কতকগুলি কথার উল্লেখ করা উচিত, যে সম্বন্ধে লেখকের উক্তি অনভিজ্ঞ পাঠকে স্থিরসত্য বলে' হয়ত মেনে নেবেন অথচ যার বিষয়ে এ-দাবী একেবারেই সঙ্গত নয়। সাম্যবাদীদের ইউনাইটেড্ ফ্রণ্টের নীতিকে বর্কেনাউ অম্লান বদনে তাদের মতবাদের বিরোধী, মূলবিশ্বাসের পরিপন্থী, অভিনব কর্ম্মপদ্ধতি ইত্যাদি আখ্যায় ভূষিত করেছেন। কিন্তু স্বয়ং মার্ক্সের লেখা সাম্যবাদের ঘোষণাপত্রিকার শেষ অংশটুকু খুলে দেখলে তিনি দেখতেন যে সেখানেই স্থানবিশেষে ইউনাইটেড্ ফ্রন্ট্ অবলম্বনের উপদেশ রয়েছে। বর্কেনাউ ফ্যাক্ট্ হিসাবেই ইঙ্গিত করেছেন যে ১৯৩১এর আগে একই সঙ্গে চরম বাম ও দক্ষিণ পন্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম সাম্যবাদী মহলে প্রচলিত হয় নি। মার্ক্স্, এঙ্গেল্‌স্ ও লেনিনের কর্ম্ম ও চিন্তা সম্বন্ধে যাঁর বিন্দুমাত্র জ্ঞান আছে, তিনি এমন কথা কখনও বলতে পারেন না, তাঁর পক্ষে বোঝা সহজ যে বরাবরই সাম্যবাদীদের উভয় শত্রুর সঙ্গে লড়তে হয়েছে। ষ্টালিনের কার্য্যাবলী পরস্পরবিরোধী, তাঁর মতের স্থিরতা নেই, তাঁর নীতি দুইমুখো ইত্যাদি নানা মন্তব্যকে গ্রন্থকার ফ্যাক্ট্ হিসাবে চালাতে চেষ্টা করেছেন, যেন এসম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ওঠে না। অথচ এ-সকল তথাকথিত পরিবর্ত্তনের পিছনে যে-থিওরি কার্য্যকরী রয়েছে, যা' ষ্টালিন্ নিজে এবং অন্য অনেকে বারবার বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, তার কোন আলোচনা আমাদের এই নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক প্রয়োজন মনে করেন নি কেননা সে-ক্ষেত্রে তাঁর ফ্যাক্ট্ সম্বন্ধে লোকের মনে সন্দেহ জাগতে পারে। দায়িত্বজ্ঞানের এই চমৎকার নিদর্শনের পর আমরা লেখকের আরও অজস্র অসংকোচ উক্তিতে আর আশ্চর্য্য বোধ করি না। বল্‌শেভিক্ রাশিয়া ও কামালের তুরস্কে নাকি প্রকৃতিগত প্রভেদ নগণ্য, লেনিনের দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে নাকি সামান্য জ্ঞানও ছিল না, মার্ক্স্ কিম্বা লেনিনের চাইতে বাকুনিন্ বা ট্রট্‌স্কির আদর্শই নাকি কমিন্‌টার্নের মধ্যে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিল—একটির পর একটি এইরূপ 'ফ্যাক্টের' প্রবাহ বইখানির কলেবর বৃদ্ধি করেছে। মনে হয় যেন লেখকের আন্তরিক বিশ্বাস এই যে জোর

গলায় বারবার কোন কথা বলে' গেলেই তা' ইতিহাসের পর্য্যায়ে উঠে যায়। বর্কেনাউ নির্ব্বিকার চিত্তে লিখে গেছেন যে সাম্যবাদ অনুসারে সকল বিজ্ঞানই কেবলমাত্র শ্রেণীস্বার্থের প্রকাশ, সাম্যবাদীরা কখনও তাদের পূর্ব্বতন নীতি আলোচনা করতে চায় না, চার্টিষ্ট আন্দোলন নাকি মুখ্যতঃ পার্লামেণ্ট সংস্কার নিয়ে আস্ফালন মাত্র। পাতার পর পাতায় এ-সব কথা পড়তে পড়তে মনে হয় যে বর্কেনাউ-এর ইতিহাসচর্চ্চা নিতান্তই সংকীর্ণ কিম্বা তিনি অন্যদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানকে সংশোধন করার বদলে তাকে ভুলিয়ে নিজের দলের কাজে লাগাতে চেয়েছেন। দুঃখের কথা এই যে অনেক বুদ্ধিবাদীই বোধ হয় মার্ক্স্‌বাদের সাহিত্য আলোচনা না করে' বর্কেনাউ-এর মন্তব্যকে ফ্যাক্ট্ হিসাবে গ্রহণ করবেন। তাই তাঁর বইএর প্রকৃত স্বরূপ দৃঢ় ভাবে উদ্ঘাটিত করা নিতান্তই উচিত।

নানা কথার আড়ালে অসাবধানী পাঠকের মনে হঠাৎ লেখকের মতামত-গুলিকে বিনা প্রমাণে অবিসম্বাদিত সত্য হিসাবে চালিয়ে দেবার রীতি আলোচ্য গ্রন্থখানির ঐতিহাসিক মূল্য খর্ব্ব করে ফেলেছে। কিন্তু গ্রন্থকারের অবশ্য একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী থাকা অন্যায় না, যদি তিনি তাকে শুধু ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা হিসাবেই উপস্থিত করেন। তবে যেহেতু সকল দৃষ্টিভঙ্গীই সমান সার্থক অথবা বাস্তব হতে পারে না তাই তা নিয়েও সমালোচনা চল্‌তে বাধা নেই। ব্যাখ্যা হিসাবে দেখতে গেলে বর্কেনাউ-এর বইখানি তিনটি মূল বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। কারো কারো কাছে এগুলি স্বয়ংসিদ্ধ মনে হতে পারে, কিন্তু পক্ষান্তরে অনেকেই এর কোনোটিকেই নির্ভুল বলে' গ্রহণ করতে পারবেন না।

বর্কেনাউ-এর প্রথম বিশ্বাস যে মার্ক্সের মতবাদে গোড়াতেই এক প্রচণ্ড গলদ রয়েছে—যন্ত্রপ্রধান দেশে শ্রমিকশ্রেণী নাকি প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবী হ'তেই পারে না। সুতরাং পশ্চিম ইয়োরোপ বা আমেরিকায় শ্রমিক-বিপ্লব অলীক কল্পনা মাত্র, তাই প্রচলিত সাম্যবাদ আকাশকুসুমের সন্ধান ভিন্ন কিছু নয়। কমিন্‌টার্ণ এই সত্যটুকু ধরতে পারেনি বলেই তাকে বারবার নীতি পরিবর্ত্তন করতে হয়েছে অথচ তার অভিযানে সাফল্যের দেখা নেই। গ্রন্থকারের এ বিশ্বাস যথার্থ হ'লে ধনিকদের ত' ভয়ের কোন কারণই নেই—তাহলে সাম্যবাদ প্রচারে এত আতঙ্ক, কমিউনিষ্ট্-দমনের এত চেষ্টা, ফাশিষ্ট্ প্রচারকার্য্য ও কর্ম্মপ্রণালী সবই

নিরর্থক বলতে হবে। কিন্তু কোন শ্রেণী বা দলের প্রকৃত বিশ্বাস প্রকাশ পায় তার কথায় নয়, কাজে। সুতরাং বর্কেনাউ-এর কথার চাইতে ধনিকদের আচরণই এক্ষেত্রে বেশী প্রামাণ্য। গত একশ' বছরের ইতিহাস পড়লে বিশ্বাস করা শক্ত হয় যে শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লবের দিকে ঝুঁকতে পারে না, আসলে লেখক তা' না দেখে তাঁর দৃষ্টি আবদ্ধ রেখেছেন মাত্র গত কয়েক বছরের ঘটনার উপর। ভবিষ্যতে কি হবে সে সম্বন্ধে অবশ্য কেউই সম্পূর্ণ নিশ্চিত হ'তে পারে না। বর্কেনাউ নিজে শ্রমিকবিপ্লব অসম্ভব মনে করেন, কিন্তু তাঁর মতন লোকেরাই আবার উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে কমিউনিষ্ট্‌দের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশ্বাস দৈবের উপর অন্ধ নির্ভর মাত্র। এ ছাড়া বইখানির মধ্যেও একটা বিশ্বাসের বিরোধ উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থকার সবিস্তারে দেখিয়েছেন যে ইটালি, জার্মানি, হাঙ্গারি, বুল্‌গেরিয়া, চীন প্রভৃতি দেশে কমিন্‌টার্ণের পরাজয় ঘটেছে নানা ভুলের জন্য। কিন্তু শ্রমিকবিপ্লব মূলেই অসম্ভব হ'লে কর্ম্মপদ্ধতির আংশিক গলদ বা ভুলের কথা ওঠে কি করে'? ভূমিকাতেও লেখক এক জায়গায় বল্‌ছেন যে কমিন্‌টার্ণ্ ব্যর্থ হয়েছে, অন্যত্র তাঁর মত ১৯৩৪এর পর এ-প্রতিষ্ঠানের বিপুল শক্তিবৃদ্ধি ঘটেছে।

কিন্তু মার্ক্সের গোড়ায় গলদ থাকলেও রাশিয়ায় বল্‌শেভিক্ বিপ্লব হয়েছিল এবং চীনেও এক সময় বিপ্লব আসন্নপ্রায় হয়। তাই বর্কেনাউ এক দ্বিতীয় মতের অবতারণা করেছেন যে যন্ত্রশিল্পে অনুন্নত বলে'ই এদিকে বিপ্লব জয়যুক্ত হতে পেরেছিল। তাঁর বিশ্বাস এই যে রাশিয়া পশ্চিম ইয়োরোপ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, সেখানে পশ্চিমের প্রচলিত শ্রেণীবিভাগের ছায়ামাত্র দেখা যায়—অর্থাৎ রুষবিপ্লবের সঙ্গে সাম্যবাদের প্রকৃতপক্ষে কোন সম্পর্ক নেই, সাম্যবাদীরা রাশিয়ার অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে আকস্মিকভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছে মাত্র। বর্কেনাউ-এর এই মত অনেকেই পোষণ করেন, তাঁরা ভাবেন পৃথিবীর নানা অঞ্চল সম্পূর্ণ বিভিন্ন পথের পথিক। এই একই মতের প্রকারভেদ হিসাবে মাঝে মাঝে বলা হয় যে সাম্যবাদ পশ্চিমের উপযোগী এবং পূর্ব্বে অচল। কিন্তু বর্কেনাউ-এর দ্বিতীয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে রয়েছে আধুনিক ইতিহাসের গতি। ধনতন্ত্রের বিশিষ্ট প্রকৃতিই এই যে তা' সর্ব্বদা ছড়িয়ে পড়তে উদ্যত, পুরাকালের

নানা গণ্ডি তার সামনে ক্রমশঃই লোপ পেয়েছে। সোভিয়েট্ বিপ্লবের পূর্ব্বে রাশিয়াতে ধনতন্ত্র সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তিলাভ না করে' থাকতে পারে কিন্তু তাই ব'লে জারদের রাশিয়া ধনতন্ত্রের আওতার বাইরে ছিল, একথার কোন সার্থকতা নেই। যন্ত্রশিল্পের পরিমাণ সবদেশে সমান হবে, এ-প্রত্যাশা অসার—কিন্তু তার থেকে এ-সিদ্ধান্ত আসে না যে অনুন্নত দেশগুলিতে ধনতন্ত্র বিদ্যমান নেই। ধনতন্ত্র ত' একটা ঝোঁক, গতি ও কাঠামোর কথা, তার মধ্যে ফিউডাল্ বিধি ব্যবস্থা সব লুপ্ত না হ'লেই তার অস্তিত্ব অপ্রমাণিত হয় না। মার্ক্স্ কোথাও বলেন নি যে যন্ত্রশিল্পে সব চেয়ে অগ্রসর দেশেই প্রথম শ্রমিক-বিপ্লব হবে, সে-ভবিষ্যদ্বাণী অমার্ক্সীয় হাইণ্ড্ম্যানের। মার্ক্স্ সেকথা বিশ্বাস করে' থাকলে আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের সৃষ্টি করতেন না। তাঁর জীবদ্দশাতেই কি তিনি ইংল্যাণ্ড্ থেকে অনুন্নত ফ্রান্সে বিপ্লবচেষ্টার অধিকতর প্রসার দেখেন নি? লেনিনের মত ছিল যে ধনতন্ত্রের সাম্রাজ্যবাদী রূপ জগদ্ব্যাপী হয়ে পড়েছে এবং সে-শৃঙ্খলের দুর্ব্বলতম স্থানটিই প্রথমে ছিন্ন হবে। এর সঙ্গে মার্ক্সের মতের কোন প্রকৃত অমিল নেই। বর্কেনাউ এসব যুক্তির উল্লেখমাত্র না করে' লিখেছেন যে শেষ পর্য্যন্ত রুষবিপ্লব মার্ক্স্‌বাদের চাইতে নারোদ্‌নিক্ মতের যাথার্থ্যই প্রতিপন্ন করে। নারোদ্‌নিক্‌দের বিশ্বাস ছিল যে রাশিয়ায় ধনিকতন্ত্র আসবার আগেই তাকে টপ্‌কে বিপ্লব নূতন সমাজ গঠন করবে, সে বিপ্লব প্রকৃতপক্ষে হবে কৃষকদেরই ব্যাপার এবং ভবিষ্যৎ রুষসমাজ গড়ে উঠবে মির্ নামে পরিচিত সেদেশীয় সনাতনী গ্রাম্যব্যবস্থার উপর। বর্কেনাউ তাঁর নিজের যা' ইচ্ছা ভাবতে পারেন কিন্তু অনুসন্ধিৎসু পাঠকের পক্ষে মেনে নেওয়া শক্ত হবে যে গত শতকের শেষের দিকে রাশিয়া ধনতান্ত্রিক ছিল না, বল্‌শেভিক্ বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণী অবান্তর অথবা সোভিয়েট্ আমলের একত্রিক চাষ আর পুরাতন মির্ একই পদার্থ। এই গ্রন্থের যুক্তির ধারাই হ'ল এই যে বিভিন্ন ব্যাপারের দুস্তর পার্থক্যকে অবজ্ঞা করে' সামান্য সাদৃশ্যকে বড় করে' তুলে কূট ব্যাখ্যার জাল বোনা। গ্রন্থকার এক জায়গায় বলেছেন যে তাঁকেও ডায়ালেক্‌টিক্ শিখতে হয়েছিল কিন্তু তাঁর লেখা পড়ে মনে হয় যে তাঁর মতন শিষ্যদের সমাবেশ হওয়াতেই জার্মান্ সাম্যবাদীদলের এ-দুরবস্থা।

বর্কেনাউ-এর তৃতীয় মূল বিশ্বাস এই যে লেনিন্ মার্ক্স্‌কে অনুসরণ করেন

নি, উভয়ের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান তিনি লক্ষ্য করেছেন। সাম্যবাদের পরিণতির ধারা মার্ক্স্, এঙ্গেল্‌স্, লেনিন্ ও ষ্টালিনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, একথা আজ বহুস্বীকৃত। ট্রট্‌স্কিপন্থীরা সম্প্রতি প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন যে ষ্টালিন্ মূল মতবাদ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন কিন্তু তুমুল তর্কের পর এতদিনে তাঁরা অনেকখানি পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছেন। বর্কেনাউ তাই মেনে নিয়েছেন যে ষ্টালিন্ লেনিনের মত অনুসরণ করছেন না, ট্রট্‌স্কির এই অভিযোগ অমূলক। কিন্তু সাম্যবাদকে আক্রমণ করবার এখন নূতন প্রণালী আবশ্যক এই ভেবেই বোধ হয় তিনি লেনিন্‌কে মার্ক্স্-নির্দ্দিষ্ট পন্থা থেকে ভ্রষ্ট রূপে বর্ণনা করেছেন। এ-মন্তব্য অবশ্য কাউট্‌স্কির মতের পুনরাবৃত্তি মাত্র কিন্তু সাধারণ পাঠকে সম্ভবতঃ এতদিনে লেনিন্ কর্ত্তৃক কাউট্‌স্কির অভিযোগ খণ্ডন ভুলে গিয়ে থাকবেন এ বিশ্বাস হয়ত গ্রন্থকারের মনের কোণে আছে। বর্কেনাউ মার্ক্স্ ও লেনিনের প্রভেদ সম্বন্ধে যত মন্তব্য করেছেন তার প্রত্যেকটি অসম্পূর্ণ ও বিকৃত। তাঁর মতে মার্ক্স্ ভাবতেন সমাজে পরিবর্ত্তন আপনা থেকেই সিদ্ধ হয়, বিপ্লব প্রচেষ্টার অপেক্ষা রাখে না; কিন্তু এ উক্তি সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ও দার্শনিক বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিরোধী। যন্ত্রশিল্পে সবচেয়ে উন্নত দেশে বিপ্লব প্রথমে আসবে, মার্ক্সের উপর এ ভবিষ্যদ্বাণী চাপানো অন্যায়। লেনিন্ কর্ত্তৃক বিপ্লবব্রতী ক্ষুদ্র দল গঠন মার্ক্সতত্ত্বের বিরোধী এই অদ্ভুত বক্তব্যের বেলায় বর্কেনাউ স্বয়ং মার্ক্সের যৌবনের নানা উদ্যমের কথা মনে রাখেন নি। দলের মধ্যে সুবিধাবাদের বিপক্ষে লেনিনের নানা সংগ্রামকে অমার্ক্সীয় ও অভিনব আখ্যা দিয়ে গ্রন্থকার মার্ক্সের চিন্তাধারা সম্বন্ধে নিজের পরিপূর্ণ অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন মাত্র। বিপ্লবের উপায় হিসাবে কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টনে মার্ক্সের নিষেধ আছে এ তথ্য বর্কেনাউ কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন? প্যারিস্ কমিউন্ সম্বন্ধে মার্ক্সের মতামতকে এ-গ্রন্থে বিকৃত করা কি ইচ্ছাকৃত না অজ্ঞানপ্রসূত? বিপ্লবের পর শ্রমিকশ্রেণীর অধিনায়কত্ব মার্ক্স্‌বাদের বিরোধী এই যুক্তি শুধু প্রমাণ করে যে বর্কেনাউ কমিউনিষ্ট্ ম্যানিফেষ্টো থেকে গোথা প্রোগ্রাম পর্য্যন্ত মার্ক্সের কোন লেখাই তলিয়ে পড়েন নি।

মার্ক্সের মতবাদ অমঙ্গলের আকর, তার ফলে মানুষের লাভের চেয়ে ক্ষতির আশঙ্কাই বেশী, ইত্যাদি মন্তব্য বর্কেনাউ স্বচ্ছন্দে করতে পারতেন কারণ এসব

হ'ল মূল্যবিচারের কথা। কিন্তু তিনি ঐতিহাসিক হিসাবে যে কাজে হাত দিয়েছেন সে বিষয়ে যোগ্যতার অভাব সুস্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে, একথা বলা অন্যায় না।

শ্রীসুশোভন সরকার

Kilvart's Diary—(Jonathan Cape)

একখানি ডায়েরী। কিল্‌ভার্ট ছিলেন একজন খৃষ্টান ধর্ম্মযাজক। ১৮৪০ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। জীবিতকালে সাহিত্যিক বলে বা অন্য কোন হিসাবে তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন নি। ১৮৭০ সাল থেকে তিনি তাঁর দৈনন্দিন জীবনের একটি ডায়েরী রাখতে আরম্ভ করেন। এই ডায়েরীখানি ১৯৩৭ সালে উইলিয়াম প্লোমারের হস্তগত হয়। উইলিয়াম প্লোমার তারই কতক অংশ নির্ব্বাচন ক'রে আলোচ্য গ্রন্থখানিতে প্রকাশ ক'রেছেন।

কিল্‌ভার্ট কেন যে নিজের ডায়েরী রেখেছিলেন তা আমরা বুঝতে পারি না। ইংরাজী সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডায়েরী বোধ হয় পেপ্‌সের (Pepys) ডায়েরী। পেপ্‌স জীবিতকালে একজন পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি যে ডায়েরী রেখে গেছেন তার কারণ তিনি নিজে খোলাখুলিভাবে না প্রকাশ ক'রে থাকলেও আমরা অনেকটা অনুমান ক'রে নিতে পারি। তাঁর মধ্যে অহমিকার অভাব ছিল না। মনের গোপন কোণে হয়ত তাঁর এই আকাঙ্ক্ষা ছিল যে তাঁর নাম পৃথিবীতে অমর হ'য়ে থাক। নতুবা বিপদের সম্ভাবনা সত্ত্বেও তিনি তাঁর ডায়েরীখানি অতিশয় যত্ন ক'রে রাখলেন কেন? শুধু তাই নয়। অন্য কেউ সহজে বুঝতে না পারে এইজন্য যদিও তিনি ডায়েরীতে সাঙ্কেতিক ভাষা ব্যবহার করেছিলেন, তাহলেও তিনি এই ডায়েরীখানি উইল করে কেম্ব্রিজের মড্‌লিন কলেজকে দিয়ে যান। কিল্‌ভার্ট কিন্তু একজন সাধারণ ধর্ম্মযাজক ছিলেন। তাঁর জীবনে যে কোন অসাধারণ ঘটনা ঘটেছিল তার কোন পরিচয় আমরা পাই না। ডায়েরীর মারফতে অমর হয়ে থাকবার তাঁর বিশেষ কোন আকাঙ্ক্ষা ছিল ব'লে মনে হয় না। আত্ম-জীবনীর মালমশলা ডায়েরী থেকে সংগ্রহ করবেন এবং

তিনি সেইজন্যই ডায়েরী রাখেন, একথাও আমরা বলতে পারি না, কেন না তিনি জীবনে এমন প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারেন নি যাতে কোন কালে আত্ম-জীবনী লেখবার বাসনা তাঁর মনে উদয় হতে পারত। বোধ হয় খেয়ালের বশেই তিনি এই ডায়েরী রাখতে আরম্ভ করেন।

যে উদ্দেশ্যেই তিনি ডায়েরী রেখে থাকুন না কেন, বইখানি যে মূল্যবান সে বিষয়ে সন্দেহের খুব কম অবকাশ আছে ব'লেই মনে হয়। ইংলণ্ডের সমাজের বিশেষতঃ পল্লীসমাজের ইতিহাস যাঁরা রচনা করতে চান, তাঁরা এই ডায়েরী থেকে অনেক সাহায্য পাবেন। ১৮৭০ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ১৮৭১ সালের অগাষ্ট মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত, কিল্‌ভার্টের জীবনের কয়েকটি ঘটনার বিবরণ বইখানিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তখনকার ইংলণ্ড ও এখনকার ইংলণ্ডে অনেক তফাৎ। কিল্‌ভার্টের ডায়েরী থেকে এই ১৮৭০-৭১ সালের ইংলণ্ডের একটি চিত্র গড়ে নেওয়া মোটেই কঠিন নয়। কিল্‌ভার্ট স্বভাবতই মিশুক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তা ছাড়া ধর্ম্মযাজক হিসাবেও, কর্ত্তব্যের খাতিরে, তাঁকে নানাশ্রেণীর লোকের সংস্পর্শে আসতে হত। কাজেই তাঁর ডায়েরী থেকে তখনকার ইংলণ্ডের পল্লীসমাজের বিষয় অনেক তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে।

শুধু সামাজিক চিত্র হিসাবেই বইখানি মূল্যবান মনে করলে অন্যায় হবে। যে সব গুণে পেপ্‌সের ডায়েরী এত প্রসিদ্ধিলাভ করেছে তার কয়েকটি কিল্‌ভার্টের ডায়েরীতেও আমরা দেখতে পাই। প্রথমেই ধরুন naiveté বা অকপটতার কথা। এই অকপটতার নিদর্শন আমরা কিল্‌ভার্টের ডায়েরীতেও পাই। কিল্‌ভার্ট একদিন একজন রুগ্না বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে দেখতে যান। এই বৃদ্ধার বাড়ীতে তিনি যে দৃশ্য দেখেন তার বিবরণ তাঁর ভাষাতেই দিচ্ছি—

"Hannah Jones smoking a short black pipe by her fire, and her daughter, a young mother with dark eyes and her hair hanging loose, nursing her baby and displaying her charms liberally."

আর একদিন একজন মদ্যপায়ীকে উপদেশ দান করতে গিয়ে তাঁর যে অবস্থা হয়েছিল তা পড়ে হাস্য সংবরণ করা কঠিন। তিনি লিখেছেন—

"He became savage at once, cursed and swore and threatened violence. Then he began to roar after me but he could only stagger slowly, so I left him behind reeling and roaring, cursing persons and shouting what he would do if he were younger, and that if a man did not get drunk he wasn't a man and of no good to himself or the public houses, an argument so exquisite that I left it to answer itself."

এই সব পড়তে পড়তে পেপ্‌সের ডায়েরীর দুই একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে—কেমন পেপ্‌স একদিন একটি অজ্ঞাতকুলশীলা সুন্দরী যুবতীর হাত হাতে নিতে গিয়ে তাকে তার পকেট থেকে একটি কাঁটা বার করতে দেখে বিরত হন, কেমন একটি স্ত্রীলোক তাঁর জামায় হঠাৎ নিষ্ঠীবন ত্যাগ করলে তিনি এই বলে সান্ত্বনা লাভ করেন যে যিনি এই কাজ করেছেন, তিনি রূপবতী, কুরূপা নন। তবে পেপ্‌সের সারল্য ও কিল্‌ভার্টের সারল্যে একটু তফাৎ আছে—সে তফাৎ বোধহয় চরিত্রগত। চরিত্রের দিক থেকে পেপ্‌সের প্রশংসাযোগ্য কিছু ছিল না। কাজেই রুচিবাগীশদের কাছে পেপ্‌সের এই অকপটতা অনেকস্থলেই রুচি-বিরুদ্ধ মনে হতে পারে। কিল্‌ভার্টের ডায়েরীতে কিন্তু রুচিবিরুদ্ধ কিছুই নাই।

এই অকপটতা ছাড়াও অন্যান্য অনেক কারণেই ডায়েরীখানি বেশ উপভোগ্য। লেখবার ভঙ্গী বেশ সুন্দর। প্রাকৃতিক দৃশ্যের অনেক সুন্দর সুন্দর বর্ণনা আছে। সম্পাদক মহাশয় ভূমিকায় বলেছেন—এবং আমরাও দেখতে পাই—যে এইসব বর্ণনার মধ্যে সময়ে সময়ে বিশেষণের একটু আধিক্য দেখা যায়। কিন্তু তা হ'লেও এইসব বর্ণনা দেখে মনে হয় গদ্য-লেখক হিসাবেও বোধ হয় কিল্‌ভার্ট উচ্চ আসন দাবী করতে পারেন। তবে ডায়েরীর মধ্যে এই বর্ণনা-ভাগ এত বেশী যে শেষের দিকে বইখানি একটু একঘেয়ে বলে মনে হয়। সম্পাদক মহাশয় যদি এই বর্ণনাগুলি একটু কমিয়ে দিতেন তা হ'লে বোধ হয় ভাল হত।

শ্রীদর্শন শর্ম্মা

Art and Archaeology Abroad—A report intended primarily for Indian Students desiring to specialize in those subjects in the Research centres of Europe and America, submitted by Kalidas Nag, M. A. (Cal.), D. Litt. (Paris). Published by the University of Calcutta.

আর্ট ও আর্কিয়লজির মধ্যে যে মাত্র আকারগত সাম্য আছে তা নয়; ও-দুই বস্তুর মধ্যে বাস্তব-সম্বন্ধও অনেক। অতীতের ঐশ্বর্য্য পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা এ-যুগে সম্ভবপর না হলেও, তার আংশিক অবতারণা করা যায়। পরশু-হস্তে বিরাম-বিহীন ভূখনন কার্য্যে যাঁরা মনোনিবেশ করেছেন তাঁরা এই অংশাবতার-সৃষ্টির সহায়ক। তাঁদের লক্ষ্য ত্রিকালের যোগ-সাধন; ভূতপূর্ব্ব শিল্পকে বর্ত্তমানের আলোয় এনে তাঁরা ভবিষ্যতের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী। কালিদাস নাগ মহাশয় এ-জাতীয় যোগের অন্যতম উপাসক। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকম্পায় আট বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপ ও আমেরিকা পর্য্যটন করে বিভিন্ন দেশে প্রাচীন শিল্প ও পুরাতত্ত্ব অনুশীলনের ব্যবস্থা পরিদর্শনের সুযোগ পেয়েছিলেন। আলোচ্য পুস্তকখানি সেই পরিদর্শনের ফল। ভারতীয় ছাত্রদের পক্ষে বিদেশে কোথায় কী ভাবে এই অনুশীলন করা যেতে পারে, লেখক প্রধানতঃ সেইদিকে দৃষ্টি রেখে তাঁর রিপোর্ট বা প্রতিবেদনটি রচনা করেছেন। নানা দেশ ভ্রমণের ফলে তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এনেছেন তার কিঞ্চিৎ পরিচয় আমরা পাই, এবং সেজন্যে তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। বর্ণনা-প্রধান রচনায় সাহিত্যের রস বহুল পরিমাণে আশা করা অনুচিত। এইটাই যথেষ্ট যে বইটি পুরোপুরি ক্যাটালগ-জাতীয় নয়; মাঝে মাঝে ঐতিহাসিক তথ্যেরও সন্ধান মেলে; কখনো কখনো লেখকের স্বকীয় মনোভাবেরও বিজ্ঞপ্তি আছে।

আমাদের দেশের সুধীবৃন্দ কোন্ কোন্ দিকে গবেষণা করলে দেশীয় পুরা-তত্ত্বের সঙ্গে বিদেশীয় পুরাতত্ত্বের সম্পর্ক আবিষ্কার করতে পারবেন, সে-বিষয়ে নাগ মহাশয় কিছু কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। অবশ্য এ-কথা স্বীকার্য্য যে পুরা-তত্ত্বের পুরা তত্ত্ব আমরা কখনই উদ্‌ঘাটন করতে পারব না, এবং খণ্ড সত্যের পিণ্ডকেই ইতিহাস নাম দিয়ে পরিবেশন করলে পিতৃগণের পূর্ণ পরিতৃপ্তি হবে

না। তবু, মানুষের মন এমনই যে এই খণ্ড সত্যগুলোকে কল্পনার সূত্রে গ্রথিত করে তৃপ্তি অনুভব করে। ভারতের ইতিহাসে এখনো সত্যের ভাগ কম, কল্পনার ভাগ বেশী ; পৃথিবীর ইতিহাসে ভারতের যোগ্য স্থান নির্দ্দেশ করতে হলে আরো অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে, এবং সন্ধান পেতে গেলে ঘরের বাইরে যেতে হবে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আদান ও প্রদান বহু শতাব্দী ধরেই চলেছিল। আমরা কী পেয়েছি, আর কী দিয়েছি, তার হিসেব-নিকেসের চেষ্টা কেবল বিদেশী বিদ্বানরাই করবেন, এটা যুক্তিযুক্ত নয়। আমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত যে ভারতের ইতিহাসের পুনরুদ্ধারে যাঁরা ব্রতী তাঁরা অধিকাংশই 'নাই ভারতে'।

ঐতিহাসিক উপাদানও বিস্তর বিদেশে স্থানান্তরিত হওয়ায় এ দেশের ইতিহাস-রচনা করা কঠিন হয়েছে। যাতে দেশের জিনিষ দেশেই থাকে, সেদিকে আমাদের শাসনকর্ত্তারা দৃষ্টি রাখুন, এই মর্ম্মে জনসাধারণের মধ্যে মতবাদ প্রচার করার পক্ষে যুক্তি আছে। এ বিষয়ে ডাক্তার নাগের উক্তি উদ্ধৃত করে সমালোচনা শেষ করি :—

"Such invaluable National Treasures, once removed by outsiders, are rarely replaced, and we have noticed lately how the awakening nationhood of the Near East and Extreme Orient are showing a laudable spirit of "Jealous guardians" of these priceless monuments. Iran, Iraq & Turkey have by adequate legislations secured their treasures, but alas, India is still helpless and is exposed to foreign exploitation as attested by so many unique specimens of Indian art and antiquities permanently lost to India to enrich the museums of London and Paris, Boston and New York. Here India should follow the examples set by young Egypt and Japan where the strict "Laws of national treasures" enforce the safe custody of such relics in the national sites and museums."

শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব

হেগেল ও মার্কস—রেবতীমোহন বর্ম্মণ। (আর্য্য পাবলিশিং কোং)

সাম্রাজ্যবাদের সঙ্কট—রেবতীমোহন বর্ম্মণ। (আর্য্য পাবলিশিং কোং)

মার্ক্সের অর্থনীতি—পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী। (অগ্রণী)

রাশিয়ার রূপান্তর—সুকুমার মিত্র। (প্রগতি পাবলিশিং হাউস)

জাগৃহি—রেজাউল করীম। (আর্য্য পাবলিশিং কোং)

উনবিংশ শতকে যে কয়জন রাষ্ট্রনীতিবিদ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একমাত্র মার্ক্স-এর ভাবধারার প্রভাবই আজ সমগ্র বিশ্বে বিস্তার লাভ করেছে। তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়, 'he found socialism a conspiracy and left it a movement', তিনিই প্রথম বুঝেছিলেন যে, বিপ্লব-সংগঠন ইতিহাসের কোন আকস্মিক ব্যাপার নয়। শাসকসম্প্রদায় অত্যাচারী হ'লেই তার অনিবার্য্য ফলস্বরূপ জনসাধারণ মাথা তুলে দাঁড়ায়। তাঁর উদ্ভাবিত কর্ম্মপন্থার মধ্যে শ্রমিকশ্রেণী মুক্তির সঙ্কেত লাভ করেছে। সামাজিক আবর্ত্তনের দর্শনে তাঁর দান প্রথম শ্রেণীর প্রতিভার পরিচায়ক। তাঁর 'labour theory of value' হয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী ইংরেজ ধনবিজ্ঞানীদের কাছ থেকেই নেওয়া ; Communist Manifesto-তেও Considérant-এর প্রভাব থাকতে পারে। শ্রেণী-বিরোধের কথাও Saint-Simon আগে ব'লে যেতে পারেন ; দর্শনে হেগেল, হলবাখ ও ডিডেরো এবং অর্থনীতিতে রিকার্ডোর কাছেও মার্কস-এর প্রভূত ঋণ থাকতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত বিষয়ের বিস্ময়কর সমন্বয়ের মধ্যেই তাঁর কৃতিত্ব। সামাজিক ব্যাপারের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বুঝতে হ'লে মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্য নেওয়া ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। সাম্যবাদী সমাজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মার্ক্স তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু আলোচনা করেন নি ; ধনতন্ত্রের ধ্বংস ও তার পরবর্ত্তী অবস্থা নিয়েই তাঁর মূল গ্রন্থগুলি রচিত। ধনতান্ত্রিক সমাজের মধ্যেই ধনিকদের সঙ্গে শ্রমিকদের বিরোধের বীজ নিহিত আছে। ইতিহাসের দর্শন থেকে তাঁর এই মত উদ্ভূত। মার্ক্স বলেছেন, Capitalism produces its own grave-digger। সেইজন্য তাঁর মতানুসারে বিপ্লব ধনতন্ত্রবাদেরই অনিবার্য্য ফল। রাষ্ট্র ধনিক সম্প্রদায়ের দ্বারা তাদের স্বার্থের অনুকূলে পরিচালিত হওয়ার জন্য শ্রমিক সম্প্রদায় একদিন এই রাষ্ট্রের উচ্ছেদ-

সাধন করবেই। উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের উপরেই সমাজের সকল দিক নির্ভর করছে। নিয়মকানুন, ধর্ম্ম, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান,—সবই তৎকালীন সমাজের অর্থনীতিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। মার্ক্‌স এ কথা প্রথম প্রচার না করলেও সমাজ-বিচারের ভিত্তিকে তিনি এই মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন।

বর্ত্তমান যুগে ধনতান্ত্রিক সমাজের মধ্যেই পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশ সোভিয়েট রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সেইজন্য মার্ক্সীয় চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য আজকাল অনেকেই ব্যস্ত। 'হেগেল ও মার্ক্‌স' নামক গ্রন্থে রেবতীমোহন বর্ম্মণ হেগেলের দার্শনিক তত্ত্ব ও মার্ক্স্‌বাদ সহজ ক'রে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। এইজন্য তিনি মার্ক্‌স-এর Capital, হেগেলের Philosophy of History ও প্লেখানভের Essays on the History of Materialism থেকে সাহায্য নিয়েছেন। দ্বিতীয় গ্রন্থ 'সাম্রাজ্যবাদের সঙ্কটে' তিনি 'পুঁজির প্রতিযোগিতা', 'ডলার-সাম্রাজ্যবাদ', 'ফ্যাশিজমের ফ্যাঁসাদ', 'হিটলার-এক-নায়কত্বের উদ্ভব', 'পূর্ব্ব ও মধ্য ইউরোপে আন্তর্জাতিক পুঁজি', 'জাপ-সাম্রাজ্যবাদ', এবং 'চীন-সমস্যার পটভূমিকা' সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী মার্ক্‌স-এর তিন খণ্ড Capital-এর সারাৎসার দিয়েছেন 'মার্ক্সের অর্থনীতি'তে। সোভিয়েট্‌ রাশিয়ার নিয়ন্ত্রিত অর্থ-নীতির সাফল্য দেখে মার্ক্সীয় অর্থনীতির মূল সূত্রগুলি জানবার জন্য সাধারণের কৌতূহল উদ্রিক্ত হওয়া স্বাভাবিক। লেখক অতি সংক্ষেপে ও প্রাঞ্জল ভাষায় এই জটিল বিষয় বিবৃত করেছেন। ইতিপূর্ব্বে এই দুরূহ কাজে কেউ প্রবৃত্ত হয়েছিলেন বলে আমার জানা নেই। সুকুমার মিত্রের 'রাশিয়ার রূপান্তরে' বিপ্লবোত্তর সোভিয়েট্‌ রাশিয়ার কথা আছে। মার্ক্‌সবাদ, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্য ও সোভিয়েট্‌ শাসনতন্ত্রের সার মর্ম্ম এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। লেখকের ভাষা সহজ ও জোরালো। বর্ত্তমান রাশিয়া সম্পর্কে তাঁর এই বইখানির উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা চলে।

'জাগৃহি' নামক গ্রন্থে রেজাউল করীমের অনেকগুলি প্রবন্ধ সংগৃহীত হয়েছে। হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা সম্পর্কীয় তাঁর রচনাগুলি মূল্যবান। বাংলার এই সমস্যার যত শীঘ্র মীমাংসা হয়, ততই মঙ্গল।

অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

কুরুপাণ্ডব—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়)
মূল্য—একটাকা আটআনা।

শিশু-সাহিত্যের উৎকর্ষের প্রতি কিছুকাল থেকে আমাদের লেখকদের সচেষ্টতা দেখা দিয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে দু' একটি বাদ দিলে এখন পর্য্যন্ত ও-সাহিত্যে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন পুস্তক প্রকাশিত হয় নি। আমাদের শিশু-সাহিত্যের শৈশব এখনো আসেনি, সবে সে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। রোমহর্ষ সস্তা আজগুবি গল্প আমাদের শিশুদের চিত্তবিনোদনের প্রধান সামগ্রী বলা যেতে পারে। গল্পের আজগুবিত্বে আপত্তির কারণ নাও থাকতে পারে যদি তা' রোমহর্ষ না হ'য়ে চিত্তাকর্ষক ও কল্পনাউদ্দীপক হয়। যেমন রবীন্দ্রনাথের 'সে'। রবীন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ প্রতিভা বাংলা সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে নূতন শ্রী এনেছে। কিন্তু সে প্রতিভাও শিশু-সাহিত্যে তেমন সাফল্য লাভ করেনি। তাঁর শিশু-পাঠ্য বইগুলি শিশুদের যতটা যোগ্য তার চাইতে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের অনেক বেশী উপভোগ্য। রচনা ও কল্পনার যে স্তরে নেমে গেলে সম্পূর্ণ শিশুদের উপযোগী বই লেখা চলে, রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভার পক্ষে তার মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বন্দী রাখা অসম্ভব। তাই তাঁর লেখায় এমন অনেক কিছু ধরা দেয় যার রস ঠিক শিশুদের জন্য নয়।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাহিনী অবলম্বনে "কুরুপাণ্ডব" বিদ্যালয়ের উচ্চতরবর্গের ছাত্রদের জন্য লেখা। এই বই একেবারেই পাঠ্য পুস্তক। অর্থাৎ কিনা এতে ছাত্রদের আনন্দ আস্বাদনের বড় কিছু নেই। এ যেন অপ্রচলিত বাংলা-শব্দ শেখাবার জন্য রচিত। নিজের ষ্টাইল বর্জ্জন ক'রে কেন যে রবীন্দ্রনাথ প্রাক্-বঙ্কিমী বাংলার কাছাকাছি বাংলায় এ বই লিখলেন তা' বলা শক্ত। পাঠ্য পুস্তক আনন্দ দানের জন্য নয়, শুধু শিক্ষার জন্য, এ মত রবীন্দ্রনাথ পোষণ করেন ব'লে কখন বিশ্বাস হয় না। অপ্রচলিত বাংলা-শব্দ শিখবার জন্য বাংলা সাহিত্যে শব্দভারাক্রান্ত ষ্টাইলের অভাব নেই। তবে কেন রবীন্দ্রনাথ "কুরুপাণ্ডবের" ইতিহাস তাঁর ভাষায় অপূর্ব্ব রসোদ্রেক না ক'রে কৃত্রিম আড়ষ্ট ষ্টাইল অবলম্বনে রচনা ক'রলেন? "কুরুপাণ্ডবের" ষ্টাইলের নিয়ে দুটি নমুনা দিচ্ছি—

"এই অবস্থায় সূর্য্য অস্তমিত হইল। সমরক্ষেত্র তিমিরাচ্ছন্ন হইলে যুদ্ধ

ক্ষণকাল স্তব্ধ রহিল। অনন্তর চন্দ্রমা অন্ধকার নিরাকৃত করিয়া নভোমণ্ডলে উদিত হইলে ক্ষত্রিয়গণ আলোকপ্রাপ্ত হইয়া পুনরায় পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইলেন।"

"যদুবংশাবতংস কৃষ্ণ প্রবিষ্ট হইবামাত্র কুরুবৃদ্ধগণ আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র উত্থিত হইলে তত্রস্থ সহস্র সহস্র ভূপতি গাত্রোত্থান করিলেন। কৃষ্ণ হাস্যমুখে সকলকে প্রত্যাভিনন্দন করিলেন।"

এ ছাড়া "কুরুপাণ্ডবের" আখ্যানভাগের উপর কবি বড় বেশী ঝোঁক দিয়েছেন, চরিত্রবিকাশের দিকে তেমন মনোযোগ দেননি। অনেক ছোটো-খাটো ঘটনা ও কথোপকথন বাদ দিয়ে ও সংক্ষিপ্ত ক'রে চরিত্রগুলি সম্বন্ধে কবি কিছু কিছু নিজের মন্তব্য ছড়িয়ে গেলে চরিত্রগুলি সজীব হ'য়ে উঠ্‌তো। মহাভারতের চরিত্রগুলির পূর্ণ স্বরূপ মহাভারতের বিরাট আখ্যানেই পরিস্ফুট হ'তে পারে। সেই আখ্যানকে ছেঁটে যখন কোন সংক্ষিপ্ত মহাভারত সৃষ্ট হয়, তখন প্রকৃত পরিপ্রেক্ষিতের অভাবে চরিত্রগুলি ছোট হ'য়ে পড়ে। সেই "হৃত-জ্যোতি" চরিত্রগুলির মহিমা বজায় রাখ্‌তে ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা ক'রতে হ'লে লেখকের টিপ্পনী দরকার। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তা' করেন নি, তিনি শুধু মহাভারতের গল্প ব'লে গেছেন।

আমার আর একটি বক্তব্য এই যে শিশুপাঠ্য ও স্কুল-পাঠ্য পুস্তকে চল্‌তি ভাষায় ক্রিয়াপদের রূপ থাকাই ভাল। এর কারণ সাধুভাষায় যদিও এখনো অনেকে লেখেন তবু এ কথা বোধ হয় নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে যে চল্‌তি ভাষার রূপই হবে ভবিষ্যৎ বাংলা ভাষার একমাত্র রূপ। সুতরাং নবলিখিত শিশু-পাঠ্য ও স্কুল-পাঠ্য পুস্তক হ'তে যত শীঘ্র "করিয়া" "খাইয়া" প্রভৃতি সাধুভাষার ক্রিয়াপদগুলি নির্ব্বাসিত হবে ততই সে ভবিষ্যৎ আমাদের এগিয়ে আসবে। কেন না, ভবিষ্যতের লেখকরা শৈশব থেকেই চলতি ভাষার রূপের সঙ্গে পরিচিত ও অভ্যস্ত হ'তে থাক্‌বে। কিন্তু পাঠ্য-পুস্তকে চলতি ভাষার রূপ চাপালে আমাদের জনমত সম্ভবতঃ মারমূর্ত্তি ধারণ ক'রবে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ দৃষ্টান্ত স্থাপন না ক'রলে সহজে তা' গ্রাহ্য হবে না। "কুরুপাণ্ডবে" সাধুভাষার ক্রিয়াপদের পরিবর্ত্তে চলতি ভাষার ক্রিয়াপদ ব্যবহার ক'রে রবীন্দ্রনাথ এ দৃষ্টান্ত স্থাপন ক'রলে খুসি হতুম।

পূর্ণেন্দু গুহ

In Hazard—By Richard Hughes (Chatto & Windus 7/6)

রিচার্ড হিউজের সাহিত্যসৃষ্টি বহুমুখী। আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রকাশিত হবার পূর্ব্বে তাঁর রচিত উপন্যাস, ছোট গল্প, কবিতা ও নাট্য আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। বর্ত্তমান চেষ্টার উৎকর্ষ স্বতন্ত্র। এতে তাঁর স্বাভাবিক উদ্ভট রোমাণ্টিক পরিকল্পনা বৈজ্ঞানিক প্রথায় বিবৃত হয়ে নূতন রূপ পরিগ্রহ করেছে। একটি আধুনিক মালবাহী জাহাজ প্রবল ঝড়ের আবর্ত্তে পড়ে নাস্তানাবুদ হচ্ছে তারই পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা, কিন্তু এমনই চিত্তাকর্ষক যে শেষ পর্য্যন্ত বিরতির অবকাশ থাকে না।

ঝড়ের গল্পের মধ্যে এক সময় কনরাড-এর 'টাইফুন' ও কবি মেসফিল্ড-এর 'ভিক্টোরিয়াস ট্রয়' আমাকে খুব উত্তেজিত করেছিল। কিন্তু এভাবে মন্ত্রমুগ্ধ হইনি। মোটা কথায় সে ছিল মানুষের বীরত্বে আত্মপ্রসাদ লাভ, আর এ হলো শিল্পীর চাতুর্য্যে বিস্ময়।

জল ও আকাশকে নিয়ে বাতাসের এই তাণ্ডব নৃত্য ক্ষুদ্র মানব-হৃদয়ে যে অঙ্কপাত করে, তার মধ্যে বিশেষ তারতম্য নেই ; তবে তাই নিয়ে যখন সাহিত্য-সৃষ্টি হয় তখন বৈচিত্র্য প্রকাশ পায় স্রষ্টার বর্ণন-নৈপুণ্যে। মেসফিল্ড সাবেকি আমলের ভাবোদ্দীপ্ত ভঙ্গীতে যে গাথা রচনা করেছেন তার উন্মাদনা অতুলনীয় কিন্তু ক্ষণস্থায়ী। ধ্বনির স্পন্দন ক্ষান্ত হলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে বালক নায়কটির বীরত্ব উজ্জীবিত করবার অভিপ্রায়েই ঝড়ের আবর্ত্তন এবং তার প্রকোপ বর্দ্ধিত ও উপশমিত হয়েছে প্রয়োজন অনুযায়ী। কনরাড-এর দুর্ব্বলতা স্বতন্ত্র গোত্রের। তাঁর প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন সংক্ষোভ্য (sensitive) চিত্ত ধর্ম্ম ও নীতি-মূলক বহুবিধ প্রশ্নের বিলয়নে অধীর। ফলে ঝঞ্ঝাবর্ত্তটি হয়ে দাঁড়িয়েছে মনুষ্য-চরিত্রের ঘাত প্রতিঘাতে ভারাক্রান্ত।

বর্ত্তমান গ্রন্থকার গল্প বলেছেন নির্ব্বিকার পরিদর্শকের মত। পাশ্চাত্য দেশীয় সিমফনি সঙ্গীতের সুরের মূর্চ্ছনা যেমন রেকর্ড্‌ যন্ত্রের ওপর মুদ্রাঙ্কিত হয়ে যায় তেমনি রচনাটির মধ্যে ঝটিকার সঞ্চারণ হয়েছে আপন ঠমকে। গল্পটি নিছক কল্পনাপ্রসূত বলে হয়ত' এতখানি নির্লিপ্ততা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু তার জন্য সত্যের কোন অপলাপ করা হয়নি, কারণ প্রত্যেকটি ঘটনা সম্ভবপর বলে প্রমাণিত।

গ্রন্থকার প্রথমে জাহাজটির নাড়ী-নক্ষত্রের সংবাদ দিয়েছেন পরিপাটিরূপে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নিরূপিত করেছেন কোন অংশের কতখানি ধকল সইবার শক্তি। জড় বস্তু সকল হয়ে দাঁড়িয়েছে যেন মানুষের মতই পৃথগাত্মা-যুক্ত। তারপর নাবিকদের পরিচয় দেওয়া হয়েছে ঝটিকার ফাঁকে ফাঁকে। তাদের মানসিক প্রতিক্রিয়া ও শারীরিক ক্লেশের বৈচিত্র্য কনরাড-এর রচনার সমতুল্য হলেও সম্পূর্ণ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিরচিত। একটি হচ্ছে মানুষের প্রতি সহানুভূতিব্যঞ্জক, আর একটি হচ্ছে উদ্দেশ্য-বিবর্জ্জিত—সর্ব্বাঙ্গীণ রূপসৃষ্টির উপকরণমাত্র।

আজকাল বেতার-বিজ্ঞানের কল্যাণে ঝড়ের গতিবিধি এতই জ্ঞাত হয়ে পড়েছে যে বিপদের কোন আশঙ্কাই নেই। তবু আর্কিমেডিস্-এর বিখ্যাত মালিকরা অর্থব্যয়ে মুক্তহস্ত ছিলেন এবং 'সাবধানের মার নেই' এই মন্ত্রটি স্মরণে রেখেই গঠন করিয়েছিলেন তার কলকব্জা। কর্ম্মচারী নিয়োজিত হয়েছিল সুদক্ষ। গ্রীষ্মের শেষভাগে আমেরিকার পূর্ব্ব তীর হতে মোম, পুরাতন সংবাদ-পত্র ও তামাক বোঝাই করে জাহাজটি চলেছিল প্রাচ্যের হাটে। কর্ম্মবিরতির পর কনিষ্ঠতম অফিসার ডিক্ ওয়াচেট্ একাগ্রচিত্তে দেখছিল শুশুকদের খেলা। তাদের মূর্ত্তিমান গতির আকৃতি, অনায়াস বিচরণ তাকে পূর্ব্বরাত্রের নৈশ মজলিসে জনৈক মদিরামত্ত যুবতির নগ্নদেহের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। দৈবাৎ সেখানে গিয়ে পড়েছিল সে। মদ্যপানে অনভ্যস্ত মেয়েটি বিহ্বল হয়ে সহসা বসন স্খলিত করে তার পদপ্রান্তে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে। অনাবৃত নারীদেহের সাক্ষাৎ এই তার প্রথম। জলাশয়ের মত নমনীয় দেহলতাটিকে সে মাদুরে আবৃত করে রেখে উত্তাল প্রেম বহন করে ফিরেছিল।

পূর্ব্বে বলেছি গ্রন্থকারের গল্প বয়নের চাতুর্য্য বিস্ময়কর। নগণ্য যুবকটির এই সামান্য অভিজ্ঞতা হতে বিচ্ছুরিত তড়িৎ ঝঞ্ঝার উন্মত্ততায় বর্ণ নিক্ষেপ করেছে ক্ষণে ক্ষণে, অথচ মনুষ্য-বিরচিত ক্রিয়াকলাপের সে প্রলয় নৃত্যের ছন্দে স্থান নেই। চিফ-অফিসারের পোষা ম্যাডাগাস্কার বিড়াল শিল্পী যামিনী রায়ের মার্জ্জারটির মতই নখ-দংষ্ট্রা শূন্য, মূক ও বধির 'ভাল মানুষ' বিশেষ—সেও নিভৃতে থেকে প্রলয় কাণ্ডের বিভীষিকা রঞ্জিত করেছে। তার অপরাধের মধ্যে সে কারও নিমীলিত চক্ষু সহ্য করতে পারতো না—খুলে দিত। এবং তার চলা

ফেরার ভঙ্গী ছিল অস্বাভাবিক। ভীতিপ্রদ আবহাওয়ার মধ্যে এই নির্ব্বিরোধী জীবটি যে কতখানি শক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠেছে অনুমান করা কঠিন।

গ্রীষ্মমণ্ডলে বড় বড় তেলাচে ঢেউর আকার গ্রহণ করে আসে ঝড়ের অগ্রদূত। সেদিন সে লক্ষণ ছিল না। সমুদ্রের এক অংশ হতে অদ্ভুত সুন্দরভাবে স্ফুরজ্জোতিঃ পড়েছিল আকাশের গায়। কাছে আসতে কালো জল নক্ষত্র-নিচয়ের মত চকচক করে উঠলো এবং তার ওপর ভাসমান সমস্ত জিনিষ হয়ে উঠলো যেন শীতল অনলে উদ্ভাসিত। গভীর জলে কোন বিশাল মৎস্য লাইট-হাউসের মত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলো ফেলছিল। আকাশ বাতাস সুস্থির, সুস্মিত—এমন সময় ঝড় এলো আকস্মিকভাবে।

ঝঞ্ঝার আবর্ত্ত ভ্রাম্যমাণ। ভিতরে প্রবেশ করা কিম্বা বাহিরে থাকা ইচ্ছা-সাপেক্ষ নয়, তবু ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ড্‌স চিন্তিত হলেন না। ভাবলেন জাহাজটি তার গুণপনার পরিচয় দেবার সুযোগ পেয়েছে সে তো সৌভাগ্যের কথা। দেখতে দেখতে বাতাসের চিৎকার দুঃসহ গর্জ্জনে পরিণত হলো। সমুদ্র-গাত্রে যেন কেশ গজিয়ে উঠলো। দুর্দ্দান্ত ঝটিকা তরঙ্গমালার গাত্র হতে চর্ম্ম ছিঁড়ে নিয়ে চল্লো। অসংখ্য ফেনিল ক্ষত চিহ্ন বহন করে অট্টালিকার মত বিরাট ঢেউগুলি ছুটলো ট্রেনের বেগে। বহিঃদৃষ্টি রুদ্ধ হয়ে গেল। ভিতরে দেওয়াল ও মেজের মধ্যে প্রতিযোগিতা লেগে গেলো পরস্পরের স্থান অধিকার নিয়ে। ঘণ্টায় দুই শত মাইল বেগে তাড়িত জলের ছিটা খরধার ছুরিকার মত টারপলিনের আবরণ ছিন্ন ভিন্ন করে দিল। মাল ঘরের অনাচ্ছাদিত পাটাতনগুলি নিমেষের মধ্যে শুষে নিলো বাতাসে। সংবাদপত্র ও তামাকের বোঝা জল শোষণ করে তরীকে করে তুললো আকণ্ঠ নিমজ্জিত। বায়ু, শূন্যগর্ভ শঙ্কুর আকার ধারণ ক'রে উৎপাটন ক'রে নিয়ে গেলো ফানেলটিকে এবং সেই সঙ্গে ইঞ্জিনের অগ্নি গেল নির্ব্বাপিত হয়ে। বাষ্পের অভাবে বিজলি হলো বন্ধ। বেতার যন্ত্রটি মূক হয়ে রইলো। নিরেট ও নিরবচ্ছিন্ন ঝঞ্ঝার নিনাদ সহসা বন্ধ হয়ে ছেয়ে এলো স্থূল নিস্তব্ধতার আবরণ। সকলেই বধির হয়ে গেছে। ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ডস বুঝলেন আবর্ত্তের অন্তর্দ্দেশে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন এবং আর এক দফা আক্রান্ত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। ক্ষণিক বিরতিটি যেন আরও ভীষণ। ক্ষুব্ধ আকাশ তড়িৎচ্ছটায় আচ্ছন্ন। অল্পালোকে দেখা গেলো সমগ্র সাগর নভঃমণ্ডলে ঠেলে

উঠেছে যেন পৃথিবীর প্রান্ত চাপিয়ে পড়ে যাবে শূন্যলোকে। স্ফীত সমুদ্রবক্ষে হাঙ্গর দল একটা কিছু হবার অপেক্ষায় অসহিষ্ণু চঞ্চলভাবে বিচরণ করছে। ডেকের ওপর পদক্ষেপণ করা ভার। অগণন মৃত ও জীবিত পক্ষী, প্রজাপতি ও ফড়িং-এর দেহে সমাচ্ছন্ন নোনা জল নিষ্কাশন না ক'রে রসদখানায় প্রবেশ অসম্ভব। ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর নাবিকেরা ঝটিকার পুনরাগমন কাটিয়ে উঠলো শেষ পর্য্যন্ত।

চারদিন চাররাত্রি ব্যাপী প্রলয় কাণ্ডটি বহু বিচিত্র ব্যাপারে সমৃদ্ধ। স্বল্প পরিসর সমালোচনায় তার মোটামুটি চুম্বক দেওয়াও অসম্ভব কারণ গ্রন্থকারের নিজস্ব ছন্দ হতে বিচ্যুত হলে কোন ঘটনাই সেরূপ প্রভা-সম্পন্ন থাকবে না।

বিপন্ন নাবিকেরা অধিকাংশ অতি সাধারণ মানুষ এবং প্রাণের ভীতি প্রায় সমভাবেই তাদের শরীরকে শিথিল ও নিষ্ক্রিয় ক'রে তুলেছিল। গ্রন্থকার তাদের মধ্যে কতকগুলির শৈশব ও যৌবনকাল মন্থন ক'রে দেখিয়েছেন যে বাহ্যিক ব্যবহার হতে অন্তস্থ সম্পদ নির্ণয় করতে যাওয়া মূঢ়তা। নির্ব্বাপিতপ্রায় দীপশিখাগুলির প্রত্যেকটি প্রদীপ্ত থাকার স্বপক্ষে তাঁর অকথিত যুক্তি শেষ পর্য্যন্ত গ্রন্থখানির আবহ সংক্ষুব্ধ রেখেছে।

পলাতক চৈনিক কম্যুনিষ্ট এ্যাওলিং-এর জীবনকাহিনীটি গ্রন্থখানির একটি বিশেষ সম্পদ। বাহ্যতঃ জড়ভরত এই যুবকটির অন্তরের প্রদাহ তাকে বহু বিপর্য্যয়ের মধ্যে দিয়ে আর্কিমেডিস্-এর মধ্যে এনে ফেলেছে। অতি শৈশবকালে চেতনার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভিক্ষের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে। তারপর সে দেখেছে দুর্ব্বলের প্রতি সকলের দুর্নিবার অত্যাচার। আদরিণী সহচরী ভগ্নীকে বিক্রয় হয়ে যেতে দেখেছে কয়েকটি মাত্র মুদ্রার বিনিময়ে। ধনী প্রতিবেশীর ভোজনপুষ্ট দারোয়ান যেদিন অবলীলাক্রমে একদল অনাহারক্লিষ্ট ব্যক্তিকে ভূমিলুণ্ঠিত করে ফেলে দিলো, তাসের বাড়ীর মত—সেদিন সে করল প্রথম উষ্মার প্রকাশ। গ্রাম-দেবতার বিগ্রহটিকে চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রে ভেঙে দিয়ে এলো। সেদিন সে হতভাগ্য পিতাকে ঘৃণা করতে শিখলো। গৃহত্যাগ ক'রে উদভ্রান্তের মত গা ভাসিয়ে দিলো সহরের কর্ম্মপ্রবাহে। হ্যানকীনের সরকারী যূপকাষ্ঠ হতে দৈবাৎ উদ্ধার পেয়ে তার জীবনযাত্রার মোড় ঘুরে গেলো। সৈন্যবাহিনীতে প্রবিষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে সাম্যতন্ত্রে দীক্ষিত হলো। মার্কস্-এর মতবাদ পড়ে সে

বুঝলো জগতে এই দুঃখ কষ্টের অসম বণ্টন বিধির বিধান নয়, মানুষেরই আলস্যের ফল। তিক্ততায় আড়ষ্ট শূন্য অন্তর আশার আলোকে ভরে উঠলো। নূতন চীনের জাগরণের চেষ্টায় সে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করলো। ক্রোধ ও হিংসার স্থানে দরদ ও জ্ঞানলিপ্সা তার মন প্রাণকে অধিকার করে নিলো।

চিয়াং-কাই-শেক-এর পুলিশ বাহিনী হতে আত্মরক্ষা করবার উদ্দেশ্যে ছদ্মনামে চাকুরি গ্রহণ করেছিল সে। সামান্য খালাসী, উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের সন্দেহ উদ্রেক হবার কারণ ছিল না। কিন্তু ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ডস বেতার বার্ত্তা পেয়েছিলেন গোপনে।

জাহাজ যখন ঝটিকার আবর্ত্তে বিধ্বস্তপ্রায় তখন তাঁর খেয়াল ছিল না। পরে নিরাপদ হতে তিনি এবং তাঁর শ্বেতাঙ্গ সহকারীদের স্বাভাবিক বুদ্ধি ফিরে আসতে সিদ্ধান্ত হলো চীনেরা নিশ্চয় বিদ্রোহের চেষ্টা করছে।

বস্তুতঃ যখন উপরের ডেক দুর্গম হয়ে উঠলো তখন তারা মন হতে ভীতি দূরীকরণ কল্পে বহু বিচিত্র ব্যাপারে নিরত ছিল। একটি বাচ্ছা লস্কর ঝড়ের দেবতার উদ্দেশ্যে আতস বাজি উৎসর্গ করছিল। এ্যাওলিং এই অন্ধ বিশ্বাসে বিরক্ত হয়ে হট্টগোলের মধ্যে গিয়ে পড়লো। ক্রিষ্টিয়ান খালাসী হেনরী টাং বক্তা। ব্যাপার কিছুই নয় আত্মশ্লাঘা। তার নির্লজ্জ মিথ্যা কথায় শ্রোতাদের মুগ্ধ হতে দেখে এ্যাওলিং কি একটা ব্যঙ্গ করেছে এমন সময় বিদ্রোহ দমনকারীরা প্রবেশ ক'রে তার ওপর ব্যাঘ্র-ঝম্প দিয়ে পড়লো। ক্যাপ্টেন-এর কাছ থেকে গ্রেপ্তার করবার আজ্ঞা পেয়ে উৎসাহের আতিশয্যে ডিক্ করলো প্রচণ্ড মুষ্টি চালনা। এ্যাওলিং মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লো।

ইংরাজ যুবকটি কোমল মাংসের স্পর্শ ভুলতে পারেনি কিন্তু অন্যায় আঘাতের আত্মধিক্কারকে সতত কর্ত্তব্যজ্ঞানের প্রলেপে অবনমিত রেখেছে।

গ্রন্থকার গল্পচ্ছলে ইংরাজ চরিত্রের সমালোচনা করেছেন এবং তাঁর বিশ্লেষণ যে কতখানি সত্য আমরা অবগত আছি।

গ্রন্থখানির যে কয়েকটি অংশ আমাকে নিবিড়ভাবে স্পর্শ করেছে তার মধ্যে চৈনিক বরুণানীর কাহিনীটি সর্ব্বাপেক্ষা করুণ।

শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

রাসলীলা—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য—১৲

মেঘদূত—মূল ও পদ্যানুবাদ—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য—৸০

'রাসলীলা'য় যে সব প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হয়েছে সেগুলি পূর্ব্বে ধারাবাহিকভাবে পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'রাসলীলা' গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের একটি প্রধান অঙ্গ। প্রাচীন গ্রন্থে রাসলীলার যে সমস্ত বর্ণনা আছে তার মধ্যে অসামঞ্জস্য থাকায় বৈষ্ণব পণ্ডিতেরা রাসলীলার শাস্ত্রীয়ত্ব প্রতিপাদন ও প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করবার বহু চেষ্টা করেছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থকার প্রাচীন গ্রন্থে রাসলীলার যে সব বর্ণনা আছে তার বিশদ আলোচনা করেছেন, প্রাচীন পণ্ডিতদের মতামত বিশ্লেষণ করেছেন এবং রাসলীলার গূঢ় অর্থ নির্ণয় করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি মধ্য যুগের খৃষ্টান মিষ্টিক্‌দের উক্তির সঙ্গে তুলনা করে রাসলীলার রূপকত্ব প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছেন।

রাসলীলার প্রধান বর্ণনা রয়েছে শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ে। এই অধ্যায়ে রাসলীলার সব কথাই আছে, শুধু রাধার নাম নাই। এ বর্ণনায় গোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যে প্রেমলীলার কথা আছে তাতে কামগন্ধের অভাব নাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও পদ্মপুরাণে রাসলীলাকে আরও বিস্তৃত করা হয়েছে, রাধার নাম সন্নিবিষ্ট হয়েছে, এবং বর্ণনায় কামগন্ধ তীব্রতর হয়েছে।

গ্রন্থকার যে ঐতিহাসিক আলোচনা করেছেন তাতে তিনি স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন যে মহাভারতে রাসলীলা সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই, হরিবংশে 'হল্লীষ' নৃত্যের যে কথা আছে তাতে বোঝা যায় যে 'হল্লীষ' নৃত্য রাসলীলারই প্রাচীন সংস্করণ। ব্রহ্মপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণেও হরিবংশের অনুরূপ বর্ণনা আছে কিন্তু সে লীলা ভাগবতের রাসলীলার মত বিস্তৃত নয়। এ হতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে মহাভারতের যুগে রাসলীলার অনুরূপ কোন কৃষ্ণলীলার পরিকল্পনা হয় নাই। হরিবংশ, ব্রহ্ম ও বিষ্ণুপুরাণে গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের হল্লীষ নৃত্যের বর্ণনা পাওয়া যায়। এই হল্লীষ নৃত্যের কল্পনাকে বিস্তৃত করে ভাগবতে রাসলীলার সৃষ্টি। এ পর্য্যন্ত রাধার কোন উল্লেখ নাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও পদ্মপুরাণ ভগবতের বর্ণনাকে যে শুধু বিস্তৃত করেছে তা নয়, রাধাকে আমদানী করেছে।

এ পর্য্যন্ত গ্রন্থকারের সঙ্গে সকলেই একমত। কিন্তু তিনি তারিখের কথা যেখানে তুলেছেন সেইখানেই মতান্তরের সৃষ্টি হয়েছে। হালের 'সপ্তশতী'তে একটি শ্লোকে রাধিকার নাম উল্লিখিত হয়েছে, অনুমান করা হয়। অনেকেই হালকে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের লোক বলেছেন। 'হাল', 'সাতবাহন' নামের 'সাত' শব্দের প্রাকৃত রূপ। সাতবাহন একটি রাজবংশের নাম মাত্র। সপ্তশতীকার সাতবাহন বা হাল কোন রাজা তা জানা যায়নি। পরবর্ত্তীকালের কোন কবি ঐ নামে সপ্তশতী রচনা করেছিলেন কিনা তাও বলা যায় না। এ অবস্থায় এই একটিমাত্র উল্লেখের উপর নির্ভর করে রাধা নামের প্রাচীনত্ব ও সমস্ত রাসলীলার ক্রমবিভাগের পর্য্যায় নিঃসংশয়ে নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নয়। ভাসের 'বালচরিতে' হল্লীষ নৃত্যের বর্ণনা আছে গ্রন্থকার তারও বিশদ আলোচনা করেছেন। তাতেও রাধিকার নাম নাই। পুরাণ প্রাচীন হলেও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও পদ্মপুরাণ প্রাচীন নয়। সুতরাং সে দুই গ্রন্থে রাধিকার যে উল্লেখ আছে তার দ্বারা সে নামের প্রাচীনত্ব নির্দ্ধারিত হয় না।

হল্লীষ নৃত্য ঐতিহাসিক। কিন্তু রাসলীলা যে রূপক তা সকলেই বিশ্বাস করেন। এবং সে রূপক যে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন ঘটিত রূপক তা গ্রন্থকার স্পষ্ট করেই দেখেছেন। প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থকারেরাও কৃষ্ণ-রাধিকার এই লীলাকে অপ্রাকৃত বলেছেন। অথচ ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ও পদ্মপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে এই লীলার যে বর্ণনা রয়েছে তা eroticism বা "কামায়নে" পরিপূর্ণ। তার কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে গ্রন্থকার বলেছেন—"পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলনে যে অত্যন্ত সুখানুভূতি, তাহা অকথ্য-অবর্ণ এবং সেইজন্য সর্বদেশে সর্বকালে সকল মিষ্টিকই ঐ অনুভূতির ইঙ্গিত করিতে হেঁয়ালী সন্ধ্যাভাষার ও প্রচুর প্রতীকের প্রয়োগ করেন; এ সম্পর্কে মত্ত ও মদন, বিশেষতঃ মদন সুপরিচিত প্রতীক"। এ কথা যে সত্য তা নির্দ্ধারণ করবার জন্য গ্রন্থকার নানা সম্প্রদায়ের মিষ্টিক্‌দের বহু উক্তি সন্নিবিষ্ট করেছেন। এ সমস্ত বর্ণনায় প্রতীকের যে প্রয়োজন তাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু শুধু প্রতীক নিয়েই যখন বাড়াবাড়ি আরম্ভ হয় তখনই জাতীয় অবনতির যুগের সূত্রপাত হয়। আমাদের দেশেও যে এক সময়ে তা ঘটেছিল তা অস্বীকার করা যায় না।

সংস্কৃত সাহিত্যে মেঘদূত একমাত্র বই যা সকল দেশের লোকেই সকল সময়েই পড়তে পারে ও আনন্দলাভ করতে পারে। সেই কারণে এ বই বৈদেশিক ভাষাতেও বহুবার অনূদিত হয়েছে। বর্ষাকালের মেঘ বাঙ্গালী-কবির চিত্ত সব চাইতে বেশী আন্দোলিত করে। সেইজন্য মেঘদূত তার এত প্রিয়। এবং সেইজন্যই মেঘদূতের কালিদাসকে বাঙ্গালী কবি বলে প্রতিপন্ন করবার প্রয়াস। বাঙ্গালা ভাষায় মেঘদূতের অনুবাদ আছে, কিন্তু বর্ত্তমান অনুবাদে বৈশিষ্ট্য আছে। তা বিশেষভাবে মূলানুগত। বাঙ্গালা অনুবাদ করা হয়েছে কবিতায়, মাত্রা হিসাবে বিচার করলে সে কবিতার ছন্দও মূলের ছন্দানুগত, শুধু মূলের ধ্বনির অভাব। মূলানুগত অনুবাদের যে প্রয়োজন ছিল তা স্বীকার করতেই হবে। পরিশিষ্টে মেঘদূতের মেঘের পথ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা আছে। রামগিরি হতে অলকা পর্য্যন্ত যে পথের বর্ণনা আছে তা কাল্পনিক নয়, এবং বর্ত্তমানকালের meteorologist মৌসুমী মেঘের যে গতি নির্দ্ধারণ করেছেন সে পথ তারও বিরোধী নয়, এ কথা অনুবাদক স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

শ্রীগোবর্দ্ধন মণ্ডল কর্তৃক আলেক্জান্ড্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত
ও শ্রীকুলভূষণ ভাদুড়ী কর্তৃক ১১, কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত

৮ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা
পৌষ, ১৩৪৫

পরিচয়

নতুন ও পুরাতন

সাহিত্যিক তর্কের অবসান হল যুবক-বন্ধুর একটি প্রশ্নে—"সত্য কথা বলুন মুখুয্যে মশাই—ভাল সন্দেশ কোলকাতা সহরে আর পান? আমাদের সময় আধা-ছানার মণ্ডা দ্বিতীয় শ্রেণীর মিষ্টির মধ্যে গণ্য হত, এখন যে-কোনো বড় দোকানের কাচের বাক্সে মাথা খুঁড়লেও পাবেন না, অর্ডার দিলে পরের দিন মিলতে পারে, তাও কেবল চিনির ডেলা।"

এই মন্তব্যে আপত্তি জানালাম—"কেন, আজকাল খাবার কত সুবিধা, টেলিফোনে দোকানে অর্ডার দিন, আধ ঘণ্টার মধ্যে মোটরে পৌঁছে দেবে—সিঙ্গাড়া গরম, দই ঠাণ্ডা, রেফ্রিজারেটারে রাখা, টাইফয়েড কলেরার ভয় নেই। অবশ্য দাম একটু চড়া।"

"ব্যস্, ঐ পর্য্যন্ত! কিন্তু সিঙ্গাড়া আমাদের কালে খাবারের মধ্যে অন্ত্যজ ছিল। হাঁ, দইটা অবশ্য—কিন্তু কোয়ালিটি দেখুন, দইএর কাছে আপনি কি প্রত্যাশা করেন? সুগন্ধ, সুস্বাদ, না দইএর দধিত্ব, সেটা মোল্লার চকেই পাওয়া যেত।"

"খানিকটা মানি। আমার পৈতে ও বিয়েতে কর্ত্তারা পেনেটির গুপো, নাটোরের মণ্ডা, তমলুকের দই খাইয়েছিলেন।"

"তেমনি ধরুন চাল। বাঁশমতি বাজারে পান? কোনটার উন্নতি হয়েছে বলুন?"

"তা হলে আপনার মতে রবীন্দ্রনাথই দায়ী?"

"এক হিসেবে তাই বৈ কি। তাঁর সদ্গুণ কেউ নিলে না, শেষের কবিতার ভাববিলাসটাই নিলে। ফলে বুদ্ধদেব বসু। এই অবনতির গতি থেকে রক্ষা

করতে চেষ্টা করছেন দুজন কবি—বিষ্ণু দে ও সুধীন্দ্র দত্ত। তাঁদের সামাজিক সার্থকতার জন্য তাঁরা সিগ্‌নিফিক্যান্ট।”

“দেখুন, আমার মনে হয়, প্রমথবাবু, দেবেন সেন প্রভৃতি লেখক রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে আত্মনিবেদন করেন নি। তাঁদের ধরছেন না কেন?”

“প্রমথবাবুর সমাজ-বোধ ছিল না, তিনি ছিলেন কেবল যাকে উনবিংশ শতাব্দীতে ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল বলা হত তাই।”

“সুধীন্দ্র ও বিষ্ণু ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল নয়? তাঁরা কি খুব সামাজিক? দুজন কি একই ধরণের?”

“ব্যক্তিগতভাবে তাঁরা যাই হোন না কেন, তাঁদের প্রচেষ্টার একটা সামাজিক কৃতিত্ব আছে। বিষ্ণুবাবু ও সুধীন্দ্রবাবুর মধ্যে পার্থক্য আছে—একজন ছুরি চালান, অন্যের হাতে হাতিয়ার মুদ্গর।”

আমার যুবক-বন্ধুর সঙ্গে যা কথোপকথন হয়েছিল তারই শেষাংশ যথাযথ লিপিবদ্ধ করলাম। কারণ এই যে তাঁর মন্তব্যগুলি বিচারের উপযোগী। তিনি যাবার পর আমার অস্বস্তি এসেছে, কলম ধরে শান্তির আরাধনা করছি। বন্ধুর মতামত ঠিক অপ্রত্যাশিত কিংবা অপূর্ব্ব নয়। কিছুকাল থেকে অনেকটা ঐ ধরণের মতামতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়েছি বটে, কিন্তু ঐ রকম স্পষ্টভাষায় তার প্রকাশ পাইনি। যখন পেলাম তখন বন্ধুর বয়সের সঙ্গে তাঁর আফশোষের বিরোধ উপলব্ধি করে নীরব থাকা অনুচিত।

তাঁর সঙ্গে আমার একটা কোথায় যেন পার্থক্য রয়েছে। সেটা কি মাত্র বয়সের? না, আরো প্রাথমিক, দৃষ্টিভঙ্গীর? আমাদের যুবা বয়সে এমন কি ছিল যা এখন নেই, এ কালে এমন কি আছে যা আমাদের ছিল না? সত্যকারের পার্থক্য আছে কি? কি ভাবে আমরা জগৎকে দেখতাম? কি ভাবেই বা এঁরা দেখেন? যদি কিছু পার্থক্য থাকে তবে তার মূল্য কতটুকু?

‘আমাদের’ বলতে অবশ্য আমার ও আমাদের দলকে বোঝাই স্বাভাবিক। আমি কি ছিলাম? আমি রুসোর মতন আত্মজীবনী লিখতে বসিনি বটে, কিন্তু তাই বলে এখনকার মনোভাব ও আদর্শ তখনকার ওপর আরোপ না করার মতন সংযম আমার আছে। ছিলাম এক কথায় ‘ফাজিল’ ছেলে—অর্থাৎ পাঠ্যপুস্তক পড়তাম না, বাজে বই পড়তাম, যা পড়তাম তার চেয়ে বেশি কিনতাম, তারও

বেশি ঘাঁটতাম, ও আরো বেশি ‘চাল’ দিতাম। টাকার ভাবনা এক হিসেবে ছিল না, কেবল বাবা ও মা চা ও চপ্‌ কাটলেট, দর্জ্জি ও বইএর দোকানের বিল্‌ শোধ দেবার সময় রাগারাগি করতেন এইটুকু ছাড়া। চাকরী বাকরীর কথা মনে উঠত না, পড়াশুনার সঙ্গে চাকরীর সম্বন্ধ আমার অজ্ঞাত ছিল। ভাল ছেলের সঙ্গে যেমন মিশেছি, বখা ছেলের সঙ্গে তেমনই, বোধ হয় একটু বেশী প্রাণ খুলে। একটা গোঁড়ামি ছিল চরিত্র সম্বন্ধে। গান শিখতাম ও ভাল বাসতাম, তবে ধ্রুপদ—তার নীচুতে নামিনি। থিয়েটার খেলাধুলোর সখ ছিল। মেয়েদের সঙ্গে মিশেছি, তবে আগ্রহ ছিল না, লোভ ত’ নয়ই। বন্ধুত্ব করেছি প্রাণভরে—সমবয়সীর সঙ্গে। যা কিছু রোমান্স প্রধানতঃ ওঁদেরই সঙ্গে। অন্য সব ছুটকো-ছাটকা—দু’এক বছরের বেশী তাদের জান্‌ ছিল না। কল্পনা-বিলাসী ছিলাম না, তবে কল্পনা ছিল। বাঙলা সাহিত্যের প্রতি কোনো প্রকার আসক্তি ছিল না। ‘বাঙলা বই’ বলতাম, বাঙলা সাহিত্য বলতাম না। স্বদেশী যুগে ‘বন্দেমাতরম্‌’ গেয়েছি বটে, কিন্তু যেন মনে ধরেনি। লাঠি খেলা, সাঁতার দেওয়া, গাছে চড়া, স্বেচ্ছাসেবক হওয়া, বন্যা-প্রপীড়িতের উদ্ধার, গ্রাম-সুধার, নাইট স্কুল, ইংরেজীতে বক্তৃতা—কিছু বাদ দিইনি বটে, কিন্তু হুজুকে পড়ে। মোদ্দা কথা পলিটিক্যাল জীব ছিলাম না।

চিন্তার দিক থেকে কোনো একটা বিশেষত্ব ছিল না। শেষ যে নামজাদা লেখকের বই পড়তাম তারই মত উদ্‌গীরণ করতাম। সেটা মস্তিষ্কের পরিচায়ক নয়, স্মৃতিশক্তির। একাধিক কলেজ ঘুরেছি কিন্তু প্রধানতঃ রিপণ কলেজেরই ছাত্র আমি। যখন নতুন বাড়িতে কলেজ এল, তখন বিস্তর আধুনিক বই কেনা সুরু হয়। বিকেলবেলা ত্রিবেদী মহাশয়ের ঘরে অধ্যাপক-বৃন্দের আড্ডা জমত কৃষ্ণকমল বাবুকে ঘিরে। সেখানে তুলনামূলক ধর্ম্মতত্ত্ব, দর্শন, সাহিত্য, চারুকলা, পুরাতন ইতিহাসের আলোচনা হত, আমি পাশে দাঁড়িয়ে শুনতাম। এমন আলোচনা আর কোথাও আমি অন্ততঃ শুনিনি। তার দুটি প্রধান গুণ ছিল—গাম্ভীর্য্য ও বিদ্যা। ক্ষেত্র বাবু রসিকতা করতেন, কিন্তু সে-রসিকতার অন্তরে, পিছনে ও চারপাশে যে গুরুত্ব ছিল তা স্মরণ করলে এখনও মাথা নীচু হয়। এই আসরের প্রভাব আমার জীবনে ওতপ্রোত হয়ে আছে। বিশেষতঃ একটা দিক থেকে। আমার বি, এ, ক্লাসে ছিল কেমিষ্ট্রি ও অঙ্ক—বিজ্ঞানে ইণ্টারমিডিয়েট

পাশ করি। ত্রিবেদী মহাশয়, গঙ্গাধর বাবু, সুরেন বাবু, জানকী বাবু, বাজপেয়ী মহাশয় কেমিষ্ট্রি পড়াতেন। ত্রিবেদী মহাশয়ের শরীর তখন ভাঙ্গতে সুরু হয়েছে। সপ্তাহে তিনি মাত্র দুদিন পড়াতেন। যেদিন ক্লাসে প্রথম এলেন সেদিন আমাকে একটি প্রশ্ন করেন, 'Charles' law, Avogadro's hypothesis পড়েছ?' গড় গড় করে মুখস্থ বলে গেলাম। একটু হেসে বল্লেন 'Law ও hypothesis-এর পার্থক্য কি?' চুপ। 'Logic পড়েছ? ওটা না পড়লে বিজ্ঞান বোঝা যাবে না।' তার পর পুরো দু' তিন মাস বিজ্ঞানের তর্কনীতির ব্যাখ্যা চলল—সেগুলি 'জগৎ কথা'য় প্রকাশিত হয়। সেই থেকে 'বিজ্ঞানের অর্থ আমার কাছে M. Sc. D. Sc.-র কাছে বিজ্ঞানের অর্থ থেকে পৃথক রয়েই গেল।

এই সময় অমার সঙ্গে ৺সতীশ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সম্পর্ক সুরু হয়। তিনি তখন ম্যাণ্ডালে থেকে দেশে ফিরেছেন। জন কয়েক বন্ধু মিলে আমরা তাঁর ছাত্র হই। প্রধানতঃ বিজ্ঞান ও অঙ্কের, কিন্তু মুখ্যত চরিত্রের। যুবা বয়সের দোষগুণ তখন আমার স্বভাবে ফুটে উঠছে। একটা ভাবের ঘুরপাকে জীবনটা তখন পড়েছিল। তাঁর আদর্শবাদ আমাকে উদ্ধার করলে। আমার জীবনে আমার পিতার ও সতীশ বাবুর আদর্শবাদের ছাপ সুস্পষ্ট। পরে অনেক অশান্তি এসেছে তাঁদের প্রভাবে; কিন্তু আমার পরিশ্রম করবার শক্তিও তাঁদের কৃপায়। দুজনেই ধার্ম্মিক ছিলেন, পিতা জ্ঞানমার্গের পথিক, সতীশ বাবু ভক্তিমার্গের। সতীশ বাবুর ভগবানে বিশ্বাস ছিল সুদৃঢ়, কিন্তু সে-বিশ্বাসের ছোঁয়াচ আমায় লাগেনি। বরঞ্চ আমার পিতার জ্ঞানপন্থাই আমাকে সাহিত্যের ও সঙ্গীতের ভাবপ্রবণতা থেকে রক্ষা করেছে। একটা কথা লিখতে ভুলেছি। ছেলেবেলা ছোট সহরে কাটিয়েছি; সেখানে গ্রাম ও সহর, দু'য়েরই ভাল মন্দের সাক্ষাৎ পাই। তার পর থেকে সহরবাসী। গ্রামের প্রতি যুবা বয়সে কোন মোহ ছিল না—একেবারে সহুরে হয়ে যাই। এই ত' গেল আমার মানসিক আবহাওয়া।

আমাদের দলের কথা লেখা শক্ত। পূর্ব্বেই লিখেছি আমার দল ছিল প্রকাণ্ড—তাতে বখা ছেলে, কুস্তীগীর-খেলোয়াড়, গাইয়ে-বাজিয়ে থেকে, সাহিত্যিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্ন সবাই আসত। অতএব আমাদের দলের একটা মানসিক

ল, সা, গু আবিষ্কার করা শক্ত। অবশ্য, সত্য কথা বলতে গেলে, নচেৎ যাঁরা এখন বিখ্যাত হয়েছেন তাঁদের ধরে অনেক কিছুই বড় বড় কথা লেখা যায়। তবে এটা ঠিক—১৯৷২০ বছর থেকে ২৫৷৩০ বছরের আমার পরিচিত যুবক-বৃন্দ প্রমথ চৌধুরীর চার পাশে দল তৈরী করে। কমলালয়ে নানা প্রকৃতির ছেলে আসত। প্রত্যেকের পৃথক পৃথক বন্ধু ছিল অবশ্য, কিন্তু সবুজপত্রের দলেরই তখন 'মন' ছিল বলা যায়। অন্ততঃ সেই দলের প্রত্যেকে তাঁর দৌলতে মন তৈরী করার সুযোগ পায়। অতএব 'আমাদের দল' বলতে সবুজপত্রের দল বলা অন্যায় নয়। এই দলের গোটা কয়েক সাধারণ মানসিক ধারার উল্লেখ করছি। বুদ্ধিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, এই দুটোই প্রধান।

বলা বাহুল্য, বুদ্ধিবাদ মানে বুদ্ধিমত্তা নয়, যদিও প্রমথ বাবুর কাছে নির্ব্বুদ্ধিতা অভদ্রতারই নামান্তর। বুদ্ধিবাদ অর্থে (১) চরিত্র-শক্তি, ইচ্ছাশক্তির অপেক্ষা বুদ্ধির প্রাধান্য-স্বীকার (২) বুদ্ধির পরিচয় তর্কে (৩) যে-তর্কের গোটাকয়েক রীতিনীতি আছে, এবং (৪) যার সাধারণ অস্তিত্বের জন্য আপেক্ষিকতার হাত থেকে, বাস্তবিকতার কবল থেকে, সাময়িকতার নাগ পাশ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত অঙ্গীকারের উপসিদ্ধান্ত হল বুদ্ধির স্বাধীনতা, কারণ যেটা সাধারণ অর্থাৎ অবিশেষ (সাধারণের বুদ্ধি আছে সবুজপত্রের দল স্বীকার করেনি কখনও) সেটা মুক্ত। এই স্বাধীনতা থেকে আমরা অনুমান করেছিলাম যে লেখক কর্ম্মজীবনে কারুর দাসত্ব করবে না, সাহিত্যিক জীবনে সর্ব্বদাই সমালোচনা করবে। সমালোচনার বিষয় অবশ্য নির্দ্দিষ্ট ছিল না, তবে সমাজই ছিল প্রধান। পলিটিক্স-এ আমাদের আগ্রহ ছিল না, তার বদলে পলিটিক্যাল গোঁড়ামি, ধর্ম্মের গোঁড়ামি এমন কি বিজ্ঞানের, দর্শনের। মোদ্দা কথা কিছুই বাদ পড়েনি। ফলে লেখায় এসেছিল ফুর্ত্তি, এবং সাহিত্যে এল প্রবন্ধ, সর্ব্ববিষয়ে জানবার আগ্রহ। তবে নিশ্চয় মানব যে তার বিপদও ছিল যথেষ্ট, হাল্কা বেহায়াপনা তার মধ্যে সব চেয়ে কম। সব চেয়ে বেশী ছিল জীবন থেকে, বিশেষতঃ সামাজিক জীবন থেকে বিচ্যুতি। বুদ্ধির চর্চ্চায় আমরা বৃন্তচ্যুত হয়ে পড়ি। বুদ্ধিবাদের সর্ব্বনাশ ঐ করেই ঘটে, আমরাও বাদ পড়িনি।

বুদ্ধি সমাজের নেই, মানুষেরই আছে, এবং একজন মানুষেরই আছে, একটা মস্তিষ্ক দুটো স্কন্ধে যেকালে থাকতে পারে না। তার ওপর আমাদের বাস

সহরে, ভদ্র মধ্যবিত্তের সন্তান, হীরের টুকরো ছেলে, অর্থাৎ বাপমায়ের গৌরব, অথচ তাঁদের সঙ্গে বনিবনাও নেই। তার ওপর বুদ্ধিবাদের জের। অবরোহী যুক্তির ধরণই এমন যে তার সাহায্যে একমাত্র ব্যক্তিবাদেই পৌঁছান যায়। যেই অবিশেষ চিরন্তন নিয়ম কিংবা অধিকার স্বীকৃত হল অমনি সেই নিয়ম ও অধিকারের জাগতিক প্রয়োগে কর্ম্মক্ষেত্রে সমর্থন পাওয়া যায় না; তখন প্রত্যেক বিশেষ মাথা উঁচু করে থাকে; বাধ্য হয়ে বিশেষকেই অ-বিশেষ বলতে হয়। ব্যক্তিবাদের মূল কথা ব্যক্তির বিশেষত্ব স্বীকার করা নয়, তার সাধারণত্বের ঘোষণা করা। আমাদের দল এই সব কারণে স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী ছিলাম। অতএব আমাদের সঙ্গে বর্ত্তমান যুবকের একটা দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য থাকতে বাধ্য। সেটা ঠিক বয়সের জন্য হোক আর না হোক—কালের জন্য। য়ুরোপে মহাযুদ্ধই কালকে ভাগ করেছে। আমাদের মনের ওপর যুদ্ধের ছাপ স্পষ্ট ছিল না। ইংরেজ আমাদের পরাধীন করেছে, সেই ইংরেজ জার্ম্মাণের হাতে জব্দ হোক এই ছিল আমাদের ইচ্ছা। সিগারেট ও বইএর দাম বেড়েছিল—ঐটুকু দুঃখ। যুদ্ধের সময় আমরা ভূগোল শিখি—ইতিহাস না জেনে। বিস্তর জার্ম্মাণ ও ইংরেজের লেখা বইএর চলন হয় এই সময়—তার মধ্যে নীট্‌শে ও চেম্বারলেনের বইএর প্রভাবই যৎসামান্য স্থায়ী হয়। সবুজপত্রের দলই বোধ হয় ফরাসীর জয় কামনা করত। প্রমথবাবুর ঐ সম্বন্ধে লেখার ওপর ইংলণ্ডের টাইমস্ প্রকাণ্ড টিপ্পনি লেখে। বিলেতে যুদ্ধের ফলে যে হতাশা কিংবা দুরাশা আনে সে-রকম কিছু হয়নি এখানে। মাত্র আমাদের জানবার আগ্রহ বেড়ে যায়।

সূক্ষ্মভাবে ধরতে গেলে আমাদের মানসিক ধারার দুটি গোপন ধারার উৎস খোলে ঐ সময়। (অন্ততঃ আমার ত' বটেই)। ক্রপট্‌কিন ও নিকোলের জীবতত্ত্বের আলোচনা, তার ওপর স্যামুয়েল বাট্‌লার ও বের্গসঁর রচনা পড়ে অভিব্যক্তিবাদের ওপর আমাদের যেন একটু সন্দেহ আসে কিন্তু অচিরেই তার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। জার্ম্মাণীর সহানুভূতিতে বিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মায়—তবে সে-বিজ্ঞান মানে কেমিষ্ট্রি ও ফিজিক্স। সে-যাই হোক আমরা এই যুদ্ধের সময় বৈজ্ঞানিক হয়ে পড়ি।

দ্বিতীয় গোপন ধারাটি এই: ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে য়ুরোপের যুদ্ধে ইংলণ্ডের বিপদে ও সর্ব্বনাশে। সত্য কথা এই—যুদ্ধ আমাদের পরনির্ভরশীলতা শেখায়,

তবে ইংরেজের দয়ার ওপর নয়, খানিকটা তার প্রতিজ্ঞার ওপর—যে প্রতিজ্ঞা সে বিপদে পড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। এই অন্ধবিশ্বাস চিত্তরঞ্জনের ছিল। এখনও আছে, তবে আজকাল ইংলণ্ডের বদলে ইম্পিরীয়ালিজ্‌ম বলা হয়। এই দুটোর পার্থক্য আমরা জানতাম না, কারণ ঐতিহাসিক নিয়ম আমাদের অজ্ঞাত ছিল।

এই জ্ঞান রুশিয়ার দান। য়ুরোপের যুবকমনে যুদ্ধের প্রভাব যতটা ততটা প্রভাবই রুশিয়ান বিপ্লবের আমাদের দলের মনের ওপর। তার চেয়ে বেশী বল্লে অত্যুক্তি হয় না। অবশ্য এখানে ১৯১৭ সালের পূর্ব্বকার রুশিয়া ও তার পরবর্ত্তী রুশিয়ার পার্থক্য মনে রাখতে হবে। বাঙ্গালীর রুশিয়ার সঙ্গে ১৯১০ সালের পর থেকে একটা যোগ হচ্ছিল। অনেকগুলি মিল আমরা লক্ষ্য করেছিলাম।

(১) রুশিয়ার নিহিলিজ্‌ম ও বাঙলার terrorism।

(২) রুশিয়ার কৃষক ও আমাদের কৃষক—উভয়ের অশিক্ষা, নির্য্যাতন, দুরবস্থা।

(৩) রুশিয়ার গ্রাম-সভা ও আমাদের পঞ্চায়েৎ।

(৪) রুশিয়ার আমলাতন্ত্র ও আমাদের আমলাতন্ত্র।

(৫) মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সমাজের সঙ্গে উভয়ের যোগহীনতা।

(৬) সেই সম্প্রদায়ভুক্ত ইন্টেলেক্‌চুয়ালদের বাক্যবল, নিষ্ফলতা, চা, সিগারেট, কর্ম্মের প্রতি মোহ অথচ কর্ম্মক্ষেত্রে নেমে দ্বিধা, চরিত্রের আন্তরিক দ্বন্দ্ব, এক কথায় হ্যাম্‌লেটিপনায় উনবিংশ শতাব্দীর রুশিয়ানদের সঙ্গে আমরা সমগোত্রের ছিলাম।

(৭) মানসিক প্রবৃত্তিতে উভয়ের আত্মকেন্দ্রিকতা। ফলে বাঙালী ও রুশিয়ান যুবকের self-pity।

(৮) যুবতীদের কাছ থেকে যুবকদের অত্যধিক প্রত্যাশা। স্ত্রীজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উচ্চধারণার মূলে একই রকমের আত্মবিশ্বাসের অভাব।

(৯) তার ওপর ও-দেশে যেমন স্লাভোফিলিজ্‌ম ও কস্‌মপলিট্যানিজ্‌ম—এদেশেও তাই। আমাদের আর্য্যামি ও সায়েবিয়ানা ও শেষে রবীন্দ্রনাথের সার্ব্বভৌমিকতা।

১৯১০ সাল উল্লেখ করেছি, কারণ এই সময় সেন ব্রাদার্স ছোট্ট দোকান খোলেন বহুবাজার ও কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে। প্রমথ সেন ও ৺ভোলানাথ সেন এই সময় থেকে আমাদের বিদেশী, বিশেষতঃ রুশিয়ান, সুইডিশ, নরুইজীয়ান, ফরাসী প্রভৃতি বিদেশী সাহিত্যের খোরাক যোগাতে সুরু করেন। বাঙলা-সাহিত্য ও বাঙালী শিক্ষিত সম্প্রদায় এই সেন ব্রাদার্সের বইএর দোকানের কাছে চিরকাল ঋণী থাকবে।

কিন্তু ১৯১৭ সালের পূর্ব্বে বাঙালীর সঙ্গে রুশিয়ার সম্পর্ক রোম্যান্টিক। তারপর ও-দেশে গোলমাল বাধল। কানাঘুষো অনেক কিছু আমরা শুনলাম, প্রথমে কিছুই বুঝিনি। একটা কিছু ভীষণ কাণ্ড ঘটছে সন্দেহ হয়েছিল।

১৯১৭ কিংবা '১৮ সালে আমার হাতে Kropotkin-এর French Revolution আসে। সেই পড়ে বিপ্লব সম্বন্ধে আমার অনেক ধারণা একেবারে উল্টে যায়। ১৭৮৯ সালেই যে বিপ্লবীশক্তির প্রকৃত উৎস, অর্থাৎ কৃষির চাহিদা নষ্ট হয়, এই তথ্যটি আমার মনকে ভিন্নগামী করে। তারপরই, ১৯১৯ সালে আমি কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো পড়ি, যেন নতুন জীবন সঞ্চারিত হল। ১৯২২ সালে কার্ল মার্কসের ক্যাপিটাল সুরু করি। এর আগে হেগেলের Philosophy of History, Buckle, Guizot প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয় ছিল। বেশ মনে আছে নন্-কোঅপারেশন আন্দোলনের গলদ দেখাতে গিয়ে, স্বরাজ-পার্টিকে মধ্যবিত্তের চক্রান্ত ব'লে, চম্পারণের ইতিহাস পঞ্চাশ বছর পূর্ব্ব হতে টানার ফলে একটি ছোট্ট সভায় আমি ভীষণ অপদস্থ হই। তারপর সরকার বাহাদুর মীরাট মোকদ্দমা চালালেন। যুবক সম্প্রদায় সব রুশিয়ার ভক্ত হল। কেউ কেউ তাঁদের মধ্যে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, ষ্ট্যালিন, বুখারিণ, প্লেখানফ্ পড়েননি তা নয়, তবে বেশীর ভাগ বাঙালী যুবক নতুনত্বের মোহে প্রথম প্রথম কম্যুনিজ্‌মে বিশ্বাসী হন।

অবশ্য পড়া না-পড়ায় কিছু আসে যায় না। যুদ্ধের সময় চোখের সামনে অনেক গরীব বড়লোক হয়ে যায়—রাতারাতি। ১৯১৯ সাল থেকে সেই টাকা কলকারখানায় প্রযুক্ত হল। শেয়ার পিছু শতকরা ১০০০৲ মুনাফা কোনো কোনো কোম্পানী সে সময় দিয়েছে। মজুরদের মজুরী কিছু বেড়েছিল, কিন্তু নিতান্ত অসম অনুপাতে। ফলে ধর্ম্মঘট সুরু হল, তারপর ট্রেড ইয়ুনিয়ন গড়ে

উঠল। ১৯১৯ সাল থেকে ১৯৩৪ সালের মধ্যে ভারতবর্ষে শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করলে চমক লাগে। এই পনের বছরের মধ্যে ভারতের ইতিহাস চৌধুনের লয়ে এগিয়েছে। আত্মরক্ষার সমিতি থেকে সুরু করে, জাতীয়-সংগ্রামে যোগদানের মধ্য দিয়ে এসে আজ শ্রমিক-সঙ্ঘ আপনার ঐতিহাসিক নিয়তি সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে। এমন চাহিদাও শুনেছি যে মজুর-সভা ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ণয় করবে। সে যাই হোক—ঐ পনের বছর শ্রমিক-আন্দোলন ও জাতীয়-আন্দোলন পাশাপাশি চলতে থাকে। দুটির মধ্যে আদান-প্রদান চলে। কিন্তু কিছুকাল পরে দেখা গেল যে আশানুগত ফল পাওয়া যাচ্ছে না। অনুসন্ধানের ফলে চোখে পড়ল একটি মজার ঘটনা। ধনিক-শ্রেণী বোম্বাই ও কোলকাতা, নাগপুর ও দিল্লীতে কংগ্রেসকে গ্রেপ্তার করেছে। বাঙলা দেশের প্রত্যেকেই ছোট্টখাট্ট জমিদার ও সেই সঙ্গে কেরাণী। বাঙলায় কংগ্রেস জোর পায়নি জনসাধারণ, অর্থাৎ কিষাণ-মজুরদের কাছ থেকে। অল্পদিনের মধ্যে কংগ্রেস-আন্দোলনে ভাঁটা পড়ল। দুটি সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স আন্দোলনই ব্যর্থ হল। দুর্ব্বলতা আবিষ্কারের চিহ্ন গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট।

ঠিক এই সময় দেশের মানসিক আবহাওয়া পরিবর্ত্তনের লক্ষণ দেখা যায়। পূর্ব্বোক্ত দুর্ব্বলতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনেক কিছুই বেরিয়ে পড়ল। জহরলালজী এই বিশ্লেষণে সাহায্য করেছিলেন, কিন্তু একটু ভাসাভাসা ভাবে। তিনি সোশিয়ালিজ্‌মের প্রধান মন্তব্যগুলি তাঁর অনবদ্য ভাষায় জাহির করলেন। কিন্তু তাঁর রচনায় ভেতরের কারণটি ধরা পড়ল না। কংগ্রেস যে স্বদেশী ধনিক-তন্ত্রের হাতে আত্মদান করেছে, এবং সেইজন্য যে Civil Disobedience অসার্থক হল—এ কথা তিনি বলতে সাহস পাননি। সেটা তাঁর ভদ্রতা ও ব্যক্তিগত লয়ালটি। কিন্তু সত্য কথা গোপন রইল না ছেলেদের কাছে। করাচি কংগ্রেস থেকে একাধিক যুবকের কাছে ব্যাপারটি পরিষ্কার হল। তাঁরাই এখনকার বামমার্গী, এবং তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে আধুনিক। এঁদেরই সঙ্গে পুরাতনের ঝগড়া। এঁরাই, অনেকের মতে, দেশের মজ্জাগত গুরুভক্তি, শ্রদ্ধা সব কিছুই ভাঙ্গতে বসেছেন।

আমি এই আধুনিকদের জানি। বয়সে তাঁরা অনেকেই ছোট। সেটা

কিন্তু বড় কথা নয়। বড় কথা হল 'সময়', তার চেয়েও, 'কাল'। অবশ্য কালের দর্শন এঁরা জানেন না—সেটা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু সেই কালের একটা গুণ অর্থাৎ গতি, যাকে ইতিহাস বলা হয় সেইটাকে তাঁরা আঁকড়ে ধরেছেন। আমাদের সঙ্গে এঁদের পার্থক্য এইখানে—আমরা কালাতিপাত করতাম, এঁরা কালের নিয়তি সম্বন্ধে সচেতন। সচেতন অর্থে বুদ্ধির খেলা নয়, মোটেই নয়, জীবনের অনুভব। জীবনের প্রধান বিকাশ কর্ম্মে, তাই কর্ম্মজীবনে যে অনুভূতি সম্ভব তারই সাহায্যে এঁরা সচেতন। আমরা চেতনা অর্থে মস্তিষ্কের ক্রীড়া বুঝতাম, এঁরা চেতনা অর্থে কর্ম্মান্তে যে প্রতীতি জমে ওঠে তাই বোঝেন। এটা মূলগত দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য।

তারপর উপসিদ্ধান্তগুলি সহজে এসে যায়। বুদ্ধির প্রাধান্য, তার স্বাধীন অস্তিত্ব, তার সর্ব্বকালীন সার্ব্বজনীন আইন-কানুন, সেই সঙ্গে বুদ্ধিমানের বিশেষ অধিকার—কোনো কিছুই আর মানা চলে না। তার বদলে স্বীকার করতে হয় ইচ্ছাশক্তি, কর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্যকে, ঘটনার বিশেষত্বকে, তার পারম্পর্য্যের দুর্নিবারতাকে, বস্তুজগতের অস্তিত্বকে, তার প্রাথমিকতাকে, মোটামুটি এই অঙ্গীকারগুলিই আজকালকার যুবকদের মানসিক প্রতিজ্ঞা। বলা বাহুল্য—আমরা এ-সব বুঝি না। আমাদের মধ্যে যাঁরা পণ্ডিত তাঁরা বুদ্ধির কূটতর্ক তুলি—দর্শনের গলদ দেখাই। তাতে এঁদের কিই বা আসে যায়। আমরা আফশোষ করেই যাব, এঁরা কাজ করেই যাবেন।

কাজ করতে হলে একলা হয় না। আমরা ভেবেছি একলাই কাজ করা সম্ভব, অবশ্য বড় বড় কাজ। এই সেদিন রবীন্দ্রনাথ আমাদেরই মনের কথা বল্লেন, 'আর্টিষ্ট ভীষণ একাকী।' আর্টিষ্ট যেকালে মানুষের মধ্যে দেবতা, তখন সাধারণ বুদ্ধিমানও ভীষণ নিঃসঙ্গ। কোনো আধুনিক একাকিত্বের সম্মান দিতে পারেন না। তিনি বল্লেন মাতৃগর্ভেও জীব একলা নয়, মৃত্যুর পরেও মহাত্মাদের সঙ্গ। ইতিমধ্যে মানুষ সামাজিক। কিন্তু সমাজ এক ধাতুর নয়, স্থাণু নয়। সমাজ চলে হোঁচট খেতে খেতে ক্ষিদের তাগিদে, সে-তাগিদ মেটাবার প্রক্রিয়ায়। সমাজ এই প্রক্রিয়ার অনুষঙ্গ, যার হাতে ক্রিয়াপদ্ধতি ন্যস্ত সেই হল নেতা। অতএব সমাজের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ স্কুলের ভাল

ছেলে মাষ্টারের নয়। তাই সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য হচ্ছে তাকে নতুন করে গড়ে তোলা। এই সৃষ্টিকার্য্যে যতটা জ্ঞানের প্রয়োজন ততটা নব্যতান্ত্রিক স্বীকার করেন। তারপর ? দেখা যাবে। আমাদের সমাজ ছিল যেন একটা বন্ধ দরজা, যার বিপক্ষে আমরা মাথা খুঁড়তাম। আমাদের বিরোধ ছিল প্রতিরোধ। দরজা খুললেই আমরা স্বর্গরাজ্য পাব, তারপর কি মজা! যা কিছু কষ্ট এই ঠেলাঠেলিতে। আজকালকার ছেলেরা বিরোধ অর্থে versus বোঝেন না, ক্রমবর্দ্ধমান পরিক্রমায় বিরোধের পরিধি ও গুণ বেড়ে চলেছে। তাই এঁদের মুখে চোখে, মনে কাজে শান্তি নেই। ভাববিলাসের সময় নেই এঁদের, গরীব দুঃখী খেতে পাচ্ছে না বলে নয়, (আমিও গায়ের শাল এক খোঁড়াকে দিয়েছি), বিরোধের অবসান নেই এই জ্ঞানে। বাড়িতে বাপ মা, স্কুলে মাষ্টারমশাই, কলেজে অধ্যক্ষ, বাইরে ধনিক, জমিদার গবর্ণমেণ্ট, সমাজে পণ্ডিতমশাই ও বৃদ্ধের দল। শান্তি কোথায়? তাই এঁরা বলেন শান্তি স্বার্থান্ধের আবিষ্কার।

এই মনোভঙ্গীতে যে যুক্তি আছে সেটা প্লেটোর নয় অ্যারিষ্টটলের নয়। নীচে থেকে এই যুক্তি ওপরে ওঠে প্রতিপদে ঘটনাকে শ্রদ্ধা জানাতে জানাতে। চোখ খুল্লেই দেখা যাচ্ছে সব মানুষ সমান অবস্থার নয়, কারুর সুবিধা আছে, কারুর নেই, কেউ বাপের কিংবা শ্বশুরের জোরে খায়, কেউ নিজের জোরেও দুবেলা দুমুটো খেতে পায় না। কেবল চাকরীর সুযোগ নয়, ক্ষিদে মেটাবার সাধারণ অধিকার এক শ্রেণীর আছে অন্য শ্রেণীর নেই। এ-সব প্রত্যক্ষ ঘটনা, যাদের দেখে চোখ ফেরান অন্ধের চিহ্ন। আমরা কিন্তু এদের রাজপথে ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতন দেখতাম। এই প্রত্যক্ষ অনুভূতির ওপরে যুবকদের যুক্তি গড়ে ওঠে। এইটাই মুখ্য, মানসিক বিচার গৌণ। আমাদের ছিল বিপরীত। অবরোহী যুক্তিতে প্রত্যক্ষটা ব্যতিরেক বড় জোর।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যা ছিল তা এঁদের নেই। কারণ তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীই পৃথক। অতএব অভাব-আফশোষের কথা ওঠেই না। অতএব পার্থক্যটা সত্যই আছে। এখন প্রশ্ন তার মূল্য কতটুকু।

মূল্যবিচারে নিজেকে সামলাতে হয় অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে। একেবারে বাদ দিলেই ভাল হয়, তবে সেটা একপ্রকার অসম্ভব। মূল্যবিচারের তত্ত্ব নিয়ে

আমি ২।৩ বছর নষ্ট করেছি, কোনো কূল-কিনারা পাইনি। পণ্ডিতের মতামত সব ভুলে যে-টুকু থিতিয়েছে সেটা কিম্ভূতকিমাকারের। তার মোদ্দাকথা এই; চিরন্তন মূল্য নেই, সেটা ঘুরতে ঘুরতে ওপরে ওঠে কিংবা নীচে নামে। উন্নতি অবনতি আদর্শ অনুসারে, আদর্শও স্থির নয়। তবে গতির একটা মোটামুটি নিয়ম আছে, সঙ্গে সঙ্গে আদর্শেরও। যে-ঘটনা গতিরোধ করে, যে-গতি প্রধান গতিপথের বাধা সৃষ্টি করে সে-ঘটনা ও সে-গতির মূল্য কম। অতএব আপেক্ষিকতার দিক থেকে পার্থক্যের মূল্যবিচার করতে হবে। বুদ্ধির বিচারে আধুনিক কর্ম্মবাদ প্রভৃতি টুকরো টুকরো করে দেওয়া যায়। কিন্তু যাঁরা বুদ্ধিবাদী নন তাঁদের কি ক্ষতি? মহা মহা অর্থশাস্ত্রবিদ্ যাঁদের মতামত না জানলে আধুনিক পণ্ডিত হওয়া যায় না তাঁরা তর্ক করে বলে দিয়েছেন planning, collective economy হয় না, কারণ দামের হিসেবে বাধে। এ-ধারে হয়ে গেল প্ল্যানিং, সব কিছু। অতএব যাঁরা বুদ্ধিবাদী না হয়েও বুদ্ধিমান তাঁদের তরফ থেকেই তাঁদের ও আমাদের পার্থক্যের মূল্যবিচার করতে হবে।

এধারে প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়ে গেল। তাই তাড়াতাড়ি শেষ করি। পার্থক্যের মূল্য খুবই বেশী। কারণ এর জন্য আমরা বাধা সৃষ্টি করছি ও তাঁরাই বাধা বোধ করছেন। দুটি মাত্র উপায় আছে—এক আমাদের আত্মহত্যা, আরেক তাঁদের আরো অগ্রসর হওয়া। তাঁদের অসম্পূর্ণতা যেদিন ঘুচবে সেদিনই আমরা হব অবান্তর। কল্পনা খাটিয়ে কি ভাবে তাঁরা অগ্রসর হতে পারেন বাৎলাতে পারি। নিশ্চয় ঠিক হবে না, হতে পারে না। বন্ধু আশা করি প্রবন্ধের এই অংশটুকু পড়বেন না। প্রয়োজন নেই কারণ আমার সমালোচনা তাঁর সম্বন্ধে খাটে না। ধারাবাহিক ভাবে আমার বক্তব্য সাজাচ্ছি।

(১) ধরা যাক্ বুদ্ধিটা সর্ব্বস্ব নয়, কিন্তু ঘটনার বিশ্লেষণের জন্য অন্য কোনো শক্তি অমন কার্য্যকারী নয়। ইতিহাস তৈরী করবার জন্য ব্রজেন্দ্র শীল না হলেও চলে, আবার নব্যনৈয়ায়িকও অবান্তর, কিন্তু ইম্পিরীয়ালিজ্‌ম, ক্যাপিট্যালিজ্‌ম, ফিউড্যালিজ্‌ম প্রভৃতি ধরতাই বুলিতে কি মাথা ঘুলিয়ে যায় না? ও-গুলো প্রায় হিং টিং ছটের মতন হয়ে উঠেছে। ঐগুলোর কি

প্রকৃতি এক? ব্যবসায় ও বাণিজ্যের ধনতন্ত্র কি এক প্রকার সমাজ তৈরী করে? মধ্য-য়ুরোপের ফিউড্যালিজ্‌ম আর রুশিয়ার ও ভারতের ফিউড্যালিজ্‌মের মধ্যে তফাৎ কি ও কতটুকু? রোমের সাম্রাজ্যবাদ আর এখনকার কি এক ধাতুর? মোটামুটি এক জানি। সে হিসেবে আমরা সবাই জানোয়ার। একটু কোথায় গরমিল আছে, সেটার জন্য সমাজগঠনও এক ছাঁচের হয় না। কতটা জোর দিয়ে এই বিশেষত্বকে ইতিহাসের নিয়মে ফেলা যায় এ-জ্ঞানটুকু না থাকলে যুবকরাই বিপদে পড়বেন—তাঁদের কাজেরই অসুবিধা হবে। যদি তাঁরা আরো একটু বেশী বিশ্লেষণ করেন তবে তাঁরা বুদ্ধিসর্ব্বস্ব হয়ে পড়বেন না নিশ্চয়, আরোহী-যুক্তি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হবে। আমার সন্দেহ হয়েছে যতটা inductive, history-minded ও বৈজ্ঞানিক নতুনত্ব তাঁদের কাছে দাবী করে ততটা মেটাতে পারছেন না। এটা ইচ্ছা করলেই পারা যায় কিন্তু। আমরা পারিনি, আমাদের দৃষ্টি ওধারে যায়নি, এঁরা পারছেন না, দৃষ্টিভঙ্গী আছে, কিন্তু দৃষ্টি তীক্ষ্ণ নয়। চোখ ভাল হলে যে চরিত্র-হানি হয় তা বোধ হয় ঠিক নয়।

(২) স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমার মনে হয় যুবকদের ধারণা এখনও অস্পষ্ট। স্বাধীনতা বলতে আমরা ডাইসী সাহেবের পুস্তকে যা লেখা আছে তাই বুঝতাম—অর্থাৎ নড়ে চড়ে বেড়াবার, যা তা কথা কইবার, যার তার সঙ্গে মেশবার, যা ইচ্ছে বেচা-কেনার স্বাধীনতার যোগফল। আমার সন্দেহ হয়েছে যে এর বড় বেশী ধারণা এখনও জন্মায়নি। মোদ্দা কথা এই—স্বাধীনতা সাম্যবাদের নেজুড় তখনও ছিল এখনও আছে। মৈত্রীর ভাবটা এখনও সুদৃঢ় হয়নি। হলে স্বাধীনতার বনাম-ভাবটা কেটে যাবে। সেজন্য সভা সমিতি ধর্ম্মঘট অনেক সব হচ্ছে, কিন্তু সেই মেক্যানিকাল ধরণে। নচেৎ এখনও প্রেমের কবিতা কাগজে বেরোয়। নভেলে নায়ক ভিনজাতের মেয়েকে বিবাহ করতে ক্ষেপে ওঠে! গলায় দড়ি! অবশ্য আমরা যা করতাম তার চেয়ে এঁরা শতগুণে পুরুষ। এঁরা বাঁচবার স্বাধীনতাও চান। দুঃখ এই, ভুলে যান যে ওঁরা না বাঁচলে আমরা বাঁচি না। বিশ্বাসটা মজ্জায় প্রবেশ করেনি—তাই এই রসগোল্লা মার্কা সাহিত্য। তাই বাধ্য হয়ে বিষ্ণু দে ও সুধীন্দ্র দত্ত কড়াপাকের কবিতা লেখে। সুধীন্দ্র জানে যে তার নিজের বাঁচা মরা চেকোস্লোভাকিয়ার ইতিহাসের ওপরও নির্ভর করে।

বিষ্ণু অতটা জানে না, যতটুকু জানে তাতেই সে সঙ্কুচিত হয়ে নিষ্ঠুরভাবে নিজেকে আঘাত করে, অভিমানীর মতন। দুজনেই পরাধীন, তাই মৈত্রী বন্ধনে স্বাধীন হতে চায়। অবশ্য স্বাধীন হতে পারলে না কেউই। তবে সুধীন্দ্র পথটা জানে। আমাদের সময় এই প্রকার দাম্ভিক কবিতা অসম্ভব ছিল। প্রসারের দম্ভ আমরা জানতাম না। কিন্তু সুধীন্দ্রের পর! মৈত্রী কোথায়? মোর তরে হায় বিশ্বভুবন মাঝে!

ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। মেয়েরা যেমন বলেন, "বেশ তোমরা খুব ভাল, আমরা খুব খারাপ, এই ত! আচ্ছা, দেখা যাবে!" এই বলেই প্রবন্ধ শেষ করি।

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

আগন্তুক

(ডীলান টমাস-কৃত 'দি ভীজিটার্' গল্পের অনুবাদ)

তার হাতদুটি অবসন্ন হ'য়ে পড়েছিল, যদিও সমস্ত রাত তারা বিছানার চাদরের ওপরেই শায়িত ছিল, এবং সে কেবল তাদের তার মুখ এবং অশান্ত হৃদয়ের কাছেই দু'একবার নিয়ে এসেছিল। হাতের শিরাগুলো,—অস্বাস্থ্যের পরিচায়ক নীল স্রোতস্বতীগুলো,—ব'য়ে চলেছিল চামড়ার শ্বেত-সমুদ্রে। তার পাশে ধার-ভাঙা একটি পেয়ালা থেকে বাষ্প উড়ে উড়ে দুধ ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল।

সে ভোর হবার গন্ধ পেল, এবং জানতে পারল যে প্রাঙ্গণের মোরগ পেছনে মাথা হেলিয়ে সূর্য্যের দিকে চেয়ে চীৎকার করছে। তার চার-পাশের ঐ চাদরগুলো কি?—মরা মানুষ ঢাকবার চাদর নাকি? ঐ দ্রুত-স্বর দেওয়াল-ঘড়ীটা, যা তার মা এবং মৃত-স্ত্রীর ফোটোর মাঝখানে শব্দ করছে, সেইটেই বা কী? সে কী কোনো পুরাতন শত্রুর কণ্ঠস্বর? সময়ের প্রবাহ সূর্য্যকে তার বিছানার কাছে রোদ দিতে দেবার মত যথেষ্ট সহৃদয় হ'ল, এবং নির্দ্দয়ও হ'ল এক সময়ে সেই সূর্য্যকে তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ে,—যে সময়ে সেই রক্ত-রশ্মি আর নির্ম্মল উত্তাপের অধিকতর প্রয়োজন হ'য়েছিল তার।

মিলীসেণ্ট যেন একজন মরা মানুষের শুশ্রূষার তত্ত্বাবধান করছিল।...আর এইবার সে পেয়ালার ভাঙা দিকটা একজোড়া প্রাণহীন ঠোঁটের কাছে তুলে ধরল।...পঞ্জরাস্থির নীচে যা' শব্দ করছিল, তা' হৃদ্‌পিণ্ড হ'তে পারে না কখনো। মৃত-দেহের ভেতর হৃদ্‌পিণ্ড স্পন্দিত হয় না। যে সময়টা সে মৃতকল্প হ'য়ে প'ড়েছিল, মিলীসেণ্ট সেই সময় বোধহয় একখানা হাত-ছুরী দিয়ে তার বুকটা কেটে ফাঁক ক'রেছে এবং হৃদ্‌পিণ্ডটা ছিঁড়ে বের ক'রে নিয়ে ঐ দেওয়াল ঘড়ীটার ভেতরে রেখে দিয়েছে।...সে মিলীসেণ্টকে এই তৃতীয়বার বলতে শুনল: 'এই চমৎকার দুধটুকু খেয়ে নাও দেখি।' তারপর খানিক না যেতেই তার জিহ্বার ওপর দিয়ে সেই দুধকে অর্দ্ধ-অম্ল স্বাদের সাথে গড়িয়ে যেতে অনুভব ক'রে, আর মিলীসেণ্ট হাত দিয়ে তার কপাল বুলিয়ে দিচ্ছে টের পেয়ে সে বুঝতে পারল যে, সে ম'রে যায়নি'। সে একটি জীবিত মানুষ। তার মনে হ'ল, শুকনো

দিনগুলোকে ঘুরে ঘুরে বহু যোজন বেয়ে মাসগুলো যেন বছরে মিলিয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ।

কলাগ্‌হান,—যাকে রোজ রাতেই সে স্বপ্নে দেখতে পায়,—হয়ত আজো তার কাছে বসবে, আর তার সাথে গল্প করবে। সে তার মস্তিষ্কের ভেতরে কলাগ্‌হান আর মিলীসেন্টের কণ্ঠস্বরকে যুদ্ধ করতে শুন্‌তে পেল; এবং একসময় তাদের কথাগুলোর রক্তের স্বাদ পেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।...তার হাত দুখানি অবসন্ন হ'য়ে পড়েছিল। পাশে পঞ্জরাস্থি লাগানো আছে এটা লক্ষ্য ক'রে ক'রে সে তার দীর্ঘ শাদা দেহকে কঙ্কাল অবস্থায় ভাবতে লাগল। ঐ হাতদুটো অন্যলোকের হাত ধ'রে বলের মত শূন্যে ছুঁড়ে ফেল্‌তে পেরেছে। এখন ওরা মরা হাত। সে ওদের অনড়ভাবে তার পেটের ওপর ভাঁজিয়ে রাখতে পারত, অথবা তার চুলের ভেতরে নাড়াচাড়া করতে পারত, অথবা এলিয়ে দিতে পারত মিলীসেন্টের দুই স্তনের মাঝখানের শুভ্র উপত্যকায়। সে ওদের নিয়ে যা খুশী করত, কিছু এসে যেত না। এখন ওরা ঠিক ঐ ঘড়ীর কাঁটার মত মরা, আর ঐ ঘড়ীর কাঁটার মতোই প্রাণহীন ভাবে নড়ছে।

'রোদটা আরেকটুকু তেজালো না হওয়া পর্য্যন্ত জানালা কী বন্ধ ক'রে রাখব?' মিলীসেন্ট বলল।

'আমার ঠাণ্ডা বোধ হ'চ্ছে না।'

সে তাকে বলতে পারত যে মরা মানুষ ঠাণ্ডা বা গরম অনুভব করতে পারে না,—রোদ আর হাওয়া তার কাপড়-চোপড় ভেদ করে ঢুকতে পারে না। মিলীসেন্ট হয়ত এতে তার স্বভাবসিদ্ধ সদয়তার সাথে একটু হাসত, আর তার কপালের ওপর একটা চুমো রেখে বলত, 'পেটার, এত হতাশ করছে তোমাকে কীসে? সকালেই সেরে উঠে ফের ঘুরে ফিরে বেড়াতে পারবে।'

হায় একদিন সে আবার যারাভিস্‌ পাহাড়ের ওপর একটা বালকের প্রেতাত্মার মত ঘুরে ফিরে বেড়াতে পারবে, আর শুন্‌তে পাবে, লোকে বলছে: 'ওখানে ঘুরে বেড়ায় পেটারের, একজন কবির, ভূত; সে মরে গিয়েছিল লোকে যখন তাকে কবর দেয় তার বহু আগে।'

মিলীসেন্ট তার কাঁধ ঘিরে চাদর জড়িয়ে দিল, এবং একটি প্রভাত-চুম্বন দিয়ে ধার-ভাঙা কাপটা নিয়ে বাইরে চলে গেল।

কোনো লোক যেন তুলি দিয়ে সূর্য্যের নীচে একটা রঙের পাঁজরা টেনে দিয়েছে, আর সূর্য্যের বৃত্তকে ঘিরে এঁকে দিয়েছে বহু বৃত্ত। মৃত্যুকে যেন মনে হচ্ছিল গাছ-ছাঁটা কাঁচি হাতে একজন মানুষের মত; কিন্তু সেই নিদারুণ গ্রীষ্মের দিনে ছাঁটবার মত কোনো গাছ আর অবশিষ্ট ছিল না।

উত্থানশক্তি-রহিত মুমূর্ষু লোকটি তার আগন্তুকের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।—অর্থাৎ, পেটার প্রতীক্ষা করতে লাগল কলাগ্‌হানের জন্য।... তার কক্ষটিকে সে বিশাল বহির্জগতের মধ্যে আরেকটি ক্ষুদ্র জগৎ বলে মনে করল। এবং তারপরই তার মনের ভেতরে সেই জগৎটি ঘুরে ঘুরে চলতে লাগল; আর, একটা নতুন সূর্য্য উঠল সেখানে এবং একটা চাঁদ গেল ডুবে।... কলাগ্‌হান যেন ছিল পশ্চিমের বাতাস, আর মিলীসেন্ট 'টাহিটি'র হাওয়া, যা পশ্চিমের বাতাসের শৈত্যটা দেয় দূর ক'রে।

সে তার হাতখানাকে মাথার ওপর রাখল,—পাথরের ওপর পাথর! মিলীসেন্টের কণ্ঠস্বর আর কখনো এতো দূরান্তের বলে বোধ হয়নি যতখানি হ'য়েছিল 'টক্‌ দুধটুকু খেতে কী চমৎকার' এই কথা বলবার সময়ে। সে (মিলীসেন্ট) কী তবে কেবল নিছক প্রণয়িনীর মত পোষাকের কফিনে ঢাকা তার প্রণয়ীর কাছে পাগলের প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করছিল?...নিশ্চয়ই কেউ তাকে রাতে ধ'রে উল্‌টিয়ে দিয়েছে, আর, একটা ঝুটো হৃদ্‌পিণ্ড ছাড়া অন্য সবই ঝেড়ে ফেলেছে তার ভেতর থেকে। বক্ষ-পঞ্জরের নীচে ঐ যন্ত্রটা তার নিজের নয়; পায়ের ধমনীর ধাক্কাটাও তার নিজের গায়ে অনুভূত হ'চ্ছে না। তার বাহুদুটি আর নড়া-চড়া করতে পারে না; বাতাস বা দস্যুর হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য কোনো কুমারী মেয়েকেও তারা বেষ্টন করতে পারবে না কখনো। পৃথিবীতে তার নিজের নাম ছাড়া অন্য কিছুই এত সুদূরের ব'লে বোধ হচ্ছিল না; আর, কবিতা যেন সূক্ষ্ম তারের মত একটা 'বীন' গাছের ছড়ির ওপর সাধা আছে ব'লে বোধ হ'ল। সে তার ঠোঁট দিয়ে শব্দের একটা ছোট গোলককে কোনো রকম একটা আকৃতিতে ঘুরিয়ে নিল, আর একটা কথা উচ্চারিত হ'ল তারই ফলে।

মৃত মানুষের কোনো আগামী কাল নেই। সে ভাবতে পারছিল না যে, কফিনের ফাটলের কোন ফুলের মত জীবন আবার আগামী রাত্রি এবং তার নিদ্রার পর বিকশিত হ'য়ে উঠবে কখনো।

তাকে ঘিরে তার ঘরটা,—সে ভাবতে লাগল,—যেন একটি বিরাট জায়গা। এই জায়গাটির চারিপাশের ফ্রেমগুলো থেকে স্ত্রীলোকের বহু রকম দেওয়ালে-শায়িত প্রতিকৃতি তার মুখের ওপর ঝুঁকে চেয়ে ছিল। ঐটে হ'চ্ছে তার মায়ের মুখ,—ঐ যে পাকা-সোনার ফ্রেম আর বিরল-কেশের ভেতর ঈষৎ হলুদ রঙের ডিম্বাকৃতি মুখখানি। আর তারই পরেরটা হ'চ্ছে মেরীর। যদিও মৃত্যুর দূত কলাগ্‌হান মেরীকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে বহুদিন আগে, তবু দেওয়ালের ঐ মেরী মরণকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেনি।—সে মেরীকে ভাবতে লাগল, মেরী যেমন যেমন করত ঠিক সেই রকমে। কিছুক্ষণ পরে তার যেন মনে হল, মেরী বলছে; 'প্রিয়, পেটার। প্রিয়তম।' আর তার হাসি-হাসি চোখ দুটি স্থির হ'য়ে আছে তার মুখের ওপর।

তার মনে পড়ল, সেই রাত্রির পর থেকে সে আর হাসেনি,—সাতবছর আগে,—যখন তার মর্ম্মতল এত তুমুল ভাবে বিচলিত হ'য়েছিল যে, সে তার ফলে পড়ে গিয়েছিল মাটিতে। সেদিন মেঘশ্রেণীর অর্থ ছিল আরো গূঢ়তর। সূর্য্যের অবিশ্বাস্য অস্তগমনের মধ্যে শক্তি-সঞ্চারিত হ'ত তখন। পাহাড় আর ছাদের ওপর দিয়ে দিয়ে বিস্তীর্ণ চাঁদগুলো চলে যেত; আর গ্রীষ্ম আসত বসন্তের পরে।...কেমন ক'রে সে মোটেই বেঁচে থাকতে পেরেছিল মেরী মারা যাবার পর সেই ক'টা দিন, যখন মৃত্যুদূত কলাগ্‌হান বিকট শব্দে পৃথিবীর জোয়ারগুলোকে উড়িয়ে তাড়িয়ে দেয়নি, আর মিলীসেণ্ট তার কমনীয়তা বিস্তার করেনি তার চারপাশে? কিন্তু মৃতের কোন বন্ধু-বান্ধবের দরকার হয় না।...কফিনের বাঁকানো ঢাকনীর দিকে সে স্তিমিত দৃষ্টিতে চাইল।—শক্ত আর সোজা একটা মোমের মানুষ যেন চাইল। তার মুমূর্ষু চোখদুটি থেকে শেষ সম্বলটুকু নিয়ে সে কল্পনায় তার নিজের মুখের ওপর চাইল।

'খুব তাসের ঘর বানিয়ে চল সংসারে', সে বলেছিল, 'যতক্ষণ না আমি আমার ফুসফুসের এক 'বেলো'তে তোমার নড়বড়ে ঘরগুলি মাটিতে উড়িয়ে ফেলি।'...যখন মেরী এল, তখন পর-পর দিবসগুলির পরিবর্ত্তনের মাঝখানে কেবল তাকে ঘিরে যে স্বর্গীয়তা রচনা করেছিল সে, তা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। গর্ভাবস্থায় তার ভ্রূণ মেরে ফেলল মেরীকে। এবং, এই কথা মনে হ'তেই সে অনুভব করল তার শরীর যেন বাষ্পে পরিণত হ'য়েছে; আর যে-সব

লোক হাওয়ার মত হালকা ভাবে ঘুরে বেড়াত, জুতোতে ভারী ধাতু লাগিয়ে তারা তার দেহের ভেতর দিয়ে ও দেহকে ছেড়ে বহুদূরে চলাচল করছে।

সে কাঁদবার উপক্রম করল। 'মিলীসেণ্ট, মিলীসেণ্ট, কে যেন আমাকে আমার বুকের পাশটাতে ধাক্কা আর লাথি মারছে। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে আমার ভেতরে। মিলীসেণ্ট!' সে আর্ত্তস্বরে ডাকল।

মিলীসেণ্ট তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে এল, এবং বারবার ক'রে তার পোষাকের হাতা দিয়ে তার গালের ওপর থেকে অশ্রুবিন্দুগুলো মুছে দিতে লাগল।

সে চুপচাপ প'ড়ে রইল, আর সকালটা বেড়ে বেড়ে সুন্দর দুপুরের ভেতর পূর্ণতা পেল। মিলীসেণ্ট ঘরের ভেতর আসা যাওয়া করতে লাগল; এবং যখন এক সময়ে চাদরটা গুছিয়ে দিতে যেয়ে তার দেহের ওপর ঝুঁকে পড়ল সে, তার পোষাকের থেকে দুধ আর ক্লভারের গন্ধ পাওয়া গেল যেন। এক রকম অদ্ভুত বিস্ময়ের সাথে সে ঘরের ভেতরে মিলীসেণ্টের শান্ত চলা-ফেরা অনুসরণ করতে লাগল; দেখতে লাগল ঝাড়নের দিকে চেয়ে যখন মৃত মেরীকে তার ফ্রেমের মধ্যে ঝাড়তে লাগল। এই রকম বিস্ময়ের সাথেই—সে ভাবল—হয়ত মৃতেরা চলিষ্ণুদের ঘোরা-ফেরা অনুসরণ করে, জীবন্ত চামড়ার নীচে সতেজ স্ফূর্ত্তিকে লক্ষ্য ক'রে ক'রে। অগ্নিস্থান থেকে বাতায়নে যেতে-যেতে মিলীসেণ্ট গান করুক কি জিনিস-পত্রগুলো গুছিয়ে রাখুক, অথবা তার কাজকে ঘিরে ঘিরে ভ্রমরের মত গুন্-গুন্ করুক। কিন্তু যদি সে কথা বলে, কিম্বা, উচ্চহাসি হাসে, অথবা মোমবাতি-দানীর পাতলা ধাতুতে নখ ঠেকিয়ে ঘণ্টার মত টিং টিং আওয়াজ করে, বা ঘরটি যদি হঠাৎ পাখীর কলরবে চকিত হ'য়ে ওঠে, তবে হয়ত সে আবার কেঁদে ফেলবে। বিছানার চাদরের অনড় ঢেউগুলির দিকে চেয়ে থাকতে তার বেশ লাগছিল; আর, সেই সমুদ্রের মধ্যে নিজকে সে একটা দ্বীপ ব'লে ভাবতে লাগল।—এই মূল্যবান আর অদ্ভুত গাছ-পালায় ভরা দ্বীপটির ওপরে যেন তরুশ্রেণী থেকে নানারকম ডাঁসা ফল ঝুলছিল; এবং—আপেলের চাইতেও ছোট সেই ফলগুলি—মৃদু মৃদু বাতাসের সাথে বোঁটা থেকে মাটির ওপর খ'সে খ'সে পড়ছিল। ঐখানে হয়ত ওরা চুপচাপ প'ড়ে থাকবে, আর—সে ভাবল—চাই কী গরমকালে শামুকদের আশ্রয়দাতাও হ'য়ে উঠতে পারে।

তারপর সে দ্বীপটি তার দক্ষিণ দিকের কুঠুরীর কোনো জায়গায় স্থাপিত আছে মনে ক'রে নিয়ে জলের কথা ভাবতে লাগল, এবং সঙ্গে সঙ্গে জল খাওয়ার ইচ্ছা হ'ল। মিলীসেন্টের পোষাক, যা তার দেহকে ঘিরে খস্-খস্ করছিল, জলের মত মৃদু আওয়াজ করল। সে মিলীসেন্টকে তার কাছে ডাকল এবং জলকে হাত দিয়ে অনুভব করবার জন্য পোষাকের গায়ে আঙুল দিয়ে স্পর্শ করল। 'জল!' সে মিলীসেন্টকে বলল। এবং আরো বলল যে, তার বাল্যকালে সে কেমন 'যারভিস্' পাহাড়ের কঠিন পাথরের ওপর পড়ে থাকত, আর তার আঙুলগুলো দিয়ে ঝরণার কুঞ্চিত ঢেউগুলোকে অনুভব করত।··· মিলীসেন্ট তার জন্য এক গ্লাস জল আনল, এবং গ্লাসটা তার চোখের সামনা-সামনি এমন ভাবে উঁচু ক'রে ধরল যাতে সে ঘরটাকে একটা জলের ব্যবধানের ভেতর দিয়ে দেখতে পারে। জলটা সে আর খেল না, মিলীসেন্ট গ্লাসটি পাশে নামিয়ে রাখল···তারপর, দুপুরের পরেই, সে মনে করল এটা যেন একটা গরমের দিন; এবং জল পাবার জন্য ইচ্ছে হ'ল তার। এত জল চাই তার যাতে সে তাকে ঘিরে ওপরে নীচে সমস্ত জায়গাটা সেই জল দিয়ে বন্ধ করতে পারে;—এবার আর জলের ওপরে কোনো দ্বীপ হওয়া নয়, এবার হ'তে হবে জলের নীচের একটা শ্যামল প্রান্তর, আব্ছা কোনো গুহাকে ঘিরে সুস্পষ্টভাবে অবস্থান করছে যা।···সে কতকগুলো স্নিগ্ধ 'কথা'র বিষয়ে ভাবতে লাগল, এবং সেই হ্রদের নীচের কোনো অলিভ গাছের কাছে তা' দিয়ে একটা লাইন রচনা করল। কিন্তু, কিছুক্ষণ পরেই গাছটা হ'য়ে গেল একটা কথার গাছ, আর হ্রদটা অন্য কথা-দ্বারা তার মিল দিয়ে দিল।

'ব'সে আমাকে কিছু প'ড়ে শোনাও মিলীসেন্ট!'

'তোমার খাওয়া হ'লে পরে', মিলীসেন্ট জবাব দিল। এবং, কিছুক্ষণ পরেই তার খাবার নিয়ে এল। সে ভাবতে পারছিল না যে মিলীসেন্ট নিজে রসুইখানায় গিয়ে স্বহস্তে তার জন্য খাবার তৈরী করেছে। মিলীসেন্ট কিন্তু সত্যাই রসুইখানায় গিয়েছিল। আর ফিরে এল ঠিক ততখানিই সাদাসিধে ভাবে যতখানি আমরা ভাবতে পারি বাইবেলের ওল্ড্ টেষ্টামেন্টের কোনো পল্লিবালিকার সম্বন্ধে। তার নামের কিছু ব্যাখ্যা ছিল না। শুধুই একটা স্নিগ্ধ শব্দ। বাইবেলের ভেতরকার একটা অদ্ভুত রকমের নাম ছিল

মিলীসেন্টের। হয়ত এই রকমই কোনো স্ত্রীলোক 'আশীর্ব্বাদ-দশকে'র মত স্নিগ্ধ ও দক্ষ দশটি আঙুল দিয়ে খ্রীষ্টের ক্ষতগুলোকে স্পর্শ করেছিল এবং তাঁর দেহটি ক্রুসের থেকে নামিয়ে নেবার পর ধুয়ে দিয়েছিল। সেও আজ মিলীসেন্টকে বলতে পারত, 'কোনো মধুর গুল্ম আমার হাতের নীচে রাখ। তোমার লালা-দ্বারা আমাকে সুগন্ধ-যুক্ত কর।'

'কী তোমাকে প'ড়ে শোনাব?' মিলীসেন্ট অবশেষে তার পাশে এসে ব'সে এই কথা বলল।

সে তার মাথা নাড়াল, লক্ষ্য করল না মিলীসেন্ট কী পড়ছিল। এবং যতক্ষণ সে তাকে কথা বলতে দেখতে পেল, কেবল তার বিশিষ্ট উচ্চারণ-ভঙ্গীটাই বারবার ক'রে লক্ষ্য করতে লাগল।

"Oh, gentle may I lay me down, and gentle rest my head,
And gentle sleep the sleep of death, and gentle hear the voice
Of him, that walketh in the garden in the evening time...."

মিলীসেন্ট প'ড়ে চলতে লাগল যতক্ষণ না পেটার নিদ্রাতুর হ'য়ে পড়ল। মৃত্যু তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর ছড়িয়ে পড়ল আবার, এবং সে তার চোখদুটি বন্ধ করল। বেদনা বা মরণের আকৃতির হাত থেকে কোনো স্বস্তি পাওয়া গেল না,—তারা তন্দ্রাভারাক্রান্ত আঁখি-তারকার সেই তমসাচ্ছন্নতার ভেতরেও তাদের পরিচিত প্রক্রিয়ার কাজ ক'রে চলল।

'তোমাকে কী আমি চুমু দিয়ে জাগিয়ে দেব?'—কলাগ্হান বলল। তার ঠাণ্ডা হাত ন্যস্ত ছিল পেটারের হাতের ওপর।

'আর, সব কুষ্ঠরোগাক্রান্ত লোকেই চুমু দিয়েছে।'—পেটার বলল। এবং ব'লে আশ্চর্য্য হ'য়ে ভাবতে লাগল, কী মনে ক'রে সে একথা বলল!

···মিলীসেন্ট দেখল যে, সে আর তার কথা শুনছে না; পা টিপে টিপে বের হ'য়ে গেল ঘর থেকে।···

কলাগ্হান,—একা সে-ই কেবল ছিল এখন,—বিছানার ওপর হেলান দিয়ে বসল, এবং তার আঙুলের নরম ডগাগুলো পেটারের চোখের ওপর ছড়িয়ে দিল। 'এবার রাত্রি হোল', সে ব'লল, 'আজ রাত্রে কোথায় যাব আমরা?'

পেটার তার চোখ দুটো আবার খুলল; দেখল, সেই ছড়ানো আঙুলগুলো

আর মোমবাতিগুলো তার চাদরের কাছে পপিফুলের পাপড়ির মত শোভা পাচ্ছে। কেমন একটা ভয় আর বিস্ময়ের ভাব যেন কক্ষের মধ্যে বিরাজ করছিল।

মোমবাতিগুলো কখনোই নেবানো হবে না, সে ভাবল। আলো থাকতেই হবে ঘরে। আলো, আলো, আলো! সল্‌তে আর মোম কখনোই পুড়ে ক্ষ'য়ে আসলে চলবে না। সমস্ত দিন, আর সমস্ত রাত ধ'রে ঐ তিনটি মোমবাতি তিনটি কিশোরীর মত আমার শিয়রের কাছে লজ্জা পেতে থাকবে। এই তিনটি লজ্জারক্ত কুমারী মেয়েকে নিশ্চয়ই আমায় আশ্রয় দিতে হবে।...

প্রথম শিখাটি নাচতে সুরু করল, তারপর নিভে গেল। দ্বিতীয় আর তৃতীয় শিখার ওপরে কলাগ্‌হান তার ধূসর মুখটা কুঞ্চিত ক'রে ফুৎকার দিল। কক্ষটি অন্ধকার হ'ল। 'কোথায় আমরা আজ রাত্রে যাব?'—কলাগ্‌হান আবার জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু কোনো উত্তরের জন্য আর এবার প্রতীক্ষা করল না, চাদরটা সরিয়ে দিয়ে বাহু-বেষ্টনে তুলে নিল পেটারকে। তার কোটটা পেটারের মুখের ওপর পড়লে সেটা তার কাছে আর্দ্র আর আরামপ্রদ ঠেকল।

'ও কলাগ্‌হান, কলাগ্‌হান!' পেটার বলে উঠল। অনুভব করতে লাগল সে কলাগ্‌হানের দেহের নড়াচড়া, তার আঁটসাঁট ভাব, মাংসপেশীগুলোর দ্রুত চলাচল, স্কন্ধদ্বয়ের বঙ্কিম ভঙ্গী, চলিষ্ণু পৃথিবীর ওপর তার পদদ্বয়ের সংস্পর্শ। পৃথিবীর গর্ভস্থ কর্দ্দম ও চূর্ণের ভেতর থেকে উঠে-আসা একটা বাষ্প-বায়ুর ঝাপটা এসে পড়ল তার মুখের ওপর। আর কেবলমাত্র তখনই সে বুঝতে পারল যে সে উলঙ্গ, যখন নানারকম গাছের শাখা-প্রশাখা তার পিঠের ওপর দিয়ে সুড়-সুড়ি দিয়ে দিয়ে চলতে লাগল। যাতে সে চীৎকার ক'রে কাঁদতে না পারে, কলাগ্‌হানের গাত্র-চর্ম্মের একটা সাঁৎসেতে ভাঁজের ওপর সে তার ঠোঁট দুটোকে চেপে বন্ধ ক'রে রাখল। কলাগ্‌হানও উলঙ্গ ছিল শিশুর মত।

'আমরা উলঙ্গ কেন?' পেটার বলল।

'আমরা কী উলঙ্গ? আমাদের লজ্জা নিবারণের জন্য আমাদের অস্থিগুলো আছে, ইন্দ্রিয়াদি আছে, ত্বক্ আছে এবং মাংস আছে। তারপর ধর, তোমার চুলের সাথে বাঁধা সমস্ত-দেহে-ছড়িয়ে-পড়া একটা রক্তের রীবন্ রয়েছে। ভয় পেও না। তোমার উরুদ্বয়কে বেষ্টিত করে শিরা আর ধমনীর কাপড় জড়ানো আছে, লক্ষ্য কর।'

পৃথিবী অদৃশ্য হ'য়ে গেল; বাতাস এত নিষ্কম্প হ'ল যাতে মনে হ'তে লাগল সেখানে কিছুই নেই। পেটার পাখীর গান শুন্‌তে পেল, কিন্তু এরকম গান তার জ্ঞাতসারে পাখীর কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হয়নি কখনো।—তার শয়ন-কক্ষের বাতায়ন থেকে যে গান শোনা যেত, সে অন্য রকম।

'পাখীগুলো যেন সব অন্ধ হয়ে গেছে!'

'সত্যই কী ওরা অন্ধ?' কলাগ্‌হান জিজ্ঞাসা করলে, 'তাদের চোখের ভেতরেই একটা জগৎ পেয়েছে তারা। তাদের কূজন-ধ্বনির ভেতরেই আলো ছায়া খেলা করছে। ভয় পেও না। উজ্জ্বল চোখ থাকে তাদের ডিম থেকে ফুটে বেরোবার আগেই।...'

সে হঠাৎ এক জায়গায় থেমে গেল। পেটার তখন হ'য়ে পড়েছিল পালকের মত হাল্‌কা; এবং এই হাল্‌কা লোকটিকে সে সযত্নে একটা শ্যামল ভূ-গোলকের ওপর রেখে দিল।...নীচে নানাপ্রকার অদ্ভুত আকারের গাছ আর ঘাসে ভরা শীর্ণ এক ফালি উপত্যকা পথের মত বহুদূর পর্য্যন্ত এঁকে বেঁকে চলে গিয়েছে,—বহুদূরে, এত দূরে যেন মনে হচ্ছিল জমানো আঁধারের মধ্যে চাঁদ যেখানে অদৃশ্য সুতোয় ঝুলছিল আকাশে, ঠিক সেইখানে গিয়ে শেষ হ'য়েছে। দু'পাশের বনানী থেকে বন্দুকের তীক্ষ্ণ আওয়াজ আসছিল, এবং চমৎকার পালক-ওয়ালা ছোট ছোট ফেজান্ট পাখী বৃষ্টির মত ঝুপ্ ঝুপ্ করে ঝ'রে পড়ছিল। কিন্তু অনতি-বিলম্বেই রাত্রি নিস্তব্ধ হ'ল; কলাগ্‌হানের পায়ের নীচে যে শব্দ হচ্ছিল, তাও মিলিয়ে এল ক্রমশঃ।

পেটার তার রোগাক্রান্ত হৃদ্-যন্ত্রের কথা স্মরণ ক'রে বক্ষ-পার্শ্বে হাত রাখল কিন্তু সেখানে কোনো চামড়া বা মাংস আছে ব'লে মনে হ'ল না তার। শুধু সঞ্চালিত রক্ত তার আঙুলের ডগাগুলোকে ঘিরে ঘিরে অস্পষ্ট শব্দ করতে লাগল, কিন্তু শিরা বা ধমনী কিছু দেখতে পেল না সে। পেটারের ভূত সেই রক্তের ভূতের দ্বারা আহত হ'য়ে গোলকটির ওপর উঠে দাঁড়াল, এবং বিষাক্ত রাত্রির দিকে আশ্চর্য্য হ'য়ে চেয়ে রইল।

'এটা কোন্ উপত্যকা' পেটারের স্বর উচ্চারণ করল।

'যারভিস্ উপত্যকা', কলাগ্‌হান বলল। তার কঙ্কাল, এমন কি এক গাছি চুল পর্য্যন্ত তীর্য্যক তুষার-পতনের দ্বারা বিচলিত হ'ল না;—স্থির হ'য়ে পড়ে রইল সে।

'এটা যারভিস্ উপত্যকা নয়।'

'এইটেই সেই উলঙ্গ উপত্যকা।'

চাঁদ তার জ্যোৎস্নাকে প্রখর থেকে প্রখরতর করে তুলল, এবং দেখা যেতে লাগল গাছগুলির শাখা-প্রশাখা-মূল-বল্কলগুলি সমস্তই ;—দেখা যেতে লাগল, ঝোপের মধ্যের ব্যস্ত মূষিকগুলোকে, প্রস্তরখণ্ডগুলোর নানারকম আকৃতিকে (তাদের নীচে পিঁপ্‌ড়ে চলাচল করছে।), ঝরণার মধ্যের উপলখণ্ডগুলোকে, গোপন তৃণগুচ্ছকে, এমন কি তাদের পাতার নীচের সর্ব্বনেশে পোকাগুলোকে পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল। বড় বড় ইঁদুর আর 'উইজ্‌লগুলো' বেরিয়ে এল (জ্যোৎস্নায় তাদের লোম দেখা যাচ্ছিল শাদাটে রঙের) পাহাড়ের উদরদেশের গর্ত্তগুলো থেকে। পরস্পর মৈথুন আর মারামারি করতে লাগল তারা ; কখনো বা পাহাড়ের ঢালুতে হুড়মুড় ক'রে দৌড়-ধাপ করতে লাগল,—জীবন্ত গরু-মোষগুলোর গলায় দাঁত বসাবার জন্য! কিন্তু যেই গরু-মোষগুলো আহত হ'য়ে মাটিতে প'ড়ে গেল আর ইঁদুর উইজ্‌লগুলো পড়ি মরি ক'রে ছুটে পালাল, অমনি উপত্যকার গোবরের স্তূপ থেকে কুয়াশার মত একপাল পোকা উড়ে এসে জানোয়ারগুলোকে ছেয়ে ফেলল একেবারে। সেই নিতান্ত উলঙ্গ উপত্যকা থেকে যেন মৃত্যুর গন্ধবাষ্প উঠতে লাগল, আর চাঁদের পাহাড়ময় নাসিকারন্ধ্র বিস্ফারিত হ'য়ে উঠল তাতে। এবার আবার মেষগুলো পড়ল মাটিতে, আর পোকাগুলোও অমনি ছেয়ে ফেলল তাদের।...ইঁদুর আর উইজ্‌লগুলো মাংস নিয়ে কাড়া-কাড়ি ক'রতে ক'রতে মেষগুলোর লোমের মধ্যেকার কীটের কামড়ে ভূপতিত হ'ল একে একে।...প্রবল বাতাস বইতে লাগল। কীটেরা পশুগুলোর হাড় থেকে সযত্নে ও সোৎসাহে তন্তুর বাঁধনগুলো খুলে দিতে লাগল ; আর সাথে সাথে ফাঁকগুলোর ভেতর থেকে আগাছা গজিয়ে উঠতে লাগল, এবং তাদের সজীব পল্লবের ওপর কঙ্কালগুলোর যে সব জায়গায় আগে স্তন ছিল সেই সব জায়গা ঘিরে ঘিরে মৃত্যুর মত বর্ণ নিয়ে রাশি রাশি ফুল ফুটে উঠতে লাগল। পশুগুলোর মৃত্যুর আগে যে রক্ত তাদের

গা থেকে ঝ'রে প'ড়েছিল, তা মাটির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হ'য়ে তৃণগুচ্ছকে চাঙ্গা ক'রে ঝরণার উৎপত্তিস্থল পরিপূর্ণ ক'রে দিল। হঠাৎ সমস্ত স্রোতস্বতীগুলো লাল হ'য়ে উঠল,—স্তূপীকৃত-উপলখণ্ডকে-ডিঙিয়ে-ডিঙিয়ে-যাওয়া অজস্র চলিষ্ণু শিরাতে সমস্ত প্রান্তরটা ছেয়ে গেল।

পেটার, তার ভৌতিক অবস্থায়, উল্লাসে চীৎকার ক'রে উঠল। তার উলঙ্গতার ভেতর, উপত্যকার বীভৎসতার ভেতর একটা জীবনের স্বাদ পেল সে। পূর্ণ-যৌবনাঙ্গী স্রোতস্বতীগুলোকে সে পর্য্যবেক্ষণ করতে লাগল ; এবং পশুগুলোর শবের গায়ে ফুল, আর রক্তস্রোতে পরিপুষ্ট তৃণগুচ্ছকে দেখে তার আনন্দও বোধ হ'তে লাগল।

এইবার স্রোতস্বতীগুলো স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়াল। মাড়িয়ে যাওয়া মৃতদেহের ধূলিরাশি ঝরণার ওপর উড়ে উড়ে পড়তে লাগল ক্রমশঃ, আর তাতে তাদের উৎসগুলো সব বন্ধ হ'য়ে গেল। রাশি রাশি ধুলো কালো রঙের তুষার-স্তূপের মত ভাসতে লাগল সমস্ত জলের ওপর। আলো, যা মুক্তধারায় প্রবাহিত হচ্ছিল এতক্ষণ, চাঁদের জ্যোৎস্নার ভেতর জমাট বাঁধ্‌ল এইবার।

'এই বীভৎস উলঙ্গতার ভেতর জীবন', তার পার্শ্বস্থিত কলাগহান বিদ্রূপ করল। এবং আত্ম-সম্বরণ ক'রে পেটার বুঝতে পারল যে সে তার নিষ্প্রাণ আঙুল দিয়ে নীচের মরা নদীগুলোর দিকে সংকেত ক'রে রয়েছে। কিন্তু যেই সে কথা বলল, (এই সময় পেটারের হৃদ্‌পিণ্ড তার মৃত্যুর পূর্ব্বেকার আকৃতি নিয়ে আতঙ্কে ধড়ফড় করছিল) এক নতুন জীবন উপলরাশির ভেতর থেকে অজস্র প্রাণশক্তির মত একটা বালকের আকৃতি নিয়ে প্রসূত হ'ল পৃথিবীতে।... আবার স্রোতস্বতী তার নিজের পথ ব'য়ে চলল। আর, চাঁদের কিরণ এক নতুন ঔজ্জ্বল্যের সাথে প্রতিভাত হ'তে লাগল উপত্যকাতে। ছায়াগুলো সব গভীরতর হ'ল, আর ছোট ছোট মূষিক আর 'ব্যাজারের' দল তাদের শীতাবাস ছেড়ে সেই জ্যোৎস্নার আকর্ষণে পৃথিবীর মৃত্যুহীন মধ্যরাত্রির অঙ্গনে এসে দাঁড়াল স্তব্ধ হ'য়ে।

'পাহাড়ের ওপর আলো ভেঙে পড়েছে যেন।'—কলাগ্‌হান এই কথা বলল, এবং অদৃশ্যকায় পেটারকে বাহুবেষ্টন ক'রে উঁচুতে তুলল।...সত্যই, হেলে-পড়া চাঁদের আলোয় উলঙ্গ-প্রায় সেই উপত্যকা-ভূমিতে উষার আলোক দেখা যাচ্ছিল তখন।

কলাগৃহান যখন পাহাড়ের ধার ঘেঁষে ঘেঁষে, বনানীর ভেতর দিয়ে, এবং কোনো আনন্দ-মগ্ন দেশের ওপর দিয়ে ছুটতে লাগল, তখন সব কিছুই যেন তার উল্টো দিকে ছুটে ছুটে পালাতে লাগল ; আর, পেটার তার বাহুবেষ্টনে বদ্ধ থেকে উল্লাসে চীৎকার করতে লাগল। বাতাসের ভেতর একটা একটানা আর্ত্তনাদ, আর, পৃথিবীর অভ্যন্তরে একটা দারুণ তোলপাড় হ'চ্ছে বলে বোধ হ'ল পেটারের।···কখনো বা বন্য-বৃক্ষরাজির শিকড় ঘেঁষে, কখনো বা তাদের সু-উচ্চ চূড়া ছুঁয়ে সে আর তার আগন্তুক তীর-বেগে একটা অদ্ভুত মোরগের পেছনে ছুটে চলতে লাগল।—আলোর পরিধির ভিতর বাহির একাকার ক'রে চীৎকার করতে করতে ছুটে চলল তারা।

'মোরগটার কথা শোন',—পেটার বলল ; এবং,···বিছানার চাদর তার চিবুক পর্য্যন্ত জড়িয়ে এল !···

কোনো মানুষ তুলি দিয়ে পূর্ব্বাকাশে একটা লাল পঞ্জরাস্থি এঁকে দিয়েছে। চাঁদের বৃত্তকে ঘিরে আর একটা অলৌকিক মণ্ডল মেঘের ভেতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করছিল। পেটার তার জিহ্বাকে ওষ্ঠদ্বয়ের ওপর বুলিয়ে নিল, কিন্তু তাদের অভূতপূর্ব্ব ভাবে চামড়া আর মাংসে ঘেরা ব'লে বোধ হ'ল তার কাছে। মুখের ভেতর একটা অদ্ভুত স্বাদ হ'য়েছিল তার। যেন, গতরাত্রে—অথবা, তিন শ' রাত আগে—পপি-ফুলের পাপ্‌ড়ি চিবিয়ে মদ খেয়ে ঘুমিয়েছিল সে।··· মোরগটা আবার চীৎকার ক'রে উঠল ; আর, একটা পাখী কাঁচি দিয়ে যব কাটবার মত ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ ক'রে শিষ দিতে লাগল।

মিলীসেন্ট ঘরে ঢুকল। তার সমস্ত চোখে মুখে একটা শুভ্র ঔৎসুক্যের ভাব ব্যাপ্ত হ'য়ে ছিল।

'মিলীসেন্ট, মিলীসেন্ট', সে বলল, 'আমার হাতটা ধরতো মিলীসেন্ট।'

কিন্তু মিলীসেন্ট তার কথা শুনল না ; তার বিছানার পাশে দাঁড়াল, এবং অপলক শোকাকুল দৃষ্টিতে তার দিকে স্তব্ধ হ'য়ে চেয়ে রইল।

'আমার হাতটা ধর, মিলীসেন্ট', করুণ অনুরোধের সুরে সে বলল।

আর, তারপর : 'ও কী! আমার মুখের ওপর চাদরটা বিছিয়ে দিচ্ছ কেন মিলীসেন্ট' ?

মণীন্দ্র রায়

দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র

(৫।খ)

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব

আমরা দেখিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে মনুষ্যের অন্তর্নিহিত শারীরিকী ও মানসিকী বৃত্তিগুলির বিহিত অনুশীলনই মনুষ্যের ধর্ম। ঐ বৃত্তিগুলিকে তিনি শারীরিকী, জ্ঞানার্জনী, কার্যকারিণী ও চিত্তরঞ্জিনী—এই চারিশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। ঐ বৃত্তিগুলি নিরপেক্ষ নয়—পরস্পর-সাপেক্ষ এবং তাঁহার মতে সকল বৃত্তিগুলিরই যুগপৎ অনুশীলন আবশ্যক এবং সেই অনুশীলনের সীমা বৃত্তিগুলির পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য। অর্থাৎ বৃত্তিগুলি স্ফুর্ত হইলেই হইল না—তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য চাই, কেহ যেন কাহাকে ক্ষুন্ন করিয়া অসঙ্গত বৃদ্ধি-প্রাপ্ত না হয়। তবেই 'Harmonious Development'-এর ফলে মানুষ আধখানা মানুষ নয়—পূর্ণ মানুষ হইবে। ঐ পূর্ণ মানুষই আদর্শ মানুষ—নতুবা সে মনুষ্যত্ববিহীন, সুতরাং ধর্মে পতিত। এই পূর্ণ মনুষ্য হইবার উপায় ও উপাদান—বৃত্তির যথাযথ অনুশীলন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, 'অনুশীলনের দ্বারা সকলেই ধার্মিক হইতে পারে। আমার বিশ্বাস এক সময়ে সকল মনুষ্যই ধার্মিক হইবে। অনুশীলনের পূর্ণ মাত্রায় মোক্ষ।' ঐ অনুশীলনের প্রণালী ও পদ্ধতি কি ?

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম কথা এই যে, শৈশবেই সমস্ত বৃত্তিগুলির এককালে যথাসাধ্য অনুশীলন আরম্ভ করিতে হইবে। অবশ্য—শিশুর জানা সম্ভব নয় কি প্রকারে কোন্ বৃত্তির অনুশীলন করিতে হয়। এজন্য উপযুক্ত শিক্ষকের সহায়তা আবশ্যক।

'শিক্ষক ও শিক্ষা ভিন্ন কখনই মনুষ্য মনুষ্য হয় না। সকলেরই শিক্ষকের আশ্রয় লওয়া কর্তব্য। কেবল শৈশবে কেন, চিরকালই আমাদের পরের কাছে শিক্ষার প্রয়োজন। এইজন্য হিন্দুধর্মে গুরুর এত মান। আর গুরু নাই, গুরুর সম্মান নাই, কাজেই সমাজের উন্নতি হইতেছে না।' (অষ্টম অধ্যায়)*

---

* পরবর্তী দশম অধ্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র এই গুরুর প্রসঙ্গে লিখিতেছেন—'গুরু জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ, আমাদের জ্ঞানদাতা—এজন্য তিনি ভক্তির পাত্র। গুরু ভিন্ন মনুষ্যের মনুষ্যত্বই অসম্ভব। এজন্য গুরু বিশেষ প্রকারে ভক্তির পাত্র। হিন্দুধর্ম সর্বতত্ত্বদর্শী, এজন্য হিন্দুধর্মে গুরুভক্তির উপর বিশেষ দৃষ্টি।' প্রাচীন ভারতের ধর্মগুরু ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে বঙ্কিমচন্দ্র কিরূপ সম্মানের চক্ষে দেখিতেন এবং তাঁহার মতে তাঁহারা কতদূর ভক্তির পাত্র—'দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র—মূল কথা' প্রবন্ধে এ কথার আলোচনা করিয়াছি।

শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন—'আত্মরক্ষা, স্বজন রক্ষা, এবং স্বদেশ রক্ষার জন্য শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন সকলেরই কর্তব্য।' কেবল শারীরিক বল পর্যাপ্ত নয়—তৎসঙ্গে ব্যায়াম (মল্লযুদ্ধ ইহার অন্তর্গত) চাই ; আর চাই অস্ত্রশিক্ষা এবং অশ্বারোহণ, সন্তরণ, পদব্রজে দূর গমন, এবং সর্বশেষ—সহিষ্ণুতা—শীত-উষ্ণ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা প্রভৃতি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা। এক কথায়, দক্ষ কর্মকার যেমন আপনার অস্ত্রখানিকে তীক্ষ্ণধার ও মাজিত করিয়া সকল দ্রব্য-ছেদনের উপযোগী করে, দেহকে ব্যায়াম, শিক্ষা, আহার ও ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা সেইরূপ একখানি শাণিত অস্ত্র করিতে হইবে—যেন তদ্দ্বারা সর্বকর্ম সিদ্ধ হয়। এসম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ কথা এই :—'শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলি এরূপ সম্বন্ধ বিশিষ্ট যে, একের অনুশীলনের অভাবে অন্যের অনুশীলনের ব্যাঘাত ঘটে। অতএব যে সকল ধর্মোপদেষ্টা কেবল মানসিক বৃত্তির অনুশীলন উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত, তাঁহাদের কথিত ধর্ম অসম্পূর্ণ। যে শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল জ্ঞানোপার্জন সে শিক্ষা অসম্পূর্ণ, সুতরাং ধর্মবিরুদ্ধ।'

জ্ঞানার্জনী বৃত্তির প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, 'জ্ঞানার্জন ধর্মের একটি প্রধান অংশ। জ্ঞানোপার্জন ভিন্ন অন্য বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন করা যায় না—বিশেষতঃ জ্ঞান ভিন্ন ঈশ্বরকে জানা যায় না, ঈশ্বরের বিধিপূর্বক উপাসনা করা যায় না।' অতএব জ্ঞানার্জনী বৃত্তিসকলের সম্যক্ স্ফূর্তি ও পরিণতি হওয়া চাই। সর্বপ্রকার জ্ঞানের চর্চা ভিন্ন তাহা হইতে পারে না। গীতা বলেন তাহাই জ্ঞান—যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি—যদ্দ্বারা সমস্ত ভূতকে আত্মাতে ও ঈশ্বরে দেখিতে পাওয়া যায়। ভূতকে জানিতে হইবে—বহির্বিজ্ঞানে অর্থাৎ Mathematics, Astronomy, Physics and Chemistry—গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থতত্ত্ব এবং রসায়নে। আত্মাকে জানিতে হইবে বহির্বিজ্ঞানে ও অন্তর্বিজ্ঞানে অর্থাৎ Biology, Psychology and Sociology—জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানে। এবং ঈশ্বরকে জানিবে অধ্যাত্মবিজ্ঞানে—উপনিষদে দর্শনে পুরাণে গীতায়।

লক্ষ্য করিতে হয়, জ্ঞানার্জনী বৃত্তির অনুশীলন বিদ্যালয় ভিন্ন অন্যত্রও হইতে পারে। (আমাদের দেশের প্রাচীনারা ইহার উত্তম উদাহরণস্থল—তাঁহারা কথকের মুখে অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার পুরাণ-ইতিহাস শ্রবণ করিতেন ; ফলে

তাঁহাদিগের জ্ঞানার্জনী বৃত্তিসকল পরিমার্জিত ও পরিতৃপ্ত হইত)। এমন কি জ্ঞানার্জন জন্য সর্বত্র পুস্তকপাঠও প্রয়োজনীয় নহে। তবে এ কথা ঠিক্, গ্রন্থাভ্যাস জ্ঞানবৃত্তিস্ফুরণের প্রধান সহায়। কারণ, 'গ্রন্থী ভবতি পণ্ডিতঃ'।

জ্ঞানচর্চার মুখ্য উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জনী বৃত্তির বিকাশ—অর্জিত জ্ঞানস্তূপের চাপে শিক্ষার্থীর চিত্তকে ভারাক্রান্ত করা নহে। ইহাই প্রকৃত শিক্ষা—অন্য শিক্ষা কুশিক্ষা।* কুশিক্ষার ফল—মানসিক অজীর্ণ, বৃত্তিসকলের অবনতি। অজীর্ণ জ্ঞান প্রকৃতই পীড়াদায়ক। জ্ঞানপীড়াগ্রস্ত ব্যক্তি বস্তুতই কৃপাপাত্র—অর্জিত জ্ঞান লইয়া কি করিতে হয়, যাহা যাহা জানিয়াছে তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ কি, কিরূপে তাহাদিগের সমবায় সিদ্ধ করিতে হয়—এসকলের সে কিছুই জানে না। এক কথায় ঐরূপ জ্ঞান 'Head-learning' মাত্র—'Soul-wisdom' নহে।

আদর্শ শিক্ষাপ্রণালী কিরূপ হওয়া উচিত, বঙ্কিমচন্দ্র তাহার সবিশেষ আলোচনা করেন নাই। বস্তুতঃ সে আলোচনা শিক্ষাতত্ত্বের (Science of Education-এর) বিষয়—ধর্মতত্ত্বের নহে। তথাপি বঙ্কিমচন্দ্র একথা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, যে প্রণালীতে জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলির প্রতিই অধিক মনোযোগ—কার্যকারিণী ও চিত্তরঞ্জিনীর প্রতি প্রায় অমনোযোগ—সে প্রণালী অনিষ্টকর। তাঁহার শেষ কথা এই—'ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য সমাজে গৃহীত হইলে এই কুশিক্ষা-রূপ পাপ সমাজ হইতে দূরীভূত হইবে।'

এইবার কার্যকারিণী বৃত্তির কথা বলি। হার্বার্ট স্পেনসর ঠিকই বলিয়াছেন, জীবন-ব্যাপারে জ্ঞানার্জনী অপেক্ষা কার্যকারিণী বৃত্তির প্রভাব ও প্রসার অনেক অধিক—কারণ, দেখা যায়

জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ

সেই সেণ্ট পলের কথা :—The good that I would do I donot ; but the evil I would not, that I do. For I delight in the law of God but I see another law in my members, warring against the law of my mind and bringing me into captivity to the law of

* এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র প্রচলিত শিক্ষা প্রণালীর প্রতি বেশ রোষ-কটাক্ষ করিয়াছেন এবং ইহার কয়েকটি মারাত্মক ত্রুটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। ইহার পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি—এখানে ইঙ্গিত মাত্র করিলাম।

sin, which is in my members. যেখানে জ্ঞানে ও ভাবে (Intellect ও Emotionএ) দ্বন্দ্ব, সেখানে ভাবেরই জয়, জ্ঞানের পরাজয়। সেই-জন্য সোপেন্‌হওয়ার বলিতেন, মানুষের ব্যাধি Diseased Will—ব্যাধিত বুদ্ধি নয়।

আমরা দেখিয়াছি, যে বৃত্তির কাজ কর্মে প্রবৃত্তি দেওয়া—যথা ভক্তি প্রীতি দয়া, কাম ক্রোধ লোভ—তাহারাই কার্যকারিণী বৃত্তি। ইংরাজিতে ইহাদিগের সার্থক নাম Emotion—E-motion, অর্থাৎ প্রেরণশীল। বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্মতত্ত্বে' এ বিষয়ের প্রভূত আলোচনা করিয়াছেন—সে আলোচনা বেশ নিপুণ ও নিবিড়। তিনি প্রথমতঃ ভক্তির কথা বলিয়াছেন—পিতা মাতা স্বামী স্ত্রী রাজা আচার্য পুরোহিত লোকশিক্ষক জ্ঞানী ধার্মিক প্রভৃতিকে পাত্র করিয়া কিরূপে ভক্তিবৃত্তির অনুশীলন করিতে হয়, তাহা প্রদর্শন করিয়া ঈশ্বরই যে প্রকৃত ভক্তির আশ্রয় ও বিষয়, তাহা সুন্দর ভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এ তথ্যের প্রতিপাদনে তিনি 'ধর্মতত্ত্বে' পর পর দশটি অধ্যায় নিয়োজিত করিয়াছেন এবং ভগবদ্‌গীতা ও বিষ্ণু-পুরাণের প্রহ্লাদ-চরিত্র অবলম্বন করিয়া অতি মনোরম ভাবে বক্তব্যের উপন্যাস করিয়াছেন। দর্শন-সাহিত্যে এরূপ উপাদেয় ব্যাখ্যান সুদুর্লভ। ঈশ্বর-ভক্তি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—'ঈশ্বরে ভক্তিই পূর্ণ মনুষ্যত্ব—এবং অনুশীলনের একমাত্র উদ্দেশ্য সেই ভক্তি'।

পুনশ্চ—

মনুষ্যের বৃত্তিমাত্রেরই যে কিছু উদ্দেশ্য হইতে পারে, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঈশ্বরই মহৎ। ঈশ্বর যে বৃত্তির উদ্দেশ্য—অনন্ত মঙ্গল, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত ধর্ম, অনন্ত সৌন্দর্য্য, অনন্ত শক্তি—অনন্তই যে বৃত্তির উদ্দেশ্য, তাহার আবার অবরোধ কোথায়? ভক্তিশাসিতাবস্থাই সকল বৃত্তির যথার্থ সামঞ্জস্য।

ভক্তির পরেই প্রীতি—কারণ, (বঙ্কিমচন্দ্রের মতে) বৃত্তির মধ্যে উৎকর্ষ-নিকর্ষ নির্দেশে এই দুইটি বৃত্তি সর্বশ্রেষ্ঠ—ভক্তি ও প্রীতি। 'ঈশ্বরে ভক্তি ও মনুষ্যে প্রীতি—ইহাই ধর্মের সার, অনুশীলনের মুখ্য উদ্দেশ্য, সুখের মূলীভূত এবং মনুষ্যত্বের চরম।' প্রীতিকে বঙ্কিমচন্দ্র আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি ও পশুপ্রীতি—এই চারি উপশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন—কৌতূহলী পাঠক তাহা নিবিষ্টভাবে পাঠ করিতে পারেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন

—সকল ধর্মের উপর স্বদেশপ্রীতি, কিন্তু তিনি আমাদিগকে সতর্ক করিয়াছেন যে তাঁহার অনুমোদিত স্বদেশপ্রীতি ইউরোপীয় Patriotism নহে।

ইউরোপীয় Patriotism একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ। ইউরোপীয় Patriotism-ধর্মের তাৎপর্য্য এই যে, পরের সমাজে কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে। এই দুরন্ত Patriotism প্রভাবে আমেরিকার আদিম জাতিসকল পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইল। জগদীশ্বর ভারতবর্ষে যেন ভারতবর্ষীয়ের কপালে এরূপ দেশবাৎসল্য-ধর্ম না লিখেন।

প্রীতির কথা শেষ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন :—

ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন ; এইজন্য সর্বভূতে প্রীতি ভক্তির অন্তর্গত, এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় অংশ। সর্বভূতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরে ভক্তি নাই, মনুষ্যত্ব নাই, ধর্ম নাই।

প্রীতির পর দয়া। আর্তের প্রতি যে বিশেষ প্রীতিভাব, তাহাই দয়া। ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন, অতএব সর্বভূতে দান করিবে। দানের প্রকৃত অর্থ ত্যাগ। জলাশয় হইতে গণ্ডূষ জল তুলিয়া ধনকুবের অপরকে দিলে তাহা দান হইল না। আপনাকে কষ্ট দিয়া পরের উপকার করিলে, তাহাই দান। ঐরূপ দানের দ্বারাই দয়াবৃত্তির অনুশীলন হয়। যাহা ঈশ্বরের (আমরা ত' ন্যাসী মাত্র), তাহা ঈশ্বরকে দেয় ; ঈশ্বরকে সর্বস্বদানই মনুষ্যত্বের চরম।

যাহাকে আমরা হিংসা বলি, তাহা ঐ প্রীতি ও দয়া বৃত্তির বিরোধী। সেজন্য এ দেশের প্রচলিত কথা এই—অহিংসা পরমো ধর্মঃ। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাখ্যাত ধর্মতত্ত্বে অহিংসার স্থান কি? 'কৃষ্ণচরিত্রে' বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহার উত্তর এই :—'অহিংসা পরম ধর্ম—এ বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, ধর্ম্ম্য প্রয়োজন ভিন্ন যে হিংসা, তাহা হইতে বিরতিই পরম ধর্ম। নচেৎ হিংসাকারীর নিবারণ জন্য হিংসা অধর্ম নহে ; বরং পরম ধর্ম।' সেই জন্যই আদর্শ ধার্মিক শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন কশ্মলগ্রস্ত হইয়া কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে ধনুর্বাণ পরিত্যাগ করিলে উপদেশ দিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বর !
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহো করিষ্যে বচনং তব ॥

অহিংসা ধর্মের এতদূর মর্মস্থানীয়, যে মহাভারতের কর্ণপর্বে দেখিতে পাই

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—‘বরং মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কিন্তু কখনই হিংসা বিহিত নহে।’ এ বাক্যের উপর বঙ্কিমচন্দ্রের টীকা এই :—

কৃষ্ণের কথার ফল এই যে, যদি এমন অবস্থা কাহারও ঘটে যে, হয় তাহাকে মিথ্যা কথা বলিতে হইবে, নয় নরহত্যা করিতে হইবে, তবে সে বরং মিথ্যা কথা বলিবে, তথাপি নরহত্যা করিবে না। যদি এরূপ ধর্মাত্মা নীতিজ্ঞ কেহ থাকেন যে বলেন যে, বরং নরহত্যা করিবে, তথাপি মিথ্যা কথা বলিবে না,—তবে আমাদের উত্তর এই যে তাঁহার ধর্ম তাঁহাতেই থাক, এ নারকী ধর্ম যেন ভারতবর্ষে বিরল-প্রচার হয়।

মনুষ্যের কতকগুলি নিকৃষ্ট বৃত্তি আছে—যথা কাম ক্রোধ লোভ—(বঙ্কিমচন্দ্র ইহাদিগকে ‘পাশব বৃত্তি’ বলিয়াছেন), তৎসম্বন্ধে আমাদের কর্তব্য কি? ঐ সকল পাশব বৃত্তি স্বতঃস্ফূর্ত, অনুশীলন-সাপেক্ষ নহে। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, যাহা স্বতঃস্ফূর্ত, সংযম না করিলে তাহার অনুচিত স্ফূর্তি ঘটে। অতএব কামক্রোধাদির দমনই প্রকৃত অনুশীলন—কিন্তু ধ্বংস নয়। নিকৃষ্ট বৃত্তিতেও প্রয়োজন আছে। কামের ধ্বংসে মনুষ্য জাতির ধ্বংস ঘটিবে, সুতরাং ঐ কদর্য বৃত্তিরও ধ্বংস ধর্ম নহে—অধর্ম। ক্রোধ আত্মরক্ষা ও সমাজরক্ষার মূল। দণ্ডনীতি বিধিবদ্ধ সামাজিক ক্রোধ। ক্রোধের উচ্ছেদে দণ্ডনীতির উচ্ছেদ এবং দণ্ডনীতির উচ্ছেদে সমাজের উচ্ছেদ। এইরূপ লোভ—লোভ যতক্ষণ ধর্মসঙ্গত অর্জন-স্পৃহা, ততক্ষণ জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয়। অতএব তাহার ধ্বংস অনুচিত। সেইজন্য বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন—‘বৃত্তি নিকৃষ্ট হউক বা উৎকৃষ্ট হউক (আমি কোন বৃত্তিকেই নিকৃষ্ট বা অনিষ্টকর বলিতে সম্মত নহি), উচ্ছেদ মাত্রই অধর্ম। অনুচিত স্ফূর্তি প্রাপ্ত হইলেই কামক্রোধাদি মহাপাপ হইয়া দাঁড়ায়—নতুবা নহে। অতএব এগুলি উচিত মাত্রায় ধর্ম—অনুচিত মাত্রায় অধর্ম। এবং যেহেতু ঐ বৃত্তিগুলি স্বভাবতঃ এমনই তেজস্বিনী যে, যত্ন না করিলে উহারা সচরাচর উচিত মাত্রা অতিক্রম করে—অতএব দমনই তাহাদের প্রকৃত অনুশীলন।’

১২৯২ ফাল্গুনের ‘প্রচারে’ ‘চিত্তশুদ্ধি’ প্রবন্ধেও বঙ্কিমচন্দ্র ঐ কথা বলিয়াছেন :—

চিত্তশুদ্ধির প্রথম লক্ষণ ইন্দ্রিয়ের সংযম। “ইন্দ্রিয়-সংযম” ইতি বাক্যের দ্বারা এমন বুঝিতে হইবেনা যে, ইন্দ্রিয়সকলের একেবারে উচ্ছেদ বা ধ্বংস করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখিতে হইবে—কেবল ইহাই বুঝিতে হইবে। * * * স্থূল কথা এই যে, ইন্দ্রিয়ের আসক্তির অভাবই ইন্দ্রিয়-সংযম। আত্মরক্ষার্থে বা ধর্মরক্ষার্থে অর্থাৎ ঐশিক নিয়মরক্ষার্থে

যতটুকু ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা আবশ্যক, তাহার অতিরিক্ত যে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির অভিলাষ করে তাহারই ইন্দ্রিয় সংযত হয় নাই ; যে না করে, তাহার হইয়াছে। যাহার ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিতে সুখ নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, কেবল ধর্মরক্ষা আছে, তাহারই ইন্দ্রিয় সংযত হইয়াছে।

এ সকল কথায় বোধ হয় কাহারই আপত্তি হইবে না। তবে আমার মনে হয় শ্রীমতী অ্যানি বেসাণ্ট এ সম্পর্কে যে উক্তি করিয়াছেন তাহা আরও কল্যাণতর। তিনি বলেন, ধর্মজীবনে যাঁহারা অগ্রসর, তাঁহারা কামক্রোধাদি নিকৃষ্ট বৃত্তির উচ্ছেদ করেন না—তাহাদের উপাদেয় করেন—destroy করেন না, transmute করেন ; মারণ করেন না, জারণ করেন ; উন্মূলন করেন না—উত্তোলন করেন, শোধন করেন, sublimate করেন। এই প্রক্রিয়ার তিনি নাম দিয়াছেন—আধ্যাত্মিক কিমিয়া (Spiritual Alchemy)। অ্যালকেমিষ্ট যেমন কৌশল দ্বারা তাম্র শীষা প্রভৃতি ইতর ধাতুকে সুবর্ণে রূপান্তরিত করে, সাধন পথে অগ্রসর সাধক সেইরূপ কামক্রোধাদি ইতর বৃত্তিকে উৎকৃষ্ট বৃত্তিতে রূপান্তরিত করেন—ইহাই তাঁহার যোগ-কৌশল—যোগঃ কর্মসু কৌশলম্ (গীতা)।

Now, this process of spiritual alchemy may be regarded as a transmutation of forces. Each man has in himself life and energy and vigour, power of will and so on. By a process which may fairly be described as alchemical, he transmutes these forces from lower ends to higher; he transmutes them from gross energies to energies that are refined and spiritualised * * (At a certain stage of spiritual progress) he will begin deliberately to transmute those faculties of the lower nature and by this alchemical process refine them in the way at which I have hinted. * * A love that is selfish, how shall it be changed? Not by diminishing the love, not by chilling it down and making it colder and harder as it were,—but by encouraging the love and deliberately trying to eliminate those elements which degrade it; by watching the lower self, and when it begins to build a little wall of exclusion, knocking that wall down; when it desires to keep that which is so precious and so admirable, then at once trying to share with its neighbours; when it tries to draw the loved one from others, rather to give him out that he may be shared by others.

এইবার চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির কথা বলি। আমরা দেখিয়াছি, চিত্তরঞ্জিনী সেই বৃত্তি যেগুলি কেবল আনন্দ অনুভূত করায় অর্থাৎ 'যে সকল বৃত্তির দ্বারা সৌন্দর্যাদির পর্যালোচনা করিয়া আমরা নির্মল ও অতুলনীয় আনন্দ অনুভূত করি'—তাহারাই চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, প্রকৃত ধার্মিক হইতে হইলে বুদ্ধ্যাদি জ্ঞানার্জনী বৃত্তির ও ভক্ত্যাদি কার্যকারিণী বৃত্তির অনুশীলন যেমন প্রয়োজনীয়, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলির অনুশীলনও সেইরূপ প্রয়োজনীয়। ভগবান্ সচ্চিদানন্দ—তাঁহার সৎভাবকে জানা যায় জ্ঞানের দ্বারা এবং চিৎভাবকে জানা যায় ধ্যানের দ্বারা। কিন্তু তাঁহার আনন্দ ভাব? সে ভাব চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিরই বেদ্য। 'ঐ বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলনে এই সচ্চিদানন্দ জগৎ এবং জগন্ময় সচ্চিদানন্দের সম্পূর্ণ স্বরূপানুভূতি হইতে পারে। তদ্‌ব্যতীত ধর্ম অসম্পূর্ণ।'

জগতের সকল ধর্মের একটি অসম্পূর্ণতা এই যে, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলির অনুশীলন বিশেষরূপে উপদিষ্ট হয় নাই। কিন্তু একথা ঠিক নয় যে, প্রাচীন ধর্মবেত্তারা এ বিষয়ে একেবারে উদাসীন ছিলেন। হিন্দুর পূজায়—পুষ্প, চন্দন, মাল্য, ধূপ, দীপ, ধুনা, গুগ্‌গুল, নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতি সকলেরই উদ্দেশ্য ভক্তির অনুশীলনের সঙ্গে চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তির অনুশীলনের সম্মিলন অথবা এই সকলের দ্বারা ভক্তির উদ্দীপন। গ্রীকৃদিগের ধর্মে এবং মধ্যকালের ইউরোপীয় রোমীয় খৃষ্টধর্মে উপাসনার সঙ্গে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিসকলের স্ফূর্তির ও পরিতৃপ্তির বিলক্ষণ চেষ্টা ছিল। আপিলীস্ বা রাফেলের চিত্র, মাইকেল এঞ্জিলো বা ফিদিয়সের ভাস্কর্য, জার্মানির বিখ্যাত সঙ্গীতপ্রণেতৃগণের সঙ্গীত—উপাসনার সহায় হইয়াছিল। চিত্রকরের, ভাস্করের, স্থপতির, সঙ্গীতকারকের সকল বিদ্যা ধর্মের পদে উৎসর্গ করা হইত। ভারতবর্ষেরও স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত উপাসনার সহায় ছিল।

চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি কিরূপে অনুশীলিত করিতে হইবে? বঙ্কিমচন্দ্র বলেন:—

জাগতিক সৌন্দর্যে চিত্তকে সংযুক্ত করাই ইহার অনুশীলনের প্রধান উপায়। জগৎ সৌন্দর্যময়। বহিঃপ্রকৃতিও সৌন্দর্যময়, অন্তঃপ্রকৃতিও সৌন্দর্যময়। বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য সহজে চিত্তকে আকৃষ্ট করে। সেই আকর্ষণের বশবর্তী হইয়া সৌন্দর্যগ্রাহিণী বৃত্তিগুলির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। বৃত্তিগুলি স্ফুরিত হইতে থাকিলে, ক্রমে, অন্তঃপ্রকৃতির সৌন্দর্যানুভবে সক্ষম হইলে, জগদীশ্বরের অনন্ত সৌন্দর্যের আভাস পাইতে থাকিবে।

নৈসর্গিক সৌন্দর্যের উপর চিত্তস্থাপনই চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলনের একমাত্র উপায় নহে। মানুষের চেষ্টায় ঐ অনুশীলনের সাহায্যকারী বিশেষ

বিশেষ বিদ্যা উদ্ভূত হইয়াছে। স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত, নৃত্য—এ সকল সেই অনুশীলনের প্রকৃষ্ট সহায় কিন্তু কাব্যই এ বিষয়ে মনুষ্যের প্রধান সহায়। কাব্যদ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ এবং অন্তঃপ্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রেমিক হয়। এইজন্য কবি ধর্মের একজন প্রধান সহায়। রামায়ণ ও মহাভারতের তুল্য কাব্য-গ্রন্থ আর নাই;—অথচ ইহাই হিন্দুদিগের এক্ষণে প্রধান ধর্মগ্রন্থ। বিষ্ণু ও ভাগবতাদি পুরাণে এমন কাব্য আছে যে অন্যদেশে তাহা অতুলনীয়।

ঈশ্বর অনন্ত সুন্দর। তিনি একাধারে সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ (গ্রীকরা যাহাকে বলিতেন The True, The Good and The Beautiful)। বিশ্বের মধ্যে যে কিছু সৌন্দর্য লক্ষিত হয়, সে সকলের অফুরন্ত উৎস সেই চিরসুন্দর। অতএব চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলন যদি সম্পূর্ণ করিতে হয় তবে চিত্তকে ভগবানে বিন্যস্ত করিতে হইবে। এ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্মতত্ত্বে' লিখিয়াছেন,—

ঈশ্বর অনন্ত সৌন্দর্য-বিশিষ্ট। অনন্তের গুণ সান্ত বা পরিমাণবিশিষ্ট হইতে পারে না। তিনি মহৎ, শুচি, প্রেমময়, বিচিত্র অথচ এক, সর্বাঙ্গসম্পন্ন এবং নির্বিকার। এই সকল গুণই অপরিমেয়। অতএব এই সকল গুণের সমবায়ে যে সৌন্দর্য, তাহাও তাঁহাতে অনন্ত। যে সকল বৃত্তির দ্বারা সৌন্দর্য অনুভূত করা যায়, তাহাদিগের সম্পূর্ণ অনুশীলন ভিন্ন তাঁহাকে পাইব কি প্রকারে? তাঁহার সৌন্দর্যের সমুচিত অনুভব ভিন্ন আমাদের হৃদয়ে কখনও তাঁহার প্রতি সম্যক্ প্রেম বা ভক্তি জন্মিবে না।

কেবল চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি কেন? বঙ্কিমচন্দ্র বলেন প্রকৃত ধার্মিক হইতে হইলে, শারীরিকী, জ্ঞানার্জনী, কার্যকারিণী ও চিত্তরঞ্জিনী সমস্ত বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরাভিমুখী করিতে হইবে। কারণ, সকল বৃত্তির ঈশ্বরে সমর্পণ ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই। ইহাই প্রকৃত কৃষ্ণার্পণ, ইহাই প্রকৃত নিষ্কাম ধর্ম, ইহাই স্থায়ী সুখ, ইহারই নামান্তর চিত্তশুদ্ধি। ইহারই লক্ষণ 'ভক্তি প্রীতি শান্তি', ইহাই ধর্ম, ইহা ভিন্ন ধর্মান্তর নাই।

পুনশ্চ—যখন মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানুবর্তিনী হয় সেই অবস্থাই ভক্তি। যাহার সকল চিত্তবৃত্তি ঈশ্বরমুখী না হইয়াছে, সে ভক্ত নহে। * * ঈশ্বরকে সর্বদা অন্তরে বিদ্যমান জানিয়া, যে আপনার চরিত্র পবিত্র না করিয়াছে, যাহার চরিত্র ঈশ্বরানুরূপী নহে, সে ভক্ত নহে। যাহার সমস্ত চরিত্র ভক্তির দ্বারা শাসিত না হইয়াছে, সে ভক্ত নহে।

যাহার সকল চিত্তবৃত্তি ঈশ্বরমুখী না হইয়াছে, সে ভক্ত নহে। * * সকল বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করিবার যে চেষ্টা, তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপাসনা আর কি হইতে পারে ?

ধর্মতত্ত্বের উপসংহারে, বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন—

'মনুষ্যের সমস্ত বৃত্তির উপযুক্ত অনুশীলন হইলে ইহারা সকলেই ঈশ্বরমুখী হয়। ঈশ্বরমুখিতাই উপযুক্ত অনুশীলন। সেই অবস্থাই ভক্তি।'

ঈশ্বর যখন সচ্চিদানন্দ, তিনি যখন একাধারে প্রতাপঘন, প্রজ্ঞাঘন ও প্রেমঘন—তখন তাঁহার সহিত মিলিত হইবার মার্গ শুধু কর্ম নয়—শুধু জ্ঞান নয়—শুধু ভক্তি নয়। কিন্তু কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের যে যুক্ত-ত্রিবেণী—উহাতে নিষ্ণাত হইলে তবেই জীব তাঁহার স্বারূপ্য লাভ করিতে পারে। 'বঙ্কিমচন্দ্র ও ভগবদ্‌গীতা' প্রবন্ধে আমরা এ বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা করিব। এখানে ইঙ্গিতমাত্র করিলাম।

আমরা দেখিলাম বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মসাধনে ভক্তিকে বিশিষ্ট স্থানে স্থাপন করিয়াছেন। এ বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে—এবং আমার 'গীতায় ঈশ্বরবাদ' গ্রন্থে আমি এই তথ্য যথাসাধ্য প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের একটা কথায় আমার কিছু আপত্তি আছে। তিনি বলিয়াছেন 'প্রাচীন বৈদিক ধর্মে ভক্তি নাই'। এমন যে উপনিষদ্—যাহার সার্থক নাম বেদান্ত, যাহা বেদের চরম পরম ভাগ—বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, ব্রহ্ম-নিরূপণ ও আত্মজ্ঞানই তাহার উদ্দিষ্ট। তিনি বলেন, 'শাণ্ডিল্যের ভক্তিসূত্রেই আমরা প্রথম ভক্তির উল্লেখ পাই; সে ভক্তি পরানুরক্তিঃ ঈশ্বরে—যদিও ছান্দোগ্য উপনিষদে ভক্তি শব্দ ব্যবহৃত না থাকিলেও একটি বচনে ভক্তিবাদের সারমর্ম আছে—'এবং বিজানন্ আত্মরতিঃ আত্মক্রীড়ঃ আত্মমিথুনঃ আত্মানন্দঃ স স্বরাট্ ভবতি'। ছান্দোগ্য উপনিষদে ঐ শাণ্ডিল্যের নাম আছে এবং দেবকী-পুত্র কৃষ্ণেরও নাম আছে। অতএব কৃষ্ণ আগে কি শাণ্ডিল্য আগে তাহা আমি জানি না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ কি শাণ্ডিল্য ভক্তিমার্গের প্রথম প্রবর্তক তাহা আমি বলিতে পারি না।' এ সম্পর্কে আমি আমার 'উপনিষদে ভক্তিবাদ' প্রবন্ধে যথোচিত আলোচনা করিয়াছি এবং প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছি যে, উপনিষদের ঋষিরা ব্রহ্মণ্যদেব যে 'রসো বৈ সঃ' তাহা জানিতেন এবং তাঁহাকে 'মধু ব্রহ্ম' বলিয়া অনুভব করিতেন। অধিকন্তু তাঁহাকে 'ভামনী বামনী (Lord

of Love) দয়িত বনিত (Beloved)' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে ব্রহ্ম 'প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়ঃ অন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ' অর্থাৎ তিনি 'প্রিয়তম' এবং রসামৃতসিন্ধু রূপে অজস্র আনন্দের প্রস্রবণ। এমন কি পতিতে, জায়াতে, পুত্রে, বিত্তে আমরা যে আনন্দ অনুভব করি, সে আনন্দ সেই 'রসোঃ বৈ সঃ'-এর, সেই রসামৃত-সিন্ধুর বিন্দু পান করিয়া—আনন্দ-কণিকার সংস্পর্শ লাভ করিয়া। ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি আত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি ইত্যাদি। কারণ, এতস্যৈব আনন্দস্য অন্যানি ভূতানি মাত্রাম্ উপজীবন্তি (বৃহদারণ্যক, ৪।৩।৩২); এষ এব আনন্দয়াতি * * রসং হ্যেবায়ং লব্ধা আনন্দী ভবতি (তৈত্তিরীয়, ২।৭।১)

বঙ্কিমচন্দ্র নিষ্কাম ভক্তিকেই প্রেম বলিয়াছেন এবং ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদকে প্রেমের পরিণত মূর্তি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। 'নিষ্কাম প্রেমই যথার্থ ভক্তি এবং প্রহ্লাদই পরম ভক্ত।' প্রেম নিষ্কাম সন্দেহ নাই কিন্তু প্রেম যে ভক্তির প্রপূর্তি (apotheosis)—বঙ্কিমচন্দ্র একথা কোথাও বলেন নাই। বস্তুতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা যাহাকে প্রেমধর্ম বলেন তাহার প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের আদৌ পক্ষপাত ছিল না। সেইজন্য দেখা যায় 'আনন্দমঠে' সন্তান সম্প্রদায়ের নায়ক সত্যানন্দের মুখ দিয়া তিনি চৈতন্যধর্মের প্রতি বেশ কটাক্ষ করিয়াছেন।

চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম নহে—উহা অর্দ্ধেক ধর্ম মাত্র। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু প্রেমময়—কিন্তু ভগবান্ কেবল প্রেমময় নহেন, তিনি অনন্ত শক্তিময়। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু শুধু প্রেমময়—সন্তানের বিষ্ণু শুধু শক্তিময়। আমরা উভয়েই বৈষ্ণব—কিন্তু উভয়েই অর্দ্ধেক বৈষ্ণব।

ধর্মতত্ত্বের একবিংশ অধ্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিতেছেন :—

ভগবদ্‌গীতা ছাড়া অন্যান্য হিন্দুগ্রন্থে যে সকল ভক্তির কথা আছে, তাহা গীতামূলক। কেবল চৈতন্যের ভক্তিবাদ ভিন্ন প্রকৃতির। কিন্তু অনুশীলন ধর্মের সহিত সে ভক্তিবাদের সম্বন্ধ তাদৃশ ঘনিষ্ঠ নহে—বরং একটুখানি বিরোধ আছে। অতএব আমি সে ভক্তিবাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না।

প্রেমধর্ম বর্তমানে আমারও আলোচ্য নয়। প্রেমধর্ম সম্পর্কে আমার যাহা বক্তব্য, তাহা আমার 'প্রেমধর্ম' গ্রন্থে সবিস্তারে বলিয়াছি। ঐ গ্রন্থ এখন যন্ত্রস্থ।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্মতত্ত্ব' সম্বন্ধে আরও বক্তব্য আছে—আগামীতে বলিবার চেষ্টা করিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

শব্দ-সঙ্ঘাত

আকাশে গ্রহ উপগ্রহ নিয়ত ঘূর্ণিত হইতেছে এবং আকাশে তজ্জনিত প্রচণ্ড শব্দ হইতেছে। আমরা সেই শব্দ শুনিতে পাই না, কিন্তু ভগবান কি সেই শব্দ শুনিতে পান? যদি শুনিতে পান এবং শুনিয়াও দূরে না পালান তাহা হইলে তাঁহার সহনশীলতাকে প্রশংসা করিতে হয়।

কিন্তু ভগবান সম্বন্ধে কিছুই না জানিয়া আর কোনো মন্তব্য করা শোভন হইবে না। আমার নিজের কথাই বলি।

যে রাজপথপার্শ্বস্থিত বাড়িতে অল্পদিন পূর্ব্বে ছিলাম তাহার পাশে বাস্‌এর আড্ডা। বাস্‌-এঞ্জিনের শব্দ এবং বাস্‌-চালকের কোলাহল কিছুদিনের মধ্যেই অসহ্য হইয়া উঠিল, সুতরাং বাস-স্থান ত্যাগের আয়োজন করিতে লাগিলাম।

অনুসন্ধানের পর মনের মত একটি বাড়ি পাওয়া গেল। একদিন রবিবার সকালে সপরিবার সেই বাড়িতে আসিয়া উঠিলাম।

বড় রাস্তা হইতে একটি ছোট রাস্তা বাহির হইয়াছে, এবং তাহা অপেক্ষাও ছোট আর একটি গলি এই ছোট রাস্তা হইতে বাহির হইয়া একটি অনতিপ্রশস্ত মাঠে আসিয়া শেষ হইয়াছে। মাঠের ওপারে ছোট মেয়েদের প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং আমাদের বাড়ির একটি দিক সেই মাঠের দিকে খোলা।

অত্যন্ত নিরীহ এবং অত্যন্ত অন্তর্মুখী এই গলিটিকে এবং তাহার উপরের এই বাড়িটিকে আবিষ্কার করিয়া অত্যন্ত খুশী হইয়া উঠিলাম। মনে হইল যেন পল্লীগ্রামে আসিয়া পড়িয়াছি। এমন কি অতি শব্দ হইতে অতি নির্জ্জনতার মধ্যে পড়িয়া কিছুক্ষণ মনটা একটু দমিয়াও গিয়াছিল। প্রাণান্তকর শব্দের নিরাপদ আবেষ্টনে আমরা সপরিবারে যে সশব্দ আলাপে অভ্যস্ত হইয়া উঠিতেছিলাম তাহা সহসা বাধাগ্রস্ত হওয়াতে স্বরযন্ত্র যেন পীড়িত হইয়া উঠিল। চুপে চুপে গৃহিণীকে বলিলাম, কথাটা একটু আস্তে বলতে হবে, এখানে কিন্তু বাস্ নেই।

গৃহিণী আমাকে দৃষ্টিদ্বারা তিরস্কৃত করিয়া আরও মৃদুস্বরে বলিলেন, অত চেঁচিও না, পাশের বাড়ির লোকেরা কান পেতে আছে।

কিন্তু তাহারা বেশিক্ষণ কান পাতিয়া রহিল না।

ঘণ্টাখানেক পরে গলির মধ্যে একটা মোটর গাড়ি সশব্দে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিতেই আমাদের ফ্ল্যাটের ঠিক নীচেই যে গারাজ্ ছিল তাহার টিনের দরজা ঝন্ ঝন্ কড় কড় কড়াৎ করিয়া খুলিয়া গেল, গাড়ি গারাজে প্রবেশ করিল এবং দরজা পুনরায় উক্তরূপ শব্দ করিয়া বন্ধ হইল। আরও কিছু পরে তাহার বিপরীত দরজা হইতে অর্থাৎ গলির ওপারের গারাজ হইতে আর একখানি গাড়ি উক্তরূপ শব্দ-সমূহের প্রত্যেকটি অনুকরণ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

বেলা তখনও বেশি হয় নাই, বোধ করি নয়টা হইবে। আমাদের ফ্ল্যাটের পূর্ব্বদিকে পাঁচ ছয় হাত ব্যবধানে যে বাড়িটি অবস্থিত তাহার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষার জন্যে গৃহিণী আদেশ করিলেন পর্দ্দা কিনে আন। ঠিক এই সময় সেই বাড়ির একটি জানালায় গ্রামোফোন বাজিয়া উঠিল। এবং আরও কয়েক মিনিট পরে তাহার পাশের জানালায় রেডিওতে সানাই বাজিয়া উঠিল। দুইটি পৃথক পরিবারের দুইটি জানালা। কিন্তু তাহাদের মাঝখানে দেওয়াল আছে বলিয়া গ্রামোফোন ও রেডিওর সত্তা তাহাদের কাছে পৃথক, কিন্তু দুই নমস্য বৈজ্ঞানিকের দুইটি বিস্ময়কর আবিষ্কারের মিলিত ফল যে একই সঙ্গে আমাদের এই বাড়িটিকে একা ভোগ করিতে হয় ইহা তাহাদিগকে বুঝাইবার উপায় নাই।

সুতরাং যন্ত্র-সঙ্গীতকে মানিয়া লইলাম।

গৃহিণীকে বলিলাম পর্দ্দা আর কিনতে হবে না, আমাদের জানালা দুটোই স্থায়ীভাবে বন্ধ রাখতে হবে।

গৃহিণীর তাহাতে আপত্তি হইল। তিনি বলিলেন তবু ত এটা মানুষের আওয়াজ, বাস্-এর আওয়াজের চেয়ে ঢের ভাল।

সুতরাং পর্দ্দার কাপড় কিনিতে হইল। আমি শব্দের বিরুদ্ধে কাঠের জানালার বাধা সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলাম কিন্তু সন্ধ্যায় আর একটি বৃহত্তর শব্দ-সমস্যার সম্মুখীন হইয়া কাঠকে বিস্মৃত হইলাম। এ শব্দটি ইট ভেদ করিয়া আমাদিগকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। বোধ হইল যেন আমাদের উপরের ফ্ল্যাটে কেহ নৃত্য করিতেছে। ইতিপূর্ব্বে বহুপ্রকার শব্দের অভিজ্ঞতাই সঞ্চয় করিয়াছি কিন্তু মাথার উপর কেহ নৃত্য করিলে মনের কি অবস্থা হয় তাহা জানা ছিল না।

গৃহিণী কিন্তু দমিলেন না। তিনি বলিলেন, তবু ত মানুষের আওয়াজ, তোমার ইঞ্জিনের চেয়ে ঢের ভাল। ভাল কি, এবং মন্দ কি, তাহার তুলনামূলক আলোচনা করিবার আর প্রবৃত্তি হইল না, আমি সোজা উপরে উঠিয়া গিয়া অপরিচিত দরজার কড়া নাড়িলাম। একটু পরেই একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক আসিয়া দরজা খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কাকে খুঁজছেন?

আমি যে সৌভাগ্যবশত তাঁহাদেরই নীচের ফ্ল্যাটটি ভাড়া লইয়াছি তাহা বিনীতভাবে প্রকাশ করিয়া বলিলাম, দেখুন, আপনাদের ফ্ল্যাট থেকে দুপ্‌দাপ্‌ একটা শব্দ হচ্ছে, যদি কিছু মনে না করেন—

কথাটি শেষ করিতে না দিয়াই ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন, মেয়েরা নাচ শিখছে।

বলিলাম, নাচে কি এত শব্দ হয়? আজকালকার নাচে ত—

ভদ্রলোক পুনরায় আমার অসমাপ্ত কথাটি পরিপূরণ করিয়া বলিলেন—হ্যাঁ আজকালকার নাচে দেহভঙ্গিটাই বেশি, পায়ের কাজ নেই বললেই চলে, কিন্তু আপনি দাক্ষিণাত্যের বা মণিপুরী নৃত্য দেখেছেন?

আমি প্রশ্ন করিলাম, আপনারা কোন্‌টা অভ্যাস করছেন?

ভদ্রলোক বলিলেন, মণিপুরী।

আমার আর বলিবার কিছু রহিল না। শুধু বলিলাম, নৃত্যে আমার যথেষ্ট সমর্থন আছে, তবে ছাদটা না ভাঙে সেইটে একটু লক্ষ্য রাখবেন।

ভদ্রলোক দরজা বন্ধ করিতে করিতে বলিলেন, দেখুন নাচ সম্বন্ধে অনেক সংস্কার ভাঙতেই শক্তি ফুরিয়ে গেছে—ছাদ ভাঙবার আর উৎসাহ নেই।—একটু অসুবিধা যদি হয় সহ্য করুন, এ নিয়ে আর দুশ্চিন্তা করবেন না।

দুশ্চিন্তা আর করিলাম না, নৃত্যটাকেও মানিয়া লইলাম। তাহা ছাড়া মনোযোগ কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্য দিকে আকৃষ্ট হইল।

স্কুলের দারোয়ান স্কুলের সম্মুখস্থ মাঠে লণ্ঠন লইয়া বসিয়া সুর করিয়া ধর্ম্ম-কাব্য পাঠ করিতে লাগিল। যে সুরে পাঠ চলিল তাহা পরিচিত কোন সুরের সঙ্গেই মেলে না এবং কণ্ঠস্বরকেও কেহ মধুর বলিয়া ভুল করিবে না, কারণ রূঢ় তীক্ষ্ণতায় তাহা গ্রামোফোন, রেডিও এবং নৃত্য শব্দকে অতিক্রম করিয়া গেল।

গৃহিণীকে বলিলাম দারোয়ানের আবৃত্তিটা কিন্তু আমার কাছে খুব ভালই

লাগছে। কিন্তু আমার এই মন্তব্য বিদ্রূপাত্মক মনে করিয়া গৃহিণী বলিলেন, তুমিই ত দেখে শুনে বাড়ি নিয়েছ, এখন আপত্তি কেন? বেশ ত তোমার যদি ভাল লাগে, আমারও লাগবে।

বুঝিলাম, মানুষের শব্দ হইলেও গৃহিণীর ধৈর্য্য সীমা ভাঙিবার মুখে।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে কাব্য-পাঠও পুরাতন হইয়া গেল। গলির বিপরীত বাড়িতে এই সময় এমন একটি ব্যাপার আরম্ভ হইল যাহা নিতান্তই অপ্রত্যাশিত। আপাত-দৃষ্টিতে যাহাদিগকে অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় একটি ভদ্র পরিবার বলিয়া মনে হইয়াছিল, তাহারা হঠাৎ অভদ্র ভাষায় কলহ সুরু করিয়া দিল। পারিবারিক কলহ! আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই এক সঙ্গে চীৎকার করিতেছে, মেয়েরা কেহ কেহ মার খাইতেছে, পিতা পুত্রকে মারিতেছে, পুত্র পিতাকে মারিতেছে। প্রায় তিনঘণ্টা এই কুৎসিত দৃশ্যের অভিনয় চলিল। রাত্রি তখন একটা।

সকালে উঠিয়া ভগবানকে এই বলিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইলাম যে এ অঞ্চলের আকাশে যে সূর্য্যটির উদয় হইল সে অন্ততঃ তাহার চিরাচরিত রীতিতে নীরবেই উদিত হইয়াছে—উদয়ের সময় সশব্দে নৃত্য করে নাই অথবা স্তোত্র-পাঠ করে নাই!

সোমবার সকাল। মেয়েদের স্কুল সকালেই বসে। বাস্‌ বোঝাই হইয়া মেয়েরা আসিতেছে। তাহাদের কোলাহলে পাড়া মুখরিত হইয়া উঠিল।

উপরে যে ফ্ল্যাটে সন্ধ্যায় মণিপুরী নৃত্য আরম্ভ হইয়াছিল, সেই ফ্ল্যাটের এক ভদ্রলোক হারমোনিয়াম লইয়া সুর সাধনা আরম্ভ করিলেন। ভৈরবীর সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায় এমন ভয় বোধ করি তাঁহার ছিল, সেই জন্য তাঁহার ভৈরবীর সঙ্গে তিনি একখানি রেলোয়ে এঞ্জিন জুড়িয়া দিলেন; সুর ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে ছুটিয়া চলিল।

বাস্‌-এর একঘেয়ে শব্দে অভ্যস্ত ছিলাম, সেই শব্দ হইতে দূরে আসিয়া বহুবিচিত্র শব্দের চমকপ্রদ সৌন্দর্য্যে মনে ধাঁধা লাগিয়া গেল। তারপর কিছুদিনের মধ্যে ইহাতেও অভ্যস্ত হইয়া উঠিলাম, এবং বৈচিত্র্যের মোহও ক্রমশ কাটিয়া যাইতে লাগিল। আমরা উভয়েই বুঝিতে পারিলাম, ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী, এবং শব্দও তাই, সুতরাং শব্দকে এড়াইতে হইলে পৃথিবীকে ছাড়িতে

হয় ; কিন্তু তাহাতেও সন্দেহ রহিল। হয়ত বা মৃত্যুর পরেও আর এক শব্দ-রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে, তবে হয়ত সে শব্দ পৃথিবীর শব্দ অপেক্ষা উন্নত, অর্থাৎ ইহার মত অর্থহীন নহে। শব্দ এবং অর্থ হয়ত সেইখানেই এক হইয়া মিলিয়াছে।

আমাদের শুইবার ঘরের জানালা বালিকা বিদ্যালয়ের মাঠের দিকে খোলা। আমাদের বাড়ির পাশ দিয়া যে গলিটি এই মাঠে আসিয়া শেষ হইয়াছে, সেই গলির ওপারে আমাদের বাড়ির বিপরীত দিকে যে বাড়ি তাহার দরজা এই মাঠের দিকে খোলা। আমাদের জানালা হইতে সে দরজা দেখা যায় না, অথচ তাহার দূরত্ব মাত্র কুড়ি কি পঁচিশ হাত হইবে।

কিন্তু এই বাড়ি হইতে কয়েকদিন পরেই যে শব্দ আসিতে লাগিল সেই শব্দই আমাকে শেষ পর্য্যন্ত নৈঃশব্দ্যে লীন করিয়াছে।

এ শব্দ মানবকণ্ঠ নিঃসৃত হইলেও অমানুষিক, এবং তাহার প্রমাণ, যাঁহারা যন্ত্রশব্দ এবং নৃত্যশব্দ সৃষ্টি করিয়া ক্রমাগত একটি শান্ত পরিবারকে অশান্ত করিতেছিলেন তাঁহারাও এই শব্দের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন।

কণ্ঠস্বরের মালিকের বয়স পনের ষোল বৎসরের বেশি হইবে না, কিন্তু তাহার স্বর-যন্ত্রটির শক্তি মানব-শক্তিকে অতিক্রম করিয়া অশ্বশক্তির সীমানায় পৌঁছিয়াছে। তদুপরি গলাটি ভাঙা।

খুব সম্ভব তাহারা ঐ বাড়িতে নূতন আসিয়াছে, তাই ইহার কণ্ঠস্বর পূর্ব্বে শুনিতে পাই নাই। সে সন্ধ্যা সাতটা হইতে ক্রমাগত বাংলা দৈনিকের সমস্তগুলি পৃষ্ঠা চীৎকার করিয়া পড়িতে আরম্ভ করে। সমস্ত বিজ্ঞাপন, সমস্ত সংবাদ, এবং সম্পাদকীয়। কাগজ পড়া শেষ হইলে পথে সংগৃহীত বিজ্ঞাপনের হাণ্ডবিল পড়িতে আরম্ভ করে।

কোথায় কোন্ গণৎকার আসিয়াছে, কোথায় কোন্ দোকানে নীলামে কাপড় বিক্রয় হইতেছে, কোথায় তসর ও গরদ শস্তায় পাওয়া যায়, সমস্ত সংবাদ সে চীৎকার করিয়া পড়ে, এবং রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত।

সকাল বেলাতেও নিস্তার নাই। নিজের স্কুলের পড়া, তারপর চিঠি আসিলে চিঠি পড়া। এবং এক এক লাইন পাঁচবার ছয়বার করিয়া।

পল্লীগ্রামে তাহার বাড়ি, চিঠি হইতে বোঝা যায়।

দেশে বর্ষা কেমন হইল, ঘর মেরামত করিতে কত খরচ হইল, পিসিমা আসিয়া কয়দিন ছিল, সঙ্গে কতখানি গুড় আনিয়াছিল, পিসিমার পুত্রকে কখানা কাপড় কিনিয়া দেওয়া হইয়াছে এই সব মূল্যবান সংবাদ পাড়ার লোককে শুনিতে হয়।

একদিন বৃষ্টি নামিল, এই ছেলেটি চীৎকার করিয়া পাড়ার লোককে বলিয়া দিল বৃষ্টি নামিয়াছে।

ছেলেটির মস্তিষ্ক যে বিকৃত এ বিষয়ে কাহারও কোনো সন্দেহ রহিল না। কিন্তু ইহাকে নিবৃত্ত করিবার উপায় কি ?

প্রতিবেশীদের সঙ্গে পরস্পর শব্দ লইয়া যে বিরক্তিজনিত গোপন মনোমালিন্য ছিল তাহা বিস্মৃত হইয়া সকলে একযোগে এই শব্দের প্রতিকার চিন্তা করিতে লাগিলাম। নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী শব্দ উৎপাদন করিবার অধিকার যে সকলেরই আছে, এবং থাকা উচিত, একথা কাহারও মনে হইল না। আমরা শুধু চিন্তা করিলাম, একমাত্র সেই তাহার অধিকার সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে।

আমরা যে বাড়িতে থাকি তাহাতে চারিটি ফ্ল্যাট। আমাদের বাড়ির বিপরীত দিকের বাড়িতেও চারিটি ফ্ল্যাট—কিন্তু ভাড়াটিয়া পরিবার মাত্র দুইটি। দুইটিরই পরিচয় আমরা পাইয়াছি। একটি পরিবার রাত্রিতে ঝগড়া এবং মারামারি করে, আর একটির বিরুদ্ধে আমরা ষড়যন্ত্র করিতেছি।

একই লোকের বাড়ি। সুতরাং বাড়িওয়ালাকে আমরা সকলে মিলিয়া বলিলাম, আমরা এই চীৎকার আর সহ্য করিতে পারিতেছি না, যদি প্রতিকার না করেন, তাহা হইলে আমরা আগামী মাসে সকলে একযোগে এই বাড়ি হইতে উঠিয়া যাইব।

বাড়িওয়ালা বিপদ গণিলেন। সত্যই বিপদের কথা। সুতরাং তাঁহাকে কথা দিতে হইল নূতন ভাড়াটিয়াকে নোটিস্ দিবেন, আমাদিগকে আর উঠিয়া যাইতে হইবে না।

পরদিন বুঝিলাম বাড়িওয়ালা সত্যই নোটিস্ দিয়াছেন। কারণ নোটিস্খানাও ছেলেটি অভ্যস্ত রীতিতে চীৎকার করিয়া পাড়ার লোককে শুনাইয়া দিল।

আরও প্রায় পনের দিন ছেলেটির অত্যাচার সহ্য করিলাম। তাহার পর

তাহার উঠিয়া যাইবার দিন। সকালে একখানা ঘোড়াগাড়ি আসিয়া পৌঁছিল। গাড়িতে কি কি সম্পত্তি উঠিল তাহা দেখা গেল না, কিন্তু সবই শুনিতে পাইলাম।

গাড়ি বাঁক ঘুরিয়া আমাদের গলিতে পৌঁছিল। গৃহিণী রান্নাঘরে আবদ্ধ ছিলেন, সুতরাং তাঁহার আর আমাদের বিজয়লাভের এই দৃশ্যটি দেখা হইল না।

গাড়ির দিকে চাহিলাম। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই ছেলেটির চীৎকার আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

দেখিলাম গাড়িতে মাত্র দুইটি প্রাণী। একটি প্রায় আশী বৎসরের বৃদ্ধ আর সেই ছেলেটি। ছেলেটি বৃদ্ধের কানের কাছে মুখ লইয়া চীৎকার করিয়া বলিতেছে—তাহার নূতন বাড়ির নম্বর। বৃদ্ধের চোখে আধ ইঞ্চি পুরু লেন্সের চশমা।

সহসা বুকে এক প্রবল ধাক্কা খাইয়া বসিয়া পড়িলাম। অর্দ্ধঅন্ধ কালা বৃদ্ধটির মৃত্যুর মত কালো পটভূমিতে ছেলেটির এতদিনের চীৎকার—তাহার বালকজীবনের বেদনাময় আত্মত্যাগের সমস্ত অর্থ লইয়া বিদ্যুতের মত ঝলকিত হইয়া উঠিল।

রৌদ্রোজ্জ্বল সকালটি আমার চোখে অন্ধকার হইয়া আসিল। এমন আত্মত্যাগী ছেলেটাকে মূঢ়তার নিষ্ঠুরতায় তাড়াইয়া দিলাম ?...

গৃহিণী তাড়াতাড়ি আসিয়া বলিলেন, ওরা চলে গেল বুঝি ?—তা হ'লে তোমাদেরই জিৎ হ'ল ?

সংক্ষেপে শুধু বলিলাম, হ্যাঁ, জিতেছি।

শ্রীপরিমল গোস্বামী

দিগ্‌গজের সাহিত্য-চর্চ্চা

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

সার্ব্বভৌম মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে অপরাহ্নের সভাটি বসিয়াছে। শকুন্তলা-পাঠ চলিতেছে। দিগ্‌গজের সেদিনের পাগলামির পর সার্ব্বভৌম মহাশয় যেন বইখানিতে নূতন কিছু দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার মন্তব্যের মধ্যে একটু নূতন সুর শুনিতে পাইতেছি। একটু পরেই দিগ্‌গজ দর্শন দিলেন। বর্ষণাসিক্ত গাছপালার উপর সোনালি কিরণ পড়িয়া চিকমিক করিতেছে। আজ দিগ্‌গজের বেশভূষাটা একটু ভদ্রগোছের, মাথায় অনেক দিন পরে তেল ও চিরুণী পড়িয়াছে। সেদিন খেদাইয়া দেওয়ার পর গত কয়দিন আর এদিকে আসেন নাই। সার্ব্বভৌম মহাশয় অভ্যর্থনার সুরে বলিলেন, "এসো দিগ্‌গজ। বৃষ্টিতে বুঝি এ কয়দিন বেরুতে পার নি। বসো, আমি সুধীশের পাঠটা সেরে নিই। পাঠ চলিতে লাগিল—

"অক্লিষ্টবালতরুপল্লবলোভনীয়ং
পীতং ময়া সদয়মেব রতোৎসবেষু
বিম্বাধরং......"

সার্ব্বভৌম মহাশয় প্রথামত ব্যাখ্যা করিলেন, দিগ্‌গজ উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল। ব্যাখ্যান্তে মন্তব্য করিলেন, "কামুক রাজার কেবল সম্ভোগের কথাই মনে পড়ছে, এখনও লো-ভ-নী-য়ং ও র-তো-ৎ-স-ব ভুলতে পারেন নি। দুষ্মন্ত চরিত্রের এই দিকটা লক্ষ্য কোরো।" দিগ্‌গজের মনের আবেগ ক্রমে মুখে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, মুখের পেশীর মৃদু আকুঞ্চন-প্রসারণ আরম্ভ হইল, ও ক্রমে তাহা স্পষ্ট মুখভঙ্গীতে পরিণত হইল। আবেগ রোধ করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, "ও কি কুব্যাখ্যা করছেন, সাব্‌ভোম দা !"

সার্ব্বভৌম মহাশয় প্রসন্ন দৃষ্টিতে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "সেদিন তোমায় তাড়না করলুম বটে ; কিন্তু তুমি একটা নূতন দৃষ্টি দিয়ে গেছ।"

দিগ্‌গজ খুসী হইল না। কিন্তু সংযত স্বরেই বলিল, "না, সাব্‌ভোম দা, আপনি মামুলিভাবে রাঘব ভট্টের পাণ্ডিত্য-কচ্‌কচিই দিয়ে যান ; চা'ন ত না হয়

শারদারঞ্জনের অতি-পাণ্ডিত্যও খানিক দিন। ছেলেদের বিচার-বুদ্ধিকে আর বিকৃত করবেন না।"

সার্ব্বভৌম মহাশয় একটু আহত সুরে বলিলেন,—"কেন, আমি কি বিচার-বিকৃতি করছি? তুমি ত এই কথাই সেদিন দেখিয়ে দিলে হে।"

দিগ্‌গজ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। ললাটে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "আমার দুরদৃষ্ট! আমি কি তাই বলছিলাম না কি? আমায় সব কথা বলতে দিলেন কই, চটে উঠে গালাগালি করে' তাড়িয়ে দিলেন যে।"

সার্ব্বভৌম মহাশয় আপনার ধৈর্য্যচ্যুতির কথা স্মরণ করিয়া একটু অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, "তবে তুমি সে দিন যা' বলছিলে তা' তা'-হলে তোমার মত নয়?"

দি—থামুন। সেদিন যে দুষ্যন্তের বিষয় আলোচনা হচ্ছিল, সে হচ্ছে প্রথম থেকে পঞ্চম অঙ্কের দুষ্যন্ত। আজ যে দুষ্যন্তের আলোচনা করছেন সে হচ্ছে ষষ্ঠ অঙ্কের দুষ্যন্ত। ভুলে যাচ্ছেন কেন যে মাঝে আট দশ বৎসর কেটে গিয়েছে? বয়সের সঙ্গে ও সুদীর্ঘ বিরহ-সন্তাপে রাজার চরিত্রের অনেক কিছু পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেছে, তা' লক্ষ্য করছেন না?"

আমি—সে কি রকম?

দিগ্‌গজ বেশ একটু অবজ্ঞার সুরে বলিলেন, "কালিদাসের মত মহাকবির সঙ্গে অন্য খুচরো কবিদের প্রভেদ এই যে, কালিদাস মানুষকে মানুষ করেই এঁকেছেন, শুধু কতকগুলা গালভরা কবিতা ঝুলিয়ে দেখাবার জন্য দোকানের কাচের জানালায় সাজান রঙ-করা পুতুল তৈরী করেন নি।"

সকলেই উৎকর্ণ হইয়া উঠিলেন। আমি বলিলাম, "আপনার বক্তব্যটা একটু পরিষ্কার করে বলুন।"

দি—পরিষ্কার ত সবই আছে। চোখ চেয়ে পড়বেন না, আমি কি করবো। নারায়ণ ভট্টের ভীম যারা বেণীসংহার নাটকখানা জুড়ে একটা অয়েল-ক্লথের গদা ঘুরা'তে ঘুরা'তে দাপাদাপি করে' বেড়াল'। আর আপনারা হাত তালির চোটে নিজের হাত ফাটিয়ে ঘনশোণিতশোণপাণি হ'লেন। ভবভূতির রামচন্দ্র সেই যে রুমাল হাতে করে' ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে ও মূর্চ্ছা যেতে আরম্ভ করলেন, শেষ পর্য্যন্ত আর সে হিষ্টিরিয়া সারল না। কোথাও চরিত্রের বিকাশ নাই। সব

পুতুল, দম-দেওয়া পুতুল, আগাগোড়া একই সুর আবৃত্তি করছে। কালিদাসের দুষ্যন্ত সত্যিকারের মানুষ, তাই তার চরিত্রের বিকাশ আছে। কালিদাসও ত অতি নিপুণ শিল্পী, তাকে নানা অবস্থায় ফেলেছেন,—কখনও মৃগয়ায়, কখনও প্রিয়-সম্ভাষণে, কখনও বিচার-সভায়, কখনও বিরহে, কখনও পুত্র-সমাগমে, কখনও প্রত্যাখ্যাতা প্রণয়িণীর সহিত পুনর্মিলনে। পাকা জহুরীর হাতের সুন্দররূপে কাটা, সুন্দররূপে বসান মহামূল্য রত্নের মত তা' থেকে কত বিচিত্রবর্ণের রশ্মি বিচ্ছুরিত করেছেন।

আমি—আজ যে দেখছি দুষ্যন্তের গুণগানে শতমুখ!

দি—বৃথা স্তবস্তুতি করছি না কি? যা আছে তাই দেখাচ্ছি। ষষ্ঠ অঙ্কের দুষ্যন্ত আর পূর্ব্ব অঙ্কের দুষ্যন্তে অনেক পার্থক্য। এই আট দশ বৎসরে পূর্ব্বের উদ্দামতা কেটে গিয়েছে। বহুপত্নিক রাজা বংশ-লোপের আশঙ্কায় ম্রিয়মাণ। "সমাপ্যন্তে পুরুবংশশ্রীরকাল ইবোপ্তবীজা ভূরেবংবৃত্তা।" (দিগ্‌গজ সুধীশের গ্রন্থ অধিকার করিয়া বসিলেন। সুধীশের অন্তর্ধান।) বোধ হয় যেন বার্দ্ধক্যের প্রথম শৈথিল্য অনুভব করতে পারছেন। রাজার অনুগ্রহে গর্ব্বিতা রাণী বসুমতী এখন রাজাকে সম্পূর্ণ পেয়ে বসেছেন। রাজার নির্জ্জনে থাকাও দুরূহ, বসুমতীকে লুকিয়ে এমনকি ছবিটি আঁকাও কঠিন। কারুর অধিকার নাই কোন সামান্য বস্তুটিও রাজাকে হাতে এসে দেন; চতুরিকা বর্ণকরণ্ডকটি নিয়ে যাচ্ছে দেখে তার হাত থেকে, আমি নিয়ে যাচ্ছি বলে' ছিনিয়ে নিলেন—পতি সেবাটা তার এমনই উগ্র ধরণের। রাজা তাকে রীতিমত ভয় করে চলেন, বসুমতী আসছেন শুনে শকুন্তলার অসম্পূর্ণ চিত্রখানি বিদূষকের কাছে দিয়ে লুকিয়ে ফেললেন, আর বিদূষক সেটি নিয়ে সরে পড়লেন। বয়সের সঙ্গে মানসিক তেজের এই নিষ্প্রভ ভাব লক্ষ্য করার বস্তু। আর এই ব্যাপিকা রাণীটিকে রাজপ্রাসাদের অন্য সকলে কি চোখে দেখতেন তা' বিদূষকের "অন্তঃপুরকালকূট" এই একটি কথাতেই প্রকাশ পাচ্ছে। রাজা কিন্তু রাণী বসুমতীকে কারুর চোখে হীন হ'তে দিতে চা'ন না। যখন শুনলেন আসতে আসতে পথ থেকে প্রতিহারী রাজকার্য্যের জন্য পত্র নিয়ে আসছে দেখে ফিরে গেছেন, তখন তাড়াতাড়ি বললেন, "কার্য্যজ্ঞা কার্য্যোপরোধং মে পরিহরতি।"

আমি—এটা খুব অন্যায় নয়; রাণী বসুমতী পাটরাণী, দেবী। কিন্তু বোধ

হয় রাণী বসুমতীর এতটা বাড়াবাড়ি হ'ত না, রাজা যদি না শকুন্তলার বিরহে উন্মনা থাকতেন।

দি—উন্মনা। এটা যে অলঙ্কারিকদের দশটি স্মরদশার মধ্যে উন্মাদ-দশা তা' দেখছেন না। চিত্রফলকে শকুন্তলামূর্ত্তি দেখতে দেখতে তাকে প্রকৃত শকুন্তলা বলে' ভ্রম হচ্ছে। প্রণয়িণীর ধ্যানে এই গভীর তন্ময়তাই উন্মাদ-দশা। (কালিদাসের হাতেরই আর একটি উন্মাদ-দশার চিত্র "বিক্রমোর্ব্বশী"তে মনে পড়ছে ? মিলিয়ে দেখলেই বুঝবেন :সেটি কত কাঁচা কাজ।) বিদূষক যখন স্মরণ করিয়ে দিল যে এটা চিত্র, রাজা চমকে উঠলেন, "কথম্ চিত্রম।" এই বিরহ বর্ণনাটি বড় নিপুণ হাতের কাজ। "বিক্রমোর্ব্বশী"র পুরুরবার সে উদ্দাম ভাব দুষ্মন্তে নাই। কবি এই বিরহের আরম্ভ থেকে রাজার মনোভাব চিত্রিত করেছেন কেবল কয়েকটি নিপুণ তুলির সূক্ষ্ম স্পর্শে। অঙ্গুরীয় দর্শনে শাপরুদ্ধ শকুন্তলার স্মৃতি রাজার হৃদয় কূলে কূলে প্লাবিত করে ফেলল, তাই "মুহূর্ত্তং প্রকৃতিগম্ভীরোঽপি পর্য্যুৎসুকনয়ন আসীৎ।" চোখদুটি জলে ভরে' এল। ক্রমে আর কিছু ভাল লাগে না। রাত্রে ঘুম হয় না, শয্যায় এপাশ ওপাশ করেন।

রম্যং দ্বেষ্টি যথাপুরা প্রকৃতিভির্ণ প্রত্যহং সেব্যতে
শয্যাপ্রান্তবিবর্ত্তনৈর্বিগময়ত্যুন্নিদ্র এব ক্ষপাঃ।
দাক্ষিণ্যেন দদাতি বাচমুচিতামন্তঃপুরেভ্যো যদা
গোত্রেষু স্খলিতস্তদা ভবতি ব্রীড়াবিলক্ষশ্চিরম্॥

নগরে বসন্ত উৎসবের কোলাহল ভাল লাগে না। "প্রভবতো বৈমনস্যাদুৎসবঃ প্রত্যাখ্যাতঃ।" উৎসব বন্ধ করে' দিলেন। রাজকার্য্যে আর মন লাগে না, অমাত্যগণকে বলেন তদারক করে' একটা রিপোর্ট পাঠিয়ে দিতে, তাই দেখেই একটা বিচার করে' দেন। এই পশ্চাত্তাপের মধ্যে দুটি কারণ আছে। নিরপরাধী নিরাশ্রয়া পত্নীর উপর নিষ্ঠুর অবিচার, ও অপত্যহীন রাজার সন্তানসম্ভাবিতা পত্নীত্যাগ। স্মৃতি চায় সেই রূপ ধ্যান করতে, সেই তপোবন, সেই স্রোতাবহা মালিনী নদী, সেই বেতসকুঞ্জ, সেই স্নিগ্ধনয়ন মৃগগুলির মাঝে অবসেকস্নিগ্ধ তরুপল্লব চূতপাদপের ছায়ায় ঘুরে' বেড়াতে। আরম্ভ করলেন সেই সকল বস্তুর মধুর স্মৃতি অবলম্বন করে' চিত্রাঙ্কন করতে। চিত্র সম্পূর্ণ হ'ল না, শকুন্তলার মূর্ত্তি দেখতে দেখতেই তন্ময় হ'য়ে গেলেন। এই অবস্থায় ষষ্ঠ অঙ্কের দুষ্মন্ত আমাদের

চোখে দেখা দিলেন। কবি দারত্যাগী মহাপাতকীকে ভুলে গেছেন, অপূর্ব্ব বিরহীর বিরহাশ্রুতে আপনার চোখের জল মিশিয়েছেন। আমাদের অধরের উদ্যত তিরস্কার কোথায় মিলিয়ে গেল। কঞ্চুকীর কথার প্রতিধ্বনি করে' বলতে হয়, "অহো সর্ব্বাস্ববস্থাসু রমণীয়ত্বমাকৃতিবিশেষাণাম্।"

আমি—চিত্রটি ত বেশ আঁকলেন। মাঝখান থেকে মাতলীর আবির্ভাব ও দুর্জ্জয় নামে দানবগণের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে মূল রসের স্বাভাবিক বিকাশে বাধা দেওয়া হ'ল না কি ?

দি—একটু অলঙ্কারশাস্ত্র যদি পড়তেন ত জানতেন বীররসটা শৃঙ্গাররসের অনুকূল, প্রতিকূল নয়। কিন্তু এই সমস্তই শকুন্তলার সঙ্গে মিলনের উপায়ান্বেষণ মাত্র। সানুমতী অপ্সরা ত বলেই দিলেন যে মহেন্দ্র-মাতার কাছে শুনেছেন যে দেবতারা এইরূপ ব্যবস্থা করেছেন যা'তে শীঘ্রই পতিপত্নীর মিলন হয়।

—দৈবানুকূল বা দৈবপ্রতিকূলতা সম্বন্ধে কালিদাসের কি ধারণা ছিল, তা'র বেশ একটি সূক্ষ্ম আভাস এখান থেকে পাওয়া যায়। প্রতিকূল দৈব শান্ত করতে কণ্বমুনি সোমতীর্থ গিয়েছেন শোনা গেল। তাঁর অনুপস্থিতিতে শকুন্তলার বিবাহ ও সুলভ-কোপ দুর্ব্বাসার শাপ। দৈব প্রতিকূলতা ত্যাগ করল না ;—স্বামী গৃহে যাবার পথে শচীতীর্থে অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়টি জলে পড়ে' গেল। রাজা শকুন্তলাকে চিনতে পারলেন না, ত্যাগ করলেন। গোতমী ও কণ্বশিষ্যও তাকে ত্যাগ করে' চলে এলেন। দৈববিড়ম্বনা পূর্ণ-মাত্রায় ভোগ করতে হ'ল। কিন্তু কিংপুরুষ-পর্ব্বতে সুরাসুরগুরু মহামুনি মারীচের আশ্রমে বাস, মুনিপত্নীর সাহচর্য্য ও মহেন্দ্র-মাতা কর্ত্তৃক সান্ত্বনা যে দুর্ভাগ্যের ফল, তা'কে যেন সৌভাগ্য বলতেই ইচ্ছা হয়। এইখানেই দুষ্মন্তের সঙ্গে মিলন,—কণ্ব কর্ত্তৃক গ্রহশান্তির ফল। অদৃষ্টের অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মসঞ্চিত কর্ম্মের ফল কেউই এড়াতে পারেন না ; মানুষের চেষ্টায় দুঃখের লাঘব হয় বা পরিণামে সুখ হয় মাত্র। শকুন্তলাও বলেছেন, "ণূণং মে সুঅরিঅপ্পড়িবন্ধঅং পুরাকিদং তেসু দিঅহেসু পরিণামমুহং আসি"—নিশ্চয়ই সে সময় আমার পূর্ব্বজন্মকৃত কোন সুখপ্রতিবন্ধক কার্য্য পরিণামমুখ হয়েছিল। কালিদাসের দৈব ইউরোপীয়দের অবগুণ্ঠিতা রহস্যময়ী নয়, বা তাদের মত পরিপূর্ণ সুখের মাঝে অহেতুক দুঃখের মরুভূমি সৃষ্টি করে না।

আমি—এই মিলনটা বড়ই নীরস নয় কি ?

দিগ্‌গজ এতক্ষণ আপন মনে কথা বলিতে বলিতে শান্তমূর্ত্তি হইয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। "কি রকম মিলন চা'ন আপনি, শুনি। গলা ধরে বেল্লিকপনা করবে, না জড়িয়ে ধরে' গিয়ে খিল দেবে? মহেন্দ্রসখা প্রৌঢ় রাজা পুত্রের সামনে, তপস্বিনীদের সামনে পায়ে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা ছাড়া আর বেশী কিছু করলে তাঁর মর্য্যাদা রক্ষা হ'ত কি? শরৎ চাটুজ্জেই পড়ুন, আপনাদের মনের আর রুচির উপযুক্ত খোরাক পাবেন। কালিদাস ছোঁবেন না, জানবেন ওটা দেবমন্দির, শুঁড়িখানা নয়।"

দিগ্‌গজ রেগে উঠে পড়ল। যাবার সময় সার্ব্বভৌম মহাশয়কেও প্রণাম করিতে ভুলিয়া গেল। সার্ব্বভৌম মহাশয় আজ কোন কথাই বলেন নাই, প্রসন্নমুখে দিগ্‌গজের কথা শুনিতেছিলেন। এইবার হাসিয়া বলিলেন, "রাগালে কেন? আজ উন্মাদ বড় আনন্দ দিয়ে গেল।"

সুধীশ আফিমের কৌটা ও চা লইয়া উপস্থিত হইল। চায়ের সহিত সকলে মিলিয়া আলোচনার গুঞ্জনধ্বনি তুলিল।

(তৃতীয় প্রস্তাব)

দিগ্‌গজ আবার সর্ব্বভৌম মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে অপরাহ্লের সভায় উপস্থিত। আসিয়াই আমার সামনে জোড়হস্ত। "সেদিন তোমায় রাগের মুখে কি না কি বলে গিয়েছি, ভায়া। কিছু মনে করো না।" সকলে তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলাম। সার্ব্বভৌম মহাশয় ক্রমেই তাহার প্রতি সদয় হইয়া উঠিতেছিলেন। আমরা স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম তাহার সাহিত্য-চর্চ্চায় বিচারের ভারকেন্দ্রে একটা গোলযোগ আছে, কিন্তু বেশ মজার মজার কথা বলে। সর্ব্বভৌম মহাশয় বলিলেন, "কিন্তু তুমি হঠাৎ অত চটে গেলে কেন বল ত?"

দিগ্‌গজের ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। বলিলেন, "এঁদের এই সব খেলো মন্তব্য শুনে। সুরাসুরগুরু মারীচের আশ্রমে মিলন হচ্ছে সসাগরা ভারতের সম্রাট মহেন্দ্রসখা রাজা দুষ্মন্তের সঙ্গে বিশ্বামিত্র-কন্যা ও কণ্বমুনির পালিত দুহিতা শকুন্তলার, আর বলে কি না—ছিঃ।"

আমিও একটু উষ্মার সহিত বলিলাম,—"আচ্ছা, আচ্ছা, কালিদাস লিখছেন ত শৃঙ্গাররসপ্রধান নাটক; এত মুনি, ঋষি, আশ্রম—এ সব কেন বাপু? প্রেম

করবার কি আর স্থান নাই, আর কল্প বৃক্ষের ছায়া ছাড়া কি মিলনের আর স্থান কল্পনা করতে পারলেন না?"

দিগ্‌গজ এইবার অবজ্ঞাসূচক মুখভঙ্গী করিল। বলিল, "কালিদাসের প্রেম সম্বন্ধে একটা ধারণা ছিল, সেটা না বুঝলে তাঁর গ্রন্থ বোঝা সহজ নয়।"

আমি সুধা'লাম, "থিওরি! কি থিওরি?"

দি—স্ত্রী পুরুষের প্রথম আকর্ষণের মধ্যে শারীরিক আকর্ষণটাই বেশী থাকে। তাই পুষ্পাভরণা পার্ব্বতী মধু-মন্মথের আবির্ভাবের সময় তরুণার্করাগ বসন পরে' মহাদেবের তপোবনে প্রবেশ করছেন। দুষ্মন্তও শকুন্তলার শারীরিক সৌন্দর্য্যের স্তবগানে পঞ্চমুখ। এই আকর্ষণ কিন্তু ক্ষণস্থায়ী; যতক্ষণ না এই রূপজ মোহের অন্তরে প্রকৃত প্রেমের বীজ জন্মায় ততক্ষণ ভয় থাকে বুঝি বা একটা অনর্থ ঘটে যায়;—মদনভস্ম হয়, দুর্ব্বাসা শাপ দিয়ে বসে। তারপর দীর্ঘ বিরহের উত্তাপে, অবস্থার পরিবর্ত্তনে প্রেমের প্রথম উচ্ছলিত ফেনা দূর হয়। প্রকৃত প্রেম তপস্যালব্ধ বস্তু, তার জন্য সাধনার প্রয়োজন, এই কালিদাসের থিওরি। এ প্রেমের মিলন-ক্ষেত্র তাই মুনি ঋষির আশ্রম, পার্ব্বতীর তপোবন। প্রকৃত প্রেমের এই নির্ম্মলরূপ তার জন্মের সময় কতকটা প্রচ্ছন্ন থাকে, কিন্তু তা' থাকে। তাই শকুন্তলা-দুষ্মন্তের প্রণয়-কাহিনীর আরম্ভও কণ্বমুনির তপোবনে।

আমি—ভাল! সেইখানেই পুনর্মিলন ঘটালে কি দোষ ছিল? আবার মারীচের আবির্ভাব কেন?

দি—হা অদৃষ্ট! এতক্ষণ বৃথাই বকলাম। কালিদাসের চোখে কণ্বমুনির তপোবন গার্হস্থ্যাশ্রম থেকে খুব বেশী তফাৎ নয়। এখানেও সংসারী লোকের মেয়ের বিয়ের ভাবনা আছে, পালক পিতার পালিতা কন্যার প্রতি স্নেহমমতার অভাব নাই। শকুন্তলাকে স্বামীগৃহে পাঠিয়ে দিয়েও কণ্ব অনসূয়া প্রিয়ংবদার বিবাহের কথা ভাবছেন ("ইমে অপি প্রদোয়")। কল্পবৃক্ষবনে মারীচের তপোবন সাংসারিক সকল দুর্ব্বলতা-দুশ্চিন্তার, সকল মোহের অতীত স্থান। অন্য মুনির পক্ষে যা তপস্যার, আকাঙ্ক্ষার বস্তু তা' এখানে সুলভ। সকল কাম্য বস্তুর প্রাচুর্য্যের মধ্যে যে নির্লেপ কালিদাসের চোখে তা' হ'ল তপস্যার আদর্শ। সমস্ত জীবন ধরে' এই আদর্শ কালিদাসের মনে গড়ে' উঠেছিল, তা-ই এই তাঁর শেষ জীবনের গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন।

আমি—শকুন্তলাকেই তা' হ'লে আপনি কবির শেষ গ্রন্থ বলে মনে করেন? রঘুবংশ বা কুমারসম্ভব নয়?

দি—হাঁ নিশ্চয়। কালিদাসের যতগুলি গ্রন্থ এখন পাওয়া যায়, তার মধ্যে শকুন্তলাই নিঃসংশয়ে শেষ গ্রন্থ, বোধ হয় তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যেও এইখানাই শেষ গ্রন্থ। কবির মনটা এখন বানপ্রস্থের শান্তিপূর্ণ তপোবনের আকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ। শকুন্তলার রূপ বর্ণনা করতে গিয়েও "অখণ্ডপুণ্যানাং ফলমিব" বলেছেন। তারপর শকুন্তলার ভরতবাক্যটা একবার পড়ে দেখুন না।—

মমাপি চ ক্ষপয়তু নীললোহিতঃ
পুনর্ভবং পরিগতশক্তিরাত্মভূঃ।

শক্তিধর আত্মযোনি নীললোহিত আমারও পুনর্জন্ম বিনাশ করুন,—এটা মহাজ্ঞানী বৃদ্ধের কথা, যিনি মৃত্যুর পদক্ষেপ শুনতে পাচ্ছেন ও মৃত্যুর পরপারে জন্মমৃত্যুর অনন্ত পরম্পরা দেখতে পাচ্ছেন, আর জানেন যে মহাদেব ইচ্ছা করলেই এই অনন্ত প্রবাহ রোধ করতে পারেন। রাজাও বার্দ্ধক্যের প্রথম শীতল স্পর্শ অনুভব করতে পারছেন, তাঁর মুখে এই উক্তি সুশোভন হ'য়েছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এ কবিরও অন্তরের বাণী।

তারপর দেখুন না কবির রচনা-কৌশল। সমগ্র নাটকখানায় একটা চরিত্র নাই যেটাকে অতিরিক্ত বলা যেতে পারে, একটা ঘটনা নাই যেটা না হ'লে চলত। একটা ছোট ঘটনা দেখুন দেখি। দুর্ব্বাসা যখন কণ্বমুনির আশ্রমে অতিথি হ'তে এলেন, তখন শকুন্তলারই অতিথিসৎকার করার কথা, কারণ এ ভার কণ্বমুনি শকুন্তলার উপরই দিয়ে গিয়েছিলেন। অনুসূয়া প্রিয়ংবদা দুজনেই ফুল তুলতে ব্যস্ত। শকুন্তলার সৌভাগ্য-দেবতার অর্চ্চনা করতে হ'বে, তাই বেশী করে' ফুল তুলছে,—এই একটি ছোট কৌশলেই কবি বহুক্ষণ একাকিনী রেখে শকুন্তলাকে দুষ্মন্ত-চিন্তায় বাহ্য-জ্ঞানশূন্য হ'য়ে তন্ময় হ'য়ে যাবার অবসর দিয়েছেন। তারপর যখন দুর্ব্বাসা শাপ দিয়ে হন্‌হন্ করে চলে যাচ্ছেন তখন তাঁকে প্রসন্ন করতে এল প্রিয়ংবদা, অনসূয়া নয়। অনসূয়া একটু বয়সেও বড়, আর তার স্বভাব ও কথাবার্ত্তায় এমন একটু মাধুর্য্য কবি মিশিয়ে দিয়েছেন যে অনসূয়া যদি আসত ত কোপনস্বভাব দুর্ব্বাসাও হয়ত নরম হ'য়ে যেতেন। কবি এই সময় কৌশলে অনসূয়াকে হোঁচট খাইয়ে তার হাতের ফুলে ভরা সাজিটা ফেলে দিলেন, আর তাকে ফুল কুড়াতে লাগিয়ে দিলেন। সব দিক বজায় রহিল।

আচ্ছা, আর একটা ছোট ঘটনা দেখুন। প্রথম অঙ্কে দুষ্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার পরিচয় হ'ল। এখনও অতিথি-সৎকার করা হয়নি, আতিথ্য গ্রহণ করতেও বলা হয়নি। আতিথ্য গ্রহণ করতে অনুরোধ করতেও কুমারীদের বাধছে। এমন সঙ্কট-মুহূর্ত্তে কবি সহজে কুমারীদের কুটীরে পাঠিয়ে ও রাজাকে সরিয়ে দিলেন স্যন্দনালোকভীত গজের ধর্ম্মারণ্যে প্রবেশ ঘটিয়ে। যে যার দিকে সরে গেল, সখীরা একটু অর্দ্ধ-নিমন্ত্রণ করে' গেলেন দুষ্মন্তকে,—অজ্জ, অসংভাবিদ-অদিহিসক্কারং ভূ বি পেক্‌খণনিমিত্তং লজ্জেমো অজ্জং বিণ্ণ বিচ্চুং। সব দিক বজায় রইল।

এই রকম সুক্ষ্ম জহুরীর কাজ সমস্ত নাটকটাতে ভূরি ভূরি আছে। একটু চোখ চেয়ে পড়বেন, নজরে আসবে। এগুলা খুব পাকা হাতের কাজ।

আমি—কতকগুলা প্রবেশক, বিস্কম্ভক দিয়ে, আর শ্যাল, ধীবর, রক্ষী প্রভৃতি জুটিয়ে জঞ্জাল বাড়ান হয়েছে না?

দি—আহা কি বিচার। প্রবেশক আর বিস্কম্ভকে যে ঘটনাগুলা বলা হ'য়েছে সেগুলা কি করে' জানান যেত বলুন। হয় নাটকের কোন পাত্র পাত্রীর মুখে ঘটনাগুলার বিবরণ জুড়ে দিতে হ'ত, না হয় প্রাচীন গ্রীকদের মত একটা কোরাস্ সৃষ্টি করতে হ'ত। প্রথম উপায়ে নাটকের নাটকীয়ত্ব লোপ পেয়ে কতকটা উপাখ্যানের ভাব আসত, আর দ্বিতীয়টার মত স্থূল অসুন্দর পন্থা নাট্যজগতে আর কিছুই নাই।

আর একটা কথা। এই সকল গৌণ চরিত্রের অবতারণা করাতে সেকালের বাস্তবজীবনের কি সুন্দর ছবি ফুটে উঠেছে ভেবে দেখুন দেখি। দুষ্মন্তের রাজ্যের রক্ষিপুরুষ দুটি ঠিক আজকালকার দুটি জীবন্ত পুলিসম্যান নয় কি?—বিনা কারণে ধৃত-ব্যক্তির পীড়ন, মৃত্যুর ভয় দেখান, রাজদত্ত অর্থ দিতে গিয়ে কটমট করে চাওয়া (অর্থাৎ আমাদেরও ভাগ দাও), আর ভাগ পাবা মাত্রই গলা জড়িয়ে ধরে' মিতালি করা ও সেই মিতালির শুঁড়িখানায় সমাপ্তি,—সমস্ত দৃশ্যটাই একটা ছবির মত, প্রচ্ছন্ন হাস্যরসে রঞ্জিত।

চতুর্থ অঙ্কের আরম্ভের বিস্কম্ভকটি মণিমাণিক্যখচিত একখানি ছোট অলঙ্কারের

মত মনোরম। অনসূয়া প্রিয়ংবদাকে কবি অনেকখানি নেপথ্যে রেখেছেন। এই ছোট একটু বিস্কম্ভকে আর অঙ্কের আরম্ভের কথোপকথনে দুজনের মনের একটা কুটুরী তিনি হঠাৎ খুলে দিয়েছেন। অনসূয়ার কথাগুলা একটু ভেবে দেখুন,—"দুক্‌খশীলে তবস্‌সিজনে কো অব্‌ভত্থীঅদু। ণং সহীগামী দোসো ত্তি ববসিদা বি ণ পারেমি পবাস পড়িনিউত্তস্‌স তাদ কস্‌সবস্‌স দুস্‌সন্তপরিণীদং আবন্নসত্তং সউন্দলং নিবেদিদুং।" তপস্বীরা যে নিয়তই উপোষ-তিরেষ নিয়ে আছেন, সাংসারিক কাণ্ডজ্ঞান যে তাঁদের অল্পই, অন্তঃসত্ত্বা কন্যাকে পতিগৃহে পৌঁছে দিয়ে আসতে হ'বে এ খেয়াল নাই, এটা বুদ্ধিমতী অনসূয়ার ভাল লাগে নি, এই সকল কৃচ্ছ্রসাধনের উপর একটু সূক্ষ্ম শ্লেষ আছে তার কথায়। শকুন্তলা যে পিতার মতের অপেক্ষা না করে' রাজাকে আত্মদান করে' ভাল কাজ করেনি, এ কথাটা অনসূয়ার মনে ক্রমেই স্পষ্ট হ'য়ে আসছে, আর সেই সঙ্গে এই ব্যাপারে যে তার নিজের উৎসাহ দেওয়াটা ভাল হয়নি, এই ভাবনা একটা প্রচ্ছন্ন কাঁটার মত মনে বিঁধছে, তাই তাত কাশ্যপের কাছে এ ব্যাপার নিবেদন করতে "ন পারেমি", তাই "ণ মে উইদেসু বি নিঅ করণিজ্জেসু হত্থ পাআ পসরন্তি"—নিজের কর্ত্তব্য কার্য্য করতেও হাত পা উঠছে না। এই ঈষদ-ব্যক্ত অনুশোচনাটি অনসূয়ার চরিত্রকে কেমন রমণীয় করে' তুলেছে বলুন দেখি।

প্রিয়ংবদার ব্যবহার ও কথাবার্ত্তাতেও তার চরিত্রের একটা অংশ বেশ খুলে গেছে এইখানে। কবির এখানেও বাহাদুরী কম নয়। "বঅং দাব উক্কণ্ঠং বিণোদইস্‌সাবো। যা তপস্বিনী নিব্বুদা হোদু।" আমাদের উৎকণ্ঠাও শেষ হ'ল। সে বেচারী ত সুখী হ'ক। নিজের কথা প্রিয়ংবদা ভাবতেই পারে না, শকুন্তলার কথা না ভেবে। হর্ষ ও বিষাদের যে জোড়া সুরে প্রিয়ংবদার কণ্ঠে এইখানে বেজে উঠেছে তা অপূর্ব্ব।

আমি—তা' হ'লে আপনি শকুন্তলাকে একখানা নিখুঁত নাটক বলেন?

দি—খুঁত সব বস্তুতেই দেওয়া চলে। তবে একটা অপূর্ব্ব সৃষ্টি বলি।

সার্ব্বভৌম মহাশয় আনন্দে উঠিয়া দিগ্‌গজকে আলিঙ্গন করিলেন। দিগ্‌গজ নীরবে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইল।

শ্রীসুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ভারতপথে*

(২২)

মিসেস্ মূরের ভাবে কিন্তু মনে হলো না এডেলাকে সাহায্য করার ইচ্ছা ওঁর আছে। কি রকম একটা রাগে উনি যেন তেতে উঠেছিলেন। ওঁর খ্রীষ্টীয় কোমলতা হয় পেয়েছিল লোপ, নয় পরিণত হয়েছিল রূঢ়তায়—সমগ্র মানব জাতির উপরই যেন ওঁর আক্রোশ এবং সঙ্গত কারণে। আজিজের গ্রেপ্তার সম্বন্ধে উনি ছিলেন একেবারে নির্ব্বিকার, কাউকে এই ব্যাপার নিয়ে ভালোমন্দ একটি প্রশ্ন পর্য্যন্ত উনি করেন নি। আর মহরমের সেই ভীষণ রাতে যেদিন মুসলমানের দল ওঁদের বাংলো চড়াও করবে এই আশঙ্কা হয়েছিল, সেদিন পর্য্যন্ত উনি নারাজ হলেন বিছানা ছেড়ে একটু নড়ে বসতে।

এডেলা আবার প্রায় কাঁদবার উপক্রম ক'রে বলল, "জানি এসব কিছু না—আমার অবুঝ হলে চলবে না, চেষ্টা তো করছি—। অন্য কোথাও এই ব্যাপার ঘটলে কিছু হোতো না—কিন্তু কোথায় যে সত্যি ঘটেছে তা জানি না।"

রনির মনে হোলো এডেলার কথার ভাব ও ধরতে পেরেছে। যে গুহার মধ্যে এই ব্যাপার ঘটেছিল তা সনাক্ত করা কিম্বা তার বর্ণনা করা ওর সাধ্যাতীত, এই ব্যাপার সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা করতে পর্য্যন্ত ও প্রায় নারাজ ছিল, সুতরাং জানা কথা যে আসামীর পক্ষ মোকদ্দমার সময়ে এই নিয়ে মহা হৈ চৈ করবে। রনি ওকে বুঝিয়ে বলল মারবারের গুহাগুলো সবাই জানে একেবারে একরকম; এমন কি ভবিষ্যতে এই জন্যে চূণ দিয়ে সেগুলোতে নম্বর মারা হবে ঠিক হয়ে গিয়েছিল।

"হ্যাঁ, আমার সত্যি তাই মত, অন্তত ঠিক করে কিছু বলা চলে না। কিন্তু এই প্রতিধ্বনির আওয়াজ কিছুতে আমার কান থেকে যাচ্ছে না।"

* E. M. FORSTER-এর বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস A PASSAGE TO INDIA আস্বাদ্য সমান উপাদেয় হইলেও আকারে এত বড় যে সম্পূর্ণ বইখানির তর্জ্জমা ধারাবাহিক ভাবেও প্রকাশযোগ্য নহে। সেইজন্য অগত্যা আমরা আখ্যায়িকার সারটুকুই নিয়মিতরূপে মুদ্রিত করিব। কিন্তু হিরণকুমার সান্যাল মহাশয় সমগ্র গ্রন্থখানিই ভাষান্তরিত করিতেছেন এবং নির্ব্বাচিত অংশের প্রকাশ 'পরিচয়ে' সমাপ্ত হইলেই তাঁহার সম্পূর্ণ অনুবাদ পুস্তকাকারে বাহির হইবে।—পঃ সঃ

মিসেস্ মূর জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রতিধ্বনির কথা কি বলছ ?" এই প্রথম তিনি এডেলার দিকে নজর দিলেন।

"কিছুতে তা যাচ্ছে না।"

"কখনো যে যাবে তা মনে হয় না।"

রনি তার মাকে পরিষ্কার বলে দিয়েছিল যে এডেলার হাল একটু বিগড়ে আছে। কিন্তু তবু ভদ্রমহিলা ওকে ইচ্ছে করে যেন নাস্তানাবুদ করার চেষ্টা করছিলেন।

"আচ্ছা মিসেস্ মূর, এই প্রতিধ্বনি কিসের ?"

"তা, জানো না ?"

"না—সত্যি এ কি, বলুন না ? আমার কি রকম মনে হোলো আপনি বলতে পারবেন···আমি তাহলে যে কিরকম শান্তি পাই···"

"যদি জানো না তো জানো না, আমি বলতে পারি না।"

"যদি না বলেন তো আপনি ভারি নির্ম্মম।"

ভদ্রমহিলা একেবারে খিট মিট ক'রে উঠে বললেন, "বলো, বলো, বলো—কিছু যেন বলা যায়। সারা জীবন কাটল ব'লে বা অন্যের বলা শুনে, শুনেছি একটু অতিরিক্ত। আর কেন, এখন একটু শান্তিতে থাকতে দাও না।" একটু তিক্তসুরে তিনি বলে চললেন, "না—সবার কথা বলছি না। অবশ্য তোমরা চাও আমি মরি। কিন্তু তোমার আর রনির বিয়ে দেখে আর ছোট দুটিকে দেখে আর তারা বিয়ে করতে চায় কিনা তা দেখে—তারপর আমি আমার নিজের এক গুহার মধ্যে অন্তর্দ্ধান করব।" এই ব'লে তিনি একটু হাসলেন, যেন যা বললেন তা নিতান্ত অসম্ভব নয়, ফলে তাঁর কথার তিক্ততা আরো বেড়ে গেল। "এমন একটা জায়গায় যাব যেখানে তরুণ তরুণীরা এসে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রে উত্তরের অপেক্ষায় হাঁ ক'রে থাকবে না। একটা নিরালা কোণ।"

"তা ঠিক। কিন্তু এদিকে মোকদ্দমার দিন এগিয়ে আসছে"—উত্তেজিত হ'য়ে রনি বল্‌ল—"আর আমাদের সবারই মত এই যে এখন ঝগড়াঝাঁটি না ক'রে এক জোটে কাজ ক'রে পরস্পরকে সাহায্য করাই সঙ্গত। সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তুমি কি এই কথা বলবে নাকি ?"

"সাক্ষীর কাঠগড়ায় আমি কি দুঃখে যাব ?"

"আমাদের তরফ থেকে দু চারটে ব্যাপার প্রমাণ করা দরকার—সেইজন্যে।"

"তোমাদের ঐ পদের আদালতে যেতে আমার বয়ে গেছে—আমাকে যে টেনে নিয়ে যাবে ভেবেছ তা হচ্ছে না।"

"না, না, আমি নিয়ে যেতে দেব না।—আমার জন্যে অনর্থ আমি হতে দিচ্ছি না"—এডেলা এই কথা ব'লে আর একবার চেষ্টা করল ওঁর হাত ধরতে, কিন্তু উনি আবার তা টেনে নিলেন। "ওঁর সাক্ষ্যের আদৌ প্রয়োজন নাই।"

"আমার মনে হয়েছিল সাক্ষি দিতে উনি নিজেই চাইবেন। ভেবো না তোমাকে কেউ দোষ দিচ্ছে, মা, কিন্তু এ কথা তো অস্বীকার করতে পারো না যে প্রথম গুহাতেই তুমি কেটে পড়লে আর এডেলাকে দিলে ঐ লোকটার সঙ্গে যেতে, তার চেয়ে তুমিও যদি ভালো মানুষটির মতন সঙ্গে সঙ্গে যেতে এত অনর্থ কিছুই ঘটত না। লোকটার সব চক্রান্ত, তা জানি, কিন্তু তোমার আগে ফিলডিং আর এ্যাণ্টনির মতন তুমিও বেশ ওর ফাঁদে পা দিলে···কিছু মনে কোরো না খোলাখুলি কথা বলছি বলে, কিন্তু আদালত সম্বন্ধে এরকম একটা বিপুল অবজ্ঞার অধিকার তোমার মোটেই নাই। শরীর খারাপ থাকে তো সে কথা আলাদা, কিন্তু নিজেই তো বলছ বেশ ভালো আছ, আর দেখেও তাই মনে হচ্ছে ; এ ক্ষেত্রে আমি মনে করেছিলাম তোমার কর্ত্তব্য তুমি করবে—সত্যি।"

সোফা থেকে উঠে রনির হাতে হাত দিয়ে এডেলা বল্‌ল, "শরীর খারাপ থাকুক চাই না থাকুক, এই নিয়ে ওঁকে বিরক্ত করতে আমি দেব না।" ব'লেই সে রনির হাত ছেড়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ধপ ক'রে আবার ব'সে পড়ল। কিন্তু রনি বেশ খুসি হোলো যে এডেলা আবার ওর দলে ভিড়ে ওর মাকে খুব করুণার সঙ্গে দেখছে।

মা সম্বন্ধে রণির কেমন একটা অস্বস্তির ভাব বরাবরই ছিল। লোকে ওঁকে যতটা ভালো মানুষ মনে করত মোটেই উনি তা ছিলেন না, তার ওপর ভারতবর্ষে এসে ওঁর সব বাঁধন পেয়েছিল লোপ।

ভদ্রমহিলা ভীষণ অস্থির হ'য়ে পড়েছিলেন, ওঁর ব্যবহারও হ'য়ে উঠেছিল কেমন যেন অশোভন। হাঁটু চাপড়ে উনি বললেন, "তোমাদের বিয়েতে আমি যোগ দেব, কিন্তু মোকদ্দমায় দেব না। তারপর ইংল্যাণ্ডে যাব।"

"আগেই তো ঠিক হ'য়েছে মে মাসে তোমার যাওয়া হবে না।"

"আমার মত বদলে গেছে।"

অসহিষ্ণুভাবে পায়চারি করতে করতে, রনি জবাব দিল, "যাক আর কথা কাটাকাটি ক'রে লাভ কি? এরকম যে হবে তা ভাবিনি। তুমি তো চাও সব কিছু থেকে তফাৎ থাকতে? বাস্।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উনি বললেন, "এই পোড়া শরীর—কিছুতে কি এতে বল হবে না? কেন যে ছাই বেশ পা চালিয়ে স'রে পড়তে পারি না, কেন যে কাজ শেষ ক'রে পালাতে পারি না। একটু হাঁটতে গেলেই কেবল মাথা ধরা আর হাঁস ফাঁস করা। আর সব সময়েই হয় এটা করো, না হয় ওটা করো, একবার তোমার মন জুগিয়ে, আর একবার ওর মন জুগিয়ে, আর সবই শুধু সহানুভূতি আর গণ্ডগোল আর পরস্পরের ভার বহন করা। এটা ওটা সব কিছু নিজের মন জুগিয়ে করা চলবে না কেন? বেশ সব সাঙ্গও হবে আর আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচব। কেন যে একটা কিছু করতেই হবে বুঝি না। কেন বাপু কেবল এই বিয়ে বিয়ে বিয়ে?…যদি বিয়ে এত কাজের জিনিষই হোতো, তাহলে বহু যুগ আগেই সমস্ত মানবজাতি পরিণত হোতো গোটা একটা মানুষে। আর কি যে বাজে বকে লোকে 'ভালবাসা' 'ভালবাসা' ব'লে—চার্চে ভালবাসা, গুহার মধ্যে ভালবাসা—যেন তফাৎ সত্যি কিছু আছে, আর আমি মাঝখান থেকে আটকে পড়েছি এই সব তুচ্ছ জিনিষ নিয়ে। গেরো!"

বিরক্ত হয়ে রনি বল্‌ল, "আচ্ছা, তুমি চাও কি? সোজা কথায় তা বলতে পারো? পারো তো ব'লেই ফেলো না।"

"আমি চাই আমার ঐ তাসগুলা।"

"বেশ, তাহলে তাই নাও।"

যা রনি ভেবেছিল তাই, বেচারি এডেলা কাঁদতে সুরু করেছিল। আর একটা দেশী লোক, ওদের এক মালী, ঠিক জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে ওদের সব কথা গিলছিল—ঠিক যা বরাবর ঘটে। রনি এমনি হতভম্ব হয়ে পড়েছিল যে ওর মুখে খানিকক্ষণ আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হোলো না। কি যে মার সরফরাজি—একেবারে ওঁকে বাহাত্তরে পেয়েছে, আগে জানলে কে বলত ওঁকে এ দেশে আসতে, কেনই বা ওঁকে আমি কথা দিতে গেলাম।

অবশেষে ও বল্‌ল, "তাহলে এডেলা—বাড়ি আসা খুব হোলো বটে! মা যে এই কাণ্ড করবেন কে জানত?"

এডেলার কান্না থেমেছিল। আশ্বস্তি আর ভয়-মেশানো অদ্ভুত এক ভাব ফুটে উঠেছিল ওর মুখে। একাধিকবার ওর মুখে শোনা গেল, "আজিজ, আজিজ।"

ওঁরা কেউ এই নাম উচ্চারণ করতেন না—যেন অন্যায়ের, অমঙ্গলের তা প্রতীক। সবাই ঘুরিয়ে বলত, "আসামী", "সেই লোকটা", "প্রতিপক্ষ।" এখন 'আজিজ' শব্দ উচ্চারণ করতে মনে হোলো যেন নতুন এক রাগের আলাপ সুরু হয়েছে।

"আজিজ, আমি কি ভুল করছি?"

রনি বিশেষ আশ্চর্য্য না হ'য়ে জবাব দিল, "তুমি একটু বেশি ক্লান্ত হয়েছ।"

"রনি, ও বেচারির কোনো দোষ নাই, আমি দারুণ ভুল করেছি।"

"আচ্ছা, একটু স্থির হ'য়ে বোসো তো।" ও ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে দেখল, শুধু দুটো চড়ুই পাখী পরস্পরকে তাড়া করছে। এডেলা বাধ্য হ'য়ে ব'সে রনির হাত নিজের হাতে তুলে নিল। রনি আস্তে আস্তে ওর হাতে হাত বুলিয়ে দিতে এডেলার মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল আর এমনিভাবে ও নিঃশ্বাস ফেলল যেন জলের তলা থেকে ও উপরে উঠেছে। তারপর কানে হাত দিয়ে ও বল্‌ল "আমার সেই প্রতিধ্বনি এখন আগের চেয়ে ভালো।"

"ভালো কথা। ক'দিনের মধ্যেই একেবারে সেরে উঠবে। কিন্তু মোকদ্দমার জন্যে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। দাশ লোকটি ভারি ভালো আর আমরা সবাই তো তোমার সঙ্গে আছি।"

"কিন্তু, রনি, লক্ষ্মীটি শোন না, বোধ হয় মোকদ্দমা না হওয়াই উচিত।"

"কি বলছ আমি ঠিক বুঝছি না—তুমি নিজেও যে বুঝে বলছ মনে হয় না।"

"যদি ডাক্তার আজিজ এ কাজ না ক'রে থাকেন তাঁকে ছেড়ে দেওয়া উচিত।"

রনি শিউরে উঠল, আসন্ন মৃত্যুর সম্ভাবনায় যে ভাবে লোকে শিউরে ওঠে। তাড়াতাড়ি বল্‌ল, "মহরমের দাঙ্গা পর্য্যন্ত ওকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, তারপর ওকে আবার আটক করতে হয়েছে।" এডেলাকে ভোলাবার জন্যে ও সেই গল্পটা ফাঁদল—ভারি নাকি তা মজার। ব্যাপারটা এই: নবাব বাহাদুরের গাড়িটা নিয়ে নুরুদ্দিন স'রে পড়েছিল—না ব'লে। তারপর আজিজকে সেটাতে চড়িয়ে

একেবারে পড়বি তো পড়্ গিয়ে এক খানায়। ফলে দুজনেই হলেন ধরাশায়ী, নুরুদ্দিনের আবার মুখ একেবারে কেটে মাংস বেরিয়ে পড়ল। মহরমের গোলমালে ওদের কান্না কারও কানেই যায়নি। বেশ কিছুক্ষণ পরে পুলিস এসে ওদের উদ্ধার ক'রে নুরুদ্দিনকে নিয়ে যায় মিণ্টো হাঁসপাতালে আর আজিজকে আবার থানায় পুরে শান্তিভঙ্গের অতিরিক্ত এক দফা অভিযোগ ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। এই উপাখ্যান শেষ হওয়ামাত্র রনি 'একটু আসছি' ব'লে উঠে গিয়ে ক্যালেণ্ডার সাহেবকে ফোন ক'রে বলল, সুবিধা হ'লেই একবার আসতে, কেননা এডেলা বাড়ি থেকে এতটা এসে ভালো বোধ করছিল না।

ফিরে এসে রনি দেখে কিনা এডেলা একেবারে ভেঙে পড়েছে, কিন্তু রকমটা একটু অন্য—রনিকে আঁকড়ে ধ'রে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বেচারি বল্‌ল, "আমায় তুমি সাহায্য করো আমার যা কর্ত্তব্য যাতে করতে পারি। আজিজ ভালো লোক। শুনেইছ তো তোমার মাও তাই বলেন।"

"কি শুনেছি?"

"উনি লোক ভালো, আমি খুব অন্যায় ক'রে ওঁর ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছি।"

"মা কখনো তা বলেন নি।"

"বলেননি?" এমনভাবে ও জিজ্ঞাসা করল যেন ও মোটেই অবুঝ নয়, যে যা বলুক শুনতে রাজি।

"একবারও মা ঐ নামও করেননি।"

"কিন্তু, রনি, আমি নিজে শুনেছি।"

"নিছক তোমার কল্পনা। সম্পূর্ণ সুস্থ হলে এ রকম যা তা কখনো ভাবতে পারো—বলো না?"

"বোধ হয় না। কিন্তু কি রকম অদ্ভুত কাণ্ড আমার।"

"যাঁর কথা আমি সব শুনেছি। যতটা শোনা সম্ভব, এত উনি এলোমেলো বকেন।"

"শেষের দিকে যখন আস্তে আস্তে কথা বলছিলেন তখন উনি এই কথা বলেন, যখন ভালোবাসা সম্বন্ধে—মাথামুণ্ডু কি ছাই বকছিলেন আমি বুঝতে পারিনি—ঠিক তখন বললেন 'ডাক্তার আজিজ কখনো এ কাজ করেনি'।"

"ঠিক এই কথা?"

"ঠিক ঐ কথা না হ'লেও ঐ ভাব।"

"না গো না। তুমি একেবারে ভুল করছ। লোকটার নামও কেউ করেনি। শোনো বলি, তুমি ফিলডিং-এর চিঠির সঙ্গে এটা গুলিয়ে ফেলছ।"

হাঁফ ছেড়ে ও বল্‌ল, "ঠিক বলেছ, ঠিক। জানতাম, কোথায় যেন ওঁর নাম শুনেছি। তুমি যে এটা পরিষ্কার ক'রে দিয়েছ তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। এ রকম সব গোলমাল করি ব'লেই তো আমার ভাবনা—এতেই তো বোঝা যায় আমার স্নায়ুর বিকার ঘটেছে।"

"সুতরাং লোকটা যে নির্দ্দোষ তা ব'লে বেড়াবে না তো, কেমন? আমার চাকররা প্রত্যেকেই এক একটি গোয়েন্দা।" রনি জানালার কাছে উঠে গেল। সেই মালি চ'লে গিয়েছিল কিম্বা বলা যেতে পারে দুটি ছোট ছেলেতে পরিণত হয়েছিল, ইংরেজি জানা তাদের পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু রনি তবু পত্রপাঠ তাদের বিদায় ক'রে দিল। ব্যাপারটা বুঝিয়ে ও বল্‌ল, "আমাদের ওপর ওদের সবারই আক্রোশ। মোকদ্দমার রায় বেরোলে সব গোল চুকবে, কেননা, একটা গুণ ওদের আছে, নিষ্পত্তি যা হোলো তা' ওরা মেনে নেবে। কিন্তু এখন আমাদের এতটুকু গলদ ধরার জন্যে একেবারে জলের মতন ওরা টাকা ঢালছে, আর তোমার ঐ রকম কথা তো ওরা যা চায় একেবারে তাই। ওরা জানলে বলতে পারবে যে আমরা সরকারী কর্ম্মচারীরা জোট ক'রে এই ষড়যন্ত্র করেছি। আমার কথা বুঝছ আশা করি।"

মিসেস্ মূর তেমনি গোঙরা মুখে ফিরে এসে তাস খেলার টেবিলের ধারে গিয়ে বসলেন। ব্যাপারটা পরিষ্কার করার জন্যে রনি সটান ওঁকে জিজ্ঞাসা করল আসামীর নাম উনি করেছেন কিনা। উনি প্রশ্নের মানে বুঝতে না পারায় ওঁকে সব বুঝিয়ে বলা হোলো। "না ওঁর নাম একবারও করিনি" ব'লে উনি 'পেশেন্‌স্' খেলায় মন দিলেন।

"আমার মনে হয়েছিল, 'আজিজ নির্দ্দোষ, এই কথা আপনি বলেছেন, কিন্তু আসলে তা আছে ফিলডিং-এর চিঠিতে।"

অত্যন্ত উদাসীন ভাবে উনি জবাব দিলেন, "অবশ্য উনি নির্দ্দোষ।" এই বিষয়ে এই প্রথম ওঁর মত জানা গেল।

"দেখলে তো রনি, আমি ঠিকই বলেছিলাম।"

"মোটেই না—মা ও কথা বলেনই নি।"

"কিন্তু উনি তো তাই মনে করেন।"

"মনে যা ইচ্ছে করুন, কি এসে যায় তাতে ?"

তাসের টেবিল থেকে আওয়াজ এল, "ইস্কাবনের সাহেব—রুইতনের নহলা।"

"উনি মনে করতে পারেন আর ফিলডিংও, কিন্তু প্রমাণ ব'লে একটা ব্যাপার আছে তো ?"

"তা জানি—কিন্তু……"

(ক্রমশঃ)

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

কবিতাগুচ্ছ

প্রত্যয়

বিশ্ব আঁধারে আবৃত,
সংশয় ঘন হ'য়ে এসেছে—
দ্বিধা মানুষকে করেছে বিচ্ছিন্ন—
সন্দেহ করেছে গ্রাস।
এরই মাঝখানে সংশয়াতীত প্রত্যয়
আপন মহিমায় প্রদীপ্ত। আপনি।

বাক্যের ঝড় বয়,
তর্কের ধূলি জমে ওঠে,
অন্ধ বুদ্ধি আকুল হয়ে ফেরে—
অন্ধ পথিকের মত দ্বারে দ্বারে
করাঘাত হেনে।
প্রত্যয় আছে নিজের মধ্যে—
তার মনে নেই কোন সংশয়,
কোন শঙ্কা।

পথে পথে কত না সঙ্কট
কত না ঘূর্ণাবর্ত্ত,
প্রতিদিনের কত না বিপাক আর বিভ্রাট,
কিন্তু প্রত্যয় তারই মাঝে উজ্জ্বল—
নিজের শান্তিতে তার অটলতা।
নিন্দা ও ক্ষতিকে সে গ্রাহ্য করে না—
মৃত্যু ও বিরহ তার কাছে মিথ্যা—
অনির্ব্বাণ আনন্দই মূল্য তার।

শ্রীবিষ্ণু মুখোপাধ্যায়

ছবি

ঝড়ের মেঘের মুখে জ্যোছনার আলো উড়ে যায় ;
উড়ে যায় তারি সাথে ফেটে-যাওয়া হাজার শিমূল।
এলো কি ফেনার ফুল সাগরের নাহি পেয়ে কূল
অগাধ আকাশে ভেসে ? আচম্‌কা উদাস হাওয়ায়
বনে বনে পাতা ঝরে ; ঘুম-চোখে পাখীরা তাকায়।
ঝাউগাছ ঝিল্‌মিল্, পিছে তার মেঘের আঁধার ;
তারি বুকে জোনাকীরা পাখা মেলে নীল আলেয়ার।
ঝিঁঝিঁ ডাকে ঝিম্ ঝিম্ ; শিশিরেরা ঘাসে ঘাসে চায়।

এমন আব্‌ছা ক্ষনে নেশা-ভরা ঝির্‌ঝিরে রাতে
ফুলের মিহিন্ ঘ্রাণে চোখে লাগে ঘুমের স্বপন।
চারিদিক কথা কয় : ভাষা তার ভেঙে পড়ে সুরে :
সে-সুরে ঝিমায়ে আসে সবুজের আভা আঙিনাতে।
কোথায় হারায়ে যায় চোখ হ'তে উদাস সুদূরে
সবুজ পৃথিবীটুকু মুছে-যাওয়া ছবির মতন !

শ্রীসুনীলরঞ্জন ঘোষ

যাত্রাশেষ

সন্তর্পণে কুমারীর নগ্নপ্রায় বক্ষোদেশে চাহি'
ভাবিলাম এ-রজনী এ-জীবনে আর আসিবে না,
উহার যৌবনস্রোতে যতোটুকু পারি অবগাহি'
আজ রাতে শেষ হোক্ জীবনের সব লেনাদেনা !
আমাকে রাখুক ঢাকি মেদনম্র বুকের প্রচ্ছায়ে
আঁখি থেকে নিভে যাক্ কামনার ক্রূর জ্যোতিশিখা,—
বসন্তের বায়ুসম উহার নিঃশ্বাস লাগে গায়ে,
রূপ যেন আজ রাতে নাহি হয় মরু-মরীচিকা।

কৃষ্ণবর্ণ এলোমেলো জড়ানো ও চুলের আড়ালে
মনে হয় স্তব্ধ মৃত্যু চুপি-চুপি মরণ শাসায়,—
অন্ধকারে মৃত্যু হবে এই বুঝি লিখা ছিলো ভালে,
তন্বঙ্গীর দ্যুতিশ্বাস মৃত্যুসম লাগে এসে গায় !
বাহুবন্ধে বক্ষোদেশে আজ যদি মৃত্যু আসে নারী,
মুহ্যমান জীবনেরে নবরূপে বুঝে যেতে পারি !

শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

বন্ধ্যা-জমি

বন্ধ্যা-জমির ক্রন্দন শুনি রাতে
তখন আকাশে চাঁদ
নীল জ্যোৎস্নায়
ছায়া মেলিয়াছে শিমুলের ঘন ডাল

বন্ধ্যা-জমির ক্রন্দন-ঘন বায়ু
জীবনে তাহার জাগে নাই মধুমাস
কত কত দিন
ব্যর্থ হয়েছে
লাঙলের ফলা আনে নাই দেহে উষ্ণ সম্ভাবনা
শিশু ফসলের নরম শিকড়
জড়ায়ে ধরেনি বুক
কঠিন মানুষ দয়াহীন নির্ম্মম
দিল না জানিতে স্বপ্নের মধু-স্বাদ
সারাটি জীবন
ব্যর্থ বীজের সাধনায় কেটে যায়

বন্ধ্যা-জমির ক্রন্দন-ঘন রাতের বায়ু
স্বচ্ছ আঁধারে
ছায়া মেলিয়াছে শিমূলের ঘন ডাল

বন্ধ্যা-জমির চোখের পাতায়
শিশিরের ঘন দাগ
বক্ষের মাঝে দুঃস্বপনের বোঝা
ক্ষণে ক্ষণে তাই
তন্দ্রার ঘোরে কাঁদিয়ে উঠিছে সে কী

সুকৃৎকুমার মিত্র

দিন চলে' যায়

দুরন্ত কুমার বন্দী হল অস্থিতে শিরায়
মুহূর্ত্ত ও প্রহরের প্রতি পদক্ষেপে
দিন চলে' যায়।
শশকের চঞ্চলতা রক্তস্রোতে উন্মত্ত অধীর ;
হে অনঙ্গ ! অঙ্গে মম তোমার প্রসাদ।

উড়ায় চঞ্চল পাখা
পুষ্প-রস গন্ধ মাখা
লিপ্-ষ্টিক্ ঠোঁটে দেখি রক্তিম আবেশ ;
সযত্নে অঙ্কিত ভুরু, পাউডার ধূসরিত কেশ।

ভূর্জ্জপত্র নিয়েছে বিদায়,
সরকারি অঙ্কের হিসাবে দিন চলে' যায়।

হে অতনু ! তবু তব চকিত ইঙ্গিতে
অস্থিতে শিরাতে
সন্ধ্যা-রক্ত-রাগ লাগে। নিরর্থক ব্যগ্রতায়
দিন চলে' যায়।

গবাক্ষের ঝিলিমিলি প্রেমে
বর্ণহীন আকাশের ধূপ-চিহ্ন মেঘ যেন নামে।
ভূমিকম্পে ভেঙে-যাওয়া পাহাড়ের মত
ঢেউ আছড়ায়।

ঝিঁঝিঁদের সুতীক্ষ্ণ আহ্বানে
স্তব্ধ মধ্য-রাত্রি যেন সহস্র আল্‌পিনে
গেঁথে' যায়, ছিঁড়ে' যায়।
তবু হায় ! দিন চলে' যায়।

আমার জীবনে
তোমার এ' প্রেম যেন ঝিঁঝিঁদের ডাক।

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

স্থিরমতির ত্রিংশিকাভাষ্য (১)*

বসুবন্ধু তাঁহার "বিংশিকায়" কিরূপে বৈশেষিকাদি মত খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে স্থিরমতির ভাষ্য সহ বসুবন্ধুর "ত্রিংশিকাবিজ্ঞপ্তির" (S. Lévi কর্ত্তৃক প্রকাশিত) আলোচনা করিব। এই "ত্রিংশিকা"তেই বসুবন্ধু বিজ্ঞানবাদের ভিত্তিস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, এবং বিজ্ঞানবাদ সম্বন্ধে ইহাই যে সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ তাহা নিঃসন্দেহ। বিজ্ঞানবাদের পরিভাষাও ইহা হইতে সুস্পষ্ট ভাবে জানা যায় এবং এই দর্শনের metaphysics, cosmology, ethics ও psychology আর কোন গ্রন্থেই এত বিশদ ভাবে আলোচিত হয় নাই। শান্তরক্ষিত ও কমলশীলের বিরাট গ্রন্থ হইতে অবশ্যই পরিণত বিজ্ঞানবাদ সম্বন্ধে অনেক কথাই জানিতে পারা যায়, কিন্তু তাঁহাদেরও মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বিরুদ্ধ মত খণ্ডন করা। বিজ্ঞানবাদীর নিজের কথা তাঁহাদের গ্রন্থে নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু সে সব কথা সংগ্রহ করিয়া একটি সুপরিচ্ছিন্ন system-এ সংনিবদ্ধ করা অসম্ভব না হইলেও অত্যন্ত দুরূহ। এই দিক হইতে স্থিরমতির ভাষ্য সহ বসুবন্ধুর "ত্রিংশিকাবিজ্ঞপ্তি" অতুলনীয়।—বিজ্ঞানবাদ সম্বন্ধে আমার নিজের যাহা বক্তব্য তাহা পূর্ব্বের তিনটি প্রবন্ধেই প্রায় বলা হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে কেবল বসুবন্ধু ও স্থিরমতির কথাই যথাযথ ভাবে উপস্থিত করিবার চেষ্টা করিব। ন্যায়শাস্ত্রে বাৎস্যায়নভাষ্যের যে স্থান, বিজ্ঞানবাদে স্থিরমতির ত্রিংশিকাভাষ্যের স্থানও তদনুরূপ। কিন্তু এই সুবিস্তীর্ণ ভাষ্যের সমস্তটির অনুবাদ ও আলোচনা করা সম্ভব হইবে না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই ভাষ্যের প্রথমাংশ এবং পরবর্ত্তী প্রবন্ধে ইহার শেষাংশ আলোচিত হইবে। মধ্যাংশে প্রধানতঃ মনোবিশ্লেষের কথাই আছে; কিন্তু দর্শনের ক্ষেত্রে তাহার বিচার অনাবশ্যক না হইলেও মুখ্য নহে।

ভাষ্যারম্ভে স্থিরমতি বলিতেছেন যে ব্যক্তি (পুদ্গল) বা ধর্মের[1] মধ্যে যে

* Prabodh Basu Mullick Fellowship Lecture, no. 4.

১ বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ দার্শনিকগণ "ধর্ম্ম" কথাটিকে একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন। আধুনিক

কোন শাশ্বত সত্তা নাই এই কথাই বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ মতাবলম্বী লোকদিগকে বুঝাইবার জন্য ত্রিংশিকাবিজ্ঞপ্তি রচনার উদ্যম করা হইয়াছে। পুদ্গলনৈরাত্ম্য ও ধর্ম্মনৈরাত্ম্য প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যও এই যে তদ্দ্বারা ক্লেশাবরণ[1] ও জ্ঞানের পরিপন্থী বিঘ্ন সকল (জ্ঞেয়াবরণ) দূরীভূত হইবে। আত্মার অস্তিত্বরূপ মিথ্যা জ্ঞান (আত্মদৃষ্টি) হইতেই রাগদ্বেষাদি "ক্লেশে"র উদ্ভব। পুদ্গল-নৈরাত্ম্যের (essencelessness) উপলব্ধি সৎকায়-দৃষ্টির (সৎকায়=self, দৃষ্টি=মিথ্যা জ্ঞান) বাধক হওয়ায় তদ্দ্বারা এই মিথ্যা জ্ঞান দূরীভূত হয় এবং ফলে সর্ব্বপ্রকার "ক্লেশ"ও নিরাকৃত হয়। ধর্ম্মনৈরাত্ম্যের উপলব্ধি জ্ঞেয়াবরণের বাধক হওয়ায় তদ্দ্বারা জ্ঞেয়াবরণ দূর হয়। ক্লেশাবরণ ও জ্ঞেয়াবরণ দূর করার কারণ এই যে এতদ্দ্বয় অপসৃত না হইলে মোক্ষ ও সর্ব্বজ্ঞত্ব কখনও অধিগম্য হয় না। রাগদ্বেষাদি "ক্লেশ" হইল মোক্ষপ্রাপ্তির পথে বিঘ্ন (আবরণ); সুতরাং সেইগুলি অপসৃত না হইলে মোক্ষ লাভ হয় না। জ্ঞেয় বিষয়ের উপলব্ধির বিঘ্নস্বরূপ "ক্লেশ"-বিরহিত অজ্ঞানের (অক্লিষ্টমজ্ঞানম্) নামই জ্ঞেয়াবরণ; সেই জ্ঞেয়াবরণ দূরীভূত হইলে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞেয় বিষয়েই শুদ্ধ জ্ঞান অপ্রতিহত গতিতে প্রবাহিত হইতে থাকে, এবং এইরূপে সর্ব্বজ্ঞত্বলাভও সম্ভব হয়।—অথবা ইহাও হইতে পারে যে ধর্ম্মনৈরাত্ম্য ও পুদ্গলনৈরাত্ম্য প্রদর্শন করতঃ অজ্ঞ ব্যক্তিকেও বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা সম্যক্‌রূপে বুঝাইয়া দিবার জন্যই আচার্য্য বসুবন্ধু এই গ্রন্থ রচনার উদ্যম করিয়াছেন।[2]

Geneticsএ প্রমাণিত হইয়াছে যে জীবের আকৃতি ও প্রকৃতি বিবিধ discrete unitsএর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে, এবং এই unitগুলি জন্ম হইতে জন্মান্তরে discreteই থাকিয়া যায়,—যদিও প্রতি জন্মেই অবশ্য এই সকল unitএর বিবিধ সমন্বয় ঘটিয়া থাকে। Geneticistএর discrete unitএর সহিত বিজ্ঞানবাদীর "ধর্ম্মে"র সাদৃশ্য বিস্ময়কর। বিজ্ঞানবাদী অবশ্যই বস্তুর প্রকৃত সত্তায় বিশ্বাস করেন না, তাঁহার মতে বস্তুর মায়িক বিজ্ঞানই আছে, বস্তু নাই। কিন্তু এই বিজ্ঞানও যে সমগ্র ও অখণ্ড ভাবে বর্ত্তমান তাহা তাঁহারা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে বস্তুর দৃষ্টি, স্পর্শ প্রভৃতি বিবিধ "ধর্ম্মে"র বিভিন্ন বিজ্ঞান অনন্ত কাল ধরিয়া প্রবাহিত হইতেছে এবং সেইগুলিই কর্ম্মবশে আলয়বিজ্ঞানে সমবেত হইয়া সমগ্র বস্তুর বিজ্ঞানরূপ মায়ার সৃষ্টি করিয়া থাকে। মানুষ সাধনার দ্বারা আপন চিত্তকে ক্রমে ক্রমে এই সকল "ধর্ম্ম" হইতে মুক্ত করিতে পারে এবং সর্বধর্ম্ম নিরস্ত হইলেই অর্হত্ত্ব লাভ হয়।

১ এই পারিভাষিক শব্দটির অর্থ স্থিরমতি নিজেই পরে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

২ ছাপা হইয়াছে "সফলে…প্রকরণারম্ভঃ" কিন্তু পড়িতে হইবে "সকলে প্রকরণারম্ভঃ"।

কেহ কেহ মনে করেন যে বিজ্ঞানের ন্যায় বিজ্ঞেয়ও সৎপদার্থ (দ্রব্যতঃ)[১] ; আবার কেহ কেহ মনে করেন বিজ্ঞেয়ের ন্যায় বিজ্ঞানও মায়িক (সংবৃতিতঃ), পারমার্থিক নহে[২]। বসুবন্ধু এই দুই ভ্রান্ত মত খণ্ডনের উদ্দেশ্যেও গ্রন্থরচনা করিয়া থাকিতে পারেন।

আত্মধর্মোপচারো হি বিবিধো যঃ প্রবর্ত্ততে।
বিজ্ঞানপরিণামেঽসৌ পরিণামঃ স চ ত্রিধা॥ ১॥

অর্থাৎ "আত্মা" (self) ও "ধর্ম্ম" সম্বন্ধীয় মিথ্যা জ্ঞান (উপচার)[৩] বিবিধ পন্থায় প্রবর্ত্তিত হইয়া পরিশেষে বিজ্ঞানের পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া থাকে, এবং এই পরিবর্ত্তন (পরিণাম) তিন প্রকার।" এই কারিকার উপর স্থিরমতি দীর্ঘ ভাষ্য রচনা করিয়াছেন :—

"আত্মধর্ম্মোপচারঃ" কথাটির অর্থ 'আত্মা ও "ধর্ম্মের" ভ্রান্তিমূলক আরোপ'। নির্ব্বিষয় বিজ্ঞানের উপর আত্মার ভ্রান্তিমূলক আরোপ হইল আত্মবিজ্ঞপ্তি, এবং তাহার উপর "ধর্ম্মের" ভ্রান্তিমূলক আরোপ হইল ধর্ম্মপ্রজ্ঞপ্তি। এই আরোপ নানা প্রকারের হইতে পারে। ভ্রান্তিবশতঃ আত্মা (self) আরোপিত হয় বলিয়াই আত্মা (soul ?), জীব, জন্তু, মনুষ্য প্রভৃতি কল্পিত লইয়া থাকে, এবং "ধর্ম্মের" আরোপ হইতেই স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন, রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানাদির উৎপত্তি। এই দুই প্রকারের আরোপই কিন্তু বিজ্ঞান-পরিণাম মাত্র (modification of subjective consciousness), মুখ্য আত্মা বা "ধর্ম্মের" উপর প্রতিষ্ঠিত নয় (ন মুখ্যে আত্মনি ধর্ম্মেষু চ)[৪]। তাহা কিরূপে সম্ভব ? এই জন্যই ইহা সম্ভব যে বিজ্ঞান-পরিণাম ভিন্ন "ধর্ম্ম" ও আত্মার বাহ্য বিকারের আর কোন উপায়ই নাই। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে বস্তু বিষয়ক বিজ্ঞপ্তির বীজই হইল "ধর্ম্ম"।

১ ইহা নৈয়ায়িকদের মত।

২ ইহাই বেদান্তের মত।

৩ "উপচার" কথাটি ন্যায়শাস্ত্রে "অতদ্ভাব" বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যে বস্তু যাহা নহে তাহাতে তদ্বস্তুর আরোপ করার নাম উপচার।

৪ ঘটকে যদি পট বলিয়া মনে হয় তবে পটকেই বলা হয় মুখ্য এবং ঘটকে বলা হয় গৌণ। স্থিরমতি নিজেই ইহা পরে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং এখানে এই অর্থেই আত্মা ও ধর্ম্মকে মুখ্য বলা হইয়াছে।

এখন এই পরিণাম কাহাকে বলে ? অন্যথাত্বই হইল পরিণাম। কেবল তাহাই নহে ; কারণক্ষণ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাহা হইতে পৃথক্ যে কার্য্যের সূচনা হয় তাহাকেই বলে পরিণাম[১]। আত্মাদি ও রূপাদি বিষয়ক বিকল্পের (Vorstellung) বাসনা (latent form) পরিপুষ্ট হইলে আলয়-বিজ্ঞান (store-house of consciousness) হইতে আত্মাদির নির্ভাসের (reflexion) বিকল্প উদ্ভূত হয়।—এইটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথা, কিন্তু স্থিরমতি সুদীর্ঘ সমাসবাক্য ব্যবহার করিয়া ভাষাটিকে এতই অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন যে তাহার অর্থোদ্ধার করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। কিছুরই প্রকৃত অস্তিত্ব নাই অথচ সকল বিষয়েরই বিজ্ঞপ্তি আছে—ইহা কিরূপে সম্ভব ? স্থিরমতি বলিতেছেন, যাহা উৎপন্ন হয় তাহা রূপাত্মাদির বিকল্প নহে, ঐ সকল বিকল্পের বাসনা। কিন্তু 'বাসনা'র অর্থ এখানে 'ইচ্ছা' হইত পারে না, কারণ ইচ্ছা যাহার হইবে তাহারই তো অস্তিত্ব নাই। সুতরাং 'বাসনা'র অর্থ এখানে রূপাত্মাদিরই latent form ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই সকল 'বাসনা'ই পরিপুষ্ট হইয়া পরে প্রাতিভাসিক রূপাত্মাদির আকারে দেখা দেয়। কিন্তু এই 'বাসনা'র উৎপত্তি যে কোথা হইতে হয় তাহা স্থিরমতি স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। কারণ তাঁহার মতে আলয়বিজ্ঞানে সঞ্চিত অনন্ত ও নিরবচ্ছিন্ন বিজ্ঞান-সন্ততিই এই 'বাসনা'র জন্মদাত্রী। অর্থাৎ বিজ্ঞান-সন্ততি হইতে 'বাসনা'র উৎপত্তি, এবং এই 'বাসনা' হইতে উৎপন্ন প্রাতিভাসিক রূপাত্মাদি।—ইহার অব্যবহিত পরেই স্থিরমতি যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতেও ইহাই অনুমিত হয় :—

আত্মাদি ও রূপাদির সেই নির্ভাসকে (reflexion) তদুৎপাদক বিকল্পের (Vorstellung) বহির্ভূত বলিয়া গ্রহণ করার ফলেই আত্মাদিরূপ ভ্রান্ত জ্ঞান (উপচার) এবং রূপাদি ধর্ম্ম বিষয়ক ভ্রান্ত জ্ঞান অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে—যদিও বাহ্য আত্মা বা ধর্ম্মাবলীর কোন অস্তিত্বই নাই। চক্ষু-রোগগ্রস্ত ব্যক্তিরও ঠিক এই রূপেই কেশাদিবিষয়ক ভ্রান্ত জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। এই রূপেই লোকে যে বস্তু যাহা নহে সেই বস্তুকে তাহাই বলিয়া ভ্রান্ত কল্পনা করিয়া থাকে, পঞ্চনদের অধিবাসীকে লোকে যেমন ভ্রমক্রমে বলদ মনে করিয়া

১ কারণক্ষণনিরোধসমকালঃ কারণক্ষণবিলক্ষণঃ কার্য্যস্যাত্মলাভঃ পরিণামঃ।

থাকে[1]। সুতরাং বিজ্ঞানমধ্যেই হউক আর বাহিরেই হউক,—আত্মাদি ও ধর্ম্মাদির অস্তিত্ব যখন কোথাও নাই তখন স্বীকার করিতে হইবে, ঐ সকল পরিকল্পিত মাত্র, পরিমার্থিক সত্য নহে। অতএব একান্তবাদিরা যে বলিয়া থাকেন বিজ্ঞান ও বিজ্ঞেয় উভয়ই সমভাবে সত্য তাহা ঠিক নহে।

কিন্তু মিথ্যা জ্ঞানও মূলে বাস্তব কিছু না থাকিলে সম্ভব হয় না; সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে বিজ্ঞান-পরিণাম সম্পূর্ণ মায়িক নহে এবং তাহার মূলে অন্ততঃ এমন কিছু আছে যাহাকে লোকে ভ্রমক্রমে আত্মা ও ধর্ম্মাদি বলিয়া মনে করিতে পারে। সেইজন্যই একথা যুক্তিসঙ্গত নহে যে বিজ্ঞেয় বিষয়ের ন্যায় বিজ্ঞানও প্রাতিভাসিক, পারমার্থিক নহে। কারণ এমন কিছুই সম্ভব হইতে পারে না যাহা কেবল মাত্র প্রাতিভাসিক সত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত, যেহেতু প্রাতিভাসিক সত্তাও কখন নিরুপাদান হইতে পারে না। সুতরাং এই দুই প্রকারের একান্তবাদই পরিত্যজ্য,—ইহাই বসুবন্ধুর মত।

এতদ্দ্বারা আরও বুঝিতে হইবে যে বিজ্ঞেয় বিষয় মাত্রেরই স্বভাব পরিকল্পিত এবং তাহার বাস্তব অস্তিত্ব নাই; বিজ্ঞান কিন্তু প্রতীত্যসমুৎপন্ন ("of dependent origination") এবং বিজ্ঞানের প্রকৃত সত্তাও আছে। বিজ্ঞানের এই প্রতীত্যসমুৎপন্নতাই 'পরিণাম' বলিয়া আখ্যাত।

কিন্তু ইহা কিরূপে সম্ভব হয় যে কোন প্রকার বাহ্যবস্তু না থাকিলেও বিজ্ঞান বাহ্যবস্তুর আকার গ্রহণ করে। ইহার উত্তর এই :—বাহ্যবস্তু তদ্বিষয়ক আভাসের বিজ্ঞান উৎপন্ন করিয়া থাকে বলিয়া বাহ্য বস্তু বিজ্ঞানের আলম্বন-প্রত্যয় (objective condition)। কিন্তু সেইজন্যই বাহ্যবস্তুকে বিজ্ঞানের কারণ বলা যায় না, কারণ তাহা হইলে সমনন্তর-প্রত্যয়াদি স্বীকার করার কোন প্রয়োজন থাকে না[2]।

১ স্থিরমতির এই অকরুণ উপমায় পঞ্চনদবাসী মাত্রেই রুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু এবিষয়ে আমার কোন দায়িত্ব নাই। স্থিরমতির নিজের ভাষা এই :—যচ্চ যত্র নাস্তি তত্তত্রোপর্য্যতে, তদ্যথা বাহীকে গৌঃ।

২ প্রতীত্যসমুৎপাদ অনুযায়ী কারণ হইতে কার্য্য উৎপন্ন হয় না, চারিটি প্রত্যয় (condition) হইতে কার্য্যাবস্থা উদ্ভূত হয়। এই প্রত্যয়গুলি হইল আলম্বন, সমনন্তর, সহকারী ও অধিপতি। স্থিরমতি এখানে বলিতে চান যে এই প্রত্যয়চতুষ্টয়ের মধ্যে আলম্বন প্রত্যয় আশ্রয় করিয়াই যদি বিজ্ঞানরূপ কার্য্য সিদ্ধ হইয়া যায় তবে অপর তিনটি প্রত্যয়ের কোন সার্থকতাই থাকে না।

মানুষের যে পাঁচ প্রকারের অনুভূতি (পঞ্চ বিজ্ঞানকায়াঃ) আছে সেগুলি সমুচ্চিত বস্তুকে আশ্রয় করিয়াই ঘটিয়া থাকে (সঞ্চিতালম্বনাঃ)। আর সমুচ্চিত বস্তুও বিভিন্ন অবয়বের সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে, কারণ সেই অবয়বগুলিকে পরিহার করিলে সমুচ্চয়ের বিজ্ঞানও অসম্ভব হইয়া পড়ে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে প্রকৃত বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব না থাকিলেও সমুচ্চিত বাহ্য বস্তুর বিজ্ঞান উৎপন্ন হইতেছে।—অবয়বী প্রকৃত পক্ষে অবয়ব-সমষ্টি ভিন্ন আর কিছু না হইলেও সমগ্রভাবে অবয়বীর তদ্ব্যতিরিক্ত একটি পৃথক্ সত্তাও স্বীকৃত হইয়া থাকে। স্থিরমতি বলিতেছেন যে এই প্রকার অবয়বী বাস্তবিকই বাহ্য বস্তু নিরপেক্ষ, বহু শূন্যের সমবায়ে যেন 'একে'র উৎপত্তি।

তাহার উপর একথাও মনে রাখিতে হইবে যে পরমাণুর সমুচ্চয় বিজ্ঞানের আলম্বন হইতে পারে না, কারণ বিজ্ঞেয় বস্তুর আকার পরমাণুর নাই (পরমাণূনামতদাকারত্বাৎ)। একথাও বলা চলে না যে পৃথক্ অস্তিত্ব বিশিষ্ট পরমাণু সকলই সমুচ্চিত হইয়া এমন সব নূতন গুণ লাভ করিল যাহা পূর্ব্বে ছিল না (ন…কশ্চিদাত্মাতিশয়ঃ)। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে অসমুচ্চিত পরমাণুর ন্যায় সমুচ্চিত পরমাণুও বিজ্ঞানের আলম্বন-প্রত্যয় হইতে অসমর্থ।

কেহ হয়তো বলিবেন, অন্যনিরপেক্ষ পরমাণু একক অবস্থায় ইন্দ্রিয়াতীত হইতে পারে, কিন্তু পরস্পরাপেক্ষী পরমাণু সমুচ্চিতাবস্থায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে দোষ কি? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে পরমাণু সাপেক্ষই হউক আর নিরপেক্ষই হউক, তাহাতে নূতন কোন গুণের বিকাশ সম্ভব নয় (আত্মাতিশয়াভাবাৎ); সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে, হয় পরমাণু সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, নয় পরমাণু সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়াতীত। তথাপি যদি কেহ বলেন যে পরস্পরাপেক্ষী পরমাণুসকলই বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, তবে তদুত্তরে বলিতে হইবে যে তাহা হইলে ঘটাদির আকার বিজ্ঞানে কখনই সম্ভব হইত না, যেহেতু পরমাণুর আকার সেরূপ নহে। কারণ বিজ্ঞানের নির্ভাস (sensation of consciousness) যেরূপ বিজ্ঞানের বিষয়ও সেইরূপ হইতে বাধ্য; নতুবা জগতে অসম্ভব কিছুই থাকিবে না।

আরও বিবেচ্য এই যে স্তম্ভাদি বস্তু যেরূপ সত্তাবিশিষ্ট, পরমাণু সেরূপ

নহে'[১]। কারণ পরমাণুরও তাহা হইলে উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন ভাগ স্বীকার করিতে হয়। এই প্রকার অংশভাগ স্বীকার না করিলেও বস্তুরূপে স্বীকৃত পরমাণুর পূর্ব্ব দক্ষিণ প্রভৃতি বিভিন্ন দিক অন্ততঃ স্বীকার করিতেই হইবে, কিন্তু তাহাও পরমাণুর পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং প্রমাণিত হইল যে বিজ্ঞানের ন্যায় পরমাণুরও রূপ বা সংস্থান নাই[২]। অতএব বাহ্য বাস্তবতা যখন কোথাও নাই তখন স্বীকার করিতেই হইবে যে বিজ্ঞানই বাহ্য বস্তুর আকারের উৎপাদক, এবং পার্থিব বস্তু স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর মতই অলীক।

এইরূপে বাহ্যধর্ম্মের অনস্তিত্ব প্রমাণান্তর স্থিরমতি চিত্তধর্ম্মের বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইলেন :—

অতীত বা অনাগত[৩] বেদনাদিও তদনুরূপ বিজ্ঞান উৎপন্ন করিতে পারে না, কারণ কার্য্যোৎপত্তিকালে অতীত বেদনা (=impression) লুপ্ত হইয়া যায় এবং অনাগত বেদনা অনুৎপন্নই থাকে। আর সমকালীন বেদনাদি হইতেই যে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাও নহে, কারণ উৎপদ্যমান অবস্থায় বেদনাদির প্রকৃত অস্তিত্বই নাই, আর উৎপন্নাবস্থায় বেদনাদির সঙ্গে সঙ্গেই তদনুরূপ বিজ্ঞানেরও উৎপত্তি হওয়ায় বলা যায় না যে নূতন কিছুর উৎপত্তি হইল (উৎপন্নাবস্থায়াং বিজ্ঞানস্যাপি তদাকারেণোৎপন্নত্বান্ন কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যমস্তীতি)। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে মনোবিজ্ঞান বাস্তব ভিত্তি ব্যতিরেকেও উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আবার কেহ আপত্তি করিতে পরেন :—মুখ্য আত্মা ও ধর্ম্মাবলীর অস্তিত্ব না থাকিলে উপচারই (mistaken transference) সম্ভব হয় না। (অর্থাৎ যাহাকে আমরা আত্মা বা ধর্ম্ম বলিয়া মনে করি তাহা না হয় আত্মা বা ধর্ম্ম না'ই হইল ; কিন্তু আত্মা বা ধর্ম্মের প্রকৃত অস্তিত্ব না থাকিলে তদ্‌ইতর বস্তুকেই বা লোকে আত্মা বা ধর্ম্ম বলিয়া ভুল করিবে কেন ?) কারণ তিনটি বিশেষ অবস্থার সংযোগের ফলেই উপচার সম্ভব হয়, এবং ঐ তিনটির একটিও যদি অসংঘটিত থাকে তাহা হইলে আর উপচার সম্ভব হয় না। উপচারের জন্য প্রয়োজন (১) একটি

১ 'ন চ পরমাণবঃ স্তম্ভাদিবৎ পরমার্থতঃ সন্তি'। এখানে 'পরমার্থতঃ' কথাটি বোধ হয় ছাপার ভুল, কারণ স্থিরমতির পক্ষে স্তম্ভাদির পারমার্থিক সত্তা স্বীকার করা অসম্ভব।

২ এখানে 'প্রসহ্যতে'র স্থলে অবশ্যই 'প্রসজ্যতে' পড়িতে হইবে।

৩ পড়িতে হইবে 'নাতীতানাগতাঃ'।

মুখ্য পদার্থ, (২) তদনুরূপ অন্য একটি বিষয়, এবং (৩) এতদ্দ্বয়ের সাদৃশ্য। "বালকটি অগ্নি"—এই প্রকার উপচার তখনই সম্ভব যখন মুখ্য পদার্থ অগ্নি, তদনুরূপ বালক, এবং এতদ্দ্বয়ের সাধারণ ধর্ম্ম কপিলত্ব বা তীক্ষ্ণত্ব বর্ত্তমান।

(সুতরাং আত্মাদি বিষয়ক উপচারের মূলে প্রকৃত আত্মাদির অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী।)

ইহার উত্তরে বক্তব্য, 'বালকটি অগ্নি'—এই উপচার হয় জাতিগত (genus) না হয় দ্রব্যগত (individual)[১] ; কিন্তু উভয়ত্রই উপচার অসম্ভব। কারণ অগ্নিরূপ জাতিতে সেই সাধারণ ধর্ম্ম কপিলত্ব বা তীক্ষ্ণতা বর্ত্তমান নাই[২], সুতরাং অগ্নিতে যখন সাধারণ ধর্ম্মেরই অভাব তখন বালকে অগ্নির উপচার সম্ভব হইতে পারে না ; এরূপ স্থলেও উপচার স্বীকার করিলে সকল বিষয়েই সকল বস্তুর উপচার স্বীকার করিতে হয় (অতিপ্রসঙ্গ)। কিন্তু এখনও বলা চলে যে জাতিতে (অগ্নি) সাধারণ ধর্ম্ম বর্ত্তমান না থাকিলেও (অতদ্ধর্ম্মত্বেঽপি জাতেঃ) জাতির সহিত তীক্ষ্ণত্ব ও কপিলত্বের অবিনাভাব (necessary concomitance) রহিয়াছে, এবং সেই অবিনাভাব আশ্রয় করিয়াই বালকে অগ্নির উপচার সম্ভব। কিন্তু জাতি যখন বিদ্যমান নাই (অর্থাৎ, যখন অগ্নি সাক্ষাৎ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না) তখনও বালকের মধ্যে তীক্ষ্ণত্ব ও কপিলত্ব পরিলক্ষিত হয়, সুতরাং অবিনাভাবিত্ব যুক্তিসিদ্ধ নহে। আর অবিনাভাব স্বীকার করিলেও উপচার (transference) কখনও সিদ্ধ হয় না, কারণ অগ্নিতে যে জাতিত্ব স্বীকার করা হইতেছে তাহা বালকেও স্বীকার করিতে ক্ষতি কি ? সুতরাং মাণবকে অগ্নির উপচার অসম্ভব।

দ্রব্যে জাতির উপচার সম্ভব না হইলেও জাতিতে দ্রব্যের (অর্থাৎ অগ্নিতে বালকের) উপচার সম্ভব হইতে পারে কি ? তাহাও নহে, কারণ পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে উভয়ের মধ্যে সাধারণ ধর্ম্মই অবিদ্যমান,—যেহেতু অগ্নির তীক্ষ্ণত্ব ও কপিলত্ব মাণবকের তীক্ষ্ণত্ব ও কপিলত্ব হইতে বিভিন্ন। মাণবকের ঐ ধর্ম্মদ্বয় সেই বিশিষ্ট মাণবকের মাণবকত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং

১ বর্ত্তমান স্থলে অগ্নি হইল জাতি, এবং বালক হইল দ্রব্য।

২ অর্থাৎ দ্রব্যরূপে সিদ্ধ অগ্নিতেই এই সকল গুণ সম্ভব।

অগ্নিগুণবিহীন সেই মাণবকে অগ্নির উপচার অসম্ভব[1]। প্রতিপক্ষ যদি বলেন যে অগ্নির ধর্ম্ম আর মাণবকের ধর্ম্ম অনন্য না হইলেও তাহাদের মধ্যে সাদৃশ্য আছে, এবং সেই সাদৃশ্য আশ্রয় করিয়াই অগ্নিতে বালকের উপচার সম্ভব হইতে পারে, তবে আমরা বলিব :—এই সাদৃশ্যবশতঃ অগ্নির তীক্ষ্ণত্ব ও কপিলত্ব মাণবকের তীক্ষ্ণত্বে ও কপিলত্বে উপচরিত হইতে পারে, কিন্তু সেজন্য মাণবকে অগ্নির উপচারের কোন কারণ নাই, কারণ অগ্নিত্ব বা মাণবকত্ব তাহাদের পরস্পরের গুণসাদৃশ্যের উপর নির্ভর করিতেছে না (গুণসাদৃশ্যেনাসংবন্ধাৎ)।[2] সুতরাং জাতিতে দ্রব্যের উপচার অসম্ভব।

কোন মুখ্য পদার্থের অস্তিত্বই নাই, কারণ তাহার স্বরূপ সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের অতিরিক্ত এবং অবর্ণনীয়[3]। মানুষ মূল পদার্থের গুণেরই মাত্র নাম জানিতে পারে, এবং মানুষের জ্ঞানও সেই মূল পদার্থের গুণের জ্ঞান মাত্র; পদার্থের স্বরূপের সহিত সংস্পর্শে আসা মানুষের পক্ষে অসম্ভব।[4] তাহা যদি না হইত, অর্থাৎ পদার্থের স্বরূপ যদি আপনা হইতেই বুঝা যাইত, তাহা হইলে গুণের আর সার্থকতাই থাকিত না[5]। জ্ঞান ও অভিধান ভিন্ন অন্য উপায়ে পদার্থের স্বরূপ নিরূপণ করা যায় না; কিন্তু পদার্থের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে পারে এমন জ্ঞান বা অভিধান যখন নাই তখন স্বীকার করিতে হইবে যে মুখ্য পদার্থের অস্তিত্বই নাই। সুতরাং শব্দের সহিত মুখ্য পদার্থের যখন সম্বন্ধই নাই তখন তাহা জানিবারও উপায় নাই এবং তাহার নামকরণও অসম্ভব; এবং অভিধান-অভিধেয় সম্বন্ধ না থাকায় স্বীকার করিতে হইবে যে মুখ্য পদার্থই নাই (কারণ যাহারই অস্তিত্ব আছে তাহাই অভিধেয়)। সমস্তই তাহা হইলে গৌণ (empirical), মুখ্য (metaphysical) কিছুই নাই। কোন পদার্থ কোন বিষয়ে তাহার অবিদ্যমান (unreal) রূপে প্রবর্ত্তিত হইলে সেইরূপকে সেই

১ বিশেষস্য স্বাশ্রয়প্রতিবদ্ধত্বান্ন বিনাগ্নিগুণেনাগ্নের্মাণবকে উপচারো যুক্তঃ।

২ মানুষের সূক্ষ্ম চিন্তা যে কতদূর অগ্রসর হইতে পারে ইহা তাহার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

৩ এইখানে খাঁটি বেদান্তের কথা আসিয়া পড়িল।

৪ প্রধানে হি গুণরূপেণৈব জ্ঞানাভিধানে প্রবর্ত্তেতে, তৎস্বরূপাসংস্পর্শাৎ।

৫ স্থিরমতির তাহা হইলে বক্তব্য, অনির্ব্বচনীয় পদার্থ এই গুণের সাহায্যেই অভিধেয় ও জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে। ইহাও বেদান্তের কথা।

পদার্থের গৌণরূপ বলে[1]; কিন্তু শব্দপ্রয়োগ যখনই করা হয় তখন তদ্দ্বারা মূল পদার্থে অবিদ্যমান গুণই (attribute) অভিহিত হয়। সুতরাং মুখ্য পদার্থ নাই। অতএব পূর্ব্বপক্ষী যে বলিয়াছিলেন মুখ্য আত্মা বা ধর্ম্মাবলীর অস্তিত্ব না থাকিলে উপচার অসম্ভব, সে কথা যুক্তিযুক্ত নহে।

কিন্তু বিজ্ঞানের পরিণাম কত রকম হইতে পারে তাহা জানা নাই; তাহাই দেখাইবার জন্য (বসুবন্ধু প্রথম কারিকার চতুর্থ পাদে বলিতেছেন) :—

পরিণামঃ স চ ত্রিধা ॥

তিন প্রকার পরিণামের উপরেই আত্মাদি ও ধর্ম্মাদির উপচার (transference) ঘটিয়া থাকে। পরিণাম আবার হেতুভাব ও ফলভাব অনুযায়ী দুই প্রকারের হইতে পারে। অখণ্ড বিজ্ঞানের মধ্যে কর্ম্মজ বাসনার (=সংস্কার, impression) নিঃষ্যন্দ গতিতে পরিপুষ্টি লাভই হেতু-পরিণাম[2]। আর কর্ম্মবিপাক বশতঃ বাসনার বৃত্তিলাভ (realisation) ঘটিলে যখন আলয়বিজ্ঞান, পূর্ব্বকর্ম্মজনিত আক্ষেপের প্রশান্তির পর, অপর একটি অস্তিত্ব (নিকায়সভাগান্তর) গ্রহণ করিতে উদ্যত হয়,—তাহাকেই বলে ফলপরিণাম। পূর্ব্ব কর্ম্ম দ্বারা অনুপদ্রুত বাসনা নিঃষ্যন্দ গতিতে (in even movement) বৃত্তিলাভ করিলে আলয়বিজ্ঞান হইতে যে প্রবৃত্তিবিজ্ঞান[3] ও "ক্লিষ্ট" (=defiled) মনের উদ্ভব হয় (তাহাও ফল পরিণাম)।[4] এই "প্রবৃত্তিবিজ্ঞান" কুশল ও অকুশল দুই প্রকারেরই হইতে পারে, এবং ইহাই আলয়বিজ্ঞানে কর্ম্মফলের বাসনার (=সংস্কার=latent form) অথবা কর্ম্মফলবিবর্জ্জিত নিঃষ্যন্দবাসনার প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে। কিন্তু অব্যাকৃত (undifferentiated) "ক্লিষ্ট" মন কেবল মাত্র এই নিঃষ্যন্দবাসনারই প্রতিষ্ঠা করিতে পারে।—সমস্তই মায়াময় হইলেও বিশ্ব-প্রপঞ্চের অবভাস কিরূপে সম্ভব হয় তাহা বোধ হয় বৌদ্ধ দর্শনের আর কোন গ্রন্থেই এত স্পষ্ট করিয়া বলা নাই; সুতরাং দুরূহ ও স্থানে স্থানে দুর্ব্বোধ্য হইলেও এই অংশের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য।

১ গৌণো হি নাম যো যত্রাবিদ্যমানেন রূপেণ প্রবর্ত্ততে।

২ আলয়বিজ্ঞানে বিপাকনিঃষ্যন্দবাসনাপরিপুষ্টিঃ।

৩ ইহাই হইল আলয় বিজ্ঞানের authoritative definition: —তত্র সর্ব্বসাংক্লেশিকধর্ম্মবীজস্থানত্বাদালয়ঃ।

৪ 'যা' এর পূর্ব্বে যে ছেদ আছে সেটি হইবে না।

উপরে তিন প্রকার পরিণামের কথা বলা হইয়াছে ; এক্ষণে (দ্বিতীয় কারিকায়) বলা হইতেছে সেই পরিণামগুলি কি কি :—

বিপাকো মননাখ্যশ্চ বিজ্ঞপ্তির্বিষয়স্য চ।

এই তিন প্রকার পরিণাম হইল বিপাক, মনন ও বিষয়বিজ্ঞপ্তি। তন্মধ্যে কুশল বা অকুশল কর্ম্মের বাসনা পরিপক্ক হইয়া ফল লাভে উন্মুখ হইলে তাহাকে বলে বিপাক[১]। বাসনাদির দ্বারা 'ক্লিষ্ট' মনই হইল মনন, কারণ নিয়ত মননের (deliberation) উপরই ইহা প্রতিষ্ঠিত। আর চক্ষুর্বিজ্ঞানাদি ছয় প্রকারের বিজ্ঞানকে বলে বিষয়-বিজ্ঞপ্তি (presentation of objects), কারণ এতদ্দারাই বিষয়ের প্রত্যবভাস (reflexion, suggestion) ঘটিয়া থাকে। এই তিন প্রকার পরিণামের স্বরূপ নির্ণয় না করিয়া দিলে সেগুলি কি তাহা বুঝিবার উপায় নাই ; সেই জন্যই বসুবন্ধু যথাক্রমে পরিণামত্রয় বুঝাইয়া দিবার উদ্দেশ্য বলিতেছেন :—

তত্রালয়াখ্যং বিজ্ঞানং বিপাকঃ সর্ব্ববীজকম্ ॥ ২ ॥

'তত্র' বলিতে এখানে বুঝাইতেছে পূর্ব্বে কথিত পরিমাণত্রয়।

'আলয়াখ্য,' অর্থাৎ আলয়বিজ্ঞানসংজ্ঞক যে বিজ্ঞান, তাহা কর্ম্মবিপাকের পরিণাম। ইহাকে 'আলয়' বলার কারণ এই যে, যে ধর্ম্মাবলী সমস্ত অশুদ্ধ করিয়া দেয় সেই ধর্ম্মাবলীর বীজ ইহারই মধ্যে নিহিত। 'আলয়' কথাটির অর্থ 'স্থান'। অথবা কার্য্যের ফলরূপে ধর্ম্মাবলী এইখানে পরস্পরের সহিত সঙ্গত ও সংবদ্ধ হয় বলিয়াই ইহার নাম আলয় (অথবালীয়ন্তে উপনিবধ্যন্তে সর্ব্বধর্ম্মাঃ কার্য্যভাবেন)। অথবা ইহার অর্থ :—যাহা সর্ব্ব ধর্ম্মের কারণ রূপে সেই ধর্ম্মাবলীর সহিত সম্পৃক্ত। (আলয়বিজ্ঞান সর্ব্ববিষয়) জানিতে পারে ; সুতরাং ইহার নাম (আলয়-) বিজ্ঞান। বিপাক (=ripening) বলা হইয়াছে কেন ?—সর্ব্বপ্রকার ধাতু, গতি,[২] যোনি ও জাতির উৎপত্তি কুশল বা অকুশল কর্ম্মের বিপাকবশতঃ ঘটিয়া থাকে বলিয়া। আলয় বিজ্ঞানকে 'সর্ব্ববীজক' বলার কারণ ইহাই সর্ব্বপ্রকার 'ধর্ম্মে'র আশ্রয়।

প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান ব্যতিরিক্তও যদি আলয়বিজ্ঞানের অস্তিত্ব থাকে তবে বিচার

১ এখানে 'যথাক্ষেপং' কথাটির অর্থ কি ?

২ গতি=class.

করিতে হইবে তাহার আলম্বন (object) বা আকার কি ; কারণ নিরালম্বন বা নিরাকার বিজ্ঞান সম্ভব নহে, এবং তাহা আমাদের অভিপ্রেতও নহে (নৈব তন্নিরালম্বনং নিরাকারং বেষ্যতে)। আমাদের অভিপ্রেত বিজ্ঞানের বিশেষত্ব এই যে তাহার আলম্বন ও আকার সুপরিচ্ছন্ন (clear-cut, specified) নহে (অপরিচ্ছন্নালম্বনাকারং)। এরূপ বলার কারণ কি ? কারণ আলয়বিজ্ঞান দুইটি বিভিন্ন পন্থায় কার্য্যকরী হয় ; একদিকে ইহার দ্বারা আত্মাতে[১] বাহ্য উপাদানের (material) বিজ্ঞপ্তি জন্মায়, অপর দিকে আবার ইহাই বহির্মুখী হইয়া অপরিচ্ছিন্নাকার বিজ্ঞপ্তিক্ষেত্র প্রচার করিয়া থাকে।

অসংবিদিতকোপাদিস্থানবিজ্ঞপ্তিকং চ তৎ।

যাহার মধ্যে উপাদি (=উপাদান, material) ও তাহার অবস্থানের বিজ্ঞপ্তি অসংবিদিত (unknown, unspecified) থাকে তাহাই আলয়বিজ্ঞান। কিন্তু এই উপাদান কি ? আত্মাদিবিষয়ক এবং রূপাদি "ধর্ম্ম" বিষয়ক বিকল্পের (Vorstellung) বাসনাই (সংস্কার, impression) হইল উপাদান অর্থাৎ বিজ্ঞানের উপাদান-কারণ। এই সকল বাসনা উপস্থিত থাকে বলিয়াই আলয়বিজ্ঞানের দ্বারা আত্মাদির ও রূপাদির বিকল্প স্বকার্য্যরূপে গৃহীত হয় (কার্য্যত্বেনোপাত্তঃ), এবং সেই জন্যই বলা হইয়া থাকে যে এই সকল বাসনা আত্মাদি ও রূপাদির বিকল্পের উপাদান[২]। কারিকায় 'অসংবিদিতকোপাদি' বলার কারণ আলয়-বিজ্ঞানে আত্মাদি ও রূপাদি ধর্ম্মের বাসনা এত সুপরিচ্ছিন্ন নহে যে তৎসম্বন্ধে বলা যাইতে পারে "তাহাই এখানে রহিয়াছে" অথবা "ইহাই তাহা"। 'উপাদি' বলিতে আরও বুঝায় আশ্রয়ের (basis of consciousness, যাহা অবলম্বন করিয়া বিজ্ঞান পরিচ্ছিন্ন আকার গ্রহণ করে) স্বাত্মীকরণ[৩]। এবং এই আশ্রয় হইল আত্মার (self) অস্তিত্ব (আত্মভাবঃ), ইন্দ্রিয় ও তাহার অধিষ্ঠান (=দেহ), রূপ ও নাম[৪]। সেই আশ্রয়ের স্বাত্মীকরণের নামই উপাদি, এবং সমজাতীয় বলিয়াই (একযোগ-ক্ষেমত্বেন) তাহাদের সমন্বয় (উপগমন) সম্ভব।

১ 'অধ্যাত্মম্' কথাটিকে এখানে ঠিক আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে।

২ স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে 'উপাত্ত' ও 'উপাদি'র শব্দ গত সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াই স্থিরমতি এই কথা বলিয়াছেন।

৩ 'উপাদান' কথাটিকে এখানে ঠিক আক্ষরিক অর্থে লইতে হইবে, material অর্থে লইবে চলিবে না।

৪ পড়িতে হইবে "ইন্দ্রিয়ং রূপং নাম চ"।

নাম ও রূপ হইল কামধাতু ও রূপধাতুর উপাদান ; আরূপ্য ধাতুর উপাদান কেবল নাম, কারণ তাহা রূপের প্রতি বীতরাগ হওয়ায় তাহাতে (রূপবাসনার) বিপাকের (ripening) অভিনির্বৃত্তি (inclination towords realisation) ঘটে না। অর্থাৎ রূপ এখানে বাসনাবস্থাতেই থাকিয়া যায়, বিপাকাবস্থা লাভ করে না। উপাদানকে যেহেতু 'ইহা' বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না[১] (অর্থাৎ যেহেতু উপাদান তখনও unspecified lump মাত্র থাকে) সেই জন্য ইহাকে (কারিকায়) 'অসংবিদিত' বলা হইয়াছে। 'স্থানবিজ্ঞপ্তি'র অর্থ যে স্থানে ঐ বিজ্ঞানের বিকাশ লাভের ক্ষেত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহারই বিজ্ঞপ্তি। ইহাকেও (কারিকায়) অসংবিদিত বলা হইয়াছে, তাহার কারণ স্থানবিজ্ঞপ্তিও প্রথমাবস্থায় অপরিচ্ছিন্ন (unspecified) ও নিরালম্বন (without objective foundation) থাকে।

বলা হইয়াছে যে আলয়বিজ্ঞান একপ্রকারের বিজ্ঞান, এবং এই বিজ্ঞান অবশ্যই চৈত্তধর্ম্ম সংযুক্ত। সুতরাং আলোচনা করিতে হইবে ইহাতে কতগুলি এবং কি কি চৈত্তধর্ম্ম থাকে, এবং সেগুলির সবগুলিই সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে কি না। সেই উদ্দেশ্যেই বলা হইয়াছে—

সদা স্পর্শমনস্কারচিৎসংজ্ঞাচেতনান্বিতম্ ॥ ৩ ॥[২]

অর্থাৎ, আলয়বিজ্ঞান সর্ব্বদাই স্পর্শ, মনস্কার, বেদনা (বিৎ), সংজ্ঞা ও চেতনা সমন্বিত। তিনের একত্র সমাবেশের ফলে (ত্রিকসন্নিপাতে) স্পর্শের[৩] (sense-impression) উৎপত্তি ; এতদ্দারা সুপরিচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয় বিকার উৎপন্ন হয়, এবং তাহা আশ্রয় করিয়াই উৎপন্ন হয় বেদনার (sensation) যাহা ভিত্তি (বেদনাসংনিশ্রয়কর্ম্মকঃ)। এই তিনটি হইল ইন্দ্রিয়, বিষয় ও বিজ্ঞান ; ইহারা কার্য্যকারণভাবে সমন্বিত হইলেই হয় "ত্রিকসন্নিপাত"। এই ত্রিকসন্নিপাত সংঘটিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দ্রিয়ের সুখদুঃখাদি বেদনার অনুকূল যে বিকার উপস্থিত হয়, সেই বিকার অনুযায়ী বিষয়টি সুখদুঃখাদি রূপে বেদনীয় হইয়া

১ ইদংতা = this-ness.

২ এইখান হইতে আরম্ভ হইল psychological analysis.

৩ 'স্পর্শ' বলিতে সাধারণতঃ অবশ্য contact বুঝায় ; কিন্তু এখানে বিজ্ঞানও স্পর্শের অন্তর্গত, সুতরাং ইহা কেবল মাত্র contact হইতে পারে না।

যখন সুপরিচ্ছিন্ন হয় তাহাকে বলে স্পর্শ। যে বিশেষ অবস্থায় ইন্দ্রিয় সুখ-দুঃখাদির হেতু হয় তাহাই হইল ইন্দ্রিয়ের বিকার। বিষয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের স্পর্শ অথবা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ের স্পর্শ,—এই উভয়ই ইন্দ্রিয়বিকার অনুযায়ী ঘটিয়া থাকে। সেই জন্যই, যদিও বিষয়েরই বিশেষ বিকৃতির নাম স্পর্শ, তথাপি ইন্দ্রিয়ের বিশেষ বিকারকেই স্পর্শ বলা হইয়া থাকে। বেদনার (sensation) উৎপাদক অবস্থার সৃষ্টি করাই হইল স্পর্শের কর্ম্ম। সেই জন্যই সূত্রে কথিত হইয়াছে "সুখ রূপে বেদনীয় স্পর্শ হইতেই প্রতীত্যসমুৎপাদ অনুযায়ী বেদিত সুখের উৎপত্তি হইয়া থাকে।"[১]

মনস্কার (attention) বলিতে বুঝায় চিত্তের আভোগ (curving) ; ইহারই দ্বারা চিত্ত আলম্বনের (object) অভিমুখী হয়, এবং ইহাই চিত্তকে আলম্বনের প্রতি নিবদ্ধ করিয়া রাখে। এই চিত্তধারণের অর্থ, চিত্ত পুনঃ পুনঃ বিষয়ের প্রতি সন্নিবিষ্ট হয়।[২] যে প্রকার চিত্তসংযোগের ফলে আলম্বনের (object) প্রতি চিত্তসন্ততি (chain of moments of consciousness) সংনিবদ্ধ হয় তাহারই দ্বারা মনস্কার সিদ্ধ হইতে পারে। যে চিত্তসংযোগ এক মুহূর্ত্ত মাত্র স্থায়ী হয় তদ্দারা মনস্কার সিদ্ধ হয় না, কারণ তাহা একটি বিশিষ্ট মুহূর্ত্তে মাত্র কার্য্যকরী হয়, পরমুহূর্ত্তে আর হয় না (তস্য হি প্রতিক্ষণমেব ব্যাপারো, ন ক্ষণান্তরে)।

বেদনার (sensation) স্বভাব হইল অনুভব। বিষয় যেমন আহ্লাদক, পরিতাপোদ্দীপক, অথবা এই দুই প্রকার হইতে পৃথক্ অন্য কোন প্রকারের হইতে পারে, তদনুযায়ী বেদনাও হয় তিন প্রকারের—সুখকর, দুঃখকর, সুখকরও নহে দুঃখকরও নহে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন শুভ অথবা অশুভ কর্ম্মের বিপাকফল যদ্দারা অনুভূত হইয়া থাকে তাহারই নামে অনুভব,[৩] ইত্যাদি।—আলয়বিজ্ঞানই হইল প্রকৃত পক্ষে শুভাশুভ কর্ম্মের বিপাক-পরিণাম, এবং সেই আলয়বিজ্ঞানের স্বধর্ম্ম উপেক্ষাই (indifference) হইল পারমার্থিক

১ "সুখবেদনীয়ং প্রতীত্যোৎপদ্যতে সুখম্।" এই বচন যে কোন্ সূত্র হইতে গৃহীত তাহা স্থিরমতি বলেন নাই।

২ সর্ব্বধর্ম্মের ন্যায় চৈত্তধর্ম্মও বিজ্ঞানবাদীর নিকট ক্ষণিক ; সুতরাং বিষয়ের প্রতি চিত্তের নিরবচ্ছিন্ন সন্নিবেশ সম্ভব নহে।

৩ ইহার পর হইতে 'মনস্তত্ত্ব' বিষয়ক এই অংশটির সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করিব।

অর্থে শুভাশুভ কর্ম্মের বিপাকফল। যেহেতু কুশল ও অকুশল কর্ম্মের বিপাক হইতেই সুখ ও দুঃখের উৎপত্তি, সেই জন্য সুখ ও দুঃখ উপচরিতার্থে (in transferred sense) বিপাকফল বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

সংজ্ঞা বলিতে বুঝায় বিষয়ের (object) একটি বিশেষ "নিমিত্তের" নিরূপণ।[১] বিষয় হইল আলম্বন (যাহা আশ্রয় করিয়া বিজ্ঞান বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করিয়া থাকে) এবং নিমিত্ত হইল সেই আলম্বনের নীলপীতাদি বিশেষ অবস্থার কারণ। "ইহা নীল", "ইহা পীত" ইত্যাদি বলিয়া সেই নিমিত্তকে বিশেষ ভাবে দেখাইয়া দেওয়া (উদ্‌গ্রহণ) হইল "নিরূপণ"।

চেতনা বলিতে বুঝায় চিত্তের অভিমুখিতা (অভিসংস্কার)। ইহা একপ্রকার মানসিক প্রচেষ্টা, যজ্জন্য চিত্ত আপনা হইতেই আলম্বনের প্রতি প্রবাহিত হয় (প্রস্যন্দ ইব ভবতি),—অয়স্কান্তের আকর্ষণে লৌহ যেমন আকৃষ্ট হয়।

বেদনা ত্রিবিধ,—সুখদায়ক, দুঃখদায়ক, অন্যবিধ; ধর্ম্ম (elements of existing appearance) চতুর্ব্বিধ :—(১) কুশল, (২) অকুশল, (৩) অনিবৃত (অর্থাৎ "ক্লেশ" দ্বারা অতুষ্ট এবং অব্যাকৃত (undifferentiated)), (৪) নিবৃত (অর্থাৎ "ক্লিষ্ট") এবং অব্যাকৃত। কারিকায় কেবলমাত্র বলা আছে "বিদ্‌" (= বেদনা); ইহা হইতে আলয়বিজ্ঞানে এই তিন প্রকার বেদনার কোন্ প্রকারটি অবস্থিত এবং আলয়বিজ্ঞান স্বয়ং কুশলাদি চারি প্রকারের কোন্ প্রকারের তাহা বুঝা যায় না। সেই জন্যই পরবর্ত্তী কারিকায় বলা হইতেছে—

উপেক্ষা বেদনা তত্রানিবৃতাব্যাকৃতং চ তৎ।
তথা স্পর্শাদয়ঃ তচ্চ বর্ত্ততে স্রোতসৌঘবৎ ॥ ৫ ॥

অর্থাৎ আলয়বিজ্ঞানস্থ বেদনা (sensation) হইল উপেক্ষা, তাহা সুখদায়কও[২] নহে, দুঃখদায়কও নহে; কারণ সুখবেদনা ও দুঃখবেদনার আলম্বন (form)

১ ইহাই যে সংজ্ঞার অর্থ স্থিরমতির অব্যবহিত পরবর্ত্তী কথা হইতেই বুঝা যাইবে।

২ আলয়বিজ্ঞানে বিজ্ঞপ্তি প্রথমে থাকে সম্পূর্ণ অব্যাকৃত, নাম ও রূপের অতীত। সংস্কারবশে ইহাই প্রথমে বিশিষ্ট আলম্বন (form) গ্রহণ করিয়া পরে বিষয়ে (objective consciousness) পরিণত হয়, যদিও বিষয়-বস্তুর subjective existence একেবারেই নাই।

সুপরিচ্ছিন্ন (defined), যেহেতু রাগ ও দ্বেষ এই বেদনাদ্বয়ের সহিত তাহারা সম্বদ্ধ। এখানে আলয়বিজ্ঞান সম্বন্ধে বলা হইয়াছে তাহা অনিবৃত (অর্থাৎ অক্লিষ্ট, undefiled) এবং অব্যাকৃত (undifferentiated)। আলয়বিজ্ঞান স্বয়ং হইল বিপাকফল (result of karma), সুতরাং কর্ম্মবিপাকের প্রতিও ইহা অব্যাকৃত। সেইজন্য কর্ম্মের কুশলাকুশলাদি বিভিন্ন ফল ইহাতে হয় না (বিপাকত্বাৎ বিপাকং প্রতি কুশলাকুশলত্বেনাব্যাকরণাদব্যাকৃতম্)।

আলয়বিজ্ঞান নিতান্তই যেরূপ কর্ম্মফল মাত্র এবং অপরিচ্ছিন্নাকার ও স্পর্শাদিসমন্বিত, এবং অক্লিষ্ট ও অব্যাকৃত উপেক্ষাই যেমন তাহার "বেদনা", সেইরূপ আলয়বিজ্ঞানের সহিত সমন্বিত স্পর্শাদিও একান্তরূপে বিপাকফল মাত্র, এবং ইহাদের আলম্বন (form) অপরিচ্ছিন্ন (undefined)। এই স্পর্শাদির প্রত্যেকটি সর্ব্বদাই অপর চারিটির সহিত এবং আলয়বিজ্ঞানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, এবং আলয়বিজ্ঞানের ন্যায় স্পর্শাদির বেদনাও তখন উপেক্ষা মাত্র[১]। কারণ আলয়বিজ্ঞানের বিপাকফলের সহিত সংপ্রযুক্ত স্পর্শাদি বিপাকফল না হইয়া পারে না, এবং অপরিচ্ছিন্নাকার (আলয়বিজ্ঞানের) সহিত সম্পৃক্ত হওয়াতে (এই স্পর্শাদিও অপরিচ্ছিন্নাকার হইতে বাধ্য)।

এখন প্রশ্ন, আলয়বিজ্ঞান কি এক ও অভিন্ন, এবং যতদিন সংসার ততদিন কি ইহা অক্ষুণ্ণ থাকিবে? অথবা ইহা একটি সন্তান (chain of discrete moments) মাত্র? আলয়বিজ্ঞান এক ও অভিন্ন হইতে পারে না, কারণ ইহা ক্ষণিক। ইহা তবে কি? তাহারই উত্তরে কারিকায় বলা হইতেছে" স্রোতসৌঘবৎ", অর্থাৎ নদীর স্রোতের ন্যায় আলয়বিজ্ঞান সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনশীল। হেতু (cause) ও ফলের (effect) নিরন্তর প্রবৃত্তিই হইল "স্রোত"; নদীর সমস্ত জল একসঙ্গে পূর্ব্বাপর ভাগ না করিয়া প্রবাহিত হইলে তাহাকে বলে "ওঘ"; আলয়বিজ্ঞান এই ওঘস্বরূপ। জলস্রোত যেমন তৃণ, কাষ্ঠ, গোময়াদি আকর্ষণ করিয়া প্রবাহিত হয়, আলয়বিজ্ঞানও সেইরূপ ভাল মন্দ ও নিরপেক্ষ (=অনেঞ্জ্য

১ অর্থাৎ স্পর্শের সুখ বা স্পর্শের দুঃখ তখনও বিশেষিত হয় নাই। স্পর্শাদি যতক্ষণ না universal হইতে particular এ আসিয়া পৌঁছায় ততক্ষণ তাহাদের বৈশিষ্ট্য নিরূপিত হইতে পারে না।

২ দুইটি প্রলয়ের মধ্যবর্ত্তী কালকে সংসার বলে।—এই আলয়বিজ্ঞানের সহিত বেদান্তের আত্মার কোন পার্থক্য খুঁজিয়া পাওয়াই দুষ্কর। এক ক্ষণিকত্ব ভিন্ন বাস্তবিক আর কোন পার্থক্যই নাই।

=indifferent) কর্ম্মের বাসনা সঙ্গে লইয়া, স্পর্শ ও মনস্কারাদি আকর্ষণ করিয়া লইয়া নিরবচ্ছিন্ন গতিতে সংসারান্ত পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইতে থাকে।

এই প্রবাহের কি বিরাম নাই? আছে,—অর্হত্বে। সেই কথাই পরবর্ত্তী কারিকায় বলা হইয়াছে :—

তস্য ব্যাবৃত্তিরর্হত্বে তদাশ্রিত্য প্রবর্ত্ততে।
তদালম্বং মনোনাম বিজ্ঞানং মননাত্মকম্॥ ৫ ॥

অর্হত্বে আসিয়া এই প্রবাহের বিরাম, ইত্যাদি।

আগামী প্রবন্ধে স্থিরমতির ভাষ্যসহ "ত্রিংশিকা"র শেষ করিয়া কয়টি কারিকা আলোচিত হইবে।

শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ

পুস্তক-পরিচয়

Czechs and Germans—by Elizabeth Wiskemann (Oxford).

সমালোচনা করবার পূর্বে এইটুকু বলে রাখা প্রয়োজন যে বইখানা চেকো-শ্লোভেকিয়া Reich-এর অন্তর্ব্বলিত হবার পূর্বে লেখা। বইখানা এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয়েছে। লেখিকা হ্বিস্কামান বোহেমিয়া ও মোরেভিয়া প্রদেশের সংঘর্ষের বাস্তব পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করেছেন। শান্তিচুক্তির ফলে যে সকল ভৌগোলিক পরিবর্ত্তন ঘটেছে সেগুলোর পরিণতি জানবার জন্য লেখিকা "Royal Institute of International Affairs" কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে বইখানা লিখেছেন।

মার্চ মাসে অষ্ট্রিয়া নাৎসী জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত হবার পর চেকোশ্লোভেকিয়ায় জার্মান মাইনরিটি সমস্যা জটিল আকার ধারণ করে এবং মহাযুদ্ধে যে এর পরিণতি হতে পারে সেই সম্ভাবনা আমাদের মনে ভয়ের সঞ্চার করেছিল। বহুপূর্বেকার সময় থেকে স্বরু করে এই ঐতিহাসিক প্রদেশ দুটোর ঐতিহ্য আলোচনা করে racial সংঘর্ষের সক্রিয়তার দৃষ্টান্ত লেখিকা বইখানার আদ্যোপান্ত দেখিয়েছেন। এমন কি হ্যাবস্‌বুর্গ রাজতন্ত্রও এই অন্তর্কলহকে দূর করতে পারেনি।

মহাসমরের পর যখন ইতিহাসের গতানুগ গতি ফিরে গেল, চেকো-শ্লোভেকিয়ায় সুদেতেন-জার্মান মাইনরিটি নিয়ে রিপাব্‌লিক স্থাপিত হল তখনও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও নিজ নিজ স্বার্থান্বেষী মনোবৃত্তিই যে সংঘর্ষের ইন্ধন জুগিয়েছে—লেখিকা হ্বিস্কামান সেগুলোকেই বড়ো করে দেখিয়েছেন। মোটের উপর এই ভল্যুমখানা মধ্য ইউরোপের নতুন ডেমক্র্যাসীর ইতিহাস বলা চলে। আধুনিক উচ্চ শ্রেণীর রাজনৈতিক আদর্শের উপর ভিত্তি করে গড়ে-ওঠা চেকোশ্লোভেকিয়ার রিপাবলিক ষ্টেট নির্বীর্য ইউরোপের অসন্তোষের মধ্যে নিজেকে গড়ে তুলেছিল নিজের সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তাকে সবচেয়ে বেশী সমর্থন করে।

নবপ্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক চেকোশ্লোভেকিয়ার অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে

লেখিকা "Birds'-eye view" দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন ভালো করে। বিশেষ করে ১৯২২ সালে যে সঙ্কট উপস্থিত হয়েছিল তার আন্তরিক ও বাহ্যিক অনেক কারণ ছিল। অবশ্য একথা মেনে নিলে একেবারে ভুল হবে না যে সুদেতেন জার্মানদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য কতকাংশে দায়ী বিরুদ্ধ-বাদী ও নিরপেক্ষতাশূন্য রাষ্ট্রের চাপ। এই মাইনরিটি বিরোধ কালক্রমে ভীষণ কুটিল আকার ধারণ করে এবং Third Reich-এর আবির্ভাবে তার রাষ্ট্রিক শক্তি দৃঢ়ীভূত হয়ে উঠল। কিন্তু বইখানা পড়ে ভালো করে মোটেই উপলব্ধি করা যায় না কেমন করে নতুন চেকোস্লোভাক্ গণতন্ত্রের আন্ত-সাম্প্রদায়িক ও অর্থনৈতিক খণ্ড সমস্যা International Capitalism-এর বিস্তৃত সঙ্কটের অঙ্গীভূত হয়ে গেল। অর্থাৎ Pan-Anglo-American Capitalism-এর crisis ইউরোপের উপর হিট্‌লারী প্রভাবে রূপান্তর গ্রহণ করলে। যদিও বইখানা জার্মানীর চেকোস্লোভেকিয়া গ্রাসের পূর্বে লেখা তবুও লেখিকা ভালো করেই জানতেন যে মাইনরিটি সমস্যা জার্মানীর চেকোস্লোভেকিয়ার উপর লোলুপ দৃষ্টির মুখ্য কারণ নয়—এর মধ্যে আন্তর্জাতিক Capitalist-দের ডিক্‌টেটারী ইঙ্গিত ক্রিয়াশীল।

লেখিকা মুখ্যতঃ দেখিয়েছেন যে জার্মানীর National Socialism-এর মতো তার National Capital-ই অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতার অবসান করেছে। কিন্তু লেখিকা কি জানেন না যে গত মহাসমরেই একথা নিঃসন্দেহভাবে মীমাংসিত হয়ে গেছে যে বিভিন্ন জাতীয় Capital আর পৃথক থাক্‌তে পারে না। বিভিন্ন জাতীয় ক্যাপিটালের ক্রমবিবর্তন হতে হতে এমন এক অবস্থায় এসে পৌঁছল যে তারা পরস্পর বিবদমান হতে বাধ্য হল। গত মহাসমর এই সংগ্রামের একটা রূপ। এটাও নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে finance-capital এবং monopoly-capital-এর যুগে জাতীয় ক্যাপিটালের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব। মহাসমরের পর একমাত্র সোভিয়েট ক্যাপিটাল ছাড়া সকল ক্যাপিটালই আন্তর্জাতিক গণ্ডীর মধ্যে আসতে বাধ্য হয়েছে—এবং ব্রিটেনই এর ডিক্‌টেটার। এ ভিন্ন আর একটা কারণ বর্তমান। সেটা হচ্ছে এই যে মহাসমরের পর জার্মান ক্যাপিটালকে বিধ্বস্ত করে তার উপর ডয়েস্-প্লান (১৯২৪) এবং ইয়ংস্ প্লানের (১৯৩০) বিরাট জগদ্দল পাথরের গুরুভার

চাপান হয়েছে তার জাতীয় ক্যাপিটালকে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করবার জন্য। তা সত্ত্বেও লেখিকা কী করে জার্মানীর স্বতন্ত্র জাতীয় ক্যাপিটালের সত্তাকে ভেবে নিতে পেরেছেন একথা ভেবে খুবই আশ্চর্য হচ্ছি। তা-হলে কি এ-ধারণা করা খুবই স্বাভাবিক ও সঙ্গত নয় যে লেখিকা ব্রিটেনকে গণতান্ত্রিক অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতা হত্যা ব্যাপারে এবং চেকোস্লোভেকিয়ার বিরুদ্ধে জটিল চক্রান্ত থেকে সম্পূর্ণ নির্দোষী করে দেখিয়েছেন ?

বহুদিন ধরে চেক্ ও স্লোভাক্ এই দুটো জাতি পরস্পর একসাথে মধ্য ইউরোপের শক্তিদ্বয় জার্মানী ও অষ্ট্রিয়ার কর্তৃত্বে বাস করে এসেছে। শতাব্দীকাল ধরে এরা চেষ্টা করেছে—তাদের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ থাকা সত্ত্বেও—জাতীয় মুক্তির জন্য। সুতরাং গত মহাসমরের সময় এরা স্বাভাবিক জাতীয় শত্রু জার্মানীর বিরুদ্ধে গিয়েছিল এবং পক্ষান্তরে মিত্রশক্তি ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের পক্ষে যোগদান করেছিল। অবশ্য উন্মুক্তভাবে নয়, গোপনে। চেকোস্লোভেকিয়ার গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট মাসারিক এ দৌত্যকার্যে অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছিলেন। সুতরাং কার্যতঃ চেকোস্লোভেকিয়া Anglo-French ক্যাপিটালের কর্তৃত্বে এসেছে। মাসারিক ও বেনেশ ধারণাই করতে পারেন নি যে Austro-German ক্যাপিটাল মহাসমরের পর আন্তর্জাতিক ক্যাপিটালের করতলগত হয়ে গেছে। যদি এটা তাঁরা উপলব্ধি করতে পারতেন তা-হলে ১৯১৬ সালের বিপ্লবের সময় রাশ্যার সাথে যোগদান করে নিজেদের ক্যাপিটালকে আন্তর্জাতিক orbit থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারতেন। মহাযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক ক্যাপিটালকে সম্প্রসারিত করবার জন্য চেকোস্লোভাকিয়াকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। আর আজ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে এই ক্যাপিটালের ১৯৩৮ সালের সঙ্কট থেকে রক্ষা করবার জন্যই নাৎসী জার্মানীর সাহায্যে পরোক্ষভাবে চেকোস্লোভোকিয়র স্বাধীনতাকে হত্যা করা হল। আন্তর্জাতিক ক্যাপিটালকে নতুন শক্তিতে উজ্জীবিত করবার জন্য ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ড খণ্ডিত চেকোস্লোভেকিয়াকেও ৪৫ কোটি টাকা ধার দিয়েছে। অষ্ট্রিয়া গ্রাসের পর থেকে এই সকল ঘটনা নাটকীয় পরিণতিতে এসে পৌঁছল। যদিও লেখিকা এ-পরিণতি ঘটবার পূর্ব্বেই বইখানা লিখেছিলেন তবুও তিনি নিশ্চয়ই জানতেন যে সুদেতেন জার্মান মাইনরিটির সমস্যা সমাধানের জন্যই জার্মানীর

চেকোশ্লোভাকিয়াকে গ্রাস করবার ইচ্ছা হয়নি—এটা একটা অছিলামাত্র। সকল দেশে সকল যুগেই মাইনরিটি সমস্যা থাকে—এটা কিছু নতুন নয়। জার্মানী আন্তর্জাতিক ক্যাপিটালের "second fiddle"-এর ভূমিকা অভিনয় করছে : ...."the Nazis are rendering a meritorious service to international capitalism"—এ কথাটার প্রতিধ্বনি করে বলতে পারি এটাই জার্মান সাম্রাজ্যলিপ্সার গোড়ার কথা।

লেখিকা ছিন্নমান চেকোশ্লোভাকিয়ার সাম্প্রদায়িক সমস্যার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করেছেন, কিন্তু জগতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে। এই কারণেই তিনি মধ্যইউরোপের উপর জার্মানীর প্রভাবের একটা স্বতন্ত্র রূপ দিয়েছেন। আজ ইউরোপে যে জটিল সমস্যার আবির্ভাব ঘটেছে অর্থাৎ "moribund finance capital"-কে আসন্ন সঙ্কট থেকে উদ্ধার করবার জন্য আন্তর্জাতিক ক্যাপিটালের যে কুটিল ষড়যন্ত্র চলেছে—(যেটা পূর্বে দেখান হয়েছে) তার মধ্যে কী কী উপাদান সক্রিয় প্রেরণা দিচ্ছে সে সম্পর্কে লেখিকা আদৌ কিছু বলেন নি।

লেখিকা ইংলণ্ডের "Royal Institute of International Affairs"-এর সৌজন্যে বইখানা লিখেছেন সেকথা পূর্বেই বলেছি। জগতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি জানবার অধিকার আছে একমাত্র ইংলণ্ডেরই কারণ সে-ই আন্তর্জাতিক ক্যাপিটালের ডিক্‌টেটার। সেজন্য বইখানাতে দামী জ্ঞাতব্য বিষয় আশা করাই সঙ্গত। কিন্তু বইখানা পড়ে সে আশা নিষ্ফল হয়েছে। মুখ্যত: লেখিকা সাম্রাজ্যবাদ-নিরপেক্ষ হতে পারেননি। তা সত্ত্বেও বইখানা মধ্য ইউরোপের ডেমক্র্যাসীর বিস্তৃত ইতিহাস এবং সেই কারণে মধ্যইউরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতি-বিষয়ে কৌতূহলী মনের অজ্ঞানতিমিরান্ধ ধ্যানধারণার উপর কিছু আলোর রেখাপাত করবে এটা নিঃসংশয়ে বলতে পারি। লেখিকাকে এ জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সুধাময় ভট্টাচার্য

'কথা ও সুর'—শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। (বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়) মূল্য ২৲।

কিছুকাল পূর্ব্বেও ভারতীয় সঙ্গীত-সমালোচনা নাট্যশাস্ত্রীয় কয়েকটি সংজ্ঞার বর্ণনা ও প্রস্তাবে নিবদ্ধ ছিল। ১৮৩৪ খৃঃ ক্যাপ্টেন উইলার্ড-এর বই সঙ্গীতালোচনায় প্রথম য়ুরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্ত্তন করে। তারপর ধীরে ধীরে এদেশে সাঙ্গীতিক আলোচনা বিভিন্ন বিষয়পুষ্ট হতে আরম্ভ হয়। একথা শুধু সঙ্গীতের পক্ষেই প্রযোজ্য নয়, প্রত্যেক বিষয় বর্ত্তমানে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় সমৃদ্ধ ও সুবিস্তৃত হয়ে পড়ছে। এখন নৃতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, ধ্বনিবিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব, জড়বিজ্ঞান, জীবতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি সঙ্গীতে প্রসারিত হয়ে সমগ্র জীবনের সঙ্গে সঙ্গীতের একাঙ্গিত্ব প্রমাণ করে।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদের লেখায় সঙ্গীতকে নানাদিক দিয়ে দেখার প্রচেষ্টা রয়েছে। নানা বিষয়োন্মুখী বিদগ্ধ মনের ছায়াসম্পাতে তাঁর রচনা চিত্রিত। কিন্তু বাংলায় এধরণের লেখা কিঞ্চিৎ অবাস্তব মনে হয়। পাঠকের হাতের কাছে এমন কোন বাংলা বই নেই যা থেকে সহজে কোন বিষয়ের একটা সংক্ষিপ্ত প্রবেশিকা পাওয়া যায়, ইংরাজি গ্রন্থে থাকলেও তা যে অবসর ও অর্থের অনুপাতে সর্ব্বক্ষেত্রে সহজলভ্য হবে এমন কোন কথা নেই। সুতরাং মুষ্টিমেয় সর্ব্বজ্ঞ কয়েকটি পাঠককে উদ্দেশ করে লেখা ছাড়া এপ্রকার পুস্তকের অন্য কোন সার্থকতা থাকে না। অথচ লেখকের আকাঙ্ক্ষা থাকে বহু জনের কাছে আসবার, বোধগম্য হবার। লেখার রীতি সামান্য পরিবর্ত্তন করলে কিছু সুবিধে হয় কি না একথা স্বতঃই মনে আসে। যদি লেখক এমন কোন বিষয়ের অবতারণা করতে চান যার সম্বন্ধে পাঠকের সুস্পষ্ট জ্ঞান না থাকাই সম্ভব, পূর্ব্বে এক প্যারায় তার সামান্য পরিচয় দিলে ক্ষতি কি? দ্বিধা হতে পারে পাঠ্যপুস্তকের উদাহরণ-কণ্টকিত পথের পুনরাবৃত্তি সাধারণের উপভোগ্য পুস্তকের গৌরব বৃদ্ধি করবে কি না। কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের একঘেয়েমি অনেকটা সিলেবসের মার্কামারা রাস্তার জন্য শ্রান্তি আনে, এখানে সে সমস্যার উদ্ভব হবে না। এধরণে লেখা বই বিলেতে ও আমেরিকায় সুলভ। অতি কঠিন বিষয়ও যে এই প্রণালীতে লেখা চলে তার সুন্দর দৃষ্টান্ত বার্ট্রাণ্ড রাসেলের Problems of Philosophyতে পাওয়া

যাবে এবং সেহেতু পুস্তকটি নিরতিশয় সুখপাঠ্য হয়েছে। ধূর্জ্জটিপ্রসাদ কোন কোন স্থানে ঐ রীতিতে লেখার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাঁর মত বিভিন্ন বিদ্যানুরাগী ব্যক্তির কাছে আমরা কি আরো আশা করতে পারি না ?

'কথা ও সুর' কয়েকটি প্রবন্ধের সমষ্টি। লেখক গানে কথা ও সুরের আপেক্ষিক মূল্য ও সার্থকতা নিরূপণের চেষ্টা করেছেন। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় সম্প্রতি নানা আলোচনা হয়ে গিয়েছে, এস্থলে সেগুলি নতুন করে উদ্ধৃত করার কোন উপকারিতা নেই। ধূর্জ্জটিপ্রসাদের মতামত মধ্যপথা-বলম্বী—যা বাস্তব তার অর্থ আছে এবং সেই অর্থ কিঞ্চিৎ নিরপেক্ষ ভাবে বুঝতে পারলে ভ্রান্তির বিশেষ কোন গুরুতর কারণ ঘটবে না—মনে হয় এই তাঁর মনোভাব। কিন্তু এ কথা তাঁর চিন্তাপ্রণালীর কারণে অধিকাংশ স্থলে সুনির্দ্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করেনি। এদিক থেকে উপক্রমণিকায় বাংলাদেশে গত ৪০।৫০ বছরের ইতিহাস ও 'নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা' অপেক্ষাকৃত সুখপাঠ্য। বিশেষতঃ এককালে বাংলায় সঙ্গীতের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা কি রকম ছিল তাঁর ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে তা মনোজ্ঞ হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে কিছু ভাল কথার মধ্যে তিনি আত্যন্তিক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথকে বীটোফেনের সঙ্গে তুলনা করে। পূর্ব্ব-প্রকাশিত 'সুর ও সঙ্গতিতে' এর চেয়ে বেশী অন্তর্দৃষ্টির তিনি পরিচয় দিয়েছিলেন।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ ঠিক সঙ্গীতসমাজের অন্তর্ভুক্ত নন, তবু বাইরে থেকে যে তিনি তাঁর অকৃত্রিম সহানুভূতি ও দরদ নিয়ে বাংলাদেশের সিনেমা-গীতি-জর্জরিত সঙ্গীত-নিষ্ঠদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, তার জন্য সাঙ্গীতিকের তিনি প্রীতিভাজন হবেন। পুস্তকটির ছাপা, কাগজ, বাঁধাই ভাল, তবে দাম কিছু বেশী মনে হয়।

হেমেন্দ্রলাল রায়

The Common People, 1746-1938—by G. D. H. Cole and Raymond Postgate (Methuen).

ইতিহাসলেখকদের বিরুদ্ধে একটা সাধারণ অভিযোগ আছে যে তাঁদের আখ্যায়িকা যুদ্ধবিগ্রহ, রাষ্ট্রনীতি এবং রাজ্যশাসনপদ্ধতির আলোচনায় পর্য্যবসিত

হয়,—তাঁদের রচনার মধ্যে তাই নাকি সামান্য জনগণের সাক্ষাৎ মেলে না। ঐতিহাসিকদের প্রচলিত রীতির স্বপক্ষে কিছু যে বলবার নেই তা' নয়, কারণ রাষ্ট্রিক পরিবর্ত্তন সকলকেই স্পর্শ করে এবং তার ব্যাপ্তি নিতান্ত স্বল্পপরিসর না হবারই সম্ভাবনা। হেগেল্ তাই একবার বলেছিলেন যে একমাত্র ষ্টেটেরই ইতিহাস থাকতে পারে। রাষ্ট্রিক বিবর্ত্তনের একটা কাঠামো না থাকলে যে অন্যবিধ ইতিহাসরচনা বিড়ম্বনা হ'য়ে দাঁড়ায় তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্তে নানা অসম্পূর্ণতা এবং সে সম্বন্ধে বহুবিধ প্রচলিত অথচ অনিশ্চিত বিশ্বাসের মধ্যে। কিন্তু সে-কাঠামো সুগঠিত হবার পর তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা অনুচিত এবং বোধহয় অসম্ভবও। তখন স্বভাবতঃই ঐতিহাসিকের নানাদিকে দৃষ্টি পড়ে এবং সেই নানাদিকের ভিতর জনসাধারণের জীবনযাত্রার কাহিনী নিশ্চয়ই এক প্রধান স্থান নেবার যোগ্য।

সৌভাগ্যবশতঃ ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসের রাষ্ট্রিক ভিত্তি ও পরিধি এতই সুনির্দ্দিষ্ট যে কোনও বিশেষ যুগে সেখানকার সাধারণ লোকদের অবস্থা সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস লেখা কিছু দুঃসাধ্যসাধন নয়। কোল্ ও পোষ্ট্‌গেটের মিলিত প্রচেষ্টায় সম্প্রতি ইংরাজ জনগণের গত দু'শতাব্দীর একটি সুখপাঠ্য ইতিহাস রচিত হয়েছে। আংশিক ভাবে অবশ্য এ-কার্য্য বহুদিন ধরেই চলে এসেছে। এ-সম্বন্ধে অনেক সমসাময়িক তথ্যসংগ্রহ আঠারো শতকের ডিফো অথবা আর্থার্ ইয়াং-এর সময় থেকে পাওয়া যায়। আরও আধুনিক যুগে সরকারী রিপোর্ট্ ইত্যাদির বন্যা বয়ে গিয়েছে, বেন্টামের প্রভাবে ফ্যাক্ট্ জড় করা উনিশ শতাব্দীতে একটা নেশায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ইংল্যাণ্ডে এ-যুগে সাধারণ লোকের কাহিনীর নানা অঙ্গ ইতিপূর্ব্বেই বহু বিখ্যাত লেখকের বিষয়বস্তুও হয়েছে, উদাহরণ স্বরূপ হ্যামণ্ড্ ও ওয়েব্ দম্পতীর নানা গ্রন্থ এবং লিপ্‌সন্ বা ক্ল্যাপ্‌হ্যাম প্রভৃতির রচিত আর্থিক ইতিহাসের উল্লেখ করা স্বাভাবিক। তাই বিশেষজ্ঞদের কাছে কোল্ ও পোষ্ট্‌গেটের নূতন রচনা অভিনব বলে মনে হবে না। কিন্তু সাধারণ পাঠকের কাছে এ-গ্রন্থের মূল্য অশেষ, কারণ এর মধ্যে অল্প পরিসরে এক জায়গায় এত জ্ঞাতব্য তত্ত্বের সমাবেশ হয়েছে যে গ্রন্থকারদের কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করতে হয়।

লেখকেরা তাঁদের বিবরণ আরম্ভ করেছেন ঠিক যন্ত্রশিল্পের বিপ্লবাত্মক

পরিবর্ত্তনের আগে থেকে। ১৭৪৬ তারিখের মাহাত্ম্য হচ্ছে এই যে ঠিক সে-যুগে এবছরেই শেষ জ্যাকোবাইট্ বিদ্রোহ দমনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটেনে ফিউডাল্ আমলের শেষ আশ্রয় হাইল্যাণ্ডের স্কচ্ গোষ্ঠীগুলির স্বাতন্ত্র্য লোপ পেল। তারপর থেকে ক্রমে ক্রমে যত আর্থিক ও সামাজিক পরিবর্ত্তন ইংরাজ জনসাধারণের জীবনযাত্রাকে প্রভাবান্বিত করেছে, তার সবগুলির সংক্ষিপ্ত অথচ মোটের উপর প্রামাণ্য বর্ণনা এ-পুস্তকে স্থান পেয়েছে। ঠিক এ-জাতীয় গ্রন্থ অর্থাৎ অল্পের মধ্যে এতখানি সর্ব্বাঙ্গীণ আলোচনা ইংল্যাণ্ডের সম্বন্ধেও পাওয়া সহজ না। চব্বিশটি নক্সা ও ম্যাপ্ বইখানির শ্রীবৃদ্ধি করাতে পাঠকসমাজে এর আদর আরো বাড়া উচিত। বস্তুতঃ গ্রন্থটির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। ইংল্যাণ্ডের প্রচলিত ইতিহাসগুলি পড়ে' যাঁদের মন তিক্ত ও ক্লান্ত, তাঁরাও নূতন ভাবে সে-ইতিবৃত্তের আলোচনায় তৃপ্তি-বোধ করবেন নিশ্চয়।

এ-ধরণের বইএ নানা ত্রুটি থাকা অনিবার্য্য এবং তা' নিয়ে আলোচনাও শোভন নয়। তবুও তিনটি কথার উল্লেখ করে' এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় শেষ করব। জনসাধারণের এই আখ্যায়িকায় সামাজিক রীতি, নীতি, ধারণা, আদর্শ ইত্যাদির পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে প্রায় কোন কথাই নেই। ধর্ম্মবিশ্বাসের অভিব্যক্তি সম্বন্ধেও বইখানি নীরব—আঠারো শতকের বিরাট মেথডিষ্ট্ আন্দোলন অথবা ইভানজেলিকাল্ মতামতের প্রসার ইত্যাদি তাই এখানে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়েছে। গ্রন্থকারেরা অবশ্য এ-সম্বন্ধে সজাগ হ'য়ে ভূমিকায় বলেছেন যে স্থানাভাবে বাধ্য হ'য়েই তাদের প্রধানতঃ আথক ও রাষ্ট্রিক ব্যাপারে নিজেদের আবদ্ধ রাখতে হয়েছে। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও মনে হয় যে গত দু' শতাব্দীতে ইংরাজ সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর বিবর্ত্তন সম্বন্ধে লেখকদের ধারণা খুব স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়নি। ফলে আলোচ্য গ্রন্থখানি কতকটা ছাত্রদের পাঠ্য পুস্তক এবং কতকটা অসংখ্য ফ্যাক্টের একত্রীকরণের আকার নিয়েছে—অর্থাৎ সমগ্র রচনার একটা কোন বিশিষ্ট রূপ শেষ পর্য্যন্ত অনুসন্ধিৎসু পাঠকের মনে গভীর ছাপ রেখে যায় না।

শ্রীসুশোভন সরকার

গল্প-সংসার-মালা—সাধারণ সম্পাদক শ্রীশ্রীপত রায়। তৃতীয় ভাগ, বাংলা। সম্পাদক—শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত (কাশী, সরস্বতী প্রেস)।

বাংলা ছোট গল্প এখন যে অবস্থায় আসিয়াছে তাহাতে সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের মত ইহাতেও আমরা আধুনিক ভারতের অগ্রণী বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতে পারি; তবু আমাদের জাতীয় সম্পত্তির পরিমাণ কতখানি তাহা জানায় নিশ্চয় লাভ আছে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বাংলার কাব্যসংগ্রহের মত ছোট গল্প সংগ্রহেরও চেষ্টা দেখা গিয়াছে। সম্প্রতি কাশীর সরস্বতী প্রেস হইতে গল্প-সংসার-মালা প্রকাশিত হইতেছে। সরস্বতী প্রেস হইতে বিখ্যাত সাহিত্যিক প্রেমচাঁদের পরিচালনে প্রকাশিত 'হংস' পত্রিকার আদর্শ ছিল যে তাহা ভারতী সাহিত্যের মুখপত্র হইবে। এখনও অনেকে ভারতীয় সাহিত্যের অস্তিত্বে সন্দিহান, তাঁহাদের মতে বাংলা হিন্দী প্রভৃতি সাহিত্য আছে, কিন্তু নিখিল ভারতের কোন সাহিত্য নাই। ভাষা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সাহিত্যের ভাবধারাকে তাঁহারা দেখিতে পারেন না; এ বিষয়ে প্রেমচাঁদের মত ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। গল্প-সংসার-মালার উদ্দেশ্য, তাহা ভারতের সকল প্রদেশের গল্প-সাহিত্য একত্র করিয়া হিন্দী ভাষায় প্রকাশ করিবে। ইহার যে পরিকল্পনা তাহাতে নয়টি ভাষাকে প্রধান বলিয়া ধরা হইয়াছে; ইহা ভিন্ন আরও চারটি ভাষা, আসামী, উড়িয়া, সিন্ধী, গুরুমুখী। গল্প সংসার মালা ভারতের নয়টি প্রধান ভাষার প্রত্যেকটিতে যে সকল শ্রেষ্ঠ গল্প রচিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্য হইতে দশ, কি তাহার কিছু বেশী, গল্প সংগ্রহ করিয়া তাহার হিন্দী অনুবাদ এক এক খণ্ডে প্রকাশিত করিবে। প্রথম নয় সংখ্যায় পূর্ব্বোক্ত নয়টি প্রধান ভাষায় রচিত গল্প, এবং দশম সংখ্যায় শেষোক্ত চারি ভাষার গল্প হইতে সঙ্কলন থাকিবে। যাঁহারা ইহার পরিচালক তাঁহারা এই দশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পরে পৃথিবীর অন্যান্য ভাষায় লিখিত গল্পের হিন্দী অনুবাদ অনুরূপ প্রণালীতে প্রচার করিবেন, এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য্য শেষ হইতে তিন চার বৎসর লাগিবে। প্রত্যেক ভাগে ২০০ হইতে ২৫০ পৃষ্ঠা থাকিবে, মূল্য হইবে প্রতি ভাগের ॥০, এবং যাঁহারা নিয়মিত গ্রাহক থাকিবেন, তাঁহাদের জন্য প্রতি ভাগের মূল্য ।৵০—ইতিপূর্ব্বে হিন্দী ও গুজরাতী

গল্প-সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছিল, এখন বাংলা গল্প-সংগ্রহ শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল সেনগুপ্ত মহাশয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইল। সম্পাদক মহাশয় প্রথমে বাংলা গল্প-সাহিত্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার পর রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার, শরৎচন্দ্র, শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধ সান্যাল, সম্পাদক মহাশয় স্বয়ং, বুদ্ধদেব বসু, বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়,—ইহাদের এক একটি করিয়া গল্প আছে, প্রত্যেকের পূর্বে সম্পাদক মহাশয় লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

বাংলা গল্প প্রসঙ্গে সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন, আজকাল আমরা যে প্রকার রচনাকে ছোট গল্পের অন্তর্গত করিয়া লই, সে প্রকার রচনা বা কাহিনী বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন নাই, কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতাম প্যাঁচার নক্সার মধ্যেই বরং কোথাও কোথাও ছোট গল্পের একটু আভাস পাওয়া যায়। বঙ্কিমের পাঠকেরা এ উক্তির কতদূর অনুমোদন করিবেন, জানি না; পরিবর্ধিত সংস্করণের ইন্দিরার কথা বলিতেছি না, কিন্তু প্রথম সংস্করণের ইন্দিরা, রাধারাণী, যুগলাঙ্গুরীয়—যে তিনটি উপাখ্যান লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র 'উপকথা' নামে এক পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাদের উল্লেখ করিলে নিশ্চয় অপ্রাসঙ্গিক হইত না। হুতাম প্যাঁচার নক্সার সঙ্গে তাহারাও অন্ততঃ উল্লেখের দাবি করিতে পারে—ছোট গল্পের পূর্বাভাস বলিয়া। সম্পাদক মহাশয় বলিতেছেন, রবীন্দ্রনাথ ছোট গল্পের সূত্রপাত করিয়াছেন, এবং তাঁহারই হাত দিয়া ইহার 'তিন পোয়া' সিদ্ধি লাভ হইয়াছে। সাহিত্যসৃষ্টির উৎকর্ষ বা পরিমাণ বিচার করিতে গিয়া 'পোয়া' ঠিক রাখা কিন্তু মুস্কিলের ব্যাপার।

আমাদের প্রাচীন উপকথার সঙ্গে বর্তমান যুগের ছোট গল্পের প্রভেদ দেখাইতে গিয়া লেখক মানুষের প্রতি মানুষের সহানুভূতিকে আধুনিক যুগের বিশেষত্ব বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন; প্রাচীন যুগের উপকথা বলিতে জাতক, কথাসরিৎসাগর, পঞ্চতন্ত্র বা হিতোপদেশের সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরদাদার ঝুলি বা ঠাকুরমার ঝুলির রূপকথাও সম্পাদকের মনে পড়িয়াছে, কিন্তু তিনি উভয়ই এযুগে অচল বলিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা গদ্যসৃষ্টির কথা বলিতে গিয়া সম্পাদক লিখিয়াছেন,—"ইংরাজ মিশনরিরা কার্য্যে সহায়তা করিবে বলিয়া বাংলা গদ্য প্রবর্তন করেন,"—"তাঁহারাই প্রথম বাংলা সমাচারপত্র প্রকাশের

গৌরবের ভাজন,"—তাহার পর (?) রামমোহন রায়ের আবির্ভাব—"ইসকে কুছ হী দিন বাদ রামমোহন রায় হুএ"—ঐতিহাসিক দৃষ্টির মর্য্যাদা রাখিয়া ইহা লেখা হয় নাই। সম্পাদক মহাশয়ের অন্য কয়েকটি মন্তব্যও বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না, যেমন বিদ্যাসাগর ও টেকচাঁদের রচনাবলী ভাষার ক্রমবিকাশের আলোচনায় উল্লেখযোগ্য হইলেও সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত নহে, 'গণনায় আসে না'; 'বঙ্কিমচন্দ্র ছোট গল্পে ও মধুসূদন গীতিকাব্যে হাত দিতে সময় পান নাই'; 'ছোট গল্প রবীন্দ্রপ্রতিভার গৌণ দিক'; 'বঙ্গের প্রকৃতি ও বাঙ্গালীর নিত্যকার সুখদুঃখের তরঙ্গে পরিপূর্ণ প্রশান্ত জীবনের পটভূমির আধারে ছোট গল্পের জন্ম—ইহাতে কোনও বড় দ্বন্দ্ব নাই, কোনও কঠিন সমস্যা নাই, কোনও বড় আহ্বান নাই, গীতিকাব্যের মতই ইহা স্বচ্ছ, সুন্দর ও মর্মস্পর্শী'; 'রবীন্দ্রনাথের সমস্ত ছোট গল্পই কাব্যলক্ষণাক্রান্ত'; অবশ্য এ সকল মন্তব্য তাহাদের মূল অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে সম্পাদকের প্রতি কতদূর অবিচার করা হয়, তাহার মীমাংসা করিতে হইলে মূল অংশটিও পড়িতে হয়।

লেখক-পরিচয়ের মধ্যেও স্থানে স্থানে মারাত্মক ভ্রমপ্রমাদ রহিয়াছে। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথের "অধিকাংশ" বাংলা রচনাই কি ইংরাজীতে অনুবাদ করা হইয়াছিল, এবং তাহার ফলেই কি তিনি 'নোবেল প্রাইজ' পাইয়াছিলেন? শরৎচন্দ্রের তুলনায় প্রবোধ সান্যালের দৃষ্টি 'অধিকতর স্বচ্ছ'? অল্পস্বল্প অত্যুক্তিও আছে; লেখক বলিতেছেন—"বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের গল্পের নিতান্ত অভাব আছে। বলা যাইতে পারে যে পরশুরামের আবির্ভাবের পূর্বে সুরুচিসম্পন্ন হাস্যরস বাংলায় একেবারেই ছিল না"। ইত্যাদি। কিন্তু সর্বাপেক্ষা অদ্ভুত লাগিল বুদ্ধদেব বাবুর পরিচয় যে ভাবে লেখা হইয়াছে, তাহাতে। "বাস্তবিক ইনি কোনও বিশিষ্ট শ্রেণীর গল্প-লেখক নহেন"। তাহা হইলে ইঁহার গল্প লওয়াই বা হইল কেন, আর যদি লওয়া হইল তবে এরূপভাবে পরিচয় দেওয়াই বা কেন? বুদ্ধদেব বাবুর সম্বন্ধে এরূপ পরিচয় (?) মোটেই ভাল লাগিল না।

সঞ্চয়ন মাত্রেই সঞ্চয়নকারীর নিজের রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং নন্দগোপাল বাবু যে সকল সাহিত্যিকের গল্প নির্বাচন করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে অন্য কাহারও (সমালোচকেরও) কিছু বলিবার নাই; তবু যেন একটা খট্‌কা লাগে। ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত যে সঞ্চয়ন বাংলার ছোট গল্পের পরিচয়

ভারতের অন্যান্য প্রদেশে দিবে, তাহাতে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর, স্বর্গীয় রাখালচন্দ্র সেনের এবং স্বয়ং পরশুরামের—অন্ততঃ এ তিন জনের কোনও নিদর্শন থাকিবে না, এই বইখানি হাতে পড়িবার পূর্বে সে কথা ভাবিতে পারি নাই।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

সোমলতা—শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী (ভারতী ভবন)।

রসকলি—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (রঞ্জন পাবলিশিং হাউস)।

সোমলতা একখানি ট্রিলজির শেষ খণ্ড। এর প্রথম খণ্ড "ময়ূরাক্ষী" ও দ্বিতীয় খণ্ড "গৃহ কপোতী"। বৈষ্ণবদের জীবন নিয়ে প্রধানত এই উপন্যাসটি রচিত। এ ধরণের বই পূর্বে যা পড়েছি—যেমন "শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব", "দৃষ্টি প্রদীপ" [বিভূতিভূষণ], "রাইকমল" [তারাশঙ্কর] ইত্যাদি—তাদের চেয়ে "সোমলতা" আমার ভাল লেগেছে। যদিচ বইটি এক হিসাবে মামুলি ধরণের, তথাপি নিছক গল্প হিসাবেও সুখপাঠ্য। মুস্কিল হচ্ছে এই যে, বৈষ্ণব সংক্রান্ত রচিত উপন্যাস প্রায়ই এক রকম হয়ে পড়ে। বিনোদিনীর [সোমলতা] সঙ্গে কমললতা [শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব] অথবা মালতীর [দৃষ্টি প্রদীপ] সঙ্গে তমাললতার [সোমলতা] কোথায় পার্থক্য তা খুঁজে বার করা পাঠকদের কষ্ট হবে। ছড়া, গান, কথাবার্ত্তা, হাবভাব, দৃশ্যপট ইত্যাদি প্রায় অনেক ক্ষেত্রেই একরকম। এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে গ্রাম্য জীবন অনেকটা একঘেয়ে ধরণের; কিন্তু এই একঘেয়েমি যদি উপন্যাসের মধ্যেও আসতে সুরু করে তাহলে সমূহ বিপদ। কখনো কখনো এই একঘেয়েমি কাটাবার জন্য ইচ্ছা পূরণের লীলা প্রকট হয়ে ওঠে। "পথের পাঁচালী" [এতো ভাল বই হয়েও] হয়ত সেইজন্য nostalgic দীর্ঘশ্বাসে ভরপুর। "সোমলতা"ও এ দোষ থেকে একেবারে মুক্ত নয়। বোধ হয় মাণিক বাবুর উপন্যাসেই গ্রাম্য জীবনের একঘেয়েমি অনেক কম। দুর্ভাগ্যবশত বাংলা দেশে ভাল ভাল ছোট গল্প রচিত হলেও উপন্যাস প্রায় লেখা হয়নি বললেও অত্যুক্তি হবে না। হয়ত যে মানসিক গঠন উপন্যাস লেখার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন তার অস্তিত্ব অনেক গল্প-লেখকের মধ্যেই নেই। অনেক সময় এই সব লেখকেরা স্বভাব গল্প-লেখক বলে বিখ্যাত হন। অর্থাৎ এঁরা সেই শ্রেণীর

গল্প-লেখক যাঁদের লেখা পড়ে যদি বা হৃদয়ে যথেষ্ট আনন্দ পাওয়া যায়, কিন্তু মন টলমল করে ওঠে না। শরৎচন্দ্র হয়ত সেইজন্যেই এত 'পপুলার', যদিও তলিয়ে দেখতে গেলে তিনি "নষ্টনীড়" কিংবা "চোখের বালির" সীমানা পেরিয়ে খুব বেশী দূর যেতে পারেননি। আর 'গোরার' যে গঠনচাতুর্য্য ও তার মুখ্য ও গৌণ চরিত্রের বিচিত্র সমাবেশ তাও আর রবীন্দ্রনাথের পরবর্ত্তী লেখকদের মধ্যে পাওয়া যায় না। বলাই বাহুল্য যে উপন্যাসের মধ্যে জীবনের কোনো একরকমের 'প্যাটার্ন' না পেলে, উপন্যাস পড়াই বৃথা। এ সব দিক থেকে দেখতে গেলে ধূর্জ্জটিবাবুর উপন্যাসের প্রশংসা না করে আর থাকা যায় না, যদিও তাঁর লেখার ধরণ অনেকের ভাল নাও লাগতে পারে। এ ভাবে বিচার করলে "সোমলতা" সম্বন্ধে শেষ পর্য্যন্ত নিরাশ হতে হয়। যে সমাজ সম্বন্ধে লেখক লিখেছেন সে বিষয়ে পাঠকের যদি কিছুমাত্র interest নাও থাকে, তবুও তাকে interesting করে তোলা লেখকেরই কর্ত্তব্য। "সোমলতা" এ বিষয়ে উদাসীন। কোনোদিকে দৃকপাত না করে একটানা গল্প বলার মধ্যে একটা দুঃসাহসিক ক্ষমতা থাকতে পারে—এমন কি তা শ্রুতিমধুরও হয়ত হবে, কিন্তু এই মননহীন মিষ্টত্বই পাঠকের মনে শেষ পর্য্যন্ত বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

"রসকলি" ছোটগল্পের সমষ্টি। তারাশঙ্করের উপন্যাসের চেয়ে ছোট গল্পই অনেক বেশী উপাদেয়। একই বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা "রাইকমল" ও "রসকলির" (লেখকের প্রথম গল্প রচনা) তুলনা করলেই বোঝা যাবে যে তিনি ছোট গল্প কত বেশী ভাল লেখেন। কিছুকাল পূর্বে লেখকের 'জলসা-ঘর' (ছোট গল্পের বই) নামক একটি বই পড়েছিলুম। তার প্রথম গল্পটি (জলসাঘর) পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। ভাব, ভাষা, রহস্য ও গাম্ভীর্য্যে "জলসাঘর" "ক্ষুধিত পাষাণে"র সঙ্গে তুলনীয়। 'ফিউডল' যুগের শেষ পরিণতির চিত্র নিয়ে এমন পরিপূর্ণ গল্প ইদানীং আর কেউ লিখেছেন কিনা আমার জানা নেই। "রসকলির" প্রায় সব গল্পগুলিই ভাল যদিচ আঙ্গিকের দিক থেকে ঈষৎ কাঁচা। প্রথম রচনা হিসাবে 'রসকলি' গল্পটি সত্যই উপভোগ্য।

চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়

গিরিশচন্দ্র—হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত।

সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত ইতঃপূর্ব্বে একাধিক গ্রন্থে গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনা ক'রেছেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, অধ্যাপক কুমুদবন্ধু সেন প্রমুখ আরও কয়েক ব্যক্তি গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি রচনা ক'রেছেন। বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চ এবং নাট্যসাহিত্যে গিরিশচন্দ্রকে শুধু অগ্রণী মনে করলে, ভুল হবে। বাঙ্গলার নাট্যসাহিত্যের তিনিই ছিলেন প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর আজীবন সাধনা আজকার বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চাদির উৎকর্ষের মূলে আছে, এ কথা ভুলে গেলে অন্যায় হবে। হেমেন্দ্র বাবু তুলনামূলক আলোচনা ক'রে দেখিয়েছেন যে তিনি গ্যারিক্ বা শেক্সপীয়র-এর চেয়ে এক হিসাবে বড় ছিলেন। গ্যারিক্ অথবা শেক্সপীয়র-এর জন্য পূর্ব্বাহ্নেই ভূমি কর্ষিত ছিল। কিন্তু গিরিশচন্দ্র নিজেই ভূমি-কর্ষণের ভার নিয়েছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে আমরা আশাতীত পুষ্টিকর ফসল-ও পেয়েছি। যাই হোক, গিরিশচন্দ্রের ক্ষমতা সম্বন্ধে বাঙ্গলার নাট্যরসপিপাসু-মহলে আজ আর কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা যতো বেশী হয়, ততোই মঙ্গল।

এই গ্রন্থের অন্তর্গত প্রবন্ধগুলি হেমেন্দ্র বাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গিরিশ-লেকচারার' পদে অধিষ্ঠিত থাকা কালে রচনা করেন।

সমসাময়িক সাহিত্যে ন্যায়নিষ্ঠ সমালোচনার অভাব লক্ষ্য ক'রে একদা শ্রীমতী ভার্জ্জিনিয়া উল্‌ফ্ মন্তব্য ক'রেছিলেন "Reviewers we have, but no critic, a million competent and incorruptible policemen but no judge."

আমাদের দেশে শুধু সমসাময়িক কেন, অতীত-সাহিত্যের সমালোচনা প্রসঙ্গেও এ কথা সমভাবেই প্রযোজ্য। খাঁটি সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গী এদেশে কদাচ চোখে পড়ে। শ্রীমতী উল্‌ফ্ আরও লিখেছেন, Men of taste and learning and ability are for ever lecturing the young and celebrating the dead. But the too frequent result of their able and industrious pens is a desiccation of the living tissues of literature into a net-work of little bones। সুখের বিষয় হেমেন্দ্র বাবুর লেখনী able ও industrious হ'লেও তাঁর সমালোচনা সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত অভিযোগ আনা যায় না।

বইখানির প্রথম ভাগে ছয়টি অধ্যায়ে গিরিশচন্দ্রের বাল্যজীবন থেকে আরম্ভ ক'রে তাঁর জীবনের ক্রমবিকাশ এবং তাঁর রচিত পৌরাণিক, ঐতিহাসিক এবং সামাজিক নাটকাদির সম্বন্ধে আলোচনা করা হ'য়েছে। তাঁর রচনার মধ্যে আত্মজীবনের প্রতিফলন লেখক কৃতিত্বসহকারে উদ্ঘাটন ক'রেছেন। গিরিশচন্দ্রের রচনায় "মাতৃশক্তিদ্বারা প্রভাবান্বিত" চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে দেখানো হ'য়েছে যে Shakespeare-এর Volumnia এবং Swinburne-এর Catherine de Medici-র চেয়ে 'জনা' অধিকতর মহিমময়ী।

গিরিশচন্দ্রের প্রথম নাটক "আনন্দরহো" (১৮৮১) ঐতিহাসিক কিন্তু এখানি সাধারণ্যে সমাদর লাভ না করায় তিনি পৌরাণিক নাটক লেখায় মন দেন। উত্তরকালে তিনি আবার ঐতিহাসিক নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন কিন্তু তাঁর "সৎনাম" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের "প্রতাপাদিত্য"-র পূর্ব্বেই রচিত হয়। হেমেন্দ্র বাবু বলেন, এই কারণে গিরিশচন্দ্রকেই বাঙ্গলার প্রথম জাতীয় নাট্যকার বলা যায়। তা'ছাড়া নানা উদ্ধৃতি-সহকারে লেখক দেখিয়েছেন গিরিশচন্দ্র অন্যান্য সমসাময়িক লেখকের চেয়ে তাঁর নাটকে অধিকতর বিশ্বস্তভাবে ইতিহাস অনুসরণ ক'রেছেন। তাঁর সামাজিক নাটকের বিষয়বস্তু মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী জীবন থেকেই আহৃত এবং মনস্তত্ত্ব-ও তাঁর রচনার অন্যতম উপজীব্য। পঞ্চম অধ্যায়ে মধুসূদন-প্রবর্ত্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দ থেকে গিরিশচন্দ্র যে মুক্ত অমিত্রাক্ষরের সৃষ্টি করেন এবং অধুনা "গৈরিশী ছন্দ" নামে যা' অভিহিত হয় সেই সম্বন্ধে আলোচনা আছে। তাঁর অনুবাদ-দক্ষতা প্রভৃতির কিছু-কিছু পরিচয় দেওয়া হ'য়েছে।

দ্বিতীয় ভাগে চারটি অধ্যায়ে গিরিশচন্দ্রের রঙ্গমঞ্চগঠনে, অভিনয়ে এবং সঙ্গীত-রচনায় নৈপুণ্যের প্রসঙ্গ বর্ণিত হ'য়েছে। ন্যাশনাল, ষ্টার এবং মিনার্ভা

থিয়েটারের তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা, এ ছাড়া এমারেল্ড, ক্লাসিক এবং কোহিনুর থিয়েটারে তিনি অধিনায়কত্ব করেছেন। তাঁর অসামান্য অভিনয়-নৈপুণ্য রামকৃষ্ণ, Edwin Arnold প্রমুখ ব্যক্তিদের মুগ্ধ ক'রেছিল। 'শ্রীচৈতন্যলীলার' অভিনয় সে-সময়ে পতোনোন্মুখ হিন্দু ধর্ম্মের পক্ষে প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি ক'রেছিল। এ বিষয়ে দাসগুপ্ত মহাশয় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

গিরিশের সঙ্গীত রামপ্রসাদের ধারায় জাতীয় ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত। গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে এ-সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

হরপ্রসাদ মিত্র

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

এই সংখ্যায় যাঁহাদের ষান্মাষিক মূল্য শেষ হইল, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক দ্বিতীয় খণ্ডের মূল্য ২॥০ মনিঅর্ডারযোগে ২০শে পৌষের মধ্যে পাঠাইয়া দিবেন। ২০শে তারিখের মধ্যে টাকা না পাইলে, মাঘ সংখ্যা তাঁহাদের নিকট ভিঃ পিঃ-তে পাঠান হইবে।

শ্রীগোবর্দ্ধন মণ্ডল কর্ত্তৃক আলেক্‌জান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌, ২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত
ও শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক ১১, কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত

RABINDRA BHARATI UNIVERSITY
11900
LIBRARY